দানব ও দেবতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ

পূজনীয় স্বামী উমানন্দ

অধ্যক্ষ

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন

দানব ও দেবতা এবং মেক্সিকোর দুটি আলাদা গ্রন্থ
হলেও, একটি আর একটির পরিপূরক, পরস্পর
সংযুক্ত। বিষয় — মানুষ এক বিচিত্র জীব। লুণ্ঠন, শোষণ
নির্যাতন, যুদ্ধ, হত্যা এ-সব কাজ মানুষেরই, আবার গঠন,
সংরক্ষণ, পালন, সৃজন, রক্ষা, এ-ও মানুষেরই কাজ।
মানুষ কখনো দানব, কখনো দেবতা।

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর বিশ্বধর্ম মিলনসভায়
বললেন, তোমরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা, প্রবক্তারা নিজের
মাতব্বরি কর, প্রেমের কথা তোমাদের মুখে সাজে না।
স্পেন মেক্সিকো লুঠ করে ঐশ্বর্যশালী, আর ইংরেজ
সারা ভারত শোষণ করে সিংহাসনে রাজা। ভারতের
সনাতন ধর্মে যুদ্ধ নেই, ধ্বংস নেই, শোষণ নেই। হিন্দুরা
লুঠ করে বড় লোক হতে চায় না। আমাদের বার্তা - যুদ্ধ
নয় শান্তি, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা, প্রেম।

১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ জঙ্গী হামলায় নিউইয়র্কের
ঐতিহাসিক ইমারত, ও-দিকে পেন্টাগন ধ্বংস হল। তৃতীয়
বিশ্বযুদ্ধ - হয়ত শুরু হল। ১৮৯৩, ১১ সেপ্টেম্বর চিকাগো
সভায় বলগর্বী, মদান্ধ পশ্চিমকে সাবধান করতে চেয়েছিলেন,
যুদ্ধ নয় শান্তি। সভ্যতা ধ্বংস কোরো না। অস্ত্রসাধনা
ছেড়ে প্রেম সাধ। স্বামীজী বলেছিলেন, শক্তির সাথে সহিষ্ণুতার
মিলন ঘটাও, নয়ত সব ধ্বংসে যাবে। কি প্রফেটিক।

কেউ শোনেনি দেববাণী। দানবের দল প্রবল।

করুণা প্রকাশনীর পিতা-পুত্র কর্ণধার দুজনের অভিপ্রায়ে
গ্রন্থ দুটিকে একত্রিত করে শক্তিস্বরূপা মা দুর্গার
সারস্বত পূজা করলেন। তাঁদের কল্যাণ হোক।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

দশটি উপন্যাস

রুকু সুকু অমনিবাস

খোলখন্তাল

এর নাম সংসার

বুদবুদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমি

বিকাশের বিয়ে

১

বিশ্বেব সমাজনীতি ও বাজনীতিতে নেহকপবিবাবেব একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। পণ্ডিত জওহবলাল তৃতীয় বিশ্বেব সম্মানিত পুবষ ছিলেন। বিশ্বে অর্থনৈতিক সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠাব জন্যে আজীবন প্রযাস চালিযে গেছেন কিন্তু 'ট্র্যাজেডি অয ফেট', চাইলেন শান্তি, চাইলেন যুদ্ধ মুক্তি, ফল হলো বিপবীত। চীন আক্রমণ কবে বসল ভাবত। চীন ভাবত সীমান্ত সীমানা নির্ধাবণ নিযে একটা টানা হ্যাঁচড়া সেই ইংবেজ আমল থেকেই চলে আসছিল। ইংবেজ দেশ ছেড়ে চলে যাবাব সময ভাবতকে সব সম্পদ এবং সমস্যাবও উত্তবাধিকাবী কবে বেখে গিযেছিল। গোলাপেব সঙ্গে কাঁটা ১৯৬০ সালে দিল্লিতে চু এন লাইযেব সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হলো। আলাপ আলোচনাব মাধ্যমে সমস্যা সমাধানেব শান্ত পথ বন্ধ হযে গেল। ভাবতকে বেছে নিতে হলো শক্তিব পথ। সীমান্তেব ভাবত ভূখণ্ড থেকে দখলকাবী চীনা সৈনিকদেব ঠেলে সবাতে হবে। ভাবতীয সেনাবাহিনীব শক্তিব পবিমাপ তখনও তেমন হযনি। এব পবেব ইতিহাস আমবা এখনও ভুলতে পাবিনি। চীন আমাদেব জববদস্ত একটা নাড়া দিযে ছেড়ে দিযেছিল স্পষ্ট হযে উঠেছিল আমাদেব শক্তিব দিক নয, দুর্বলতাব দিক, অক্ষমতাব দিক। এই সামান্য যুদ্ধ জওহবলালকে দুমড়ে মুচড়ে দিযে গেল। তাঁব সেই নাসিকোচিত আত্মপ্রত্যয ঝবে পড়ে গেল। ভাবত প্রশাসনে আলগা হযে পড়ল তাঁব হাতেব মুঠো জনমানসে ধূসব হযে গেল ভাবমূর্তি। শুভ্র আচকানে তাঁব লাল গোলাপটি পাণ্ডুব হযে গেল। কৃষ্ণমেনন পবে লিখলেন I think he collapsed it demoralized him completely because everything he had built up in his life was going

বাজীব তখন শিশু। লালবাহাদুব ইন্দিবা মোবাবজী, চবণ সিং ইন্দিবা হযে বাজীব এক দীর্ঘ জটিল পথ। বাজনীতিব ঢুলি কাঁধে ঘুবে ঘবে বাজীবেব স্কন্ধাবোহী হযেছে। বযেসে তরুণ, অভিজ্ঞতায খাটো তবে প্রাণশক্তিতে ভবপুব। শ্রীমতী গান্ধীব আমলে আভ্যন্তবীণ জটিলতায বিশ্ব পবিস্থিতিতে ভাবতেব ভূমিকা স্তিমিত হযে এসেছিল। তরুণ বাজীব ভাবতকে বিশ্ব প্রাঙ্গণে আবাব টেনে এনেছেন। দেশ থেকে দেশান্তবে উড়ে চলেছেন। তারুণ্যেব এই গুণ। তিনি একা নন, সঙ্গে অনেক সঙ্গী। নিজেব মন্ত্রীসভাব বাছাই কবা সদস্য উপদেষ্টা সংবাদপত্রেব প্রতিনিধি সবোপবি দেহবক্ষীব দল। এইডস এখন মাথা নাড়ছে। আব একটি সাংঘাতিক ব্যাধি বিশ্বকে গ্রাস কবতে চলেছে--টেববিসম। সন্ত্রাসে সন্ত্রস্ত দেশনাযকবা। মধ্যযুগেব খলিফদেব অবস্থা আব নেই। ছদ্মবেশ ধাবণ কবে গভীব বাতে জনপদেব অলিতে গলিতে ঘুবে ঘুবে প্রজাদেব অবস্থা স্বচক্ষে দেখছেন। প্রাসাদে ফিবে এসে দোষী কর্মচাবিদেব সাজা দিচ্ছেন। অযাচিত করুণা বর্ষণ কবছেন ভুক্তভোগীদেব ওপব। একালেব দেশনাযকদেব দুর্ভাগ্য। গণ্ডীবদ্ধ সীতা সব। এক পা বেবলেই বাবণে ধববে। বাজীবেব অবস্থা খুবই খাবাপ। তাঁব মাযেব বক্তে তৃষ্ণা মেটে নি জল্লাদদেব। ওত পেতেই আছে। আমাদেব বামবাজত্ব ঘুচে গেছে। বাবণেব বথেব চাকায ধুলো উড়ছে। সব ঘোলাটে। বানব সেনা পক্ষ পবিবর্তন কবে ট্রাপিজেব খেলা দেখাচ্ছে। হা বাম। বলেছিলেন গুলিবিদ্ধ মহাত্মাজী।

দেশ পত্রিকাব শ্রদ্ধেয সম্পাদক সাগবময ঘোষ জুলাই মাসেব একদিন বেলা তিনটে নাগাদ তাঁব ঘব থেকে বেবিযে এলেন, 'এই যে সঞ্জীবচন্দ্র তোমাকেই আমি খুঁজছি, নাও তৈবি হযে নাও।'

বেলা তিনটে বাজলেই এমনিই আমি তৈবি হযে থাকি। অফিসে আসতে দেবি কবলেও চার্লস ল্যাম্বেব মতো যাবাব ব্যাপাবে ভেবি পাংচুযাল। চক্ষুলজ্জা তো একেবাবে যায নি। বাঙালী হলেও কলোনিযাল সাহেবদেব ট্রেনিং সহজে ভুলি কি কবে। একটা দেবি ক্ষমা কবলেও দুটো দেবি ক্ষমা কবা যায না। ঠিক চাবটে বাজলেই ছাতা, লাঠি, ব্যাগ বই সর্ববিধ আযুধ বগলস্থ কবে আমি মানিক পাব বাস্তায নেমে পড়ে নাতিদীর্ঘ একটি নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বলি, উঃ খেটে খেটে জীবনটা গেল আব পাবা যায না। আব তখনই আমাব মনে হয পুষ্টিকব একটা কিছু খাওযা উচিত। কলকাতাব ববাত। বেগুনেব চেযে আপেলেব দাম কম। মাঝাবি মাপেব একটা আপেল কামড়াতে কামড়াতে বাসে বসাব ফোকব খুঁজি। একটা আপেলে যত বস হয, বাসে জনগণ তাব ডবল বস নিঙড়ে নেয।

সম্পাদক মহাশয়েব প্রস্তাবে মহা খুশি হয়ে বললুম, 'আমি তো তৈবিই।' মনে মনে বললুম, চাবটে বাজতে তো মাত্র আব এক মিনিট দেবি। মুখে বললুম, কোথাও যেতে হবে সাগবদা, আপনাব সঙ্গে?'

'আমাব সঙ্গে আব কোথায় যাবে। যেতে হবে প্রধানমন্ত্রী বাজীব গান্ধীব সঙ্গে। লণ্ডন থেকে মেকসিকো। এই নাও চিঠি, পি আই বি-ব নির্দেশ।'

সে আবাব কি। হাবিয়ে যাবাব ভয়ে আমি ওই নয়া ভবানীপুব কি কালীঘাটে যেতে ভয় পাই। আমাব মগজে দিগ্বিদিক জ্ঞানেব কলকব্জাটি যে কোনোও কাবণেই হোক গড়বড় হয়ে গেছে। উত্তব, দক্ষিণ, পূব পশ্চিম ঠিক কবতে পাবি না। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। যেমন, সেদিন এক ভদ্রলোকেব বাড়িতে গিয়ে বেল বাজাতেই তিনি সদব খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আপ্যায়ন করে নিয়ে গেলেন ভেতবে। টানা দালান ধবে কিছু দূব গিয়েই তাব বৈঠকখানা। বেশ গল্প গুজব হলো। তাবপব এক সময় 'আসি' বলে ঘবেব বাইবে এসে, ভেবে স্মার্টলি বাঁদিকে ঘুবে গেলুম। আমি ভাবছি বাইবে যাবাব দবজাব দিকেই যাচ্ছি, ও মা এ কি। সোজা চলে এলুম তাদেব বাথরুমে। একেবাবে বেকুব বনে গেলুম। প্রবেশ যখন কবেই, তখন দবজা বন্ধ কবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বইলুম কিছুক্ষণ।

বেবিয়ে আসতেই ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাব তো মশাই অসাধাবণ ক্ষমতা। কি কবে জানলেন ওই দিকেই ওটা।'

তাব প্রশ্নেব মুখে কি উত্তব দিলাম ঈশ্বব জানেন। জানেন তো এক বিদগ্ধ সমালোচক আমাব বইয়েব সমালোচনা কবতে গিয়ে লিখেছিলেন, বাথরুম সাহিত্যিক। বাথরুম ছাড়া আব কিছু চেনে না। জানেন তো বড়ো বড়ো লোকেব ভাষায় চেনো বাথরুম।

লণ্ডনে 'কমনওয়েলথ কনফাবেন্স' মেকসিকোয় মিনি সামিট'। কমনওয়েলথে লড়াই হবে বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা চামড়া বেখা বাব কালা আদমীদেব পিষে মাবছেন। দানবটিকে এইবাব দাবাতে হবে। ভাবত সহ প্রধানমন্ত্রী বাজীবেব সুব এবাব খুবই কড়া। চড়া। মার্গাবেট থ্যাচাব, বানী এলিজাবেথকে একটা কিছু কবতেই হবে। সাদা সাহেবেব পিঠ চাপড়ে কমনওয়েলথেব কমন ইন্টাবেস্ট বজায় বাখা যাবে না। এশিয়ান গেমস আমবা বয়কট কবেছি। কমনওয়েলথ থাকবে কি যাবে মহাবানীই জানেন।

মেকসিকোব মিনি সামিটে' যুদ্ধ ঘোষণা কবা হবে পাবমাণবিক সমব সম্ভাবেব বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউবোপ চুবমাব হয়ে গেলেও যুদ্ধ শেষ হয় নি। যুদ্ধেব নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। ধ্বংসেব নতুন শক্তি এসে গেছে বৃহৎ বাষ্ট্রেব হাতে। মৃত্যুব ছাতাব তলায় চলেছে বিশ্ব মানবেব জীবন লীলা। মানুষেব সামান্য ভুলে পৃথিবী যে কোনোও মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পাবে। বিজ্ঞানেব সাধনায় ক্যানসাব নিবাময়েব ওষুধ না পেলেও একলপ্তে অনেক কোটি মানুষ মাবাব মাবণাস্ত্র আমবা পেয়ে গেছি। বিশ্বেব মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন কবে দেওয়া এখন কয়েক দিন, কয়েক ঘণ্টাব ব্যাপাব মাত্র। পৃথিবীতে নতুন যুগ এসে গেছে, আণবিক যুগ।

সেই হাত ঘড়িটি এখনও আছে, পুড়ে ঝলসে গেছে। আটটা ষোল বেজে চিবকালেব জন্যে নিশ্চল। সকাল আটটা ষোল আগস্ট ৬ সাল ১৯৪৫। ছোট্ট শহব হিবোশিমা। সুন্দব শহব হিবোশিমা। হাতেব পাঁচটা আঙুল ফাঁক কবে চেটোটাকে উপুড় কবে বাখলে যা হয় হিবোশিমা অনেকটা সেই বকম। পাঁচটা আঙুল হলো পাঁচটা নদী। ফুড়ফুড় কবে উড়ে এল বোমাব বিমান 'এনোলা গে'। পূব থেকে পশ্চিমে। নদীব ওপব দিয়ে। পাইলটেব মায়েব নামে প্লেনেব নাম 'এনোলা গে'। মা কৃপা বর্ষণ কবেন। 'এনোলা গে' ফেলতে আসছে বিজ্ঞানেব নবতম, ভয়ঙ্কব আবিষ্কাব। একটি আণবিক বোমা। যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সংযুক্ত মিত্রশক্তি তখন চেপে ধবেছে জাপানকে। ঝাঁক ঝাঁক বিমান আসে যায়। কখনও বোমা ফেলে, কখনও ফেলে না। টহল দিয়ে, ভয় দেখিয়ে ফিবে যায়। সাইবেন বাজে। অলক্রিয়াব হয়। সবই গা-সহা ব্যাপাব। 'এনোলা গে' নদীব ওপব দিয়ে উড়ে আসছে সঙ্গী সাথী নিয়ে। আকাশের নিচে হিবোশিমাব জনজীবন তেমন সন্ত্রস্ত হলো না। বোমাব সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। কিছু বাড়ি ঘব ভাঙবে। আগুন জ্বলবে। কিছু মানুষ মববে। এবই নাম যুদ্ধ। স্বাভাবিক কাজকর্মেব বাইরে বাড়তি কিছু কাজ ধ্বংসাবশেষ সবানো, মৃতেব সৎকাব। আহতেব সেবা।

আর পাঁচটা ছেলের মতোই কাওয়ামোতো সকালের স্কুলে আসছে। স্কুলের গেটে যখন এলো তখন ঘড়িতে সকাল সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। তখনও হিরোশিমা আছে। ওটা নদী বইছে। বইছে তেনমা নদী। বইছে হোনকাওয়া, মোতোইয়াসু। হেইওয়াব্রিজের ওপর বইছে মানুষের যানবাহনের স্রোত। সুন্দর পোশাকের নরনারী। সবুজ বনস্থলীতে উড়ছে প্রজাপতি ফড়িং। নদীতে খেলছে রুপোলি মাছ। হিরোশিমা সময়ের ওই ক্ষণটিতে তখনও প্রাণচঞ্চল। আর একত্রিশ মিনিট পরে হিরোশিমা থাকবে না। বি ২৯ আমেরিকান বোমারু বিমান 'এনোলা গে' হালকা মেজাজে উড়ে আসছে। চালক—পল টিবেটস। বিমানের তলপেটে একটি মাত্র বোমা। লস অ্যালামোসের আণবিক বিজ্ঞানীরা সেতকটির নাম রেখেছেন— 'থিনম্যান'। জননী 'এনোলা' ধারণ করেছিলেন পলকে বিমান 'এনোলা' ধারণ করেছে মৃত্যুরূপী 'থিনম্যান', শীর্ণ মানবটিকে। আমাদের পুরাণের দধিচী, যার অস্থি থেকে তৈরি হয়েছিল মৃত্যুবাণ। বজ্র।

৬ আগস্ট ছিল সোমবার। ঝলমলে দিন। সেই সাত সকালেই মানুষের হাসফাঁস অবস্থা। ট্রেন ধরে হিরোশিমা স্টেশনে আসতে আসতেই বালক কাওয়ামোতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সকাল সাতটার সময় একবার বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি হয়েছিল। একটি মাত্র বি ২৯ বিমান টহল মেরে চলে গেছে। বিমানটিকে তখন নিরীহ মনে হলেও আসলে সেটি ছিল [illegible]। আবহাওয়া বিমান 'এনোলা গে'কে আক্রমণের উপযুক্ত সময়টি জানানোই ছিল যার [illegible] উদ্দেশ্য।

কাওয়ামোতোর কাঁধে একটি বেলচা [illegible] হলেও সৈন্যবাহিনী তাকে ছেড়ে দেয় নি। হিরোশিমায় তখনও পর্যন্ত বড় রকমের বোমা বর্ষণ হয় নি। যদি হয়, তাহলে এই বালক বাহিনী নেমে আসবে আগুন সরিয়ে পালাবার পথ পরিষ্কার করতে। একত্রিশ মিনিট পরে যে আগুন জ্বলবে, সে আগুন নেবাবার সময় কাওয়ামোতোর নেই।

কেন হিরোশিমা, কেন নাগাসাকি? ১৯৪৫ এর বসন্তেই এই নিধনযজ্ঞের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন [illegible] বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞরা। সেই দলে ছিলেন, গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। আবহাওয়াবিদ। রবার্ট ওপেনহাইমারও ছিলেন সেই দলে। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল।

[ক] আণবিক বোমার সব থেকে [illegible] আসবে প্রাথমিক বিস্ফোরণের মুহূর্তেই। তারপর ঘটবে দাবানল [illegible]। অতএব বোমাটিকে এমন জায়গায় ফেলতে হবে, যেখানে অনেক বাড়িঘর। তাহলেই বেশী সম্ভব হবে বোমাটির বিধ্বংসী শক্তি।

[খ] অনুমান, বোমাটি [illegible] এক মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে যা আছে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতএব বোমাটিকে এমন জায়গায় ফেলতে হবে যেখানে ওই ব্যাসার্ধের থিকথিকে একটি জনপদ আছে।

[গ] সেই লক্ষ্যস্থলেই ফেলতে হবে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটি সমূহ আছে।

[ঘ] প্রথম বোমাটি সেই শহরেই ফেলতে হবে যেখানে আগে কখনও বোমা-বর্ষণ হয় নি, তাতে বোমার বিধ্বংসী শক্তি পুরোপুরি পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

জাপানের আকাশ পুরোপুরি আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও জাপানের চারটি শহরে বোমা ফেলা হলো না। কারণ নয়। গভীরতর দুরভিসন্ধি। আণবিক আক্রমণের লক্ষ্য তালিকায় জাপানের যে কটি শহর ছিল, তা হলো, হিরোশিমা কোকুরা, নাগাটা, মন্দির শহর কিয়োতো। জাপান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এডুইন যখন শুনলেন তালিকায় কিয়োতোর নাম রয়েছে, ছুটে গেলেন তার অফিস প্রধান মেজর অ্যালফ্রেড ম্যাকরম্যাকের দপ্তরে। অধ্যাপক কেঁদে ফেললেন। ম্যাকরম্যাক তখন ওয়ার সেক্রেটারি স্টিমসনকে বলে কয়ে কিয়োতোর নামটি তোলাতে পারলেন।

১৯৪৫ সালের বসন্ত থেকেই উটার বিমানক্ষেত্র ওয়েন্ডোভারে বৈমানিকদের অ্যাটমবোম ফেলার প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেল। যে বৈজ্ঞানিক এই মারাত্মক অস্ত্রের জনক তাঁর নাম লিও জিলার্ড। আরব্য রজনীর সেই জেলেটির মতো, তিনিই জালার মুখ খুলে 'জিনটিকে' বের করেছিলেন। তিনিই এবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলেন জিনটিকে আবার জালায় ঢোকাতে। এই সঙ্কট সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে পরে তিনি খোলাখুলিই বলেছিলেন, 'গোটা ৪৩ আর ৪৪ সালে আমাদের সব চেয়ে বড় উদ্বেগের

কারণ ছিল জার্মানি। ইওরোপ অভিযানের আগেই না তারা অ্যাটম বোমা বানিয়ে বসে। ৪৫-এ সেই দুশ্চিন্তা আর রইল না, তখন শুরু হলো অন্য চিন্তা, এই বোমা এখন আমেরিকা অন্য দেশের ওপর কি ভাবে ব্যবহার করবে!' আমেরিকার হাতে ছিল মোট তিনটি বোমা। বোমা তিনটির একসঙ্গে নাম রাখা হয়েছিল, 'ট্রিনিটি' ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

এই জিলার্ডই ১৯৩৯-এর গ্রীষ্মে আইনস্টাইনেব কাছে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমেরিকাকে বোমা বানাবার অনুরোধ জানান নয় তো জার্মানি আমাদের ছাতু করে দেবে। সেই সময় সমূলে বিলুপ্তির আতঙ্ক এমন একটা জায়গায় উঠেছে যখন সবাই ভাবছেন, 'Either we build an atom bomb or Hitler will do it first'. সেই জিলার্ডই ৪৫-এর বসন্তে আইনস্টাইনের কাছে ছুটলেন, বিশ্বকে বাঁচান। জালার দৈত্যটি এখন আমেরিকার সরকারের হাতে। যে কোনোও মুহূর্তে সেই ধ্বংসের শক্তি নেমে আসবে বিশ্বের নিরীহ মানুষের জীবনে। আইনস্টাইন তখন শেষ পত্রটি লিখলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে, সঙ্গে জিলার্ডের রিপোর্ট, বোমা আমেরিকাকে শক্তি দেবে নিঃসন্দেহে, আধিপত্য দেবে পৃথিবীর ওপরে; কিন্তু সবই তাৎক্ষণিক। সারা বিশ্ব জুড়ে যে রাজনৈতিক ও সামরিক অস্থিরতা শুরু হবে, তাতে এই মুহূর্তের সাফল্য মুছে যাবে।

আইনস্টাইনের সতর্ক পত্র, জিলার্ডের ভবিষ্যদ্বাণী প্রেসিডেন্টের গোচরে আনা হলো না। পড়ে রইল তাঁর টেবিলে কাগজ-পত্রের স্তূপে। সহসা ৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মারা গেলেন। আসনে বসলেন, হ্যারি এসট্রুম্যান। জিলার্ডের সঙ্গে ট্রুম্যানের কোনোও পরিচয়ই ছিল না। নতুন প্রেসিডেন্ট বহু দূরের মানুষ। প্রেসিডেন্টের আসনে অনভিজ্ঞ একজন সিনেটার। বসে আছেন নিজের ঘেরাটোপে, যেখানে জিলার্ডের প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। ওদিকে ওয়েন্ডোভারে বৈমানিকদের ট্রেনিং চলেছে। ফিউজ ছাড়া তিনটি বোমা লস এলামোসের কারখানায় মানুষ মারার মহড়া নিচ্ছে। কর্মকর্তা আর বিজ্ঞানীদের ভয়, জাপান ভয় পেয়ে ইতিমধ্যে আত্মসমর্পণ করে বসলেই মহা বিপদ। ম্যানহাটান প্রোজেক্টে মার্কিন-সরকার বিলিয়ান, বিলিয়ান, বিলিয়ান ডলার ঢেলেছেন। অন্তত একটা বোমাও যদি জাপানের ওপর ফাটানো না যায়, তাহলে এই খরচের যৌক্তিকতা রইল কোথায়' মার্কিনীরা যে প্রেসিডেন্টকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। 'It's better for a few thousand Japs to perish than a single one of our boys.'

২

আণবিক বোমা ফেলার দরকার ছিল না। জাপান আত্মসমপণ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। অনমনীয় জাতীয় চরিত্রের কারণেই দেরি হচ্ছিল মাত্র। সামুরাই স্পিরিট। ইয়ামাতো-দামাশি। জেন বুদ্ধ ধর্মের প্রভাবে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। জীবন মরণ দুইই এক। সামুরাইদের জীবন দর্শন হলো, বেঁচে আছি মরার জন্যে। হাগাকুরের ভাষায়, সামুরাইদের পথ হলো মৃত্যুর পথ। অসম্মানজনক আত্মসমর্পণ নয়, আনুষ্ঠানিক মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ 'সেপ্‌পুকু' বা 'হারাকিরি'। নিজের হাতে ছোরা চালিয়ে এপাশ থেকে ওপাশ পেট চিরে ফেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমরাঙ্গনে জেনারেল হিদেকি তোজোর নির্দেশ ছিল, 'Don't survive shamefully as a prisoner, die, and thus escape ignominy'। যুদ্ধবন্দী হয়ে লজ্জায় বেঁচে থাকা তোমাদের পথ নয়। তার চেয়ে মরে যাও। মৃত্যুবরণ করে অপমানের হাত থেকে বাঁচো। তোজো নিজেও আত্মসমর্পণের আগে তেপপো-বারা-র চেষ্টা করেছিলেন অর্থাৎ রিভলভারের গুলিতে আত্মহনন। দ্বাদশ শতক থেকে চলে আসছে এই ধারা। জাপানের সমর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে ১১৭০ সালের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল সেনাধ্যক্ষ তামেতোমো মিনামোতো। বিপক্ষের হাতে তিনি বন্দী হতে চান নি। বেছে নিয়েছিলেন আত্মহননের সম্মানজনক পথ। তরোয়াল দিয়ে চিরে ফেললেন নিজের পেট। এই হলো ইতিহাসের শুরু। দ্বিতীয় আর একটি ঘটনায় এই রীতি হয়ে দাঁড়াল বীরের প্রথা। ১১৮৯ সালে আর এক জাপানী বীর যুশিতসোনে মিনামোতো পরাজিত হয়ে ওই একই পদ্ধতিতে

আত্মহত্যা করলেন। সেপ্পুকুর আর এক নাম, কুসুন-গোবো, অর্থাৎ সাড়ে নয় ইঞ্চি। যে তরোয়াল এই কাজে ব্যবহৃত হয় তার দৈর্ঘ্যও সাড় নয় ইঞ্চি। আত্মহননের অন্য পথ জাপানী রীতি অনুসারে ততটা পুণ্যের নয়; কিন্তু আত্মসমর্পণের চেয়ে ভালো। জাপানীদের জাতীয় বিশ্বাস, পেটই হলো ইচ্ছার পীঠস্থান, গভীর আবেগসমূহের উৎসস্থল।

পার্ল হারবারে ধাক্কা না খেলে আমেরিকা হয়তো হিরোশিমায় বোমা ফেলত না। পার্ল হারবারেই তৈরি হয়েছিল জাপানের নিয়তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানে বিশেষ একটি বাহিনী তৈরি হয়েছিল, 'স্পেস্যাল অ্যাটাক ফোরসেস'। এই বাহিনীর সৈনিকরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই আক্রমণে নামতেন। পশ্চিমী দুনিয়ায় এঁদের নাম হলো, 'কামিকাজে'। বিমান চালক সোজা বোমা সমেত লক্ষ্য বস্তুর ওপর নেমে পড়লেন। কোনও এদিক ওদিক নেই। দ্বিধা নেই। কামানের গোলায় একটা, দুটো, দশটা বিমান ঘায়েল হতে পারে। কিন্তু ঝাঁকের অন্যান্য বিমান লক্ষ্যবস্তুব ওপব গিয়ে পড়বেই।

পার্ল হারবারে জাপান সেই কৌশলই নিয়েছিল। ১৯৪১ সাল। ডিসেম্বরের গোড়ার দিক। যুদ্ধ ঘোষণা না করেই জাপানের ছটি বিমানবাহী জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের পথ ধরে পার্ল হারবারের অ্যামেরিকান ঘাঁটির দিকে এগিয়ে গেল। তাবিখ সাত ডিসেম্বব। সময় সকাল সাতটা। সাড়ে চারশো জাপানী 'কামিকাজে' বিমান ঝাঁপিয়ে পড়ল পার্ল হারবারের ওপর। ফল হলো ভয়াবহ। আমেরিকার দু হাজারের ওপর সৈনিক নিহত হলো। বিমান-ঘাঁটিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল চারশো বিমান। দুশো বিমান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। পাঁচটি রণতরী ও তিনটি হালকা ধরনের টহলদারী জাহাজ ছত্রাখান হয়ে গেল। এই একই সময়ে জাপান দূরপ্রাচ্যের সমস্ত ইংরাজ ও আমেরিকান ঘাঁটির ওপর সাংঘাতিক আক্রমণ চালিয়ে মিত্রশক্তিকে স্তম্ভিত কবে দিল। ৪২-এব নববর্ষ মিত্রশক্তির কাছে হয়ে দাঁড়াল বিষণ্ণতার বছব। ৪১-এর বড় দিনে হংকং হাতছাড়া হলো। গেল মালয়। সিঙ্গাপুব আত্মসমর্পণ করল ফেব্রুয়ারিতে। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেব প্রধান প্রধান অঞ্চল চলে গেল জাপানেব অধিকারে। মার্চ শেষ হবার আগেই জাপান সর্বত্র গেড়ে ফেলল শক্ত ঘাঁটি। আমেরিকা ছয় মে পর্যন্ত ফিলিপাইনকে নিজেদের দখলে রেখে রেখেও শেষ পর্যন্ত সরে আসতে বাধ্য হলো। করেগিডোবে আমেবিকার শেষ বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। জাপানের তখন জয়-জয়কার। অস্ট্রেলিযাব উত্তর ভাগের সমস্ত বন্দরে বোমা ফেলতে পারে। বেরিং প্রণালীব অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দুটি দ্বীপ দখলে আনায় আমেরিকার আলাস্কা আক্রমণের নাগালে। ব্রহ্মদেশ জাপানের দখলে। দখলে আন্দামান নিকোবব দ্বীপপুঞ্জ। জাপানের স্বপ্ন 'দাই নিপপন', বৃহত্তর জাপান, পূর্ণ হতে চলেছে।

কবে, সেই ১৮৫৩ সালে, আমেরিকার নৌবাহিনীর জাহাজ কমোডব পেরির 'ব্ল্যাক শিপ' জাপানের বন্দরে ভেড়া মাত্রই জাপান বুঝে গিয়েছিল হয় পশ্চিমী শক্তি গোষ্ঠীর সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে হবে, নয়তো হতে হবে তাদের পদানত। যে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল চীন। মানতে বাধ্য হয়েছিল এশিয়ার অন্যতম দেশ। কমোডর পেরি সেই যে দেশটাকে নাড়া দিয়ে গেলেন, তারপর থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জাপান হয়ে উঠল আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ। বিশ্বের অন্যতম উন্নত শক্তি।

১৬৩৬ থেকে অনধিক দুশো বছর পর্যন্ত জাপান পড়েছিল মধ্যযুগে। আধুনিক রাশিয়ার মতো লৌহ-যবনিকার আড়ালে। বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, নিষিদ্ধ ছিল জাপানীদের বিদেশীর সংস্পর্শে আসা। আবদ্ধ সভ্যতা। খ্রীষ্টধর্ম থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল চৌকাঠের বাইরে। সমাজ ছিল দৃঢ় নিগড়ে বাঁধা। সম্রাট হলেন ঈশ্বর। 'শোগুন'। তারপর দাইমো, সামুরাই, যোদ্ধার দল। কৃষক, বৃত্তিজীবী। ব্রাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন বণিক সম্প্রদায়। দুশো বছর ধরে অনুসৃত হয়েছে, ভোগবাদ নয়, আধ্যাত্মিকতা। জাপান মনে করে, পৃথিবীর জাতিকুলে, জাপানই হলো প্রথম জাতক। মানব মানবীর মিলন নয়, ঐশ্বরিক মিলনেই তাদের জন্ম। অমৃতের পুত্র। হিটলার যেমন মনে করতেন, জার্মানরাই পৃথিবীর একমাত্র খাঁটি আর্য।

কি সব কান্ডই না পৃথিবী জুড়ে ঘটে গেছে, ঘটছে, বা ঘটবে। হিটলারের মতো পাগল, যুদ্ধোন্মাদ হয়তো আবার আসবেন। স্ট্যালিনেব মতো বিদ্‌ঘুটে কম্যুনিস্ট। রুজভেল্ট বা ট্রুম্যানের মতো ওয়ারটাইম পলিটিসিয়ান। নেভিল চেম্বারলেনেব মতো অপদস্থ স্টেটসম্যান। মুসোলিনির মতো অহঙ্কারী নির্বোধ। বামপ্রসাদ যেমন গেয়েছিলেন, দেখছি কত, দেখব কত, দেখার আছে বাকি কত? হিটলারের সেই

মানুষের আস্তাবল। ইহুদীদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের ভালো ভালো আবাসস্থল আর স্বাস্থ্য-নিবাস আর রম্য হোটেলসমূহ দখল করে নিলেন। ধরে নিয়ে এলেন, সুন্দরী যুবতী জার্মান রমণীদের। মানুষ বিয়োতে হবে। যেন গাভীর দল। ধরে আনলেন মানুষ ষাঁড়। সে আবার 'স্পেসিফিকেশান' মিলিয়ে 'পেডিগ্রি' টেস্ট করে। আকৃতিই হলো সব চেয়ে বড় বিচার। লম্বা হতে হবে। লম্বা মাথা। সরু মুখ, পাতলা নাক। খাঁদা, বোঁচা, থ্যাবড়া হলে চলবে না। সুন্দর চুল। হালকা চোখের মণি, আর ফর্সা গোলাপী রঙ। তা হিটলারের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ অফিসারই ছিলেন ওই রকম। তাঁদের পোয়া বারো। ষন্ডবৃত্তি তো মজার বৃত্তি। একাধিক রমণীতে নিয়োজিত হও। হিটলারের মতো আমাদের মনু কি আর্য! তিনিও বলেছিলেন, 'স্ত্রীণাং ভোগে চ মৈথুনে'। 'প্রোডিউস চিলড্রেন অ্যাজ এ সেক্রেড ডিউটি টু দি ফুয়েরার।' পাগলের পরিকল্পনা। পাগলের হিসেব! হিটলারের কোনও হিসেবই তো শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকে নি। ১৯৩৫-এর ডিসেম্বর নাগাদ এই মনুষ্য প্রজনন পরিকল্পনা চালু হয়েছিল। হিমলার ছিলেন পরিকল্পনা প্রযোজক। প্রোজেকটের নামটিও ছিল কাব্যিক—লেবেনসবর্ন, অর্থাৎ ফাউন্টেন অফ লাইফ। জীবনের উৎস। বিবাহ টিবাহর প্রয়োজন নেই। ঘর সংসার পাতার দরকার নেই। সুরম্য পরিবেশে এসো। ক্ষমতায় কুলোলে একের পর এক নারীসঙ্গ করো। উদ্দেশ্য একটাই—গর্ভধারণ। এই সব সরকারী মায়েদের খুব আদরে রাখা হতো। সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর খাওয়া, সুন্দর পরিচর্যা। ইচ্ছে করলে নবজাতককে কাছে রেখে মিসেস হয়ে যাও, নয় ছেলে কি মেয়েকে সরকারী পরিপালন কেন্দ্রে রেখে মিস হয়ে সরকারী তোয়াজে আবার মা হবার জন্যে প্রস্তুত হও। হিমলারের ক্যালকুলেশানে তিরিশ বছরের মধ্যে জার্মানির জনসংখ্যা যা বাড়বে তাতে বাড়তি ৬০০ রেজিমেন্ট তৈরি করা সম্ভব হবে। এইভাবে যে সব ছেলেপুলে জন্মাত তাদের বলা হতো পার্সেল। সব করেটরে হিটলার নিজেই পার্সেল হয়ে চলে গেলেন পরপারে।

জাপানের দৃষ্টিভঙ্গী আর জার্মানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে যথেষ্ট পার্থক্য। জাপান বিশ্বাস করে স্পিরিচ্যুয়ালিজমে। পশ্চিমের শিল্পোন্নত, ভোগবাদী, দেহসর্বস্ব জীবন দর্শন থেকে জাপান সরে থাকতে পেরেছিল। জাপান আত্মস্থ করতে পেরেছিল একটি মন্ত্র—Duty is more weighty than a mountain, death is no heavier than a feather. কি অপূর্ব দর্শন। কর্তব্য পর্বতের চেয়েও ভারি, মৃত্যু পালকের চেয়ে ভারি নয়। The whole of modern Japanis military philosophy may be said to reside in that single statement. আধুনিক জাপানের সমর-দর্শন ওই একটি বক্তব্যে সুস্পষ্ট। গীতার মতো, যুদ্ধ মানে ধর্মযুদ্ধ। No act could be wrong if sincerely performed for the good of the Emperor and the Nation. সম্রাট ও সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে কোনও কাজই দোষের নয়।

আমেরিকা অথবা পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট দ্বিতীয় যুদ্ধে জাপানের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করতে না পারলেও, জাপান তার জাতীয় জীবন দর্শন অনুসারেই লড়াই চালিয়ে গেছে। জাপানীদের মজ্জায় মজ্জায় একটিই ব্রত। কোকুতাই বাঁচাও, কোকুতাই রক্ষা কর। কোকুতাই মানে, জাপানের সংহতি রাষ্ট্র। এই দর্শনই জাপানকে এত উন্নত করতে পেরেছে। সব দেশের সেরা দেশ বললেও ভুল হবে না। এই 'কোকুতাই' রক্ষা করার জন্যেই সুইসাইড স্কোয়াড কামিকাজের মতো বাহিনী তৈরি হয়েছিল, যাদের কাছে death is no heavier than a feather.

বিশ শতকের শুরুতেই রুশ জাপান যুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেল, বৃহৎ দেশ, বিশাল সমর সম্ভারের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে, 'ইয়ামাতো দাম্‌শি' অর্থাৎ 'ফাইটিং স্পিরিট' অর্থাৎ লড়াকু মনোভাব। এই যুদ্ধের পরই জাপানের জাতীয়তাবোধ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। শিন্টো সাম্রাজ্য ছিল সেই জাতীয়তাবোধের ইন্ধন। কিছু গুপ্ত সমিতি ছিল এর পেছনে আর ছিল সামরিক দলের একটা অংশ। এই অংশে বিশিষ্ট একদল অফিসার ছিলেন। দলটির নাম ছিল 'কোডো-হা' বা ইম্পিরিয়াল ওয়ে। যে দলের লক্ষ্য ছিল বুশিদো গুণাবলীকে রক্ষা করা। বুশিদোর পথ হলো, সম্রাটের প্রতি আনুগত্য। সামন্ত নৃপতিদের প্রতি আনুগত্য। জাতির প্রতি আনুগত্য। আর নিজের প্রতি আনুগত্য। 'কোডো-হা'র আর একটি লক্ষ্য ছিল, পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তর একটি সহ-সমৃদ্ধি গড়ে তোলা—'গ্রেটার ইস্ট এশিয়া কো-প্রসপ্যারিটি স্ফিয়ার'। ১৯০৫ সাল থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের ক্রম-শক্তিবৃদ্ধি আমেরিকার পছন্দ হচ্ছিল না। জাপানকে যুদ্ধে নামাবার জন্যে উস্কানির অভাব ছিল না। আমেরিকা ছিল জাপানের অর্থনৈতিক

প্রতিদ্বন্দ্বী। জাতীয় স্বার্থেই জাপানকে বেছে নিতে হলো যুদ্ধের পথ, অতর্কিত আক্রমণের পথ।

পার্লহারবার আর ওকিনওয়াতে কামিকাজে আর সুইসাইড স্কোয়াডের হাতে আমেরিকার লাঞ্ছনার কোনও তুলনা ছিল না। বিশাল সমরশক্তি, বিরাট লোকবল, সমর সম্ভারের শেষ নেই, আর জাপান? আয়তনে ক্ষুদ্র, শক্তিতে ক্ষুদ্র। শুধু অসাধারণ মনের জোর আর করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ব্রত নিয়ে নাভিশ্বাস ছুটিয়ে দিলে। কথায় বলে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। জাপানকে আত্মসমর্পণের সুযোগ না দিয়েই আণবিক বোমার চরম আঘাত হানা হলো। দুটো কারণে। প্রথম কারণ পার্লহারবার, ওকিনওয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আধিপত্য। দ্বিতীয় কারণ, অর্থনীতি। বিশ্ব বাণিজ্যে আমেরিকা জাপানের কাছে মার খাচ্ছে। তৃতীয় কারণও আছে, সেটা হলো সঙ্গদোষ। বিশ্ব মঞ্চে ওয়ারলর্ড হিটলারের সঙ্গে ঘষাঘষি করতে করতে সমরোন্মাদনা এসে গেছে। জাপানের ঘন বসতি অঞ্চলে বোমা ফেলে দেখতে হবে, কি ভাবে ঘর বাড়ি, মানুষ, পাখি, গাছ পালা নিমেষে গলে যায়, উবে যায়, ছাই হয়ে যায়। দেখতে হবে প্রলয়ে কি থাকে, কি যায়। নিউ মেক্সিকোর মরু অঞ্চলে, পরীক্ষাচ্ছলে, গ্রামটির নাম ওসকুরো মানে অন্ধকার আর পরীক্ষামূলক বোমাটি যেখানে ফাটান হবে, সেই জায়গাটির নাম জোরনাদা দেল মুয়েরতো, মানে মৃত্যু উপত্যকা। সেখানে পরীক্ষামূলক বোমাটি ফাটিয়ে আমেরিকার মন ভরল না। একটা টেস্টটাওয়ার বাষ্প হয়ে গেল, কি মরুভূমির বালি কাঁচ হয়ে গেল এই সব বৈজ্ঞানিক তথ্য বিজ্ঞানীদের কাজে লাগবে। জগৎ সংসারকে চমকে দিতে হলে হিটলারের ওপরে উঠতে হবে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও বিশ্বমানবের স্মৃতিতে প্রতীক হয়ে থাকবে, ব্যাঙের ছাতার মতো মেঘ। জোরনাদা দেল মুয়েরতো-তে প্রথম বিস্ফোরণ দেখে, বিজ্ঞানী লস এলামোস প্রোজেকটের ডিরেক্টার ওপেনহাইমারের মনে হয়েছিল—এই তো সেই তিনি, অর্জুনের সামনে বিশ্বরূপের শ্রীকৃষ্ণ,

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।

ওদিকে পয়েন্ট জিরো, মরুভূমির যে জায়গাটিতে বোমা ফেলা হয়েছে, ফেলা বললে ভুল হবে, যে টাওয়ারে রেখে বোমাটিকে ফাটানো হয়েছে, সেই প্রলয়ের উৎসস্থলের দিকে চোখ রেখে একটি পোস্ট দু হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন দশ মাইল দূরে। ওদিকে আকাশ যেন গলে গলে পড়ছে। কানে আসছে দর্শক বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের উক্তি—Good. God, the long-haired boys have lost control. মনে আসছে গীতা :

If the radiance of a thousand Suns
were to burst into the sky
that would be like
the splendour of the mighty one

স্তম্ভিত আকাশ, স্তম্ভিত মহাকাল। আগুনে আকাশ। দশ মাইল দূরে দর্শকাসনে বিজ্ঞানীদের প্রতীক্ষা। কালো ছায়া অনেকে বিস্ফোরণের মুহূর্তে চোখে গগলস পরতে ভুলে গেছেন। ফলে প্রায় অন্ধ। বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার ছাত্র ও সহকর্মীদের প্রিয় ওপি, কন্ট্রোল টাওয়ারে একটা লোহার ডাণ্ডা আঁকড়ে ধরে, কম্পন ও ঝটিকা সামলাতে সামলাতে দেখছেন রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনকে বলছেন :

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ
I am become Death the shatterer of worlds.

৩

আণবিক বোমার জন্ম দিয়ে আণবিক বোমার পিতারা পড়লেন মহা ফাঁপরে। বৈজ্ঞানিকদের হাত থেকে চলে গেল কলাকুশলীদের হাতে যুদ্ধ পরিচালকদের খপ্পরে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক-গোয়েন্দা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পদার্থ বিজ্ঞানী গৌডস্মিট, মুক্ত ফরাসীদেশ ও দখলিকৃত জার্মানীতে শত্রুপক্ষের ফেলে

যাওয়া কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে, জার্মানির হাতে অ্যাটম বোমা নেই, তখন একদিন এক মেজরের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে আনন্দে বলে উঠলেন, 'যাক বাবা বাঁচা গেছে, জার্মানির হাতে বোমা নেই। জার্মানি যখন বোমা ব্যবহার করছে না তখন আমাদের বোমাও আর ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না।'

পেশাদার সৈনিক বাঁকা হেসে বললেন, 'স্যাম জেনে রাখ, আমাদের হাতে যদি সত্যিই বোমা থেকে থাকে, তাহলে সে বোমা আমরা ব্যবহার করবই।'

জার্মানির হাতে বোমা নেই এই গোপন-তথ্যটি আর তেমন গোপন রইল না। আমেরিকার বিজ্ঞানীমহলে ছড়িয়ে পড়া মাত্রই ভীষণ জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। নতুন ভাবে ভাবতে হবে। আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় গবেষণা শুরু করা হয়েছিল। দু বিলিয়ান ডলার গলে গেছে। দেড়লাখ মানুষ দিন রাত খেটে চলেছেন। তাহলেও বোমা তৈরির যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নেই। না রাজনীতির দিক থেকে, না নৈতিকতার দিক থেকে। জাপান যুদ্ধের চাপে টলমল করছে। আণবিক বোমা তৈরির ক্ষমতা জাপানের নেই। অতএব যা হয়েছে, সেই অবস্থাতেই সব পড়ে থাক। কি হবে ওই বিপজ্জনক আবিষ্কারে!

আর এক দল বৈজ্ঞানিক বলতে লাগলেন, শুরু যখন হয়েছে তখন শেষ করা উচিত। শক্তির এ এক নতুন দিক। প্রায় হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এই অবস্থায় যত বিপজ্জনক আবিষ্কারই হোক গবেষণা বন্ধ করা উচিত হবে না।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীহলস বোর বললেন, 'এই যে নতুন শক্তির উৎস আমরা আবিষ্কার করেছি ও ব্যবহারিক করে তুলেছি তা মানবজাতির হাতে তাদেরই প্রয়োজনে তুলে দিতে হবে। কেবল একটা ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে, ভবিষ্যতে ওই শক্তি ধ্বংসের কাজে যেন ব্যবহার করা না হয়। শান্তির পৃথিবীতে গঠনের কাজে আণবিক শক্তির অসীম সম্ভাবনা।' বোর বললেন, 'আমরা যদি এখনই এই অস্ত্র আবিষ্কার না করে, পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের মাধ্যমে অন্যান্য শক্তিকে এর অসীম বিধ্বংসী ক্ষমতায় চমকে দিতে পারি, তাহলে কোনও না কোনও দেশ নিঃশব্দে এই আবিষ্কার করতলগত করে, আমাদেরই সর্বনাশ করবে। ভবিষ্যৎ বিশ্ব শান্তির প্রয়োজনেই মানবজাতির জানা উচিত আমরা কোন্ যুগে আছি! আণবিক যুগে।'

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেটালারজিক্যাল লেবরেটারিতেই আণবিক গবেষণার প্রাথমিক সাফল্য ধরা পড়ে। পরে সেখান থেকে সব সরিয়ে নিয়ে তিনটি কেন্দ্রকে বড় করে তোলা হয়—ওকরিজ, হানফোর্ড আর লস আলামোস। এই শিকাগোর বিজ্ঞানীরাই প্রথম প্রতিবাদ জানালেন—জাপানের বিরুদ্ধে এই বোমা ব্যবহার করা অনুচিত হবে। তাঁরাই প্রথম আণবিক অস্ত্রের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কথা তুললেন। তাঁরাই প্রথম বললেন, এই শক্তিকে শান্তির কাজে লাগাতে হবে। এই শিকাগোতেই ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে জে. জেফরিস-এর সভাপতিত্বে আণবিক বিজ্ঞানীদের এক কমিটি তৈরি হয়। যুগান্তকারী এই আবিষ্কারের গঠনের দিক আর ধ্বংসের দিক আলোচনা করে তাঁরা একটি রিপোর্ট তৈরি করলেন—'নিউক্লিয়োনিক প্রসপেক্টস'।

আমরা ১৯৪৪ থেকে আরও বছর দুই পিছিয়ে যাই। ১৯৪২ সাল। '৪২ সালে এই 'অ্যালায়েড অ্যাটমিক প্রোজেক্ট' সম্পূর্ণ নতুন একটা চেহারা নিল। চার্চিল আর রুজভেল্ট, দুজনে মিলে ঠিক করে ফেললেন, বৃটিশ ও আমেরিকান গবেষক দল, দুটি জায়গায় গবেষণার কাজ চালাবেন, কানাডায় আর আমেরিকায়। মার্কিন গবেষণার সমগ্র দায়িত্বভারে এলেন 'মিলিটারি পলিসি কমিটি'। কমিটির তিন জন হলেন সমরদপ্তরের বড় কর্তা—জেনারেল স্টায়ার, অ্যাডমিরেল পারনেল, আর জেনারেল লেসলি গ্রোভস। বিজ্ঞানীদের দিক থেকে নেওয়া হলো মাত্র দু'জনকে— ডক্টর ভানেভার বুশ, ডক্টর জেমস কোনান্ট। পুরো পরিকল্পনাটির 'কোড'-নাম রাখা হলো 'ম্যানহাটান' প্রোজেক্ট। এই প্রোজেক্টের সঙ্গে জড়িত সমস্ত গবেষককে বলা হতো, 'সাইন্টিফিক পার্সোনেল'। বড় বড় বিজ্ঞানীরা চলে গেলেন কড়া সামরিক মন্ত্রগুপ্তির আচ্ছাদনের তলায়। নিরাপত্তা বিভাগের অদৃশ্য চোখ তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল। নজর রাখল চালচলনের ওপর।

লেসলি গ্রোভস কি এখনও বেঁচে আছেন! থাকলে কেমন আছেন! কি রকম আছেন! 'এনোলা

গে'-র পাইলট টিবেটির মতো বিমূঢ়! হিরোশিমা আর নাগাসাকি ধ্বংসে গ্রোভসের ভূমিকাই প্রধান। বন্ধুরা বলতেন, 'গ্রিজি গ্রোভস'। তেলতেলে, আঠালো চরিত্রের মানুষ। যোদ্ধা জীবনে ফ্রন্টে গিয়ে কোনও দিন বন্দুক ধরতে হয় নি। অফিস আর চেয়ার টেবিলই ছিল তাঁর সমরাঙ্গন। জীবনের বড় অংশটাই কেটে গেল মিলিটারি ব্যারাক আর বিল্ডিং তৈরি করে। বিপুল, বিশাল, যুদ্ধদপ্তর 'পেন্টাগন' গ্রোভসেরই তত্ত্বাবধানে তৈরি। ছেচল্লিশটা বছর এই ভাবেই কেটে গেল। যুদ্ধও প্রায় শেষ। পদোন্নতির তেমন কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। লেফ্‌টনান্ট হয়েই পড়েছিলেন বছরের পর বছর। হঠাৎ ডাক পড়ল। হঠাৎ প্রোমোশান। এক ধরনের সান্ত্বনা। কর্তৃপক্ষ ডেকে বললেন, গ্রোভস, তোমার ওপর একটা গুরু দায়িত্ব দেওয়া হলো। ফ্রন্টে গিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার চেয়েও মারাত্মক। তোমার কাজের ওপরেই নির্ভর করবে যুদ্ধে আমাদের চূড়ান্ত জয়-পরাজয়। বিগেস্ট জব অফ দি ওয়ার অ্যান্ড মাইট বি ডেস্টাইনড টু মেক দি ডিসিসিভ কনট্রিবিউশান টু ভিকট্রি।

বিগত যৌবন গ্রোভস নতুন দায়িত্বে এসে বাড়ি, ঘরদোরের মেকানিক থেকে হয়ে উঠলেন মহোৎসাহী মানুষ মারার মেকানিক। লস এলামোসে এসে প্রথম দিনেই কলাকুশলী আর সমবেত বিজ্ঞানীদের সামনে জ্বালাময়ী একটি ভাষণ দিলেন : 'your job won't be easy. At great expense we have gathered here the largest collection of crackpots ever seen', বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল না। সবাই মনে করতেন গ্রোভসের 'আইকিউ' খুব কম। সোজা বাঙলায় মাথামোটা। গ্রোভস এ সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন, তাই সুযোগ পেলেই প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন, আমিও কিছু কম যাই না, আর সে কথা বলে বেড়াতেন নিজের তাঁবেদারদের। 'বুঝলে না, শিকাগোর নতুন মেটালারজিকাল লেবরেটারিতে আমাদের একটা সিরিয়াস আলোচনা হচ্ছে, আমি ক্যাঁক করে একজনকে চেপে ধরলুম, আপনার ভুল হচ্ছে। অঙ্কে ভুল করছেন। বুঝলে না, আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা। ভাবছে আমি ধরতে পারব না। সেই দলে আবার কয়েকজন নোবেল বিজ্ঞানী ছিলেন। ভুলটা যখন ধরে দিলুম তখন আর কারুর মুখে টুঁ শব্দটি নেই। সব চুপ। এর ফলে আমি অবশ্য ওঁদের খুব অপ্রীতিভাজন হয়ে গেলুম, তা আর কি করা যাবে।'

গ্রোভসের আর একটা নাম রাখা হয়েছিল 'গিগি'। গিগির পাশের ঘরে বসতেন বিজ্ঞানী ফিলিপ মরিসন। মরিসন তাঁর এক পরিচিতকে কথায় কথায় বলেছিলেন, গিগি এক অদ্ভুত চরিত্র। একদিন ওর অফিস ঘরে একটা আলোচনা চলেছে, আমি আমার ঘরে বসে শুনতে পাচ্ছি। লোকটার অদ্ভুত ক্ষমতা! একটা টেনিস নেট কেনা হবে কি হবে না এ নিয়ে যেমন দীর্ঘ কথা কাটাকাটি হলো আবার বিশেষ একটা পরীক্ষার জন্যে মিলিয়ান ডলার খরচ করা হবে কি না, সে ব্যাপারেও সমান গুরুত্ব পেল। শেষে টেনিস নেট কেনার খরচ বাতিল হয়ে গেল, মিলিয়ান ডলার খরচ মঞ্জুর। গ্রোভসকে যদি বলা হতো, তুমি চাঁদে গিয়ে তরোয়াল খেললে বোমাটা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাবে, গ্রোভস তাহলে তাই করত।'

পাগলা মেহের আলি যেমন ক্ষুধিত প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে হেঁকে বেড়াত, 'সব ঝুট হ্যায়। তফাৎ যাও।' সেই অবস্থা হলো গ্রোভসের। বিস্তীর্ণ বিশাল পরমাণু কেন্দ্রের অলিতে গলিতে হেঁকে বেড়াতে লাগলেন, 'We must not lose a single day' আর মাঝে মাঝে বুক চাপড়ে বলতে লাগলেন, 'আমিই সব। আমি ওয়াশিংটন-ফোয়াশিংটন মানি না।' যুদ্ধ থেমে যাবার অনেক পরে '৫৪ সালে খুব গর্ব করে বলেছিলেন, 'আণবিক গবেষণায় আমি ইংরেজদের সামান্যতম সাহায্যও করিনি, বরং ইংরেজদের যাতে সব কিছু ভন্ডুল হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থাই করেছিলাম।'

বিজ্ঞানী জিলার্ডের সঙ্গে গ্রোভসের কোনওকালেই বনিবনা হয় নি। গ্রোভসের নির্দেশও মানতেন না। গ্রোভসের নির্দেশ মেনে চললে বোমা তৈরি আর হয়ে উঠত না। জিলার্ড, ওপেনহাইমার, বোর প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা চলেছিলেন বিজ্ঞানের পথে। শুরু যখন হয়েছে শেষটা তখন দেখতেই হয়। সেই তিরিশের গোড়াতে শুরু হয়েছে পথ চলা। সে চলা হঠাৎ থামে কি করে! আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি ঢুকে যেমন সব অচল করে দিয়েছে। লেখাপড়া আর হবে না। বিংশ শতাব্দী তেমনি তিরিশে পড়তেই, রাজনীতি ঢুকে পড়ল বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে। যুদ্ধবাজদের রাজনীতি অবশ্য পৃথিবীর বিজ্ঞান সাধনা স্তব্ধ করে দিতে পারে নি, কারণ বিজ্ঞানীরা স্কুল কলেজের অকালপক্ক চরিত্র ছিলেন না। তাঁরা

ঝাণ্ডাধারী ছিলেন না, ছিলেন ব্রতধারী। লেবরেটারিতে একই সময়ে রাজনীতি আর নিউক্লিয়ার সায়েন্স ঢুকল। বিজ্ঞানে এসে গেল এগিয়ে যাবার গতিবেগ। বত্রিশ সালে জেমস চাডউইক আবিষ্কার করলেন নিউট্রন। সেই হলো অ্যাটমিক ফিসানের সূত্রপাত। লক্ষ লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ তরঙ্গের বেড়া ঘেরা অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস ভেদ করার ক্ষমতা রাখে নিউট্রন; কারণ নিউট্রন হলো নিউট্রাল। বিজ্ঞান অ্যাটমে এসে থেমে গিয়েছিল। সামনে এখন নতুন দিগন্ত। অ্যাটমকে ভাঙা যাবে। প্রথম অ্যাটম বোমাটি নিঃশব্দে পদার্থ-বিজ্ঞানের জগতেই বিস্ফোরিত হলো।

অ্যাটমের নিউক্লি অতি ক্ষুদ্র, স্থির একটি কেন্দ্র যেখানে ঘনীভূত হয়ে আছে বিদ্যুৎ শক্তি, মলিকিউলার স্ট্রাকচারের স্কেলিট্যান বিশেষ। অ্যাটমের সব কিছুই জড়ো হয়ে আছে এই নিউক্লিয়াসে। বিদ্যুৎ শক্তি, আয়তন, ওজন। বস্তুর পরিচয় পেতে হলে, পরিচয় নিতে হবে নিউক্লিয়াসের। সেই নিউক্লিয়াস থেকে বিজ্ঞানের পরীক্ষাকেন্দ্রে আত্মপ্রকাশ করেছে নিউট্রন। নিউক্লিয়াস গঠনকারী দ্বিতীয় উপাদান। আয়তনে প্রায় প্রোটনের মতো। ইলেকট্রনের আয়তনের চেয়ে প্রায় দু'হাজার গুণ বড়। অথচ নিউট্রাল, কোনও বিদ্যুৎ তরঙ্গ নেই। তাহলে কোন্ শক্তিতে এই নিউট্রন আর প্রোটন অ্যাটমের কেন্দ্র বিন্দুতে সংহত হয়ে আছে! ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক শক্তিতে নিশ্চয়ই নয় কারণ নিউট্রনে বিদ্যুৎ নেই। বিজ্ঞানীরা থমকে দাঁড়ালেন নতুন এক শক্তির মুখোমুখি। অ্যাটমের নিউক্লিয়াস আয়তনে অ্যাটমের চেয়ে লক্ষ গুণ ক্ষুদ্র। আর এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কেন্দ্রবিন্দুটিই হলো অ্যাটমের দেহ। তার মানে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে বস্তু এমন ভাবে ঘন হয়ে আছে, যা আমাদের কল্পনাকেও হার মানায়। মানব শরীরকে কোনও প্রকারে চেপেচুপে যদি নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব দেওয়া যেত তাহলে মানব-আকৃতি হয়ে দাঁড়াত আলপিনের মাথার মতো, ছোট্ট, এতটুকু। শুধু এই ঘনত্ব নয় আর একটি বিস্ময় হলো, নিউট্রন আর প্রোটন, দুয়ে মিলে নিউক্লিয়াসের প্রচন্ড গতি-বেগ। ওই অসীম ঘনত্বে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সেকেন্ডে প্রায় ৪০ হাজার মাইল বেগে দু'জনে ছুটে বেড়াচ্ছে। পদার্থবিদের ভাষায়, We can, perhaps, picture it best as tiny drops of an extremely dense liquid which is boiling and bubbling most fiercely. নিউক্লিয়াসের ভেতরে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলা চলেছে। যখনই খুব কাছাকাছি আসছে বিকর্ষণী শক্তি দূরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। একটা দূরত্ব অবধি ভয়ঙ্কর আকর্ষণ, তারপরই ভয়ঙ্কর বিকর্ষণ। এই খেলাতেই নিউক্লিয়াস সব চেয়ে স্থিতিস্থাপক বিন্দু। ভেতরটা ছটফট করছে, বাইরে প্রশান্ত। জেন দার্শনিক দাইতো সম্রাট গোদাইগোকে যেমন বলেছিলেন :

সহস্র সহস্র কল্প পূর্বে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল; কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও আমরা পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। আমরা সারাদিন মুখোমুখি কিন্তু আমাদের মিলন হয় নি।

নিউক্লিয়াসের এই প্রশান্তিকে যদি কোনওভাবে একবার ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা যায় তাহলেই হয় সূর্য। অসীম উত্তাপে সৌর কেন্দ্রে অহরহ এই বিশ্লেষণ চলেছে, যার ফলে আমাদের এই জগৎ, এই জীবন, এই লীলা। সেই সূর্যেরই সামান্য একটি খন্ডমুখ থুবড়ে পড়েছিল হিরোশিমায়, নাগাসাকিতে। মানুষের তৈরি সূর্যাণু। জেমস চাডউইক থেকে হিরোশিমা দীর্ঘ পথ। বিলিয়ান-বিলিয়ান ডলার আর পাউন্ড বিছানো মহার্ঘ পথ। সেই পথে বসে আছেন সব মুকুটমণি। বাঘা বাঘা সব বিজ্ঞানী। তিরিশ আর চল্লিশের দশক পৃথিবীকে অনেক অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে। ৩০ জানুয়ারী, ১৯৩৩ জার্মান রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট জেনারেল হিন্ডেনবার্গ নাজি পার্টির নেতা হিটলারকে জার্মানির চ্যানসেলারের পদে বরণ করে নিলেন। দানবের বীজ বুনলেন পৃথিবীর মাটিতে। রাজনীতির আকাশ ধীরে ধীরে রাঙা হতে লাগল। বিজ্ঞানের আকাশে জ্যোতিষ্কের সমাবেশ। কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটারিতে জেমস চাডউইক। সিংহ বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড। যেন সূর্য। চারপাশে তাঁর গ্রহ, আন্তর্জাতিক গবেষক সম্মেলন, মাস স্পেকট্রোগ্রাফির আবিষ্কারক অ্যাসটন, ক্লাউড চেম্বারের কুশলী জাপানী বিজ্ঞানী শিমিজু মার্কাস গুলিফ্যান্ট, নৌবাহিনীর একদা অফিসার মানচিত্র বিশেষজ্ঞ পি. এম. এস ব্ল্যাকেট, জন ককক্রফ্‌ট, নর্মান ফেদার, জার বংশধর রাশিয়ান কাপিটজা। কাপিটজা ছিলেন প্রাণ পুরুষ। কেমব্রিজের এই অনন্য সমাবেশের নাম দেওয়া হয়েছিল কাপিটজা ক্লাব। লক্ষ্য একটাই, অ্যাটমের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভাঙ্গতে হবে। ওদিকে ফ্রান্সে, ফ্রেডেরিক জোলিও কুরি ও তাঁর স্ত্রী আইরিন। '৩৫ সালে তিনি পেলেন নোবেল পুরস্কার। সহ প্রাপিকা তাঁর স্ত্রী আইরিন। স্টকহোমের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কুরি তাঁর ভাষণে বললেন, 'নিজের ইচ্ছেমতো মৌল

পদার্থ ভাঙ্গার বা গঠন করার বিজ্ঞান যদি বিজ্ঞানীদের হাতে এসে থাকে তাহলে পরমাণুর প্রাণকেন্দ্রে যে কোনও মুহূর্তে রূপান্তর এনে বিস্ফোরক শক্তির উন্মোচন অসম্ভব নয়। বস্তুপুঞ্জে এই পরিবর্তনের ঢেউ তুলে মানবজাতিকে আমরা অকল্পনীয় শক্তির সন্ধান দিতে পারি।' হাঙ্গেরির রিফিউজি লিও জিলার্ড, তেত্রিশ আর চৌত্রিশের রাজনীতিতে তিতিবিরক্ত হয়ে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছেন ইংলন্ডে। বুদাপেস্ট থেকে জার্মানী। সেখানে আইনস্টাইন, নার্নস্ট, ভন লর্ড, প্ল্যাঙ্কের মতো শিক্ষকদের পেয়েছিলেন; কিন্তু হিটলারের তান্ডবে পালাতে হলো ভিয়েনা। ভিয়েনায় থাকাকালীন তাঁর মন জানিয়ে দিল অস্ট্রিয়ার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। জিলার্ডের ষষ্ঠেন্দ্রিয় খুব প্রখর ছিল। যে কোনও সামরিক ব্যাপারে জিলার্ডের এমন বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল যে তিরিশ বছর পরে এক আমেরিকান সাংবাদিক যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার হবি কি? জিলার্ড সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'হেলমেটধারী দেখলেই তাকে পেটানো।' ওদিকে চিরকালের শহর রোমে বসে আছেন এনরিকো ফের্মির, তাঁর সুযোগ্য সহকারী এমিলিও সেগ্রে। জার্মানিতে অটো হান আর স্ট্রাসমান। সকলেরই এক যাত্রা পথ নিউট্রন দিয়ে পরমাণুকে ভাঙ্গা।

পরমাণু সত্যিই একদিন ভাঙ্গল। ভাঙ্গলো অটো হানের হাতে। ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে হয়ে গেল বেরিয়াম। ২২ ডিসেম্বর ১৯৩৮ পৃথিবীর অভিজ্ঞ মহল জানতে পারল, অ্যাটমিক ফিসানের যুগ শুরু হয়ে গেল। বোমা আর কত দূরে! এখনও সাত বছরের পথ। রোম, জার্মান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স সব ঘুরে পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রীভূত হলো আমেরিকায়। 'ম্যান হাটান'। হিটলারের তাড়া খেয়ে সেরা বিজ্ঞানীর দল তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে জেনারেল গ্রোভসের হাতের মুঠোয়। বিজ্ঞানীদের পরিচালক রবার্ট ওপেনহাইমার।

চাডউইক যখন নিউট্রন আবিষ্কার করলেন, তখনই অনেকের ধারণা হয়েছিল, এইবার একটা কান্ড হবে। চেন রি-অ্যাকসান-এর কায়দাটা কোনও রকমে রপ্ত করতে পারলেই টুসকিতে জগৎ ওড়াবেন ডিকটেটার। রাদারফোর্ড শুনে হেসেছিলেন। ১৯৩৩ সালের বাৎসরিক উৎসবে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসানে ভাষণদানকালে রাদারফোর্ড বললেন, 'যাঁরা বিশাল আকারে পারমাণবিক শক্তি নিষ্ক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তাঁদের মাথার ঠিক নেই।' জিলার্ডের কিন্তু মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। এমন কোনও ধাতু যদি খুঁজে বের করা যায়, যার পরমাণুকে ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে দুটো নিউট্রন বেরোবে, একটা সে নিজে হজম করবে অন্যটা ছুটে যাবে পাশের একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ভাঙতে। প্রথমে তাঁর মনে এসেছিল বেরিলিয়াম, পরে মনে হয়েছিল ইউরেনিয়াম। আর হলোও তাই। ম্যানহাটান প্রোজেকটে ফেরমিই সম্ভব করে তুললেন। চেন-রিঅ্যাকসান।

চেন-রিঅ্যাকসান অনেকটা কাগজের কোণায় আগুন ধরানোর মতো প্রক্রিয়া। কাগজের কোণে আগুন ধরালে প্রথমে সেই জায়গাটা জ্বলে ওঠে, তারপর ধীরে ধীরে সেই আগুন সঞ্চারিত হতে হতে সারা কাগজে ছড়িয়ে যায়। ফেরমি কর্‌লেন কি, ইউরেনিয়ামের সঙ্গে গ্র্যাফাইট মেশালেন। গ্র্যাফাইট নিউট্রনের গতিবেগ কমিয়ে দিলে। সেইটাই ছিল কাম্য। তীর বেগে ছুটলে লক্ষ্যবস্তু ফস্কাবার সম্ভাবনা বেশি। গলফ্‌ বল খুব জোরে মারলে গর্তের ওপর দিয়ে চলে যায়।

ফেরমি একটা অ্যাটমিক পাইল তৈরি করলেন। ছ'টনের একটি গাদা। তাতে দিলেন গ্র্যাফাইট, অল তাল ইউরেনিয়াম, ইউরেনিয়াম অক্সাইড আর দিলেন ক্যাডমিয়ামের পাত। ক্যাডমিয়াম নিউট্রন ধরে রাখে। কিছু নিউট্রন ধরে না নিলে চেন-রিঅ্যাকসান খুব দ্রুত হবে। ২ ডিসেম্বর, ১৯৪২, ফেরমির সেই পাইলে চার্জ দেওয়া হলো। ঘটনাস্থল, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামের নিচে পরিত্যক্ত স্কোয়াশ কোর্ট।

ন্যাশন্যাল ডিফেনস রিসার্চ কমিশানের ডিরেক্টার জেমস বি কোনান্টের টেলিফোন বেজে উঠল : অপর প্রান্তে কণ্ঠস্বর। উৎফুল্ল সংবাদ : 'The Italian navigator arrived at the shores of the new world and found the natives were friendly. It is a smaller world than he believed'.

১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সংবাদ নয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ফিসান প্রোজেক্টের প্রধান আর্থার এইচ কম্পটনের হেঁয়ালি, 'স্মলার ওয়ার্লড' মানে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ, 'ফ্রেন্ডলি নেটিভস' মানে বিশ্লেষণকে বাগে রাখা সম্ভব হয়েছে, 'ইটালিয়ান ন্যাভিগেটার মানে

এনরিকো ফেরমি, 'দি ইটালিয়ান ন্যাভিগেটার অ্যারাইভড' মানে, পারমাণবিক যুগ আর মানুষের কল্পনা নয় বাস্তব।

ফেরমি এর আগেই রয়াল অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সম্মান জানাবার জন্যে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সিলভার স্ট্রাইপড ট্রাউজার, এমব্রয়ডারি করা জ্যাকেট, ক্লোক, পালকের টুপি, একটা তরোয়াল, হিজ একসেলেনসি উপাধি আর বাৎসরিক বেশ কিছু আয়। '৫৪ সালে আমেরিকার অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন দিলেন ২৫ হাজর ডলার পুরস্কার। পুরস্কার পেলেন নভেম্বরে। ঠিক বারো দিন পরে ফেরমি মারা গেলেন ক্যানসারে। পরমাণুর শক্ত নিউক্লিয়াস চুরমার করে নিউট্রন প্রোটন আলাদা করা সম্ভব হলো। সম্ভব হলো অ্যাটম বোমা। হলো না ক্যানসার নিরাময়ের ব্যবস্থা। বিখ্যাত পদার্থবিদ সুইস ডিরাক যিনি কথা কম বলার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন, যাঁর সম্পর্কে সহবিজ্ঞানীদের উক্তি ছিল, এক আলোক বর্ষে ডিরাক একটি পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করেন, সেই ডিরাক লিখেছিলেন,

Age is of course a fever chill
That every physicist must fear,
He's better dead than living still,
When once he's past his thirtieth year!

রাজনীতি আর যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ জিলার্ড তখন মরিয়া। যেমন করেই হোক এই বোমাকে সমর দপ্তরের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে। সীতাকে আনতে হবে রাবণের হাত থেকে রামের হাতে, তা না হলে পৃথিবীর পাতাল প্রবেশ আসন্ন। জিলার্ডের প্রতিবেদন, আইনস্টাইনের আবেদন রুজভেল্টের টেবিলেই চেপে রাখা হলো। কিন্তু নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বিজ্ঞানীকে দেবার মতো তিলার্ধ সময় নেই। জিলার্ড তখন ক্ষমতাশীল এক ডেমোক্র্যাট জাস্টিস জেমস এফ বায়ারনসের সঙ্গে দেখা করলেন, পরে ট্রুম্যান এঁকে সেক্রেটারি অফ স্টেট করেছিলেন। জেমস সব শুনলেন। জিলার্ডের প্রস্তাব ছিল, আমেরিকা আর রাশিয়া পরস্পর পরস্পরকে চোখে চোখে রাখবে। জেমস হেসে বললেন, 'আপনি অকারণে বড় বেশি ভেবে পড়েছেন। জেনে রাখুন রাশিয়ায় এক ছিটেও ইউরেনিয়াম নেই।' বোমাটোমা ফেটে ধ্বংসযজ্ঞ হয়ে যাবার অনেক পরে হ্যারিসন ব্রাউন বলেছিলেন, 'বায়ারনস যদি জিলার্ডের কথায় একটু কান দিতেন, তাহলে আজকের এই ইতিহাসের ধারা একদম পালটে যেত।'

৪

সুযোগ পেলেই বর্তমান থেকে অতীতে ছুটে যাওয়া মনের ধর্ম। মনের আর একটা ধর্ম হলো অন্যেব পরিস্থিতিতে নিজেকে কল্পনা করে হয় কষ্ট পাওয়া না হয় আনন্দ পাওয়া। '৪৫ সালে আমার যে বয়েস ছিল হিরোশিমার ছেলে য়োশিটাকা কাওয়ামোতোরও সেই বয়েস ছিল। আমি যদি সেই সময় হিরোশিমায় থাকতুম তাহলে আমার কি হতো! লন্ডনের কমনওয়েলথ কি মেকসিকোর মিনি সামিট বেরিয়ে যেত। পাকা পাকা জ্ঞানের কথা বলা আর আবোল-তাবোল লেখা চিরতরে বন্ধ হতো। দূরে বসে বন্যা দেখা, টিভির পর্দায় ভিয়েতনাম দেখা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার কাটাকাটি দেখা আর ডেকচেয়ারে আড় হয়ে চোখ বুজে দার্শনিকতা করা খুব সহজ।

৬ অগাস্ট, ১৯৪৫ সালের সকালে হিরোশিমার স্কুলে কাওয়ামোতোকে প্রার্থনায় বসিয়ে সময়ের ময়দানে চরতে বেরিয়েছিলুম। চাডউইক থেকে ফেরমি, ওপেনহাইমার থেকে জেনারেল গ্রোভস। লস অ্যালামসের বোমা। কিশোর কাওয়ামোতোও জানত না বিজ্ঞানের জগতে কি হচ্ছে, পরাধীন ভারতের কিশোর আমিও জানতুম না বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে কি খেলা চলেছে। এক দিকে চলেছে বিজ্ঞানীদের প্রতিযোগিতা। কোন্ দেশ আগে ভাঙতে পারে পরমাণু। শুধু ভাঙ্গা নয়। একের পর এক লাইন করে ভেঙ্গে চলা। সেই শক্তি শান্তির কাজে লাগবে, কি যুদ্ধেব কাজে লাগবে তা দেখার দরকার নেই। আর একদিকে মুখিয়ে আছেন জেনারেলরা। হিটলার তুরুপের তাস ফেলার আগেই আগ্রাসী জার্মানিকে স্তব্ধ করে

দিতে হবে। এর মাঝে কিছু সচেতন পদার্থবিদ জাতির কর্ণধারদের দোরে দোরে নিয়তির মতো ঘুরছেন, বোঝাতে চাইছেন, পারমাণবিক গবেষণা যে পর্যন্ত এগিয়েছে, সেইখানেই ইতি টানা হোক।

জিলার্ড ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের দপ্তর থেকে। ওদিকে আর এক আণবিক বিজ্ঞানী নিল বোর অতি কষ্টে চার্চিল পর্যন্ত এগোলেন। নিল বোর ছিলেন ডেনমার্কের গর্ব। ড্যানিশরা বলতেন, আমাদের গর্বের বস্তু চারটি, এক, আমাদের নৌ-শিল্প, দুই, আমাদের ডেয়ারি, তিন, আমাদের হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারসন, চার, আমাদের নিল বোর। নিল বোর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করে বোঝাতে চেয়েছিলেন, পরমাণু গবেষণাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব বিজ্ঞানীদের একটা মিলন ক্ষেত্র তৈরি হোক। রাশিয়া, আমেরিকা, ডান, বাঁ সব ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে একটা 'ফেমিলি অফ নেশানস' গড়ে উঠুক। বিজ্ঞানীর প্রস্তাবে রুজভেল্ট সায় দেন নি। চার্চিল নীরবে প্রায় আধঘণ্টা ধরে বোরের কথা শুনলেন। কোনও টুঁ শুঁ করলেন না, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। নিল বোর অবাক। কি হলো প্রাইম মিনিস্টারের! চার্চিল তাঁর সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসার চেরওয়েলের দিকে তাকিয়ে বললেন, What is he really talking about ? Politics or Physics ?' কি বলছেন এই ড্যানিস ভদ্রলোক? পলিটিকস না ফিজিকস!

মানুষের যেমন ভাগ্য জাতিরও সেই রকম ভাগ্য আছে। পৃথিবীর ভাগ্য। আমার সঙ্গে এক বদ্ধ উন্মাদের পরিচয় ছিল। যেদিন তার কোনও আহারই জুটতো না, আকাশের দিকে হাত তুলে, হা হা করে হাসতে হাসতে বলত, 'ভগবানের যেমন বরাত'! তার কাছেই শিখেছিলুম, ভগবানেরও বরাত আছে, তা না হলে শিব গড়তে কেন বানর হবে! দেবতা গড়তে গিয়ে কেন দানব হবে! মানুষের ইতিহাস মানুষ তৈরি করে, না ভাগ্য তৈরি করে বোঝা কঠিন। একটা গল্প মনে পড়ছে। ফ্রান্সের সিংহাসনে তখন নেপোলিয়ান। একের পর এক দেশ জয় করে চলেছেন মহা বিক্রমে। ইংল্যান্ড এইবার হাতের মুঠোয় এলো বলে। মস্ত বড় বাধা খামখেয়ালী আবহাওয়া। পাল তোলা জাহাজের ভরসায় ইংল্যান্ডের কূলে ইচ্ছেমতো সৈন্য নামানো যাবে না। এক আমেরিকান আবিষ্কর্তা একদিন এসে সম্রাটকে বললেন, আমি আপনাকে এক বহর বাষ্পীয় পোত তৈরি করে দিতে পারি যা পাল ছাড়াই আপনার বহরকে ইংল্যান্ডে নামিয়ে দেবে। আবহাওয়া কোনও বাধাই হবে না। সম্রাট নেপোলিয়ান অবাক হলেন, পাল ছাড়া জাহাজ! অসম্ভব! কি বাজে বকছ! নেপোলিয়ান ফুলটনকে বিদায় করে দিলেন। ইংল্যান্ডের ভাগ্য। ইংল্যান্ড বেঁচে গেল। নিজের অহংকার সামান্য খাটো করে নেপোলিয়ান যদি ফুলটনের কথা শুনতেন তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস অন্য ধারায় বইত।

ম্যানহাটান প্রোজেক্টের দায়িত্বে জেনারেল গ্রোভস না থাকলে আর রাশিয়ায় স্ট্যালিনের মতো ধুরন্ধর না থাকলে জাপান হয়তো বেঁচে যেত। গ্রোভস বোমার শক্তি পরীক্ষার জন্যে ছটফট করছেন। চিফ অফ স্টাফ জর্জ মার্শালকে গিয়ে বললেন, বোমা তো প্রায় হাতে এসে গেল, এইবার একটা পলিসি তো ঠিক করতে হয়। গ্রোভসের কাজকর্মে মার্শাল এতই তখন সন্তুষ্ট, প্রায় আদর করার মতোই উত্তর দিলেন, 'কান্ট ইউ সি টু অল দ্যাট ইওরসেল্‌ফ!' এসব ব্যাপার তুমি নিজে ঠিক করতে পারছ না! তোমার এত এলেম! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ!

কমিশান নামক একটা প্রহসন মানুষের জীবনের চিরকালের সঙ্গী। কিছু আমলা আর সাতজন বিজ্ঞানী নিয়ে একটা কমিটি হলো। বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন, ফেরমি, কম্পটন, লরেন্স, ওপেনহাইমার। ফেরমি ছাড়া অন্যান্যদের ওপর ম্যানহাটান প্রোজেক্টের কর্মীদের তেমন আস্থা ছিল না। অন্যান্যরা রাজনীতি আর মিলিটারির সঙ্গে যে কোনও মুহূর্তে রফা করে ফেলতে পারেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হ্যারলড সি উরেকে কমিটিতে রাখার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ নাকচ করে দিয়েছিলেন।

আর্থার এইচ কম্পটন ছিলেন বিজ্ঞানীদের প্যানেলে। তিনি পরে, সব ঘটে যাবার পর, সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনগুলির স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছিলেন, বোম মিটিং হয়েছিল, অনেকটা ফুল ফেলার মতো। সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গিয়েছিল, যে ভাবেই হোক বোমা জাপানে ফেলা হবে। আর সেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন প্রবল এক সামরিক অফিসার জেনারেল গ্রোভস। আমরা বিজ্ঞানীরা ছিলাম নিমিত্তের ভাগী। বোমা ফেলা হবে কি না, ফেলা উচিত কি না, সে প্রশ্ন একবারও আমাদের করা হয় নি। আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বোমা কি ভাবে ব্যবহার করা হবে। সব চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, দলের কোনো

বিজ্ঞানীই নিজের থেকে, অথবা নিজেদেরকে অন্যদের মুখপাত্র ভেবে একবারও বললেন না, যুদ্ধের প্রয়োজনে বোমা ব্যবহার করা চলবে না। ওপেনহাইমার নিজে খুব চালাকি করলেন, তিনি শুধু টেকনিক্যাল প্রশ্নের টেকনিক্যাল জবাবই দিয়ে গেলেন, যেমন বোম ফেলার পর প্রথম চোটেই মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াবে বিশ হাজার।

জেনারেল লেসলি এল গ্রোভসের কোনও মর্মবেদনা ছিল না। তিনি পরে স্বভাবসিদ্ধ ঢংয়ে বলেছিলেন, বেসামরিক কোনও কমিটিতে আমার থাকাটা অশোভন হবে বলে আমার নাম ছিল না ঠিকই; তবে সব সভাতেই আমি সারাক্ষণ উপস্থিত থাকতুম। বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে আসাকেই আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করতুম। কি বলছ, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের হাজার হাজার ছেলে রোজ মরছে, সেই সময় আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি! আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব ছিল না! আমি জানতুম, যে সব বিজ্ঞানী বোমা ফেলার বিপক্ষে সরব ছিলেন তাঁদের কারুর কোনো নিকট আত্মীয় যুদ্ধে ছিলেন না। সেই জন্যেই তাঁরা আহা, আহা করতে পেরেছিলেন।

শেষ মিটিং-এর পর যে ভোজ সভার আয়োজন করা হয়েছিল, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেনারেল মার্শাল। কম্পটন কথায় কথায় প্রস্তাব দিলেন, বোমাটা দুম করে জাপানের ঘাড়ে না ফেলে, অন্য কোথাও পরীক্ষামূলকভাবে ফাটিয়ে জাপানকে ভয় দেখালেও তো কাজ হতে পারে। সবাই কোনও না কোনও যুক্তি দেখিয়ে কম্পটনের প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন।

জেনারেল গ্রোভসেরই জয় হলো। ইন্টেরিম কমিটির প্রস্তাব চলে গেল ট্রুম্যানের কাছে,

(১) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাপানে বোমা ফেলতেই হবে।

(২) এমন জায়গায় ফেলতে হবে যাতে এক ঢিলে দু'পাখি মরে। অর্থাৎ জনপদঘেরা সামরিক অবস্থান। এমন সব ঘরবাড়ি যা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

(৩) বোমা ফেলতে হবে আচমকা কোনও হুঁশিয়ারি না দিয়ে।

তৃতীয় প্রস্তাবটি নৌবাহিনীর পক্ষে যিনি কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন, সেই র‍্যালফ এ বার্ডের এত খারাপ, এত অমানবিক লেগেছিল যে তৃতীয় প্রস্তাবটি থেকে তিনি তাঁর অনুমোদন তুলে নিয়েছিলেন। মৃদু হলেও একমাত্র প্রতিবাদ তিনিই জানিয়েছিলেন।

রাশিয়ানরা যখন ছলেবলে, কৌশলে, তাঁদের দেশের পলাতক বিজ্ঞানী কাপিটজাকে কেম্ব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ লেবরেটারি থেকে দেশ দেখার নাম করে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখল, আর ফিরতে দিল না, তখন বিষণ্ণ রাদারফোর্ড কাপিটজাকে একটা করুণ চিঠি লিখেছিলেন। কাপিটজার রাশিয়া যাবার কিছুদিন আগে রাদারফোর্ডের চেষ্টায় প্রচুর অর্থ ব্যয়ে নিউক্লিয়ার গবেষণার জন্য নতুন একটি ল্যাবরেটারির দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়েছিল। কাপিটজা বিখ্যাত বৃটিশ ভাস্কর এরিক গিলকে দিয়ে ল্যাবরেটারির ফলকে একটি কুমির উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। অবাক দর্শকসাধারণ প্রশ্ন করেছিলেন, বিজ্ঞানী বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে কুমির কেন? কাপিটজা বলেছিলেন, Well, mine is the crocodile of science. The crocodile cannot turn its head. Like science, it must always go forward with all devouring Jaws. কাপিটজা রাদারফোর্ডেরও নাম রেখেছিলেন ক্রোকোডাইল। রাদারফোর্ড ছাড়া সকলেই তা জানতেন। প্রিয় কাপিটজার শোকে রাদারফোর্ড একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। লেবরেটারিটি খুলে পাঠিয়ে দিলেন রাশিয়ায়। কাপিটজা তখন তাঁর প্রিয় ক্রোকোডাইলকে সুন্দর একটি চিঠি লিখেছিলেন, 'শ্রদ্ধাভাজনেষু, আসলে আমরা স্রোতে ভাসমান বস্তুকণা। স্রোতটির নাম ভাগ্য। আমরা অনেক চেষ্টায় যা পারি, তা হলো ভেসে থাকা আর একটু-আধটু এধার-ওধারে সরে যাওয়া—স্রোতই আমাদের নিয়ন্তা।'

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় সম সময়ে নোবেল বিজ্ঞানী জেমস ফ্র্যাংককে চেয়ারম্যান করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন যা ফ্র্যাংক-রিপোর্ট নামে বিখ্যাত। ওই কমিটিতে ছিলেন জিলার্ড ও বায়োকেমিস্ট ইউজিন রাভিনোভিচ। পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগে সমাজ ও রাজনীতিতে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ওই রিপোর্টে তার বিস্তারিত উল্লেখ ছিল। মার্কিন সরকার ও সমরবাহিনী ওই রিপোর্ট স্পর্শ করলেন না। বোমা ফেলা হবে, অবিলম্বেই ফেলা হবে। কোনোও দয়া-মায়া দেখানো হবে না। বায়োকেমিস্ট ইউজিন রাভিনোভিচকে দেড়পাতার মতো ছোট্ট একটা লেখা দিয়ে ফ্রাংক বলেছিলেন, আমাদের

রিপোর্টটা লিখে ফেল। কিছু হোক না হোক সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে আমরা মানবজাতির পারমাণবিক ভবিষ্যতের প্রকৃত চিত্র তুলে দিয়ে যেতে চাই। শিকাগোর সেদিনের রাত ছিল ভ্যাপসা গরম। আকাশে ক্ষয়া চাঁদ। রাভিনোভিচ পথ হাঁটছেন। ব্যস্ত শহর। উন্মাদ জন ও যান স্রোত। রাতের ষড়যন্ত্র কেউ জানে না। যুদ্ধ অনেক দূরে। মিত্রশক্তি ছুটে চলেছে বার্লিনের দিকে। জাপানের দাই-নিপ্পনের স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হতে চলেছে। হঠাৎ রাভিনোভিচের চোখের সামনেই যেন ঘটে গেল অলৌকিক ঘটনা। সামনের আকাশে আগুন ধরে গেল। বিশাল বিশাল বাড়ি জ্বলতে জ্বলতে ভেঙে পড়তে লাগল চারপাশে। গাছপালা সব হিল হিল করে প্রেত-শরীরের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। স্তম্ভিত রাভিনোভিচ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। ঘোর তখনও কাটে নি। সামথিং গ্র্যাড টু বি ডান টু ওয়ার্ন হিউম্যানিটি। মানবজাতিকে সচেতন করার জন্যে একটা কিছু করতে হবে। 'আমার ঘুম এল না। সারারাত বিছানায় পড়ে ছটফট না করে, ভোর হবার বহু আগেই আমি লিখতে বসে গেলাম। ফ্রাংক একটা খসড়া দিয়েছিলেন মাত্র, আমারটা ক্রমশই হয়ে উঠল দীর্ঘ। A REPORT TO THE SECRETARY OF WAR, JUNE 1945.

যা ঘটল আর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা যেন স্পষ্ট হয়ে আছে এই রিপোর্টে। শুরুই হচ্ছে এই ভাবে, The only reason to treat nuclear power differently from all other developments in the field of physics is the possibility of its use of a means of political pressure in peace and sudden destruction in war. সুদীর্ঘ রিপোর্ট সাত বিজ্ঞানী শেষ করছেন এই বলে, মার্কিন সরকার যদি অন্য সব দেশের আগে প্রথমেই যুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে চান তাহলে আমেরিকার জনসাধারণ ও বিশ্বের অন্যান্য সব দেশের জনমত গ্রহণ করুন। তাঁদের বলতে দিন জাপানে বোমা ফেলা উচিত কি অনুচিত! এই মর্মান্তিক ব্যাপারে তাঁদেরও একটা ভূমিকা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাক।

কত জল ঘোলা হলো তবু থামানো গেল না বৃহৎ শক্তির হামলা। বিজ্ঞানের মতো সমরশক্তিও যেন বিজ্ঞানী কাপিটজার সেই কুমির। ঘাড় ঘোরাতে জানে না। ভয়াল মুখ ব্যাদান করে যে কুমির শুধু এগিয়েই চলে সামনে। কিশোর কাওয়ামোতো সে কথা জানত কি! ৬ আগস্ট, ১৯৪৫, সকাল আটটা পনেরোতেও সে জানত না, আটটা বেজে ষোল মিনিটে কি ঘটতে চলেছে তার জীবনে। সকাল আটটায় সে ক্লাসে ঢুকে প্রতিদিনের নিয়ম অনুসারে সম্রাটের ছবিকে নমস্কার করে নিজের ডেস্কে গিয়ে বসল। তার প্রিয় ডেস্ক। ডেস্ক আর চেয়ারের মাঝখানে বেশ কিছুটা জায়গা যাতে বিমান আক্রমণের সময় হামাগুড়ি দিয়ে আশ্রয় নেওয়া যায়। সকলের সঙ্গেই রয়েছে বুলেটপ্রুফ হেলমেট। হেলমেট বললে ভুল হবে, আসলে মায়ের তৈরি মোটা কাপড়ের ছুঁচলো টুপি। ছেলেরা ডেস্কে বসা মাত্রই বয়স্ক ছাত্রেরা রোজ যেমন বলে, সেই রকমই বলল, চোখ বুজাও, ধ্যান করো। কাওয়ামোতো চোখ বুজিয়েছিল তবে ধ্যানে মন বসল না। সে ভাবতে লাগল, দাদারা আজ আবার মারবে না তো! দাদারা সুযোগ পেলেই কোনও না কোনো ছুতোয় ছোটদের খুব চড় চাপড় মারত। চোখ বুজিয়ে কাওয়ামোতো মুখের এমন একটা ভঙ্গি করার চেষ্টা করতে লাগল, যে মুখ ভালো ছেলের, লক্ষ্মী ছেলের।

নির্দেশ দিয়েই বড়রা চলে গেল ক্লাসের বাইরে। ছোটরা চোখ বুজিয়ে ধ্যানের চেষ্টা করছে। ওদিকে তলপেটে আণবিক বোমা, 'থিনম্যান' নিয়ে 'এনোলা গে' ঢুকে পড়েছে হিরোশিমার আকাশে। পেছনেই আর একটি বিমান, 'গ্রেট আর্টিস্ট' যার কাজ ছিল ছবি তোলা। প্রলয়ের ছবি।

কাওয়ামোতো হঠাৎ চোখ মেলে তাকালো। চোখ চলে গেল জানলার ধারে বসে থাকা কুজিমোতোর দিকে। তার বাবা ছিলেন একজন ডাক্তার। হঠাৎ কুজিমোতো বলে উঠল—আরে, ওই দ্যাখ একটা বি ২৯। অন্য ছেলেরা সবাই ধ্যান করছে। কেউই চোখ খুলল না। কাওয়ামোতোর বড় বেশি কৌতূহল। সে জানলার কাছে যাবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠল। জানলার দিকে এগোচ্ছে এমন সময় আকাশে আলোর ঝিলিক। কোনও শব্দ নেই, শুধু বিদ্যুতের একটা ঝিলিক আকাশ ফেঁড়ে ফেলল। বায়ুমণ্ডল যেন থরথর করে কাঁপছে। খারাপ হয়ে গেলে টেলিভিশনের পর্দা যেমন কাঁপে।

তারপর অচৈতন্য। কানে অস্পষ্ট বিদ্যালয়-সংগীত, হিরোশিমার সন্ধ্যার আকাশে সাদা বৃষ্টিধারা। ফোটা ফুলের পাপড়ির রঙ হাল্কা হয়ে আসছে। বসন্ত চলে যায়। তবু আমরা দাঁড়িয়ে আছি ঠিকই,

কোমর বেঁধে। আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন অমলিন। কাওয়ামোতো চেতনা হারাবার আগে তার বন্ধুর নাম ধরে ডেকে উঠল—ওটা। পালিশ করা শহুরে ছেলে। চটপটে। বুদ্ধিমান। তার নাক কাওয়ামোতোর মতো থ্যাবড়া নয়, খাড়া।

কাওয়ামোতোর যখন চেতনা এল, তখন সব জ্বলছে। সেই আগুনে পুড়ছে প্রিয় বন্ধু ওটা। কাওয়ামোতো ছুটে চলে এল খেলার মাঠে। কালো ঘন ধোঁয়ায় চারপাশ আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে নীল আকাশের উঁকি। কাওয়ামোতো বিভ্রান্ত। জানে না কোন দিকে ছোটা নিরাপদ। কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'বাতাসের দিকে ছোট'। সেই অবস্থাতেই কাওয়ামোতো এক মুঠো বালি তুলে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল। বোঝা গেল বাতাসের গতি কোন্ দিকে। সর্বত্র আগুন আর আগুন। বাতাসে আগুন ধরে গেছে। সারা মাঠে ছড়িয়ে আছে মৃতদেহ। অনেকের তখনও প্রাণ আছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

হঠাৎ কাওয়ামোতো দেখতে পেল তার প্রধান শিক্ষককে। সারা দেহ পুড়ে এমন ভাবে ঝলসে গেছে যে চেনাই যায় না। কাওয়ামোতো চিনতে পারল তাঁর কণ্ঠস্বর। পরনে তাঁর কিছুই নেই, শুধু আন্ডার প্যান্টটি লেগে আছে। সেই অবস্থাতেই তিনি একটা ঠেলা গাড়ি ঠেলে আনছেন। সেই গাড়িতে রয়েছে কাওয়ামোতোরই কয়েকজন সহপাঠী। প্রধান শিক্ষককে সাহায্যের জন্যে কাওয়ামোতো এগিয়ে গেল। কোথায় চলেছে জানা নেই। কি ভাবেই বা এগোবে? নিমেষে একটা শহর একেবারে ধ্বংসস্তূপ। আগুন আর ছাই। মাঝে মাঝেই ঠেলাগাড়িটাকে দুপাশ থেকে তুলে ধরে পড়ে থাকা মৃতদেহ পার করাতে হচ্ছিল। যাদের তখনও প্রাণ ছিল তারা কাওয়ামোতো আর প্রধান শিক্ষকের পা চেপে ধরছিল। সাহায্যের জন্যে করুণ আকুতি। অবশেষে তারা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যেখানে আগুন নেই। একপাশে কয়েক টিন তেল গড়াগড়ি যাচ্ছিল। খানিকটা কাপড় সেই তেলে ভিজিয়ে দুজনে মিলে দগ্ধ ছাত্রদের গায়ে বোলাতে লাগল। এ ছাড়া আর কিছু মাথায় এল না। করার কিছু ছিলও না। রাস্তা-ঘাট-মাঠ সব তেতে উঠছে হু হু করে। আণবিক বোমা থেকে যে ভূ-উত্তাপ নির্গত হয়েছিল তার মাত্রা ছিল ৩০০০° সেন্ট্রিগ্রেড বা ৫৪০০° ফারেনহাইট। এর অর্ধেক উত্তাপেই লোহা গলে যায়। 'আমাদের দু'জনেরই আর কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তখন। একটু জল। একটু জল কোথায় পাই। চোখের সামনেই ওই গাড়িতে আমার দুই সহপাঠী মারা গেল।' সেই তান্ডব থেকে অলৌকিক ভাবে বেঁচে যাওয়া কাওয়ামোতো আজ প্রৌঢ়। সম্প্রতি 'হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের' ডিরেক্টার নির্বাচিত হয়েছেন। সেদিন যাঁরা বেঁচে গিয়ে আজও জীবিত আছেন আধুনিক জাপান তাঁদের বলেন, 'হিবাকুশা'। শব্দটি তেমন গৌরবের নয়। প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে প্রশ্ন, সবাই যখন মারা গেল তুমি কেন বেঁচে? শব্দটির মধ্যে করুণা আছে, প্রত্যাখ্যান আছে। কাওয়ামোতো নিজেকে 'হিবাকুশা' বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পান। বেঁচে আছেন ভেবে লজ্জা পান। স্বপ্নে দেখতে পান তাঁর সহপাঠী ওটা ধীরে ধীরে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। রাতের ঘুম তাঁকে ত্যাগ করেছে।

দীর্ঘ ৪১ বছর পরেও প্রৌঢ়ের স্মৃতিতে হিরোশিমা আজও জ্বলছে। কিশোর কাওয়ামোতো টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে কিয়োবাশি নদীর দিকে। অসহনীয় উত্তাপে শরীরে ফোস্কা উঠছে। মাটিতে পা রাখা যাচ্ছে না। চারপাশে ছড়িয়ে আছে কালো, ঝলসানো মৃতদেহ। মৃত মায়ের স্তন কামড়ে রয়েছে জীবন্ত শিশু। মৃত মাকে ছোট ছোট হাতের ঘুষি মেরে জাগাবার চেষ্টা করছে অবুঝ শিশু। মিউক ব্রিজের কাছে অন্ধের মতো টাল খাচ্ছে সহপাঠী কিমুরা। তার মুখটা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। অস্পষ্ট স্বরে সে শুধু বলছে, 'আমি বাড়ি যাই। আমি বাড়ি যাই।' 'বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যাও। বাড়ি আর নেই।' তবু সে নেশাগ্রস্তের মতো, আগুনের আকর্ষণে ছুটে চলা পতঙ্গের মতো সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অগ্নিকুন্ডে। তার দেহাবশেষটুকুও আর পাওয়া গেল না পরে। সেদিন মানুষের আচার আচরণ এই রকম ভূতগ্রস্তের মতোই হয়ে পড়েছিল। আগুনের উল্টোদিকে না ছুটে কাতারে কাতারে ছুটে গিয়ে ঝাঁপ মেরেছিল আণবিক চুল্লিতে।

কাওয়ামোতোর আজও স্পষ্ট মনে পড়ে কি ভাবে সে দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছেছিল মিউকি ব্রিজের কাছে। ধাপের পর ধাপ ভেঙে টাল খেয়ে উল্টে পড়েছে নদীর কিনারে। তারই মাঝে এক ঢোক জলের আশায় পোড়া পোড়া উলঙ্গ মানুষের দল, মৃত, অর্ধমৃত, ঘোলা, কর্দমাক্ত জলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সেই দলে কাওয়ামোতোও ছিল। এক চুমুক জল মুখে নিয়েই ফেলে দিয়েছিল থুথু করে।

পরের দিন জাপানের প্রখ্যাত আণবিক বিজ্ঞানী ইয়োশিও নিশিনাকে পাঠান হলো বিধ্বস্ত হিরোশিমায়। বিমানে গোলমাল দেখা দেওয়ায় সেদিন তিনি ফিরে এলেন। অগাস্টের আট তারিখে নিশিনার বিমান যখন হিরোশিমার আকাশে এল, নিচের দিকে তাকিয়ে তিনি স্তম্ভিত। কোথায় গেল অত বড় একটা প্রাণচঞ্চল শহর। বিশাল এক ধ্বংসস্তূপ তখনও ভলভল করে ধোঁয়া ছাড়ছে। একটি মাত্র বোমা। উড়ে গেল বিশাল এক শহর। বিমান নামা মাত্রই দৌড়ে এলেন বিমানক্ষেত্রের সামরিক অফিসার। তাঁর মুখের একটা পাশ পুড়ে ঝলসে গেছে। অপর পাশ অক্ষত। পোড়া দিকটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'শরীরের যে অংশ উন্মুক্ত সেই অংশ পুড়ে ঝলসে যাবে, যে অংশ সামান্য আচ্ছাদিত সেই অংশ পোড়ার হাত থেকে বাঁচবে। তার মানে বাঁচার উপায় আছে।' নিশিনার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শুরু হলো। বোমা যেখানে ফেটেছে তার চারপাশে ৬৫০ গজের মধ্যে সমস্ত ছাদের টালি দশমিক ০০৪ ইঞ্চির মতো গলে গেছে। কি ভয়ঙ্কর উত্তাপ! যেখানে যেখানে কাঠের দেয়াল তখনও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে জায়গায় জায়গায় মানুষ অথবা অন্য বস্তুর ছাপ ধরে গেছে। প্রচন্ড উত্তাপ আর সহস্র সূর্যের দীপ্তিতে চারপাশ ঝলসে গেছে শুধু সেই অংশটি ছাড়া, যে অংশ ছিল শরীর অথবা বস্তুর আড়ালে। এর থেকে নিশিনা হিসেব করতে পারলেন জমি থেকে কতটা উঁচুতে বোমাটি ফেটেছিল। বোমা বিস্ফোরণের ঠিক তলার জমি খুঁড়ে নিশিনা তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করলেন। ঠিক চার মাস পরে তাঁর সারা শরীরে ফুটে উঠল ছাপকা ছাপকা দাগ। তেজস্ক্রিয়তার শিকার হলেন তিনি।

জেনারেল গ্রোভস এক সমাবেশে বেশ খোসমেজাজে বললেন, 'তেজস্ক্রিয়তা! আর তেজস্ক্রিয়তায় মৃত্যু তো বড় মধুর। ভেরি প্লেজান্ট।' তাঁর ভাষণ শুনে লস অ্যালামোসের বিজ্ঞানীদের রক্ত ফুটে উঠল। বলে কি! কয়েক দিন আগে তাঁদেরই এক তরুণ সহকর্মী ডাগনিয়ানের ডান হাতে র‍্যাডিয়েশান লেগেছিল। তিলে তিলে যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুর ছবি চোখের সামনে। দেখতে দেখতে হাত ফুলে উঠল। অসাড়। অবশ। ভুল বকা। অসহ্য যন্ত্রণা। মাথার সব চুল ঝরে গেছে। রক্তের শ্বেতকণিকা হুহু করে বাড়ছে। চব্বিশ দিনের মধ্যে ডাগনিয়ান মারা গেলেন।

হিরোশিমা, নাগাসাকিতে যাঁরা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন তারা ভাগ্যবান। যাঁরা তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হলেন তাঁদের হলো 'ভেরি প্লেজেন্ট' ডেথ। যেমন হলো ডাগনিয়ানের। বিজ্ঞানের তো হৃদয় নেই। মৃত্যুর পেছন পেছন ক্যামেরা হাতে ছুটে এলেন চিত্রগুপ্তের দল, ইতিহাসের সন্ধানে। মৃত্যুকে ছবি করে বিজ্ঞানের আর্কাইভে রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্যে। হিরোশিমার মানুষ, নাগাসাকির মানুষ কি ভাবে মরেছিল? রক্ত তুলে। গলে গিয়ে। ফেটে গিয়ে। ফুলে উঠে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। বুকের একপাশ গলে পড়ে গেছে। মুখ নেই প্রাণ আছে। সারা গায়ে দগদগে ফোস্কা। কিমোনোর ফুল আর নকশার ছাপ নগ্ন শরীরে। চুল ঝরে গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেঁকে গেছে। আমেরিকান জেনারেল লেসলি গ্রোভসের 'মধুর মৃত্যু'।

জীব জগতে মানুষ হলো নিষ্ঠুরতম প্রাণী। জাপানের বায়ুমন্ডল যখন তেজস্ক্রিয় আগুনে জ্বলছে। দুটি শহরে যখন মৃত্যুর স্তব্ধতা। নেমে এসেছে মধ্যাহ্নে আঁধার। নদীর জল যখন নরকের কাদার মতো ফুটছে। গলে গলে পড়ছে, ধাতু, ইট, কাঠ, পাথর। ঘন কালো মেঘে আকাশ অদৃশ্য। মানুষের হাতে খুলে এসেছে তারই শরীরের চামড়া কোটের মতো। তখন আমেরিকার মানুষ সাফল্যের উল্লাসে পথে পথে নৃত্য করছে। শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হচ্ছে। বাজি পুড়ছে। লস অ্যালামোসের আকাশে লক্ষ তারার ফুলঝুরি। প্রখ্যাত গাইয়ে বাজিয়ের দল পথ পরিক্রমা করছে। উৎসব। শুধু উৎসব। ঐতিহাসিক পল বোয়ার সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ করেছেন—By the Bomb's Early Light. হিরোশিমায় প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হবার বছর পাঁচেকের মধ্যে আমেরিকায় একটা আণবিক সংস্কৃতি দানা বেঁধে উঠল। জাতীয় অহঙ্কার উদ্ধত। আমেরিকাই একমাত্র দেশ যার প্রভূত অর্থবলে পৃথিবীর একমাত্র কারখানায় চব্বিশ ঘণ্টা বোমা তৈরির কাজে মশগুল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর দল। সারা দেশ বুঝে গেছে, বিশাল একটা কিছু ঘটাবার ক্ষমতা আমেরিকার আছে; আর এই বোমা হলো জাতির পক্ষে কল্যাণকর। বড় বড় দোকানে আণবিক নিদর্শন সমূহ বিক্রি হতে লাগল। নিউমেক্সিকোর যে মরুভূমিতে পরীক্ষামূলক বোমাটি ফাটানো হয়েছিল, সেই মরুভূমির বালি উত্তাপে কাঁচের কণায় পরিণত হয়েছিল। সেই কাঁচের টুকরোয় তৈরি হয়েছিল কস্টিউম জুয়েলারি। কি তার চাহিদা! আবার এক লাস্যময়ী

চিত্রাভিনেত্রীর বিশেষণ হলো 'The Anatomic Bomb.' আবার কেক তৈরি হলো আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর ব্যাঙের-ছাতা মেঘের আকারে। মাশরুম ক্লাউড অ্যাটমিক কেক। আমেরিকায় তখন অ্যাটমিক কালচার ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাত্তা পাচ্ছে না। দি নিউইয়র্ক টাইমসে জেমস রেস্টন লিখলেন, 'দশ হাজার মাইল দূরে বসে মানুষ সেই বিশাল বিস্ফোরণে প্রত্যক্ষ করলেন আমেরিকার ভবিষ্যৎ।' আনন্দ আর সাফল্যের উন্মাদনার পাশাপাশি আশঙ্কার ছবিও ফুটতে লাগল। দি ওয়াশিংটন পোস্ট সেই 'টেরিবল ফ্ল্যাশে' যে ভবিষ্যৎ দেখলেন, তা হলো বিশ্বে মানুষের আয়ুষ্কাল অপরিমেয় কমে গেল। ঐতিহাসিক বোয়ার লিখছেন, 'এই যে আণবিক সংস্কৃতি গড়ে উঠল তাতে একটি চেতনা হৃদস্পন্দনের মতো দপদপ করতে লাগল—গ্লোবাল অ্যানিহিলেশান—বিশ্বের অসতর্ক অবলুপ্তি।

হেরম্যান তাঁর মহাকাব্য, দি বম্ব দ্যাট ফেল অন অ্যামেরিকায় লিখলেন,

> আমেরিকায় যখন বোমা পড়ল, পড়ল জনগণের মাথায়।
> হিরোশিমায় মানুষ গলে গিয়েছিল আমেরিকার মানুষের শরীর গেল না।
> কিন্তু যা গেল তা আরও সাংঘাতিক, অতীত আর ভবিষ্যতের সঙ্গে মানুষেব সংযোগ॥
> পৃথিবীতে নতুন কিছু একটা ঘটল, যা ছিল সে ভূমিতে আর পা রইল না মানুষের।
> ভয়াল ভয়ঙ্কর বিশাল বিশাল এক দিগন্তের হাতছানিতে সভ্যতা কোল ছাড়া॥
> পৃথিবীর মাটি এক সময় কত কঠিন মনে হতো, 'মেন স্ট্রিট' কোথায়!
> কোথায় তার শানবাঁধানো শক্ত তেলা ভূমি!
> এ তো দেখি পায়ের তলায় থল থল করছে বিশাল এক জেলি!
> কাঁপছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে, ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে,
> What have we done, my country, what have we done?

৫

পঁয়তাল্লিশ আর ছিয়াশি সময়ের নদীতে ঘটনার অনেক জল বয়ে গেছে। যুদ্ধ থেমেছে। বৃহৎ শক্তি ইওরোপ ভাগ করেছে। ভাঙা শহর ঝকমকে হয়েছে। জীবনেব মূল্যবোধ পাল্টেছে। গরম যুদ্ধ থেমে ঘিনঘিনে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা, কম্বোডিয়া, সুয়েজ, ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান, নিকারাগুয়া, আর্জেন্টিনা, লড়াই আর থামে না। এখানে ওখানে সেখানে বিশ্ব শক্তির মল্ল যুদ্ধ। হালে পানি না পেলেই আণবিক অস্ত্র প্রয়োগেব হুমকি। পঁয়তাল্লিশে হিরোশিমা, নাগাসাকি ওড়াবার প্রাক্কালে এই আশঙ্কাই করা হয়েছিল।

বোমার ব্ল্যাকমেল নাগাসাকি থেকেই শুরু হয়েছে। নাগাসাকিতে 'ফ্যাট ম্যান' ফেলার পরই, বিমান থেকে ফেলা হলো তিনটি পরিমাপ যন্ত্র। প্রতিটি যন্ত্রে বাঁধা একটি হাতে লেখা চিঠি। কয়েকজন আণবিক বিজ্ঞানীর মাথা থেকে বেরিয়েছিল এই ফন্দি। বোমারু বিমানের পেছনেই থাকত অনুসরণকারী বিমান। সেই বিমানে যে বিজ্ঞানীরা ছিলেন তাঁরা দ্রুত একটি চিঠি লিখে ফেললেন জাপানের বিজ্ঞানী সাগানেকে। জাপানও আণবিক গবেষণায় কিছু কমতি ছিল না। টোকিওতে কাজ করছিল গোপন একটি সাইক্লোট্রন যন্ত্র। ডিরেক্টার ছিলেন য়োশিয়ো নিশিনা। নিশিনাকে বলা হতো জাপানের ওপেনহাইমার। জাপান বোমা তৈরি করতে পারে নি দুটো কারণে। আমেরিকার মিলিটারি বিজ্ঞানীদের যে-ভাবে কব্জা করতে পেরেছিলেন, জাপানের মিলিটারি সে-ভাবে পারেন নি। জাপানের বিজ্ঞানীরা মিলিটারির হাতে ওই মারাত্মক অস্ত্রটি সহজে তুলে দিতে নারাজ ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, জাপানী গবেষণায় একটা ত্রুটি ছিল। তাঁরা হাই-এনারজি নিউট্রন দিয়ে অ্যাটম ভাঙার চেষ্টা করছিলেন। দরকার ছিল লো-এনারজির। এ

যেন অনেকটা সেই রকমের ব্যাপার, শত্রু সৈন্য দিনের পর দিন দুর্গের দুর্ভেদ্য গোপন আস্তানাটি শক্তিশালী কামানের গোলায় ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে যখন হতাশ, তখন কে যেন পরামর্শ দিলেন পিংপং বল মেরে দেখ তো কি হয়। তা ছাড়া জাপানের অর্থসঙ্গতিও তেমন প্রচুর ছিল না। দু বিলিয়ান ডলার মুখের কথা নয়।

ওয়ার লর্ডদের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের এই তফাৎ। দেশনেতারা তরোয়াল-এর ভাষায় কথা বলেন। বিজ্ঞানীরা বলেন মানবিকতার ভাষায়। অনুসরণকারী বিমানের বিজ্ঞানীরা বিমানে ওঠার আগে বসে বসে বীয়ার খাচ্ছিলেন, হঠাৎ মনে হলো, জাপানকে যদি বাঁচান যায়! বাঁচতে হলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন চিঠি :

অধ্যাপক, আর. সাগানে,

হইতে ঃ আপনার আমেরিকায় থাকাকালীন তিন সহকর্মী বিজ্ঞানী।

আপনার কাছে এই চিঠি আমাদের ব্যক্তিগত আবেদন। আণবিক বিজ্ঞানী হিসাবে আপনি আপনার দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষকে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিন, নয় তো সমূহ বিপদ। বুঝতেই পারছেন এই জাতীয় বোমা আরও ফেলা হলে জাপানের আর কিছুই থাকবে না।

কয়েক বছর ধরেই আপনি জানেন প্রচুর অর্থ থাকলেই আণবিক বোমা তৈরি করা যায়। আপনি এখন দেখছেন আমাদের কারখানা আছে, যে কারখানায় বোমা তৈরি হচ্ছে। এখন সেই কারখানায় দিন রাত কাজ হচ্ছে আর সেই উৎপাদনের পুরোটাই পড়বে আপনাদের ঘাড়ে।

গত তিন সপ্তাহে, প্রথম বোমাটি আমরা ফাটিয়েছি আমেরিকার মরুভূমিতে, দ্বিতীয়টি ফেটেছে হিরোশিমায়, তৃতীয়টি এই চিঠি সমেত নামছে নাগাসাকিতে। আজ প্রাতে।

আমাদের অনুরোধ কর্তৃপক্ষকে বোঝান। বন্ধ করুন ধ্বংস ও লোকক্ষয়। এই যুদ্ধ চললে আপনারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি, এমন সুন্দর একটা আবিষ্কার মানুষ মারার কাজে লাগান হচ্ছে বলে। আমরা নিরুপায় হয়ে আপনাকে জানাতে চাই, আত্মসমর্পণ না করলে জাপান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তিনটে চিঠির একটা নাগাসাকিতে বোমা ফেলার পরের দিন জাপানের ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স ডিভিসানের হাতে পড়ল। সেই চিঠি বেশ কয়েক দিন পরে বিজ্ঞানী সাগানের কাছে পৌঁছল। চিঠির ফলেই জাপান আত্মসমর্পণ করল কি না জানা গেল না; তবে এ কথা সবাই জানত, অন্তত আমেরিকার ম্যানহাটান প্রোজেক্টের সকলে জানতেন, আমেরিকার হাতে সেই সময় আর একটিও বোমা ছিল না। বোমা বৃষ্টির ভয় দেখান হচ্ছিল।

'৪৫ সালে যুদ্ধ পুরোপুরি থেমে যাবার পর অনেকে বলেছিলেন, দুটো শহর ধ্বংস হলো ঠিকই, দু'লক্ষ নিরীহ জাপানীর মৃত্যুও দুঃখজনক; কিন্তু বোমাই নিয়ে এল শান্তি। আণবিক বোমাই হলো শান্তির দূত। হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে মৃত্যুর সংখ্যা দু'লক্ষ; কিন্তু বেঁচে গেল দশ গুণ মানুষ। বোমা না ফেললে আমেরিকাকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সঙ্গে লড়ে যেতে হতো গতানুগতিক পদ্ধতিতে। '৪৫এ জাপান একেবারে মরীয়া। দশ লক্ষ সৈন্য আর তিন কোটি জাপানী নাগরিক আমৃত্যু লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। ওকিনাওয়া আর আয়োজিমাতে জাপানী সৈনিক আর কামিকাজে পাইলটরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, বুশিডো স্পিরিট কাকে বলে। সামনাসামনি প্রথাগত লড়াই হলে কমপক্ষে দশ লক্ষ মার্কিন সৈনিকের মৃত্যু হতো। মৃত্যু হতো ততোধিক জাপানী যোদ্ধার। 'জাপানিজ ব্রাডিওয়েল ডিসার্ভড হিরোশিমা' বলে বোমাটি ছাড়া হলো আর সান্ত্বনা খোঁজা হলো বেঁচে যাওয়ার কাল্পনিক সংখ্যা বের করে। অভিজ্ঞরা জানতেন, হিরোশিমায় বোমা ফেলা হয়েছিল রাশিয়াকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে, আর জাপান যুদ্ধ থামিয়েছিলেন হিরোশিমা নাগাসাকির আতঙ্কে নয়। বরং বোমা তাঁদের অহঙ্কারে ইন্ধন জুগিয়েছিল। তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল জাতীয় অভিযান। হারব না—বরং মরব। জাপান আত্মসমর্পণ করলেন রাশিয়ার চালে। হিরোশিমায় বোমা পড়ার পরে আর নাগাসাকিতে পড়ার আগে ৮ অগাস্ট স্ট্যালিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যার যা ধান্দা। জাপান কমিউনিস্ট রাশিয়ার খপ্পরে পড়ার চেয়ে আমেরিকার আশ্রয়ে যাওয়াটাই পছন্দ করলেন।

প্রচুর অর্থ, প্রচুর গম, প্রচুর কাউবয়, অস্ফুট অনুনাসিক ইংরেজি উচ্চারণ, ঢাউস মোটর গাড়ি,

বেসবল, চিউয়িংগাম, হলিউড, টেক্সাস, কলম্বাস, রেড ইন্ডিয়ান, এই রকম একটা পরিচয় থেকে রাতারাতি আমেরিকা হয়ে দাঁড়াল পৃথিবীর সুপ্রীম পাওয়ার। আণবিক শক্তির অধিকারী—নিউক্লিয়ার পাওয়ার। প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া। যুদ্ধ থামল। ইওরোপ ভাগবাঁটোয়ারা হলো। আমেরিকার আণবিক কারখানা বন্ধ হলো না। ন্যাশন্যাল হিরো ওপেনহাইমার লস অ্যালামসের ডিরেক্টারের পদে ইস্তফা দিয়ে অধ্যাপনায় ফিরে গেলেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে একে একে আর সব সেরা বিজ্ঞানীরাও বিদায় নিলেন। জমজমাট, প্রাণচঞ্চল আণবিক কেন্দ্র লস অ্যালামোসের চেহারা হয়ে দাঁড়ালো ভুতুড়ে। তবু জেনারেল গ্রোভস দমলেন না। আমেরিকার সামনে লাল আতঙ্ক। আমেরিকার চেতনায় পৃথিবীর এক নম্বর শক্তি থেকে পড়ে যাবার আশঙ্কা। আমেরিকা কেন, বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহে ঢুকে পড়েছে আণবিক সংস্কৃতি। আমেরিকার মিলিটারি পুলিশ জার্মানিতে বিজ্ঞানী ধরতে ছুটলেন। আদর্শবাদী মার্কিনীরা প্রতিবাদ জানালেন। কর্তৃপক্ষ যুক্তি দিলেন, আমরা বগলদাবা না করলে, রাশিয়া নিয়ে পালাবে।

মজার মজার সব পাগলামি শুরু হয়ে গেল। যেমন ব্রেমেন থেকে আণবিক বিজ্ঞানী বলে মিলিটারি পুলিশ একজনকে তুলে নিয়ে এলেন। তাঁর হাত-পা ছোঁড়া প্রতিবাদে কেউ কর্ণপাত করল না। আমেরিকায় এনে দপ্তরে ফেলে জিজ্ঞাসাবাদ চলল দিনের পর দিন। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তাঁর কতটা জ্ঞান জানা দরকার। অমন একগুঁয়ে বিজ্ঞানী খুব কম দেখা যায়। জার্মানির আরও অনেক বিজ্ঞানী ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কেমন বশ্যতা স্বীকার করেছেন, এরকম তো কেউ করেন নি। যতই তাঁকে প্রশ্ন করা হয় ততই তিনি বলতে থাকেন আণবিক 'আ'-ও আমি জানি না। আমার জ্ঞান ওই খবরের কাগজ পড়ে যতটা হয় ততটা। হয় বিশ্বাস করুন, আমি আণবিক বিজ্ঞানী নই, আসলে আমি একজন দর্জি। যাঁরা জেরা করছিলেন তাঁদের একজনের মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে জোগাড় করে আনলেন ছুঁচ সুতো। নাও দেখাও তোমার কেরামতি। সকলকে হতবাক করে সেই ধরে আনা বিজ্ঞানী তাঁর পাহারাদারদের জামা আর ট্রাউজারের ওপর সেলাইয়ের কাজ দেখালেন। অনেক কচলাকচলির পর ভুলটা অবশেষে ধরা পড়ল। ভদ্রলোকের নাম হাইনরিখ জোর্ডান। জোর্ডান পদবীটিই হলো কাল। মিলিটারি পুলিশরা ধরতে চেয়েছিলেন পাসকুয়াল জোর্ডানকে। একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ। ম্যাক্স বর্নের ছাত্র। হাইনরিখ জোর্ডানকে মানে মানে ছেড়ে দেওয়া হলো।

নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে গিয়ে আমেরিকান মিলিটারি আর একটি মারাত্মক ভুল করে বসলেন। হিটলার বই পুড়িয়েছিলেন, মেজর ও হার্ন অধিকৃত জাপানে, অধ্যাপক নিশিনার সাইক্লোট্রন যন্ত্র দুটি পাঁচ দিন পাঁচ রাতের নাগাড় চেষ্টায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলেন।

বোমা যাঁরা তৈরি করলেন, সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা চেয়েছিলেন, যুদ্ধ থেমেছে, ধ্বংসের নমুনা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। আণবিক বিজ্ঞান আর আণবিক মারণাস্ত্র তৈরির কাজে লাগাতে দেওয়া হবে না। বিজ্ঞানোন্নত দেশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হোক সব গোপনীয়তা। তাঁরা চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন ওপেনহাইমারের ওপর, কেন আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে বসছে না। ওপেনহাইমার কেবলই বলেন, পেশেন্স, পেশেন্স। ধৈর্য ধরো। এখনই নৌকো দুলিও না।

শেষে দেখা গেল চক্রান্ত অতি গভীর। কংগ্রেসম্যান অ্যান্ড্রুসেকে দিয়ে সমর দপ্তর, জেনারেল গ্রোভসের পরিচালনায় একটি বিল পাশ করাতে চলেছেন, যার ফলে, সমস্ত নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে মিলিটারির হাতে। সিকিউরিটি ঘেরা পারমাণবিক উৎপাদনকেন্দ্রে বসে স্লেভ ফিজিসিস্টরা আণবিক অস্ত্র বানাবেন, আর সেই অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বিশ্বের ওপর প্রভুত্ব করবে আমেরিকা। রুজভেল্ট, ট্রুম্যান ফেরৎ সেই এক রোখা বিজ্ঞানী জিলার্ড এবারও এগিয়ে এলেন, অ্যাসিসটেন্ট সেক্রটারি অফ ওয়ার কেনেথ রয়াল, জেনারেল গ্রোভস, অ্যান্ড্রুসে, বিজ্ঞানী ভানেভার বুশ আর জেমস কোনান্টের চক্রান্ত ভাঙতে। সেনেটার জনসন ছিলেন বিলটির উত্থাপক। জিলার্ড জনমত তৈরি করে ফেললেন। চাপে পড়ে মে-জনসন বিল এল হিয়ারিং-এ। জিলার্ড ঝাড়া এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট একাই লড়ে গেলেন। মে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলেন জিলার্ডকে অপদস্ত আর বিভ্রান্ত করতে। এমন একটা ভাব দেখালেন, যেন কে জিলার্ড! যাঁর নামই উচ্চারণ করা যায় না। সে সর্বক্ষণ জিলার্ডকে মিস্টার সাইল্যান্ড বলে সম্বোধন করে গেলেন। তাঁকে ধাঁতালেন। দাবড়ালেন। হেয় করলেন। জিলার্ড বড় কড়া ধাতের মানুষ ছিলেন। সহজে উত্তেজিত করা শক্ত ছিল। তিনি ফাঁদে পা দিলেন না। ধীরে ধীরে তাঁর যুক্তির জালে আচ্ছন্ন করে ফেললেন

সকলকে। প্রথম চোটের লড়াই জিতে গেলেন জিলার্ড। সামরিক নিয়ন্ত্রণ থেকে যেভাবেই হোক জনগণের হাতে নিয়ে আসতে হবে পরমাণু বিভাজনের অসীম শক্তিকে।

লম্বা লম্বা চুল নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীরা রাতারাতি দেবতার পর্যায়ে চলে গেলেন। মহাদেব ওপেনহাইমার। এইবার তাঁর নীলকণ্ঠ হবার পালা। প্রশংসার পাশাপাশি ধিক্কার। জীববিজ্ঞানী ডক্টর থিওডর হাউস্কা ওপেনহাইমারকে তিক্ত একটি খোলা চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে সুন্দর একটি কথা লিখেছিলেন, আজ আপনাদের এত সম্মানের একটিই কারণ, আপনারা হলেন, 'ব্রিলিয়েন্ট কোলাবোরেটারস উইথ ডেথ।' মৃত্যুর সঙ্গে সুন্দর হাত মেলাতে পারলেন বলেই আজ আপনারা মহান।

অনেক আন্দোলন, লেখালেখি, সভাসমিতি করেও কিছু হলো না। আমেরিকা '৪৬ সালের জুলাই মাসে বিকিনি অ্যাটলে পরীক্ষামূলকভাবে আবার একটা বোমা ফাটালেন। এই বিস্ফোরণের পর মানুষের আণবিক আতঙ্ক কমে এল। হিরোশিমার পর টাইম পত্রিকা একটি শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। তাকে কথায় কথায় প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি কি চাও? শিশুটি একটি কথাই বলেছিল, 'বাঁচতে'। বিকিনি অ্যাটলের পর, করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধানকারীরা জনমত সংগ্রহ-অভিযানে বেরিয়ে অবাক। আতঙ্ক একেবারে থিতিয়ে গিয়েছে বললেও ভুল হবে না। প্রশ্নের উত্তরে একজন বললেন, 'আমি কেন, সব মানুষই জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য। যখন যেমন তখন তেমন। যেমন ধরুন ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় যদি আমাকে সারা জীবন বসবাস করতে হতো, তাহলে প্রতি রাতে ভূমিকম্পের ভয় নিয়ে বিছানায় শুতে যাবার কি কোনও মানে হতো!' আর একজন বলেছিলেন, 'যা আমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে তার জন্যে ভেবে মরি কেন! সরকার অবশ্যই কোনও ব্যবস্থা নেবেন।' আইনস্টাইন একদিন হাঁটতে হাঁটতে তাঁর সহকারী তরুণ গণিতজ্ঞ আর্নস্ট স্ট্রসকে বললেন, 'হ্যাঁ আমাদের সময়কে এখন রাজনীতি আর গণিতের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। তবে আমার কাছে গণিতই হলো সব, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি সাময়িক। গণিত চিরকালের।'

পশ্চিমের বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন রাশিয়া হয়তো পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আমেরিকার জনগণের পাশে এগিয়ে আসবেন। ওপেনহাইমারের সহযোগিতায় একটা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল বিবেচনার জন্যে। '৪৬ সালের ২৪ জুলাই আন্দ্রেগ্রোমিকো সরাসরি বাতিল করে দিলেন বিজ্ঞানীদের প্রস্তাব। দুই রাষ্ট্র মুখোমুখি। গরম লড়াই শেষ হলো, তো শুরু হলো ঠান্ডা লড়াই। রাজনীতিতে আণবিক অস্ত্রের ব্ল্যাকমেলিং। বহুকাল পরে পূবের বিশাল কারাগার রাশিয়া থেকে ভেসে এল বন্দী বিজ্ঞানী কাপিটজার কণ্ঠস্বর। রাদারফোর্ডের সেই প্রিয় ছাত্র। যাঁকে কায়দা করে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়ে খাঁচার কুলুপ আটকে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমের বন্ধু বিজ্ঞানীদের কাপিটজা লিখলেন—'হায় কি দুর্ভাগ্য আমাদের অ্যাটমিক এনার্জি বলতে অ্যাটমবম্ব ভাবার অর্থ হলো ইলেকট্রিসিটি বলতে ইলেকট্রিক চেয়ার ভাবা।'

এই উক্তির ফলে কাপিটজার জীবনে নেমে এল ঘোর দুর্বিপাক। বিজ্ঞানের জগৎ থেকে তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দশ বছর পরে জানা গেল তাঁর অন্তর্ধান-রহস্য। এক দল আমেরিকান বৈজ্ঞানিক রাশিয়া গিয়েছিলেন। তাঁরা কানাঘুষো শুনে এলেন, স্ট্যালিন কাপিটজাকে বন্দী করে রেখেছেন। তাঁর অপরাধ, স্ট্যালিনের নির্দেশমতো পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনে রাজি না হওয়া। শুধু কাপিটজা কেন আরও অনেক বিজ্ঞানীকে স্ট্যালিন সশ্রম বন্দীশিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই একই অপরাধে।

'৪৭ এর বসন্তে দেখা গেল, বিজ্ঞানীদের বিশ্বজোড়া বিদ্রোহ মিইয়ে এসেছে। সবাই আবার মাথা নিচু করে ফিরে এসেছেন নিজের নিজের জায়গায়। রাষ্ট্রের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন। জেনারেল গ্রোভস হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আমি জানতুম, এই রকমই ঘটবে। ছ' মাসের যথেচ্ছ স্বাধীনতার পর সব পাই সুড়সুড় করতে লাগল। ফিরে এলেন সরকারী গবেষণায়। এমন উত্তেজনা কি ছেড়ে থাকা যায়!'

'৪৯ এর অগাস্টে ফাটল রাশিয়ার বোমা।

সেই থেকে শুরু হয়েছে হিসেব, কার স্টকে কটা বোমা। আমেরিকা আর একা নয়। বিশাল বিশাল দেশের সব জালাতেই এখন দানবের বাসা। আমেরিকার সান্ত্বনা, তার ভাঁড়ারে আছে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক আণবিক অস্ত্র। নিক্সন ভারি সুন্দর বলেছেন, বোমা আর এখন শুধুই বোমা নয়। বোমা এখন 'ডিপ্লোম্যাটিক স্টিক'। এই 'ডিপ্লোম্যাটিক স্টিক' ব্যবহার করে ফল পাওয়া গিয়েছিল কোরিয়ায়।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে কোরিয়ার যুদ্ধ প্রায় পাগল করে ছেড়েছিল। চলেছে তো চলেছেই। দু' বছর ধরে উভয় পক্ষে কথাই চলেছে বিরতির নাম নেই। পানমুনজমে বৈঠক চলেছে, ওদিকে হাজার হাজার মানুষ মরে ভূত হয়ে যাচ্ছে। শেষে সিদ্ধান্ত হলো মাটির লড়াই যতই বাড়ানো যাক যুদ্ধ থামবে না। এ গেরো খোলার একমাত্র রাস্তা আণবিক অস্ত্র। আইজেনহাওয়ারের মনে সামান্য দ্বিধা ছিল। আমেরিকা এশিয়ায় একবার বোমা ব্যবহার করেছিল, আবার সেই এশিয়াতেই বোমা! নিকসনের মাথাতেও ওই একই চিন্তা ঘুরছিল। জন ফস্টার ডালাসকে তখন ভার দেওয়া হলো। কৃষ্ণ মেনন সেই সময় ইউনাইটেড নেশানসে ভারতের রাষ্ট্রদূত। মেননের সঙ্গে চীন আর রাশিয়ার খুব মাখামাখি সম্পর্ক। নিক্‌সনের কথায়, who loved to talk to people—a great blah blah blah. ডালাস মেননকে বললেন, 'কোরিয়াব ব্যাপারে আমরা খুব আগ্রহী। প্রেসিডেন্টের ধৈর্য ক্রমশই কমছে। আর বেশি বাড়াবাড়ি হলে আমরা আণবিক অস্ত্র প্রয়োগে বাধ্য হব।' রাশিয়া সরে দাঁড়াল। ক্লান্ত চীন থমকে গেল। আণবিক বোমা হয়ে দাঁড়াল সব চেয়ে বড় 'ডিপ্লোম্যাটিক স্টিক'।

'৫৬ সালে সুয়েজ সমস্যাতেও আমেরিকা আণবিক চালে কিস্তিমাৎ করেছিল। ক্রুশ্চেভ আমেরিকাকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, আসুন আমরা সমবেত ভাবে ক্যানাল থেকে ইংরেজ আর ফরাসীদের হাটাই। আইজেনহাওয়ার জানালেন, এ প্রস্তাব রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। দে আর মাই অ্যালিজ। ক্রুশ্চেভ বুঝলেন, সুয়েজ-সমস্যা নামক শক্ত মটরদানাটি নিজেকেই চিবোতে হবে। ঘোষণা করলেন, রাশিয়া একাই যুদ্ধে নামছে। ঘোষণা শুনে বিশ্বশক্তির রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল।

সেই সময় আইজেনহাওয়ার যা করলেন তার কোনো তুলনা নেই। ন্যাটোর কমান্ডাব অল গ্রুয়েন্থারকে বললেন একটা প্রেস-কনফারেন্স ডাকো। সেখানে গ্রুয়েন্থার ঘোষণা করলেন ক্রুশ্চেভ যদি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে রকেট আক্রমণ করেন তাহলে যেমন রাতের পর অবধারিত ভাবে দিন আসে, ঠিক সেই রকম মস্কোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

জালা থেকে দানব বের করার ভীতি বার্লিন সমস্যাতেও বেশ কাজ দিয়েছিল। '৫৯ সালে সোভিয়েট ভয় দেখালেন বার্লিন পূর্বজার্মানির শাসনভুক্ত হবে। তার মানে বার্লিনে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফরাসী দেশের প্রবেশাধিকার থাকবে না। আইজেনহাওয়ার বললেন চার-শক্তির চুক্তি এইভাবে ভাঙা যায় না। ডাকলেন প্রেস কনফারেন্স। অতুলনীয় আইজেনহাওয়ার। শক্ত ধুরন্ধর মানুষ। ভিয়েতনামে আমেরিকা যখন নাস্তানাবুদ, সেই সময় জনসন আক্ষেপ করেছিলেন আজ যদি আইজেনহাওয়ার থাকতেন, 'The Russians feared Ike. They did not fear me'.

সেই প্রেস কনফারেন্সে আইক বকেই চলেছেন বকেই চলেছেন। সবাই ভাবছেন মরেছে। প্রেসিডেন্ট বোধ হয় পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। আইকের এইটাই ছিল কায়দা। বকতে বকতে টুক করে পৌঁছে যেতেন আসল বক্তব্যে। তিনি হঠাৎ বললেন, নতুন বাজেটে পেন্টাগনের গ্রাউন্ড ফোর্স ৫০ হাজারের মতো কমে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেস-বকস থেকে প্রশ্ন : এই বার্লিন সমস্যার মুখে প্রেসিডেন্ট কি বাজেট সংশোধনের কথা ভাবছেন! পঞ্চাশ হাজার সৈন্য কমানোর বদলে বাড়াতে হবে না তো!

আইক নিরুদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'ইওরোপে আমরা কোনওমতেই স্থলযুদ্ধের ভেতর আর যাবো না। তা ছাড়া বার্লিনে কয়েক হাজার বেশি আমেরিকান সৈন্য; কি কয়েক ডিভিসান পাঠিয়েই বা লাভ কি। আর যাই হোক ওখানে, ইস্ট জার্মানিতে পাঁচ লাখ সোভিয়েট আর ইস্ট জার্মান বাহিনী রয়েছে, কাছাকাছি রয়েছে আরও ১৭৫ ডিভিসান সোভিয়েট বাহিনী।' তখন প্রশ্ন হলো, 'তবে কি আপনি আণবিক অস্ত্রের কথা ভাবছেন।'

আইজেনহাওয়ার নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'আণবিক যুদ্ধ! কোনও মানে হয় আণবিক যুদ্ধের। নৃশংস ভয়াবহ কান্ডজ্ঞানহীন সংহার।' সবাই ভাবলেন, আইক আণবিক যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী। হিরোশিমার স্মৃতি ব্যাঙ্কোর ভূতের মতো চোখের সামনে ঘুরছে। সব শেষে আবার সেই আণবিক প্রশ্ন। আইজেনহাওয়ার ছোট্ট একটি মন্তব্য করে কনফারেন্স শেষ করলেন, 'আমেরিকা নিজের অঙ্গীকার সম্পর্কে অতি সচেতন। স্বাধিকার সংরক্ষণের জন্যে, নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে যা করলে ভালো হয় আমরা তাই করব।' চার দিন পরেই সেনেট সাব কমিটির সামনে এয়ার-ফোর্সের চিফ অফ স্টাফ

ঘোষণা করলেন, 'বার্লিন সঙ্কট যে কোনও মুহূর্তে আমাদের যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে আর সে যুদ্ধ হবে নিউক্লিয়ার ওয়ার।' এই হুমকিতে রাশিয়া সরে গেল।

মোন্টানার ২৩ হাজার স্কোয়ার মাইলের একটি কৃষি-খামারে, যব, গম আর ভুট্টার চারা লকলক করছে। চাঁদের আলোর ঢেউ খেলছে। প্রকৃতির সবুজ হাত মোলায়েম হয়ে আছে। কত শান্তি। এই সবুজের আড়ালে ওঁত পেতে বসে আছে দুশো মাইনিউটম্যান। ম্যান টু, ম্যান থ্রি, দু'ধরনের মিসাইল। এই তিন নম্বর মানুষ ঘণ্টায় ১৫ হাজার মাইল উড়তে পারে। একটি মাত্র সঙ্কেত, আধঘণ্টারও কম সময়ে সাতশো মাইল উচ্চতার ওপর দিয়ে উড়ে, মেরু টপকে সোজা গিয়ে পড়বে সোভিয়েট রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তুর ওপর।

৬

আর এক পরমাণু বোমা মানুষের ঘৃণা। মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ। পরমাণু বোমা একবারে একলপ্তে মারে। বর্ণবিদ্বেষ মারে ধীরে ধীরে, তিলেতিলে। নিয়তই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাদা চামড়ার হাতে মরছে কালো মানুষ। তাদের হাতে মারা হচ্ছে, তাদের ভাতে মারা হচ্ছে। কে যেন প্রশ্ন করেছিলেন, পৃথিবীটা মানবের না দানবের। ভূপেন হাজারিকার সেই গানটা মনে পড়ছে, মানুষ মানুষকে জীবিকা করে, মানুষ মানুষকে পণ্য করে। সাদা মানুষের হাতে বন্দুক এক সর্বনেশে বস্তু। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ যখন হইহই করে আফ্রিকার বুকে গিয়ে চেপে বসল, সেই ১৮৯৮ সালে অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ লেখক হিলেয়ার বেলক সুন্দর একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার দৃশ্যকল্পটি ছিল এই রকম। এক ইংরেজ ভাগ্যান্বেষী একদল মারমুখী আফ্রিকাবাসীর সামনাসামনি হয়ে ভাবছে : Whatever happens. We have got/ The Maxim gun and they have not.

হিরাম ম্যাকসিম ছিলেন এক আমেরিকান ভদ্রলোক। হিরামের ভাই হাডসান ছিলেন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন টর্পেডোর বারুদ। তার নাম দিয়েছিলেন ম্যাকসিমাইট। এই ম্যাকসিমাইট ইওরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ভাগ্য ফিরিয়েছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার হয়েছিল।

বর্ণবিদ্বেষের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন দক্ষিণ আফ্রিকা। এক কোটি দশ লক্ষ মানুষের একটি সুন্দর ভূখন্ড। প্রকৃতির দানে ভরপুর। এর মধ্যে পঁচিশ লক্ষ হলো সাদা মানুষ। এই জনসংখ্যার পাঁচের তিন অংশের ভাষা হলো আফ্রিকান, আর বাকি দুভাগের ভাষা হলো ইংরেজি। দশ লক্ষ মানুষ হলো বর্ণসঙ্কর। সাদা আর কালোর মিশ্রণ। বাকি সব খাঁটি কালো আফ্রিকান, আদিবাসী আফ্রিকার বিচারে জোহানেসবার্গ বিশাল এক শহর। সাত লক্ষ মানুষের বসবাস। সুন্দর ঝকঝকে অত্যাধুনিক শহর। কিছু হাঘরে বস্তিবাসীও অবশ্য আছে। ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে উমজিমুকলু নদী। দু পাশে ভেঙে পড়া মানুষের কান্না শুনতে শুনতে, ও নদীরে!

আকাশের চাঁদ একদিন একটি পোকাকে ধরে বললেন, তুমি তো বেশ উড়তে পারো আমার একটা কাজ করে দেবে? ছোট্ট কাজ। তুমি তোমার ছোট্ট ডানা মেলে উড়ে যাও। কোথায় যাবে? ওই যে দেখছ একটা দেশ। ওই দেশের নাম দক্ষিণ আফ্রিকা, তুমি ওইখানে উড়ে যাও। ওখানে গিয়ে দেখবে, অনেক মানুষ বড় যন্ত্রণায় আছে। তাদের গায়ের রঙ কালো। তুমি ওদের গিয়ে বলো, চাঁদ তোমাদের একটা বার্তা পাঠিয়েছে। কি বার্তা? ভালো করে শোনো। তুমি বলবে, 'আমি যেমন মরে যাই, আবার মরে গিয়েও বেঁচে থাকি, ওরাও যেন সেই রকম, মরে যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার মতো যেন মরে গিয়েও বেঁচে থাকে।' পোকা বললে, আচ্ছা। সে বার্তা নিয়ে চলেছে। হঠাৎ পথে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক খরগোসের। খরগোস জিজ্ঞেস করলে, 'পোকাভাই কোথায় চলেছ, কি কাজে, অমন হন্তদন্ত হয়ে?' পোকা খরগোসকে সব কথা বললে। 'আমি চাঁদের বার্তাবাহী।' খরগোস বললে, 'তুমি তো জোরে হাঁটতেই পারো না। তুমি এইখানে থাকো। আমি যাচ্ছি, আমি গিয়ে বলে আসছি।' পোকাকে ফেলে খরগোস দৌড়ল। খরগোস গিয়ে বললে, 'ভাইসব শোনো, চাঁদ বার্তা পাঠিয়েছে

তোমাদের। চাঁদ বলেছে, চাঁদ যেমন মরে যায় আর মৃত্যুর পর তার আর কিছুই থাকে না, তোমরাও তেমনি মরে যাও, মরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও।' এই উল্টো কথাটি বলে খরগোস সোজা ফিরে গেল চাঁদের কাছে। সে যা বলে এসেছে চাঁদকে শোনাল। চাঁদ বললে, 'সে কি আমি যা বলিনি, তুমি তা-ই বলে এলে। তোমার তো ভারি দুঃসাহস।' এই কথা বলে চাঁদ ভীষণ রেগে গিয়ে হাতের কাছে এক টুকরো কাঠ ছিল সেই কাঠ দিয়ে মারলে খরগোসের নাকে। সেই দিন থেকে খরগোসের নাক তাই দুফালা।'

দক্ষিণ আফ্রিকার লোক-কাহিনী মানুষকে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার প্রেরণা যোগায়। চাঁদ যখন আকাশ আলো করে নেই, তখনও চাঁদ আছে। সে চাঁদ কালো চাঁদ। চাঁদ মরেও বেঁচে থাকে, আফ্রিকার কালো মানুষ, তুমিও বাঁচ। খরগোস, সাদা খরগোস যদি চাঁদের নামে মৃত্যুর মিথ্যা বার্তা নিয়ে আসে, মেরে তার নাক ফালা করে দাও।

আগে আমরা রেল কম্পানি সম্পর্কে রসিকতা করতাম। যাত্রী এসে স্টেশানমাস্টারকে জিজ্ঞেস করছেন, 'মশাই বারোটার ট্রেন কটায় ছাড়বে?' অথবা সেই গল্প, এক যাত্রী ঠিক সময়ে ট্রেন এসেছে দেখে গার্ড সায়েবের গোঁফে চুমু খেয়ে বললেন, 'হোয়াট এ পাংচুয়ালিটি?' গার্ড সাহেব আমতা আমতা করে বললেন, 'বাবুজী এ আজকা ট্রেন নেহি, কালকা। রানিং টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স লেট।' আমাদের বিমানও সময় সময় এই খেলাই দেখায়। সুচিত্রাদির সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আমাকে একটি গানের কয়েক কলি শুনিয়েছিলেন, 'কোন খেলা যে খেলবে কখন, ভাবি বসে সেই কথাটাই'। আমার কানে লেগে আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সৃষ্টিকর্তাকে, পরমেশ্বরকে উদ্দেশ্য করে। 'সিসটেম'-ই এখন ঈশ্বর। কোন খেলা যে খেলবে কখন?'

অণু, পরমাণু, বর্ণবিদ্বেষ, সাউথ আফ্রিকা, লিভিংস্টোন, নিউ ইম্পিরিয়ালিজম্ এসব তো মৌচাকে মধুর মতো। রাতারাতির ব্যাপার নয়। কোনওটা অর্ধশতাব্দীর সাধনা কোনওটা শতাব্দীরও প্রাচীন। সামান্য ব্যাপার, একটা লোক কলকাতা থেকে দিল্লি যাবে, সেও যেন নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। লেখার মতো কাহিনী। না, লিখবো বলেই এয়ার লাইনস রশদ যোগালেন। তা ভালোই করেছেন। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে।

বিশ্বরঞ্জনবাবু আমার হাতে বিমানের টিকিটটি তুলে দিয়ে বলেছিলেন, দিল্লি যাবার মর্নিং ফ্লাইট এক মিনিটও দেরি করে না। অনেক সময় আগেই উড়ে চলে যায়। সিক্স ফিফ্‌টিন তো সিক্স ফিফটিন। সেই শুনে দিনের আলো ফোটার আগেই ঘুম থেকে উঠে, সোজা দমদম। সবে ভোর হচ্ছে। আকাশে মুক্তো রঙের আলো। মন খুবই বিষণ্ণ। প্রায় মেরে ধরে পাঠানো হচ্ছে। কোথাও যাওয়া মানেই জীবনের অভ্যস্ত রুটিন একেবারে এলোমেলো। অভ্যাসের বাইরে যাওয়া অনেকটা মরে যাবার মতো। আমার মনে আছে চীন যে বছর বললেন মানসে প্রথম কয়েকজনকে যেতে দেওয়া হবে তখন আনন্দবাজারের শ্রদ্ধেয় সম্পাদকের মনে হলো আমাকে পাঠালে হাল্কা শরীরে যা হয় একটা করে আসতে পারবো। আমার সহকর্মী বন্ধু সুদেব রায়চৌধুরী দৌড়-ঝাঁপ করে, পাসপোর্ট-ফর্ম এনে, উপর-মহলের সইসাবুদ করিয়ে পাসপোর্ট অফিসে জমা দিয়ে এল। আমার লেখক-বন্ধু প্রখ্যাত সমরেশ মজুমদার পাসপোর্টের 'ডেলিভারি উইদাউট টিয়ার্স' সম্ভব করলেন। ওদিকে আইনের জট যতো খুলতে থাকে, আমার মুখও তত শুকোতে থাকে। এক গাদা ভ্রমণ-কাহিনী আষ্টেপৃষ্ঠে পড়ে আমার বদ্ধমূল ধারণা হলো, আমি আর ফিরছি না। সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের কৈলাসে কেলেঙ্কারির মতো একটা কিছু হবে। লিপুলেখ পেরোবো আর হুহু বাতাসে হড়কে সোজা তুষার-সমাধি। বড়লোকদের উইল করার মতো অনেক কিছু থাকে। আমার কিছু কলম আছে, সেই কলমগুলোই মনে মনে উইল করে, কাকে কাকে দেওয়া যায় ঠিক করে ফেললুম। আমার হিতাকাঙ্ক্ষীরা আনন্দে লাফাচ্ছেন, তোমার কি ভাগ্য। উঃ কতকাল পরে মানসের পথ খুলল, আর সেই পথে তুমি ভাগ্যবান। আর আমার মনে ক্রেডল ড্রাম সহ কীর্তন চলেছে, হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করেছে।

শেষ পর্যন্ত মানসে যাবার পারমিসান মিলল না। পাসপোর্টটা রয়ে গেল স্ট্যাটাস সিম্বল। বছরের পর বছর যায় পাসপোর্টের পরমায়ু কমতে থাকে। সেকালের বড় মানুষের দোনলা বন্দুকের মতো। ছেলেবেলায় যে পথের ধারে আমার বাড়ি ছিল সেই পথ ধরে মানুষকে থানায় যেতে হতো। ডিসেম্বর

মাস এলেই সারা দিন জানালার ধারে বসে থাকতুম। একের পর এক বড়লোক চলেছেন থানায়। কাঁধে বন্দুক। এক নলা, দো নলা। লাইসেন্স রিনিউ করাতে। বছরে একবারই ওই বন্দুক বেরতো দিবালোকে। আমার কাছে ওই দুটো তিনটে দিন ছিল উৎসবের মতো। এখনকার ভিন্টেজ কার র‍্যালির মতো বন্দুকের শোভাযাত্রা। এখন আর দেখা যায় না। সোস্যালিজমে জমিদার গেছে ভুঁড়িদার বেড়েছে। বাঘমারা বন্দুকের বদলে মানুষ মারা কল এখন ছেলেছোকরার ট্যাঁকে ট্যাঁকে। তার আবার আদুরে নাম হয়েছে, চেম্বার।

আমার পাসপোর্টটার সেই হালই হয়েছিল। মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। এবারেও উদ্ধারকর্তা হলেন আমার বন্ধু সুদেব। যে সব বাধায় পানাপুকুরের ধারে আমার অভ্যস্ত জীবন অবিচল থাকতে পারত সেসব বাধা সরাবার জন্যে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা এবার কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন। ভিটেছাড়া তোমাকে করবই। সেই চন্ডীর শ্লোকে আছে, দেবীকে দেবতারা নানা আয়ুধে ভূষিত করছেন। কেউ দিচ্ছেন খড়্গ, কেউ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, চক্র, শূল। আমারও সেই অবস্থা, পি আই বি দিলেন নমিনেশান, সাগরদা দিলেন পারমিশান, সুদেব দিলেন পাসপোর্ট, অভীকবাবু দিলেন ফরেন একসচেঞ্জ, বিভূতিবাবু সারাদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এক ঠ্যাঙে খাড়া থেকে অবশেষে অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস থেকে এনে দিলেন ট্র্যাভলার্স চেকে ডলার। অরূপবাবু দিলেন মনোবল। শেষ পর্যন্ত আমি দশভুজ বাবা দুর্গা।

আমার তো ঘোড়ার ডিম কিছুই ছিল না। কেবল জনে জনে জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁ মশাই, লন্ডনে ক ডিগ্রি সেলসিয়াস! সেলসিয়াস, ফেলসিয়াস ভুলে একটু সাজপোশাকের ব্যবস্থা করুন, বললেন অরূপবাবু। ঘ্যান ঘ্যান না করে গরম কাপড়ের গলাবন্ধ একটা মন্ত্রীকোট। ওসবের মধ্যে না গিয়ে আমার সহকর্মী বন্ধু রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে একটা উইন্ডচিটার কিনলাম। সেই দিশী বায়ু-কান-পরিধেয় হিথ্রোতে আমাকে কি রকম ইনসাল্ট করেছিল, সে গল্প পরে।

সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত সুদেব আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমার মতো বিশাল এক প্যাঁটরা নিয়ে বিদেশ যেও না। ট্র্যাভ্‌ল লাইট। আমার জামাইবাবুর পরামর্শে, তাঁরই দেওয়া বিশাল এক জগদ্দল নিয়ে গিয়ে আমি যা ফাঁপরে পড়েছিলুম। সুদেব ফ্রান্সে একটা সুন্দর হাল্কা এয়ারব্যাগ কিনেছিলেন, সেই ব্যাগটা আমাকে এনে দিলেন। তবুও বাজার ঢুঁড়ে আমি একটা ব্যাগ কিনলুম। সে ব্যাগ আবার তিন কিস্তির ছোট গল্পের মতো। প্রথম কিস্তির পর দুটো ক্রমশ। ফাস্টনার টানলে দ্বিতীয়, তৃতীয়। তলায় আবার চারটে চাকা। ওই ব্যাগও আমাকে বিপদে ফেলেছিল। অনেকটা দড়ি বাঁধা কালীঘাটের পাঁঠার মতো তার ব্যবহার। টানলে, সে ঘাড় কাত করে উল্টো টান মারতে থাকে। কি রে আয়। তুই বলির পাঁঠা নোস, আমার সাড়ে 'বশো টাকা দামের গুড়গুড়ে চাকা লাগানো ব্যাগ। উইন্ডচিটারের চিটিং ব্যাগের বিটিং, কখনও কখনও বাইটিং, সে গল্প আমি যথা সময়ে বলব।

যা আমাকে মুগ্ধ করেছে, তা হলো আমার সহকর্মীদের সহযোগিতা আর ওপরঅলাদের ভালবাসা। যাবার কয়েক দিন আগে অভীকবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরেন একসচেঞ্জ কত নিয়ে যাচ্ছেন?'

'ওই যে নিয়ম অনুসারে যা দেয়, পাঁচশো ডলার।'

'তার মানে? পাঁচশো ডলারে হবে? টুপি উল্টে ভিক্ষে করবেন নাকি? আপনি আরও বেশি পাবেন।'

তাঁর শেষ মুহূর্তের ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত আটশো, না সাড়ে আটশো ডলার পেলাম। পাঁচশো ডলার নিয়ে গেলে সত্যিই আমাকে গান গেয়ে ভিক্ষে করতে হতো। অরূপবাবু বললেন, 'আমি আমার টেলারকে ডেকে পাঠাচ্ছি, দু দিনে দু প্রস্থ স্যুট বানিয়ে দেবে। সাগরদাকে যেই বললুম, নাকে কেঁদে, আমার পুজোর লেখা। তিনি বললেন, 'অনেক সময় আছে। ইউ আর টু গো, ইউ মাস্ট গো।' অরূপবাবু বললেন, 'আপনার জন্যে আনন্দলোকের একটা ফর্মা ধরে রাখা হবে।'

বিদেশ যাওয়াকে উপলক্ষ করে এই সব শ্রদ্ধেয় মানুষের যে ভালবাসা পেলাম, তা আকাপুলকোর অ্যাটলান্টিকের উত্তাল ঢেউকে হার মানায়। আর বাড়ির লোক আমার স্বভাব জানে। তারা বলেছিল, এবার যদি না যাও, তোমাকে ওই বিদেশ বাসের ক'দিন আমরা বাড়ি ঢুকতে দোব না।

আমার সেই তিন কিস্তি ব্যাগ সমেত কাক ভোরে গাড়ি এয়ারপোর্টের সামনে ফেলে দিয়ে হাত নেড়ে চলে গেল। আমি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের কাউন্টারের সামনে জয় মা বলে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্যাগ জমা করে বোর্ডিং-পাস নিয়ে চলে আসার সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, ব্ল্যাক বোর্ডে

খড়ি দিয়ে লেখা, এগারোটা পনের।

'হ্যাঁ মশাই, ওটা কি? এগারোটা পনের?'

ভদ্রলোক তাঁর নিথর গাম্ভীর্য এতটুকু আলগা না করে বললেন, 'ছটা পনের-র ফ্লাইট আজ এগারোটা পনের মিনিটে ছাড়বে।'

'সে কি? এখন তো সবে পাঁচটা পনের! এতক্ষণ আমি কি করব?'

ভদ্রলোক বলতে পারতেন, 'ভ্যারেন্ডা ভাজবেন।' তা না বলে, 'বাড়ি যদি কাছে হয় তো ঘুরে আসুন, সাড়ে দশটা নাগাদ এলেই হবে।'

সেই বোর্ডিং-পাসটা বুক পকেটে নিয়ে বিমান বন্দরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। প্রথমেই বাধা। ওদিকে দিল্লিতে, শ্যামলদা, সাংবাদিক শ্যামল চক্রবর্তী অসম্ভব রেগে আছেন। রেগে থাকারই কথা। আমার যাওয়া উচিত ছিল আরও তিন দিন আগে। এই তিন দিন তিনি আমার হয়ে নানা জায়গায় প্রক্সি দিয়ে চলেছেন। প্রেস কনফারেন্সে, প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরোতে। আজ বেলা বারোটায় আবার একটা প্রেস-কনফারেন্স আছে। তা ছাড়া আমার এখনও মেক্সিকো যাবার ভিসা করানো হয় নি। মেকসিক্যান এমব্যাসিতে গিয়ে ভিসা করাতে হবে। শ্যামলদা একা কত দিক সামলাবেন।

বাইরে বেরিয়ে ভাবছি, এখন কি করা যায়! আমার সংস্কার বলছে, বাধা যখন পড়েছে, তখন আর যাবার দরকার নেই। ফিরে চলো আপন ঘরে; কিন্তু মালপত্র সমেত আমার ব্যাগটা যে এয়ারলাইনসের জিম্মায়। বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। ইতিমধ্যে কত লোক কত দিকে চলে যাচ্ছে। প্লেন উঠছে, নামছে। বিমানবন্দর ক্রমশই ব্যস্ত হয়ে উঠছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় দেখি, বেমক্কা একটা জায়গায় পার্ক করে রাখা একটা গাড়ি ঘিরে বন্দর-কর্মীদের খুব জটলা। পুলিসও এসে পড়েছে। গুটিগুটি এগিয়ে গেলাম। সর্বনাশ, এই গাড়িটা করেই তো আমি এসেছিলাম। চালক গেল কোথায় গাড়ি লক করে! কেউ বলছেন, চাকার হাওয়া খুলে দাও। কে একজন ছুটে গিয়ে বিশাল একটা স্টিকার নিয়ে এলেন, তাতে ছাপার অক্ষরে বড় বড় করে লেখা, ইউ হ্যাভ পার্কড ইন এ রং প্লেস। স্টিকারটা সামনের উইন্ড স্ক্রিনে লাগাতে হবে। সমস্যা, স্টিকার আছে, আঠা নেই। আঠার খোঁজে আর একজন দৌড়লেন। ফিরে এলেন, প্লাস্টিকের গেলাসে এক গেলাস জল নিয়ে। স্টিকারটা যিনি এতক্ষণ দু'হাত দিয়ে উইন্ড স্ক্রিনে চেপে ধরে রেখেছিলেন, তিনি জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললেন। তখন আর একজন পরামর্শ দিলেন, এক কাপ চা নিয়ে এস। চায়ে ভিজিয়ে লাগাও। যিনি জল এনেছিলেন তিনি বিশুদ্ধ বাঙলায় বললেন, 'হ্যাঁ. ওটাও মায়ের ভোগে যাবে।'

সম্মানজনক দূরত্বে দাঁড়িয়ে, আমি এই সব দেখছি, আর মনে মনে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। ছি ছি, এ যেন পাবলিক প্লেসে বড় বাইরে করে ফেলা। এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে ঘ্যাঁচ করে কিছুটা দূরে দাঁড়াল। পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্লাস্টার করা একটা পা।

৭

গাড়ি থেকে নেমে এল আমার বন্ধু দিলীপকুমার। বোম্বের দিলীপকুমার না হলেও কলকাতার ফেমাস ছেলে। স্বামী বিবেকানন্দ দেহে থাকলে এমন ছেলেকে দেখলে আনন্দে দুহাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিতেন। সুন্দর সুঠাম চেহারা। বড় বড়, টানা টানা চোখ। সামান্য মায়োপিক। তাই চোখে উঠেছে কালো ফ্রেমের ভারি চশমা। সে আর কি করা যাবে! যে দেশে ঘিতে ঘি নেই, তেলে তেল নেই, শুধু আমাদের তেলানি আছে, সে দেশের যুবক রাতকানা হলেও কিছু করার নেই। দিলীপকে দেখে যে কোনও মেয়েরই মতিভ্রম হতে পারে। দিলীপের হয় না। ব্যাচেলার থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সমাজসেবায় নেমে পড়েছে। ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া পরে না। যে কোনও অবস্থাতেও মুখের হাসি মেলায় না। প্রাণখোলা হাহা হাসির জন্যে দিলীপ বিখ্যাত। 'অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস' হলো দিলীপের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

দিলীপ আমাকে দেখতে পায় নি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ট্যাক্সির সামনের দিকে এসে ভাড়া মেটাতে ব্যস্ত। কথা ছিল দিলীপ আমার জন্যে আসার পথে একটা সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি দিলীপকে তুলে নিয়ে আসবো। আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে সাঁ সাঁ করে চলে এসেছি। দিলীপকে তোলার জন্যে ঘুর পথ আর ধরিনি। ভাড়া মিটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। দিলীপ যেন ভূত দেখছে। 'এ কি আপনি? এখানে দাঁড়িয়ে? যাবেন না?' ঘাড়ে ঘাড়ে তিনটে প্রশ্ন করেই সেই বিখ্যাত হাহা হাসি।

'পাটা গেল কি করে?'

'অন্ধকারে খোলা ম্যানহোলে ঢুকে গিয়েছিল।' আবার সেই হাসি!

'দিলীপ আমি বাড়ি যাবো।'

'বাড়ি যাবেন? কেন কিছু ফেলে এসেছেন? পাসপোর্ট, টিকিট?'

'সব ঠিক আছে। তবে এগারোটার আগে প্লেন উড়বে না। অতক্ষণ আমি কি করবো?'

দিলীপের সঙ্গে কথা বলছি, চোখ পড়ে আছে গাড়ি আর গাড়ি ঘিরে জটলার দিকে। একজন পুলিস এসে ততক্ষণে গাড়ির গায়ে হাত বোলাতে শুরু করেছে। একবার যদি জানতে পারে ওই গাড়িতে আমার শুভাগমন ঘটেছে তাহলে কি যে হবে! পালাতেও পারছি না, এগোতেও পারছি না সাহস করে। রাজধানীর বদলে শ্রীঘরে গিয়েই না বসে থাকতে হয়।

হঠাৎ আমাদের সামনে গুড় গুড় করে একটা স্কুটার এসে থামল। হেলমেটধারীকে আমি চিনতে পারলাম না। দিলীপ ভাঙা পা নিয়েই নেচে উঠল, 'আ গিয়া, আ গিয়া।'

ছেলেটি দিলীপের বন্ধু। বেলেঘাটা থেকে ছুটে এসেছে। দিলীপের আদেশে। অফিস টফিস কামাই করে। ইতিহাস রচনা করবে। সে আবার কি? ছবি তুলবে। বিভিন্ন পর্যায়ের। এয়ারপোর্টের সামনে আমরা। ভেতরের লাউঞ্জে আমরা। টারম্যাকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলা। সিঁড়ি বেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বিমানে ওঠা। চিত্রতারকাদের বেলায় যেমন হয় আর কি! কোনও পত্রপত্রিকার প্রতিনিধি তুলবেন না, আমাদের সময় আমরাই ধরে রাখবো ফ্যামিলি অ্যালবামে। তারপর অনেক অনেক বছর পরে আত্মীয়-স্বজনদের দেখাতে দেখাতে, চিবিয়ে চিবিয়ে আধো ইংরেজি আধো বাঙলায় বলা হবে, হোয়েন আই ওয়াজ ইন মেরিকা উইথ পি এম. ইউ নো। তখন আমার একটা মোটা ঝুমকো স্পিৎস কুকুরকা মাফিক ন্যাজ নিকালা।

অ্যামেচার আর প্রোফেসানালে এই তফাৎ। অ্যামেচারদের ক্যামেরার অ্যাঙ্গল আর ফোকাস ঠিক হতে হতে মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, চোখ দুটো বড় হতে হতে ছানাবড়া হয়ে যায়। মারো ভাই, ফটাফট মারো। যা হয় হোক না একটা কিছু। মাঝে মাঝে টেরিয়ে তাকাচ্ছি গাড়িটার দিকে। আইনও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ওখানে যাঁরা দাঁড়িয়ে তাঁরা এখন গাড়িটার গায়ে হাত বোলাচ্ছেন। যেন আদর করছেন।

এই টেরাবার জন্যে, পরে যখন ছবির কপি পেলাম, তখন দেখি সব ছবিতেই আমার ট্যারা চোখ। তা মন্দ না। ছবি তোলার মনে হয় নেশা আছে। শেষ যেন আর হতে চায় না। দিলীপ, এ কি ভাই ক্ল্যাসিক্যাল গান! শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না! না চাইনিজ নুডল্স! একবার মুখে ঢোকালে, বিশ বাইশ ফুট না ঢোকালে শেষ দেখা যায় না!

দিলীপ বললে, হয়ে এসেছে, পুরোটা একসপোজ না করলে আজই ডেভোলাপ করতে দেবে কি করে! ক্যামেরাটা যে ধার করা।

হঠাৎ দেখি আমার সেই চালক বেশ খোশ মেজাজে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির দিকে এগোচ্ছে। গাড়ির কাছে গিয়ে এমন একটা ভাব করলে, যেন স্বপ্ন দেখছে। খুব ক্যাচারম্যাচার শুরু হয়ে গেল। আমাকে এখনও দেখতে পায় নি। আমি দেখেও দেখছি না। শেষে মনে হলো সে দু কানে হাত ছোঁয়ালো। তারপর দরজার লক খুলে উঠে বসল গাড়িতে। গাড়ি স্টার্ট করে আমার কাছাকাছি আসতেই, নাম ধরে ডাকলাম। ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

'এ কি, আপনি গেলেন না?'

'তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?'

'আমি তো ওই তিন তলায় ছিলাম। আপনাকে বাই বাই করে হাত নেড়ে তবেই তো নেমে এলাম। সত্যিই আপনি যান নি!'

'কি জানি! তুমি যখন বাই করে এলে তখন নিশ্চয় গেছি। এখন চলো বাড়ি যাবো!'

'আপনি লন্ডন যাবেন না!'

'পরে যাবো।'

গাড়ি চালাতে চালাতে আমার চালক বললে, 'আমি তাহলে কাকে হাত নাড়লুম। প্লেনটা উড়ে গেল।'

বেচারা বেশ ধাঁধায় পড়ে গেছে। সেই জট ছাড়াতে ছাড়াতেই বাড়ি এসে গেল।

সবাই অবাক। 'কি হলো ফিরে এলে?'

'প্লেন আপাততঃ প্লেনেই থাকবে। আবার দশটা সাড়ে দশটার সময় চেষ্টা করবো। এখন রান্না চাপাও।' এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি আর পুলিস যে-ভাবে গাড়ি দেখছিল, আমি সেই ভাবে বাড়ি দেখতে লাগলাম। নিজের বাড়িতে ফিরে আসার অনুভূতি কি সুন্দর! ঝট্ করে একবার ছাদে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম দূর আকাশের দিকে। আমার পোষা বেড়াল ঘোষালদের বাড়ির কার্নিশে বসে আছে খুপ্‌পি মেরে। বল্‌গা বাঁশের আগায় লাল কাপড়ের ফালি বেঁধে, নাচিয়ে নাচিয়ে পায়রা ওড়াচ্ছে। দুটো সাবু গাছের ফাঁকে গঙ্গার জল চিকচিক করছে সকালের রোদে। আমি যে-স্কুলে পড়তাম সেই স্কুলের মাঠের বিশাল অর্জুন গাছ, গত কয়েক দিন আগের বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে, পাতায় রোদ পড়ে মনে হচ্ছে, ইস্পাতের পাতা। চারপাশে যা দেখছি সব আমার। আমার নিজস্ব। এই সব ছেড়ে কোথায় এখন যেতে হবে আমাকে, একটু পরে। সেখানে আমার গঙ্গা নেই, একশো বছরের প্রাচীন কালী-মন্দির নেই। জেলেপাড়া নেই। বাঁধানো বটতলা নেই। আমার কুকুরটা রোজ সকালে আমার সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরোয়। আমার পুষি রোজ আমার খাবার সময় হ্যাংলামো করে।

নেমে এলাম ছাদ থেকে। ভাগ্যিস, মরে গেলে মানুষ মরে যায় তাই, তা না হলে চির বিদায়ের মুহূর্তে ভেউ ভেউ করে কাঁদত। যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন তাঁদের মনের অবস্থাই বা কি হয় কি হয়, আমি এখন বুঝতে পারছি না। একেবারে যা-তা হয়ে যায়। যাক বরাতে ডাল ভাত মাপা ছিল, তাই জুটল। বাঙাল বিশেষতঃ সেকেলে বাঙালী হলে বেশ মজা। মনটা এমন তুলতুলে হয়! অনেক রকম সেন্টিমেন্ট, দুর্বলতা, ভয় ভীতি নিয়ে কখনও চোখের জল, মন কেমন, উৎফুল্ল আনন্দ।

আবার ঘনিয়ে এল বিদায়ের সময়। এবার ফিরাও মোবে বললেও, ফেরাবার নেই কেউ। দ্বিতীয় যাত্রায় বাড়তি সঙ্গী হলো, আমার সেই শ্যালিকার সোয়েটারের শ্যালিকা। বললে, আমার পয়ে, এইবার প্লেন উড়ে যাবে। দল এত ভারি হলো, আমার ভাই, মেয়ে, সব মিলিয়ে, ইচ্ছে করলে মিছিল কবা যায়। ভিসিকে ঘেরাও করা যায়। গাড়ির পেট ফুলে যাবার মতো অবস্থা।

আবার এয়ারপোর্ট। সকালে ছাড়ার ব্যবস্থা ছিল ইন্টারন্যাশনাল থেকে। বেলায় সরে এসেছে ডোম্যাস্টিকে। সেখানে কাউন্টার আছে দিল্লি নেই। 'দিল্লি ফ্লাইট···।'

কথা শেষ কবতে দিলেন না ভদ্রলোক, 'এনকোয়ারিতে জিজ্ঞেস করুন।'

'এনকোয়ারি দিল্লি?'

ভদ্রমহিলা ব্ল্যাকবোর্ড দেখিয়ে দিলেন। বোর্ডে লেখা, প্লেন উড়তে আরও দেরি হবে। একটা তিরিশ। বাজে সাড়ে দশ। এইবার কি হবে! আর তো ফেরা যায় না। ফিরে গেলে পাড়ার লোক নিন্দে করবে। আমার চেয়ে এয়ারলাইনসের অপমান বেশী হবে। সারা সকাল চেষ্টা করে একটা প্লেন ওড়াতে পারলে না। গাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা সব লাউঞ্জে বসে পড়লুম। কত কত দিকে প্লেন উড়ে যাচ্ছে। যাত্রীরা সব আসছেন, চেক ইন করাচ্ছেন। সিকিউরিটি চেকে ঘোষণা হচ্ছে। যে যার চলে যাচ্ছেন। আর আমার এমন বরাত! যাঁরা তুলে দিতে এসেছিলেন তাঁদের ধৈর্যে ফাটল ধরছে। এপাশ ওপাশ ঘোরাঘুরি করছেন। এইভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর, ঠিক হলো চা খাওয়া যাক।

ধারণা ছিল না, হাওয়াই চা কি বস্তু। হাল্ডা একটা কাপে, নেংটি ইঁদুরের মতো কি একটা ডুবে আছে। ন্যাজের বদলে লম্বা একটা সুতো বাঁধা। এর নাম টিব্যাগ। সেই ব্যাগ থেকে যে নির্যাস বেরলো, তার স্বাদ বিলিতি জিভে। দিশি জিভে পানসে গরম জল। আর ওই পাঁচনের দাম যা, শুনে অক্কা পাবার অবস্থা। চা পানে মানুষ সবল হয়, আমি দুর্বল হয়ে পড়লুম। অনেক টাকা চোট হয়ে গেল। বৃদ্ধাদের যেমন জপের মালা, যুবতীদের সেইরকম সোয়েটার। আমার শ্যালিকা বুনতে বসে গেছে।

কুটুস কুটুস কাঁটা ঘুরছে। ঠাকুর বলতেন, যোগীর চোখ দেখলেই বোঝা যায়। পাখি যেন ডিমে তা দিতে বসেছে। সোয়েটার বোনাও এক ধরনের যোগ। এই যোগে বসলেই মানুষ পরিবেশের বাইরে চলে যায়। দিল্লি, বোম্বাই, কাবুল, কান্দাহার সব একাকার! সহনশীলতা, ধৈর্য, ক্ষমা, আদরণীয় সমস্ত গুণ বেড়ে যায়। সোয়েটার বুনছে, আর মাঝে মাঝে ফ্যালফ্যাল করে এপাশে ওপাশে তাকাচ্ছে। লাউঞ্জে লোক থইথই। স্বদেশী, বিদেশী। মাইকে ইংলিশ মিডিয়াম মহিলার দুর্বোধ্য ঘোষণা। আমাকে যাঁরা ওড়াতে এসেছিলেন তাঁদের মুখের চেহারা দেখে নিজেই লজ্জা পেয়ে যাচ্ছি। এই প্রথম বুঝলাম, প্রতীক্ষার রঙ কালো। যেমন রাগের রঙ কালো। এই প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আফ্রিকার তামাম মানুষের রঙ কালো হয়ে গেছে। আমরা অতটা কালো নই; কারণ আমাদের প্রতীক্ষার পুরোটাই বিফলে যায় নি। কিছু না কিছু পেয়েছি। নিষ্ঠুর ভাগ্যান্বেষীরা বারে বারে এসেছে। শক, হূনদল, মোগল, পাঠান, সাদা চামড়া। মেরেছে, লুটেছে, পরাধীন করে রেখেছে। বোলতার মতো, ভিমরুলের মতো হুল চালিয়ে শুষেছে। তবু আমরা সরাতে পেরেছি। আফ্রিকা, বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা আজও বুটের তলায়।

আর একবার এয়ারলাইনসের এনকোয়ারিতে গেলাম। ভদ্রমহিলা জানালেন, কোনও খবর নেই। যা ছিল তাই আছে। খড়িব লেখা এগোয় নি, পেছয় নি, দেড়টাতেই খাড়া আছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'জেনে কি হবে?'

'জানতে ইচ্ছে করে, এই আর কি? জানার ইচ্ছে থেকেই তো জ্ঞান বাড়ে।'

'ওসব টেকনিক্যাল ব্যাপার আপনি বুঝবেন?'

ফিরে এলুম। যে চেয়ারে বসেছিলুম বেদখল হয়ে গেছে। ভীষণ গম্ভীর দর্শন এক ভদ্রলোক বসে আছেন। মনে হয় কোম্পানি একজিকিউটিভ। ওপরঅলার ধমক খেয়ে অথবা অধস্তনদের ধমকাবার জন্যে চলেছেন। বসা আর হলো না। দিলীপ বললে, ক্ষিধে ক্ষিধে পাচ্ছে। আমার দলের সকলেই প্রায় অভুক্ত। কে জানতো এগারোটা পনেরও দেড়টার আগে উড়বে না। চা খেতে গিয়ে বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়ে আমরা বুদ্ধিমান হয়েছি। তদন্ত না করে কোথাও পাতা পেত না। দিলীপ দৌড়লো দোতলার রেস্তোরাঁয়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল শুকনো মুখে। বললে, 'বসলুম। একটা মেনু পুরোটাই প্রায় পড়ে ছাগলছানার মতো লাফাতে লাফাতে নেমে এলুম।'

'চেয়ারে বসার জন্যে মেনুটা পড়ার জন্যে পয়সা চাইলে না?'

'মনে হয় খেয়াল করে নি।'

'এখানে যা কিছু দেখছ, সবই কম্পানি অ্যাকাউন্টের সুরে বাঁধা। নিজের পয়সায় এখানে কেউ কিছু করে না। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। এ হলো গৌরী সেনের কিংডাম।'

দিলীপ আর দলবল বাইরে চলে গেল, সস্তার রেস্তোরাঁর সন্ধানে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরেও এল পান চিবোতে চিবোতে। কথায় বলে উদ্যোগী পুরুষের সামনে ভাগ্যের দরজা খুলবেই। কে জানতো এই ওয়ার্লডেরও একটা আন্ডার ওয়ার্লড আছে। জেট-এজের পাশে কার্ট-এজ। ওপাশে বিমান, এপাশে বয়েল গাড়ি। খুঁজে খুঁজে ওরা একটা ড্যামচিপ পাইস হোটেল পেয়েছে। সেখানে ভাত আর পাবশে মাছের ঝোল না ঝাল কি খেয়ে এল।

একটা তিরিশ বেজে গেল তবু কোনও ঘোষণা নেই। আবার এনকোয়ারি কাউন্টার। এবার একজন পরিচিতা মহিলা। বোর্ডে লেখা ছিল একটা তিরিশ। লেখা মুছে দেওয়া হয়েছে। কালো জমি করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। যেটুকু আশা ওই লেখার মধ্যে ধরা ছিল তাও গেল।

'ব্যাপারটা কি ভাই? বেশ ঘোরালো মনে হচ্ছে?'

'ধরেছেন ঠিক, প্লেনের ডানার একটা অংশ খুলে পড়ে গেছে।'

শুনে মনে হলো আমারই ডানা ভেঙে গেছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হবে তাহলে?'

মহিলা, বেশ লম্বা চওড়া সুন্দর এক যুবককে দেখিয়ে বললেন, 'এই তো ইঞ্জিনিয়ার দাঁড়িয়ে আছেন জিজ্ঞেস করুন।' প্লেন ওড়াবার ইঞ্জিনিয়ার চলে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, 'বোম্বে থেকে রিপ্লেসমেন্ট আনা হয়েছে; কিন্তু ফিট করা যাচ্ছে না। ডায়াগ্রাম মেলাতে পারছি না আমরা।'

'কি হবে তা হলে?'

'কি আবার হবে! বোম্বাই থেকে ইঞ্জিনিয়ার আসছেন। তিনি এলেই ডানায় তালি মারা হয়ে যাবে।

হয়ে গেলেই ঘোষণা হবে। ঘোষণা হলেই গিয়ে বসে পড়বেন। পড়লেই উড়ে যাবে।'

'সেটা কটা নাগাদ হতে পারে?'

'ওই ইঞ্জিনিয়ার এসে ডায়াগ্রামটা মিলিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। ডোন্ট ওয়ারি। ডোন্ট ওয়ারি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি চলে গেলেন। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। দিলীপ হাসছে। এত দুঃখেও তার হাসি অমলিন। বললে, 'ভাববেন না। যা হয় একটা কিছু হবে। হয় দিল্লি, না হয় বাড়ি।' কথা শেষ করে এমন জোরে হেসে উঠল, এখানে পায়রা থাকলে উড়ে যেত ফটাফট।

বাবারে মারে করে তিনটে বেজে গেল। সকালের দিকে যাঁদের সাদা চোখ দেখেছিলাম, তাঁদের চোখ এখন রক্তিম। তার মানে পেটে ইন্‌সপিরেসান পড়েছে। এখন তাঁরা বসে বসেই উড়তে পারবেন। আমাদেরই মহাবিপদ। একবার ওপরে যাই একবার নিচে নেমে আসি। সময় আর সরতে চায় না। কি গেরো বাবা। ওদিকে দিল্লিতে আমার প্রক্সি শ্যামলদাদা রেগে টং হচ্ছেন। আজ বেলা বারোটায় আমার পি আই বিতে হাজির হবার কথা আইডেন্টিফিকেশানের জন্যে। বিমানের বারোটা বেজে গেলে আমি কি করব।

অতি কষ্টে সাড়ে চারটে বাজল। ইনফরমেশানের ব্ল্যাকবোর্ড ফাঁকা। কোনও ভবিষ্যদ্বাণী নেই। এয়ারপোর্ট পোস্টাপিসে ফোনের চাকা ঘোরাচ্ছি। অফিসে খবরটা জানানো দরকার। চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। জানা উচিত ছিল যে শহরে বাস সে শহরে ভাগ্যের চাকা উল্টো ঘোরে। দিলীপ হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল, 'আরে আপনি এখানে, দিল্লি ছেড়ে দিলে।' সঙ্গে সঙ্গে দৌড়। ক্লোজড সার্কিট টিভির পর্দায় সত্যিই লেখা ডেলহি, সিকিউরিটি চেক ফর ফ্লাইট নাম্বার টু নাইন থ্রি।

আমার দলের কে কোথায় ছড়িয়ে আছে জানি না। বিদায় নেওয়া হলো না। সিকিউরিটির খাঁচা গলে সোজা বিমানে। দরজার পাশে খাড়া বিমান-বালিকাদের হাসি হাসি মুখ। এত কষ্টের পরও তাঁদের হাসতে হয়। এ যে হাসিরই চাকরি। আমরা যে যার আসনে বসে পড়লুম। যথারীতি নাকের ডগা দিয়ে ট্রে ঘুরে গেল। কানে তুলো গুঁজে, মুখে লজেন্‌স ফেললুম। আমার পাশে ভদ্রলোক এতই ক্লান্ত যে ঘুমিয়ে পড়লেন। রিমঝিম সেতার বাজছে। ভেতরে অসহ্য গরম। প্লেনের তলার দিকে চ্যাড়চ্যাড় করে একটা আওয়াজ হচ্ছে। ডানায় ওয়েল্ডিং মেশিন চলছে। একটা গরম ভাপ উঠে আসছে তলা থেকে ওপরে। বসে আছি তো বসেই আছি। দুটো লজেন্‌স কখন শেষ! বিমান-বালিকারাও সরে পড়েছেন। আমার পাশের ভদ্রলোক চোখ না খুলেই ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বেনারাস পেরিয়েছে।'

'বেনারাস! এখনও আমরা ড্যাঙাতেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছি।'

'সে কি মশাই!'

তিনি চোখ খুলে, সোজা হয়ে বসলেন। তারপর একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'উড়বে কি উড়বে না!'

এতক্ষণ সব রাগ চেপে বসেছিলেন। এই একটি কথায় ধৈর্যের বারুদে আগুন ধরে গেল। বিমানের নাকের দিকে জনৈক অফিসার এসে দাঁড়ালেন। ইংরেজি উপন্যাস হলে লেখা যেত টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। তিনি আকাশী ইংরেজীতে যা বললেন, তার অর্থ, আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি। আর দোর্বো না। মা কালীর দিব্যি। ডানার জোড় আবার খুলে গেছে। বাপের ভাগ্যি ওড়ার পর মধ্যগগনে খোলে নি। প্লেন কম্যান্ড নিচ্ছে না। আপনারা বরং লাউঞ্জে ফিরে যান। ওড়ার মতো অবস্থায় এলে চিঠি লিখে জানাবো।

বিমান অবতরণের পর সবাই যেমন গম্ভীর চালে মাথা নিচু করে 'অ্যারাইভ্যাললাউঞ্জে' ফিরে আসে, আমরাও সেই রকম ফিরে এলাম। আমার কানে তখনও তুলো গোঁজা। পাশ থেকে দর্শনার্থী কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন ফ্লাইট এলো?' বললাম, 'গ্রাউন্ড ফ্লাইট।'

ভদ্রলোক কি বুঝলেন, কে জানে! শুধু বললেন, 'আজকাল, কত রকম ফ্লাইট যে চালু হয়েছে।'

এতক্ষণে ধৈর্যের বাঁধ সব ভেঙেছে। চেক-ইন কাউন্টারে ফাটাফাটি শুরু হয়ে গেছে। হয় ফ্লাইট ক্যানসেল করুন, নয় বিকেলের ফ্লাইটে জুড়ে দিন। চিৎকার, চেঁচামেঁচি, শেষে ফ্লাইট টু নাইন থ্রি ক্যানসেলড। সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর এক কাউন্টারে মারামারির পটপরিবর্তন। যুদ্ধক্ষেত্র বাঁ থেকে ডানে সরে এল। কাল সকালের ফ্লাইটের জন্যে টিকিট পরিবর্তনের ব্যবস্থা। ছেলেবেলায় আমার এক

বন্ধু মারামারির সময় বলতো, এবার আমি গাঁট চালাবো। তার গাঁট মানে, কনুই। তা ভদ্রবেশী, বিমানযাত্রীরা টিকিট নবীকরণের জন্যে পরস্পর পরস্পরকে গাঁট চালাতে লাগালেন। এ পাশে আর একদল যাত্রী আর এক অফিসারকে চেপে ধরেছেন, রাতে থাকার ব্যবস্থা। তাঁদের জন্যে এয়ারপোর্ট হোটেলে বন্দোবস্ত হচ্ছে।

আমি গাঁটেও নেই, হোটেলেও নেই। একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি আর মনে মনে ভাবছি, খুব হয়েছে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড়। আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

দিলীপরা তিন তলার অবজারভেশান টাওয়ারে ছিল। নেমে এসেছে। এসেই হাহা করে এত জোরে, যাত্রার পতির কোলে সতীর ঢংয়ে হেসে উঠল, এয়ারপোর্ট, এয়ারলাইনস, সবই যেন লজ্জায় ক্ষণিকের তরে ম্লান হয়ে গেল। তার ওই সুন্দব স্বাস্থ্য আর অনিন্দ্য রূপ নিয়ে বাউলের ঢঙ গাইতে গাইতে এক পাক নেচে নিল,

ওড়া কি যায় সহজে
মাটির এমন টান
ও ভোলা মন, মন রে...

কে আবার মুখে একতারা বাজাচ্ছেন—বুঁই। বুঁই।

৮

দিলীপকে বললুম, 'কী হচ্ছে, লোকে কী মনে করবে!'

'কোন্ লোক?'

'এত সব বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের চারপাশে!'

'তাকিয়ে দেখুন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কী করছেন! খামচাখামচি, আঁচড়াআঁচড়ি। সভ্যতা একটা মেকআপ। স্বার্থের উত্তাপে সুন্দরীর গালের মেকআপের মতো গলে পড়ে যায়, বেরিয়ে আসে প্রিমিটিভ ম্যান, এপ ম্যান। দিন টিকিটটা দিন। গুঁতোগুঁতি করে আসি।'

'দু দুবার বাধা পড়েছে। আমি আর যাব না। পরে টিকিট ফেরত দিয়ে যা পাওয়া যায় নিয়ে নোব।'

'টিকিটটা দিন তো। বাধা আবার কি! যত মেয়েলি সংস্কার! আগে কাল সকালের জন্যে কবে আনি তো তারপর দেখা যাবে। এয়ারপোর্ট হোটেলে থাকতে চান?'

'না। হোটেলে থাকতে যাবো কোন দুঃখে!'

'পাঁচ তারা হোটেলে বিনা পয়সায় থাকার সুযোগটা ছেড়ে দেবেন?'

'ভাই আমার বাড়ি যে হাজার তারা হোটেল। বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই, আমি থাকি মহা সুখে অট্টালিকা পরে। তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে। মনে আছে তো বাবুইয়ের উত্তর?'

দিলীপ টিকিট নিয়ে চলে গেল গুঁতোগুঁতির দলে। আমি চলে গেলুম আমার ব্যাগেজ ছাড়াতে। সেই লটবহর তো গলায় লেবেল এঁটে ভোর সাড়ে চারটের সময় সিকিউরিটি চ্যানেল দিয়ে ঢুকে গেছে ভেতরে।

কাউন্টারের সাহেব বললেন, 'সে তো দেওয়া যাবে না। দিল্লি তো আপনাকে যেতেই হবে।'

'আমি যাবো না, আমার মাল খালাস করে দিন।'

'আমার ক্ষমতা নেই। ডিউটি অফিসারকে বলুন।'

ডিউটি অফিসার বললেন, 'চ্যানেলে গিয়ে দাঁড়ান, ঠিক সময়ে এসে যাবে।'

দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে ব্যাগের হদিস আর পাওয়া গেল না। ফিরে এলাম সেই অফিসারের কাছে। তিনি তখন প্রায় ঘেরাও। অনেক লড়াইয়ের পর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। তিনি তাঁর সহকারীকে বললেন, 'ব্যাগেজ ক্লিয়ারেনসের কি হলো!'

সহকারী বললেন, 'সে তো আমরা লক করে রেখে দিয়েছি। পাওয়া যাবে না।'

আর মেজাজ রাখা গেল না। পকেট থেকে আইডেনটিটি বের করে বললুম, 'এটা দেখেছেন? আমি তাহলে কাল সকালের জন্যে একটা স্টোরি তৈরি করি, কি বলেন! ফ্লাইট নাম্বার টু নাইন থ্রি। ভালোই হবে, বেশ ভালো একটা স্টোরি হবে।'

ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে গেলেন। 'কি যে সব করে' বলে তেড়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে টেলিফোনের তারে পা জড়িয়ে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলেন। একজন ধরে ফেললেন। অফিসার একজনকে বললেন, 'এই ভদ্রলোককে নিয়ে গিয়ে ব্যাগেজ ছাড়িয়ে দাও।'

সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে চলেছি। পেছন থেকে এক আমেরিকান ভদ্রলোক বললেন, 'ক্যান ইউ হেলপ মি ইন গেটিং মাই ব্যাগ অলসো।'

আমি বললুম, 'ফলো মি।'

গলিপথ ধরে একটা গোডাউন পেরিয়ে আমরা চলে এলাম বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের কিনারায়। সেখানে জিপসি ওয়াগনের মতো পরপর কয়েকটা ঠেলাগাড়ি দাঁড়িয়ে। সেখানে যে কর্মী দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে আমাদের পথপ্রদর্শক বললেন, 'এই ভদ্রলোকের ব্যাগটা বের করে দাও।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিয়ে নিন, আমি আসছি। আর কোনও প্রবলেম নেই।'

ভদ্রলোক যে দিক থেকে এসেছিলেন, সেদিকেই ফিরে গেলেন হনহন করে।

আমাদের ব্যাগ কর্মী এক নম্বর ওযাগনের দরজা খুলে বললেন, 'দেখে নিন।'

পর্বত প্রমাণ ব্যাগ একের ঘাড়ে আর এক চেপে বসে আছে। আমি বললাম, 'মশাই এ তো গন্ধমাদন, হনুমানও হেরে যাবে বিশল্যকরণীর সন্ধানে।'

কর্মী বললেন, 'রামায়ণ, মহাভারত ছেড়ে খুঁজে নিন, আমি এখুনি লক করে লকারে ঠেলে দোব।'

'এ তো মশাই অসম্ভব ব্যাপার। আপনি নামাবেন না?'

'ইমপসিবল।'

আমার সায়েব বললেন 'ইমপসিবল।'

আমিও বললাম, 'ইমপসিবল।'

তিনটে ইমপসিবল, তিন দিক থেকে এসে ট্র্যাফিক জ্যামের মতো দাঁড়িয়ে গেল মুখোমুখি। আমার সায়েব বললেন, 'ডু সামথিং।' আর কি করবো। আমার করার মধ্যে তো একটাই অস্ত্র আছে, বুক পকেট থেকে প্রেসকার্ড বের করে দেখানো। আমাদের ব্যাগ কর্মী ততক্ষণে একের পর এক ওয়াগনের দরজা খুলে খুলে চলেছেন। এই রকম প্রায় সাত আটটা ব্যাগ ঠাসা গাড়ি। শেষের দরজাটা খুলতে খুলতে তিনি বললেন, 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও একটা একটা করে নামানো সম্ভব নয়। এর থেকেই দেখে নিতে হবে'।

আমার আমেরিকান সায়েব, 'ও গড' বলে তড়বড় করে কাজে লেগে গেলেন। আমি বললুম, 'জয় ভগবান।' আমার চোখের সামনে ব্যাগের পর ব্যাগ, ব্যাগের পাহাড়। কত রকমের যে ব্যাগ হতে পারে, এই প্রথম দেখার সুযোগ হলো। গবেষকরা গবেষণার বিষয় খুঁজে পান না; এই ব্যাগ নিয়ে কত মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা করা যায়! যেমন ছেলে দেখে বোঝা যায় পরিবারের পরিমন্ডল। হ্যাপি ফ্যামিলির ছেলে, না, আন-হ্যাপি-ফ্যামিলির হেলাফেলা বংশধর। শার্লক হোমস যেমন ওয়াটসনকে কুকুর দেখিয়ে পরিবারের অবস্থা বোঝার চোখ তৈরি করতে বলেছিলেন, ইউ ওন্ট সি এ হ্যাপি ডগ ইন এ মোরোজ ফ্যামিলি অর এ মোরোজ ডগ ইন এ হ্যাপি ফ্যামিলি। আমার সামনে কিছু আদরের ব্যাগ, কিছু অনাদরের ব্যাগ। যতদূর মনে হলো প্রথমটায় আমার ব্যাগ নেই। আমার আমেরিকান সায়েবেরও নেই। সায়েব বললেন, 'তুমি অ্যাস্ট্রলজিতে বিশ্বাস করো? ফেট?' 'খুব করি। আগে না করলেও, আজ সকাল থেকে খুব করি।' 'তুমি লটারি করেছ কোনও দিন?' 'দু একবার। লাগেনি কোনও দিন।' 'নাউ লেট আস ট্রাই আওয়ার লাক ইন দি সেকেন্ড ওয়ান।'

সায়েবের বাম্পার লটারি পাবার বরাত বা যোগ কেটে গেল। দ্বিতীয় গাড়ি থেকে ভদ্রলোকের ব্যাগ বেরিয়ে এল। বেশ লোভনীয় চেহারা। জাতে আমেরিকান, তায় বেশ যত্নে থাকে। সায়েব আমাকে একজোড়া থ্যাঙ্কস দিয়ে, ব্যাগ হাতে বুক ফুলিয়ে চলে গেলেন। সেই বিশাল প্রান্তরে, আমি পড়ে

রইলুম একা। আমার পেছনে, দূরে রানওয়েতে একটা প্লেন পড়ন্ত রোদে ঝিমোচ্ছে। তৃতীয়টাতেও আমার ব্যাগ নেই বলেই মনে হলো। চতুর্থটায় পেয়ে গেলুম আমার সেই হারামাণিক। আরও গোটা কতক দামড়া গুন্ডা চেহারার ব্যাগ বেচারাকে প্রায় শেষ করে ফেলেছে। আহা রে, বাছা আমার।

আমার সেই এক রোগ! সেন্স অফ ডাইরেকসনার অভাব। কোন পথে কি ভাবে এসেছি খেয়াল নেই; অথচ ভাব দেখাচ্ছি—আমি এক স্মার্ট গাই। আমেরিকানরা মানুষকে গাই বলে, আমরা বলি গরুকে। গ্যাটম্যাট, গ্যাটম্যাট করে একটা কাঁচের দরজার সামনে এসে বন্দুকধারী প্রহরীকে দেখে বুঝলুম, ভুলপথে আসার কি অসাধারণ প্রতিভা ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন! সেন্ট্রির বিরস বদনের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলুম। যেন আমার কত দিনের দোস্তের সঙ্গে দেখা। দোস্ত হাসি ফিরিয়ে দিলেন না। বন্দুকের অহঙ্কার। তখন ভয় হলো, চ্যালেঞ্জ না করে বসেন ব্যাগ-চোর ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন। ছোট মতো একটা প্যাসেজে ঢুকে পড়লুম। কিছু দূর যাবার পর দরজা। দরজা ঠেলতেই যে ঘরে এলুম, সে ঘরে বড় বড় প্যাকিং বক্স। আর না, কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। বরাতে শ্রীঘর নাচছে। উল্টো দিকে দরজা। ঠেলতেই খুলে গেল। আর দাঁড়ায়। বামে দুপা এগোতেই, চক্ষুস্থির, আরে এ তো সেই সিকিউরিটি চেকিং-এর ঘর। ওই তো সেই মেটাল ডিটেক্টার দিয়ে শরীর পরীক্ষা করার খুপরি। ওই তো সেই হাত ব্যাগ হাত ছাড়া করার কনভেয়ার বেল্ট। ভাগ্য ভালো কেউ কোথাও নেই। চোখ কান বুজিয়ে পেরিয়ে এলুম, জুয়েল থিফের দেবানন্দের মতো। উল্টো পুরাণের মতো উল্টো সিকিউরিটি। লাউঞ্জে এসে হাসি পেয়ে গেল। আমি আর কিছুক্ষণ থাকলে, দমদম বিমান বন্দরের সব ব্যবস্থা উল্টেপাল্টে যাবে!

দিলীপকে আবার খুঁজে পেলুম। বললে, 'কোথায় গিয়েছিলেন এতক্ষণ! আমার টিকিটের কাজ হয়ে গেছে।' একটা ট্যাক্সি ধরে এবার বাড়ি ফেরার পালা। সারা পথে কৈফিয়ত দেবার পালা নেই। মজা হলো পাড়ায় ঢুকে। সন্ধে হয়ে এসেছে। অসংখ্য চেনা মুখ। সকলেরই এক প্রশ্ন, কি ব্যাপার, এর মধ্যে বিলেত ঘুরে এলেন! রকেটে গিয়েছিলেন বুঝি! আর একেবারে যিনি প্রতিবেশী, তিনি বললেন, 'কি আনলেন?'

শ্যালিকাকে দেখিয়ে বললুম, 'এই যে বিলেত থেকে বউ নিয়ে এসেছি।'

একটা লোক বাড়ি ফিরে এল, কোথায় সবাই আনন্দ করবে, নিবু আঁচে পোলাও বসাবে তা নয়। আমি যেন মৃত্যু সংবাদের টেলিগ্রাম ডেলিভারী করতে এসেছি। সবাই সেইভাবে আমাকে নিলে। বিমর্ষ গোবদা মুখ সব। 'যাঃ এবারেও ফিরে এলে?' যেন আজ পরীক্ষার ফল বেরোবার কথা ছিল। ফেল করে ফিরে এসেছি। 'আসলে ওর যাবার ইচ্ছে নেই। ভালো করে চেষ্টা করলে অবশ্যই যেতে পারতো। প্লেনের আবার ডানা খোলে না কি! প্লেন তো ভেঙে পড়ে। সবসুদ্ধু হুড়মার করে পড়ে যায়।' সত্যি পরিবার পরিজনরা খুব চুপসে গেছে। পাড়া প্রতিবেশীর কাছে মুখ দেখাবে কি করে। 'ওরে জল বসা। মুড়িটুড়ি যা হয় কিছু দে খেতে!'

আমি ভাবছি জামাকাপড় বদলে আর লাভ কি! ঘণ্টা কয়েক পরে তো আবার সেই ছুটতে হবে। প্লেন ধরার পাঁয়তাড়া। সাগরদার বাড়িতে ফোন করলুম। হয় তো খাবার যোগাড় হচ্ছিল। আনন্দের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কি ঠিক মতো পৌঁছে গেছ? দিল্লির অবস্থা কি! পি আই বির ঝামেলা মিটেছে।'

'সাগরদা, আমি বাড়ি থেকে বলছি। দিল্লি যেতে পারিনি।'

'অ্যাঁ, সে কি! তুমি তোমার বরানগরের বাড়ি থেকে বলছ?'

'হ্যাঁ, সাগরদা।'

'যাঃ, কি হলো?'

'প্লেনের ডানা খুলে গেছে।'

পুরো ঘটনা শোনালুম। সাগরদা বললেন, 'কাল ভোরে তাহলে আবার চেষ্টা করছ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হাল ছেড়ো না। আমার শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ রইল। জানবে শুরুটা খারাপ হলে শেষটা ভালো হয়।'

রাতটা কেমন যেন হয়ে গেল। মরা মানুষ বেঁচে শ্মশান থেকে ফিরে এলে যেমন লাগে। আমার মনে হলো। কারণ আমি তো মরিনি। মরে বেঁচেও উঠিনি। তবে এ রাত জীবনের অন্য সব রাতের

মতো নয়। আলো জ্বলছে ঘরে ঘরে। কি রকম যেন হল ফেটে। পাশের বাড়ির প্লেয়ারে চটুল গান হচ্ছে। মনে হচ্ছে সবাই মিলে এক সঙ্গে বলছে, বলো হরি।

ভালো ঘুম হলো না। কেউ ডাকার আগেই শেষ রাতে উঠে পড়লুম। অন্ধকার। গাছপালা সব ধ্যানস্থ। ধকধক করছে এক আকাশ তারা। বহু দূরেব কোনও মন্দির থেকে শৃঙ্গারে আরতির শব্দ ভেসে আসছে। শৃঙ্গার আরতি নয়, মা ভবতারিণীর মন্দিরে মঙ্গল আরতি হচ্ছে। বাড়ির ছাদে একা দাঁড়িয়ে আছি। 'শেষ রাতের বাতাস এখনও ওঠেনি। এখনও ক্ষয়া চাঁদ অস্ত যায়নি। দূরে ঝাঁকড়া শিরীষ গাছ। রাতের শিকার ক্লান্ত প্যাঁচা কর্কশ স্বরে দিনের পাখিদের জানাতে চাইছে, আমার হলো সারা, তোমরা এবার শুরু করো। তারাদের সভার পাশ দিয়ে আলোর একটা বিন্দু ধীরে—পূব থেকে পশ্চিমে চলেছে। মানুষের ছাড়া অনেক স্যাটিলাইটের একটি। সন্ধানী চোখ মেলে সরে সরে যাচ্ছে। পৃথিবীর মানুষের সব গোপনীয়তা এখন বৃহৎশক্তির নখদর্পণে। সামনে গঙ্গা। পরপারে আলোর মালা ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। অনেক জেগেছে। বটতলা পর্যন্ত জোয়ারের জল এসে গেছে। পাশাপাশি তিনখানা নৌকো ভাসছে। সাদা একটা বেড়াল থুপ্পি মেরে বসে আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে তার মালিক অপু ঠাকুর মারা গেছে। নাট মন্দিরের সাধু জগৎ জেগে ওঠার আগেই স্নান সেরে নিচ্ছেন।

যে ছেলেটি আমাকে নিয়ে যাবে, সেই সজল কোনও ঝুঁকি না নিয়ে এ বাড়িতেই রাতে শুয়েছিল। বাড়ি জেগে উঠেছে। আমিও তৈরি। আজ সঙ্গী হবে আমার স্ত্রী। কাল যারা ছাড়তে গিয়েছিল তারা সব অপয়া। কথাটা ভাবার মতো। এই রাত আর দিনের সন্ধিক্ষণে যখন সানাইয়ে যোগীরা কি আহীর ভৈঁরো বাজার কথা, এই সময় ছাদের নির্জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মঙ্গল আরতি শুনতে শুনতে ফেলে আসা পঁচিশটা বছরের কথা ভাবলে, মনে হয়, জীবন এক নৌকো, আমরা দু'জনে হাল আর দাঁড় ধরে, ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে দুলতে দুলতে এসেছি। অনেক কষ্ট করেছে আমার সঙ্গে। সহ্য করেছে অনেক। ঠুনকো প্রেম এখন ঢালাই হয়ে জমাট একটা অস্তিত্ব। অনিশ্চিত কোনও যাত্রায় যাবার সময় জীবনের বন্ধন বড় বেশী অনুভব করা যায়। আর কিছুক্ষণ পরে মাথার ওপর এই আকাশটা আর থাকবে না। অন্য আকাশ। চারপাশে এই মুখ আর থাকবে না। অন্য মুখ।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ভোরের আলো সবে ফুটছে। ভি আই পি রোড ধরে কিছু কিছু গাড়ি চলেছে। দেখলেই মনে হয় সদ্য ঘুমভাঙা গাড়ি। সকলেরই লক্ষ্য এয়ারপোর্ট। চেক ইন কাউন্টারে এরই মধ্যে বেশ বড় লাইন তৈরি হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'আজ আপনাদের বিমানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব ঠিক আছে তো। উড়বে তো!'

এই কাজের যাঁরা ভারপ্রাপ্ত তাঁদের আচার আচরণ বিশেষ মধুব নয়। আধাসামরিক, আধাসামরিক ভাব। কারুরই মুখে সুপ্রভাত লেগে নেই। সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'ইয়েস।'

আবার আমার প্রশ্ন, 'কালকেরটাই উড়ছে?'

আবার সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'ইয়েস, ইট ইজ অলরাইট বাই নাও।'

সিকিউরিটি চেকে যাবার আগে প্রিয়জনের কাছে হাত নেড়ে বিদায় নেবার পালা। বাঙালীর বিদায় পর্বে এখনও এই ছিয়াশি সালেও প্রচুর সেন্টিমেন্ট। মন কেমন করা। আমার যাওয়াটাও তো বেশ গোলমেলে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা বড় জটিল। পদে পদে নিরাপত্তার বাঁধন। তাঁর প্রাণ নেবার জন্য একাধিক শক্তি সুযোগ খুঁজছে। সেই দলে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, বিশাল দুই সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়া তেমন নিশ্চিত ভ্রমণ বলা যায় না।

আজ আর কোনও গোলমাল নেই। রাইট টাইমে ডানা জোড়া বিমান আকাশে ভেসে পড়ল। আমার পাশের যাত্রীর সঙ্গে নিমেষে আলাপ হয়ে গেল। বড় ভাল ছেলে। নাম অগ্নিহোত্রী। আজকাল অনেক নতুন নতুন বিষয় হয়েছে। অগ্নিহোত্রী এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। রাঁচী থেকে দিল্লি চলেছে। গল্পে গল্পে দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের গেস্ট হাউস, গঙ্গারাম হসপিট্যাল মার্গ। যথারীতি ঠকার পালা। রাম সেই সময় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিলেন। এখন রাবণের যুগ। কথায় কথায় সীতাহরণ। আর সব লক্ষ্মণই ছুটছেন সোনার হরিণের পেছনে। রাম একালে হেরে ভূত। পঞ্চাশটাকার পথ পঁচাত্তরে পেরিয়ে এলাম। রাজধানীতে রাজার সিংহাসনের তলায় কি না হচ্ছে! সারা দেশ জুড়ে এখন একটাই ইরাপসান, নাম তার করাপসান। সন্ধের দিকে এমন একজন স্কুটার আর ট্যাক্সি ড্রাইভার পাওয়া যাবে না, যার মুখ দিয়ে না ভড়ভড় করে অ্যালকোহলের গন্ধ বেরোচ্ছে। তবে হ্যাঁ পুলিশ খুব কড়া।

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি বেরোয় পুলিস চৌকিতে নম্বর লিখিয়ে।

আমি যখন দিল্লিতে তখন জুলাইয়ের শেষ। কয়েক দিন আগেই মারদাঙ্গা হয়ে গেছে। বিস্তীর্ণ এলাকায় কারফিউ চলেছে। তিলক নগর, প্যাটেল নগর, জনকপুরি, চাঁদনীচৌক। গেস্টহাউসে বসতে না বসতেই, শ্যামলদা এসে গেলেন। চলুন পি আই বি। আমি আগেই হাত তুলে সারেন্ডার করেছিলাম। বকবেন না। দোষ আমার নয়। দোষ এয়ারলাইনসের।

শ্যামলদা বললেন, 'আমি আর কি করবো। আসল বকুনি হবে যেখানে যাচ্ছি সেখানে।'

দক্ষিণ ভারত মন্দিরের জন্যে বিখ্যাত। কলকাতা বিখ্যাত খোঁড়াখুঁড়ি আর গর্তের জন্যে, বোম্বাই বিখ্যাত স্লামস-এর জন্যে দিল্লি বিখ্যাত রাস্তার জন্য। ফর্দাফাঁই রাস্তা। সাঁসাঁ ছুটছে গাড়ি, অটো, বাস। স্কুটার ছাড়া দিল্লি অচল। ভেবেছিলাম দিল্লির সরকারী ভবন হয়তো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর হবে। না। দিল্লিই হোক আর বোম্বাইই হোক ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক স্বভাবে পশ্চিমী পরিচ্ছন্নতা অসহ্য লাগে। পানের পিক, ল্যাভেটারির দুর্গন্ধ, ধুলো, ঝুল, অপরিষ্কার দরজা জানলা, এই সবের মধ্যে বেশ হোমলি লাগে। মাটির শরীর মাটিতেই যখন মিশবে, তখন অকারণ সময় আর শ্রম নষ্ট করে লাভ কি! লম্বা, বস্তুত লম্বা একটা করিডর পেরিয়ে আমরা দুজনে একটা ঘরে এসে পৌঁছলুম। সেই ঘরে যে অফিসার বসেছিলেন, ভারি সুন্দর। কাটখোট্টা দিল্লিতে অনেকটা বাঙালীর মতো স্বভাব। মধ্যবয়সী। মাথার চুল সাদা। স্বাস্থ্যবান। গৌরবর্ণ। দীর্ঘদেহী। এমন ভাবে বর্ণনা দিচ্ছি, যেন বিয়ের বিজ্ঞাপন লিখছি। আমাকে একটা রোগে ধরেছে নাম ভুলে যাওয়া। অমন সুন্দর স্বভাবের একজন মানুষের নাম ভুলে যাওয়া অবশ্যই অপরাধ। ভদ্রলোক আমাকে বকবেন, এমন কি দেরি করে আসার জন্যে যাওয়ার তালিকা থেকে আমার নামও কেটে দিতে পারেন, এই রকম একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে সোফায় বসে পড়লুম।

ভদ্রলোক টেবিলে কাগজের স্তূপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, 'চট্টোপাধ্যায় আর চ্যাটারজি কি এক?'

বুঝলাম অবাঙালী মানুষ আমার পদবী নিয়ে ধাঁধায় পড়েছেন। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন কাগজপত্রে কখনো চট্টোপাধ্যায়, কখনো চ্যাটারজি হয়েছে। আমি বললাম, 'ইংরেজরা যখন আদর করত তখন বলতো চ্যাটারজি। আর যখন রেগে যেত তখন বলত চট্টো হারামজাদা।' ভদ্রলোক হোহো করে হাসতে লাগলেন। এত উপভোগ্য হয়েছে আমার ব্যাখ্যা! বকুনির বদলে ভদ্রলোক সেই মুহূর্তে আমার বন্ধু হয়ে গেলেন। অনেক ফর্ম্যালিটিজ বাকি। আমি লেটে রান করছি। ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করার জন্যে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন। প্রথম কাজ মেকসিকোয় ঢোকার ভিসা, তিন ঘণ্টার মধ্যে বের করতে হবে। অন্য সকলের সব কিছু হয়ে গেছে। আমার সবই বাকি। জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরেন একসচেঞ্জ পেয়েছেন।'

'পেয়েছি।'

হিসেব করে দেখা গেল, চাইলে আমি আরও শ দুই ডলার বেশি পেতে পারতাম। দুঃখ করলেন। তিন চার দিন আগে দিল্লি এলে আমার এ অবস্থা হতো না। ভিসার দরখাস্ত ফর্মে ছাপ ছোপ মেরে বললেন, 'এখুনি মেকসিক্যান এমব্যাসিতে চলে যান।'

শ্যামলদা বললেন, 'এইবার আপনার ভার নেবেন বিজয়দা।'

আমাদের দিল্লি অফিসের বিজয় ঘোষ, বিজয়দার কোনও তুলনা নেই। অমন পরোপকারী, সেবাপরায়ণ, সাহায্যকারী মানুষ কম দেখা যায়। আই ই এন এস বিলডিং-এ বিজয়দা এসে আমাকে তুলে নিলেন। যে মানুষ নিজের সম্পর্কে কম ভাবেন তাঁর চেহারায় একটা সদানন্দের ছাপ পড়ে।

৯

মেকসিক্যান দূতাবাসে ভিসা নিয়ে তেমন সমস্যা হলো না; কিন্তু দূতাবাসটি কেমন যেন শ্রীহীন। অবশ্য ভেতরটা কেমন বলতে পারবো না; কারণ ভেতরে কেউ আমাদের সাদরে ডেকে নেয়নি। সামনে একটা বাগান আছে; তবে পরিকল্পনাহীন, এলোমেলো ব্যাপার। চার পাঁচটা দামী বিলিতি গাড়ি

দাঁড়িয়ে আছে, এয়ার-কন্ডিশান্‌ড। বাড়িটার পেছন দিকে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার মতো একটা জায়গা। সেইখানেই ছোট একটা ঘরে ভিসা অফিস। ভেতরে প্রবেশাধিকার নেই। সাদা চামড়াদের সব সময়ই কেমন যেন একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব। কালো হওয়ার অনেক দুঃখ। বিদেশীদের কি বলবো, আমাদের মধ্যেও তো সাদা কালো নিয়ে নাক তোলাতুলি আছে। কালো মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যায়। পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ কালো হলে, বলি টেলিফোনের মতো গায়ের রঙ। কথাই তো আছে কেলে ভূত। কালো মেয়ে লাল জামা পরলে বলি, টিকেয় আগুন। শিব্‌রামবাবুর গল্প ছিল, গদাইয়ের বাবার আলকাতরার ব্যবসা। গদাই এত কালো যে ঘামলে আলকাতরা বেরোয়। গদাই ঘামে আর গদাইয়ের বাবা টিনে সেই ঘাম ধরেন, আলকাতরার লেবেল লাগিয়ে বিক্রি করেন।

মেকসিকোর হাইকমিশনার অফিসে ভিসার কাজকর্ম জানলা পথেই হয়। জানলার ঘুলঘুলি দিয়ে ফর্ম গেল, টাকা গেল। আমি সাক্ষীপুরুষ। আমার হয়ে যা কিছু সবই করছেন বিজয়দা। ভেতর থেকে হুকুম হলো তিনটের সময় আসুন। আমরা বেরিয়ে এসে অটো ধরলুম। দিল্লির প্রশস্ত প্রশস্ত রাজপথে অটোর চ্যারিয়ট রেস হয়। পাঁই পাঁই ছুটছে এদিক ওদিক। আমার মতো দুর্বল নার্ভের লোকের ভয় করে। মনে হয় এই বুঝি উলটে গেল, কি বড় দরের কোনও কিছুর সঙ্গে একটু হলায়-গলায় হলেই, ভবসাগর তারণ কারণ হে। গুরুদেব দয়া করো দীনজনে।

কলকাতায় একবারমাত্র অটোয় চেপেছিলুম শখ করে। বরানগর থেকে বিবাদি বাগ। ওঃ সে এক অভিজ্ঞতা! যে ছেলেটি চালাচ্ছিল, সে বললে, জানেন, আমি বত্রিশ নম্বর বাসের ড্রাইভার। এটা আমার পার্টটাইম। তারপর শুরু হলো পার্টটাইমের খেল। বড় বড় দৈত্যের মতো বাস, ডবল ডেকার আর ট্রেলারের গা ঘেঁষে, সমানে তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, মাঝে মাঝে ফাঁক ফোকব দিয়ে ফুড়ুত ফুড়ুত গলে, কখনো বাঁয়ে, কখনও ডাইনে গিয়ে, খানাখন্দ টপকে এমন ভাবে চালাতে লাগল, মনে হলো, এই আমার লাস্ট জারনি, শেষ যাত্রা। জোড় হাত করে বললুম, ভাই আমাকে নামিয়ে দাও। সে হিন্দী ফিলমের হিরোর মতো বললে, নালায়েক ডরপুক, বৈঠো ঠিকসে। ঘাবড়াও মাত। পঁচিশ মিনিটে পথ পার করে দিলে। নেমে তাকে নমস্কার করেছিলুম। পরে সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হলেই বলত; 'আসুন দাদা, উঠুন। বিনা পয়সায় নিয়ে যাবো।'

সময় কাটাবার জন্যে, এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি শুরু হলো। দোকান-পাট। পার্ক। শেষে ভালো একটা রেস্তোরাঁর দোতলায় উঠে, দুজনে মুখোমুখি বসলুম। এক সময় ইংরেজ চালাতো, এখন চালায় ভারতীয়। ইংরেজ আমলের কেতাটা আছে। বিশাল আয়না। সিঁড়িতে কার্পেট। ক্যাকটাসপট। দোতলার অলিন্দ থেকে নিচেটা দেখা যায়। টেবিলের পর টেবিল। জমায়েত। রোস্ট করা মুরগীর ঠ্যাং দুহাতে ধরে দাঁত দিয়ে টানাটানি।

আমাদের যে ওয়েটার সার্ভ করছিলেন, তাঁর সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল। এক সময় কলকাতায় ছিলেন। এক জজসায়েবের বাড়িতে কাজ করতেন। কফি আর কি যেন সব খেতে খেতে, যতটা পারা যায় সময় কাটিয়ে, আমরা বেরিয়ে এলুম দিল্লির রাজপথে। লোকে লোকারণ্য। দিল্লিটাকে কিছুতেই আপন করে নেওয়া যায় না। বিশাল হাঙড়ায় এক শহর কেমন যেন হৃদয়হীন, মায়া-মমতাহীন। সবই এখানে দৌড়চ্ছে। স্কুটার, মটোরবাইক, অটো। গ্রীষ্মের দিল্লীতে গরম একপ্রস্থ জামাকাপড় কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সেই অনুসন্ধানই চলল দোকানে দোকানে। কোথাও খুব একটা আশাপ্রদ কিছু পাওয়া গেল না। শীত আসতে অনেক দেরি। দু'একটা দোকানে ঝড়তি পড়তি কিছু পড়ে আছে। সাগরদা কলকাতা থেকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন, যত টাকাই লাগুক নাঙ্গাবাবাকে একটা স্যুট কিনে দাও, তা না হলে শীতে বেচারার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। ও তো আর গান্ধীজী নয় যে আট হাতি ধুতি পরে রাউন্ড টেবিলে যাবে। তাঁর ছিল আলাদা কনস্টিটিউশান। স্যুটের চেয়ে অনেক বড় এই ভালবাসা। বড় মাপের মানুষ হতে গেলে বড় দিল চাই : সাগরদার নির্দেশ বিজয়দা স্যুট না কিনে ছাড়বেন না। দিল্লির দোকানে দোকানে স্যুটকেস আছে, স্যুট নেই। থাকলে কোনোটাই আমার মাপের নয়।

আবার আমরা ভিসার জায়গায় ফিরে এলুম। ঘুলঘুলি তখনও খোলেনি। তিনখানা ঢাউস বিলিতি গাড়ি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আলাপ হয়ে গেল এক সাধকের সঙ্গে। ওখানকার সান্ত্রী। পেটানো শরীর। লম্বা। একহারা। বয়েস বললেন, আশি ছুঁই ছুঁই। এক সময়

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার স্বাস্থ্যের গোপন কথাটা কি?' মানুষটি একটু গম্ভীর প্রকৃতির। মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে বললেন, 'কম খাও। গম না করো।' বলেই ঘুরে গেলেন। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন ওদিকে। যেদিকে বাড়ির মুখ।

ভিসা হয়ে গেল। পাসপোর্ট সুচারু করে লাগিয়ে ভেতরের কর্মীটি, যাঁর হাত ও গলার অংশ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, আমাদের ফিরিয়ে দিলেন। বাইরে এসে বিজয়দাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'গম মানে কি? গম না করো।'

'গম মানে দুশ্চিন্তা। কম খাও, আর দুশ্চিন্তা কোরো না।'

পরের দিন সকাল, এগারোটা কি সাড়ে এগারোটার সময়, পি আই বির বড়কর্তার অফিসে জমায়েত হবার নির্দেশ ছিল। যাকে বলে জরুরী বৈঠক। এরপর আর কোনও বৈঠক হবে না। শেষ নির্দেশাদি দিয়ে, কণিষ্ক হোটেলে লাঞ্চ খাইয়ে চরে খাবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। ঠিক কটার সময় কোন তারিখে প্লেন ছাড়বে তাও বলা হবে ফিসফিস করে। নিরাপত্তার কারণে প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণ-সূচী সহজে জানানো হয় না। কেবলই অদলবদল করা হয়। কি যন্ত্রণা প্রধানমন্ত্রীর! চলাফেরার কি কড়াকড়ি। 'যাই, একটু বেড়িয়ে আসি'—বলে দুপা ঘুরে আসার উপায় নেই। আততায়ীর বুলেট এসে ঝাঁজরা করে দেবে। এ যেন মধ্যযুগের আরব দুনিয়া! কি বাবা গণতন্ত্র বুঝি না। চারিদিকে ভারতকে টুকরো টুকরো করার ষড়যন্ত্র। ভারতের ইতিহাস বড় গোলমেলে। সারা ভারত জুড়ে স্বাধীন কোনও নৃপতি রাজত্ব করে গেছেন কি না মনে পড়ছে না। যে যতটুকু দখল করতে পেরেছিলেন, সেইখানেই রাজ্যপাট বিছিয়ে কিছুকাল সুখ ভোগ করেছেন। আক্রমণ, প্রতিরোধ আক্রমণ। সীমানা বাড়ানো, সীমানা হারানো। এই তো ছিল রেওয়াজ! মোগলরা এসে ও-মাথা থেকে, মাঝ-ভারত পেরিয়ে প্রায় দক্ষিণ ছুঁই ছুঁই করে, আবার পিছু হটতে শুরু করল। তারপর ভাঙা ভারতে শুরু হলো সামন্ত রাজাদের লড়ালড়ি! কোথায় গণতন্ত্র! আর কোথায়ই বা শাসন! প্রজাসাধারণের কথা কে-ই বা ভাবে! অরাজকতার মধ্যেই আমরা বছরের পর বছর চালিয়েছি। একমাত্র ইংরেজরা এসে, সারা ভারতকে শৃঙ্খল পরাতে পেরেছিল। যেমনই হোক, কু-ই হোক আর সু-ই হোক, সারা দেশকে একটা শাসনের মধ্যে আনতে পেরেছিল। দিল্লির অবস্থা এখনও মোগল শাসনের শেষের দিকের মতো। শক্ত মুঠো খুলে এক একটি রাজ্য ঝরে পড়ছে। স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে।

বড় কর্তার ঘরে জমায়েত মন্দ হলো না। নবীনে প্রবীণে মিলিয়ে বেশ বড় একটি দল। আই. এফ এস-এর উর্ধ্বতন অফিসারটি বেশ স্মার্ট। হেসে, হেসে অনেক কথাই বললেন। বইপত্তর দিলেন পড়ে প্রস্তুত হবার জন্যে। আমার সঙ্গে কারুরই আলাপ হলো না। সব শেষের দিন ক্লাসে এলে যা হয়। অনেকের সঙ্গেই অনেকের পরিচয় হয়েছে। আমি হয়ে গেছি একঘরে। প্রথম পরিচয়ের আমার সেই সৌম্যদর্শন অফিসারই একমাত্র বন্ধু! তিনি বললেন, নিচে নেমে অপেক্ষা করতে। তুলে নিয়ে যাওয়া হবে লাঞ্চে।

হোটেল কণিষ্ক এক বিপর্যময় বিশাল সৌধ। খাবার আগেই মানুষকে গিলে ফেলে। ফয়ার। ঝকঝকে মার্বেল। বিশাল সিঁড়ি। ক্যু দা আতাতের বিশাল সৈন্যবাহিনী পাশাপাশি মার্চ করে ওপরে উঠে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারে। দোতলায় খাবার ঘর। টেবিলের পর টেবিল, তাহার পর টেবিল। ধারের দিকে বেশ কিছু আসন আরব তেলঅলাদের দখলে চলে গেছে। এখানে কেউ খেতে দেয় না, উঠে উঠে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়। হোটেল কর্তৃপক্ষ কি ভাবে হিসেব রাখেন কে জানে! বাঁ দিকে বিশাল এক থামের আড়ালে অতি লম্বা টেবিলে কমপক্ষে শ দেড়েক রকমের পদ সাজানো। মাঝখানে গোটা তিনেক গ্যাসের চুলোয় কি যেন গরম হচ্ছে।

আমরা সব ডিশ হাতে টেবিলের চারপাশে ঘুরতে লাগলুম। মনে মনে ঠিকই করে নিয়েছিলুম, চেনা চরিত্র ছাড়া, অচেনা কিছু ডিশে তুলব না। সকলে স্যালাড তুলছেন। হরেকরকমের স্যালাড। নিশ্চয় ভেজিটেবলই হবে। বেশ লাল লাল, গোল গোল, চাকা চাকা কি একটা সাজানো রয়েছে। কড়াইশুঁটি, শশা, পেঁয়াজ, নানা রকমের পাতা দিয়ে বর্ণাঢ্য, মনোহারী একটা ব্যাপার। খানিকটা তুলে নিলুম প্লেটে। আমি আবার ভেজ। জীবহত্যায় প্রাণ কাঁদে। দাঁত নেই বলে ভেজিটেরিয়ান নই। একবার কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে ছিলুম; তখন সঞ্জয় গান্ধী বেঁচে। সেই সময় সঞ্জয় গান্ধী দলবল নিয়ে সেই

সার্কিট হাউসে এলেন। ভোরবেলা আমার ঘরের পেছনের জানলা খুললেই সার্কিট হাউসের মাঠ। সেই মাঠে একটা লোক, দু ঝুড়ি মুরগী নিয়ে বসেছে, হাতে একটা লম্বা ছুরি। জালঘেরা ঝুড়ি থেকে একটা করে মুরগী তুলে, গলায় ছুরির পোঁচ মেরে দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। মুরগীটা ঝটপট ঝটপট করতে করতে এক সময় নেতিয়ে পড়ছে। যুব নেতাদের জন্যে, একের পর এক নিরীহ প্রাণী প্রাণ দিচ্ছে। সেই দিন থেকে মুরগী ত্যাগ। তার আগেই ছাগল ত্যাগ করেছিলুম। সেও এক করুণ ইতিহাস। মাংস কিনতে গেছি। খুব আগলি রাং, পিছলি রাং করছি। দোকানদার বললে, দাঁড়ান ফ্রেশ মাল আনছি! বলেই, কিছু দূরে দড়ি বাঁধা একটা ছাগল আপন মনে শুকনো বটপাতা চিবোচ্ছিল, সেটাকে টানতে টানতে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই প্রথমে ঝড়াস করে একটা শব্দ, তারপরেই বুক কাঁপানো ব্যা আর্তনাদ। আমি আর দাঁড়াইনি। মাংসঅলা চেঁচাচ্ছে, এই যে বাবু, আগলি রাঙ। বাবু আগলি রাঙ। ছাগলটার মরণ আর্তনাদে, আমি যেন শুনলুম, শুয়োর, আর কতকাল তোদের প্রোটিনের জন্যে আমরা জীবন দোব! জীবস্য জীবাহার, এই যুক্তিতে মন আর সায় দিল না।

স্যালাড, পিজ পোলাও, পনীর মটর, এই রকম গোটা তিন চার খাদ্য বস্তু এক সঙ্গে একই প্লেটে মিলেমিশে একটা জগাখিচুড়ি তৈরি হলো। টেবিলে এসে বসলুম। আমার সামনেই বসেছেন পি. আই. বি-র সেই বড় কর্তা। আমার প্লেটের সেই লাল লাল চাকা চাকা বস্তুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাম-স্যালাড, দ্যাটস ভেরি গুড।

'দিস গোল গোল, চাকা চাকা, ইজ ইট হ্যাম?'

'সেন্টপারসেন্ট হ্যাম। ভেরি গুড। নিউট্রিসাস, প্রোটিনাস।'

কাঁটায় গেঁথে একখন্ড তিনি মুখে পুরলেন। চিবোতে চিবোতে বললেন, 'আই ওন্ট কিল মাচ টোডে।'

হ্যামের নাম শুনে বরানগরের মহাশ্মশানের দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে। নর্দমার ধারে কাদা মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে গোটাকতক শূকর। ঘোঁত ঘোঁত করছে।

উঠে গিয়ে আবার কিছু নিয়ে আসার ইচ্ছে হলো না। শূকর চর্চিত সুখাদ্য সমূহ, ছুরি কাঁটা দিয়ে ড্রিবল করে সময় পার করে দিলুম। আমার সেই সৌম্য, সদাশয়, ইনফরমেশান অফিসার আসন ছেড়ে উঠে এসে বললেন, 'কিছুই তো খেলেন না, টেক সাম সুইটস।'

খাওয়া হোক না হোক তাঁর এই বাঙালী সুলভ আতিথেয়তায় মন ভরে গেল। খাচ্ছেন বটে, আরব অয়েলকিংরা। যাকে বলে হাঁউহাঁউ করে খাওয়া, সেই খাওয়া। থেকে থেকে উঠে যাচ্ছেন খাবার সাজানো টেবিলে। পুরোটা তো আমার দেখা হয়নি, ঘুরে ঘুরে। কি সব সাজিয়ে রেখেছে কে জানে। তবে এইটুকু বুঝেছি, সব আয়োজনই শাস্তিতে, তৃপ্ত করে খাওয়ার জন্য নয়, তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে, ভড়কে দেবার জন্যে।

না খেয়ে, ভড়কে বেরিয়ে এলুম। এইবার একটা ছাত্তর হোটেল খুঁজি। মধ্যবিত্ত মেজাজ সহজে বদলানো যায় না। মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকেই চিতায় গিয়ে চড়ে। সেই একবার দুরপাল্লার ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে এক সহযাত্রী দেখেছিলুম। ভোরে কি একটা স্টেশনে ট্রেন থামল। তিনি প্ল্যাটফর্মে নেমে গিয়ে একখাবলা মাটি তুলে এনে বাথরুমের বেসিনে রাখলেন। হাতে মাটির ব্যবস্থা হলো। কলকাতার পাইস হোটেলের স্ট্যান্ডার্ড গিয়ে মরেছে কণিষ্কতে। নাও এখন উপোস করে থাকো সারা দিন।

বেশ কিছুক্ষণ হারিয়েও গেলুম। যাবো আই. ই. এন. এস বিলডিং, কোথায় কোন দিকে যে চলে গেলুম। সল্টলেক আর দিল্লি, প্রায় এক। সব রাস্তাই এক রকম। শেষে অগতির গতি অটো। অটো চালককে আমার গন্তব্য জানাতে, সে আমাকে পাগলটাগল ভাবলে মনে হয়। ভাবারই কথা, আমার উল্টোদিকের বাড়িটাই আই. ই. এন. এস বিলডিং।

আজ এয়ার ইন্ডিয়া আমাদের টিকিট দেবেন। রাজীব যাবেন চারটারড্ প্লেনে। আগে যে প্লেনে চাপতেন তার নাম ছিল কণিষ্ক। কণিষ্ক ভেঙে পড়ে গেছে। নাশকতা। তদন্ত রিপোর্ট এই সেদিন বেরিয়েছে। রাজীব এখন যেটা ব্যবহার করছেন তার নাম অন্নপূর্ণা। সেই অন্নপূর্ণায় অতিথি হবার জন্যে, সরকারী অতিথি হলেও টিকিট লাগবে, যেমন লাগে সকলের। টিকিটের সঙ্গে পাওয়া যাবে একটি স্যুটকেস। উপহার। বিজয়দা আর আমি বেরিয়ে পড়লুম টিকিটের সন্ধানে। এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসেও নিরাপত্তার

কড়াকড়ি। চৌকিদারের কাছে কাঁধ ব্যাগ জমা দিয়ে ভেতরে যেতে হলো। সর্ব অঙ্গে যাদুদণ্ডের মতো মেটাল ডিটেক্টারও মনে হয় ব্যবহার করলেন। এত কান্ড করেও কিন্তু টিকিট পাওয়া গেল না। সরকারী লিস্ট এখনও এসে পৌছয়নি। আগামীকাল সকালে আবার একবার চেষ্টা করা যাবে।

বিকেলটা আমাদের। দিল্লি এমন এক জায়গা, সময় কাটাবার মতো কিছুই নেই। কিছু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেড়াতে বেড়াতে আমরা পুরনো দিল্লির দিকে চলে গেলুম। যাবার পথে ডানদিকে পড়ল রেড ফোর্ট। পুরনো দিল্লিতে তবু প্রাণ আছে। প্রাচীন প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ, জায়গায় জায়গায় এখনও আছে। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়নি। তবে বেশি দূর যাওয়া গেল না। সামনেই কারফিউ এলাকা। রাজধানীতে আর সে শান্তি নেই। থেকে থেকেই ধর্মকে হাতিয়ার করছে রাজনীতি। আমরা খাদি ভবনে ঢুকে, পাজামার সন্ধান করতে লাগলুম। কলকাতার চেয়ে দিল্লির খাদিবাজার অনেক ভালো। হরেক রকম জিনিস দেখলে বেশ আনন্দ হয়। দোকানটা বেশ পুরনো। দেখলেই মহাভারতের কালে চলে গেছি মনে হয়। মনে হয় দুর্যোধন এখানে বসে এক সময় চ্যবনপ্রাশ বিক্রি করতেন।

দিল্লিতে আমার এক অধ্যাপক বন্ধু আছে, তার ডাক নাম পিন্টু। শরীর, স্বাস্থ্য, মেজাজ অনেকটা দিলীপের মতো। লম্বা, চওড়া। পাঞ্জাবীদের পাশে দাঁড়াতে লজ্জা পাবে না। ধার্মিক পরিবারের সন্তান। পিন্টুর জ্যাঠামশাই ববানগর পাটবাড়িব একজন উচ্চ মার্গের বৈষ্ণব। দিলীপের সঙ্গে পিন্টুর একটাই পার্থক্য, সহজে হাসে না। সে তার নিজের ভাব জগতে থাকে। পলিটিক্যাল সায়েনসের অধ্যাপক; কিন্তু ভালো সংস্কৃত জানে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ভাবধারায় বড় হয়েছে। পরোপকারী। দিল্লিতে পিন্টু আমার পরম অভিভাবক। পিন্টুর হাতে নিজেকে সমর্পণ কবে, আমি বেশ মজায় থাকি। চোস্ত উর্দু বলে, মাঝে মাঝে শাযেরির মিশেল। খাতির বেড়ে যায়!.

পিন্টু গেস্ট হাউসে এসে অনেকক্ষণ বসে আছে। আলাপি ছেলে জমিয়ে নিয়েছে। আদর আপ্যায়নের অভাব হয়নি। বাঙলা সাহিত্যেব পোকা। পিন্টুরা আছে বলে সাহিত্য বেঁচে আছে। পিন্টুর সঙ্গে আবার বেরনো হলো স্যুট কিনতে। হাতে আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে। এর মধ্যে জোড়াতালি যা মারবার মেরে নিতে হবে। আমরা গিয়ে ঢুকলুম বেমন্ডেসের দোকানে। ফর্সা টুকটুকে একটি ছেলে এগিয়ে এল। পিন্টু সঙ্গে সঙ্গে একটি শায়েরি ছেড়ে ছেলেটিকে ভিজিয়ে দিলে। এমনিই নরম প্রকৃতির আরও নবম হয়ে গেল। উর্দুটা মনে নেই, বাঙলা ভাবার্থ, যেতে তো একদিন হবেই, অন্ধকার, অনিশ্চিত কোনও যাত্রায়, তবু এই পৃথিবীব রোশনিতে একটু সেজেগুজে মায়ফেলে বসি। ডাক এলেই এ চিরাগ নিবে যাবে। হালকা একটু ধোঁয়া তাও মিশে যাবে বাতাসে।

সেই অল্প বয়সী দোকানদার দুদ্দাড় করে যেখানে যত স্যুট ছিল, সব নামিয়ে ফেললে। প্রথমে রঙ পছন্দ। বিজয়দা আর পিন্টু এটা নয়, ওটা নয়, সেটা নয় করে একটা পছন্দ করলেন। কোটটা হলো একেবারে মাপে মাপে। প্যান্টের ঝুল খাটো করতে হবে। সে ব্যবস্থাও হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দোকানদার ছেলেটিও সাহিত্য রসিক। পিন্টুর সঙ্গে খুব জমে গেল। সঙ্গীত রসিক। সাতশো বছর আগে দিল্লি ছিল মোগল সংস্কৃতির পীঠস্থান। নাচ, গান, বাজনা, কবিতা। এখন আমলা, এম পি আর সন্ত্রাসবাদীদের বিচরণভূমি। কোথায় ঠুমরিব চলন, কোথায় ঘুঙ্গরুর বোল। মহল্লার সব ভালো ভালো নাম, চাণক্যপুবী, জনকপুব, বড়াখাম্বা। রাতেব অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ইন্ডিয়া গেট। বিশাল পার্লামেন্ট ভবন ভয় দেখাচ্ছে। বেডফোর্টে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডে ঘোড়া ছুটছে। আসলে জীবন বলে কিছুই নেই। আছে চাকরি আর ব্যবসা আর রাজনীতি। পাড়া নেই, আড্ডা নেই, চায়ের দোকান নেই, সব চেয়ে দুঃখের, ভাঁড় নেই। আরও দুঃখের প্রাচীন মন্দির নেই। বটতলা নেই। বিশাল বিশাল বাড়ির কংক্রিটের খাঁচায় এক একটি পরিবার। মেলামেশার তেমন চল নেই। কি দুঃখ রাজধানীর!

অবশেষে খবর পেলাম খাঁটি, তাও টেলিফোনে, শনিবার রাত দশটার সময়, পি আই বি-র সামনে, বিশাল যে গাছ, সেই গাছের তলায় যথা সর্বস্ব নিয়ে হাজির থাকতে হবে। একটা মুখ বন্ধ করা খাম দেওয়া হয়েছিল আমাকে। সেই খামটা খুললাম। তখন অনেক রাত। ঘুমের নদী বইছে নিঃশব্দে। দিল্লির রাজপথ, পার্লামেন্ট ভবন, রেডফোর্ট, জুম্মা মসজিদ সব, সব এখন নিদ্রিত। খাম থেকে বেরিয়ে এল গোটা পাঁচেক স্টিকার। স্টিকার না বলে ট্যাগ বলাই ভালো। গোল টিকেট। সাদা জমি। গোটা গোটা লাল অক্ষরে লেখা, প্রাইম মিনিস্টারস ভিজিট। বেরলো দুটো কারপার্ক-স্টিকার।

বিছানার ওপর ছড়ানো স্টিকার। ওপাশে প্যাক করা দুটো ব্যাগ। ছোট্ট একটা কাঁধ ব্যাগ হাঁটুর পাশে শুয়ে আছে। ঘুম আসছে না। সব কটা ব্যাগেজে সুন্দর করে ট্যাগ লাগালুম। রাত দেড়টা। গেস্ট হাউসের পাশের বাড়িতে ছোট মতো একটা চিড়িয়াখানা আছে। পর্দা সরিয়ে জানলা খুলে দেখলুম, এক ঝাঁক সাদা পায়রা পালকে মুখ গুঁজে ঘুমে অচেতন। তিনতলার ঘরে জোরালো আলো জ্বলছে। জানলায় কার ছায়া দুলছে। বিছানায় ফিরে এসে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। কাল রাতে এই বিছানায় অন্য কেউ শোবে।

এই বছরটা আমার শূন্যতার বছর। জাগতিক ব্যাপাবের চেয়ে, আত্মিক ব্যাপারই আমাকে বেশি টানে। আমি উদ্ভবের কথা ভাবি। ফলেব বৃক্ষের প্রতি কোনও কৃতজ্ঞতা থাকে কি না জানি না। আমি যে বৃক্ষের ফল, সেই মহীরুহের পতন হয়েছে। এই বছব আমার অনাথ হয়ে যাবার বছর। রাত দুটো। সুপ্ত পৃথিবী। দুটো গাঁঠরি কোণের টেবিলে গলায় প্রাইম মিনিস্টার টিকিট ঝুলিয়ে বসে আছে। ঝিমঝিম রাত। আমি একা। এই বিশাল পৃথিবীতে একটা পতঙ্গের মতোই আমি একা। কি জানি কেন এই মন্ত্রটি কোথা থেকে ভেসে এল · ওঁ বৃদ্ধোঽহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ। সম্প্রদাস্যতি। ভার্য্যাং তথা দরিদ্রস্য দুষ্করো দারসংগ্রহঃ॥ পিতর উচুঃ। অস্মাকং পতন বৎস ভবতশ্চাপ্যধ্যো গতিঃ। ন্যূনং ভাবি ভবিত্রি চ নাতিনন্দসি নো বচঃ। ইত্যুক্তো পিতরস্তস্য পশ্যতো মুনিসত্তম। বভূবুঃ সহসাঽদৃশ্যা দীপা বাতাহতা ইব॥ ঘুম আব আসবে না।

১০

অনেকটা রহস্য উপন্যাসের মতো। রাত দশটা। কালো ঝকঝকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চালক ফেদার ডাস্টার দিয়ে তবুও ধুলো ঝেড়ে চলেছেন। ফ্লানেল দিয়ে উইন্ডস্ক্রীন মুছছেন। কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি পাতা ঝরে পড়ছে। সেকালের থিয়েটারে একটা ফেমাস ডায়ালগ ছিল। সকলের মুখে মুখে ঘুরতো। নাটকের নাম মনে রাখার মতো স্মৃতি নেই। ডায়ালগটা মনে আছে, 'তবে আজ আসি রে খেঁদী, আমি বড্ড বিজি প্রোফেস্যানাল ম্যান।'

বড্ড বিজি প্রোফেস্যানাল ম্যানের মতো গাড়ির পেছনের আসনে উঠে বসলুম। ওই অত রাতেও বিজয়দা আমার সঙ্গী হয়েছেন। পি আই বি বিলডিংসের সামনে গাছতলায় আমকে নামিয়ে দিয়ে, বহু দূরে তাঁর বাড়িতে ফিরে যাবেন। যে অঞ্চলে ফিরবেন, সেই অঞ্চলে আবার খাবলা খাবলা কারফিউ এলাকা আছে। 'আনডন্টেড' বিজয়দা। বিজয়দা আমার পাশে বসলেন। গাড়ি ছাড়ল। গেস্ট হাউসের তিলক সিং, হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি, গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন।

দশটার পর দিল্লির রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। পথ, আলো, গাছ, মাঝে মাঝে ক্লান্ত অটো, নিঃসঙ্গ স্কুটার, পেছনে লাল আলো ডিপ্লোম্যাটিক বিলিতি গাড়ির জমাট অহঙ্কার। দিল্লিটা কেন যে এমন প্রাণহীন, ভয়াবহ। এই রকম একটা শহর দেখলে সেই পুরনো গানটা গাইতে ইচ্ছে করে, 'শোন বন্ধু শোন, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা। ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্মব্যথা।'

সেই জায়গাটা পেরিয়ে গেলুম। বুদ্ধ পার্ক। এইখানেই জঙ্গল আর পাথরের মধ্যে পড়েছিল ভাইবোনের মৃতদেহ। কোন এক ম্যানিয়াক খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। পেছনে পড়ে রইল রাজঘাট। আবার আমার মনে পড়ছে সেকালের নাটকের এক দৃশ্য। কারভালো নাচছে আর গাইছে, ভোঁ ভনভন, সোঁ শনশন, ভ্যাঁপপো ভ্যাঁপ। কি যে হচ্ছে! কোথায় যে যাচ্ছি, একটু পরেই যে কি হবে, কিছুই জানা নেই। পাশে বিজয়দা বসে আছেন চুপচাপ। আমাকে গাছতলায় ছেড়ে দিয়ে কখন যে বাড়ি ফিরবেন! একেই বলে বন্ধুকৃত্য। পার্লামেন্ট স্ট্রিট। ডানপাশে ইংরেজ আমলের স্থাপত্য। অন্ধকারে স্থির। বিশাল চওড়া পথ নির্জন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

এসে গেল আমার সেই গাছতলা। নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। নামলো আমার ব্যাগ। নেমে এলেন বিজয়দা। সামনেই বিশাল পি আই বি বিল্ডিংস। অন্ধকারে দৈত্য। গাছতলায় আর একজন মাত্র

এসে পৌঁছেছেন। একেবারে কেতাদুরস্ত সাহেব। সঙ্গের ব্যাগটিও বেশ বিশাল আকৃতির। আমার পোশাকের দিকে একবার তাকালুম। তেমন জমেনি। আমার কাঁধে সেই উইন্ডচিটার। দণ্ডায়মান ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কোনও বাক্যালাপ করলেন না। তিনি করলেন না বলে আমিও করলুম না। ইংরেজদের দেশে নিয়ম আছে, তৃতীয় আর একজন পরিচয় করিয়ে না দিলে, কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। দু'জন ইংরেজ পাশাপাশি সারা জীবন কথা না বলে কাটিয়ে গেল। কেউ ইনট্রোডিউস করিয়ে দেয়নি বলে কথা বলা হলো না।

একপাশে চুপচাপ দাড়িয়ে আছি। আকাশে এক খণ্ড চাঁদ ঝুলছে। ছানা কাটা মেঘ। বিশাল গাছটা মনে হয় কৃষ্ণচূড়া। আকাশের গায়ে তার ডালপালা চীনা পেন্টিং এর মতো দেখাচ্ছে। চারপাশ থমথমে। একটুও বাতাস নেই। তেমনি গরম। একটা প্রাইভেট গাড়ি এসে ঢুকলো। নেমে এলেন এক ভদ্রলোক। এঁর পোশাক আশাকে আমেরিকার প্রভাব। বাঙালী ভদ্রলোক। নিজে নামালেন। নানা ব্যাগ। গাড়িতে একটি ছেলে আর মেয়ে। ছেলেটি স্টিয়ারিং-এ। ওকে ডডনাই, ডডনাই নানাবিধ বিদায়বাণী উচ্চারিত হলো। গাড়িটা দ্রুত করে বেরিয়ে গেল। এই ভদ্রলোকই তাহলে অজয় বসু। আমিও বাঙালী, অজয়ও বাঙালী ভেবেছিলুম আমাকে দেখে, আরে মশাই বলে এগিয়ে আসবেন। দু'জনে বক বক করে বকবো। সময় কেটে যাবে। অস্বস্তি কেটে যাবে। তা আর হলো না। আধুনিক কাল হলো, হাম দো হামারা দো র কাল। তৃতীয় কারুর অস্তিত্ব নেই।

ভস করে একটা ট্যুরিস্ট বাস এসে ঢুকলো। নেমে এলেন পি আই বি র সেই সৌম্য অফিসার। চিনতে পারলেন। হাসলেন। জানালেন এখুনি যাত্রা শুরু হবে। আমার পাশে এখন এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক এসে দাড়িয়েছেন লক্ষ্য করিনি। পরে আছেন গলাবন্ধ গরম কোট। তাকাতেই হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্যে। ভদ্রলোকের নাম প্রফুল্ল মাহেশ্বরী। এ যুগে এমন মানুষকে বলা হয় অমায়িক ভদ্রলোক।

দেখতে দেখতে গাছতলা নানা প্রবাসে ভরে গেল। সকলেরই মুখে চোখে বেশ একটা ভারিক্কি ভাব লেগে আছে। দলে আরও একজন ঋজু বাঙালী ভদ্রলোক রয়েছেন, সাহেবী পোশাকে। ইনিই হলেন সীতাংশু দাশ। প্রবীন মানুষ। দলে একজন মহিলা সাংবাদিকের থাকার কথা। তিনি কোথায়? এর আগের সব ভ্রমণেও দেখেছি, মহিলাদের নিজস্ব একটা ব্যাপার থাকে। আলাদা এক ধরনের খাতির। হিংসা করছি না, এতে কিন্তু 'টিমস্পিরিটটা' নষ্ট হয়ে যায়।

আদেশ এল, এবার সব উঠে পড়ুন আমরা একে একে সৈনিকের মতো আমাদের লটবহর নিয়ে উঠে বসলুম। বিজয়দা বাইরে থেকে হেঁকে বললেন আমি তাহলে যাই'। বিজয়দা চলে গেলেন। আমরাও চলতে শুরু করলুম ঝকঝকে ট্যুরিস্ট বাস ঝড় বেগে ছুটলো, পার্লামেন্ট স্ট্রিট ধরে। কতবার যে আসা যাওয়া হলো এই পথে।

ইন্দিরা ইন্টারন্যাশন্যালের টেকনিক্যাল এরিয়া কম বড় নয়। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। ঠোঁটে ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে। অন্ধকার অল্প অন্ধকার পথঘাট পেরিয়ে হঠাৎ একেবারে আলোর স্বর্গে। যেন মেলা বসেছে। কম্যান্ডো, সিকিউরিটিবাহিনী, সাদাপোশাক লোকের লেকরণ। অস্থায়ী একটা ব্যবস্থা। ত্রিপল দিয়ে ঘেরা 'চেক ইন' এর ব্যবস্থা।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান, তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই। সকলেই গোবদা গম্ভীর। আর ভাবনা চিন্তা, দার্শনিকতার সময় নেই। অগ্নি-পরীক্ষা আকাশমুখী হবার জন্যে তৈরি। আমরা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদের ফেলে দিলুম। ক্যাম্পে ঢুকেই দেখলুম ডানপাশ থেকে ওপাশে ঘুরে গেছে সার সার টেবিল। ডান দিকের প্রথম দুটোয় চার পাঁচ জন সুন্দরী এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাজ পরে টিকিট পরীক্ষায় ব্যস্ত। তার পরেরটায় স্মার্ট এক ভদ্রলোক। পরীক্ষা করছেন, পাসপোর্ট। তারপরে কাস্টমস। ওপাশে এক সার সিকিউরিটিবাহিনী।

ঠেক খেতে খেতে, সিকিউরিটিতে। শুরু হলো একের পর এক পরীক্ষা। প্রায় ডাক্তারি পরীক্ষার মতো। যে অফিসার এই সব করছেন, বেশ সৌম্যদর্শন। সবচেয়ে সুন্দর তাঁর গোঁফ জোড়া। খঞ্জন পাখির ন্যাজের মতো কথা বলার তালে তালে নাচছে। ব্যাগের যেখানে যত ফাস্টনার ছিল সব টেনে হিঁচড়ে খুলে ফেললেন। মুখে হাসি, সামান্য সামান্য রসিকতা করলে হবে কি, ব্যাগ ওলটপালটে খাতির

খুঁতির নেই। নাড়িভুঁড়ি সব বের করে ফেললেন টেনেটুনে। তারপর যাদুদণ্ডের মতো ঘোরাতে লাগলেন যন্ত্র। যন্ত্র হঠাৎ বিপুল শব্দ করে উঠল। ভদ্রলোকের কপালে কুঞ্চন।

জিজ্ঞেস করলুম, 'এনি থিং রং?'

ভদ্রলোক বললেন, 'বোমা থাকলে এই রকম শব্দ হয়।'

'বোমা?'

'ইয়েস বম্ব।'

খোলা ব্যাগের মুখের কাছে নাকটা নামিয়ে এনে নস্যি টানার মতো করে নিঃশ্বাস নিলেন। বললেন, 'ধূপ আছে না কি?'

'আপনি ধূপ ভালোবাসেন?'

হাতের যন্ত্রটা দেখিয়ে বললেন, 'বাট মাই ফ্রেন্ড ডাজনট লাইক ইট।'

আমি ব্যাগের মধ্যে জামাকাপড়ে সুন্দর গন্ধ হবে বলে চন্দন ধূপের একটা কিউব ফেলে রেখেছিলুম। যাক জানা হয়ে গেল, বোমা আর ধূপ এক গোত্রের জিনিস। যন্ত্র অবশ্য মন্দ কিছু বলে নি। বোমা মানে মৃত্যু। মানে স্বর্গীয়। তারপরই ধূপের ধোঁয়া। দুটিই দিব্যালোকের বস্তু। কোণাকৃতি ধূপের খণ্ডটি তাঁর টেবিলে রাখা মাত্রই হস্তধৃত যন্ত্র যেন পাগল হয়ে গেল। ক্যাঁ কোঁ। ক্যাঁ কোঁ।

যত রকমের ট্যাগ হতে পারে আষ্টেপৃষ্ঠে ঝুলিয়ে নির্গমন পথের কাছে দাঁড়াতেই এক কম্যান্ডো কোমরের কাছে মৃদু চাপড় মেরে বললেন, 'গো। দেয়ার ইজ দি প্লেন।'

মা অন্নপূর্ণা নরম চাঁদের আলোয় পাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে ছায়া ছায়া মূর্তি। যা কিছু ঘটছে, সবই ঘটে চলেছে জোড়া জোড়া সন্ধানী চোখের সামনে। প্লেনে ওঠার সিঁড়ির মুখে আবার এক প্রস্থ দেখাদেখি। শেষ ছাড়পত্র সংগ্রহ করে বিমানে। এতক্ষণ চলছিল কঠিন কঠোর মুখের মেলা। বিমানের প্রবেশদ্বারের দুপাশে কপালে টিপ আঁকা দুটি মিষ্টি মুখ। অন্নপূর্ণার বিমানসেবিকা। প্রধানমন্ত্রীর বিমানে যাঁরা সেবিকা হন তাঁদের রূপে এবং গুণে অতুলনীয়া হতে হয়। রূপ তো দেখছি। গুণ দেখবার সুযোগ এখনও আসে নি। ডান দিকে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর মুখে বাঙালী সুলভ একটা লাবণ্য ছিল। তিনি আমার বোর্ডিং টিকেটটি নিয়ে বসার আসন দেখাবার জন্যে ভেতরে এলেন। বিমান পরিপূর্ণ। যেন হরিহর ছত্রের মেলা লেগে গেছে। দুপাশে দুসার আসনের মাঝখানের পথটি তেমন প্রশস্ত নয়। প্রধানমন্ত্রীর বিমানের ভেতরের নকশা একটা ভিন্নতর ধরনের। বিমানের মাঝখানে একটা পার্টিসান। পার্টিসানের ওপাশে দুটি কেবিন। একটি প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব কামরা। অন্যটি ড্রয়িংরুম, কনফারেনস রুম। তারপর তাঁর নিজস্ব সঙ্গীসাথীদের বসার জায়গা। ন্যাজের অংশে সাংবাদিক, মিডিয়া স্টাফ, সিকিউরিটি কর্মী, বিমান কর্মচারী, প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের লোকজন। এই দিকটাকে তেমন আরামপ্রদ বলা যায় না, তবে ওই বলে না! ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া! অথবা পড়ে পাওয়া সাতগণ্ডা।

আমার আসন জানালার ধারে।

জানালার ধারে আসন বলে লাফিয়ে ওঠার কিছু নেই। সেই আসনে বসে আছেন শালোয়ার কামিজপরা সুন্দরী এক পাঞ্জাবী তরুণী। চোখ দুটো বিদেশিনীদের মতো নীল। বিমানসেবিকা হাসিহাসি মুখে বললেন, 'দেয়ার ইজ ইওর সিট।' পাঞ্জাবী তরুণী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কিছু যদি মনে না করেন আমি আপনার জায়গাটায় বসতে পারি!'

পৃথিবীতে এমন মানুষ কে আছে যে সুন্দরীর আবদারের কাছে মাথা মুড়োতে রাজি না হবেন। অমন বুদ্ধিমান রামচন্দ্র তিনি ছুটলেন সোনার হরিণ ধরতে। রাজা ছেড়ে দিলেন সিংহাসন। আমি বললুম, 'অঃ সিওর, অঃ সিওর, ভেরি গ্ল্যাডলি আই অফার ইউ মাই সাইড সিট।' এর নাম যদি দেওয়া হয় জবরদখল কাকে বলে?

অন্নপূর্ণার আসন-সংস্থান ছিল, এপাশে তিন, মাঝে প্যাসেজ। মহিলার পাশের আসনে বসে পড়লুম। আমার বাঁ পাশ তখনো খালি। বসার সঙ্গে সঙ্গেই পরিচয়ের পালা। মহিলার নাম কুমকুম চাধা। ইনিই সেই কুমকুম। দিল্লিতে এসেই যাঁর নাম বারবার শুনেছি। ডাকাবুকো সাহসী মহিলা। চার্লস শোবরাজকে ইন্টারভিউ করেছিলেন। তারপর শোবরাজ নাকি পালিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে কুমকুম বিখ্যাত। কুমকুমের পাশে বসে আছি, ভাবতেও যেন কেমন লাগছে। যে সব মেয়ে মেকআপ করে না, ন্যাকা

ন্যাকা কথা বলে না, তাদের আলাদা একটা আকর্ষণ থাকে।

পরিচয় আর একটু গড়াতেই কুমকুম বললে, 'আমি আপনার ধারের সিটটা নিলুম একটু ঘুমবো বলে।'

সত্যি কথা বলতে কি, ধারে বসতে পাইনি বলে মনে একটা অস্বস্তি ছিল। কুমকুম এত আলাপী আর মিশুকে মেয়ে যে সেই অস্বস্তিটা বহুক্ষণ কেটে গিয়েছিল। আবার কেন? আমার পাশের শূন্য আসনে আর এক বয়স্কা মহিলা এসে বসলেন। যৌবনে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন, সন্দেহ নেই কোনও। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ।

দুপাশে দুই মহিলা, মাঝখানে আমি। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা। আসনও তেমন চওড়া নয়। ঠাসাঠাসি আর গাদাগাদি করেই বসতে হবে, উপায় নেই। ন্যাজের দিকে এইরকমই হবে। উপায় কি! কুমকুমকে বললুম, আমি বরং ওপাশে ধারের দিকে সরে যাই। আপনারা দুজনে পাশাপাশি বসুন। কুমকুম বললে, আপনি বসুন তো।

কুমকুম সুন্দর বাঙলা বলে। কেন বলে তা জানি না। সারাটা ভ্রমণ পথে কুমকুমের সঙ্গে বাঙলা বলতে পারবো ভেবে মন বেশ পুলকিত। প্রবীণা মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। চলেছেন লন্ডনে। সেইখানেই যাত্রার ইতি।

রাত কটা হলো? জানালার বাইরে দিল্লির রাত। আলোর মালা। সারা প্লেনে যেন দুরমুশ চলছে। মাল উঠছে, ব্যাগ ঢুকছে ওপরের হোল্ডে। মাসলস্ ম্যানের অভাব নেই। সবই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার কারণে। ভারতের সিংহাসন আর তেমন সুখের নেই। শেকসপীয়ার অবশ্য বলেই ছিলেন, আনইজি লাইজ দি হেড দ্যাট ওয়্যারস দি ক্রাউন। ওই দক্ষযজ্ঞের মধ্যেও কুমকুম ঘুমোবার চেষ্টা করছে। একেই বলে কমিটেড রাইটারের মতো, কমিটেড স্লিপার! এই পরিবেশে কেউ ঘুমোতে পারে!

ভেতরের অবস্থা ক্রমশ থিতিয়ে এল। বিমানসেবিকারা নেমে পড়েছেন সেবায়। রাত যতই হোক পান ভোজন হবেই। কুমকুম মদ্যপান করে না, আমিও করি না। আমাদের দুজনের জন্যে এল কোক। অনেক দিন পরে কোকোকোলার স্বাদ পেল জিভ। জ্বলে উঠল আলো। আসন সোজা করো, কোমরে বেল্ট বাঁধো, সিগারেট নেবাও। প্রতীক্ষার অবসান। কোকে চুমুক মারতে মারতে আকাশে উঠে পড়লুম। আর কিছু করার নেই। তারাদের জলসার ভেতর দিয়ে সোজা ইংলিশ চ্যানেল। সাত ঘণ্টার মতো নিশ্চিন্তে। ভেঙে না পড়লে ভোরে হিথ্রো।

সামনে পেছনে মদের ফোয়ারা ছুটছে। বিমানসেবিকারা ট্রে হাতে এ মাথা থেকে ও মাথায় ছুটছেন। পার্টিশানের ওপাশে ভি আই পি সমাবেশ। কুমকুম আর আমি ভেজিটেরিয়ান। আমাদের জন্যে ভেজিটেবল এসে গেল। অনেক তার কায়দা। হরেক রকম মোড়ক। মেকআপ। খেতে কেমন? প্রশ্ন করলে, কথা ঘুরিয়ে দোব। বলব, কটা বাজল? অথবা পাল্টা প্রশ্ন করব, ডাহুক পাখির বংশ কি লোপাট হয়ে যাচ্ছে!

প্রবীণা মহিলা গোল একটা কৌটো বের করলেন, মেডিসিন বক্স। গোল একটি চাকা। চাকায় সার সার ফুটো। সেই গর্তে সাজানো ওষুধের বড়ি। মৃদু আলোয় ওষুধ খুঁজে পাচ্ছেনা না। কৌটোটা আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন। চাইছেন হার্টের ওষুধ। বিমান এখন অনেক উঁচুতে। কমজোর হৃদয়ের অসুবিধে হতেই পারে। প্রয়োজনীয় বড়িটি তুলে তাঁর নরম হাতের তালুতে ফেলে দিলুম। কুমকুম ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ের ওপর কম্বল টেনে। যে যাই বলুক, এ ভাবে ঘুমনো যায় না। যাঁরা প্রচুর মদ্যপান করলেন, তাঁদের কথা আলাদা।

আমি চোখ বুজিয়ে ভাবছি, আকাশের কোন স্তরে আছি। এই স্তরেই কি আত্মা ঘোরে! মুখে একটা লজেন্‌স ফেললুম। এই সাতটা ঘণ্টা মনের আনন্দে অনেক কিছু ভাবা যায়। আফ্রিকা। আফ্রিকা রবীন্দ্রনাথকেও আহত করেছিল। সেদিন এক লেখায় পড়ছিলুম, কালো আফ্রিকার পূর্বপুরুষরা বড় রেগে আছে। যারা পূর্বপুরুষের আত্মিক শক্তি, অথবা প্রেত শক্তিতে বিশ্বাসী, তারা সেই ক্রোধের প্রকাশ আজ চারপাশে দেখতে পাচ্ছে। যারা অবিশ্বাসী, তাদের কাছে এই ক্রোধের প্রমাণ অন্য নাম পেয়েছে; এডমান্ড বার্ক বলেছিলেন, 'যারা পেছন ফিরে পূর্বপুরুষদের দিকে তাকাতে চায় না, তাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তারা উত্তর পুরুষের তোয়াক্কাও করে না। পূর্বপুরুষের অভিশাপ যে আফ্রিকার বুকে

লেগে আছে তার প্রমাণ কোথায়! প্রমাণ হলো, কোনও কর্মসূচীই সে দেশের ভাগ্য ফেরাতে পারছে না। ডাকার থেকে ডার এস সালাম, মাররাকেশ থেকে মাপুটো, সর্বত্র প্রতিষ্ঠান মরে আসছে, রাজ্যের কাঠামোয় ধীরে ধীরে মরচে ধরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, পূর্বপুরুষরা সেই অভিশাপ রেখে গেছেন যাতে ভেতর থেকেই সাংস্কৃতিক অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাত। আফ্রিকার এই প্রজন্মের মানুষ কান পাতলেই যেন সেই অভিশাপ শুনতে পান :

> যোদ্ধারা পন্ডিতদের সঙ্গে লড়াই করে সংগীন তছনছ করে দেবে। আগাছায় পথঘাট ছেয়ে যাবে। জমির উর্বরতা কমে গিয়ে উৎপাদনের হার দিন দিন কমে যাবে আর ওদিকে উত্তরোত্তর বংশবৃদ্ধি হতে থাকবে। বাড়িঘর ভেসে যেতে থাকবে বন্যায় আর ওদিকে মাটি ফুটিফাটা হবে খরায়। তোমাদের সন্তানেরা কোদাল ছেড়ে বেকার ঘুরে বেড়াবে শূন্যতায়। তোমরা লোক ঠকানোর কায়দা শিখবে, বন্ধুকে বিষ দিতে শিখবে। দেখবে সব চুরমার হয়ে যাবে। খুলে খুলে পড়ে যাবে।

নাইজেরিয়ার ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবে এই অভিশাপটি ধরে রেখেছেন তাঁর প্রথম উপন্যাসে, থিংস ফল অ্যাপার্ট। বেশ এই যদি অভিশাপ হয় তাহলে পাপটা কি? আফ্রিকা আর এই বিংশ শতাব্দীর যোগাযোগটা বিশেষ সুবিধের হলো না। হাত মেলানোর সমস্ত সর্তই সর্বনাশা। আফ্রিকার অতীত ভুলিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা। অতীতকে ফেলে দিয়ে ভবিষ্যৎ দাঁড়াতে পারে না। বর্তমান সেই কারণে বিভ্রান্ত। এতকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে আধুনিকীকরণের চেষ্টাটাই পাপ। আফ্রিকা থেকে আফ্রিকাকে বের করে দেবার চেষ্টাটাই পাপ। ইওরোপের দরজা খুলে সামাজিক পরিবর্তনের বিশাল অভিঘাত প্লাবনের মতো আছড়ে পড়েছে আফ্রিকার বুকে। সেই আঘাতে সমাজ গরম জলের মতো ফুটতে শুরু করেছে।

১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় রুজভেল্ট আমেরিকানবাসীদের সুন্দর একটি কথা বলেছিলেন, 'The only thing we have to fear is fear itself'. যা আমাদের ভয় করা উচিত তা হলো ভয়। ভয়কেই ভয় করা উচিত। আশির দশকে আফ্রিকায় আমরা কি দেখছি, প্রচন্ড রাজনৈতিক টালমাটাল, অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে, সমাজে ওলটপালট, ঘোর সাংস্কৃতিক সঙ্কট। রুজভেল্ট থাকলে বলতেন, 'The main thing we need to change is our own changeability'। পুরনো নতুন হবে; সব কিছুই বদলাবে তার মানে এই নয় সঞ্জীব ম্যাকিনটশ হয়ে যাবে। আফ্রিকা হয়ে যাবে আমেরিকা। ইংরেজের সংস্পর্শে এসে ওই সর্বনাশটাই আমাদের হতে চলেছিল হারসাধন দও হচ্ছিলেন এইচ এস. ডাট। বাপ মাকে ভুলে ইংরেজদের মতো হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ সর্বস্ব পরিবার। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস। রেল কম্পানী কর্মচারীদের পাস দিচ্ছেন, সে [illegible] মা কি বাবার ভ্রমণে যাবার অধিকার নেই। অধিকারী স্ত্রী! বিবাহ-বন্ধনের এতকালের [illegible] ভুলে নেচে বেড়াচ্ছি ফ্রী সেকসের শ্লোগান তুলে। বিয়েটাই শেখা হলো না, শিখে [illegible] ডিভোস।

তোমরা কালো, তোমরা আফ্রিকান এই বোধটা কারা তৈরি করল, সাদা চামড়া, সাদা দুনিয়ার মানুষ। আধুনিক আফ্রিকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ভাগ্য বিড়ম্বনার সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক হলো ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদ ডেঁবেমুশে শোষণ তো করলই আর সর্বাঙ্গে দেগে দিল একটি শব্দ, 'আফ্রিকা'। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে পন্ডিত সুনিপুণ বিশ্লেষণকারী বারনার্ড লুইস একবার প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'তুর্কী কাদের বলে? আমরা কাদের তুর্কী বলি?' তারপর উত্তরটা নিজেই দিয়েছেন, 'নিজেকে যে তুর্কী ভাবে, সেই তুর্কী'।

লিউইস ওই একই ভাবে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আরব কাকে বলে?' উত্তরও ওই এক, আরব ভাবলেই আরব। পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাপথে আবার এক প্রশ্ন পরিস্থিতি ঘোলালো করে তুলেছে! একদল মানুষ, যারা নিজেদের আফ্রিকান বলে, তারাই এখন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিশ্বের রাজনীতিতে আফ্রিকার মানুষের স্থান কোথায়! কতটা প্রভাব তারা ফেলতে পেরেছে। পশ্চিমের দুনিয়া এই সমস্যা সম্পর্কে কতটা সচেতন!

সুপরিচিত আমেরিকান আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ মেলভিল হারসকোভিটস মনে করেন আফ্রিকা হলো ভূগোলের গল্প। যাঁরা ম্যাপ তৈরি করেন তাঁরাই কাল্পনিক রেখা টেনে দেশভাগ করেন। ইওরোপের

কার্টোগ্রাফাররা বিশাল এক মহাদেশকে রেখায় লেখায় জর্জরিত করে দিলেন। বলার কিছু নেই। বন্দুক আর বারুদের শক্তিতে তাঁরা ছিলেন বলীয়ান। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে আফ্রিকা অভিনব। একদিকে বিশাল মরুভূমি। বালি আর বালিয়াড়ি। অন্যদিকে গভীর গহন অরণ্যানী। কত রকমের প্রজাতি! খয়সান থেকে সেমাইটস। ভাষারও কত রকমভেদ। য়োরুবা থেকে কিডিগো। ১৬৫৬ সালে ফরাসীদেশের রয়্যাল জিওগ্রাফার লিখেছিলেন, আফ্রিকা এক বিশাল মহাদেশ। পৃথিবীর তৃতীয়াংশ। ইওরোপের দক্ষিণ প্রান্তে বিশাল এক ভূখন্ড। বহুকাল এই ধারণাই চলে এসেছে, উত্তর আফ্রিকা হলো দক্ষিণ ইওরোপের প্রসারিত অংশ। ইসলামের বিজয় অভিযান সেই ধারণা পালটে দিলে। উত্তর আফ্রিকা হয়ে দাঁড়াল আরব ভূখণ্ডের পশ্চিমাংশের প্রসারণ। আফ্রিকাকে কিছুতেই বলা গেল না উপসাহারা অঞ্চলের উত্তরাংশের সম্প্রসারণ। ম্যাক্স বেলফ সেই কারণেই বলেছিলেন, ভূগোলের পারম্পর্য বোঝা সহজ, কঠিন হলো ইতিহাসের ধারা।

১১

আকাশ পথে কত দূর এলুম কে জানে! ট্রেন হলে তবু বোঝা যায়। মোগলসরাই না সাহারানপুর! আকাশে তো স্টেশন নেই। স্রেফ অন্ধকার। বিরক্তিকর ব্যাপার। সেই কারণেই মনে হয় গেলাস গেলাস মদ গিলিয়ে বিমান সেবিকারা ধুম্ব ধুম্ব মানুষগুলোকে অজ্ঞান করে কম্বল চাপা দিয়ে ফেলে রাখে। আমার মন যখন আফ্রিকায় ঘুরছিল সেই ফাঁকে কুমকুম এক ঘুম দিয়ে নিয়েছে। চোখ খুলে বললে, 'একটা কোক খেলে মন্দ হয় না!'

অবাঙালীদের মুখে বাঙলা বড় মিষ্টি শোনায়। আমাদের পেছন দিকেই বিমানের ভাঁড়ার ঘর। সেখানে শরীর একটু শান্ত হয়ে বসেছেন। খাবারদাবার নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক যা ছোটাছুটি হয়েছে। মাথার ওপর হাত তুলে পুট করে ডাকার আলোটা জ্বালিয়ে দিলুম। আমার বাঁপাশের প্রবীণা মহিলা শান্ত হয়ে বসতে পারছেন না। বারে বারে উঠে যাচ্ছেন। একবার দেখলুম ছোট্ট একটা প্যাডে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিছু লেখার। তার আসন এখন শূন্য। সেই গোল টিপ, গোল মুখ বিমান-সেবিকা এলেন। মুখে মধ্যরাতের হাসি।

পানীয় এল। এল ছোট ছোট টুথপেস্ট। টুথপেস্ট মানেই ভোর হয়ে আসছে। বেশ দেখতে, যেন খেলাঘরের টিউব। পুতুলে দাঁত মাজবে। একটা টিউবের ছিপি খুলতেই সাদা সাপের মতো ফোঁস করে বেরিয়ে এল ইঞ্চি খানেক পেস্ট। রকমসকম দেখে মনে হলো পুরোটাই বেরিয়ে আসবে। খাবার সময় যে টিসু পেপারের রুমাল দিয়েছিল, সেটা বাঁচিয়ে রেখেছিলুম। কথায় বলে, যাকে রাখো সেই রাখে। টিসু দিয়ে মুখটা চেপে ধরে ছিপি আটকে দিলুম। কুমকুম অবাক হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে। প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ তখনও কাটেনি। বিব্রত ভাবটা কাটাবার জন্যে দার্শনিকতার আশ্রয় নিলুম, 'বুঝলে কুমকুম টুথপেস্ট হলো জীবনের মতো, যা বেরিয়ে গেল তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না।'

কুমকুম তখন কিছু বললে না। কম্বল টেনে অবশোয়া হলো। পরে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে সব সঙ্কোচ ঝরে গিয়ে, যখন রসিকতার সম্পর্ক এল, তখন প্রায়ই বলতো, 'দাদা, জীবন হলো টুথপেস্ট।' কুমকুম ঘুমোচ্ছে। সারা বিমান ঘুমোচ্ছে। বিশাল এক ঘুমন্ত পাখি উড়ে চলেছে অন্ধকার আকাশে।

আমি চোখ বুজিয়ে দেখছি, একটা উট ছুটছে মুখ তুলে। উট চলেছে মুখটি তুলে, ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে। উটের পিঠে যিনি বসে আছেন, তাঁর নাম মহম্মদ আবদিল্লে হাসান। যাঁকে সাদা মানুষেরা বলতেন, 'ম্যাড মোল্লা।' বীর যোদ্ধা আবার সোমালি ভাষার অগ্রগণ্য কবি। একই সঙ্গে কলম আর তরোয়ালের এমত সমাবেশ আর হয়েছে কি না সন্দেহ। তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়েছেন, লড়েছেন ইতালিয়ানদের সঙ্গে। একটা সময় ছিল, যখন আফ্রিকা ছিল সাম্রাজ্য শক্তির বড় লোভের পিঠে! যে যেখান থেকে পারছে এসে খাবলা মারছে। অধিবাসীরা কালো হলে কি হবে, মাটি খুঁড়লেই হীরে। জাল ফেললেই হাজার হাজার ক্রীতদাস। ধরো আর চালান করে দাও সাদা দুনিয়ায়। গ্রামকে গ্রাম খালি। সেই সব

গ্রাম দেখতে দেখতে আগাছায় ভরে যেত। মানুষের পরিবারের স্বপ্ন, সুখের সংসারের স্বপ্ন হারিয়ে যেত অরণ্য আর শ্বাপদের পায়ের তলায়! মায়েরা ভয় পেতেন সন্তানের জননী হতে। সন্তান মানেই তো আর একটি ক্রীতদাসের জন্ম। অদ্ভুত একটি বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ছে :

হিউলেট অ্যান্ড ব্রাইট
বিক্রয়
মূল্যবান ক্রীতদাস
(চলে যাবার জন্যে)

নিচে যাদেব নাম দেওযা হলো, সেই সব মূল্যবান ক্রীতদাস বিক্রয় করা হবে কারণ মালিক দেশে চলে যাচ্ছেন। বিক্রযস্থলেব ঠিকানা . নিউ একসচেঞ্জ, সেন্টলুইস ও গবট্রেস স্ট্রিটের কোণে। বিক্রয়ের তারিখ, ১৬ মে শনিবাব, বেলা বাবোটা।

বিবরণ

১. সারা—আধা নিগ্রো, আধা শ্বেতাঙ্গ বয়স ৪৫। ভালো রাঁধুনী।

২ ডেনিস—তাব ছেলে আধা নিগ্রো, আধা শ্বেতাঙ্গ বয়স ২৪ ভালো রাঁধতে পারে।

৩. চেলে—আধা নিগ্রো, আধা শ্বেতাঙ্গ বয়স ৩৬ এমন চাকরানী এ-দেশে আর দুটি নেই।

৪. ফ্যানি —ওর মেয়ে, আধা নিগ্রো, আধা শ্বেতাঙ্গ বয়স ১৬ ফরাসী আর ইংরেজি বলতে পারে। হেয়ার ড্রেসার।

এই ভাবে পরপর মোট দশজনের নাম। বিজ্ঞাপনের শেষ কথা, উল্লিখিত সব ক্রীতদাসই এই দেশের আবহাওয়াব উপযোগী ও এ-দেশেব সুন্দর প্রজা। বর্তমান বিক্রেতা বহুকাল আগে কিনেছিলেন। শাসনে থাকাব ফলে দন্ডনীয অপবাধ এবা করবে না, সে বিষয়ে বিক্রেতা নিঃসন্দেহ। একমাত্র সমস্যা শেষোক্ত ফ্র্যাঙ্ককে নিয়ে। তার সবই ভালো, কেবল মাঝে মাঝে একটু বেশী মদ্যপান করে ফেলে।

সর্ত—দামের অর্ধেক দিতে হবে নগদে। বাকি অর্ধেক নোটে, যা ভাঙাবার মেয়াদ থাকবে ছ মাস। বিক্রেতার সর্বপ্রকার সন্তুষ্টি অনুসারে দলিল তৈরি হবে। যত দিন না পুরো দাম মেটানো হচ্ছে ততদিন ক্রীতদাসেরা বিক্রেতার বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে। এই হাতবদল আইন সিদ্ধ করবেন, উইলিয়াম বসওয়েল নোটারি পাবলিক। খবচ বহন করবেন ক্রেতা।

নিউ অরলিনসে এই ইস্তাহার বিলি করা হয়েছিল। তাবিখ ১৩ মে, ১৮৩৫।

পৃথিবীকে এক সময় কি ভাবে ধর্ম দিয়ে গ্রাস কবা হয়েছিল। মহামানবেরা এসেছিলেন শান্তি, মুক্তি, মৈত্রীর বাণী নিযে। জীবত্ব থেকে দেবত্বে নিয়ে যেতে। রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছিলেন, ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠিয়েছ বারে বারে। দূতের পেছনে পেছনে ভূতও আসে। পৃথিবী যে সাংঘাতিক লোভের জায়গা। এখানে যা নেই ওখানে তাই আছে। আমার যা নেই তোমার তা আছে। যাঁরা বলছেন, 'এহ বাহ্য', তাঁরাই আবার বলছেন, 'বীবভোগ্যা বসুন্ধরা।' যুদ্ধ হলো হিংসা, আবার ধর্মযুদ্ধ হলো পুণ্যকর্ম। অর্জুনেব হাত থেকে গান্ডীব খসে পড়ে যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে বলছেন, তুমি তো নিমিত্ত মাত্র, এই দেখ আমার মুখ গহ্বরে, কোটি জীব জন্মাচ্ছে, কোটি জীব মরছে।

কুমকুমের হাতে কি একটা খড়মড় করছে। চোখ না খুলে কম্বলের তলা থেকে একটা হাত বের করল। হাত উঠে এল আমার চোখের সামনে। দু আঙুলে ধরা লজেন্স। কে কবে শেষ রাতে লজেন্স খেয়েছে! যে লজেন্স আবার চাঁপার কলি আঙুলে ধরা থাকে। জীবনের এক একটা দিন, এক একটা দিন। কোনও দুটো দিন সমান হয় না। দুটো মানুষ যেমন সমান হয় না।

ঘুমঘুম গলায় কুমকুম বললে, 'কটা বাজল?'

সময় জিজ্ঞেস করায় মনে পড়ল, আকাশেব এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে আমার সময় আর বাইরের সময় মিলবে না। বেজেছে তিনটে। সময়ে আমরা পেছচ্ছি, না এগোচ্ছি! আমার ঠিক জানা নেই। মনে হয় পেছচ্ছি। যেতে যেতে এক ভদ্রলোক আমাদের আসনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য। কুমকুমকে বললেন, 'হ্যাললো।' হাসলেন, হাত নাড়লেন, 'ট্রাই টু স্লিপ'। চলে গেলেন,

সামনের ভি. আই. পি. এলাকার দিকে।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কে, কুমকুম?'

'মণিশঙ্কর আয়ার।'

'আচ্ছা, ইনিই মণিশঙ্কর। প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছের লোক। অ্যাডভাইসার।'

'ভেরি পাওয়ারফুল, অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট।'

কুমকুম ওপাশে জানালার দিকে হেলে পড়ল। আমার বাঁ পাশের প্রবীণা মহিলা কফি খাচ্ছেন। কি আর করবেন! পাখির পেটে বসে আছি, যেন ডিমে তা দিচ্ছি। আমি আবার ফিরে গেলুম চিন্তার রাজ্যে। যাচ্ছি লন্ডন, ভাবছি আফ্রিকার কথা। কাল সকালেই শুরু হচ্ছে কমানওয়েলথ কনফারেন্স। ছোট কমানওয়েলথ। সরকারী ইস্তাহারে বলা হচ্ছে—'কমানওয়েলথ মিনি সামিট।' ৪৯টি রাজ্য নিয়ে এই কমানওয়েলথ। ইংরেজি ভাষাভাষী এই দেশগুলি প্রায় সব মহাদেশ, সব সাগ : ঘিরে ছড়িয়ে আছে। আধুনিক বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ দেশ কমানওয়েলথ সদস্য। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ কমানওয়েলথভুক্ত। কম কথা! আমেরিকা আর বড় বড় আরও কয়েকটি দেশ এর বাইরে। ইউনাইটেড নেশানসের মতোই কমানওয়েলথ ইংল্যান্ডের রানীর নেতৃত্বে সভ্যদেশগুলির স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, তা হোক, সবাই মিলিত এক স্বার্থে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে, আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে, উন্নতির পথে এগিয়ে চলা।

মিনি সামিট ডাকতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা অত্যাচার স্তব্ধ করার জন্যে। Apartheid must be dismantled now if a greater tragedy is to be averted, and that concerted pressure must be brought to bear to achieve that end. বর্ণবৈষম্যের খোল নলচে খুলে ফেলতে হবে। তা না হলে, দক্ষিণ আফ্রিকার জনজীবনে ঘোরতর সঙ্কট আসন্ন। কমানওয়েলথভুক্ত সমস্ত দেশকে সেই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বোথা সরকারের ওপর ভয়ঙ্কর একটা চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

কোনও কোনও দেশের ইতিহাস যেন দুরারোগ্য ব্যাধি।

প্রথম মানুষ মনে হয় আফ্রিকাতেই ট্যাঁ করেছিল। বিশেষজ্ঞরা তো সেই রকমই বলেন। একদিকে অ্যাটলান্টিক আর একদিকে ভারত মহাসাগর, মাথার ওপর ইওরোপ, পড়ে আছে আফ্রিকা। এক সময় বলা হতো ডার্কেস্ট আফ্রিকা। অসহ্য গরম। কোথাও অবিরাম বৃষ্টি, কোথাও বারিহীন শুষ্ক মরুভূমি। প্রকৃতির বিশাল হেঁয়ালি। এখানে মানুষ জন্মায় যত, দ্রুত মরেও তত। ১৯৩১ সালে কিনিয়ান লুইস লিকে লেক ভিক্টোরিয়ার রুসিঙ্গা দ্বীপে একটি প্রাণী আবিষ্কার করলেন। বানরজাতীয় প্রাণী। নাম হলো প্রোকনসাল। এর আগে যে সব উচ্চ জাতীয় বানর পাওয়া গিয়েছিল, এই প্রাণীটির মস্তিষ্ক তাদের চেয়ে অনেক বড়। দৃষ্টিশক্তি অনেক বেশি পরিষ্কার যাকে বলে 'স্টিরিওস্কোপিক ভিসান'। মাটির যে স্তর থেকে প্রোকনসালকে পাওয়া গেল, ভূতাত্ত্বিকের হিসেবে তার বয়েস হবে দু কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর। ১৯৫৯ সালে লিকে এবং তাঁর স্ত্রী মেরি ওলডুভাই জর্জে আরও উন্নত প্রাণীর খুলি পেলেন। তার নাম দিলেন জিনজ্-অ্যানথ্রোপাস। যার মানে হলো জিনজ মানব। জিনজ্ হলো পূর্ব আফ্রিকার আরব নাম। সঙ্গে পাওয়া গেল কিছু পাথুরে অস্ত্রের টুকরো। বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা পোটাসিয়াম আরগন ডেটিং পদ্ধতির মাধ্যমে পৃথিবীতে এই প্রাণীর বিচরণকাল নির্ধারণ করলেন ১৫ লক্ষ বছর আগে। সতের লক্ষ বছর আগে থেকে পনের লক্ষ বছর, তার মানে ২ লক্ষ বছর ধরে এই প্রাণীর আধিপত্য ছিল ভূপৃষ্ঠে। তারপর থেকে ওই একই অঞ্চলে আরও দু'টি ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও উন্নত ধরনের প্রাণীর, যাকে বলা হয় হোমোহ্যাবিলিস বা স্কিলফুল ম্যান। পারদর্শী মানব। ১৯৮৪তে আরও প্রমাণ মিলল। আফ্রিকাই ছিল মানুষের প্রথম নিলয়। দুই কিনিয়বাসী, কামোয়া কিমেউ ও লুইসের ছেলে রিচার্ড লিকে, লেকটুরকানার জলা থেকে একটি বারো বছরের শিশুর কঙ্কালের প্রায় সবটাই আবিষ্কার করলেন। শিশুটি ছিল হোমোইরেক্টাস শ্রেণীর। আধুনিক চিন্তাশীল মানবের পূর্বপুরুষ। হোমোহ্যাবিলিস আর হোমোস্যাপিয়েনের মাঝামাঝি স্তরের প্রাণী। প্রায় মানুষ, যে মানুষ আজ পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এই সব পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার প্রমাণ করে প্রথম মানুষ আফ্রিকাতেই জন্মেছিল। স্বর্গোদ্যান বা গার্ডেন অফ ইডেন যদি থেকেই থাকে তাহলে সেই উদ্যান হলো আফ্রিকা। যেখানে আদম আর ইভ নিষিদ্ধ আপেল ফলটি খেয়েছিল। আফ্রিকা শুধু প্রথম মানবের দোলনা নয়,

সভ্যতারও বিকাশভূমি। পূর্ব আফ্রিকা মানুষ ও তার সংস্কৃতির যেমন উৎসস্থল, সেই রকম আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে শুরু হয় মানুষের প্রথম চাষবাস। কৃষির আবিষ্কার। উত্তর আফ্রিকায় প্রথম গড়ে ওঠে তাক লাগিয়ে দেবার মতো সভ্যতা। পশুপালনের মতো, লতা বৃক্ষ-পত্রাদি পালনও শুরু হয়েছিল আফ্রিকায়। নন ভেজিটেরিয়ান থেকে ভেজিটেরিয়ান। ফসলের উদ্ভব। ইতিহাস বলছে আফ্রিকাই মানুষের প্রথম 'জেনিসেন্টার'। আফ্রিকাতেই শুরু হয় সরগম, চাল, তৈলবীজ, বেডি, তুলো, তরমুজ, কফি, কাউপি, অয়েলপাম, কোলানাট প্রভৃতির প্রথম চাষ। প্রকৃতির বিশাল ও বিচিত্র সবুজের ভাণ্ডার থেকে আফ্রিকার মানুষ সভ্যতার সেই উষালগ্নে খুঁজে খুঁজে বের করেছিল, কি মানুষের খাদ্য, কি মানুষের অখাদ্য, পশুরই বা কি খাদ্য। পরের যুগে আফ্রিকাই আবিষ্কার করে, গম, যব, যোয়ার। নীলনদের উভয় তীরে খুলে গেল সভ্যতার জোয়ার। ফারোয়াদের লীলাভূমি। পিরামিডের আকাশছোঁয়া ঔদ্ধত্য। যা হয়ে গেছে তা আজও আমাদের বিস্ময়।

তারপর কি হলো? তারপর যা হলো তা আর বলার নয়। আমরা বাঁ পাশের ভদ্রমহিলার কোলের ওপর কফির গেলাস উল্টে গেল। আমার কোনও দোষ নেই। আমি হাত নাড়িনি, পা ছুঁড়িনি, হাঁচিনি, কাশিনি। প্লাস্টিকের গেলাস বালিশের কারসাজিতে উল্টে গেল। আমাদের প্রত্যেকের পেছনে দুটো করে ছোট বালিশ বিমান কোম্পানি দিয়েছেন। দূর যাত্রার আরামকে আরও আরামপ্রদ করার জন্যে। জোড়া বালিশ আমরা পেছনে কোমরের কাছে রাখতে পারি। একটাকে তুলে দিতে পারি ঘাড়ের কাছে। ভদ্রমহিলার ঘাড়ের কাছের বালিশ হঠাৎ কাঁধের ওপর দিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে কফির গেলাসের ওপর।

ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট।'

আমি বললুম, 'টু আর ইজ হিউম্যান।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ব্ল্যাংকেটস আর ওয়াশেবল।'

কুমকুম ঘুমোতে ঘুমোতে বললে, 'ড্রাই ওয়াশ।'

বিমানসেবিকা এগিয়ে এলেন। মুখে বাঁধাধরা অমলিন হাসি। কম্বলটা কোল থেকে ধীরে সরিয়ে নিলেন। নিচু হয়ে গেলাসটা তুলে নিলেন পায়ের তলা থেকে। অনেকক্ষণ একভাবে বসে আছি। এই সুযোগে বেরিয়ে এলুম আমার খাঁচা থেকে। পেছন দিকে টয়লেট। তার আগে তিনপাশে পর্দা ঘেরা, সেবিকাদের বিশ্রাম খুপরি। পর্দার তলা দিয়ে উঁকি মারছে শাড়ির পাড়। গুজুর গুজুর আলাপ আলোচনার শব্দ ভেসে আসছে।

বিমানের টয়লেট বেশ একটা কমপ্যাক্ট সিস্টেম। ডানপাশে আয়না। তার তলায় স্টেনলেস স্টিলের বেসিন। চারপাশে হরেকরকম নির্দেশ। কোথায় ব্লেড ফেলতে হবে। কোথায় ফেলতে হবে টিস্যু পেপার। ফ্লাশ টানতেই বড়ো জল গোল হয়ে প্যানে ঘূরপাক খেয়ে গেল। পৃথিবীর কত হাজার ফুট ওপরে এই সব কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। আয়নার পাশের র‍্যাকে হরেক রকম কসমেটিকস। মুখেরটা মুখে লাগালুম। গায়ে যেটা মাখতে হবে সেটা ফ্যাস করলুম। একটা ড্রয়ার রয়েছে সেটা টানতেই বেরিয়ে পড়ল এয়ার ইণ্ডিয়ার ছাপ মারা চিরুনি, তোয়ালে, সেই ছোট্ট ছোট্ট টুথপেস্টের টিউব। যত ভাবে পারা যায় প্রসাধন করে বেরিয়ে এলুম। আসতে আসতে ভাবলুম হোমোহ্যাবিলিস থেকে হোমোইরেকটাস হলুম, হোমোইরেকটাস থেকে হোমো স্যাপিয়ান্স। সেই অবস্থা থেকে আজ এই উন্নতি। গা থেকে ভুরভুর করে কোলনের গন্ধ বেরোচ্ছে। [illegible] উন্নত হয়েছে। আসনের ধারে একটা উঁচু মতো জায়গায় একটা ট্রে রয়েছে। ট্রেতে [illegible] লজেন্স। গোটা কতক তুলে নিলুম। আবার আসনে বসে আছি। নেই কাজ তো খই ভাজ। লজেন্স খাই।

মিনি সার্কিট। সার্কিটেরও মিনি ম্যাক্সি আছে। দুই মহিলার মাঝখানে আবার আমি ভাবতে বসলুম। ইডেনের মানুষের এই অবস্থা হলো কি করে! মিনি সার্কিট করে ভাগ্য ফেরাতে হচ্ছে। আদম আর ইভের বংশধররা প্রথমে শিকার করতে শিখল। মারে আর খায়। বলা যায় না, আমিও হয়তো সেই দলে ছিলুম। তারপর জন্মাতে জন্মাতে আজ আকাশে উড়ছি। শিকার থেকে এল এলাকার নিয়ন্ত্রণ। এই হলো আমাদের এলাকা। এই এলাকায় আমরা শিকার করব। তোমাদের অধিকার নেই। এই অধিকার বোধ থেকে এল যুদ্ধ। শিকারই যুদ্ধের জন্মদাতা। এল পশুপালন। মানুষ চাষবাস শিখল। পাথরে পাথর ঠুকে পাওয়া গেল আগুন। আকাশে প্রথম উড়ল ধোঁয়া। বসতি থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহর, শহর

থেকে নগর, নগর থেকে মহানগর। হাতিয়ারের যুদ্ধ থেকে পারমাণবিক লম্ফঝম্প।

আফ্রিকার মাথাটা কি ভাবে উড়ে গেল। আবার দুনিয়াটা কি ভাবে বেরিয়ে এল মূল ভূখন্ড থেকে! ইংরেজের খুব গর্ব ছিল, তাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। এখন আর সে অবস্থা নেই। সূর্য এখনও অস্ত যায়। প্রশ্ন এখন নানা দিক থেকে নানা ভাবে ফুড়ে বেরোচ্ছে। যেমন প্রবল প্রতাপের যুগে ইংরেজ সময়ের ওপরেও প্রভুত্ব করত। গ্রীনউইচের সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষকে ঘড়ি মেলাতে হবে। বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জের ছোট একটা জায়গা গ্রীনউইচ সারা পৃথিবীর ঘড়ি নিয়ন্ত্রণ করছে। এমনই ইংরেজের প্রতাপ। যে দ্রাঘিমা গ্রীনউইচের ওপর দিয়ে গেছে সেই একই দ্রাঘিমায় উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার বহু শহর ও গ্রাম রয়েছে। পৃথিবীর 'মিনটাইম' গ্রীনউইচের সঙ্গে না মিলিয়ে আফ্রিকার ওই মধ্যরেখায় অবস্থিত যে কোনও একটি স্থানের সঙ্গে মেলানো যেত। 'গ্রীনউইচ মিন টাইম' না বলে বলা যেত 'গাও মিরিডিয়ান'। কবে কোন রাজা, অষ্টম হেনরি গ্রীনউইচে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, সময় দিয়ে সেই প্রাসাদকে সারা পৃথিবীর মানুষ কেন স্মরণ করবে। যেহেতু ইংরেজের তোপ ছিল, বারুদ ছিল, নৌবহর ছিল। সংহের নৃপতিদের রাজধানী 'গাও'কে কেন আমরা ভুলে যাব। সময়ের কথা বলতে গিয়ে কেন আমরা বলব না 'গাও মিনটাইম।'

আরও সাংঘাতিক প্রশ্ন, আফ্রিকার উত্তরে মাথার ওপর ইওরোপ। কেন ওপরে। কেন নিচে নয়। পৃথিবীর মানচিত্রে আফ্রিকা নিচে। অর্থনীতিতে নিচে। ক্ষমতায় নিচে। আন্তর্জাতিক সম্মানে নিচে। আফ্রিকা হলো পৃথিবীর তলানি। মানচিত্র বলছে ইওরোপ ওপরে ওই আফ্রিকা ইওরোপের পদতলে। ইওরোপের মানচিত্র প্রণেতাদের খেয়াল খুশি। যেহেতু তারা প্রণেতা সেই হেতু পৃথিবীটাকে তাঁরা তাঁদের দিক থেকে দেখে বললেন এইটা উত্তর মেরু, এইটা দক্ষিণ মেরু। দূর আকাশ থেকে এই গ্রহটির দিকে কে ওইভাবে তাকাতে বলেছিল। ম্যাপ তৈরি হয়েছে সেই কোন সকালে, তখন কোনও ইওরোপীয় মহাকাশে ওঠেনি। আজ ইওরোপীয়দের কারসাজিতেই পৃথিবীর দিকে ওইভাবে তাকাতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। বহু আগে তৈরি ওদের ম্যাপ বলছে এইভাবে তাকাও। Yet there is no reason, from an astronautical or cosmonautical point of view Why the South Pole should not be the North Pole and vice versa

ইওরোপের জাতিবৈষম্য, শ্বেতকেন্দ্রিক তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ষোড়শ শতকের ইওরোপীয় মানচিত্র প্রণেতা জেরহার্ড মারকেটারের তৈরি মানচিত্র। উত্তর গোলার্ধের মহাকাশ সমূহের আকার আকৃতিকে খেয়ালখুশি মতো বড় করা হয়েছে। সাদা দুনিয়া বড়, কালো দুনিয়া ক্ষুদ্র। এই ছিল মারকেটারের দৃষ্টিভঙ্গী। মারকেটারের ম্যাপে উত্তর আমেরিকা আফ্রিকার চেয়ে দেড়গুণ বড়। গ্রীনল্যান্ড আর আফ্রিকার প্রায় এক মাপ। অথচ প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকা উত্তর আমেরিকার চেয়ে সাড়ে তিনগুণ বড়। আফ্রিকার তুলনায় গ্রীনল্যান্ড একটা রুটির টুকরো। গ্রীনল্যান্ডের মাপ হলো, ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আর আফ্রিকা, ৩ কোটি বর্গ কিলোমিটার। শয়ে শয়ে বছর ধরে ছেলেমেয়েরা এই পক্ষপাতদুষ্ট মানচিত্র দেখে দেখে ভুল ভূগোল শিখল। জেনে গেল পৃথিবীর উত্তর গোলার দক্ষিণের চেয়ে অনেক বড় বিপুল বিশাল। পৃথিবীর যত বুদ্ধিমান, শক্তিশালী উন্নত শ্বেতাঙ্গ মানবমানবীর বাসস্থান। পৃথিবীর সব বিত্ত, বৈভব, উত্তরে জমজমাট। ষোড়শ থেকে বিংশ শতক ইতিহাস চলে এল এই ভুলের পোশাক পরে। সাদা উত্তরটাই সব কালো দক্ষিণ কিছুই না। আফ্রিকার কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে শোনাই The visual memories of millions of children across generations have carried distorted ideas about the comparative physical scale of northern continents in relation to Southern ones আফ্রিকার প্রকৃত আয়তন চীন আর ভারতকে এক করলে যা হয় তার চেয়েও বড়। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে রাজ্যলোভী যে সব শক্তি আফ্রিকাকে দখল করে চলেছে সেই সব সাম্রাজ্য খণ্ডকে আফ্রিকা তার বিপুল আয়তনে বার কতক গ্রাস করতে পারে

টুক টুক আলোর নোটিস জ্বলে উঠল। ফাসন্স ইওর সিটবেল্ট। গোল জানালার ওপাশে পাখির মতো ভোরের ঝাপসা আকাশ। কুমকুমকে সরিয়ে আমি ধারের আসনে চলে গেলুম। লন্ডন ক্রমশ ওপরে উঠে আসছে। না আমি ক্রমশ নিচে নামছি।

১২

আজ রবিবার। নিদ্রিত শহর লন্ডনের মাথার ওপর রাজীবের বিশেষ বিমান চক্কর মারছে। ক্রমশই আমরা নিচে নামছি। মেঘ ফাটা আকাশে ভোরের রোদ ঝিলিক মারছে। লন্ডনে রোদ কমানওয়েলথ মিনি-সামিটের চেয়েও দুর্লভ ব্যাপার। বিমানের ঘুলঘুলি দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছি। এতক্ষণের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা সব মিলিয়ে গেছে। যাঁরা হাজার বার লন্ডন গেছেন তাঁদের কাছে এই অবতরণ কিছুই না। আমার কাছে সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। মনে হচ্ছে, শেকসপীয়ার, ডিকেনস, চসার, ড্রাইডেন, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, শার্লক হোমস সবাই এক সঙ্গে নিচে থেকে আমাকে ডাকছেন, 'কাম ডাউন মাই বয়'। কত পড়েছ। কত কবি 'হেজেল আয়েড' মেয়েদের জন্যে পাতার পর পাতা কবিতা লিখেছেন। এক সময় বিলেত ঘুরে না এলে এ-দেশের মানুষ জাতে উঠত না। শার্লক হোমসের পাতায় পাতায় ইংল্যান্ডের বর্ণনা। আমি যে দেখতে পাচ্ছি ওয়াটসনকে, It was quarter past nine when I started from home and made my way across the Park, and so through Oxford Street to Baker Street.

সব এখন আমার পায়ের তলায়। রুমাল মাপের ছোট ছোট নিখুঁত সবুজ লন দেখতে পাচ্ছি। ছবির মতো ছোট ছোট বাড়ি। জানলায় সব পর্দা টানা। বাড়ির ছাদে ছাদে চিমনি। প্রাচীন কালের সাক্ষী। লম্বা লম্বা ফিতের মতো রাস্তা এদিকে ওদিকে খুলে খুলে চলে গেছে। জনপ্রাণী নেই। লন্ডন রবিবারের ঘুমে অচেতন। দেখতে পাচ্ছি টেমস নদী। বড় বড় ক্রেন। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। ধীব গতি দুয়েকটি গাড়ি। টুপি মাথায় বৃদ্ধ হব সাহেব টুকুস টুকুস হাঁটছেন। আমি মনে মনে ভাবছি, ওইটা ট্রাফালগার স্কোয়ার। ওই তো প্যাডিঙ্গটন স্ট্রিট, পলমল, পার্ক স্ট্রিট, পিকাডিলি, ব্লুমসবেরি স্ট্রিট, কুইনস গেট। কিছুই জানি না, অথচ মনে হচ্ছে সব জানি।

আকাশে শেষ চক্কর মেরে বিমানের নিখুঁত অবতরণ। রাজীবের বিমান যে ক্যাপটেন চালাচ্ছেন, তাঁর নিখুঁত হাত। রানওয়ে ছোঁয়ার সময় কোনও রকম ঝাঁকুনিই টের পাওয়া গেল না। একেই বলে, 'স্মুথ ল্যান্ডিং'। আমরা সিটবেল্ট খুলে ফেললুম। শেষ লজেন্সটা পুরে দিলুম মুখে। ঘড়ির দিকে তাকালুম। সাড়ে চার ঘণ্টা সময় লাভ হয়েছে। ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে দশ, লন্ডনের সময় ভোর ছটা। কি মজা! সময়কে কেমন ট্যাঁকে পুরেছি!

নিয়মটা হলো, সামনের দরজা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলবল নিয়ে নেমে যাবেন। বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের এক পাশে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বাগত জানানো হবে। তিনি তাঁর গাড়িতে উঠবেন, তারপর আমরা গুটিগুটি পেছনের দরজা দিয়ে নামবো। পেছনের দরজায় সিঁড়ি লেগে গেছে। আমরা তার ধাপে ধাপে দাঁড়িয়ে আছি। মাথার ওপর লন্ডনের ঠান্ডা ঘোলাটে আকাশ। লাজুক মেয়ের ঠোঁটের হাসির মতো রোদের ঝিলিক। হঠাৎ দেখি বিমানবন্দরের চারপাশের উঁচু নিচু ছাদে ব্লব, ব্লব করে মাথার পর মাথা জেগে উঠছে। যতটুকু দেখা যাচ্ছে, কালো ইউনিফর্ম, কালো ক্যাপ। হাতে স্টেন গান, চোখের কাছে ধরা বাইনোকুলার। সাদা ধবধবে পাথুরে মুখ। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই ওই এক দৃশ্য। বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের চারপাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন অনুরূপ পোশাকের নিরাপত্তা বাহিনী। বাঘের মতো কুচকুচে কালো অ্যালসেসিয়ান তাঁদের সাথী। মাটির দিকে মুখ নামিয়ে, জিভ লকলকিয়ে সেই কুকুরদের চালচলন মোটেই সুবিধের মনে হলো না। অনেকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছি, ভালোই লাগছে। যখন নামবো তখন ওই সব ফাঁড়া কাটিয়েই যেতে হবে। কুকুরের চোখ, প্রহরীর চোখ, কাস্টমস-এর খোঁচা। আর একটু পরেই সব শুরু হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে তেমন একটা আদিখ্যেতা হলো না। ইংরেজ প্রথায় স্যাটস্যাট তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমরা নেমে আসার সঙ্কেত পেলুম। আমরা আমাদের ঝোলাঝুলি নিয়ে লন্ডনের মাটি স্পর্শ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে টেনিসনের একটা লাইন মনে পড়ল। অনেকটা উর্দু বয়েতের কায়দায় লেখা; হুইচ ইজ টোডে, টোমরো উইল বি ইয়েস্টারডে। এই যে আজ, আগামীকাল হয়ে যাবে গতকাল। ছোটখাটো, কার্পেট মোড়া অতি সুন্দর একটা ঘরে আমরা জড়ো হলুম। আমার হাফ সোয়েটারে শীত আর বাগ

মানছে না। সেই স্বদেশী উইন্ডচিটারটা গায়ে চড়ালুম। বুকের কাছে দু থাক জিপ ফাস্টনার। দেঁতো হাসির মতো গলার কাছ থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। সব চেয়ে ভেতরে যেটা, সেটার দুটো মুখ এক করে ওপর দিকে টানতেই লক্ষ্মী ছেলের মতো ঠোঁট বন্ধ হলো। ইতরামি শুরু করল সবার ওপরেরটা। দুটো মুখ এক করে যত খ্যাঁচকা টান মারি তিন ঘাট উঠে আটকে যায়। বুকটা তো বন্ধ করতেই হবে, তা না হলে এ বস্তুকে আমি কি বলব, উইন্ডচিটার না সেল্‌ফচিটার!

এক পাশে দাঁড়িয়ে এক মনে ফাস্টনারের বাঁদরামো কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি, এমন সময় লম্বা চওড়া ফর্সা চেহারার এক ভদ্রলোক সামনে এসে বললেন, 'চ্যাটারজি, আই অ্যাম পিনাক চক্রবর্তী অফ ইন্ডিয়ান হাইকমিশান।' কালো গলাবন্ধ কোট, কালো ট্রাউজার। স্টাউট অ্যান্ড টল। উদ্ভাসিত মুখমন্ডল। আমার ছবি আঁটা, ল্যামিনেট করা, একটা আইডেনটিটি কার্ড, স্পেস্যাল ক্লিপ দিয়ে বুকের কাছে ঝুলিয়ে দিলেন। 'আপাতত এইটাই আপনার রক্ষাকবচ। হ্যান্ড ওভার ইওর পাসপোর্ট টু মি। ব্যাগ ব্যাগেজ কাস্টমস চেক করছে। হয়ে গেলেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে। গো, অ্যান্ড হ্যাভ এ কাপ অফ কফি।'

পুরু মেরুন রঙের কার্পেট মোড়া ঘর। বাঁ দিকটা খোলা। সেই দিকে একটা লবি। শেষ মাথায় কাউন্টার। কাউন্টারে লাল মুখো সায়েবরা পৃথিবীর যাবতীয় জটিল আইন-কানুন দিয়ে মানুষের আসা যাওয়ার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করছেন। কাউন্টারের পাশে বিশাল কাঁচের দরজা। ওই দরজাই বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে আসা যাওয়ার পথ। দুপাশে দু'জন ফুট ছয়েক লম্বা গোরা সান্ত্রী হাতে ওয়াকিটকি নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে ঘরে স্থান পেয়েছি সেই ঘরটি ছোট হলেও মনোরম। ঘরের লাগোয়া প্যানট্রি। সেখানে তৈরি হচ্ছে কফি। কেউ আদর করে এগিয়ে দেবে না। সেলফ্ হেলপ্। নিজের কফি নিজেই তৈরি করে খাও। এই ঘরের আর একটি দরজা। সেই দরজার ওপারে একটি পথ। এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরে গেছে। উঁচু তারের বেড়া। বেড়ার ওধারে ছোট ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ির ছাদে ছাদে কালো পোশাক পরা নিরাপত্তা রক্ষী। চোখে চোখে বাইনাক্যুলার। বগলে স্টেনগান। পথ দিয়ে নিরাসক্ত ভঙ্গীতে হেঁটে চলেছেন অ্যালসেসিয়ানধারী লন্ডন-পুলিস। পুলিস বলে না, বলে ববি।

আমি দরজার বাইরে পথের পাশে দাঁড়িয়ে সাধনা চালিয়ে যাচ্ছি। কফি খাবো কি! আমার উইন্ডচিটারের ফাস্ট্‌নার বিদ্রোহ করেছে। তিন দাত উঠেছে। আর উঠছে না। কি অপ্রস্তুত অবস্থা! রাগে ভেতরটা কষকষ করছে। কলকাতা হলে তালগোল পাকিয়ে ফুটবলের মতো মারতুম এক লাথি। এক মনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কোনও দিকে কোনও খেয়াল নেই। হঠাৎ পেছন দিকে ফোঁস করে একটা শব্দ হতেই চমকে ফিরে তাকালুম। পায়ের কাছে কালো অ্যালসেসিয়ান। পেছনে ছ'ফুট লম্বা, ক্যাপ মাথায় ববি। কালো কোটে সোনালী বোতাম ঝকমক করছে। অ্যালসেসিয়ানে আমার ভয় নেই। আমার একটা আছে। তার মেজাজ একেবারে নেকড়ের মতো। আমাকে নানা ভাবে, নানা অ্যাঙ্গল থেকে বার পাঁচেক কামড়েছে। আমার পায়ের কাছেরটিকে আমার বলার হক আছে, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়। আমার জানা আছে কি হয়। ঘ্যাঁক করে ধরলে পোয়াটাক মাংস খাবলে নেয়। মাস তিনেক লাগে সারতে। প্রথমে একটা এ. টি. এস. নিতে হবে, তারপর চালাতে হবে পেনিসিলিন আর মাঝে মাঝে ফুরাসিন দিয়ে ড্রেসিং। সুগার নরম্যাল থাকলে গ্যাংগ্রিন হবে না। গত পাঁচটা কামড়ে তো আমি এই ভাবেই সেরেছি। হাতের চেটোর উল্টো দিকের কামড়টাই একটু বেশি ভুগিয়েছিল। একটা ভেন রাপচার হয়ে গিয়েছিল। গ্যাস গ্যাংগ্রিন হবার লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু ভরসা দিয়েছিলেন, সে রকম হলে অ্যামপুট করে দিলেই হবে। যাক গুরুর কৃপায় অত দূর আর গড়ায় নি। আমার পায়ের কাছে ফোঁসফোঁসকারী পুলিস কুকুরকে বললুম, 'হ্যাললো কাল্‌লু।'

উত্তর দিলেন তাঁর মালিক, 'গুড মরনিং, হোয়াট ইউ আর ডুইং হিয়ার!'

খুবই সহজ ইংরেজি, তবু বুঝতে একটু সময় লাগল। ইংরেজের জিভে 'র' 'ড়' হবেই, আর সেই 'ড়' বিলিয়ার্ড বলের মতো জিভের ডগায়, নাচতে থাকবে বেশ কিছুক্ষণ। আমার বন্ধু ফটোগ্রাফার অলক মিত্র ঠিকই বলেছিলেন, 'বিলেত ঘুরে এসে আমার মনে হয়েছে সায়েবরা ইংরেজি বলতে জানে না।' একেবারে সেন্ট পার সেন্ট খাঁটি কথা।

সায়েব বোধ হয় ভেবেছিলেন, আমি দেয়ালের দিকে মুখ করে বিভলভাবে গুলি ভরছি। মুখ ঘুরিয়ে বললুম, 'ট্রাইং টু ফাস্টন মাই ফাস্টনার।'

'দ্যাটস ওম্যানস জব।'

সায়েব কুকুর নিয়ে রোঁদে চলে গেলেন। ওদিকে সবাই কফি সেবন করছেন। গজর গজর চলছে। কমলালেবু রঙের শালোয়ার কামিজের ওপর অফ হোয়াইট কার্ডিগান চাপিয়ে কুমকুম হঠাৎ এগিয়ে এল, 'দাদা, তুমি কি করছ?'

ওই ভোরে, অমন জায়গায়, ওই মুখে মিষ্টি বাংলা বুলির কোনও তুলনা নেই।

'এইটা কিছুতেই লাগাতে পারছি না। সেই তখন থেকে।'

'দেখি, কি তুমি করেছ?'

কুমকুম কি একটা কায়দা করল, সড়াক করে ফাস্টনার ওপরে উঠে গেল। সায়েব ফিরে এসে বলে গেল, 'ওম্যানস জব।'

হাইকমিশানের পিনাক সাহেব ছোট মতো একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন। কর্মসূচীটা মোটামুটি কি হবে। প্রেসের যাঁরা এসেছেন তাঁদের সকলকে নিয়ে গিয়ে তোলা হবে পাঁচ তারা একটা হোটেলে। হোটেলের নাম সেন্ট জেমস কোর্ট। বাকিংহাম গেট রোডে সেই হোটেল। সুন্দর হোটেল। গেলেই বোঝা যাবে। কমানওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট 'বাথ হাউসে' একটি প্রেস সেন্টার বসিয়েছেন। এক সময় ওইখানেই ছিল ইংরেজ সরকারের 'প্রেস অ্যান্ড কমিউনিকেসান সেন্টার'। বাথ হাউসের তিন তলায় শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সাংবাদিকদের জন্যে একটি আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেল থেকে প্রেস সেন্টার হেঁটে গেলে মাত্র পনের মিনিটের পথ। বাকিংহাম গেট রোড ধরে বাঁদিকে হাঁটুন। বাকিংহাম প্যালেসকে বাঁয়ে রেখে ঘুরে যান ডান দিকে। ঢুকে পড়ুন স্টেবল ইয়ার্ড রোডে। পলমল ক্রস করে ঢুকে পড়ুন সেন্ট জেমস স্ট্রিটে। প্রেস সেন্টার। গাড়ি থাকবে। হোটেল আর প্রেস সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবে। এইবার শেষ কথা হোটেলে শুধু মাত্র থাকার চার্জ, প্রতিদিন ৮৮ পাউন্ড। খাওয়ার চার্জ আলাদা। হোটেলে চাইনিজ আর ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁ আছে। অর্ডার দিলে ভারতীয় খাবারও ঘরে বসে মিলবে। হোটেলের খুব কাছেই একটা স্যান্ডউইচ বার ও ছোট রেস্তোরাঁ আছে। এক মিনিটের পথ। বাকিংহাম গেট রোড আর পেটি ফ্রানস রোডের সংযোগস্থলে। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে ভারতীয় টি বোর্ডের টি পারলার কাম রেস্তোরাঁ আছে। হার্ট লার্ক ম্যানর ভারতীয় রেস্তোরাঁ আছে। ম্যাডিসন স্ট্রিটে গেলর্ড, গ্লেন্টওয়ার্থ স্ট্রিটে ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া। বিশেষ স্ট্রিটে লাল কোয়ালি।

পিনাক সায়েব প্রায় সবই জানিয়ে দিলেন। পাসপোর্ট এসে গেল। মালপত্র খালাস করে দিলেন কাস্টমস। এইবার আমাদের যাবার পালা। মাবাবাঁ আকারের কালবরে একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে ঢুকলেম দুবে। কলকাতার ছেলে। তাল তোবড়ানো, ধোঁয়া ছাড়া বাস, মিনি দেখা অভ্যেস এমন মিনিবাস দেখলে চোখ ঠিকরে যাবারই কথা। কাচের জানালা ঝকঝক করছে যেন এই মাত্র কারখানা থেকে তৈরি হয়ে এল। সামনে অটোমেটিক দরজা। ড্রাইভার বোতাম টিপতেই সুইশ করে দরজা খুলে গেল। ভেতরে সবুজ রঙের পা ডুবে যায় এমন কার্পেট। এত পরিষ্কার মনে হচ্ছে নতুন। বাসে উঠতেই মনে হলো, আসন, কার্পেট, জানালা, ওপরের ছাদ সব যেন এক সঙ্গে কাকলি দিয়ে বলছে, গুড মরনিং।

সামনের দিকে জানলার ধারে বসে পড়লুম। সারা রাত জেগে, কুঁকড়ে মুচড়ে বসে সাতটা ঘণ্টা কেটেছে। শরীরে সামান্যতম ক্লেশ নেই। আমার ডান এক মাস ঘাড়ের স্পন্ডিলাইটিসে ডান হাত একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছিল। এখন সেই হাত সম্পূর্ণ সচল। কোনও ব্যথা নেই। বেদনা নেই। চার চোখে লন্ডন দেখছি। একেই বলে ইয়ারো রিভিজিটেড। যা পড়েছি, যা শুনেছি সব মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। বড় বড় মানুষের কথা মনে পড়ছে। কিছুকাল আগে জোকমোবিয়াটের একটা ছবি আঁকার বই কিনেছিলুম। বইয়ের পাতায় পাতায় শিল্পীর স্বপ্ন লন্ডন ও তার আশপাশের অসংখ্য ছবি। উল্টে উল্টে দেখতুম আর রাতে শুয়ে শুয়ে কল্পনা করতুম, দাঁড়িয়ে আছি টেমস নদীর ওপর ওয়াটারলু ব্রিজে। টাওয়ার অফ লন্ডন থেকে ভেসে আসছে মৃত্যুর চিৎকার। দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে চুরুট ঠোঁটে চার্চিল। মনে পড়ে যেত নেলসনের কথা। সময়ের স্রোতে পেছিয়ে যেতুম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে। লন্ডনের

ওপর পড়ছে জার্মানীর উড়ন্ত বোমা। হিটলারের 'অপারেশান সিলায়ন'।

১৮০৩ সালে নেপোলিয়ান একবার চেষ্টা করেছিলেন ইংল্যান্ডকে গ্রাস করার। ১৮০০ সালের অক্টোবরে অ্যামিয়েনসে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে নেপোলিয়ানের ফ্রান্স ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ইংলিশ চ্যানেলের দুই পারে দুই দেশ বেশ শান্তিতেই থাকতে পারত। বেঁধে গেল বিরোধ। ব্রিটেন ফ্রান্সের হাতে মালটার অধিকার তুলে দিতে অস্বীকার করল। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গেল শান্তিচুক্তি। নেপোলিয়ান ধারণ করলেন নিজ মূর্তি। ঘুচে গেল ব্রিটেনের সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক। ফ্রান্সের ললিত আকর্ষণে দশ হাজার ইংরেজ গিয়েছিলেন চ্যানেলের ওপারে। নেপোলিয়ান তাঁদের দেশে ফেরা বন্ধ করে দিলেন। পরবর্তী দশটা বছর তাঁরা সেইখানেই আটকে রইলেন। আর এদিকে ছোটখাটো ফরাসী ভদ্রমহিলা নেমেছিলেন ডোভারে। সেই সময়টা ছিল ১৮০২ সালের মে মাস। বাকি জীবনে তাঁর আর দেশে ফেরা হলো না। তাঁর যৌবন কেটেছিল প্যারিসে। বিপ্লবের চরমতম বাড়াবাড়ি দেখে বীতশ্রদ্ধ। ইংল্যান্ডকেই করে নিলেন শেষ জীবনের আবাসস্থল। অসাধারণ সব মোমের মূর্তি তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিলেন ইংরেজদের। মহিলার নাম মেরি তুসৌদ। তাঁর আর্ট গ্যালারি লন্ডনের এক বিশেষ আকর্ষণ।

১৮০৩ সালে ব্রিটেন আর ফ্রানস চ্যানেলকে মাঝামাঝি রেখে প্রায় যুদ্ধের মুখোমুখি। এবার রণাঙ্গন আর মধ্য প্রাচ্য নয়, ইংলিশ চ্যানেলের দুই তীর। বোনাপার্টি প্রথমেই হ্যানোভার দখল করে নিলেন। আমাকে মাল্টা দাও আমি তোমাদের হ্যানোভার ছেড়ে দোব। ইংল্যান্ডের রাজাদের আদি বাসস্থান এই হ্যানোভার। বহুকাল হ্যানোভার তার রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে বসে আছে। সম্রাট তৃতীয় জর্জ জীবনে হ্যানোভারে পদার্পণ করেন নি। সুতরাং নেপোলিয়ান হ্যানোভার দখল করলেও বৃটেন মাল্টা ছেড়ে দেবার তেমন গরজ দেখালে না। অনেকটা রয়ে গেছে ভাব। আসল ভয় ঘনীভূত হল ফ্রান্সের উত্তর তটভাগে। সেখানে নেপোলিয়ান বিশাল এক বাহিনী মোতায়েন করে ফেললেন। 'আর্মি অফ ইংল্যান্ড'। সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। চ্যানেল পেরোতে পারলেই ইংল্যান্ড হাতের মুঠোয়।

এপারে ইংল্যান্ড ওপারে ফ্রান্স। নেপোলিয়ান তাঁর সেই বিখ্যাত ভঙ্গীতে, পেছনে হাত মুড়ে পায়চারি করছেন। তাঁর প্রয়োজন গভীর ঘন কালো একটি রাত আর ক্ষণিকের জন্যে প্রশান্ত সমুদ্র। পুরো বাহিনী নিঃশব্দে অতর্কিতে অবতরণ করবে ইংল্যান্ডের তটভাগে। প্রায় বিনাযুদ্ধে হাতের মুঠোয় এসে যাবে তার চির শত্রুর ভূভাগ। পুরো একটা বছর ১৮০৩ থেকে ১৮০৪ ইংল্যান্ডের পরপারে ঝুলে রইল এই আতঙ্ক। বোলোন উচ্চ ভূমিতে 'আর্মি অফ ইংল্যান্ড'-এর সারি সারি ছাউনি। ক্যান্টনমেন্ট। নেপোলিয়ানের অতীত বিজয় - ভিয়ানের স্মৃতিতে রাস্তাঘাটের নামকরণ। সর্বোচ্চ ভূমিতে একটি মন্ডপ। সেই মণ্ডপে দাঁড়িয়ে থাকেন সম্রাট নেপোলিয়ান। অদূরে সমুদ্রে অপেক্ষমাণ বিশাল নৌবহর—সমতল মালপরিবাহী জাহাজ, মালবোট, কর্নশিপ। অ্যামিয়েনসে একটি ফলকের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা—'টু ইংল্যান্ড'। প্যারিসের একটি কারখানা গাদা গাদা 'মেডাল' তৈরি করে চলেছে। প্রতিটি মেডাল উৎকীর্ণ 'ইনভেসান অফ ইংল্যান্ড। স্ট্রাক ইন লন্ডন, এইটটিন হান্ড্রেড ফোর।' কিন্তু গুপ্তচর আর স্মাগলারদের কে ঠেকাবে! এসেক্স আর সাফোকের তটভাগে চোরাচালানকারীদের অবাধ গতিবিধি। বুলোর সমস্ত খবর চোরাই পথে ইংল্যান্ডে যেতে লাগল। যত খবর যায় ইংরেজদের প্রস্তুতিও তত বাড়তে থাকে। ভলান্টিয়ার বাহিনী প্রস্তুত। সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। নতুন বাহিনীতে লোক নেওয়া শুরু। সমুদ্রতীরের গ্রাম থেকে লোকজন ও গবাদি পশু সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা পাকা। সাফোক থেকে হ্যাম্পশায়ারের মধ্যে, গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জায়গায় চুয়াত্তরটি গড় তৈরি করা হলো। টন টন কাঠ আর আলকাতরা মজুত করা হলো। ওদিকে ৩৫ লক্ষ ভোটে নেপোলিয়ান নির্বাচিত হলেন ফরাসী দেশের সম্রাট। মহামান্য পোপ রোম থেকে প্যারিসে এসে নেপোলিয়ানের হাতে তুলে দিলেন রাজমুকুট। নোতরদামের সামনে বেদীতে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ান স্বহস্তে সেই মুকুট নিজের মাথায় তুলে নিলেন। বহু অভিযানের সঙ্গী শোণিতসিক্ত, ছিন্নভিন্ন পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ান 'আর্মি অফ ইংল্যান্ডকে' অভিবাদন জানালেন। পরপারে ইংল্যান্ড অক্ষত তখনও। সেখানেও ঘটে গেছে রাজনৈতিক পালাবদল। অপদার্থ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডিংটনের আসনে এসে বসেছেন পিট।

তবু নেপোলিয়ান বৃটেন জয় করতে পারলেন না। ইংল্যান্ডের অতুলনীয় নৌবহর আর নেলসনের

বীরত্বের কাছে তিনি হীনবল। ট্র্যাফালগারে নেলসন নেপোলিয়ানকে বুঝিয়ে দিলেন, চ্যানেলের পরপারে থাকলেও বৃটেনের অপরাজেয় নৌশক্তি যতদিন আছে ফ্রান্স বৃটেনকে গ্রাস করতে পারবে না। নেলসন একটা চোখ নিয়েই 'থরহরি কম্প' করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই নেলসন এখন ট্রাফালগার স্কোয়ারে সু-উচ্চ মনুমেন্টের মাথায় ব্রোঞ্জে স্থির।

ইতিহাস কি ভাবে আবার ঘুরে আসে। চক্রবৎ। ১৮০৩ সালে ইংরেজদের একটা বিশ্বাস ছিল, নেপোলিয়ান যতই চেষ্টা করুক ইংল্যান্ডের প্রতিরোধ ভেদ কবতে পারবে না। কিন্তু চল্লিশের ইংল্যান্ড বুঝেছিল হিটলারের পক্ষে সবই সম্ভব। বৃটেনের উল্টোদিকেব ইওরোপীয় ভূভাগে নাজি পতাকা উড়ছে। থাবা গেড়ে বসে আছে সি লায়ন। হিটলারের লোকবল, অস্ত্রবল অসীম। আকাশ তার হাতের মুঠোয়। ১৯৪০-এর ইংল্যান্ড শীতে নয়, ভয়ে কাঁপছে। ৯ জুন, চার্চিল তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে সারা দেশের ঝিমিয়ে পড়া মনোবলকে চাঙ্গা করে তুললেন, We shall defend our Island whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. আমরা মাঠে লড়ব, লড়ব রাস্তায় রাস্তায়, আমরা পাহাড়ে লড়ব, we shall never surrender, যা আমি বিশ্বাস করি না তাও যদি ঘটে, এই দ্বীপ, অথবা দ্বীপের বড় একটা অংশ যদি অধিকৃত হয়, যদি অনাহারে থাকে পরাভূত মানুষ, তাহলে আমাদের সাম্রাজ্য আছে, আমরা সসাগরা, সাগরপারের সাম্রাজ্যে আছে বৃটিশ রণতরী, আছে সশস্ত্র, সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী, তারা আমাদের হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। until in God's good time, the new world, তার সমস্ত শক্তি ও বিক্রম নিয়ে এগিয়ে আসবে আমাদের উদ্ধারে, এই প্রাচীন ভূখন্ডে তারা আবার উড়িয়ে দেবে স্বাধীনতার পতাকা।

হিটলারের নির্ঘন্ট প্রস্তুত। ৮ আগস্ট শুরু হবে প্রাথমিক বিমান আক্রমণ আর ১৫ আগস্ট বিশাল অভিযান। সি লায়ন ঝাঁপিয়ে পড়বে ইংল্যান্ডের বুকে। ফ্রান্সকে ছিঁড়েখুঁড়ে শেষ করে দিয়েছেন হিটলার। জার্মানীর বহুকালের বহু দিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ। ১৭ জুন দ্য গল সব ছেড়ে পালিয়ে গেছেন বৃটেনে। রেনড পদত্যাগ করেছেন। স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন পেতেঁ। হিটলারের দিন এসেছে। সেই 'ফকস রেলওয়ে কোচ'। ১৯১৮ সালে এইখানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেদিনের অস্ত্রবিরতি চুক্তি। পেতেঁ আর ওয়েগ্যান্ড এইবার সেই কোচে, সামনে ফুয়েরার হিটলার। একে একে বলে চলেছেন যুদ্ধ বিরতির সর্ত। ২২ জুন স্বাক্ষরিত হলো চুক্তি। ২৫ জুনের মধ্য রাতে সব শেষ। ডানকার্ক থেকে কোনও রকমে পালিয়ে বেঁচেছে যুদ্ধক্লান্ত ইংরেজ সৈন্য। এই যুদ্ধে ফরাসী দেশের ক্ষতির পরিমাণ, মৃত ৯০ হাজার, আহত ২ লক্ষ, বন্দী হয়েছেন বা বেপাত্তা ১৯ লক্ষ। ইংরেজ সৈন্য মারা গেছেন, ৬৮,১১১। বেলজিয়াম, ২৩,৩৫০। ওলন্দাজ ৯,৭৭৯। ফরাসী বিমান বহর হারিয়েছে ৫৬০টি বিমান। রয়্যাল এয়ার ফোর্সের গেছে ৯৩১। ডানকার্কের সৈকতে পলাতক ইংরেজ বাহিনী রাইফেল ছাড়া ফেলে এসেছে প্রায় যাবতীয় সমর সম্ভার। হিটলার উইল ক্রাশ বৃটেন।

চলমান গাড়ির ঝকঝকে জানালার বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ল মূর্তি। সেই ভারি-জমাট-সামান্য কুঁজো চেহারা। পা পর্যন্ত নেমে এসেছে গ্রেট কোট। চারচিল।

১৩

কাল রাতে মনে হয় বৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তাঘাট ভিজে ভিজে। লন্ডন যেন সিক্তবসনা সুন্দরী। রাস্তা কামড়ে গাড়ি ছুটছে। পথে জনপ্রাণী নেই। দুপাশে দোকান। সুন্দর সুন্দর সায়েবী বাড়ি। সবই আটকাট বন্ধ। কলকাতার রাস্তায়, কলকাতার গাড়ি ট্রাকটারের মতো মাটি কুদলে চলে। কত তফাৎ। এখানে গাড়িতে বসে চিঠি লেখা যায়। জানালার ধারে বসে আছি, আমার দুপাশ দিয়ে লন্ডন বহে চলেছে। শহরটাকে এত পরিষ্কার রেখেছে কি করে! আমরা পারি না কেন? একটা মাত্র বন্ধ দোকানের সামনে কিছু খালি বাক্স আর কাগজ ডাঁই হয়ে আছে। শনিবারে দোকান বন্ধের আগে মনে হয় সাফসুতরো করে গেছে। ভোর। এখনও শহর সাফা করা হয়নি। তার মানে কাল যাঁরা শহর ব্যবহার করে গেছেন

তাঁদের কি পরিচ্ছন্ন রুচি। আমাদের কি ভাগ্য আজ লন্ডনে রোদ উঠেছে। গাড়ি যিনি চালাচ্ছেন, তাঁর নাম পিটার। রাস্তাঘাট তেমন চওড়া নয়। এপার থেকে ওপারে যেতে বুক কেঁপে ওঠে না। 'ম্যানেজেবল' 'ক্রসেবল' রাস্তা। বাড়ির বন্ধ সদরের সামনে সামনে দুধের বোতল, খবরের কাগজ, ফুল রেখে চলে গেছে। গৃহস্বামী উঠে তুলে নেবেন। শোনা কথা আজ চাক্ষুষ মিলিয়ে নেবার সুযোগ হলো।

লন্ডনকে এত ফাঁকা লাগার কারণ আমি জানি। গাড়ি জনশূন্য পথ ধরে সামনে ছুটুক আমি সময়ের পথ ধরে চলি পেছনে। সেই ব্যাট্‌ল অফ বৃটেনের কালে। হিটলারের পাউন্ডিং। ফ্রান্‌স হাতের মুঠোয় আসার সঙ্গে সঙ্গে চ্যানেলের ওপারেই চলে এল জার্মানির 'এয়ার পাওয়ার'। চল্লিশের জুলাই থেকে শুরু হলো বৃটেনের সমুদ্রতীরের বিভিন্ন লক্ষ্যে আর চ্যানেলের বৃটিশ জাহাজের ওপর বোমাবর্ষণ। রয়েল এয়ার ফোর্সকে আকাশে তোলার উস্কানি। আকাশে বিমানবাহিনীকে ব্যস্ত রেখে চ্যানেলের পরপারে নৌবহর সাজাবার মতলব। শুধু বোমা ফেললে তো হবে না, ইংল্যান্ড দখল করতে হবে। পা রাখতে হবে বৃটেনের মাটিতে।

আগস্টের মধ্যেই গোয়েরিং-এর তত্ত্বাবধানে, জার্মানির ২৮০০ ফাইটার আর বোমারু বিমান ফ্রান্‌সে চলে এল। একসঙ্গে ৬৫০টি বিমান আকাশে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে বৃটেনের ঘাড়ে। আট থেকে আঠারোই আগস্ট জার্মানির বিমান আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। বৃটেনের বিমানক্ষেত্র সেই আক্রমণের লক্ষ্য। এল ১৫ই আগস্ট। গোয়েরিং ওই দিনটির নাম দিল 'ইগল-ডে'। ১৫ই আগস্ট বারে বারে বোমা ফেলা হলো। নিউ ক্যাস্টল থেকে উয়েমাউথ প্রায় মাইল পাঁচশোর একটি বৃত্ত ধরে ১৭৯০ বার বোমা ফেলে গেল জার্মান বিমান। এতবার হানা দেওয়া সত্ত্বেও ইংরেজরা ভালই লড়ে গেল। ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে ছিল নিপুণ রাডার আর ছিল আগে ভাগে সংগ্রহ করা শত্রু শিবিরের খবর। আর স্বয়ং খ্রাইস্ট ছিলেন সহায়। অল্প স্বল্প জখম হওয়া বিমান, আর বিমান ভাঙ্গা পাইলটরা শত্রু এলাকায় না পড়ে, পড়ল মিত্র এলাকায়। ফলে তাদের চাঙ্গা করে তুলে আবার যুদ্ধে পাঠান সম্ভব হলো।

২৪ আগস্ট জার্মান-বিমান আরও ভেতরে ঢুকে এল। রয়াল এয়ার ফোর্সের বাঁধুনি প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বিশাল। পড়ে পড়ে মার না খেয়ে ইংরেজরা স্ট্র্যাটেজি বদলালেন। ২৫ আর ২৬ আগস্ট রাতে বৃটিশ বিমান বার্লিনে বোমাবর্ষণের চেষ্টা করল। দু একটা ফেলেও এল। ৫ সেপ্টেম্বর রাতেও বৃটিশ বিমান বার্লিনে হামলা করে এল। হিটলার রেগে আগুন। এতদিন জার্মান বিমান হানা দিচ্ছিল রাতে। ১৫ই সেপ্টেম্বর দিন দুপুরে সারা লন্ডন শহরে বোমা পড়ল। তবে রয়েল এয়ার ফোর্সের কোনও তুলনা হয় না। ২৬টি বৃটিশ ফাইটার আক্রমণ সামলাচ্ছিল। ৫৬টি জার্মান বিমানকে নামিয়ে দিল মাটিতে। সারা সেপ্টেম্বর ধরে জার্মানি দিনের হামলা চালিয়ে গেল। রয়াল এয়ার ফোর্সের হাতে মারও খেল তেমনি। ১৭ সেপ্টেম্বর হিটলার 'অপারেশন সি লায়ন' বাতিল করে সিদ্ধান্ত নিলেন 'নাইট ব্লিৎস অন বৃটেন'। লন্ডনকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর এমন একটা রাত গেল না, যে রাতে জার্মান-বিমান লন্ডনে বোমা ফেলে গেল না। একটা শহরও বাদ গেল না। বাদ গেল না কলকারখানা।

ব্যস্ত টেলিপ্রিন্টার ক্রমাগত খবর উগরে চলেছে। হোম সিকিউরিটির ওয়াররুমে চিন্তিত সেনানায়কেরা বসে আছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া ডক নাম্বার টুয়েলভ জ্বলছে। সাউথ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ডক অফিস মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বারোটা বার্জ জ্বলছে। গ্রেট রাশেল স্ট্রিটে বৃটিশ মিউজিয়ামে আগুন ধরে গেছে। ওয়েস্ট মিনস্টার ক্যাথিড্রেলের ওপর বোমা পড়েছে। হ্যামারস্মিথে তিনটি বড় বোমা পড়েছে। মৃতের সংখ্যা ২০। ১৮টি মৃতদেহ এখনও ধ্বংসস্তূপের তলায়। সাউথওয়ার্কে পাওয়ার স্টেশনের পাশে বোমার ঘায়ে নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে। নদীতে জল বাড়ছে। যে কোনও মুহূর্তে প্লাবনের সম্ভাবনা। কর্সিকা স্ট্রিটে রেল ব্রিজ ভেঙে বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছে। মাইন সুপার এইচ এম এস গোটফেলের ওপর সরাসরি বোমার আঘাত। বারমোন্ডসে প্রচন্ড বোমাবর্ষণ। বিধ্বস্ত জনপদ ও অফিস এলাকা। চেরি গার্ডেনে গম্বুজের কাছে সরাসরি আক্রমণে এইচ এম এস টাওয়ার ডুবে গেছে। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ থেকে ৪১-এর মে মাসের শেষ পর্যন্ত লুফৎওয়াফ ৪৬ হাজার টন হাই একসপ্লোসিভ ও এক লাখ ১০ হাজার আগুনে বোমা ফেলেছিল। মোট ৫৪৪২০ টন বোমা। হতাহতের সংখ্যা ৪০ হাজার মৃত, গুরুতর আহত ৮৬ হাজার, এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সামান্য আহত। বিশ লক্ষ বাড়ি ভেঙে চুরমার।

এর ৬০ শতাংশই লন্ডনে।

সেই লন্ডন আবার কেমন সেজে উঠেছে। এই প্রজন্মের মানুষ হয়তো জানেই না, কি রাত আর কি দিনের মধ্য দিয়ে সেই সময় হেঁটে গেছে। এই আগস্ট আর সেই আগস্ট। ফুরফুর করে গাড়ি চলেছে অকসফোর্ড স্ট্রিট ধরে। দু পাশে দোকান, সুন্দর সুন্দর বাড়ি। বহুকাল প্রকৃত সাহেব মেম দেখিনি। চোখের বড় তৃষ্ণা। হঠাৎ চোখে পড়ল সুন্দরী। হাল্কা নীল স্কার্ট আর সোয়েটার পরে বৃটিশ বিউটি দ্রুত হাঁটছেন। তাঁকে পেছনে ফেলে গাড়ি সামনে এগিয়ে গেল। শরতের মেঘ ভাসা নীল আকাশ মাথার ওপর। ঝলমলে রোদ উঠেছে আমাদের রাজীবকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে। এমন আকাশ দেখলে মা দুর্গাকে মনে পড়ে। হঠাৎ মনে হলো এই আকাশে ঘুড়ি ওড়াতে পারলে বেশ হতো। একতে চাঁদিয়াল একটা ঘুড়ি বাকিংহাম প্যালেসের মাথায় লাট খাচ্ছে।

বৃটেনের প্রতি হিটলারের নিশ্চয় কিছু দুর্বলতা ছিল। প্রায় তো শেষ করেই এনেছিলেন। হঠাৎ সরে গেলেন কেন! মায়া হলো। এমন সুন্দর একটা দেশ নষ্ট করে দেবেন! যে দেশের মেয়েরা এত সুন্দর! একটু অহঙ্কারী। তা হোক। হিটলার সরে গেলেন লাল দুনিয়ার দিকে। বলশেভিজমকে শেষ করতে হবে। ফিনিশ রাশিয়া।

হ্যারল্ড নিকলসনের 'ওয়ার ডেজ ডায়েরি' থেকে একটা দিনের বর্ণনা তুলে দিলে ১৯৪০ এর আগস্ট কি রকম গিয়েছিল বোঝা যাবে। নিকলসন লিখছেন, ২৬ আগস্ট, ১৯৪০, 'অসাধারণ সুন্দর একটি সকাল। ওরা কাল লন্ডনে হানা দিয়েছিল। আমরা বার্লিনে বোমা ফেলে এসেছি। আমি আমার রেডিও ভাষণ লিখতে বসেছি। দুপুরের দিকে বিমানের শব্দ কানে এল। কিছুক্ষণ পরেই বেজে উঠল সাইরেন। এই শব্দে মানুষ আর তেমন বিচলিত হয় না। সয়ে গেছে। আমার মনে হয় লন্ডনের মানুষ একটা কায়দা রপ্ত করে ফেলেছে, কল্পনাকে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করে ফেলা। এই যে আকাশে বিমানের চাপা শব্দ, আমার আর মনেই হয় না, এই শব্দ যে কোনও মুহূর্তে শতশত মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। জানালার ধারে বসে আছি। চোখের সামনে আমার বাগানে ফুটে আছে অজস্র ফুর্কসিয়া আর জিনিয়া। ঝাঁক ঝাঁক হলুদ প্রজাপতি গোল হয়ে উড়ছে, খেলা করছে। আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়, সে দেখতে দেখতে গাছের মাথায় আর এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে এসে চক্কর মারতে শুরু করল যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো প্রথম ঝাঁকের সবকটা প্রজাপতিকে মেরে ফেলা। One lives in the present. The past is too sad a recollection and the future too sad a despair.'

বড় সুন্দর লাইন। আমরা বর্তমানে বেঁচে থাকি। আমাদের অতীত অতি দুঃখের স্মৃতি মাত্র। আর ভবিষ্যৎ হলো বড় রকমের এক নৈরাশ্য। নিকলসন এরপর লিখছেন, 'আমি লন্ডন পর্যন্ত গেলুম। ডিনারের পর হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলুম টেম্পল-এ। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা'। ভিসেপ্পা থিয়েটারের সব আলো নিবে যাবার পর যে অন্ধকার নেমে আসে লন্ডন শহর সেই রকম নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। অস্পষ্ট ছায়া ছায়া বাড়ি ঘরের আকৃতি আকাশের আলোয় ধরা যায়। তেমন ঠান্ডা নেই। মাথার ওপর আকাশে চালের দানার মতো তারা ছিটিয়ে আছে। সার্চলাইটের আলো আকাশের বুকে জেগে উঠল। প্রতিটি রেখা গিয়ে শেষ হচ্ছে তুলোর গুটিতে। এই রকম মনে হবার কারণ আলো আর কুয়াশার খেলা। শহরতলিতে গর্জে উঠল কামান। গোলা ফাটার শব্দ। সেন্ট্রাল লন্ডনে কামান নেই। একটা প্লেনের বোঁ শব্দ কানে আসছে। শত্রুপক্ষের বিমান হতেও পারে, নাও পারে। কয়েকটি নিঃসঙ্গ পদশব্দ ছুটে গেল স্ট্র্যান্ড ধরে। সামান্য ভীত এক পথিক পেছন দিক থেকে এসে আমাকে ধরে ফেললেন। শুরু করলেন কথোপকথন। তাঁর দিকে একটি সিগারেট বাড়িয়ে ধরে যেন বিব্রতই করলুম। সিগারেট ধরাবার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হলো। আগুন ধরাবার সময় ভয়ে তাঁর হাত কাঁপছে। আমার হাত কাঁপল না।

ফিরে এলুম নিজের ঘরে। আলো নিবিয়ে জানালার ধারে বসলুম। তখনও আকাশে একটা প্লেনের গুঞ্জন। দূরে থেকে থেকে বিস্ফোরণের ভোঁতা শব্দ। আলো জেলে, এইটুকু লিখতে না লিখতেই শুনতে পেলুম আরও প্লেন আসছে। আর আলো জ্বেলে রাখা ঠিক না। এবার অন্ধকার করে রাতের শব্দ শুনি। আমার ভেতরে ভয়ের কোনও রকম অনুভূতিই নেই। একেই কি বলব অদৃষ্টবাদ না অন্য কিছু। যাই হোক এই ভাব ভারি সুন্দর। আমি শোনার অপেক্ষায় বসে রইলুম। সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে

গোঁ গোঁ শব্দ। বিমানের মৌমাছি। হঠাৎ সার্চলাইট নিবে গেল। সাইরেনে অল ক্লিয়ার। জানালা বন্ধ করে আবার আলো জ্বালালুম। শেষ করলুম এই লেখা। লন্ডনের ঘড়িতে মধ্যরাত। আমি এবার শুয়ে পড়ি।'

১৯৪০-এর আগস্ট আর এই আগস্ট। সময়ের স্রোতে ছেচল্লিশটা বছর কিভাবে ভেসে গেছে ছেঁড়া পাপড়ির মতো। ফৈজ আহম্মদ ফৈজ-এর কবিতার লাইন মনে পড়ছে,

No where, no trace can I discover
of split blood
not ou the murderer's hand nor on his sleeve ;
no daggers with red lips nor scarlet-pointed swords.
I see no blots on the dust
no stains on the walls.

যে মানুষ ভাঙে সেই মানুষই গড়ে। মানুষের হাতের কি খেলা! কত রকমের হাত আছে! স্টেফান জুইগের অনবদ্য একটি লেখার কথা মনে পড়ছে। মানুষের মুখ না দেখে, নজর করে শুধু হাত দেখ। মুখে মুখোস আঁটা থাকতে পারে। লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা, ভালবাসার অভিব্যক্তি মানুষ চেপে রাখতে পারে, পারে না তার হাতের নড়াচড়াকে ধরে রাখতে। জুইগের লেখার চরিত্রটি তাকিয়ে আছে 'কেসিনোর' টেবিলের দিকে। সে মুখ দেখছে না, দেখছে জোড়া জোড়া হাতের ব্যবহার। মুখ দেখে বলা না গেলেও, হাত দেখে চরিত্র বলা যায়। A clawlike hand betokens avarice ; a loose hand, extravagance ; a quite one calculation, at remulous one despair। থাবার মতো হাত। লোভীর হাত। আলগা হাতের মানুষ উড়োনচন্ডে। শান্ত হাতের মালিক হিসেবী। আশাভঙ্গের হাত কাঁপে। জুইগ লিখছেন, I cannot tell you how many thousand varieties of hands there are. কত হাজার রকমের হাত যে আছে! Wild beasts with hairy, crooked fingers, noble and base, violent and timid, crafty and faltering। হাতেই মানুষের জীবন-ভাবনার প্রকাশ। আর সবচেয়ে বড় হাত হলো সেই অদৃশ্য হাত। বছরের দুয়ারে দাঁড়িয়েছিল একটি মানুষ। আমি তাকে বললুম, "আমাকে একটি আলো দাও, যে আলো আমাকে অজানা লোকের পথচলাকে নিরাপদ করবে।" সে আমাকে স্পষ্ট বললে, "অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়ো। ঈশ্বরের হাতে নিজের হাত সমর্পণ করো। একটা আলোর চেয়ে সেই হবে সবচেয়ে ভালো, জানা পথের চেয়ে অজানা পথই তখন সবচেয়ে নিরাপদ হবে।"

বাকিংহাম প্যালেসকে বাঁয়ে রেখে গাড়ি অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে গেল। এই সেই বাকিংহাম। চল্লিশে জার্মান বিমান ডাইভ বম্বিং করে চুরমার করে দিয়েছিল। সেদিনের কাগজে খবর বেরিয়েছিল, "They have just dive-bombed Buckingham Palace, and hit it three times. The king is safe." হিটলার লন্ডনের জীবন প্রায় অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। চার্চিল ছাড়া প্রায় সকলের স্নায়ুই ছিঁড়ে আসছিল। রাতের পর রাত মানুষ শেল্টারে জেগে বসে আছে। কম্যুনিস্টরা শেল্টারে ঘুরে ঘুরে সই সংগ্রহ করছে। চার্চিলের কাছে কম্যুনিস্টদের তরফ থেকে একটা গণ-আবেদন পাঠান হবে, খুব হয়েছে, আর যুদ্ধ নয়, এইবার একটা শান্তি চুক্তি করুন। অনেকের ক্ষোভ চার্চিল নাইট-বম্বিং-এর একটা প্রতিকার কেন বের করতে পারছেন না! তবে অসীম সাহসী মানুষও ছিলেন। রাতে ক্লাবে বসে পানাহার করছেন। চারপাশে সমানে বোমা পড়েই যাচ্ছে। ক্লাবহাউস ভূমিকম্পে টলছে। গেলাসে পানীয় দুলে উঠছে। আমেরিকান সাংবাদিক নিকারবোকার মাঝরাতে ফরেন অফিসে এসে ফাটাফাটি করছেন, তাঁর কাছে একটা স্কুপ রয়েছে, কেন তা ছাপতে দেওয়া হবে না। সেন্ট-পলস ক্যাথিড্রালের বাইরে একটা টাইম বোমা পড়ে আছে। যে কোনও মুহূর্তে ফাটবে আর স্যার ক্রিস্টোফার রেনের ওই বিশাল স্থাপত্য অবলুপ্ত হয়ে যাবে। মধ্যরাত। ব্ল্যাক আউটের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশে সার্চলাইটের আঙুল শত্রু বিমান খুঁজছে। জার্মানির শত শত বিমান আকাশের কোলে চড়ে ওঁয়া ওঁয়া করছে। হাইডপার্কে সার সার কামান থেকে থেকে গর্জন করে উঠছে ক্রাম্প, ক্রাম্প। মেশিনগানের লম্বা বুলেট শিলাবৃষ্টির মতো ছরছরিয়ে যাচ্ছে। এরই মাঝে প্রায় নিঃশব্দে সব আলো নিবিয়ে চলেছে কালো মটোর গাড়ি। ভেতরে বসে আছেন দু'জন সাংবাদিক। একজন বলছেন রোস্ট টার্কির কথা, আর একজন বলছেন, মেশিনগানের বুলেটগুলোকে

যদি একটু দেখতে সুন্দর করা যেত। হ্যারল্ড নিকলসন ফরেন অফিস থেকে ফিরে এসে সব দরজা জানালা বন্ধ করে চোরা লণ্ঠনের আলোয় তাঁর মৃত্যুভীতি নিয়ে লিখে ফেলছেন অনবদ্য এক অনুচ্ছেদ। "ইংল্যান্ডকে বাঁচিয়ে রেখেছে উইনস্টনের অপটিমিজম। পরপর ৫৭ রাত্রি ধরে প্রতিদিন দুশো জার্মান বোমারু নির্বিচারে বোমা ফেলে যাচ্ছে। কি যে বিরক্তিকর ব্যাপার। আমার নিজের ভেতরেই একটা ক্লসট্রোফোবিয়া তৈরি হয়েছে। এই বুঝি চাপা পড়ে গেলুম। বোমার ঘায়ে উড়ে যেতে আমার আপত্তি নেই। আমার ভয় বিশাল বাড়ি ভেঙে, ইট কাঠ পাথরের তলায় না মরে চাপা পড়ে রইলুম। শুনছি, কোথাও ধীরে ধীরে জলের ধারা পড়ছে। গন্ধে বুঝতে পারছি ধীরে ধীরে গ্যাস এগিয়ে আসছে আমার দিকে। শুনতে পাচ্ছি আমার অন্যান্য সহকর্মীদের আর্তনাদ। ওই ভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। লিখতে লিখতে শুনছি বোমা আর গোলাগুলির শব্দ। আমি যখনই লিখতে বসি, লেখা আর বোমা একসঙ্গে পড়ে। গোলাগুলির কথা লেখা হয় তবে আমরা আর গায়ে মাখি না। বহুদূর থেকে ভেসে আসে সার সার কামানের শব্দ। কানের পাশেও কামান। রিজেন্ট পার্কের কামান সমানে গর্জে চলেছে। হাইড পার্কের ভারি কামান থেকে রকেট ছোঁড়ার শব্দ। এই শব্দকে ভালোবেসে ফেলেছি। লন্ডনের রাগী কামানের শব্দ। কিছুক্ষণের জন্যে এই শব্দ থামলেই শুনতে পাই বহু উঁচুতে জার্মান বোমারু আর ফাইটার প্লেনের শব্দ। যেন ডেন্টিস্টের ড্রিল চলেছে। সব সময়েই যেন আমাদের মাথার ওপর রয়েছে, গোল হয়ে ঘুরছে তো ঘুরছেই। পরপর তিনটে বোমা ফেলার জন্যে ছটফট করছে। এক একটি বিমান এক সঙ্গে পর পর তিনটে বোমা ছাড়ে। জ্বলতে জ্বলতে নেমে আসে। কোথাও না কোথাও পরপর তিনবার শব্দ, ক্রাম্প, ক্রাম্প। কোথায় পড়ল, বন্ড স্ট্রিটে! লিংকনস ইন ফিল্ডে! কোথায়! ভিক্টোরিয়ান না জর্জিয়ান, কি ধরনের বাড়ি ভেঙে পড়ার এই দূরাগত শব্দ! আমার কোনও ভয় নেই, রাগ নেই। Hum and boom. Always I write my nightly diary to that accompaniment.

পিনাক সাহেব বললেন, "এই হলো সেন্টজেমস পার্ক। আপনাদের হোটেল এসে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিন। গাড়ি আসবে, প্রেস সেন্টারে নিয়ে যাবে। দিন শুরু।" সেন্টজেমস পার্কটাকে ভালো করে দেখে নিলুম। ৪০-এর রাতে এখানে টাইমবোমা ফেটেছিল। যুদ্ধের কোনও স্মৃতি আর লন্ডনের বুকে লেগে নেই। যুদ্ধ বেশি দিন বাঁচে না। বেঁচে থাকে শান্তি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সঙ্গীত। গাড়ি আর একটা বাঁক ঘুরে সুন্দর একটা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়; কিন্তু সুন্দর। লন্ডনের কোনও রাস্তাই তেমন চওড়া নয়।

ইংরেজদের দেশে ঘোরানো দরজার খুব চল। যে দরজা দিয়ে মালপত্র নিয়ে গলতে গণিতের মাথা ভালো হওয়া চাই। দরজার খাঁজে নিজেকে ফেলে ঘুরে যেতে হবে। বিশাল এক ইংরেজ ঝকঝকে কালো ইউনিফর্ম পরে দরজার সামনে খাড়া। মাথায় টপ হ্যাট। কোটের জায়গায় জায়গায় টিয়া হলুদের বাহার। ইংরেজ দ্বাররক্ষী কপালে হাত ছুঁইয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। বিশাল লবি। এখানে ওখানে সেখানে বিশাল বিশাল সোফা-সেট লাগিয়ে ছাড়া ছাড়া জমায়েতের আয়োজন। চারপাশ নিখুঁত পরিষ্কার।

রিসেপসানে দুটি মেয়ে আর দুটি ছেলে নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে মহা ব্যস্ত। চারজনেরই বয়েস কম। মেয়ে দুটি খুবই সুন্দরী। যে সার্জের স্কার্ট আর ব্লাউজ পরে হাসি হাসি মুখে চেক-ইন চেক-আউট করাতে ব্যস্ত। এক নম্বর সুন্দরী আমার দিকে একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন। নাম, ধাম, দেশ, জাতি, তারিখ, সময়। কার্ডের বদলে একটা চাবি পাওয়া গেল। বেশ বড় সড়। চামড়ার জিভ লাগানো। সেই জিভে লেখা নম্বরই আমার ঘরের নম্বর। বিরাট সংখ্যা ৬৮২। পরীক্ষায় এই রকম পেলে স্কলারশিপ জুটে যেত। চাবি নিয়ে ইংরেজ ললনাকে থ্যাংকস জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই একটু খাটো উচ্চতার স্বাস্থ্যবান ইংরেজ যুবক আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে হাসি হাসি মুখে বললে, 'কাম স্যার।' প্লিজ বলেছিল কি না মনে পড়ছে না। দুশো বছর আমরা যাদের পায়ের তলায় ছিলুম তারা স্যালুট করছে, স্যার বলছে। দারুণ অভিজ্ঞতা।

রিসেপসান থেকে কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরতেই লিফ্ট। বেশ বড় মাপের আরোহণ-অবরোহণ যন্ত্র। গোটা হোটেলটাই, লবির অংশটুকু ছাড়া পা ডুবে যাওয়া কার্পেটে মোড়া। লিফ্টে কুমকুম ও আরেক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। টিভির রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়। বড় ভালো মানুষ। কুমকুম আর রঞ্জিৎবাবু সিক্সথ ফ্লোরে নেমে গেলেন। আমার সেভনথ ফ্লোর।

লিফ্‌ট থেকে নামলুম। আমার ব্যাগবাহী পথপ্রদর্শক প্রথমে ডান দিকে বাঁক নিলেন। কিছুদূর এগিয়ে আবার ডানদিক। কার্পেট মোড়া করিডর চলেছে তো চলেইছে। কেউ কোথাও নেই। ঠান্ডার জন্যে সব জানালা বন্ধ। ঘষা কাঁচ যতটুকু প্রকৃতির আলো দিতে পারে দিচ্ছে। যেটুকু অভাব থেকে যাচ্ছে পূরণ করছে বৈদ্যুতিক আলো। করিডর কখনও দুধাপ নামছে তো তিন ধাপ উঠছে। ডাইনে বাঁয়ে খেয়াল খুশি মতো বাঁক নিচ্ছে। কতটা যে হাঁটলুম। মাইল খানেক কি না কে জানে! নম্বর আঁটা এক একটা দরজা আসছে আর চলে যাচ্ছে। বেশ ভয় ভয় করছে। জনপ্রাণী নেই। শুধু ছবি। জায়গায় জায়গায় ঝোলানো। আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে ওহে সুন্দর! দুম করে একটা দেয়ালে করিডরের মাথা ঠুকে গেল। পেতলের হরফে নম্বর লাগানো একটা দরজা। ওটা আমার নয়। বাঁদিকেরটা আমার। উল্টো দিকে একটা জানালা। অবশ্যই বন্ধ। আমার গাইড দরজা খুলে চাবিটা হাতে দিয়ে হাসলেন, 'দিস ইজ ইওর রুম।

ইজ ইট অল রাইট?'

'ইয়েস, ডু ইউ নো ভুলভুলাইয়া?'

'ভুলভুলাইয়া?'

'ইয়েস, ইন্ডিয়ায় লক্ষ্ণৌ বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ভুলভুলাইয়া বলে একটা বাড়ি আছে। সেখানে নবাবরা বেগমদের ঢুকিয়ে দিতেন। যে বেরিয়ে আসতে পারত তাকে সাদী করতেন আর যে পারত না সে মরে ভূত হয়ে যেত। ইওর দিস হোটেল ইজ এ ভুলভুলাইয়া।'

'আ ইয়েস, ভুলভুলাইয়া।'

'তা সায়েব এই তো ঢুকিয়ে দিয়ে গেলে, এখন বেরবো কি করে?'

'কাম হিয়ার, লুক।'

বাইরে বেরিয়ে তার পাশে দাঁড়ালুম, 'এই দ্যাখো, অ্যারো টু এলিভেটার। এই রকম বাঁকে বাঁকে অ্যারো লাগানো আছে। গোলমাল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলো দ্যাট অ্যারো। ইজ ইট অলরাইট?'

'ইয়েস, থ্যাঙ্ক ইউ।'

ছেলেটি গটমট করে চলে গেল। আমি আমার কক্ষে প্রবেশ করলুম। আহা চোখ আমার জুড়িয়ে গেল। যেন সিনেমার ঘর।

১৪

এই রকম একটি বিশাল ঘরে থাকতে হবে ভেবেই হাসি পাচ্ছে। ভাগ্যদেবী কত খেলাই না তোমার জানা আছে! মানুষকে এই ফুটপাথে ফেলছ, এই পালঙ্কে তুলছ। আমি যেন জেমস বন্ড ০০৭। জেমস বন্ড যে কোনও হোটেল ঘরে ঢুকে আগে ভালো করে সব দিক দেখে নেন। কোথায় কি কেরামতি করা আছে দেখতে হবে তো! বাগিং, বুবি ট্র্যাপ। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তো শত্রুর অভাব নেই। তাঁকে না পেয়ে তাঁর সঙ্গী সাথীদের ছোটো মতো একটা ঝেড়ে দিলেই, গন উইথ দ্যা উইন্ড। হঠাৎ মনে পড়ল এই তো সেই হোটেল। গাদ্দাফির চেলারা বোমা মেরে ছারখার করে দিয়েছিল। সেই হোটেল আবার বহু অর্থব্যয়ে সেজেগুজে উঠেছে। ঢোকা মাত্রই বেশ ভয় ভয় করছে। কেউ কোথাও নেই। আমি আছি আর আছে এই বিশাল ঘর।

ঢোকার দরজার পাশেই আর একটা দরজা। দরজা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল অনবদ্য বাথরুম। আহা চোখ জুড়িয়ে গেল। কি জিনিস বানিয়েছে সায়েবরা। সেই গানটা নেচে নেচে গাইতে ইচ্ছে করছে 'আহা, কি কল বানাইছে কোম্পানি'। ফ্লোরে সবচেয়ে দামী হাল্কা সবুজ রঙের লিনোলিয়াম। তার ওপর অফ হোয়াইটে মনোরম নকশা। ডান দিকে শুয়ে আছে বিশাল বাথটাব। সেই বাথটাব উঁকি মারছে সুদৃশ্য দুপাট প্ল্যাস্টিকের পর্দার আড়াল থেকে। ওয়াশ বেসিনে গরম জলের ট্যাপ, ঠান্ডা জলের ট্যাপ। মাঝে এটা আবার কি! টানলে ওপর দিকে উঠে আসছে। ও এটা হচ্ছে ওয়াটার একজস্ট।

টানলে বেসিনের জল সাঁত করে নেমে যাবে। বেসিনের ওপর তাক। সেই তাকে দুরকম শ্যাম্পু সাবান, শাওয়ার ক্যাপ, দুটো সাদা নরম তুলতুলে তোয়ালে রুমাল। জুতো পরিষ্কারের একটা নতুন রকমের ব্যাপার। কাগজে মোড়া সুন্দর একটা গেলাস। ইলেকট্রিক রেজার ফিট করার জন্যে একটা ইলেকট্রিক পয়েন্ট। তার আবার ভোলটেজ কমানো বাড়ানো যায়। ঝকঝকে টাওয়েল-র‍্যাকে গোটা বারো নানা মাপের তোয়ালে। পরে জেনেছিলুম ফাইভ স্টার হোটেলের আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে নানা মাপের বড় ছোট তোয়ালে দিতেই হবে। না দিলে জাত যাবে। একটা গায়ে জড়াও। একটা বাঁধো মাথায়। একটা দিয়ে হাত মোছ, একটা দিয়ে পা। কি কান্ড। অ্যালুমিনিয়াম কি স্টিল বুঝতে পারছি না। মনে হয় স্টিল। স্টেনলেস স্টিলের তোয়ালে-র‍্যাকটা আবার হিটার। যে দেশে রোদ নেই, সে দেশে এ ছাড়া আর উপায় কি! ঢাকা কমোডে বিশ্বসুন্দরীর বুকে যেমন আড়াআড়ি 'মিস ইউনিভার্স' পটি বাঁধা থাকে, সেইরকম একটা ব্যান্ড। তাতে ইংরেজিতে লেখা, "স্পেশ্যালি স্টেরিলাইজড ফর ইউ।" কায়দার কপিকল। দেয়াল ঘেঁষে বাথটাব। তার পাশে হাতের নাগালের মধ্যে দেয়াল-তাকে আরও এক প্রস্থ সাবান ও বাথ-ফোম। এই ফোমের কথা বিলিতি পত্রপত্রিকা ও উপন্যাসে অনেক পড়েছি। আজ হবে তার পরীক্ষা।

বাথরুম পরীক্ষা করে বেরিয়ে এলুম। বাথরুমের দরজার ডানপাশে ধবধবে সাদা গদি মোড়া একটা বেঞ্চ। তার ওপর আপাতত বসে আছে আমার চার চাকার ব্যাগ। ঘরের ডিজাইনটা ইংরেজি এল-এর মতো। মাঝামাঝি জায়গায় ডান দিকের দেয়াল ঘেঁষে বিশাল জোড়া পালঙ্ক। পুরু মোটা বেড কভার দিয়ে ঢাকা। মাথার দিকে থাক্ থাক্ বিশাল মাপের দুধ সাদা বালিশ। ইংরিজি সিনেমায় বিলিতি শোয়া দেখেছি। অনেকটা আধ শোয়া মতো। বালিশের পর বালিশ তার ওপর মাথা। শরীরের ওপর দিকটা দোতলায় তো নিচের দিকটা এক তলায়। জেমস বন্ডের শোয়া দেখেছি। পালকের লেপ তুলে ধুপুস করে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে পাশে চলে এল বিশ্বসুন্দরী। বন্ডের হাতে মাথা রেখে গা ঘেঁষে অ্যাডাল্ট সিন। অবশ্য তার পরেই আসবে আততায়ী। এ ঘরেও আততায়ী আসার সুন্দর ব্যবস্থা। ঘরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিশাল জানালা। একটা দিকে শুধুই জানালা। পর্দারও যে অন্তর্বাস থাকে, এই প্রথম দেখলুম। ভারি সিল্কের বিশাল বিশাল পর্দা তলায় আবার আর এক প্রস্থ ধবধবে সাদা নেটের পর্দা। অসংখ্য দড়িদড়া ঝুলছে। কোনটা ধরে টানলে কোন পর্দা সরবে, পরীক্ষার ব্যাপার। সেই পরীক্ষায় পর্দা এক পাশে সরে গেল। এতক্ষণ যাকে জানালা ভেবেছি আসলে তা ঝকঝকে কাঁচের দরজা। বাইরে থমকে আছে সকালের লন্ডন। এখন আমি যা দেখছি, হিচককের রিয়ার উইন্ডোর নায়কও তাই দেখেছিলেন। দরজার বাইরে সাদা রেলিং ঘেরা নাতিপ্রশস্ত লম্বা বারান্দা। দরজার ঝকঝকে পেতলের ছিটকিনি খুলে উঁচু চৌকাঠ টপকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। কম উঁচুতে নেই। নিচে বিশাল একটা কোর্ট ইয়ার্ড। সেখানে সাদা রঙের একটা ভ্যান। চোখের সামনে এক জোড়া বিমর্ষ চেহারার, গম্ভীর প্রকৃতির উঁচু বাড়ি, ঝুল বারান্দা দিয়ে যুক্ত করা। তলা দিয়ে পথ চলে গেছে। স্ট্রিট নয় লেন। টুপি পরা এক সায়েব পথের একটা পাশ ঘেঁষে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন। তাঁর ডান হাতের পাশ দিয়ে ঝুলে আছে সাদা মতো একটা কি! কাগজ হতে পারে, ব্যাগ হতে পারে। ভদ্রলোকের হাঁটার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, ছেলে, ছেলের বউ দুর্গাপুরে চাকরি করে। কর্তা গিন্নির ঠ্যালা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। প্রথমে গঙ্গার দোকান থেকে মাদার ডেয়ারির দুধ নিয়ে, গোকুলবাবুর বাজার থেকে কাটা পোনা আর দুটো কপি নিয়ে, পয়সা বাঁচলে এক আঁটি ধনে পাতা কিনে ভোলাদার দোকানে এক চিলতে চা খেয়ে বাড়ি ফিরবেন। জম্পেস শীত পড়েছে। সায়েব ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে দুটো বাড়ির সংযোগকারী উড়াল বারান্দার তলা দিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এদিকটা হলা সেন্ট জেমস স্ট্রিটের পেছন দিক। যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা খুবই সরু। সুন্দর সাদা রঙ করা রেলিং। বেশি উঁচু নয়। তার ওপর হাত রেখে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাতে ভয় করছে। একবার মাথা ঘুরে গেলেই সোজা নিচে। সাত তলা থেকে পড়লে কুমড়ো ফট্টাস। সাদা রেলিং-এ এখনও শিশিরের মতো বৃষ্টির ফোঁটা জায়গায় জায়গায় ঝুলে আছে। ঠান্ডা হিলহিলে বাতাস বইছে। লন্ডনে বড় বাড়ি আর ছোট বাড়ির মধ্যে বেশ ভদ্রগোছের একটা সমতা রেখেছে সায়েবরা। দূরে একটা ঢ্যাঙা বাড়ি, কোলে কোলে ছোট বাড়ি। মানুষের দৃষ্টি দূরে যাবার পথ পায়। আকাশের ওপর তেমন উৎপাত হয় না। এতক্ষণ

দাঁড়িয়ে আছি, কোথাও কোনও বাড়িতে প্রাণের চিহ্ন দেখছি না। আমার মতো বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। মনে হয় ব্রংকাইটিসের ভয়ে কেউ বাইরে আসছে না। এখানে শুনেছি খুব ফ্লু হয়। শিশু-কণ্ঠের কলরব নেই। মায়েদের ধমকধামক নেই। রেডিওর শব্দ নেই। রাস্তায় গাড়ি আছে হর্ন নেই। চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেলে পুলিস রাগ করবে না, হর্ন বাজালে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ দশ পাউন্ড জরিমানা।

চৌকাঠ টপকে ঘরে এসে ঢুকলুম। কাঁচের দরজা বন্ধ করে সোনার মতো ঝকঝকে ছিটকিনি আটকে, প্রথমে সাদা নেটের পর্দা, তারপর ভারি সিল্কের পর্দা টেনে ঘরের দেয়ালের শোভায় মন দিলুম। শ্রেষ্ঠ ওয়াল পেপারের স্নিগ্ধ বৃটিশ রঙ। রুচি ছাড়া অর্থের কোনও দাম নেই। দুটো দরজার মাঝখানের দেয়ালে গিল্টি করা ফ্রেমে ছবি।

বাঁ দিকে ঘাড় ঘোরাতেই নজর চলে গেল আর এক কোণে। সেখানে সুন্দর একটা টেব্‌ল। দামী গোল আয়না। আঙুল রেখে সিলভারিং পরীক্ষা করলুম। আঙুল আর আঙুলের প্রতিফলনের মাঝের গভীরতা দেখে বোঝা যায় আয়নার জাত। টেবিলের ডান ধারে একটা কালার টিভি। আয়নার কাছে পাতলা কাগজ মোড়া একটা বেতের ট্রে। সেই ট্রেতে ফল। আপেল, লাল আঙুর, র‍্যাসপবেরি, আর একটা কি ফল কে জানে! জীবনে দেখিনি। মোক্ষফল নয় তো! সিগারেটের দুটো বড় কার্টুন। বেনসন হেজেস আর রথম্যান। ভেলভেট আর ফোম বাঁধাই ওয়ালেট। তাইতে লেখার সরঞ্জাম। বৃটিশ কার্পেন্টারের তৈরি নিখুঁত ড্রয়ার। এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার কারণ, ইংরেজদের আমরা পারফেকসানিস্ট বলেই জানি। রুচিরও প্রশংসা শুনে এসেছি। পৃথিবীতে বৃটিশ আভিজাত্যের খুব অহংকার। কতটা আছে, কতটা গেছে, দেখতে হবে তো! এখনও বেশ আছে। সব নিখুঁত। খাটের দু'পাশে দুটো সাইড টেব্‌ল। তার ওপর দুটো জালার মতো টেব্‌ল ল্যাম্প। পেতলের শরীর, সিল্কের শেড। পেতল পালিশ দিয়ে মাজা। শেডে ধুলো নেই, ঝুল নেই। টিভির মাথা কিম্বা সুইচের কাছে পাউডারের মতো ধুলো জমে নেই। এমন কি ড্রয়ারের ভেতর আরশোলার বাচ্চা নেই। এই রকম একটা ঘরের জন্যে রোজ পঞ্চান্ন পাউন্ড দেওয়া যায়।

এইবার ওয়ার্ডরোব ইনস্‌পেকসান। হিচককের ম্যানিয়াকরা ওয়ার্ডরোবেই লুকিয়ে থাকে। বেশ ভয়ের জায়গা। ওয়ার্ডরোবের গায়েই আর একটা খুপরি। কোনও তাকটাক নেই। বেশ দাঁড়িয়ে পড়া যায়। জামা কাপড় ছাড়া যায়। সেখানে আবার অনেক গ্যাজেট। মনে হয় জেমস বন্ডের ব্যায়াম করার যন্ত্রপাতি। ওয়ার্ডরোবের ভেতরে একটা ছোট লম্বাটে কাঠের ক্যাবিনেট। কে জানে কি!

খাটের পাশে সাইড টেবিলের গায়ে সার সার সুইচ। টিভি ওই মাথায় সুইচ এই মাথায়। ছোট্ট একটা ক্যালকুলেটারের মতো যন্ত্র সাইড টেবিলের ড্রয়ারে। টিভির রিমোট কন্ট্রোল। মাথার ওপর পোড়া লাল রঙের টেলিফোন। মুখ গোঁজ করে আছে। বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে বহু দূরে ফেলে আসা আমার বাড়ির কথা চিন্তা করলুম। নাঃ তেমন কিছু মনে পড়ছে না। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে এই হোটেল ঘরেই আমার জন্ম হয়েছে। সরু গলি, গঙ্গার ঘাট, কালীবাড়ি, আশ্রম, কোনও কিছুর জন্যেই মনে সামান্যতম আঁকুপাঁকু নেই। শুয়ে তাকালেই দূরে টেবিল, আয়না, ফলের বাস্কেট, টিভি। গদি আঁটা বেঞ্চের ওপর আমার ব্যাগ, সানডে লন্ডন টাইমস, দুটো ছবি। এই সব চোখে পড়ছে।

উঠে পড়লুম। বিছানাটা বড্ড বড়। রাতে এত বড় বিছানায় একা ঘুমানো যায়! কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে মনে হলো, আমি সায়েব। সায়েবরা প্রতিদিন ব্যায়াম করে। আমারও করা উচিত। ব্যায়ামের বদলে কার্পেটে শুয়ে গোটা তিন চার যোগাসন করে নিলুম। হলাসনটা খুব জমে গেল। আমার নিজের বাড়িতে হলাসন করতে গেলে একটা না একটা বিপত্তি হবেই। চতুর্দিকে ফারনিচার, বাক্‌সো, প্যাঁটরা। আসন করার সময় মাথার ওপর দিয়ে পা ওলটালেই, পেছন দিকে একটা না একটা কিছু পড়বেই পড়বে, আর আমার কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বাড়ি মাথায় করবে। সেই সঙ্কট মুহূর্তে আমার কানে আসবে মন্তব্য, হলাসন করে মরেছে। কি পড়ল! ফুলদান! এখানে তেমন কিছু হলো না। আমার মাথাটাকে কেন্দ্রবিন্দু ধরলে, পায়ের দিকেও অঢেল জায়গা, মাথার দিকেও অঢেল জায়গা।

যোগাসনের পর ফল খাওয়া উচিত। ফলের বাস্কেটের কাছে গিয়ে ভাবতে লাগলুম, একটি দ্রাক্ষা ফল ছিঁড়ে মুখে ফেললে ক'পাউন্ড বিল হবে! হাত এগোচ্ছে। ক' পাউন্ড? হাত পেছিয়ে আসছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, পাশেই একটা সুদৃশ্য কার্ড। তাতে পরিষ্কার লেখা, উইথ কমপ্লিমেন্টস ফ্রম ইন্ডিয়ান

হাই কমিশান। সঙ্গে সঙ্গে পাতলা কাগজ ফর্দাফাঁই। প্রথমেই আক্রমণ করলুম আপেলটাকে। ভেবেছিলুম সাংঘাতিক একটা কিছু স্বাদ পাবো। হতাশ হতে হলো। ইংল্যান্ডের আপেল আর ভারতের আপেলে বিশেষ ফারাক নেই। অথচ ইংল্যান্ডের আপেল আর ভারতের মানুষের কত তফাৎ।

কচর কচর করে আপেলটা খাবার পর বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো। ভয়ও হলো। আমার দলের কে কোথায় আছে! ফেলে চম্পট দিল না তো! আপেলের শেষ অংশটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলুম। এমন একটা জিনিসে এমন জিনিস ফেলা যায়। কমলালেবু রঙের অসাধারণ সুন্দর আবর্জনাধার। টুকরোটা কাগজে মুড়ে ধীরে ভেতরে রেখে দিয়ে, দরজা খুলে বাইরে পা দিলুম। দরজা আপন মনে কুলুক করে বন্ধ হয়ে গেল। করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে করিডরের চৌমাথায় এসে থমকে দাঁড়ালুম। কেউ কোথাও নেই। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও প্রাণী আছে বলে মনে হলো না। অপ্রাণীর অভাব নেই। ফুল গাছের টব। ছবি। নানা রকম লেখাজোখা। আছে সবাই। দরজার ওধারে। চার দেওয়ালের নিরুদ্ধ জগতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিরে এলুম আমার ঘরের সামনে। দরজার নব ধরে ঘোরালুম। এ কি খুলছে না যে? কি হলো রে ভাই? এদিক ঘোরাই, ওদিক ঘোরাই। ঠেলাঠেলি করি। কোথায় কি! আলু ফাঁক, পটল ফাঁক, ঝিঙে ফাঁক। চিচিং ফাঁক আর হয় না। দরজা লকড হয়ে গেছে। চাবি ঘরের ভেতরে। টেবিলের ওপর। কি হবে? নিজেকে এত অসহায় বোধহয় কোনও দিন মনে হয়নি। ঘরে ঢুকতে না পারার কি অদ্ভুত অনুভূতি। দাড়ি কামাতে হবে। স্নান করতে হবে। পোশাক পাল্টাতে হবে। সময় বহে যাচ্ছে। আমি ছাড়া আমার সব কিছু ভেতরে। এখুনি গাড়ি এসে যাবে। দিন শুরু হবে। হায় ভগবান! একেবারে বেইজ্জতি ব্যাপার! আবার ফিরে গেলুম সেই চৌমোহনায়। চারপাশ থেকে চারটি করিডর এসে মিশেছে প্রশস্ত একটি সঙ্গমে। দেয়ালের গায়ে এখানে অনেক ছবি। আমি গম্ভীর চালে পেছনে হাত মুড়ে এদিকে ওদিকে কয়েক পাক ঘুরে নিলুম। একটা জানালার আধপাল্লা খুলে বাইরের জগৎটা একবার দেখে নিলুম। রোদ বেশ স্পষ্ট হয়েছে। জানালা বন্ধ করে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেয়ালের ছবি দেখছি। যেন অ্যাকাডেমির আর্ট এগজিবিশানে আমি এক আর্ট ক্রিটিক। ছবি দেখছি, আর ভাবছি, আচ্ছা কেউ কি আসবে না! এটা কি ফরবিডন ল্যান্ড! আবার এতটা হেঁটে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আবার সেই রিসেপসানে যাওয়া! সেখানে দুই সুন্দরী। তাদের দরবারে গিয়ে বলতে হবে আমার বোকামির কথা!

টু এলিভেটার, টু এলিভেটার। তীর চিহ্ন ধরে এগোচ্ছি। ডান দিকে একটা কাঁচের দরজা। লেখা, ফায়ার একজিট। দরজার ওপাশে দেয়ালে একটা ফোন ঝুলছে। গেলুম সেদিকে। ফায়ার একজিট মানে সিঁড়ি। একেই তো জনপ্রাণী নেই, তার ওপর দরজার আড়ালে নির্জন সিঁড়ি ধাপে ধাপে কোন অনিশ্চিত, অদৃশ্যলোকে যে নেমে গেছে! পরিবেশ মনের ওপর যে কি অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে! সাইকোলজিক্যাল ফিয়ার। পৃথিবীর বাইরে চন্দ্রালোকে নেই, তবু কি অস্বস্তি! ফোনের পাশে একটা কার্ড। তাইতে সব নম্বর লেখা। রুম সার্ভিস, লন্ড্রী, রেস্তোরাঁ, রিসেপসান। পিয়ানো কি সিসটেম। প্রথমে শূন্য টিপে তারপর ছয়।

যাক ভয় পেলেও ইন্ডিয়ান ইংলিশটা ভুলিনি। হ্যালো রিসেপসান। মহিলা কণ্ঠ। দিস ইজ সিক্স ফোর টু, নট জিরো জিরো সেভন। তারপর সেই কথামালার গল্প। আমি ছিলুম খাঁচার বাইরে বাঘটা ছিল ভেতরে। আমি ঘরের বাইরে, আমার চাবি ভেতরে। মেয়েটি শূন্য পূরণ করলে, অ্যান্ড দি ডোর ইজ লক্‌ড। রাইট ইউ আর, সোনা মেয়ে। হোয়াট? শেময় লেদার। নো নো, ইউ আর এ গোলডেন গার্ল। মেয়েটি কুঁই কুঁই করে হেসে উঠল।

চাবির তোড়া হাতে একটি মেয়ে এল। মুখের আদল দেখে মনে হচ্ছে সিঙ্গাপুরী। এ গার্ল ফ্রম সিঙ্গাপুর। মেয়েটি মুচকি হাসল। বললুম, "হোয়াট এ প্রবলেম।" মেয়েটি বললে, "দ্যাটস নাথিং।" চাবির থোলো থেকে পেল্লায় এক চাবি বের করে দরজা খুলে দিল। তারপর সেই মিষ্টি মেয়েটি, সেই অটোমেটিক দরজাটি সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিল। কি ভাবে, কি করলে দরজা আর বন্ধ হবে না। বার কতক, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলুম। মেয়েটি গুটগুট করে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে মনে হলো আমি যেন যুদ্ধজয়ী এক জেনারেল। আনন্দে সব কটা আলো জ্বেলে দিলুম। টিভি চালিয়ে দিলুম। বিবিসির খবর হচ্ছে। কত কি যে বলছে! কাল এক পুলিসকে ধরে ছুরি মেরে

ফালা ফালা করেছে কিছু রাগী ইংরেজ ছোকরা। যে জায়গায় এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সেই ঘটনাস্থল দেখানো হচ্ছে। আমি যে দেশেব মানুষ, আমার কাছে এ ঘটনা কিছুই নয়। ডাল ভাত। আমি এইবার চান করব। বিলিতি চান। বাথরুমে ছোট একটা নোটিস। দয়া করে মেঝেতে জল ছড়িও না। বেশ ছড়াবো না। আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাবো না। বাথম্যাট পেতে তার ওপর একটা তোয়ালে বিছলুম। বাথটাব থেকে নেমে ওর ওপর দাঁড়াবো। একেবারে পাকা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। গরম জল আর ঠান্ডা জল মাপ মতো ছেড়ে, ওই ফোমের শিশিটা উপুড় করে দিলুম। তারপর দু হাত দিয়ে খলরবলর করতেই ফুলতে শুরু করল।

ফ্যানা উঠছে। ফুলছে তো ফুলছেই। ফুলেই চলেছে। সর্বনাশ! এরপর তো উপচে মেঝেতে পড়বে। সব ভাসিয়ে দেবে। বাথটাব আর বেসিন ছাড়া জল বেরোবার আর কোনও জায়গা নেই। হায় রাম! ফুলছে, ফুলেই যাচ্ছে। দুধ ওতলাবার মতো পালিশ করা মেঝেতে নেমে এল বলে। ছেলেবেলায় দেখেছি পাখাব বাতাস করলে দুধ শান্ত হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় তোয়ালেটা টেনে নিয়ে দু হাতে খুলে বাথটাবে বাতাস করতে লাগলুম। ওরে থাম, আর ফুলিস নি বাবা। যে জায়গাটা খুলে দিলে এখুনি সব জল বেরিয়ে যেতে পারে, সেটা পড়ে গেছে তলায়। হাত ডুবিয়ে খুলতে গেলে ফেনা উপচে পড়বে। একেই বলে অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড়। গুরু বলে অথবা বাতাসের দাপটে ব্যাপারটা একটু থিতলো। ফেনার ছেঁড়া টুকরো, দু এক কুচি দেয়ালের সুদৃশ্য ওয়াল পেপারে আটকে ছিল। তোয়ালে দিয়ে মুছেটুছে কোনও রকমে সামাল দেওয়া গেল। চান করবো কি, আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। ফেনাটা থিতোতে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লুম। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। খুব খানিকটা খলরবলব করলুম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, জলেব ঊর্ধ্বচাপে মেঝেতে গিয়ে না পড়ি! মিনিট পনের নাকানিচোবানি খেয়ে উঠে পড়লুম ডাঙ্গায়। সারা অঙ্গ অনেক দিনেব পুরনো মাছের মতো হড়হড় করছে। সেকালে জমিদার বাড়ির পুকুরে, নাকে নোলক পরানো কিছু কিছু পোষা মাছ থাকতো। কোনওটাব নাম ভোলা, কোনওটার নাম মোহন। এক একটার বয়েস পঞ্চাশ, ষাট। আমি যেন সেই রকম একটা মাছ। মাগুর অথবা সিঙ্গি কারণ আমার গায়ে আঁশ নেই। সব কটা তোয়ালেই কাজে লেগে গেল। হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেলুম, ফোম বাথ বা বাথ ফোম কাকে বলে!

ঘরের ফোন বাজছে। জেমস বন্ড যে ভাবে তোয়ালে পরে ফোন ধরেন, আমিও রিসিভার তুলে নিলুম! মহিলা-কণ্ঠ, 'হ্যালো, দাদা, তুমি কি করছো!' কুমকুমের গলা। 'আমি মেকআপ নিচ্ছি ভাই।' 'আর কতো দেরি করবে। চলে এসো।' 'কোথায়?' 'আমার ঘরে।' 'তুমি কি করছো?' 'আমি রোস্টেড অ্যামন্ড খাচ্ছি।' 'কোথায় পেলে?' 'ওয়ার্ডরোবের ভেতরে।' 'ওয়ার্ডরোবের ভেতরে!' 'তুমি খুলে দেখ। একটা মিনি বার পাবে। মাথার ওপর চাবি আছে, আর আছে একটা লিস্ট। ড্রিংকসে হাত দিও না, মরে যাবে। ইচ্ছে হলে বাদামটা নিয়ে চলে এসো। আমরা এখুনি রঞ্জিতের সঙ্গে বেরবো। তুমি তাড়াতাড়ি নাও।'

কুমুকম ফোন করেছে। আমাকে মনে রেখেছে। ভেতরটা লাফাতে শুরু করেছে। টিভিতে এক সায়েব গজর গজর করছে। আর এক সায়েব কি একটা আবিষ্কার করেছে, সেই নিয়ে একেবারে পাগল করে মারছে। ড্রেস কমপ্লিট। পিনাক সায়েব বলেছেন, পাসপোর্ট আব ট্র্যাভলার্স চেক যেন সঙ্গে সঙ্গে থাকে, নেকস্ট টু ইওর স্কিন। হারালে বা চুরি গেলে মহা সমস্যা। আমার সেই বিখ্যাত উইণ্ডচিটার এবার তেমন ভোগাতে পারল না। ফায়ার একজিট দিয়ে নেমে এলুম নিচের তলায়। আমার ঘরের ঠিক নিচেই কুমকুম মেম সায়েবের ঘর। আর তার পাশেই ঘরেই রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়।

রঞ্জিৎবাবুকে হাইকমিশান অফিস থেকে আলাদা একটা গাড়ি দিয়েছে। টেলিভিসানের ব্যাপার। ভিডিও তোলা, প্রসেস করা, এডিট করা। দেশে সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো। স্বতন্ত্র একটা গাড়ি না থাকলে চলবে না। কুমকুমের প্ল্যান আমরা রঞ্জিতবাবুর গাড়ি চেপে খানিক ঘুরবো। কোথাও বসে চা কফি খাবো, তার পর প্রেস সেন্টারে যাবো। কুমকুমের এই লোভনীয় প্রোগ্রামে আমাকে নেওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতায় বেড়ালের মত ঘড়র্ ঘড়র্ করতে ইচ্ছে করছে। অরেঞ্জ কলারের শালোয়ার কামিজে কুমকুমকে সম্রাজ্ঞীর মতো দেখাচ্ছে; যেন রাজিয়া সুলতানা।

নিচের লবিতে সকলে সমবেত হয়েছেন। দীর্ঘকায় পিনাক সায়েব এসে গেছেন। একটা সুবিধে,

বিমানবন্দর থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রীর দলবলের বাইরে চলে আসতে পেরেছি। তা না হলে সিকিউরিটিতে শেষ করে দিত। রাজীবজী আছেন চার্চিল হোটেলে। অবশ্যই আরও বিশাল। কোন গ্রুপের কে জানে! হোটেলের আবার ভীষণ দলাদলি আছে। হিল্টন গ্রুপ, ওবেরয়, শেরাটন। বড় লোকদের বড় বড় ব্যাপার।

হাসিখুশি, বেশ স্বাস্থ্যবান, চেহারার এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ইন্ডিয়ান হাই কমিশানের মিঃ ভাটিয়া। টেলিভিসান টিমের দায়িত্বে নিয়োজিত। ভাটিয়া সাহেব রঞ্জিতবাবুকে বললেন, 'গাড়ি রেডি।' আর ভাটিয়ার চেহারায় বেশ সাদৃশ্য আছে। আকার আকৃতিতে দু'জনেই সমান। দু'জনেই সমান রসিক ও দিলদরিয়া।

একেই বলে গাড়ি। আবার একেই বলে ফুটপাথ। কলকাতা ছেড়ে ইংরেজরাও গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাথও গেছে। কলকাতার কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে অজ্ঞাত কারণে, অথবা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার জন্যে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ ধরে আনেন। উদ্দেশ্য শহরকে সুন্দর করে তোলার পরামর্শ চাই। সেদিন এক বিশেষজ্ঞ এসে শেষমেষ বলে গেলেন, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ন' হলে সুন্দর কলকাতার স্বপ্ন আর সোনার পাথরবাটি, একই ব্যাপার।

গাড়ির চালক বসে আছেন গ্রে-স্যুট পরে। গ্রে রঙটা ইংরেজদের ভীষণ প্রিয় দেখছি। ভদ্রলোক বয়সে, প্রবীণ; এই চেহারায় ফিল্মের হিরো হওয়া যায়। একটা বোতাম টিপলেন, সুইস করে সামনের আর পেছনের দরজা খুলে গেল। হড়াস করে খুলল না। খুলল ধীরে ধীরে। ভাটিয়া সামনের আসনে। কুমকুম আর রঞ্জিতবাবু একই সঙ্গে বললেন, 'দাদা আপনি উঠুন।' ওঁদের এই ভদ্রতায় ভেতরটা ভরে গেল। ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে যে কোনও মানুষকেই সহজে কাত করে দেওয়া যায়।

১৫

আসনে বসে মনে হলে তলিয়ে গেলুম। এর নাম রোভার। আগাপাশতলা যার কম্পিউটার। কম্পিটার পে-ডিগ্রি। গাড়ি চলেছে মাখমের মতো। আসনে হাত রেখে মনে হচ্ছে ভেলভেটের জামা পরা কোনও সুন্দরীর পিঠে হাত রেখেছি। চোখ দুটো আমার ড্যাবা ড্যাবা হয়ে গেছে। গাড়ি বাকিংহাম প্যালেসকে বাঁয়ে রেখে বোঁ করে ঘুরে গেল। এসে গেল নেলসনস কলাম। কোন আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নৌযোদ্ধা! আমাদের গাড়ির চালকের নাম মিস্টার রবিনস। ভাটিয়া সায়েবের ফর্সা উজ্জ্বল মুখ। থেকে থেকে সেই সুন্দর মুখ ঘুরিয়ে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন পথের সঙ্গে।

আমি একপাশে। রঞ্জিতবাবু আর একপাশে মাঝে কুমকুম। কুমকুম বললে, 'যে ভাবেই হোক সময় করে বাকিংহাম প্যালেসের চেঞ্জ অফ গার্ডস দেখতে হবে।' ভাটিয়া সাহেব বললেন, 'তাঁহলে ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় গেটের বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে।' ট্রাফালগার স্কোয়ার ফেলে গাড়ি চলে এল সেন্ট মার্টিনস লেনে। লিচেস্টার স্কোয়ার। মনমাউথ স্ট্রিট। মনমাউথ স্ট্রিট থেকে নিউ অকসফোর্ড স্ট্রিট। সেখান থেকে বাঁয়ে ঘুরে অকসফোর্ড স্ট্রিট।

রঞ্জিতবাবুর কাজে আমরা প্রথমে যাব একটা স্টুডিওতে। প্রোসেসিং, ডেভালাপিং নানা ব্যাপার হয় সেখানে। সেই স্টুডিও এসে গেল। র‍্যাথবোন প্লেসে সেই স্টুডিও। সায়েবদের ব্যাপার যেমন হয়। গাড়ি থেকে নেমে আমরা স্টুডিওতে ঢুকলুম। প্রবেশপথটি ভারি সুন্দর। অ্যালুমিনিয়াম সিট দিয়ে মোড়া। আমরা বেসমেন্টে নেমে এলাম। তরুণ ইংরেজ ছোকরা, বিটলস্‌দের মতো চুল, মহা উৎসাহে তার কাজ কর্মের কথা বলতে লাগল। আমার বিষয় নয়। আমি শুধু দেখছি, একটা স্টুডিও কত পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর হতে পারে। ফ্লোরে মেরুন রঙের কার্পেট। এখানে ওখানে নানা যন্ত্রপাতি মেশিনপত্তর ছড়ানো।

কথাবার্তা বলে রঞ্জিতবাবু বেশ সন্তুষ্ট হলেন। ভাটিয়া সায়েব একেবারে সঠিক জায়গায় এনে ফেলেছেন। আমরা মাটির তলা থেকে ওপরে উঠে এলুম। রোদ ঝলমলে রাস্তায়। লন্ডন এতক্ষণে

জেগে উঠেছে। লোক চলছে। গাড়ি চলছে। তবে হই হট্টগোল নেই। কারণ গাড়িতে হর্ন দিতে হয় না। আর লন্ডনের মানুষ অকারণে কথা বলে না।

গাড়ি নিলে অফিসিয়াল কাজকর্ম একটু করতেই হবে। তা না হলে সমালোচনা হবে; কলা বেচার সঙ্গে রথ দেখা জুড়ে দিতে হবে বুদ্ধিমানের মতো। কলা বেচা হলো এই স্টুডিওতে মিনিট পনের কথা বলা। কলা বেচা শেষ, এইবার আমরা রথ দেখবো। ভাটিয়া সাহেবের নির্দেশে গাড়ি ঢুকে পড়ল বণ্ড স্ট্রিটে। ছোটখাটো একটা রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থেমে পড়ল। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি, পার্কিং,-এর কোন সমস্যাই নেই। ফুটপাথের গা ঘেঁষে গাড়ি রাখলেই হলো। সদর রাস্তার কি নিয়ম জানি না, তবে পাশের রাস্তায় পুলিসের কোন অত্যাচার নেই। কলকাতা হলে করপোরেশনের দাদন দেওয়া কর্মীরা স্লিপ নিয়ে তেড়ে আসতেন। অবশ্য লন্ডনের ম্যাপে অনেক পার্কিং জোন দেখানো আছে।

বেশ ছোটখাটো, খোলামেলা রেস্তোরাঁ। সামনের দিকটা একটু নিচু। পেছন দিকটা উঁচু। দু ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। সেখানে দুপাশে দু সার বসার জায়গা। সামনে বাঁপাশে লম্বা কাউন্টার। কাউন্টারে যাবতীয় ভোজ্য বস্তুর লোভনীয় সমাবেশ। তার কিছু চিনি কিছু চিনি না। হরেক রকমের ফল আছে। দুধ আছে। কাঁচের শো কেসে হরেক রকমের কেক আর প্যাস্ট্রি সত্যাগ্রহীদের মতো বসে আছে। কাউন্টারের শেষ মাথায় স্টেনলেস স্টিলের ব্যারেল আকৃতির একটি যন্ত্র। কল টিপলেই কাপে কফি হিস করে দিচ্ছে। মনে হয় ফ্যামিলি শপ। প্রৌঢ় পিতা হলেন মালিক। অ্যাপ্রন পরে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কাউন্টারের মাঝখানে। হাত দুটো দুপাশে লম্বা করে ছড়ানো। যেন দু হাতের সীমার মধ্যে খাদ্যবস্তুর এই বিচিত্র জগৎটি আগলাতে চাইছেন। কফি মেশিনের কাছে গাঁট্টাগোঁট্টা, ষোল সতের বছরের ছেলে আর ওই বয়েসের দুটি মেয়ে। সকলেই সাদা অ্যাপ্রন দিয়ে বুক ঢেকে রেখেছে। কি করব, আমার কোনও দোষ নেই, আমার চোখ দুটির দোষ। মেয়ে দুটিতে আটকে গেছে। বিলিতি বেগুনের মতো লাল লাল গাল। পানের মতো চিবুক। তারপর আনুষঙ্গিক অন্যান্য চোখকাড়া দেহসম্ভার। প্রথমে ভেবেছিলাম ইংরেজ। পরে বুঝলাম গ্রীক। আমরা আসার আগে থেকেই ভাই বোনে ঝগড়া চলছিল। আমরা আসনে বসতে না বসতেই সে ঝগড়া তুমুল হলো। মাতৃভাষায় কথা কাটাকাটি চলছে। রানী মুরগীর মতো ছোট মেয়েটি একবার এদিক যাচ্ছে, একবার ওদিক যাচ্ছে।

বড় বোন এগিয়ে এল অর্ডার নেবার জন্যে। আমরা রবিনস সাহেবকেও জোর করে ধরে এনেছি। প্রতিটি টেবিলে এপাশে ওপাশে চারজন বসতে পারেন। রবিনস সাহেব ওপাশ থেকে একটা চেয়ার টেনে এনে পাশে বসেছেন। আমি আর কুমকুম চিজ স্যাণ্ডউইচ খাবো। বিদেশ বিভুঁই জায়গা, আবোল তাবোল গিলে কাত হয়ে পড়ে থাকতে চাই না। রঞ্জিতবাবু মেনু দেখে কি একটা অর্ডার দিলেন জীবনে সে বস্তুর নাম শুনিনি—প্ল্যাটিপাস না হকটোপ্লাজম, এই রকম একটা নাম বললেন। ভদ্রলোক নির্ঘাত বিপদে পড়বেন। ভাটিয়া সাহেব আপাতত কফি ছাড়া কিছু খাবেন না।

আমি রবিনস সায়েবকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কি খাবেন?'

রবিনস সায়েব নিজের ভুঁড়িটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে বললেন, 'আমার যে কিছু খাওয়ার উপায় নেই, বিকজ অফ দিস।' করুণ মুখে দু'বার ভুঁড়ি চাপড়ালেন। 'আমি শুধু কফি খাবো চিনি ছাড়া।'

মেয়েটি অর্ডার নিয়ে চলে গেল। চলে যাওয়া মাত্রই কাউন্টার ফাইট আবার জোরদার হলো। ছোট বোনটি কি কারণে যেন ভীষণ রেগে গেছে। ভাই বোনে কিছু একটা হয়েছে। প্রৌঢ় পিতা নামতা পড়ার মতো অনর্গল কি বলে যাচ্ছেন। মনে হয় বলছেন 'ওরে তোরা ঝগড়া করিসনি। ওরে দোহাই তোদের ঝগড়া করিসনি।'

ওই লড়াইয়ের মধ্যেই বড় বোনটি পরিপাটি করে দু প্লেট স্যাণ্ডউইচ নামিয়ে দিয়ে গেল। ভুর ভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে। স্বর্গীয় গন্ধ। রবিনস সায়েবকে বললুম, 'এক পিস স্যাণ্ডউইচ খান। যাবার আগে আমি আপনাকে পদহস্তাসন আর হলাসন শিখিয়ে দিয়ে যাবো। এক মাসের মধ্যেই ভুঁড়ি চুপসে পেস্টবোর্ডের মতো হয়ে যাবে।'

সায়েব বললেন, 'ইয়োগা।'

'ইয়েস ইয়োগা।'

তবু সায়েবের বিশ্বাস হলো না। সায়েবরা ভুঁড়িকে কি ভীষণ ভয় পান? ওয়েস্ট লাইন চওড়া হয়ে যাওয়াটা ভীষণ ডিসকোয়ালিফিকেসান। কফি ছাড়া সায়েব কিছু খাবেন না। ওদিকে কফি-যন্ত্রের

কাছেই অন্তর্কলহ শুরু হয়ে গেছে। খাদ্য ডিপার্টমেন্টটাই সচল আছে। প্রৌঢ় পিতা আর বড় মেয়ের হাতে সেই বিভাগ। ভাই আর ছোট বোনের দায়িত্বে গরম পানীয়। গরম বলেই বোধহয় এত গরম। গাঁট্টাগোট্টা একগুঁয়ে ধরনের ছেলেটি হঠাৎ একপাশে সরে গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন ফায়ারিং স্কোয়াডের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে এখুনি তার কোর্ট মারশাল হবে। বৃদ্ধ এবার খুবই সরব। বড় মেয়েটি যেন কিটসের চরিত্র। গ্রিসিয়ান আর্ন-এর গা থেকে জীবন পেয়ে নেমে এসেছে। ওদিকে যে এত বড় নাটক চলেছে, আমার দলের কারুরই নজর নেই সেদিকে। তাঁরা নিজেদের মধ্যেই কথা বলে চলেছেন।

বড় মেয়েটি এইবার একটা ডিশে করে রঞ্জিতবাবুর সেই প্ল্যাটিপাস না একটোপ্লাজম নিয়ে এল। ডিশজোড়া আস্কে পিঠের মতো বাদামী করে ভাজা একটি বস্তু। ওপরটা ফেটে গেছে। মেয়েটি যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম, 'হোয়াট ইজ দি প্রবলেম?'

মেয়েটি মুচকি হেসে বলে গেল, 'সেই এজ-ওল্ড প্রবলেম, স্বামী স্ত্রীর কলহ।'

এতক্ষণে বোঝা গেল, ছেলেটি হলো এই পরিবারের ঘরজামাই। বিছানা থেকেই ঝগড়া করতে করতে উঠে এসেছে, এখনও মেটেনি। ছোট বোন হঠাৎ অ্যাপ্রনটা খুলে ছুঁড়ে দিল স্বামীর পিঠের ওপর। সে মুখ না ফিরিয়েই কাঁধের ঝটকা মেরে ফেলে দিল মেঝেতে। মেয়েটি গনগন করে কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসে আমাদের থেকে কিছুটা দূরে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। আর তার স্বামী অ্যাপ্রনটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে তেড়ে এসে জড়িয়ে দিল মেয়েটির মুখে।

এইবার ঠিক হয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল। এরপর ছেলেটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। সেই অ্যাপ্রন জড়ানো মুখ দু'হাতে ধরে একটু উঁচু করে চকাস চকাস চুমু খেতে লাগল। ছেলেটার বুদ্ধি আছে, এমনি খেতে গেলে কামড়ে দিত। মেয়েটি খুব বেকায়দায় পড়ে উঁ উঁ করে চলেছে।

কুমকুম বললে, 'দাদা, তুমি কি করছ! স্যাণ্ডউইচ খাও।'

যার যেমন বরাত। কেউ সকালে সুন্দরীকে চুমু খায়, কেউ সকালে সুন্দরীকে পাশে রেখে স্যান্ডইউচ খায়। কপাল গুণে ঘি ভাত, কপাল দোষে কি ভাত! মেয়েটি কোনও রকমে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়াল। ঝটপট অ্যাপ্রন পরে চলে গেল কফিযন্ত্রের কাছে। যাক রবিনস সায়েবের কপাল ফিরল। এইবার ওই গোলগোল মিষ্টি হাত থেকে যে কফি বেরোবে তার স্বাদই হবে অন্যরকম।

স্যান্ডউইচ খেতে খেতে রঞ্জিতবাবুর প্লেটের দিকে তাকালুম, জিনিসটা কি বটে! ওপরটা বেশ মুচমুচে। বাদামী রঙ। যেই ছুরি দিয়ে কাটলেন, মোলায়েম ঘি ঘি অন্তরাত্মা বেরিয়ে এল। আমি অপেক্ষা করে আছি, মুখে পোরার পর চেহারা কি দাঁড়ায় দেখতে হবে। ভেবেছিলুম জিভে দেওয়া মাত্রই চোখ বড় বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসার মতো হবে। সে রকম কিছু হলো না। কেমন যেন সমাধিস্থ মতো হয়ে গেলেন। আমি আর কুমকুম দু'জনেই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, 'কেমন? কেমন? কেমন খেতে।'

রঞ্জিতবাবু চোখ খুললেন। অনুভূতির কোন সুদূর জগতে যেন চলে গেছেন! সাধকের সমাধি ভঙ্গ হলে যেমন হয়, সেই রকম ভাবের গলায় বললেন, 'কোনও তুলনা হয় না।'

বলেই দুটো টুকরো, একটা আমার প্লেটে আর একটা তুলে দিলেন কুমকুমের প্লেটে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা টুকরো মুখে পুরে দিলুম। সাপের ছুঁচো গেলা প্রবাদটা শোনা ছিল। ছুঁচো গিললে সাপের কেমন লাগে জানা ছিল না, সেই মুহূর্তে জানা হয়ে গেল। এই দোকানের মালিক কি ফ্রাঙ্ক বাকল্যান্ডের রেপিসি খুঁজে পেয়েছেন।

কে এই বাকল্যান্ড! এই দেশেরই এক মজার মানুষ। ইউস্টন স্টেশানের কাছে যেখানে এখন রয়াল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস, সেইখানে ছিল বাকল্যান্ডদের রিজেন্সি হাউস। সে ১৮০০ সালের কথা। ফ্রাঙ্ক বাকল্যান্ড ছিলেন একজন নামকরা সার্জেন ও ন্যাচারালিস্ট। ১৮২৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর এই বিখ্যাত মানুষটি জন্মেছিলেন। ছোটোখাটো, শক্ত সমর্থ এই মানুষটির ছিল অসীম পরিপাক শক্তি। বিদঘুটে বিদঘুটে জিনিস রান্না করে খাওয়া আর খাওয়ানোই ছিল যাঁর শখ। বাকল্যান্ড তাঁর ডায়েরির এক জায়গায় লিখছেন। লাঞ্চে আজ একটা ভাইপার (বিষাক্ত সাপ) রেঁধেছিলুম। আর তৈরি করেছিলুম হাতীর শুঁড়ের স্যুপ। মন্তব্যে লিখেছেন, স্যুপটা বড় হতাশ করেছে। তিন চার দিন ধরে সমানে এত ফোটালুম, তবু কি শক্ত! দাঁত বসানো গেল না।

এক দিন তাঁর বন্ধুরা এসে দেখলেন বাকল্যান্ড নানা রকম জিনিস দিয়ে পিঠের মতো কি একটা সাংঘাতিক খাদ্যবস্তু তৈরি করেছেন। বন্ধুদের পরিবেশন করলেন। ভেতরে ডুমো ডুমো গণ্ডারের মাংস। বাকল্যান্ড খেতে খেতে বললেন, মন্দ হয়নি, তবে গণ্ডারের মাংসের স্বাদ যেন বহু প্রাচীন, ভীষণ শক্ত গরুর মাংসের মতো। মনে হচ্ছে গরুর বৃদ্ধ প্রপিতামহকে চিবোচ্ছি।

যে কোনও জিনিস চেখে দেখার অদ্ভুত ঝোঁক ছিল এই মানুষটির। লন্ডনের চিড়িয়াখানা এই ব্যাপারে কয়েকবার তাঁকে ভীষণ সাহায্য করেছিল। চিড়িয়াখানায় একবার একটা দামী প্যান্থার মারা গেল। বাকল্যান্ড খবর পেলেন। কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালেন ওটাকে খুঁড়ে বের করে কয়েকটা টুকরো আমাকে পাঠিয়ে দিন। অত বড় একজন ন্যাচারালিস্টের অনুরোধ। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ না করতে পারলেন না। বাকল্যান্ড সেই টুকরো দিয়ে প্যানথার চপ তৈরি করে খেলেন। ডায়েরিতে মন্তব্য আছে, 'নট ভেরি গুড'। একবার চিড়িয়াখানার জিরাফ হাউসে আগুন লেগে গেল। বাকল্যান্ডের মহানন্দ! কিসের আনন্দ! কয়েক সপ্তাহ, যে সব জিরাফ তখনও স্তন্যপায়ী অবস্থায় পুড়ে রোস্ট হয়ে গেছে, সেই রোস্ট মনের আনন্দে খেতে পারবেন।

বাকল্যান্ডের রিজেনসি হাউস সেকালে এক মজার জায়গা ছিল। সুখী দম্পতির এই বাড়িটি ছিল এক মুক্ত চিড়িয়াখানা। ফায়ার প্লেসের পাশে পোষা বাঁদর লাফাচ্ছে। গোটা কতক মহাশয়তান বাঁদর। বাড়ির যথেষ্ট ক্ষতি করত। যাকে সামনে পেতে তাকেই কামড়াত। তবু তাদের কি আদর! বাকল্যান্ড রোজ রাতে তাদের বিয়ার খেতে দিতেন আর রবিবার তাদের জন্যে বাঁধা ছিল কয়েক ফোঁটা দামী পোর্ট। সারা বাড়িতে ছোটাছুটি করে বেড়াত পোষা একটা বেঁজি। টেবিলে, ড্রয়ারের ওপর, সর্বত্র খেলা করে বেড়াত পোষা ধেড়ে ইঁদুর। আর আধঘন্টা অন্তর অন্তর চিৎকার ছাড়ত একটা ধেড়ে গাধা। এই তাণ্ডবের মাঝখানে খুশ মেজাজে দাঁড়িয়ে আছেন বাকল্যান্ড। মুখে সিগার। গলগল ধোঁয়া। পরনে পুরনো ফ্ল্যানেলের জামা। ট্রাউজার কাঁধের ওপর থেকে বকলস দিয়ে টেনে বগলের তলা পর্যন্ত তোলা। মাথায় একটা বোলার হ্যাট। বুট অথবা অন্যধরনের জুতোর প্রতি অসীম ঘৃণা তাই ইংল্যাণ্ডের মতো শীতেও খালি পা।

বাকল্যান্ড তাঁর এই অদ্ভুত খাদ্য-রুচির উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন, পিতা উইলিয়াম বাকল্যান্ডের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন উয়েস্টমিনিস্টারের ডিন। আধুনিক ভূতত্ত্বের জনক। শোনা কথা উইলিয়াম বাকল্যান্ড না কি চতুর্দশ লুইয়ের সংরক্ষিত হৃৎপিণ্ডের একটা টুকরো রান্না করে খেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন, জীবনে যত খাদ্য খেয়েছি, তার মধ্যে ছুঁচোর চেয়ে অখাদ্য আর কিছু নেই। তারপর লিখছেন, ভেবে দেখলুম, ছুঁচোর চেয়ে অখাদ্য হলো, ডুমো ডুমো নীল মাছির স্টু। উইলিয়াম বাকল্যান্ড কেন্নোও খেয়ে দেখেছিলেন। কেন্নো সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ, খাওয়া যায় না। অসম্ভব তেতো।

ছেলে ফ্রাঙ্ক বাকল্যান্ডের আহার্য তালিকায় আরও অদ্ভুত অদ্ভুত সব পদ ছিল, যেমন কুমীর। অতিথিদের প্রায়ই যা দেওয়া হতো, পুরু করে মাখম মাখানো টোস্টের ওপর আস্ত একটা ইঁদুর। ফ্র্যাঙ্ক একবার বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ রিচার্ড ওয়েন ও তাঁর স্ত্রীকে উটপাখির রোস্ট করে দিয়েছিলেন।

সেই ফ্র্যাঙ্ক ওয়েনের রেসিপিই কি এই প্ল্যাটিপাস না একটোপ্লাজম, ব্লু বারনাকলস্‌ও বলা চলে। রবিনস সায়েব এক কাপ কফি খেয়ে দু হাতে ভুঁড়ি চেপে ভুঁড়ির চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে আছেন। আমি আবার সাহস দিলুম, 'সায়েব আপনি ভাববেন না, এই ডায়াটিং-এর কোনও প্রয়োজন নেই, আমি লন্ডন ছেড়ে যাবার আগেই আপনার ভুঁড়ি দু সুতো কমিয়ে দেবো। এমন সব আসন আছে আমাদের শাস্ত্রে, কিছু না পারি, কি ভাবে যা-তা খেয়ে ডিসপেপসিয়া ধরাতে হয় শিখিয়ে দেবো। এক মাসেই আপনি আমার মতো নেংটি ইঁদুর হয়ে যাবেন। সামান্য অ্যামিবায়োসিস কি জিয়ার্ডিয়াসিস ধরাতে পারছেন না!' রবিনস সায়েব বললেন, 'আমি তাহলে আর এক কাপ কফি খাই।'

রঞ্জিতবাবু প্ল্যাটিপাস শেষ করেছেন। নানা দেশ ঘোরা জিভ, আমাদের মতো অতটা বিব্রত হন নি। শেষ টুকরো মুখে ফেলে বললেন, 'হাইলি ইন্টারেস্টিং ক্রিয়েশান। ভেরি হোলসাম।'

আমি বললুম 'দেন হ্যাভ সাম মোর অফ ইট।'

ঘাড়, মাথা, হাত, এক সঙ্গে দুলিয়ে বললেন, 'নো মোর, নো মোর।'

আমাদের কফি এল। রবিনস সায়েবের ব্ল্যাক কফি এল। খাটো পোশাক পরা গ্রীক সুন্দরী যেন কবিতা। আমার দুঃখ একটু পরেই জীবন থেকে এই মুহূর্তটি চিরতরে হারিয়ে যাবে। স্মৃতির হাত-

বাক্‌সে জমা পড়ে যাবে। বহু পরে যখন ঝেড়েঝুড়ে বের করতে যাবো তখন দেখবো কায়াহীন অক্ষরের সমষ্টি। এসেন্‌স আছে, ম্যাটার নেই। প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তের এই মৃত্যু রোধ করার মেশিন আজও অনাবিষ্কৃত।

দশ পাউন্ডের মতো বিল হলো। ভাটিয়া সাহেব কিছুতেই আমাদের দিতে দিলেন না। নিজেই মিটিয়ে দিলেন হাসি মুখে। মেয়ে দুটি হেসে আমাদের বিদায় জানাল। প্রৌঢ় কাউন্টার সাজাতেই ব্যস্ত। কেক, প্যাস্ট্রি, পাই, বিস্কিটস, লোভনীয় সুগন্ধী খাদ্যের ছড়াছড়ি। কোথাও একটা মাছি নেই। মাছিরা মনে হয় জাতে নেটিভ।

আমবা আবার গাড়িতে উঠলুম। লন্ডনের মেয়েদের ভীষণ অহঙ্কাব। গাড়িতে ওঠার সময় হাই হিল খটখটিয়ে একজন চলে গেলেন। গাড়িতে আমরা সেই মেয়েটিকে ধরে ফেললুম। কোনও দিকে না তাকিয়ে কেমন গটমট করে চলেছেন। মুখে হাসি নেই, চলনে দ্বিধা নেই। আত্মবিশ্বাস উপচে পড়ছে। স্বামীজী পশ্চিমের মেয়েদের দেখে বলেছিলেন, এই গুলো স্বাধীন দেশের মাতৃমূর্তি।

সুখের সকাল শেষ হয়ে গেল। এইবার শুরু হবে অফিসিয়্যাল দ্বিপ্রহর। রঞ্জিতবাবুর হঠাৎ মনে হলো কি যেন একটা নেই। আমাকে বললেন, 'কি নেই বলুন তো?'

ভালো করে দেখে বললুম, 'আপনার কাঁধে ব্যাগটা নেই।'

'সর্বনাশ, ওর মধ্যেই যে আমার সব।'

এ তো আর কলকাতা নয় যে গাড়ি গোঁত করে যে কোনও জায়গা থেকে ঘুরে যাবে! ডাইনে বাঁয়ে ঘোরার চিহ্নিত জায়গা আছে। বেশ খানিকটা উজিয়ে গিয়ে গাড়ি বাঁয়ে বাঁক নিল। এই রাস্তায় অনেক ভালো ভালো দোকান পাট। দোকানেব উইন্ডো ডেকরেশান দেখাব মতো। দূর থেকে দেখলে ভুল হয়ে যায়, মনে হয় জীবন্ত মেমসায়েবরা নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক আগে আমাদের পার্ক স্ট্রিটের হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসানের দোকানে এই রকম ম্যানিকুইন ছিল। সে দোকান বহুকাল হলো উঠে গেছে।

অনেক ঘুরে ঘারে আবার আমরা সেই দোকানেব সামনে। প্রৌঢ় মালিক দেখেই চিনলেন। না চেনার কথাও নয়। আমরা একদল ভাবতীয়। বুকে আঁটা হলুদ বঙেব ব্যাজ। একটু আগে দোকান জমজমাট করে হ্যা হ্যা হাসি। ভদ্রলোক টি কে তি-এর মতো উচ্চারণে খুব বকাঝকা করলেন। ইবেসপনসিব্‌ল ব্ল্যাবার বললেন। তাবপর কাঁধ ব্যাগটি ফিবিয়ে দিলেন, 'চেক আপ। চেক দি কনতেন্তস।'

বাঙালীর যা হয়, বিনয়ে গলে যায়! আমি বললুম, 'না না, খুলে দেখার কি আছে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ।'

ব্যাগ হলো গিয়ে রঞ্জিতবাবুব আর বোলচাল মাবছে সঞ্জীববাবু। এও বাঙালীর আর এক স্বভাব। রঞ্জিতবাবু বললেন, 'ও কে, ও কে!'

বৃদ্ধ তো আর বাঙালী নন, রেগে গিয়ে বললেন, 'নো ও কে। ওপ্‌ন ইত, চেক ইত।' পিতার দু পাশে দুই কন্যা এসে দাঁড়িয়েছে। জামাই বাবাজীবন পেছনেব টেবিলে দাঁড়িয়ে কুঁচি কুঁচি করে নানা রকম ফল কাটছে। রঞ্জিতবাবু ব্যাগ খুলে ভেতবের জিনিসপত্তর মিলিয়ে নিলেন। এক পাতা ওষুধ বেরলো।

'কি মশাই! ওষুধ কি হবে?'

রঞ্জিত আমার প্রশ্নের উত্তব না দিয়ে বড় মেয়েকে বললেন, 'এক চুমুক জল, প্লিজ।'

ঢুক করে একটা বড়ি গিলে ফেললেন, তারপর আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, 'মশাই, সাবধানের মার নেই। এক বড়ি ইন্ট্রেস্টোপ্যান চালিয়ে দিলুম। সন্দেহজনক জিনিস পেটে পড়েছে। আপনিও একটা মেরে দিন।'

পাতা ফুটো করে আমিও একটা বড়ি বের করে গিলে ফেললুম।

কুমকুম বললে, 'তুমি তো দাদা দুপিস স্যান্ডউইচ খেয়েচো, তা হলে শুধু শুধু ওষুধ খাচ্চ কেন?'

আমি বললুম, 'একটু পরেই তো আরও বিজাতীয় খাদ্য ঢুকবে ধরে নাও, এটা হলো, ওয়ান ফর দি রোড।'

গম্ভীর মুখ বৃদ্ধ হোহো করে হেসে উঠলেন। কাউন্টারের ভেতর থেকে একমুঠো লজেন্‌স বের করে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। 'টেক ইট, টেক ইট। ওয়ান ফর দি হিউমার।'

১৬

মাথার ওপর নীল আকাশ। রোদ বেশ চড়েছে। ঠিক যেন মনে হচ্ছে শরতের কলকাতা। এ কলকাতা নয়, সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ, কি পঞ্চাশের পার্ক স্ট্রিট, লিন্ডসে স্ট্রিট, থিয়েটার রোড এলাকা। নিজের বরাতকে নিজেরই হিংসে করতে ইচ্ছে করছে। রঞ্জিতবাবুর এবার অনেক কাজ। আবার একবার ভিসনিউজ স্টুডিওতে যাবেন। এডিটিং আর স্যাটিলাইট ট্র্যানসমিসানের ব্যবস্থা পাকা করতে। তারপর যাবেন বিবিসিতে। অলইন্ডিয়া রেডিও স্যাটিলাইট ট্র্যানসমিসান কেন্দ্র দেখতে। রেডিও তাঁর বিষয় নয় তবু যাবেন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে।

কুমকুম বললে, 'আমাদের যে কোনও একটা জায়গায় নামিয়ে দাও। আমরা তারপর হেঁটে হেঁটে চারপাশ দেখতে দেখতে প্রেস সেন্টারে চলে যাবো।'

কুমকুমের এই সাহস আমার তেমন ভালো লাগল না। বুড়ো বয়সে হারিয়ে যেতে কার ভালো লাগে। মনের কথা মনেই রইল। একজন মহিলার কাছে সাহসে হেরে যেতে চাই না। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে আমাদের দু'জনকে পথের পাশে ফেলে দিয়ে গাড়ি চলে গেল। সামান্যতম দয়ামায়া নেই। একটা দুঃসাহসী, অবুঝ মেয়ে বললে আর অমনি নামিয়ে দিয়ে হুস করে চলে গেল।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমি কুমকুমকে বললুম, এইবার কি হবে?'

কুমকুম বললে, 'দাঁড়াও না দাদা, তুমি ঘাবড়ে যেও না। আমি তো আছি। এইবার আমরা কত কি করবো।'

'কি করবে?'

'আমরা যে কোনও একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবো। দোকান দেখবো। লোকজন দেখবো। বাসে চড়বো। যা খুশি তাই কিনে খাবো।'

'হারিয়ে গেলে।'

'সোজা পুলিসকে গিয়ে বলব, লুক হিয়ার মিস্টার, আমরা হারিয়ে গেছি। আমাদের খুঁজে বের করো। তুমি বলো দাদা, আবার কবে লন্ডনে আসা হবে, তুমিও জানো না, আমিও জানি না। অতএব আমরা যতটা পারি দেখে নোব। কেমন?'

'বেশ তবে তাই হোক।'

সামনের পথ দিয়ে ডবল ডেকার চলেছে। দোতলার জানালায় ফর্সা টুকটুকে ইংরেজ ছেলেমেয়েদের হাসি হাসি মুখ। রোদ ওঠার আনন্দে সব মাতোয়ারা। একটু আগে ভাটিয়া বলছিলেন, লন্ডন দেখার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো, ডবল ডেকারের দোতলায় উঠে, জানালার ধারে বসে পড়ো। ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের কথা মনে পড়ছে, When a man is tired of London, he is tired of life, for there is in London all that life can afford. ভাটিয়া বলছিলেন, এখানে সারা জীবন বাস করলেও সব দেখা শেষ হয় না। একটু এদিক সেদিক গেলেই কিছু না কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কার করা যায়। লন্ডনের এইটাই হলো মজা। ইন্টারন্যাল সিটি।

একটা ডবল ডেকার গেল, আর একটা এসে আমাদের সামনে, একটু দূরে দাঁড়াল। কুমকুম বললে, 'দাদা, ছোটো। উঠে পড়ো।' তার কথা শেষ হতে না হতেই, দেখি ফুটবোর্ডে উঠে পড়েছে। কলকাতার ছেলে, ধাবমান বাসে ওঠা আমার কাছে কিছুই না। রোজের ব্যায়াম। কলকাতার বাসে ফুটবোর্ডে শ'-খানেক মানুষ আঙুরের থোকার মতো ঝোলে। এ তো পরিষ্কার ফাঁকা ফুট বোর্ড। তড়াং করে উঠে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে ধমকের সুরে কে একজন বললে, 'গো ইনসাইড অ্যান্ড টেক ইওর সিট।' ওপরে ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মধ্যবয়স্ক ক্যারিবিয়ান কন্ডাকটার। সাদা ইউনিফর্ম। কাঁধে ব্যাগ। কালো চেহারা। বাঁ পাশে তিনজনের বসার আসনে দু'পাশে দু'জন, মাঝখানে আমি বসে পড়লুম। বাসের পরিচালক ভীষণ রাগী। বলা যায় না, এখুনি হয়তো মারধোর করবেন। আমার দু'পাশে দুই সায়েব। সায়েবরা দেখছি খবরের কাগজ ছাড়া থাকতে পারেন না। দুই সায়েব দুটো কাগজে মুখ জেবড়ে বসে আছেন। কে মাঝখানে বসল কোনও দৃকপাত নেই। কুমকুম তখনও রড ধরে দাঁড়িয়ে

আছে। কন্ডাকটার এগিয়ে এসে বললেন, 'ম্যাডাম, অনেক জায়গা খালি আছে, বসে পড়তে তোমার কি এমন অসুবিধে হচ্ছে। তুমি কেন আসা-যাওয়ার পথটা ব্লক করে দাঁড়িয়ে আছো।'

আমি বললুম, 'কুমু বসে পড়ো ভাই। বেশ কড়া মেজাজের মানুষ।'

আমার ডান পাশের সায়েব কাগজ থেকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ফ্রম ক্যালকাটা?'

'ইয়েস।'

'মাই গ্র্যান্ড ফাদার ওয়াজ উইথ দি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে। হাউ ইজ হাওড়া স্টেশান?'

'ফাইন, ফাইন।'

আমার বাঁ পাশেব ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। মনে হয় তাঁর নামার জায়গা এসে গেছে। ভদ্রলোকের খবরের কাগজটা পড়ে আছে। আমি গলা চড়িয়ে বললুম, 'ইওর নিউজপেপার।'

গেটের কাছ থেকে উত্তর দিলেন, 'দ্যাট ইজ ফর ইউ।'

কাগজটা তুলে নিতেই কুমকুম বসে পড়ল। আমার এক কপি 'দি গারডিয়ান' লাভ হলো। আমাদের দেশে এই পত্রিকাটির দাম পনের টাকা। হাওড়া স্টেশানের খবর জিজ্ঞেস করে আমার ডান পাশের ভদ্রলোক আবার কাগজে ডুবে গেলেন। কন্ডাকটার এলেন টিকিট চাইতে। আমি তাঁর হাতে একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট ধরিয়ে দিলুম।

কুমকুম বললে, 'তুমি কেন দিচ্ছ দাদা?'

'দাদা বলে।'

কন্ডাকটার নোটটা ঝোলায় ভরে প্রশ্ন করলেন, 'হোয়্যার টু?'

তা তো জানি না। 'কুমকুম হোয়্যার টু?'

কুমকুম বললে, 'সাম হোয়্যার।'

ভীষণ রাগী কন্ডাকটার। মুখটা যেন পাথর কোঁদা। ব্যাগ থেকে খুচরো বাব করতে করতে বললেন, 'দেন টু পিকাডিলি।' বাসে ওঠার সময় টুক করে এক নজবে দেখে নিয়েছিলুম বাসের সামনে মাথাব ওপর লেখা আছে, 'পিকাডিলি সার্কাস।' তাব মানে ওইটাই টার্মিনাস। কন্ডাকটার এক গাদা খুচরো ফেরত দিলেন। পাউন্ড, শিলিং, পেনসেব কিছুই বুঝি না। যা দিলেন চোখ কান বুজিয়ে ফেলে দিলুম আমার কাঁধ ব্যাগে। ছবির মতো মনোবম পথ ঘাট, দোকানপাট ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে পেছন দিকে। কোথায় চলেছি কে জানে! ভয়ে ভয়ে আছি। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ফিরে আসতে পাববো তো! এখানে আবার বর্ণবিদ্বেষেব হাঙ্গামা আছে। পাকি, পাকি বলে ধোলাই না দেয়! বুকে অবশ্য ব্যাজ ঝোলানো আছে।

পিকাডিলি সার্কাস এসে গেল। আমরা নেমে পড়লুম। নামার মুহূর্তে আমার পাশের সহযাত্রী প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের পাতাল রেল হচ্ছে, তাই না!'

'হ্যাঁ, বেশ কিছু অংশে চালুও হয়ে গেছে।'

'আমার বোন তোমাদের ওখানেই থাকে। সে লিখেছিল।'

মাঝখানে একটা স্কোয়ার। চারপাশ দিয়ে গোল হয়ে রাস্তা ঘুরে গেছে। স্কোয়ারের মাঝখানে ইরসের স্ট্যাচু। স্ট্যাচু নির্মাণে ইংরেজরা অসাধারণ। কলকাতায় কত ভালো ভালো মূর্তি ছিল। আমরা সব তুলে ফেলে দিয়েছি। স্বাধীন হবার পর আমাদের সব আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল ইংরেজ রাজ পুরুষদের মূর্তির ওপর। ইরস হলেন গ্রীকদের প্রেমের দেবতা। এদিকে রিজেন্ট স্ট্রিট ওদিকে শ্যাফটেসবেরি অ্যাভিনিউ। রিজেন্ট স্ট্রিট নামটা পড়েই রিজেন্ট সিগারেটের কথা মনে পড়ে গেল। কুমকুম আর আমি দু'জনেই কেমন যেন বোকাবোকা হয়ে গেছি। চারপাশে এত ফর্সাফর্সা ছেলে মেয়ে। মনে হচ্ছে যেন স্বর্গে আছি। ইরসের মূর্তির তলায় একদল ট্যুরিস্ট। ম্যাপ বিছিয়ে লন্ডনকে চেনার চেষ্টা করছেন। পথের একপাশে সাদা রঙের একটা ওয়াগান দাঁড়িয়ে। কোকাকোলার কৌটো বিক্রি হচ্ছে। আমরা দু'জনে দুটো কিনে ফেললুম। কতকাল কোক খাওয়া হয় নি। কৌটো হাতে আমরা হাঁটছি। হেঁটেই চলেছি। চলতে চলতে চেষ্টা করছি কৌটোটা খোলার। ঢাকনার একটা জায়গায় রিং লাগানো। রিংটা ধরে প্যাঁচ মারলেই একটা ফালি ছিঁড়ে আসবে। জানি, কিন্তু কায়দা করতে পারছি না। হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে গেল। ফ্যাঁস করে খানিকটা কোকোকোলা ফোয়ারার মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল, আর গেল

তো গেল, পাশ দিয়ে এক মেমসায়েব যাচ্ছিলেন, তাঁর গায়ে। প্রথমে ভাবলুম, হোলি হায় বলে চিৎকার করি। সাহস হলো না। সাতটা সায়েব তেড়ে এসে জিওগ্রাফি চেঞ্জ করে দেবে। মহিলা কটমট করে তাকাচ্ছেন। আমি এক-এককে-এক, দু-এককে-দুইয়ের মতো এক ঝাঁক 'সরি' ছুঁড়ে দিলুম। আমাকে বাঁচাবার জন্যে কুমকুমও যোগ দিল। 'সরি'-র কোরাস। ভদ্রমহিলা কি আর বলবেন! সে স্যুটের বুকে কোকোকোলার ফেনা কেলেংকারির মতো জড়িয়ে আছে। বাঙালী হলে বলতেন, 'উজবুক কাঁহাকা।' হেজেল-চক্ষু সুন্দরী খ্যাটখ্যাট্ করে তাঁর পথে চলে গেলেন। কুমকুম বললে, 'তুমি যে দাদা কি করো না! খুলতে পারছ না, তা আমাকে বলবে তো! খুলেছো?'

'খুলেছি ভাই।'

এতকাল বোতলে স্ট্র পুরে সফ্‌ট ড্রিংকস খেয়েছি। কৌটো থেকে খাবার কায়দা শিখিনি। মুখে যেই ঢালতে গেলুম, চোখের জলে নয় কৌটোর কোকে বুক ভেসে গেল। কুমকুম বললে, 'সিম্পলি হরিব্‌ল। তুমি দাদা উডি অ্যালেনকেও হার মানালে।'

'কুমকুম একটা জিনিস দেখলে, কত কাল আগে সেই ইংরেজ লেখক আলেকজান্ডার পোপ লিখেছিলেন, তোমার মনে আছে! গুড নেচার অ্যান্ড গুড সেন্স মাস্ট এভার জয়েন। টু আর ইজ হিউম্যান, টু ফরগিভ, ডিভাইন। এঁরা অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ কি রকম মেনে চলেন দেখলে!'

'তোমাকে দেখে ভদ্রমহিলার মায়া হলো তাই। তা না হলে তোমার কি অবস্থা হতো দেখতে। সে রকম কিছু হলে আমি দৌড় লাগাতুম।'

'বাঃ, বেশ মেয়ে তো তুমি! আমাকে বিপদে ফেলে পালাতে।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে গ্রীন পার্কে চলে এলুম। এইবার একটু বসা যাক। নানা রকম কুকুর নিয়ে সায়েব মেমরা রোদ খেতে বেরিয়ে পড়েছেন। আমার কোক তখনও শেষ হয়নি। বেশ চনচনে ক্ষিধে হয়েছে। চারপাশ সবুজ। এক পাশে বসে বসে ভাবছি, আমাকে কেউ যদি এই দেশের ইতিহাসটা একটু বলে দিতেন। কোথা থেকে রোমানরা এলেন। আমরা যাঁদের সায়েব বলি তাঁরা কে! কি তাঁদের পরিচয়!

খ্রীস্টপূর্ব দু লক্ষ বছর আগে প্রস্তর যুগের শিকারীরা বৃটেনে বেওয়ারিশ ঘুরে বেড়াত। তখন পৃথিবীর চেহারা ছিল অন্যরকম। বৃটেন তখন বিশাল এক মহাদেশের অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল। খ্রীস্টপূর্ব ৬ হাজার থেকে ৫ হাজার সময় কালের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল গ্রেটবৃটেনকে ইওরোপীয় ভূখন্ড থেকে ছিঁড়ে বের করে দিল। গ্রেটবৃটেন হয়ে গেল একটি দ্বীপ। খ্রীস্টপূর্ব চার হাজারে নতুন প্রস্তর যুগের ইওরোপীয়রা বৃটেনে চাষবাস শুরু করে দিল। দু'হাজারে রাইন উপত্যকা থেকে এল ব্রোঞ্জযুগ। এই ব্রোঞ্জ যুগের বিস্ময়কর স্মৃতি পড়ে আছে উইল্টশায়ারে। বৃত্তাকারে সাজানো পবিত্র পাথরের স্তূপ—'স্টোনহেঞ্জ'। যা নিয়ে গবেষণার শেষ নেই এখনও। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের ধারণা, 'স্টোনহেঞ্জ' হলো 'স্টোন এজ কম্পিউটার'। কারুর মতো স্টোনহেঞ্জ হলো 'লাইফ ফোর্স'। জীবনী-শক্তি। দিকচক্রবালের বিশেষ একটি বিন্দুর সঙ্গে এই বৃত্তের যোগ আছে। প্রাচীন কালের ঐশী শক্তি-সম্পন্ন মানবেরা সেই বিন্দুটির সঙ্গে জীবনের যোগ সাধন করতে পেরেছিলেন। ওই বিন্দুটি থেকে নেমে আসত অসীম শক্তি। এই রেখাটি হলো 'লে লাইনস' বা 'লাইনস অফ ফোর্স'। আধুনিক মানুষ সভ্যতার চাপে যে শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, প্রাচীন মানবের সেই শক্তি ছিল। তাঁরা জানতেন প্রকৃতির স্পন্দনের সঙ্গে জীবন মেলাবার কৌশল। জানতেন শক্তির ভান্ডার থেকে শক্তি আহরণের কৌশল। এই মতের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা বিশ্বাস করেন এই সব রহস্যময় প্রস্তর গঠনে এখনও সেই শক্তি অবতরণ করে। তাঁরা আলোকচিত্র সংগ্রহ করে দেখেছেন পাথর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অলৌকিক রশ্মি। পাথর স্পর্শ করে অনেকে তড়িতাহত হয়েছেন।

এই সব চিন্তা করতে করতে চারপাশে যতবার তাকাচ্ছি ততবার মনে হচ্ছে, আমি যেন এই শতকের মানুষের দলে নেই। কুমকুম আমার পাশে বসে আছে তবু যেন কত দূরে। সায়েবরা রোদ পোহাচ্ছে, বল মুখে কুকুর ছুটছে, সবই যেন দেখছি দূর কোনও শতাব্দীর জানালায় বসে। এক সময় এই পার্ক ছিল না। ঘোড়ায় চেপে ছুটে যেতেন বীর নাইট ল্যান্‌সেলট। লেডি অফ দি শ্যালটের কাছে। কিং আর্থার কোথায় ছিলেন! শেকসপীয়ার হেঁটে যেতেন ড্রুরি লেনের কোনও থিয়েটারে, যেখানে

ম্যাকবেথ মঞ্চস্থ হচ্ছে। চার্লস ল্যাম কোন পথ দিয়ে ইন্ডিয়া হাউসে যেতেন! শেলি ঠিক কোন জায়গায় আত্মহত্যা করেন। ডিকেনস কোন ডকের কোন ওয়্যার হাউসে চাকরি করতেন! পায়ের ওপর দিয়ে ছুটে যেত ইঁদুর।

আমার কোক শেষ। অপূর্ব সুন্দর সাদা কৌটোটা ফেলতে ইচ্ছে করছে না। যেখানে সেখানে ফেলাও যাবে না। পুলিসে কান মলে দেবে। কুমকুমও আমার মতই চুপচাপ বসে আছে। মাথার ওপর অচেনা আকাশ। সামনে অচেনা দৃশ্য। হীনমন্যতায় ভুগছি না। স্বীকার করতেই হবে, বসে আছি বীরের দেশে। ছোট্ট একটা দ্বীপ। সামান্য তার আয়তন, ২৪৪১০০ বর্গ কিলোমিটার। ইতালির চেয়ে ছোট। পশ্চিম জার্মানির চেয়ে ছোট। আধখানা ফ্রান্সের চেয়ে ছোট। অথচ এক সময় অমিত বিক্রমে সাম্রাজ্য বাড়াতে বাড়াতে এত বড় হয়েছিল যে সূর্য অস্ত যেত না। তখন কোনও ইংরেজ এই ভাবে বলতে পারতেন,

> What shall we tell you?
> Tales, marvellous tales,
> of ships and stars and isles
> where good man rest
> where nevermore
> the rose of Sunset pales
> And winds and shadows
> fall toward the west

আবার ইতিহাস ভেসে আসছে। খ্রীস্টপূর্ব সাতশো থেকে একশো, এই সময়কালে মধ্য ইওরোপের কেল্ট উপজাতির সাহসী যোদ্ধারা এই দেশ দখল করে লৌহ যুগের সূচনা করল। তারপর এলেন জুলিয়াস সিজার। খ্রীস্টপূর্ব ৫৫ থেকে ৫৪-র মধ্যে দুবার আক্রমণ করলেন। এই দ্বীপের তিনিই নাম রাখলেন ব্রিটানিয়া। শেকসপীয়ার সিজারকে ভীষণ ভালবাসতেন। দুজনেই গ্রেট। একজন বীর যোদ্ধা, শাসক। অন্যজন মহাকবি। সিজারও লেখক ছিলেন। ছিলেন সুবক্তা। তাঁর যৌবনের রচনা অগাস্টাস প্রকাশ করতে দেননি। চেপে রেখেছিলেন প্রকাশের অযোগ্য বলে। আমরা তাঁর 'সিভিল ওয়ার' পড়েছি। তাঁর হারিয়ে যাওয়া লেখার তালিকায় আছে, অ্যান্টিকাটো, জ্যোতির্বিদ্যার ওপর একটি লেখা, সম্ভবত ক্যালেন্ডার সংস্কার। তাঁর লেখা একটি কবিতার কথাও আমরা শুনেছি, দি জার্নি। রোম থেকে পশ্চিম স্পেনে যাবার পথে লেখা। সেই কবিতার ছটি লাইন মাত্র পাওয়া যায়। শেকসপীয়ার তাঁর সিজারের মুখে বসিয়েছিলেন সেই অনবদ্য উক্তি, এই পার্কে বসে যা আমার মনে পড়ছে, সেই কত কাল আগে পড়া :

> Cowards die many times
> before their deaths
> The valiant never taste of
> death but once
> of all the wonders
> that I yet have heard
> It seems to me most strange
> that men should fear
> seeing that death, a necessary and
> will come when it will come.

শেকসপীয়ার মনে হয় মহাভারত পড়েছিলেন, তা না হলে বক রূপী ধর্মকে যুধিষ্ঠির যে কথা বলেছিলেন, তার প্রতিধ্বনি হয় কি করে! প্রতি মুহূর্তে মানুষ মরছে তবু মানুষ মরণকে ভয় পায়, এইটাই তো সবচেয়ে বড় আশ্চর্য।

কুমকুম কোকাকোলার টিনটা হাতে নিয়ে বললে, 'চলো দাদা, এবার আমরা বাড়ি যাই।'

'চলো বোন। এতক্ষণে রাজীব মনে হয় চার্চিল হোটেল থেকে মার্লবরো হাউসে চলে এসেছেন।

রুদ্ধদ্বার সভা শুরু হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে খ্যাচাঙের সঙ্গে লড়াই।'

'মার্লবরো হাউসে কি আছে?'

'ওইখানেই তো কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট।'

আমাদের সামনে দিয়ে একটা প্যারামবুলেটার চলে গেল। লাল টাটকা একটি শিশু শুয়ে আছে। রোববারের লন্ডন কেমন জমে উঠেছে। আমার ইতিহাসও বেশ জমছিল। সূত্র ছিঁড়ে গেল। রোমানদের আমি খুঁজে পেয়েছি। সিজারের পরেই রোমান বাহিনী ঝটিকার বেগে ইংল্যান্ড আর ওয়েলশের নিম্নাঞ্চল দখল করে নিল। স্কটল্যান্ডও দখল করেছিল; কিন্তু অধিকারে রাখতে পারেনি। চারশো বছর ইংল্যান্ড ছিল রোমানদের দখলে। পঞ্চম শতক থেকে শুরু হলো রোমান সাম্রাজ্যের শৌর্য আর বীর্যের পতনের কাল। রেমান বাহিনী বৃটেন থেকে চলে গেল পাততাড়ি গুটিয়ে। তখন কি হলো! ভূমি আর রমণী হলো দখলদারির জিনিস। উত্তর ইওরোপ থেকে ছুটে এল বর্মধারী, সশস্ত্র স্যাকসন যোদ্ধার দল। ইংল্যান্ডের মাটি চলে গেল স্যাকসনদের দখলে। ইতিহাস কি মজার জিনিস! গাড়ি ছুটছে, কুকুর ছুটছে, মাণ্টার কমলালেবু খাচ্ছে সুন্দরী পিকু, বর্তমান বর্তমানে টগবগ করছে। ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে আছে, মূর্তিতে, প্রাসাদে, জরদ্গব দুর্গে, কবরখানায়, চার্চের চূড়ায়। রোমের তরবারি খাপে ঢুকে গেল, বেরিয়ে এল বাইবেল। শুরু হলো খ্রীস্ট ধর্মের বিজয় অভিযান। রিলিজান ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড। ৫৬৩ অব্দে আইরিশ ধর্মপ্রচারক সেন্ট কলাম্বা স্কটল্যান্ডের পশ্চিম প্রান্তে একটি মঠ স্থাপন করলেন। ৫৯৭ অব্দে রোম থেকে এলেন সেন্ট অগাস্টিন। কেন্টে স্যাকসনদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। শুরু হলো চার্চ দখলে ধর্মের লড়াই। আইরিশ আর রোমানদের সঙ্ঘর্ষ। ৫৬৪ অব্দে হুইটবিতে বসল মীমাংসা সভা। সভায় স্থির হলো রোমক চার্চের আধিপত্য।

পার্কের বাইরে এসে কুমকুমকে বললুম, 'রাজা ক্যানিউটকে তোমার মনে পড়ে। ড্যানিশ কিং, ভাইকিং ক্যানিউট।'

'সেই রাজা, যিনি সমুদ্রের ঢেউকে বলেছিলেন, দিস ফার অ্যান্ড নো ফারদার।'

'ইয়েস। হাজার ষোল শতকে সেই রাজা ছিলেন ইংল্যান্ড আর স্কটল্যান্ডের দোর্দণ্ড অধিপতি।'

ইরসের মূর্তি সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। আমরা দু'জন হাঁ করে সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

১৭

এরসের কথা মনে পড়ছে। সেই কবে পড়েছিলুম। ত্রৈলোক্য বাবুর কল্পনার সঙ্গে যৎসামান্য মিল আছে। ব্রহ্মাণ্ড নামক একটি অণ্ডের ধারণা তাঁর লেখাতেও আছে। সেই জগৎ রূপ ডিম্বে তা দেবার ফলেই গ্রীক দেবতা এরসের জন্ম। তিনিই হলেন প্রথম দেবতা। কারণ এরস ছাড়া অন্য দেবতার জন্ম সম্ভব হতো না। এক মত হলো এই। ভিন্ন মতও আছে। ভিন্ন মত হলো, অ্যাফ্রোডাইট আর হারমেসের মিলনে এরসের জন্ম। এরসকে খুব সভ্য ভব্য বলা চলে না। দুর্দান্ত বালক। বয়েসের প্রতি তাঁর কোনও সম্মান ছিল না। এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকার মতো বালকও তিনি ছিলেন না। সোনার ডানা মেলে যত্রতত্র উড়ে বেড়ানোই ছিল তাঁর স্বভাব। উড়তে উড়তে কাঁটা খোঁচা তীর ছুঁড়তেন এলোপাথাড়ি। আর তাঁর হাতে থাকত মারাত্মক মশাল। সেই মশাল দিয়ে যার তার হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দিতেন।

চিন্তায় বাধা পড়ল। কুমকুম বললে, 'দাদা, মনে হচ্ছে আমরা হারিয়ে গেছি।'

হারিয়ে গেছি শুনে আমার তেমন ভয় হলো না; কারণ এই শহরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজেকে কুমকুমের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছি। আমি বললুম, 'তুমি হারিয়েছ, তুমিই খুঁজে বের করবে। তোমার দায়িত্ব। আমি তোমাকে ধরে আছি।' সাহসী মেয়ে। তরতর করে এগিয়ে গেল এক সায়েবের কাছে। সায়েব দাঁড়িয়েছিলেন সুসজ্জিত এক দোকানের জানালার সামনে। টুপি দেখছিলেন।

কুমকুম বললে, 'এক্সকিউজ মি।'

সায়েব এক্সকিউজ করে তাকালেন। তাকিয়ে তাঁর লাভই হলো। সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন। টুপির চেয়ে ঢের ভাল।

কুমকুম বললে, 'লিট্‌ল সেন্ট জেমস স্ট্রিটটা কোন দিকে হবে?'

সায়েবের মুখ দেখে মনে হলো বেশ বিব্রত। এমনি সেন্ট জেমস স্ট্রিটে হয় না, লিটল সেন্ট জেমস। সায়েব হেরে যাবার পাত্র নন। বিশেষত একটি মেয়ের কাছে। আমি হলে আমিও হারতুম না। সায়েব হিপপকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে, ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন, 'জাস্ট এ মিনিট।' একটা লেটার বক্সের মাথার ওপর ম্যাপটা বিছিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'নাও উই আর হিয়ার। দিস ইস রিজেন্ট স্ট্রিট। তুমি চাইছ, লিট্‌ল সেন্ট জেমস স্ট্রিট। লিটল সেন্ট জেমস লিটল সেন্ট জেমস···।' সায়েবের আঙুল ম্যাপের ওপর টিকটিকির মতো ঘুরছে। একপাশ থেকে আমি আর এক পাশ থেকে কুমু ঝুঁকে পড়েছে।

আগে শুনেছিলুম চাইনিজ পাজলের মতো বড় ধাঁধা আর হয় না। কে বলেছে! ম্যাপের চেয়ে বড় ধাঁধা আর নেই। ম্যাপটা হলো লন্ডনের ম্যাপ। নানা রঙের পথঘাট, এদিক থেকে ওদিক থেকে বেঁকেচুরে পরস্পর জড়াজড়ি করে যে মানচিত্র রচনা করেছে তার মান ভাঙানো আর রমণীর মান ভাঙানো একই ব্যাপার।

সায়েব কেবলই বলছেন, 'উই আর হিয়ার।' আরে বাবা, আমরা কোথায় তা ম্যাপে দেখতে হবে কেন, চোখ ঘোরালেই তো দেখতে পাচ্ছি। হোয়্যার ইজ লিটল সেন্ট জেমস। সাহেব শেষে বললেন, 'ওরকম কোনও রাস্তা এদেশে নেই।' যাক আপদ চুকে গেল। সায়েব ম্যাপ মুড়ে আবার টুপিতে মন দিলেন। আমাদের এক জোড়া পা আছে। পায়ের ধর্ম পা করবেই। গুটি গুটি সামনে এগোতে লাগল। মানুষের ধর্ম হলো সামনে এগনো। কখনও পেছতে চায় না। ফিরতে চায় না। কুমকুম বললে, 'তুমি ঘাবড়ে যেও না দাদা। জানো তো পৃথিবী গোল।'

'তাহলে যেখান থেকে শুরু করেছি, সেইখানেই আবার ফিরে আসতে হবে।'

আমার কথা শুনে কুমকুম বেশ ভেবে পড়ল এইবার। কথা বলতে বলতে আমরা কিন্তু হেঁটেই চলেছি। দোকানের পর দোকান। লন্ডন যেন বিশাল এক দোকান। দোকানেরও কি বাহার! লাখ লাখ টাকার মালে ঠাসা। ইংরেজরা শহরটাকে বেড়ে বানিয়েছে। প্রকৃতি প্রেম মনে হয় সহজাত। তা না হলে, এতদিনে বিশাল বিশাল মাথা উঁচু বাড়ি তুলে আকাশের ফাঁক ফোকর সব বন্ধ করা হতো। আইন করে সে পথ বন্ধ করা হয়েছে। নম্র, ভদ্র, বিনীত অট্টালিকার সারি, মাথার ওপর উদার আকাশ। নয়ন-ভ্রমর কংক্রিটে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়ে না পথে। শহরের মাঝখানে কিছু কিছু ঢ্যাঙা বাড়ি মাথা তুললেও, ইটকাঠ পাথরের জঙ্গল তৈরি হয়নি। ফলে শহরটি বেশ মোলায়েম আছে। লোকসংখ্যা বেড়েছে সঙ্গে সঙ্গে শহরও হাত পা ছড়িয়েছে। তৈরি হয়েছে মফঃস্বল এলাকা। শান্ত, সবুজ শহরতলি থেকে তিরিশ চল্লিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে মানুষ ছুটে আসে শহরে জীবিকার সন্ধানে।

উত্তরে অক্ষাংশে বৃটেনের আবহাওয়া যতটা প্রতিকূল হবার কথা ততটা হয়নি তার কারণ উপসাগরীয় উষ্ণ স্রোতধারা তটভাগ স্পর্শ করে বহে চলেছে। ভূ-ভাগের উথালপাথালে সমতা এনেছে দশ হাজার বছর আগের বরফ স্তূপ। বরফের চাপে পাহাড়-পর্বত তেমন মাথা তোলার অবকাশ পায়নি। কুয়াশাচ্ছন্ন স্কটল্যান্ডের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বেন নেভিস মাত্র ১৩শো মিটার দীর্ঘ। আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতির মধ্যে তেমন অসাধারণত্ব না থাকলেও ইংরেজ জাতি হিসেবে অসাধারণ। এক কি দু'পুরুষ আগেও তাঁদের মহিমার তেমন কোনও তুলনা ছিল না। ১৯৩৩ সাল নাগাদ ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তার তুঙ্গে উঠেছিল। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ ছিল তাঁদের প্রজা। সম্পদে, শক্তিতে, প্রভাবে ইংরেজ ছিল শীর্ষস্থানে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের ৫০ বছর আগেই এদেশে ঘটে গিয়েছিল শিল্প-বিপ্লব। ফলে ১৯৫০ সালে পৃথিবীর ধনী দেশের পুরো ভাগে ছিল বৃটেন। ইওরোপের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যবসায়িক জাতি। সেই শীর্ষ থেকে ধীরে ধীরে পতন হলো। কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, সব দিক থেকেই নিবে এল তার ছটা। সাম্রাজ্য খসে পড়ল। ভারত-সম্রাজ্ঞী রানী ভিকটোরিয়ার নাতনীর নাতনী রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এখন ক্ষমতাহীন, দুর্বল এক কমানওয়েলথের নেত্রী মাত্র। বৃটিশ সিংহ এখন জরদ্গব, নখ দন্ত-হীন। কোনও তর্জনগর্জন নেই আর। তবু ইংরেজরা তিরিশ বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে

দ্বিগুণ ধনী হতে পেরেছে। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও পাল্লা দিয়ে বড়লোক হয়েছে। ধনী দেশের তালিকায় বৃটেনের স্থান দশ থেকে পনেরর মধ্যে ওঠানামা করে।

যতই ভাগ্য বিপর্যয় হোক এদেশের মানুষের মনোবল আর সাহস অটুট আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে দৃপ্ত ও দেশভক্ত জাতি। সম্প্রতি একটি সমীক্ষা হয়েছিল, তাতে দেখা গেল আমেরিকা, জাপান আর ইউরোপের তুলনায় ৫৫ শতাংশ বৃটেন নিজের দেশ সম্পর্কে এখনও ভীষণ অহঙ্কারী। দেশাত্মবোধে একমাত্র আমেরিকান আর আইরিশরাই তাদের অতিক্রম করে যেতে পেরেছে। কোন দেশের মানুষ কতটা সন্তুষ্ট। তাতে দেখা গেল, ছত্রিশ শতাংশ ব্রিটেন তাদের বর্তমান জীবনে ভীষণ সন্তুষ্ট। ফরাসী দেশে মাত্র ষোল শতাংশ মানুষের এখন সন্তুষ্টি আছে। জার্মানদের মধ্যে বিশ শতাংশ মানুষ বলেছেন, আমরা সন্তুষ্ট। আত্মহত্যা আর অপরাধের হার নিয়ে দেশে দেশে আর একটি সমীক্ষা হয়েছিল, তাতে দেখা যাচ্ছে বৃটিশরা অনেক সুখে আছে।

এই কয়েকটি ক্ষেত্রে ইংরেজরা অতুলনীয় হলেও, অন্যান্য বহুক্ষেত্রে তাদের অতীত গর্ব আর নেই। দেশের প্রকৃতির সমতা একালের ইংরেজরা তাদের চরিত্র ধারণ করেছে। জীবনাচরণে কোথাও তেমন কোনও বাড়াবাড়ি নেই। এই যে আমাদের চারপাশ দিয়ে এত মানুষ হেঁটে চলেছে, কারুর মুখে কোনও কথা নেই, কোনো মারামারি নেই। দু কদম যেতে না যেতেই সামনে, পাশে, পেছনে মুখ ঘুরিয়ে পিচিক পিচিক থুতু ছিটনো নেই। সাইলেনসার ফাটা লরি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দৈত্যের মতো ছুটছে না। মিনিবাস 'এবার আমি তোমায় খাবো' বলে, গেল গেল শব্দে ছুটছে না। প্রাইভেট বাসের হেলপার বন্ড স্ট্রিট, বেকার স্ট্রিট, পলমল, পিকাডিলি বলে দরজায় লাট খেতে খেতে কানের পোকা বের করছে না। তিন চাকার টেম্পো সখি ধরো ধরো, মালা পরো পরো করে ঘাড়ে এসে পড়ছে না। সর্বত্র একটা মসৃণ জীবনছন্দ। তবু বৈচিত্র্যের শেষ নেই। মাঝারি মাপের এতটুকু একটা দেশ। যার বেশির ভাগই শহর। চতুর্দিকে কলকারখানা। এরই মধ্যে এক একদিক, এক এক রকম। জীবন যাত্রার ধরনেরও কত রকমারি।

এই ছোট্ট দেশেই কত রকমের ভূ-প্রকৃতি। বিশাল দেশ হলে কথা ছিল না, যেমন ভারত, আফ্রিকা, কি আমেরিকা। অন্যান্য দেশে হয়তো সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গ আছে, চওড়া আঁকাবাঁকা বিশাল নদী আছে, যেমন গঙ্গা, ভোলগা, আমাজোন, মিসিসিপি, হয়তো দর্শনীয় সমুদ্র সৈকত আছে; কিন্তু কোন দেশে এই এত স্বল্পপরিসরে এমন বৈচিত্র্য ঠাসা আছে। পর্বতের পাশেই জলাভূমি, জনপদের ধারেই অরণ্যভূমি, নদীর পাশেই সমুদ্র সৈকত। এক দিনেই সব কিছু দেখে নেওয়া যায়।

বহু সমালোচিত আবহাওয়া ভূ-প্রকৃতির মতোই যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারে। আবহাওয়াবিদরা এ দেশের আবহাওয়াকে বলেন, 'কুল টেম্পারেট'। তার মানে খুব বেশি শীত পড়ে না, খুব একটা গরমও মাঠ-ঘাট পুড়িয়ে দেয় না। বৃষ্টিতে বন্যা নামে না, অনাবৃষ্টিতে ক্ষরা আসে না। আবহাওয়ার এমন সমতা পৃথিবীর আর কোথাও তেমন দেখা যায় না। জুলাই মাসে লন্ডনের গড় তাপমাত্রা ১৩° সেন্টিগ্রেডের কাছে ঘোরাফেরা করে। জানুয়ারি মাসে পারা অবশ্য নেমে যায়, তবে অসহনীয় নয়। লন্ডনে বছরে বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ৬১২ মিলিমিটার। নিউইয়র্কের চেয়ে কম, স্যানফ্রানসিসকোর চেয়ে সামান্য বেশি। রোমের সমান। আর একটা কি, এই বৃষ্টি সারা বছরই সমান ভাবে পড়ে। তবু ইংল্যান্ডের আবহাওয়াকে বলা হয় 'ওয়ার্স্ট।' বলা হয় আবহাওয়ার যুদ্ধক্ষেত্র। বায়ুর চাপ অনবরত কমছে বাড়ছে। বায়ুমন্ডলে লন্ডভন্ড একটা বকান্ড সব সময় চলেছে। যার ফলে বলা শক্ত দিনের কোন সময় কেমন যাবে। এই রোদ এই ঝড়বৃষ্টি চার্চিল সায়েবের ঠোঁটে তাই সব সময় থাকত চুরুট আর কোলে থাকত ছাতা।

কুমকুম এত জোরে হাঁটছে যে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমাকে প্রায় ছুটতে হচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'তুমি এত জোরে হাঁটছ কেন?'

'আমি রেগে গেছি।'

'হারিয়ে গেলে কি রেগে যেতে আছে ভাই, তাতে আরও হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। হারানোর ওপর রাগতে নেই।'

'হারানোর ওপর রাগি নি। রেগে গেছি সায়েবদের ওপর; কি আশ্চর্য নিজেদের দেশের রাস্তাঘাট

নিজেরাই চেনে না! আধ ঘণ্টা ধরে ম্যাপট্যাপ দেখে বললে, ও নামের কোনও রাস্তা এ দেশে নেই।'

'আহা রাগ করছ কেন। সায়েবরা একটু নন ইন্টারফিয়ারিং টাইপ। অন্যের ব্যাপারে তেমন নাক গলাতে চায় না।'

'তুমি আর বোলো না দাদা, এটা অন্যের ব্যাপার হলো কি করে! লিট্‌ল সেন্ট জেমস স্ট্রিটটা নিজের দেশের ব্যাপার নয়!

'আমার মনে হয় ওই ভদ্রলোক একজন ট্যুরিস্ট।'

পথের পাশে নতুন একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সায়েবদের সায়েবি ব্যাপারের ধরন ধারণই আলাদা। প্ল্যাস্টিকের ঘেরাটোপের ভেতর কাজ হচ্ছে, যাতে পথের মানুষের কোনও অসুবিধে না হয়। এই বাড়িটা বেশ উঁচুই হবে। দোতলায় অনেক খোপ তৈরি হয়েছে! সেই খোপে বসে ইঞ্জিনিয়াররা কাজের তদারকি করছেন। একেবারে মাথার ওপর দুটো ক্রেন হাত তুলে আছে। আমাদের দেশের বাড়ি তৈরির সঙ্গে কোনও মিল নেই। মশলার কড়া মাথায় যোগাড়েরা ভারা বেয়ে উঠছে না। সামনের রাস্তা জুড়ে স্টোন চিপস পড়ে নেই, বালির ডাঁই নেই।

আজ থেকে চারশো বছর আগে, এই শহরে ইট কংক্রিটের বাড়ি ছিল না বললেই হয়। সব কাঠের বাড়ি। ঘুপচি ঘাপচি। সরু সরু রাস্তা। বস্তিরও অভাব ছিল না। যত না মানুষ তার চেয়ে বেশি ইঁদুর। মরা ইঁদুরের পচা দুর্গন্ধ। লেগে গেল প্লেগ। শুরু হলো মড়ক। ১৬৬৫ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ অবস্থা চরমে উঠল। প্লেগে সাপ্তাহিক মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় সাত হাজার। 'গ্রেট প্লেগ অফ লন্ডন'-এর পর ঈশ্বরের করুণার মতো এক রাতে ঘটে গেল 'গ্রেট ফায়ার অফ লন্ডন।' ১৬৬৬ সাল। সব বাড়ি-ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এই আগুন ইংরেজদের চোখ খুলে দিল। এগিয়ে এলেন ইঞ্জিনিয়ার স্যার হ্যাগ মিডলটন। তাঁর দূরদৃষ্টিকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। নতুন শহরের পত্তন করলেন তিনি। কাঠের বদলে এল ইট। টাউন প্ল্যানিং বলতে যা বোঝায় তাই হলো। সপ্তদশ শতকে বিখ্যাত স্থপতি স্যার ক্রিস্টোফার রেন লন্ডনকে আরও ভালো করে সাজালেন। সবই হলো, পড়ে রইল রোমান আমলের স্মৃতি, লন্ডনের আঁকাবাঁকা, নাতিপ্রশস্ত পথঘাট। রোমান আমলের ভগ্নস্তূপ এখনও আছে। তার পাশ দিয়ে উঠে গেছে বড় বড় অফিস বাড়ি। রোমানদের তৈরি নগর প্রাকার এখনও আছে। রেমানরা যখন লন্ডন শহরের পত্তন করলেন, তখন প্রথম হাজার বছর এই শহরের আয়তন ছিল মাত্র তিন স্কোয়ার কিলোমিটার। টেমস আর দুর্ভেদ্য প্রাচীর ঘেরা এই ক্ষুদ্র ভূভাগ দেখতে দেখতে হয়ে দাঁড়াল বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রাণচঞ্চল বন্দর।

কুমকুমের হাঁটার গতি কমে এসেছে। তার মানে রাগ কমে এসেছে। কিন্তু আমরা আপাতত আছি কোথায়! আমার এখন সেই ঘটনাটি মনে পড়ছে। বিখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর বেজ শান্তিনিকেতন থেকে দিল্লি যাচ্ছেন। কি ভাবে ভুল করে দিল্লির আগেই কোনও এক স্টেশানে নেমে পড়লেন। নেমে পড়ে হারিয়ে গেলেন। শান্তিনিকেতনে টেলিগ্রাম এল, আই অ্যাম লস্ট, ফাইন্ড মি আউট। কোনও ঠিকানা নেই, শহরের নাম নেই। শুধু আনন্দ-সংবাদ, হারিয়ে গেছি, আমাকে খুঁজে বের কর। আমাদেরও প্রায় সেই অবস্থা।

হঠাৎ ঝকঝকে একটা গাড়ি আমাদের পাশে ফুটপাথ ঘেঁষে থেমে পড়ল। গাড়ির ভেতর থেকে পরিষ্কার বাঙলা, 'আরে তোমরা এখানে কি করছ।' গাড়ির পেছনের আসনে রঞ্জিতবাবু। সামনের আসনে ভাটিয়া সাহেব। এতক্ষণ যেন সমুদ্রে ভাসছিলুম। আমরা গাড়িতে উঠে পড়লুম। বিজ্ঞের মতো বললুম, 'এই একটু ঘুরেঘারে দেখছিলুম। আপনারা কোথা থেকে?'

'আমরা আসছি ভিস স্টুডিও থেকে।'

গাড়ি গোটা কতক পাক মেরে মাঝারি মাপের একটা বাড়ির সামনে থেমে পড়ল। রাস্তা খুব একটা চওড়া নয়। তবে সুন্দর। পরিষ্কার তকতকে। মাঝে মাঝে স্টিল প্লেট পাতা। ঢোকার মুখে ডানদিকে একটা বিষণ্ণ চেহারার চৌকো মতো বাড়ি। স্যালভেশান আর্মি। বহুকাল পরে এই পরিচিত নামটি চোখে পড়ল। ওই বাড়ির নিচের তলায় একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। তবে রবিবার বলে বন্ধ।

ভাটিয়া সাহেব নেমে পড়লেন। আমরা বাথ হাউসের প্রেস সেন্টারে এসে গেছি। বাড়ির সামনে সদরে, রাস্তায় লম্বা লম্বা এক দল পুলিশ। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু আধুনিক অস্ত্র। ওয়াকিটকি

না হয় মেটাল ডিটেক্টার। লন্ডনের পুলিসদের ইউনিফর্ম, টুপি সবই ভারি সুন্দর। দেখলে বেশ সম্ভ্রম হয়। আমাদের ছাড়পত্র, আমাদের বুকে লটকানো সেই হলুদ রঙের ব্যাজ বা পরিচয় পত্র।

ইংরেজদের আর্কিটেকচার বড় কনজারভেটিভ। বাড়িটা তেমন খোলামেলা নয়। আবহাওয়ার জন্যেই মনে হয় চাপা ধরনের। একটা সুবিধে, যতই বৃষ্টি হোক কাদা নেই। যতই এলোমেলো বাতাস বয়ে যাক ধুলো নেই। ঢোকার মুখেই স্টিলের জালি পাতা। তলায় বেশ বড় মাপের চৌকো গর্ত। জুতোয় যাই থাক না কেন ঝরে যাবে। আর থাকলেই বা কি! রাস্তায় ছাড়া গরু নেই যে গোবর থাকবে। কলকাতা কর্পোরেশান নেই যে নর্দমা থেকে তোলা পাঁক কি আবর্জনার ডাঁই থাকবে! জালি পেরলেই গাঢ় নীল রঙের কার্পেট ঢাকা করিডর। করিডর গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে তারের জালি লাগানো দরজায়। দেখা যায় যাওয়া যায় না। ভেতরে হরেক রকমের যন্ত্রপাতি। মনে হলো স্টুডিও কাম টেলিকমিউনিকেসান সেন্টার। কর্মীরা এতই ব্যস্ত যে মাথা তোলার অবকাশ নেই। বাঁ দিকে সিঁড়ি। আমরা সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠে গেলুম। সবই কার্পেট মোড়া। কোথাও এতটুকু আবর্জনা নেই। লিফ্‌ট আছে, তবে আমরা লিফ্‌টে ওঠার প্রয়োজন বোধ করলুম না।

নানা দেশের সাংবাদিকরা এসেছেন। স্ত্রী, পুরুষ। কাঁধে ক্যামেরা। বড়, ছোট নানা মাপের। এত লোকজন; কিন্তু কোনও হইচই নেই। তিন তলার করিডরের শেষ মাথায় বড় একটা হলঘর। একটা ডায়াস। ডায়াসের সামনে কমানওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশের পতাকা। এপাশে, ওপাশে, দু'পাশে দুটো টেলিভিসান। এইটাই হলো কনফারেন্স রুম। তার আগের ডান দিকের ঘরটা হলো আমাদের প্রেস সেন্টার। আর তার আগের ঘরটা কমানওয়েলথ প্রেস সেন্টার।

ভারতীয় প্রেস সেন্টারের এক পাশে সার সার টাইপরাইটার আর টেলেক্স যন্ত্র। ক্লোজড সার্কিট-টিভির পর্দায় লেখা, মার্লবরো হাউসে মিটিং চলছে, যথাসময়ে খবরাখবর জানানো হবে। আমরা যে যার চেয়ারে বসে পড়লুম। ঘরটা বেশ কমফারটেবল। আপাতত আমাদের কিছু করার নেই। ওদিকে রুদ্ধদ্বার সভা চলেছে। ছটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা সভায় বসেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতাঙ্গদের মুক্তি চাই। ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে নাসভিতে অনুরূপ একটি অধিবেশন বসেছিল। সেই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল—দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারকে বর্ণবৈষম্য নীতি প্রত্যাহার করতেই হবে, তা না হলে আরও দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে বাধ্য। নীতি প্রত্যাহারের জন্যে কমানওয়েলথভুক্ত সমস্ত দেশকে এক জোট হয়ে চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

আমরা সভাকক্ষে না থাকলেও দেখতে পাচ্ছি কি হচ্ছে মার্লবরো হাউসের সভাকক্ষে। প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার একপাশে মুখ গোঁজ করে বসে আছেন। আর কমানওয়েলথ গ্রুপ অফ এমিনেন্ট পারসনস-এর কো-চেয়ারম্যান, দু'জন জেনারেল ওলুসেগান ওবাসানজো আর শ্রীমালকম ফ্রেজার তাঁদের রিপোর্ট সভার সামনে দাখিল করেছেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সেই সব প্রশ্নের জবাবের পালা শেষ। এইবার স্যার জিওফ্রে হো উঠেছেন। তিনি একদিকে বৃটিশ ফরেন সেক্রেটারি আবার ই ই সির কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের প্রেসিডেন্ট। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলেন। স্যার হো তাঁর বিবৃতি পেশ করছেন। মার্গারেট থ্যাচার মুখ ভার করে বসে আছেন।

থ্যাচার সম্পর্কে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের মত, 'দ্যাট ইনটেলিজেন্ট অ্যান্ড কারেজাস ইয়াং ওম্যান'! বৃদ্ধ ম্যাকমিলান এই মুদীর কন্যা ও চাষার নাতনীটিকে বড় স্নেহ করতেন। তবে থ্যাচারের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। দেশের বেকার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। থ্যাচার নির্বাচনের আগে প্রায়ই ম্যাকমিলানের কাছে যেতেন। রাজনীতি সম্পর্কে নানা পরামর্শ করতেন। বৃদ্ধ এতে খুব খুশি হতেন। ম্যাকমিলান আবার সপ্তাহের শেষে মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে যেতেন চেকারসে থ্যাচারের শান্ত অবকাশ ভবনে। ম্যাকমিলান কঠোর পরিশ্রমী এই মহিলাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, এই পরিশ্রম মার্গারেট কত দিন সহ্য করতে পারবেন। একদিন না হার্ট-অ্যাটাকে মারা যেতে হয়! ম্যাকমিলান ইংল্যান্ডের খুব নামী ও প্রিয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রশংসার দাম আছে।

তবু দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে মার্গারেট ভীষণ এক তরফা। বোথা সরকারকে বিপাকে ফেলার মানবিক ইচ্ছা তাঁর নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব অপেক্ষায় আছেন। সুযোগ এলেই আক্রমণ করবেন। অস্ত্র হলো শাণিত বক্তৃতা। নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক অ্যালান কাওয়েল লিখছেন :

সেদিন ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ সাল। একদল অশ্বেতাঙ্গ প্রতিবাদকারী আলেকজান্ড্রার নোংরা পথ ধরে ছুটে চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম নগর জোহানেসবার্গের উত্তরে কালো মানুষদের বসতি এই আলেকজান্ড্রা। উত্তেজিত মিছিলকারীদের লক্ষ্যস্থল হলো, উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটি কারখানা। কারখানার মালিক শ্বেতাঙ্গ। মিছিল সেই পাঁচিলের বাইরে এসে থেমে পড়ল। আন্দোলনকারীরা পাঁচিলের গায়ে ছুঁড়তে লাগল পাথর আর গ্যাসোলিন বোমা। ভেতরের শ্বেতাঙ্গরা পিস্তল আর বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া শুরু করল। কারখানার এক শ্বেতকায় প্রতিরোধকারী সাংবাদিক কাওয়েলকে বললেন, 'আমরা যেই দেখলুম ওরা আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে তখন আমি একদিকে আর আমার বাবা একদিকে, দু'জনে দুপাশে দাঁড়িয়ে গুলি চালানো শুরু করলাম। আমাদের আর এক সহকারী বন্দুক উঁচিয়ে বললেন, ব্যাটাদের আসতে দাও। আসুক, ঝাঁকে ঝাঁকে আসুক, আমরাও প্রস্তুত আছি।' গত তিনশো বছর ধরে এই একই লড়াই চলেছে। জীবন মৃত্যুর লড়াই।

১৮

নেলসান ম্যান্ডেলার মুক্তি চাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকার ম্যান্ডেলা সহ আরও অনেক নেতাকে জেলে ভরে রেখেছেন। গত নাসাউ অধিবেশনে কমনওয়েলভুক্ত জাতিপুঞ্জ একযোগে এইসব নেতাদের মুক্তি চেয়েছিলেন। বোথা সরকার সে দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন।

নেলসান ম্যান্ডেলার স্ত্রী উইনি ম্যান্ডেলাকে বলা হয়, 'দি মাদার অফ দি ব্ল্যাক পিপল অফ সাউথ আফ্রিকা। দি ইনকারনেশান অফ দি ব্ল্যাক স্পিরিট।' তিনিও কড়া পুলিস পাহারায় দিন কাটাচ্ছেন। বহু দূর একগ্রামে তিনি নির্বাসিতা। একসঙ্গে একজনের বেশি মানুষের সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই। সভা সমিতি করার হুকুম নেই। স্কুলে পড়াতে যাবার অধিকার নেই। অনুমতি ছাড়া কোথাও যাবার উপায় নেই। এমন কি স্বামীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়াও দুঃসাধ্য।

ওয়াইনি জোহানেসবার্গে লেখাপড়া করে প্রথম অশ্বেতাঙ্গ মহিলা মেডিকেল ওয়ার্কার হবার গৌরব অর্জন করেন। যে রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো, সেই রাতের বর্ণনা তিনি এইভাবে দিয়েছেন :

১৬ মে, ১৯৭৭ সাল। অরল্যান্ডোতে তখন গভীর রাত। আমি তখন সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটা কাজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত। দিনের বেলা চাকরি করি। রাতটুকুই আমার সম্বল। রাত দুটোর আগে আমার বিছানায় যাবার উপায় ছিল না। পরের দিনই একটা লেখা জমা দিতে হবে তাই কাজ সারতে সারতে সেদিন রাত আড়াইটে হয়ে গেল।

আমি লিখছি, আর শুনছি, বাইরে বিচিত্র সব আওয়াজ হচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব শব্দে আমি আর ভয় পাই না। জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমি জানি যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমার চারপাশে কেউ না কেউ থাকবেই। সুতরাং বাইরে যে পদশব্দ শুনছি তাতে অবাক হবার, ভয় পাবার, কিছু নেই। ওদের নিয়ে নিয়ত এই ভাবেই আমাকে বাঁচতে হবে। বাইরের অন্ধকারে যারা ঘুরছে তারা পুলিস। রাতের অভ্যস্ত চৌকিদারিতে তারা ঘুরছে। আমি আলো নিবিয়ে দিলুম; কিন্তু ঘুমোতে পারলুম না।

ভোর চারটে নাগাদ বাইরের প্রচন্ড শব্দে ঘুম ছুটে গেল। আমার মনে হলো বাইরে থেকে এই বাড়ি লক্ষ্য করে কে যেন ঝাঁক ঝাঁক পাথর ছুঁড়ছে। মনে হচ্ছে সবই যেন আমার বাড়ির পাঁচিলের ভেতরে এসে পড়ছে। আমার অরল্যান্ডের বাড়ির চারপাশ উঁচু সিমেন্টের দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

নিমেষে আমার ঘরের সব কটা জানালা আর দরজায় একই সঙ্গে টোকা পড়তে লাগল। ব্যাং, ব্যাং, ব্যাং শব্দে। দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকার ভদ্রতা ওদের নেই। ওরা দরজা আর জানালায় দুমদাম টোকা মারবে আর চিৎকার করবে। তখনই আমি বুঝে যাব কি হচ্ছে, কি হতে চলেছে। আমি ধরেই নিলাম পুলিস আজ আমাকে আইনের ছ'নম্বর ধারায় গ্রেফতার করতে এসেছে।

আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। বাড়ির উঠোনে পুরো একটা বাহিনী ঢুকে পড়েছে। কিছু ছদ্মবেশী, কিন্তু সকলেরই হাতে বন্দুক, যারা নিরাপত্তা রক্ষী তারা সকলেই আরও সশস্ত্র।

একটা সুটকেস আমার সব সময়েই গোছানো থাকে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এই কায়দাটা আমি শিখেছি। যখনই আমাকে গ্রেফতার করা হয়, তখনই আমাকে একা রাখা হয়। আমার ছেলেমেয়েদের আমি বোর্ডিং-এ রেখেছি! গোছানো সুটকেস হাতের কাছে থাকলে এই সুবিধে, যাবার সময় চট করে তুলে নেওয়া যায়। পরে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কাউকে আর ঝামেলা পোহাতে হয় না। সুটকেসে থাকে এক প্রস্থ জামা কাপড়, প্রসাধনী, টুথব্রাশ আর চিরুনি। সুটকেসটা হাতে তোলা মাত্রই, ওরা বললে, 'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো।' যেমন হয়, বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটি হলো। ওই সময় আমার মেয়ে জিণ্ডজি আমার সঙ্গে ছিল। আমি তাকে একা ফেলে রেখে যাই কি করে! আমার জানা দরকার কত দিনের কারাবাস! আমার কথা শুনছে কে! আমাকে প্রায় ঝটকা মেরে তুলে নিল। পরের নাটক প্রোটিয়া পুলিস স্টেশানে।

শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ। আমার কাছ থেকে খবর বের করার চেষ্টা। যাঁরা আমার মতো বারে বারে জেল খেটেছেন, তাঁরা সহজেই এই বাজে ব্যাপারটা সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারেন। আমার এই বয়সে কোনও পুলিসেরই ক্ষমতা নেই জিজ্ঞাসাবাদ করে খবর বের করার। আমার বয়স যখন কম ছিল, তখন হয় তো পারত, কিন্তু আজ ওই ক্ষুদ্র পুলিস যতই প্যাঁক প্যাঁক করুক, সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই হবে না। সব শেষে যা হবে, তা আমার জানা আছে। পরস্পর পরস্পরকে অপমান করে শেষ হবে জিজ্ঞাসাবাদ-পর্ব। সকাল দশটা পর্যন্ত এই পন্ডশ্রম চলল। দশটার পর আমার মেয়ে জিণ্ডজিকে এনে আমার সেলে ঢুকিয়ে দিল। আমার চারপাশে তখন সশস্ত্র প্রহরা। জিণ্ডজির হাতে ঝুলছে বাড়ির চাবি। জিণ্ডজিকে দেখেই আমি বুঝে গেলুম ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে। আমার কারাকক্ষে যে তিনজন এতক্ষণ আমাকে প্রশ্ন করছিল তারা এইবার স্রেফ উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে উঠেই বললে, 'তোমাকে এখুনি ফ্রি স্টেটে দূর করে দেওয়া হবে।' এতক্ষণ ধারণাই ছিল না ওরা আমাকে নিয়ে কি করতে চলেছে। ভেবেছিলুম আবার কিছুকাল জেলে ভরে রাখবে। হয় প্রিটোরিয়ায় না হয় দেশের অন্য কোনও জেলে। আগে আগে যেমন হয়েছে। যখন জিণ্ডজিকে ওরা নিয়ে এল তখনই বুঝেছিলুম, এবার আর কারাবাস নয়, এবার বরাতে নাচছে নির্বাসন।

বাইরে সেনাবাহিনীর অনেক ট্রাক দাঁড়িয়েছিল তারই একটায় আমাদের তোলা হলো। আমাদের যা কিছু সহায় সম্পদ সবই দেখি ওই ট্রাকে বোঝাই করা হয়েছে। বিছানার ওপর থেকে চাদর আর ঢাকা টান মেরে তুলে এনেছে। বাড়িতে যা ছিল সব গুটিয়ে পাকিয়ে নিয়ে এসেছে। ওই চাদরে ওয়ার্ডরোব আর কাবার্ডে যা ছিল সব বের করে পুঁটলি পাকিয়েছে। যত কাপ ডিশ ছিল সব কম্বলে মুড়েছে। তিনের চার ভাগই ভেঙে টুকরো টুকরো। নেলসনের সমস্ত বই একটা চাদরে তালগোল পাকানো। যা কিছু বোঝাই করেছে তার অর্ধেক ভেঙেচুরে, দুমড়ে শেষ।

গাড়ি ছেড়ে দিল। আমাদের গন্তব্য ফ্রি স্টেট। জিণ্ডজি আর আমি বসে আছি গাড়ির পেছনের দিকটায়। ঘিরে আছে সশস্ত্র প্রহরী। সামনের আসনেও ওই একই ব্যাপার। সর্বত্র অস্ত্রধারী মানুষ। পেছনে আসছে সারি সারি আরও ট্রাক। আমার জানাই ছিল না, ব্র্যান্ডফোর্ট বলে আর একটা জায়গা আছে। আমাদের নিয়ে গিয়ে ফ্রি স্টেটের থানায় নামানো হলো। সেখানকার সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের হাতে আমরা জমা পড়ে গেলুম। এদের সংখ্যাও কম নয়।

ব্র্যান্ডফোর্ট থানা থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো নির্দিষ্ট বাড়িতে। সেই আবাসস্থলকে বাড়ি বললে, বাড়ির অপমান করা হয়। তিনটে মাত্র খুপরি। আমরা গিয়ে দেখলুম সেই খুপরি তিনটের যা অবস্থা, ঢোকা যায় না। সুস্থ মানুষের বসবাসের অযোগ্য। তিনের চার ভাগই মাটি আর আবর্জনায় ভর্তি। পুলিস তখন লোকজন ডেকে নিয়ে এল। বেলচা দিয়ে মাটি আর আবর্জনা পরিষ্কার শুরু হলো। পরে আমরা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জেনেছিলাম, এই অঞ্চলে যখন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, তখন, কন্ট্র্যাক্টাররা এই তিনটে খুপরিতে যত র‍্যাবিশ ফেলত। ওই অমার্জিত ঘরেই পুলিসের লোক দুমদাম করে আমাদের জিনিসপত্তর ফেলতে লাগল। দরজা এত ছোট যে আমাদের একটা ফারনিচারও সেই দরজা দিয়ে ঢুকলো না। এত ছোট দরজা সাধারণত মানুষ বাথরুমেই বসায়। আসবাবপত্র সব পুলিস

স্টেশনেই ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

সেই প্রথম রাতে আমাদের স্নান হলো না, এমন কি হাতমুখ ধোয়ারও উপায় নেই। কারণ আশেপাশে কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। হঠাৎ মনে হলো আমরা যে বাড়িটায় ছিলাম সেটা এর তুলনায় ছিল যেন রাজপ্রাসাদ। কোথাও একটা বালতি নেই, কোথাও একগ্রাস খাবার নেই। রাঁধবই বা কি করে। কোনও স্টোভ নেই। চারপাশে চারটে দেয়াল, তার মাঝে আমাদের মালের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। অসম্ভব শীত। মেঝেতে একটা তোশক ফেলে দুমড়ে মুচড়ে কোনও রকমে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলুম।

ভয়ঙ্কর সে অভিজ্ঞতা। জিঞ্জির পক্ষে সাংঘাতিক এক মানসিক আঘাত। যে কোনও মানুষেরই এই অবস্থায় ভেঙে পড়া স্বাভাবিক। আর এ-সব সেই উদ্দেশ্যেই করা। বিপ্লবে, সংগ্রামে মানুষ হয়তো এর চেয়েও কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে; কিন্তু ষোল বছরের নিষ্পাপ একটি মেয়ের পক্ষে এই অবস্থা সহ্য করা এক অসম্ভব ব্যাপার। মা হয়ে নিজের কন্যার এই পীড়ন দেখে স্থির থাকা যায় না। আমার অপরাধে, আমার জীবনের কার্যধারায় আমার সবচেয়ে প্রিয়জন কেন কষ্ট পাবে। এই অভিজ্ঞতায় মনের যে ক্ষত, তা কি কোনও দিন সারবে! এর আগে যা সব ঘটেছে তার কাছে এই ঘটনা যেন অনেক বেশি তিক্ত। আমার সর্বাঙ্গ রিরি করছে।

আমাদের আশেপাশে ওই অঞ্চলের মানুষকে ওরা প্রায় পাথর বানিয়ে রেখেছিল। ওই তথাকথিত পার্লামেন্টের এতদাঞ্চলের সদস্য ও পুলিস কর্তৃপক্ষ এখানে জনসভা করে স্থানীয় জনসাধারণকে বুঝিয়েছেন, সাংঘাতিক এক কমিউনিস্ট আসছে তোমাদের এলাকায়। সেই বিপজ্জনক কমিউনিস্টের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা কোরো না। এই মহিলা তোমাদের নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করবে, দেশের জন্যে লড়াই করো। এই মহিলা অনেক আবোল তাবোল কথা তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করবে। সাবধান। ওর বাড়িতে পা দিয়েছো কি মরেছ। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার ও যাবজ্জীবন কারাদন্ড। যেমন ওই মহিলার স্বামীকে করা হয়েছে। সারা জীবন যাকে জেলেই পচতে হবে। আমার ওই প্রতিবেশীদের শাসানো হয়েছিল, ছেলেমেয়েদের আগলে রেখো। তারা যখন দোকান বাজারে বেরোবে তখন যেন ঘুরতে ঘুরতে ভুল করেও ওই বাড়ির ত্রিসীমানায় না যায়।

কিন্তু দিন যে বদলে গেছে। কৃষ্ণ চিন্তাধারা এখন ঘুরে গেছে। শ্বেতাঙ্গরা যদি বলে, এইটা খারাপ, কৃষ্ণাঙ্গরা তখনই বুঝতে পারে ওইটাই ভালো। ভয়ে ভয়ে থাকলেও বিশ্বাসের গতি চলে বিপরীত দিকে। বর্ণবৈষম্যমূলক সমস্ত নীতিই এখন এই ভাবে আদৃত হয়। যখন একজন শ্বেতাঙ্গ বলে, এই কাজই করা উচিত, কৃষ্ণাঙ্গ বোঝে ঠিক তার উল্টোটা। আমার সম্পর্কেও ঠিক সেই ব্যাপারই হলো। সেতু ছাড়াই সেতুবন্ধন সম্ভব হলো। যত সময় অতিবাহিত হতে লাগল ততই স্থানীয় মানুষেরা বুঝতে লাগলেন, আমরা কারা। ব্যাপারটা কি। কারুর কাছে আমাদের যেতে হলো না। ডেকে ডেকে বলতে হলো না। শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পুলিস বাহিনী অপসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে প্রচলিত শক্তি সঙ্কেত দেখাতে শুরু করল। তারা ভোরবেলা আমাদের এসে জাগিয়ে দিত। যে যেমন পারত খাবার দাবার দিয়ে যেত, বিনস, বাঁধাকপি। অবশ্য সাবধানের মার নেই ভেবে দিনের বেলা কেউই আমাদের সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তারা আসত। এসে জানিয়ে যেত, আমরা কৃষ্ণকায়রা একতাবদ্ধ। এই হলো ঘটনা।

নেলসনকে তারা জানে। প্রত্যেকে জানে নেলসন কে; কেন সে কারারুদ্ধ!

আমার একক সত্তাকে আমি বহুদিন আগে বিসর্জন দিয়েছি। যে আদর্শ, যে রাজনৈতিক লক্ষ্যের আমি প্রতিনিধি, তা আমার একার নয়, তা সারা দেশের মানুষের। দেশের মানুষ কখনও আদর্শচ্যুত হতে পারে না। আমার নিজস্ব জীবনের মৃত্যু ঘটেছে। ওরা আমার ওপর যা অত্যাচার করছে, তা একা আমার উপর নয় সারা দেশের মানুষের ওপর। আমি কেবল সেই অত্যাচার আর লাঞ্ছনার ব্যারোমিটার মাত্র। আমি যখন যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থা দেখে সারা দেশের উত্তাপের মাপ করা যাবে। যখন আমাকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছে তখন ওরা ভাবছে আমার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিও বুঝি নির্বাসনে গেল। মূর্খের দল বোঝে না, ইতিহাসে তা কখনও সম্ভব হয় নি। কোনও কালে কেউ পারে নি। এরা তো শিশু। মানুষ হিসেবে ওদের কাছে আমার মূল্য কানাকড়িও নয়। ওরা যা নির্বাসনে পাঠাতে

চায় আমি তার প্রতিনিধি মাত্র। এই নির্বাসন, এই অত্যাচার, এই লাঞ্ছনা আজ আমার কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান।

ঠিক এই অবস্থাই প্রত্যক্ষ করে এসেছেন 'কমানওয়েলথ' গ্রুপ অফ এমিনেন্ট পার্সনস-এর সাতজন বিশিষ্ট সদস্য-ম্যালকম ফ্রেজার, ওলুসেগান ওবাসানজো, অ্যানথনি বারবার, নিটা ব্যারো, জন ম্যালেসেলা, সরল সিং, এডওয়ার্ড স্কট। মার্লবরো হাউসে এই মুহূর্তে তাঁদের দাখিল করা রিপোর্টই হয়তো পড়া হচ্ছে।

ওবাসানজো পড়ছেন, 'জাতিবৈষম্য কাকে বলে, তার স্বরূপ কি হতে পারে আমাদের কারুরই সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না। সমাজকে ভেঙে ফেলার নীতি হিসেবে এ যে কি ভয়াবহ আর নিষ্ঠুর! একমাত্র শক্তির বলে জোর করে এর প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে আর বাঁচিয়েও রাখা হয়েছে সেই ভাবে। মানুষের সে কি আতঙ্কজনক অবস্থা, কি সাংঘাতিক বঞ্চনা। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ক্ষয়ে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজ জীবন এই বর্ণবৈষম্য নীতির বলপ্রয়োগে টুকরো টুকরো। বিধিনিষেধের বেড়ায় জীবন সব খোপে খোপে ভরা যন্ত্রণার মতো। যে কোনও সভ্য মানুষ দেখলে অবাক হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে এসে আমরা আজ বুঝতে পেরেছি, কেন শত শত পর্যটক এই দেশ ঘুরে গিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, অথচ এই আপাত চাকচিক্যের অন্তরালে হাজার হাজার মানুষের চাপা কান্না শুনতে পায় না।'

কেন পায় না! সেইটাই তো বোথা বাবার কেরামতি।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা নগর আর শহরের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর যে কোনও উন্নত দেশের সমতুল্য। অথচ তার চারপাশে অশ্বেতাঙ্গ মানুষের এলাকার দুর্দশা বর্ণনাতীত। এই পার্থক্যের স্রষ্টা বর্ণবৈষম্য নীতি। একই দেশে কালো আর সাদা বসবাস করে চলেছে অপরিচিতের মতো।

মানুষকে সর্বত্র যে ভাবে আলাদা করে রাখা হয়েছে, তা দেখলে অবাক হতে হয়। কেপটাউনে যাবার পথে একাধিক কালো শহর পড়ে। গুগুলেতু, ইনায়াঙ্গা, লাঙ্গা। পড়ে অশ্বেতাঙ্গ শহর আথলোন। পড়ে শ্বেতাঙ্গ শহর মোব্রে আর পাইনল্যান্ডস। শহরের বাইরের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় কোনটা কালো শহর, কোনটা সাদা শহর। মহানগরীর মাঝের একটি এলাকা দেখে আমাদের খুব খটকা লাগল। যেটাকে ওঁরা বলেন ৬ নম্বর জেলা, সেই জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। এক সময় এই জেলাতে বাস করত কৃষ্ণাঙ্গ আর ভারতীয়রা। সেই জেলা এখন জনশূন্য। সেখানে কোনও তৎপরতা নেই। পড়ে আছে গোটা কতক গির্জা আর মসজিদ। আর আছে নতুন কয়েকটি সরকারী ভবন। দশ বছর আগেও এটি ছিল একটি প্রাণচঞ্চল জনপদ। কৃষ্ণাঙ্গ আর ভারতীয়রা পাশাপাশি বসবাস করত সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতি নিয়ে। চল্লিশ কিলোমিটার দূরে কেপ ফ্ল্যাটস-এ এদের দূর করে দেওয়া হয়েছে। শূন্য রাজপথে সার সার ল্যাম্পপোস্ট সেই বহিষ্কৃত মানুষদের উৎকণ্ঠা আব বেদনায় সাক্ষী হয়ে আজ দাঁড়িয়ে আছে।

কেপটাউনের বাইরে এক একটি পথসন্ধি যেন বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতীক। হোমল্যান্ডস পলিসি আর গ্রুপ এরিয়াজ অ্যাক্ট প্রযোগ করে বাবে বারে যাদের জোর করে উচ্ছেদ করার চেষ্টা হয়েছে, এই রকম হাজার হাজার পরিবার সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে পথেব পাশে আশ্রয় নেওয়াকেই শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছে। আমরা গিয়েছিলাম মাঠে। অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করে, সহস্র পরিবার এক জোট হয়ে পথকেই গৃহ বলে মেনে নিয়েছে। করোগেটেড শিট কার্ডবোর্ড আর পলিথিনের ঝুপড়িতে কোনও রকমে দিন কাটানো। চাপাচুপি দিয়ে কোনও রকমে শীতের হাত থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা। ঝুপড়ির পাশে কোনও নর্দমা নেই। ইলেকট্রিসিটি নেই। আশেপাশে দু একটা, জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী জলের কল আছে। তবু মানুষের স্পিরিট, উৎসাহের জোরে সব হয়। এত অভাব, তবু মানুষগুলি পরিচ্ছন্ন। ঝুপড়িগুলি সাধারণতই বেশ গোছানো আর সুন্দর।

এই পথিপার্শ্বস্থ ঝুপড়িতে যারা বসবাস করছে, তাদের প্রশ্ন করে আমরা যে তথ্য পেয়েছি তা বেশ চমকপ্রদ। হোমল্যান্ড বলে যে অঞ্চলে এদের পাচার করার কথা সেই অঞ্চলে শিশু মৃত্যুর যে হার তার চেয়ে এখানে মৃত্যুর হার অনেক কম, মাত্র চতুর্থাংশ। এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে হোমল্যান্ডের দুর্দশা। সেখানে জীবিকা নেই, আহার নেই, পানীয় নেই, পরিবারে পরিবারে বন্ধন নেই। সেই কারণেই এই পথ প্রবাস। এখানে আর যাই হোক মৃত্যুর হার কম আর মানুষে মানুষে আছে অটুট বন্ধন।

এই পথ মোহনার ওপাশে কৃষ্ণাঙ্গ অঞ্চলের অবস্থা দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি। যেমন

জোহানেসবার্গের সোয়েটো। ছোট ছোট বাড়ি। যেখানে কোনও রকমে আট লক্ষ মানুষ মাথা গুঁজে থাকতে পারে সেখানে জোর করে বিশ লক্ষ মানুষকে ঢোকানো হয়েছে। পোর্ট এলিজাবেথের অবস্থাও সমান শোচনীয়। সেখানে রাবিশের ঢিপিতে কিছু বাড়ি তৈরি করে কৃষ্ণাঙ্গদের পোরা হয়েছে। ডারবানের কাওয়ামাশু, জোহানেসবার্গের আলেকজান্ড্রা, প্রিটোরিয়ার মামেলোদিরও এক অবস্থা।

অথচ শহরতলির শ্বেতাঙ্গ জনপদ প্রাচুর্যের ছবি। কৃষ্ণাঙ্গ এলাকার দুঃখ দুর্দশার বাইরে এক স্বপ্নরাজ্য যেন। তাদের আসা যাওয়া, প্রাত্যহিক কাজকর্মে ওই কালো মানুষদের দুঃখ দুর্দশা কোনও ভাবেই ছায়া ফেলতে পারে না।

কেপটাউনের শহরতলি হাউটবের নিরাশ্রয় পথবাসীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এঁরা হাউটবে ছেড়ে কেপফ্ল্যাটের শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে নির্দিষ্ট খায়েলিটশায় কোনো ভাবেই যেতে প্রস্তুত নন। সেখানে সারাদিন শুধু ঝোড়ো বাতাসের হাহাকার। হাউটবেতে যাদের জন্ম, কয়েক পুরুষের বসবাস। জীবিকার সন্ধান। এখানে থাকলে তবু মাস গেলে শ তিনেক টাকা রোজগার হয়, খায়েলিটশা থেকে আসা যাওয়া করতে হলে পুরো টাকাটাই চলে যাবে পথ খরচায়। ওখানে যাওয়া মানে প্রকারান্তরে বেকার হয়ে যাওয়া।

কেপটাউনেই আমরা টের পেলাম দেশের শ্বেতাঙ্গ সরকার কি ভাবে মজা লুটছেন। সাদা মানুষদের স্বর্গোপম সুন্দর কলোনির চারপাশে অশ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণকায়দের ঘেটো। কম মজুরির শ্রমিক ভান্ডারের মতো। হাত বাড়ালেই সস্তার মজুর। কলে কারখানায় খাটবে। খাটবে মাঠে ঘাটে, বাড়ি ঘর রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে। খাটবে ক্ষেতে খামারে। সাদা মানুষের কলোনিতে নীল সুইমিংপুল। পানভোজনের ফলাও ব্যবস্থা। আনন্দ, আরাম আর প্রাচুর্যের ফোয়ারা। ওদিকে কৃষ্ণাঙ্গ এলাকায় শিশু মৃত্যু, অনাহার, দারিদ্র্য। সেখানে সন্তরণ সরোবর নেই, আছে ডোবা। সেই ডোবায় কৃষ্ণ শিশু গা ডুবিয়ে প্রখর আগুনে শরীর শীতল করে। এই অবস্থা দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি। দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ কালে আমরা সেই অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পদে পদে পেয়েছি যেমন জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই, এলাকা দেখলেই বোঝা যায়, এটা শ্বেত এলাকা। এটা কৃষ্ণ এলাকা। দক্ষিণ আফ্রিকা-সরকারের এটা কৃতিত্ব না নিন্দনীয় অক্ষমতা।

আমরা যখন প্রেস সেন্টারে বসে আছি তখন মার্লবোরো হাউসে চলেছে প্রচন্ড বিতর্ক। একটাই দাবি অ্যাপারথিড টু বি ডিসম্যান্টলড। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারকে নমনীয় হতে হবে। কৃষ্ণাঙ্গদের ফিরিয়ে দিতেই হবে মানবিক অধিকার। নিজ বাসভূমে বাহুবলে যাদের পরবাসী করে রাখা হয়েছে, সেই বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থে কমানওয়েলথভুক্ত সমস্ত দেশ আজ এক জোট। 'স্যাংশান'। এই একটি শব্দে সব দাবি জমাট হয়ে আছে। সব শাস্তি। 'স্যাংশান'। দক্ষিণ আফ্রিকাকে একেবারে কোণঠাসা করে দাও।

আমাদের রাত জাগার ফল ফলছে এবার। গদি আঁটা টিনের চেয়ারে বসে বসেই ঘুম এসে যাচ্ছে। একেবারে বিচিত্র পরিবেশ। চারপাশে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা ঘুরছেন। ফটোগ্রাফাররা কাঁধে, বুকে তিন চারটে করে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাঁটছেন। ঘুমঘুম চোখে তাকাচ্ছি, যেন স্বপ্ন দেখছি। বিচিত্র সাজপোশাকে ফর্সা সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়ে। কোনও ঢিলেঢালা বুড়িয়ে যাওয়া ব্যাপার নেই। ঠ্যাং তুলে কাগজ পড়া নেই। ক্ষেয়ো কাপে চা, তলানিতে সিগারেটের টুকরো আর ছাই নিক্ষিপ্ত। বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে এ অঞ্চলের বাতাসে একটিই তরঙ্গ 'উদ্দেশ্য'। 'পারপাস'। একটিই তরঙ্গ—'গতি'।

১৭

বিশ্ব মঞ্চে সাংবাদিকদের দাপট বেশ বেড়েছে। পুরোহিত ছাড়া যেমন বিয়ে হয় না, সাংবাদিক ছাড়া সেই রকম রাজনীতি হয় না। যুদ্ধ হয় না। সংবাদপত্র এখন বিরাট এক শক্তি। বিশাল এক জগৎ। ফোর্থ ওয়ার্ল্ড বলা যেতে পারে। সারা দুনিয়ার সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার, রেডিও, টিভি

টিম এই প্রেস সেন্টারে। 'সামথিং বিগ ইন দি এয়ার', আবার সেই বিখ্যাত গানটা মনে গুনগুন করছে। আধখোলা চোখে ভোলানাথের মতো দেখছি সব। ঠিক এই মুহূর্তে আমার কোনও লেখাপড়ার কাজ নেই। যাঁরা দৈনিকের তাঁদের নিষ্কৃতি নেই। পিটি আই-এর ভেঙ্কটাচলম আর ইউ এন আই-এর গণপতি দুটি মেশিন দখল করে বসে পড়েছেন। দু'জনেই প্রবীণ সাংবাদিক। সামনে ঝুঁকে কটর কটর টাইপ করে চলেছেন। এখনও তেমন কোনও খবর তৈরি হয় নি। না হলেও শূন্যে হাত ঘুরিয়ে সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ করতে পারেন। ওঁরা হয়তো এইটাই ডেসপ্যাচ করছেন—কনফারেনস শুরু হয়েছে। পরিষ্কার নির্মল আবহাওয়া। রাজীব কড়া পাহারায় হোটেল চার্চিল থেকে মার্লবরো হাউসে গেছেন। একটু পরে রানী তাঁকে লাঞ্চ দেবেন। আধ কলাম নিউজ তৈরি করা কি তেমন কঠিন!

আমরা একটু হাত পা ছড়াবার অবকাশ পেলেও টিভি আর রেডিও টিমের অবসর নেই। অবসর নেই ফিল্ম ডিভিসানের। প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরোর ফোটোগ্রাফারেরও ছুটি নেই। তাঁরা সব ওই মার্লবরো হাউসে ব্যস্ত আছেন কভারেজে। চুপচাপ বসে থাকলে যা হয়, ভীষণ ক্ষিদে পায়। আর খাবার কথা হলেই পাউন্ড, শিলিং, পেন্স ভয় দেখায়। ফরেন এক্সচেঞ্জ এক সাংঘাতিক ব্রেক। ইচ্ছার ঘোড়া ছুটবে কি অমন লাগাম যার নাকে।

তবু কুমকুমকে ফিসফিস করে বললুম, 'কিছু খেলে হয় না! নিচে একটা রেস্তোরাঁ দেখে এলুম।'

কুমকুম বললে, 'তা তো হয়।'

'তাহলে চলো।'

এই বাড়িটার মাথামুন্ডু বোঝা শক্ত। মনে হয় তলাতেও মানে মাটির তলাতেও একটা ফ্লোর আছে। রেস্তোরাঁটা বেসমেন্টে না গ্রাউন্ড ফ্লোরে, না ফার্স্ট ফ্লোরে! কে জানে। ছোটখাটো সুন্দর একটা লিফ্ট সুটসাট ওঠা নামা করছে। রেস্তোরাঁটা তারের জালের দরজা ঘেরা। পরিচ্ছন্নতা তো এসব দেশের সহজাত গুণ। সে কথা আর না বলাই ভালো। বারে বারে এক কথা বললে সবাই ভাববেন আদেখলে। প্যাচপ্যাচে জল নেই, ভ্যাটভ্যাটে নর্দমা নেই, ভ্যানভ্যানে মাছি নেই। ভেতরে সারা দেশের সাংবাদিকের জমায়েত। রেস্তোরাঁটি মহিলা পরিচালিত। সবাই মনে হয় গোয়ানিজ। ধোপ দুরস্ত পোশাক। মুখে ছড়িয়ে আছে মিষ্টি হাসি। দু'পাশে দুটো সার্ভিস কাউন্টার। মাঝখানে বাইরের দিকে কফি কাউন্টার। ঢাউস একটা কল লাগানো পাত্রে গরম কফি। তার পাশে থাকে থাকে সাজানো পেপার গ্লাস, বোনচায়নার কাপ প্লেট। আর সাজানো কয়েক শো রকমের কেক আর প্যাসট্রি। ডান পাশের কাউন্টারে অন্যান্য খাদ্য বস্তু। বাঁ পাশের কাউন্টারে জল আর বিয়ার। সেল্‌ফ সার্ভিস। কফি টেব্‌লের বাঁ পাশে একটা চেয়ারে বসে আছেন মহিলা ম্যানেজার। তাঁর কাছে পয়সা জমা দিয়ে, খাবার নিয়ে টেব্‌লে চলে যাও।

কুমকুম বললে, 'দাদা, কি খাবে বলো?'

'মিষ্টি খাবো না।'

'তা হলে দাঁড়াও দেখি ওই কাউন্টারে কি পাওয়া যাচ্ছে।'

কাউন্টারের ডান পাশের দেয়ালে একটা কাগজ সাঁটা। সেটা একটা খাদ্যতালিকা। তার প্রথম আইটেমটা হলো হ্যামবার্গার। হ্যাম চলবে না। ওরই মধ্যে একটা পদের নাম, টার্কি স্যালাড।

'কুমকুম, টার্কি স্যালাড লাগাও।'

'দাঁড়াও, তুমি দাম দেবে না, আমি দোবো।'

দু প্লেট টার্কি স্যালাড সংগ্রহ করা গেল। সুন্দর করে কুঁচনো সবজির মধ্যে রোস্ট করা মুরগীর ঠ্যাং গোঁজা। মুরগী না বলে মুরগীর দাদা বলাই ভালো। প্লেট হাতে আমরা একটু বিব্রত। বসার জায়গা নেই। অত বড় একটা আয়োজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেরে দেওয়াও যাবে না। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কোনও টেব্‌লেই জায়গা নেই। সুন্দর সুন্দর চেহারার শ্বেতকায় নারী-পুরুষ, হাসছে, খাচ্ছে, হাত পা নেড়ে কথা বলছেন। মেয়েদের পরিধানে জিনের প্যান্ট, শার্ট। সোনালি রঙের চুলে যেন আগুন লেগে গেছে। মনে হচ্ছে স্বর্গ-সভা। বিশাল বুদ্ধিজীবী সমাবেশ। কেন জানি না, ওই অসাধারণ দৃশ্য দেখে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল অষ্টাদশ শতকের কবি উইলিয়াম ব্লেকের কবিতার লাইন:

I care not whether a man is Good or Evil :
all that I care
Is whether he is a wise man or a fool
Go! put off Holiness
And put on intellect.

সারা ঘরে শুধু সুখাদ্য আর সুপক্ব কফির ঘ্রাণ নয় বুদ্ধিবৃত্তিরও ঘ্রাণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারতীয় ছাড়া সকলের সঙ্গেই সকলের বেশ ভাব ভালোবাসা হয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদারা কালোদের ঠেঙ্গাচ্ছে। এই লন্ডনেই এমন জায়গা আছে যেখানে হয় তো নিত্য পেটাপিটি হচ্ছে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ভারতীয় কি পাকিস্তানীদের বাগে পেলেই ইংরেজ যুবকরা বৃন্দাবন দেখিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু এই সুরম্য, উষ্ণ ভোজনালয়ে দৃশ্য অন্য রকম। একাধিক অশ্বেতাঙ্গ মহিলা সাংবাদিক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সাংবাদিকদের সঙ্গে জটলা করছেন। কানে আসছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা। এই হলো ইনটেলেক্টের মহিমা। হোলিনেসের প্রয়োজন নেই। যীশু হতে হবে না, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য হবার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিবৃত্তি পরিধান করো। দেশে দেশে নেতারা অ্যাটম বোমার চাষ না করে, বুলেটের ফসল না ফলিয়ে সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করে যদি বুদ্ধির চাষ করতেন পৃথিবীর চেহারা অন্য রকম হয়ে যেত। গদির স্বার্থে তা করার উপায় নেই। লর্ড ব্রুহামকে মনে পড়ছে। অষ্টাদশ শতকের মানুষ। বলেছিলেন, মানুষ শিক্ষিত হলে, তাকে সহজে পথ দেখিয়ে পরিচালনা করা যায়; কিন্তু লাগাম পরিয়ে হ্যাট হ্যাট করে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। সহজে শাসন করা যায়; কিন্তু ক্রীতদাস করা যায় না।

এই সব জ্ঞানের কথা ভাবার সময় নয়; লক্ষ্মণের ফল ধরে দাঁড়িয়ে আছি হাঁ করে। আমাদের বসা দরকার। একেই বলে ইওরোপীয় ভদ্রতা। সকলেই মনে হয় কথার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের দিকে চোখ রেখেছিলেন। দু'জন খুব তাড়াতাড়ি গপাগপ খাওয়া শেষ করে, আমাদের ডাকলেন—'আসুন আসুন, এইখানে এসে বসুন।' নিজেদের প্লেট দুটো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কুমকুমের কি হলো জানি না, আমি খুব অবাক হয়ে গেলুম। কতটা মার্জিত হলে মানুষের মধ্যে এমন সচেতনতা আসে! দু'জনেই বয়েসে তরুণ। গ্রীক ভাস্করের খোদাই করা মুখের মতো মুখ। বলিষ্ঠ, দৃপ্ত। বড় বড় চুল। পোশাক যেমন তেমন। হাসতে হাসতে তাঁরা আমাদের জায়গা ছেড়ে দিলেন।

আমাদের উল্টো দিকে যে দু'জন বসেছিলেন, তাঁরা হাসি মুখে আমাদের স্বাগত জানালেন। আমাদের বুকে লটকানো পরিচয় লিপির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উইথ দি ডাইনামিক প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া?'

'ইয়েস।'

ওঁরা দুজন আমেরিকার সাংবাদিক। খাওয়ার গতি দেখে মনে হলো, একটা মিনিটও বাজে নষ্ট করতে চান না। প্রতি মুহূর্তে বিজবিজ করে সংবাদ অঙ্কুরিত হচ্ছে। সেই সব সংবাদ টেলিপ্রিন্টারকে খাওয়াতে হবে। ও সব দেশের পত্রপত্রিকার যা গতর। সকালে আমাদের হোটেলে সানডে টাইমসের আয়তন দেখে মাথা ঘুরে গেছে। গোটা কাগজটা একদিনে কেন একমাসেও পড়ে শেষ করা যাবে না।

আমাদের এই টার্কিশ স্যালাড বস্তুটি বেশ উপাদেয়। এমন বিলাইতি খাদ্য আগে কখনো খাই নাই। টার্কিশ নামটা শোনা ছিল। ছবিও মনে হয় দেখেছি, আর ব্যবহার করেছি টার্কিশ টাওয়েল। যাকে বলে হোলসাম ফুড, এ বস্তু হলো সেই জিনিস। টার্কিশের ঠ্যাং যে টার্কিশ টাওয়েলের মতই নরম, তা আমার জানা ছিল না। তেমনি সুস্বাদু। প্রায় হতবাক হয়ে যাবার মতো অবস্থা। খরগোশের মতো ঝুরোঝুরো কপির পাতা লেটুসের পাতা চিবোচ্ছি আর থেকে থেকে ঘ্যাঁক করে কামড় মারছি, সেই অসহায়, দগ্ধ প্রয়াত পক্ষীটির ঠ্যাঙে।

এত পেল্লায় খাবার আমাদের দু'জনের কেউই পুরোটা খেতে পারলুম না। কুমকুম বীরাঙ্গনা হতে পারে, তবে বীরভোক্তা নয়। উঠে গেলুম কফি আনতে। নিজের কফি নিজে আনার মতো ঝকমারি কাজ আর দুটো নেই। যাইহোক, কফি তো নিয়ে এলুম। ছলকে ছলকে পড়েছে কিছুটা প্লেটে। কোনও কিছুর বারে বারে প্রশংসা করা ঠিক না; তবু এই কফির কথা না বলে পারছি না। আমাদের দেশে বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানিটি যে বস্তু ইনস্ট্যান্ট নাম দিয়ে বাজারে পরিবেশন করেন, তা নামে কাটে।

ভারতের বাজারে যেহেতু কোনও কম্পিটিশান নেই, সেই হেতু কোয়ালিটিরও কোনোও প্রশ্ন নেই। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের মানুষ হলো প্রথম ভাগের গোপালের মতো, অতি সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহা খায়। ভুলেও প্রশ্ন তোলে না, দাম তো দিন দিন বেড়েই চলেছে, মান কেন দিন দিন নামছে! হিন্দু ধর্মের সহিষ্ণুতা আর গীতার উদাসীনতা আমাদের কেমন যেন ভুতো বোম্বাই করে দিয়েছে। আমাদের যত আন্দোলন শোবার ঘরে। যত বিপ্লব এ বারান্দায় ও বারান্দায়। পরেশবাবুর টাক ফাটাবো, গণেশবাবুর বাপের নাম ভোলাবো। যে কোনও ছুতোয় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে খেস্তাখিস্তি করবো।

সেই আহামরি কফি আর টার্কিশ স্যালাড খেয়ে শরীরটা বেশ চনমনে হয়ে গেল। তখন মনে হলো এইবার একটু বাইরে বেরনো দরকার। তিনটে সাড়ে তিনটের আগে কিছু খবর আসবে বলে মনে হয় না। বাইরে কখন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এই হলো লন্ডনের আবহাওয়া। এই রোদ, এই বৃষ্টি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা, বৃষ্টির জলে ধুয়ে আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। লোকসংখ্যা এমনিই কম, বাথ ক্লাবের সামনের রাস্তায় পুলিশ আর সিকিউরিটির লোক ছাড়া কেউ নেই। আমরা স্যালভেশান আর্মির বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে, বার্ড কেজ ওয়াক ধরে মলে এলাম। সামনেই মার্লবরো হাউস। আবার একটু ফিসফিসে বৃষ্টি হয়ে গেল। যেন প্রেমিকা কথা বলে গেল কানে কানে। আমার গায়ে উইন্ডচিটার, মাথায় আবার সেই ফাউ টুপি। বৃষ্টি আমাকে ভেজাতে পারল না। ভিজিয়ে গেল কুমকুমকে। একটি ছেলের সামনে একজন মেয়ে ভিজবে, তাও আবার এই নাইট শিভ্যালরির দেশে! কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছে। স্যার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস তো পড়েছি, না কি! সেই নাইট, কি যেন তাঁর নাম ছিল লকিনভার, 'He rode all unarmed and he rode all alone. So faithful in love and so dauntless in war. There never was knight like the young Lochinvar.' সেই নাইট হয় তো এই মার্লবরো হাউসের সামনে দিয়েই আসা যাওয়া করতেন। তাঁদের তো আর অন্য কোনও কাজ থাকত না। যুদ্ধ আর প্রেম। প্রেম আর যুদ্ধ। ১৭১০ সালে বিখ্যাত স্যার ক্রিস্টোফার রেন এই আসাধারণ সুন্দর প্রাসাদটি তৈরি করেছিলেন। ভেতরটা এত সুন্দর যে কুইন ভিকটোরিয়া একদিন বেড়াতে এসে প্রাসাদের অধিকর্ত্রী ডাচেস অফ সাদারল্যান্ডকে বলেছিলেন, আমার কুটীর থেকে তোমার প্রাসাদে বেড়াতে এলাম গো। রানীর প্রাসাদ মার্লবরো হাউসের তুলনায় কুটীর মাত্র। এইখানেই বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী চপিন প্রিন্স অ্যালবার্ট আর মহারানী ভিক্টোরিয়াকে বাজনা বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন। এরই অঙ্গনে ল্যাংকাস্টার হাউস। মার্লবরো হাউসে এখন কমানওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট। ল্যাংকাস্টার হাউস এখন কনফারেনস সেন্টার।

ফিসির ফিসির বৃষ্টি পড়ছে। বাতাস বইছে ঝোড়ো। 'কুমকুম তুমি আমার উইন্ডচিটারটা নেবে?' আমি যেন নাইট লকিনভার। সুন্দরীকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে চাইছি। সো ফেথফুল ইন লাভ, সো ডন্টলেস ইন ওয়ার। সুন্দরী বললে, 'পাগল হয়েছ দাদা, আমি তো সোয়েটার পরে আছি।' তাহলে চলো তোমাকে একটা টুপি কিনে দি।'

'তুমি আমাকে টুপি পরাতে চাও?

মার্লবরো হাউসের উল্টো দিকের ফুটপাথে, যে ফুটপাথে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে একটা কাণ্ড চলেছে। একপাশে কিছু ইংরেজ। প্রত্যেকের হাতে ফেস্টুন। তাঁরা সমস্বরে গান গেয়ে চলেছেন। 'ডিসম্যান্টল অ্যাপারথিড। ডাউন উইথ অ্যাপারথিড, ফাইট অ্যাপারথিড, ফ্রি সাউথ আফ্রিকা।' দেখে বেশ ভালো লাগছে। সংখ্যায় কম হলেও, শান্ত, সংযত ইংরেজ নারী পুরুষের এই দলটির মানবিক চেতনা তাহলে জেগেছে? সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে, আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে ছুটে এসেছেন প্রতিবাদ জানাতে।

এই দলটির পাশেই সমবেত হয়েছে একদল শিখ মহিলা। এঁদের গলার জোর কিঞ্চিৎ বেশি। হাত পা ছোঁড়াছুঁড়িও বেশ প্রবল। সেই এক দাবি খালিস্তান চাই। এঁরা চাইছেন রাজীবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। ডাইনে বামে নির্বিচারে লিফলেট বিলি করে চলেছেন। অভারতীয়দের কাছে হয় তো কিছু নয়, ভারতীয়দের কাছে সেই লিফলেটের ভাব ও ভাষা অতি অপমানজনক। হিন্দুদের বিরুদ্ধে অকথ্য গালিগালাজ। তারা শয়তান, শিখরাই মর্তের দেবতা। সেই হ্যাণ্ডবিল পড়ে কুমকুম খুব রেগে গেছে। পারলে ঘুঁষোঘুঁষিই করে ফেলে। খালিস্তানীরা স্লোগান দিতে দিতে মাঝে মাঝে ফুটপাথ থেকে পথে নেমে পড়ছেন আর পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটন দিয়ে ঠেলে ফুটপাথে তুলে দিচ্ছেন। তুলকালাম কাণ্ড

চলেছে ঠিকই, তবে পুরো ব্যাপারটাই পুলিসের হাতের মুঠোয়। আন্দোলন করো; কিন্তু জনজীবনকে বিপর্যস্ত করা চলবে না। সামনের রাস্তা ঝঞ্ঝাট মুক্ত। বিনা হর্নে ছবির মতো গাড়ির পর গাড়ি চলেছে। বৃটিশ নাগরিকরা ভ্রূক্ষেপহীন। না তাকিয়ে পাশ দিয়ে যে যার কাজে চলে যাচ্ছেন। এ তো আর কলকাতা নয়। যেখানে জনজীবনকে নাকামি চোবানি না খাওয়ালে আন্দোলনই হয় না। মিছিলের ন্যাজের ঝাপটায় সব বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ের প্রসেসানে যানজট তৈরি হয়। খুলতে রাত কাবার। ঠাকুর বিসর্জন এক আতঙ্ক। সেখানে আবার প্রতিশ্রুতি, আসছে বছর আবার হবে।

কুমকুমের চুল আর সোয়েটার অল্প অল্প ভিজিয়ে বিলিতি বৃষ্টি অবশেষে থামল। এদেশের কেউই তেমন বৃষ্টিকে গ্রাহ্য করে না। বারে বারে এলে যা হয় আর কি! খাতির কমে যায়। যাঁরা ছাতা খুলেছিলেন, তাঁদের ছাতা বন্ধ হয়ে গেল। লণ্ডনের ছাতার চেহারা সব কেমন যেন। মুড়ে ফেললে মনে হয় কালো বকের মতো। এই মাত্র মেরে গলা ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশাল লম্বা একটা হাতলের মাথায় কালো কাপড় ছত্রাকার। ছত্রধারীর মাথার অনেক ওপর এই আচ্ছাদন শোভা পায়। ছাতা মাথায় দিলেও বোঝা যায়, কে টম, কে ডিক, কে জলি, কে শেলি। মুখ মাথা ঢেকে পালাবার উপায় নেই। পাওনাদার ঠিক ধরে ফেলবে।

একজন বিদেশী সাংবাদিক পটাস পটাস ছবি তুলছিলেন। ছবি তোলানোর ব্যাপারে খালিস্তানীরা বেশ সচেতন। যখনই ছবি উঠছে তখনই তাঁদের চিৎকারে আর হাত পা ছোঁড়া প্রবল হচ্ছে। ক্যামেরা এক শক্তিশালী হর্মোন। সেই সাংবাদিক অবশেষে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ক্যামেরার লেনসে ঢাকা পরাতে পরাতে বললেন, 'তোমরা হিন্দু?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আমরা হিন্দু।'

'তোমরা পোটেস্ট করছ না, এই সব যা তা প্রচার করছে।'

'হিন্দু ধর্ম অনেক সহ্য করেছে হাজার বছর ধরে, এইটুকু মিথ্যাও সহ্য করতে পাববে। গুড ডাইজেশানের নাম হিন্দু ধর্ম।'

সাহেব খুব খুশি হয়ে আবার লেনসের ঢাকা খুলে ফটাস করে আমাদের দু'জনের ছবি তুলে নিলেন। কোথায় কোন কাগজে আমরা দু'জনে বেরিয়ে বসে আছি কে জানে। হেডিং হয়েছে, ভালো হজমের নাম হিন্দু ধর্ম। হিন্দু ধর্ম ভেতর থেকেই কি কিছু কম ধাক্কা খেয়েছে! গোঁড়া নীতিবাগীশদের হাতে। স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে পুড়িয়েছে উত্তরাধিকার লোপাটের চেষ্টায়। প্রথম সন্তানকে জলে ভাসিয়েছে। উচ্চ বর্ণের অহঙ্কার নিম্ন বর্ণের মানুষকে শেয়াল কুকুর জ্ঞান করেছে। আবার শাসক সম্প্রদায়ের সিন্নির লোভে ধর্মান্তরিত হয়েছে। বিধবার সঙ্গে ব্যভিচার দোষ নেই, বিবাহের নামেই শাস্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

সায়েব একটা সিগারেট এগিয়ে ধরলেন। প্যাকেটের গায়ে লেখা মার্লবোরো। সামনে মার্লবরো হাতে মার্লবরো। সাংবাদিক ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে সামনে এগিয়ে গেলেন উত্তেজনার খোঁজে। এখন তো লণ্ডন একেবারে খবরে খবরে জমজমাট। জলের ওপর ব্যাঙাচির মতো লাফাচ্ছে। আবার রোদ উঠল। সেই বৃষ্টিধোয়া রোদে মার্লবরো হাউস যেন ঝকঝক করছে। ক্লান্ত ডিপ্লোম্যাটরা এখন মনে হয় লাঞ্চে বসেছেন। মেনুটা একবার জানতে পারলে হতো।

কুমকুম বললে, 'চলো দাদা, এ জায়গায় আর কোনও নাটক নেই।'

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পলমল ধরে চলে এলুম ওয়াটারলু প্লেসে। হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন এলো। কুমকুমকে প্রশ্নটা করেই ফেললুম, 'কুমকুম' লণ্ডনে কাক আছে?'

কুমকুম বললে, 'দাদা, তোমার মাথা বটে। পৃথিবীতে এত ভালো ভালো জিনিস থাকতে তুমি কাকের কথা ভাবছো!'

'না, মানে সকাল থেকে একটাও কাক চোখে পড়ল না। সায়েবদের দেশের কাক কালো হয়, না সাদা হয় জানার বড় ইচ্ছে।'

কুমকুম একটু ভেবে বললে 'অত কালো কি একেবারে সাদা হবে। আমার মনে হয় পাঁশুটে হবে। ছাই ছাই রং।'

আমার মনে হলো আবার আমরা হারাতে চলেছি। ওয়াটারলু প্লেস ছেড়ে আমরা চার্লস দি সেকেণ্ড

স্ট্রিটে চলে এসেছি। সামনেই হে মার্কেট। 'কুমকুম, আর এগিও না। এর পর হারিয়ে গেলে প্রেস-ব্রিফিং মিস করবে।'

সাংবাদিকতার ব্যাপারে কুমকুম খুব সিরিয়াস। আর মেয়েলিপনার ছিটেফোঁটাও নেই। এদিকে আমার অভিভাবিকা। আমার সাবধানবাণীতে ঘুরে দাঁড়াল, 'চলো তাহলে ফেরাই যাক।'

আমাদের পাশ দিয়ে একটা প্যারামবুলেটার চলে গেল। ফুটফুটে এক দেবশিশু ঘুমিয়ে আছে। মুষ্টিবদ্ধ একটি কচি হাত ঠোঁটের কাছে। শিশুর মাতাও ফুটফুটে সুন্দর। এ দেশের মেয়েদের পোশাক কি সুন্দর। শীতের দেশে সাজপোশাক করেও আনন্দ। শিশুটিকে দেখে মনে হলো, আমি এক দামড়া শিশু। কুমকুম যেন আমার মা। হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমার অবস্থা প্রায় সেই রকম। কোথা দিয়ে কোথায় চলেছি কে জানে।

চলতে চলতে আমার কেবলই মনে পড়ছে সেই সাংবাদিক দু'জনের সৌজন্যের কথা, যাঁরা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে আমাদের বসার জায়গা করে দিলেন। পাশাপাশি মনে পড়ছে কলকাতার কে. সি. দাশের একটা ঘটনা। একদিন জটলা করে দাঁড়িয়ে আছি। খালি হলে বসব। আমাদের মধ্যে একজন নজর রেখেছেন, কোন্ টেবিলে কি অবস্থা। একটা টেবিলে চা খাওয়া শেষ হয়েছে, আমার বন্ধু তাড়াতাড়ি এগিয়ে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে ডাকলেন, 'এই যে এদিকে আসুন, খালি হচ্ছে।' আমরা হুটপাট করে এগিয়ে গেলুম। দখলকারীরা মুখে মশলা ফেলতে ফেলতেও ফেললেন না। হেঁকে বললেন, 'দেখি, আর চার কাপ চা।' আমরা বোকা বনে আবার ফিরে এলুম দরজার কাছে।

২০

বেশী দিন নয়, শ খানেক বছর আগেও বাইরের জগৎ জানত না আফ্রিকার গহীন গভীরের রহস্য। দুঃসাহসী পর্যটক, ক্ষমতালোভী যোদ্ধা, সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরা সমুদ্রের তটভাগে ক্ষণিকের পদচিহ্ন রেখে ফিরে আসত। আফ্রিকার অলঙ্কার, আফ্রিকার গৌরব প্রকাশ পেত মাত্র দুটি শব্দে, 'ডার্কেস্ট আফ্রিকা।' সভ্য জগতের অজানা ছিল আফ্রিকার অন্তর্ভাগের মানচিত্র। যাঁরা সাহস করে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিলেন, দুর্গম অরণ্য আর দুর্দান্ত অরণ্যবাসীরা তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। অনেকে আর ফিরে আসেননি। রহস্যে রহস্য হ[illegible] গেছেন। পৃথিবীর সেরা একসপ্লোরার ডক্টর ডেভিড লিভিংস্টোনের কথাই ধরা যাক। আফ্রিকাকে জানাই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। শেষ চেষ্টা ছিল নীল নদের উৎস সন্ধানে। উৎসমুখে প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলেন। আর হাজারটা মাইল কোনও ক্রমে এগোতে পারলেই হয়ে যেত।

আফ্রিকার সঙ্গে লিভিংস্টোনের নাম এমন ভাবে জড়িয়ে আছে' ছেলেবেলায় আমাদের কাছে আফ্রিকার গল্প যেমন বিস্ময়ের ছিল, তেমনি বিস্ময়ের ছিল ডক্টর লিভিংস্টোনের অসাধারণ জীবন। স্কটল্যান্ডের ব্ল্যানটায়ারে জন্মেছিলেন এই দুঃসাহসী মানুষটি। ছেলেবেলায় লিভিংস্টোনকে মনে হতো অপ্রসন্ন, শান্ত, লক্ষ্যশূন্য একটি বালক। দেখতে শুনতে মোটেই ভালো ছিলেন না। কুৎসিত, কদাকারই মনে হতো। কথায় জড়তা ছিল। কিন্তু একটা গুণ সেই স্বল্প বয়সেই তার চরিত্রে ফুটে উঠেছিল, তা হলো স্থিরপ্রতিজ্ঞা, অভঙ্গনীয়তা। করবো .তা করবোই। নাছোড়বান্দা স্বভাব। সেই গুণের জোরেই তিনি অত বড় অনুসন্ধানকারী হতে পেরেছিলেন।

ওদিকে কমানওয়েলথ কনফারেন্স চলেছে, রাস্তার মোড়ে একই সঙ্গে দুটি দল গান গাইছে স্লোগান দিচ্ছে, এদিকে একদল সাংবাদিক হুটরপটর করছেন, আর আমি এক পাশে বসে ভেবেই চলেছি। আমার অদূরে বসে আছেন এক মহিলা আফ্রিকান সাংবাদিক। বারে বারেই চোখ চলে যাচ্ছে। ভারি সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। চোখ দুটো কি সুন্দর। সেই কালো, সে যত কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। এক একবার মনে হচ্ছে উঠে গিয়ে ভাব করি; কিন্তু লজ্জায় সাহস পাচ্ছি না। তার চেয়ে লিভিংস্টোনের কথাই ভাবি।

একটি সর্বকালে অনুকরণীয় চরিত্র। জীবনে কম সংগ্রাম করেছেন। আমি যদি অমন হতে পারতাম।

দশ বছর বয়সেই চাকরিতে ঢুকতে হলো। স্কটল্যান্ডের এক তুলোর কারখানায় ভোর ছটা থেকে রাত আটটা। আটটায় কারখানা থেকে বেরিয়ে ইভনিং ক্লাস। ধর্মনিষ্ঠ খ্রীস্টান পরিবারের সন্তান ছিলেন লিভিংস্টোন। সেই সুবাদে যখন তাঁর বয়েস পঁচিশ তখন লন্ডন মিশনারী সোসাইটি লিভিংস্টোনকে প্রাথমিক কোর্সে ভর্তি হবার সুযোগ দিলেন। কিন্তু সুবিধে করতে পারলেন না। প্রচারক হিসেবে ব্যর্থ হলেন। এ সব জিনিস বিলেতেই সম্ভব, লিভিংস্টোন ডাক্তার হলেন। ভাবা যায়, আমাদের দেশের একজন শিল্প শ্রমিক, লাইন চেঞ্জ করতে করতে অবশেষে যশস্বী ডাক্তার হয়ে গেলেন। এ দেশে জীবন গঠনের সে সুযোগই নেই। লক্ষগণ্ডা বিধি-নিষেধ।

ডাক্তারি পাশ করার পর তাঁকে যাজকশ্রেণীভুক্ত করা হলো। লিভিংস্টোন পাড়ি জমালেন বিদেশে। প্রথমে তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিল মহাচীনে। সেখানে তখন যুদ্ধ চলেছে। লন্ডন মিশনারী সোসাইটি তাঁকে পাঠালেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৮৪১ সালে লিভিংস্টোন নামলেন কেপটাউনে। কেপটাউনে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা ইংরেজ ধর্মপ্রচারক ডক্টর জন ফিলিপের সংস্পর্শে এলেন।

সমুদ্র ধরে তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে আফ্রিকার এখানে ওখানে বিদেশী শক্তি বহু আগে থেকেই পা রেখেছে আবার পা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছবার আগেই পর্তুগিজরা কেপ অফ গুড হোপ ঘুরে গেছে। সমুদ্রের তীরেই তারা আস্তানা গেড়েছিল। ভেতরে ঢোকারও চেষ্টা করেছিল। সফল হয় নি। মারও খেয়েছিল দুতরফা। দুর্ভেদ্য অরণ্য। শ্বাপদসঙ্কুল জলাভূমি। ভয়ঙ্কর মারমুখী আফ্রিকার আদিমানব।

আমার সামনে যে আফ্রিকান মহিলা সাংবাদিক বসে আছেন সুশিক্ষিতা, সুবেশা, তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় আফ্রিকা সভ্যতার বিকাশে কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছে। বাইরের আক্রমণে খারাপ যেমন হয়েছে, ভালোও তেমনি হয়েছে। প্রকৃতি বহু শতাব্দী ধরে আফ্রিকাকে দুর্গম করে রেখেছিল। উত্তরে সাহারার মরণফাঁদ। অতি দক্ষিণে সুমদ্রের তটভাগে সেঁতসেঁতে, অস্বাস্থ্যকর। তটভূমি ক্রমশ উন্নত হতে হতে মধ্যভাগে যে উপত্যকা বচনা করেছে সেখানে পৌঁছোনোও সহজ ছিল না। দুরন্ত নদীর কাটাকুটি। স্রোত এত প্রখর যে নৌকো ভাসানো চলে না। সর্বোপরি আদি বাসিন্দাদের প্রতিকূলতা। ফারোয়াদের আমল থেকেই তারা জানত, বিদেশীদের আগমন মানেই ক্রীতদাস হবার ইঙ্গিত। ধরবে, চাবকাবে, জাহাজের খোলে ভরে চালান করে দেবে শৃঙ্খলিত ভবিষ্যতের দিকে।

দুর্গম, বিপদসঙ্কুল, পথে পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা পৌঁছোবার পুরস্কার সেই সময় এতই অনিশ্চিত ছিল যে কেউই তেমন উৎসাহ পেত না। একমাএ দূর দক্ষিণের অন্তর্ভাগেই ইওরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল, তাও সেখানে ইওরোপীয়দের আস্তানা পড়েছিল ইংরেজ আর বোয়ারদের ঝগড়ার কারণে। ১৮৩৫ সালে শুরু হয়েছিল সেই দুর্গমের অভিসার।

এই ইতিহাস আমরা শুনছি ইওরোপীয়দের মুখ থেকে, তা কতটা সত্য। ইতিহাসের এই ইওরোপীয় ভার্সান! এই গুপ্ত, অন্ধকার আফ্রিকার নিজস্ব একটা সংস্কৃতি অবশ্যই ছিল। চাষবাস তো ছিলই। পশুপালনে রপ্ত ছিল আফ্রিকাবাসী। খনিখননবিদ্যা আয়ত্তে ছিল। তামা আর লোহা গলানোর কৌশলও জানা হয়ে গিয়েছিল সেই দূর অতীতে। হাজার বছর আগে পশ্চিম আফ্রিকায় শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। জিম্বাবোয়েতে যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই ঐতিহাসিক রহস্যের সমাধান আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। সুপ্রাচীন কোনও অবলুপ্ত সভ্যতার স্মৃতি।

মানুষ বড় লোভী। মানুষের মতো অসন্তুষ্ট প্রাণী জীবজগতে আর দ্বিতীয় নেই। আফ্রিকা আফ্রিকায় আফ্রিকার মতো থাকলে কি ক্ষতি ছিল! নীলনদ বেয়ে ইজিপসিয়ানদের আফ্রিকায় ঢোকার কি প্রয়োজন ছিল। খ্রীস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে ইজিপ্টের সাহসী বীরেরা নীলনদ দিয়ে নেমে এল আফ্রিকার দক্ষিণভাগে। তারা 'কুশ' অবধি এগোতে পেরেছিল, যেখানে দীর্ঘদেহী নুবিয়ানদের বসবাস ছিল সেই সময়। সেখান থেকে নৌকো বোঝাই করে তারা নিয়ে আসত আফ্রিকার বিখ্যাত কালো আবলুস কাঠ, নিয়ে আসত হাতির দাঁত আর সুদেহী কর্মঠ কৃতদাস। কৃতদাসই বলি; কারণ তখন তো কেনার প্রশ্ন ছিল না, তখন ছিল ধরার প্রশ্ন।

সমুদ্র যখন মানুষের বশে এল তখন শুরু হলো আরও বড় রকমের অভিযান। ঠিক আড়াইশো বছর পরে খ্রীস্টের জন্মের দু হাজার সাতশো পঞ্চাশ বছর আগে জাহাজ ভিড়ল 'ল্যান্ড অফ পান্টের'

কূলে। মানচিত্রে এ পরিচয়ে কোনও দেশ নেই। অনুমান, লোহিত সাগর যেখানে শেষ হচ্ছে, সেইখানে ছিল এই 'পান্ট'। সোমালিয়ারই একটি অঞ্চল। সমুদ্র সড়গড় হয়ে যাবার পর ইজিপ্টের লোভী জাহাজ বারে বারেই আসতে লাগল এই অঞ্চলে। সে ছিল এক মজার দেশ। ছিল বলি কেন! দেশ তো আর প্রাণী নয়, যে মরে যাবে! আছে অন্য নামে। এখানে পাওয়া যেত এক ধরনের গাছের আঠা। অপূর্ব যার সুগন্ধ। আর পাওয়া যেত মহামূল্যবান কাঠ। তখন সেই অঞ্চলে ছিল উন্নত সভ্যতা। ইজিপ্টের প্রথম মহিলা ফারোয়া রানী হ্যাটশেপসুট পান্টে একবার পাঁচ পাঁচটি জাহাজ পাঠিয়েছিলেন। সেখানকার নিগ্রো শাসক সমুদ্রের বেলাভূমিতে ইজিপসিয় অতিথিদের পান-ভোজনে আপ্যায়িত করেছিলেন। রেড সি বেয়ে জাহাজ ফিরে এল, নিয়ে এল জাহাজ বোঝাই সুগন্ধী নির্যাস আর নিয়ে এল হাতি। উটের দেশে হাতি এসে ঢুকল। সেই হাতিকে পোষ মানিয়ে ইজিপসিয়ানরা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতে শুরু করল।

খ্রীস্টের জন্মের পনের শো বছর আগে থেকে শুরু করে প্রায় চারশো বছরে ফারোয়ারা সাম্রাজ্য বিস্তারের শীর্ষে উঠেছিলেন। উঠেছিলেন সভ্যতার তুঙ্গে। 'কুশ' তাঁরা দখল করে ফেলেছিলেন। নুবিয়ার রাজধানী নাপটা থেকে বেশ কয়েকবার অভিযান চালিয়েছিলেন আরও দক্ষিণে। আফ্রিকার অন্তর্ভাগের সঙ্গে উন্নত ইজিপসিয়ান সভ্যতার যোগাযোগে আফ্রিকার ক্ষতি যেমন হয়েছিল ভালোও তেমনি হয়েছিল। কিন্তু খ্রীস্টের জন্মের সাতশো পঁচিশ বছর আগে 'কুশ' আবার স্বাধীনতা ফিরে পেল। শুধু ফিরে পেল না, দখলকারীদের চেয়ে হয়ে উঠল শক্তিশালী। ইতিহাসের চাকা কার হাতে তা জানি না। মানুষের হাতে না ভগবানের হাতে। অদ্ভুত তার গতি! কুশের রাজা পিয়ানখি বিশাল ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন ইজিপ্ট। ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক এলাকা এসে গেল তাঁর দখলে। এতকাল সব অভিযানের মুখ ছিল আফ্রিকার দিকে এইবার হলো উল্টো। আফ্রিকার মধ্যভাগ থেকে বিজয়ী বাহিনী ছুটে গেল সীমানা অতিক্রম করে বাইরের দিকে। সত্তর বছর ধরে নুবিয়দের দাপট চলল মিশরের বুকে। সব কিছুরই শেষ আছে। সত্তর বছর পরে আসিরিয়রা ঢুকলো ইজিপ্টে। ঠেলে বের করে দিল নুবিয়দের। 'কুশে'র অধিবাসীরা ওপরের চাপে ঠেলা মারল নিচের দিকে। আফ্রিকার আরও গভীরে তারা ছড়িয়ে পড়ল। রাজ্যের সীমা একালের খার্টুম অতিক্রম করে ছড়িয়ে গেল আরও দূরে।

বসে বসে এই সব ভাবছি; আর দেখছি সংবাদ শিকারীদের চঞ্চলতা। ঢুকছেন, বেরোচ্ছেন। ক্লোজড সার্কিট টিভির পর্দায় একের পর এক ঘোষণা আসছে, চলে যাচ্ছে। বেশ আরামে বসে মজা দেখছি। পর্দায় ঘোষণা হলো কিছু পরে ল্যাঙ্কাস্টার হাউসে প্রেস-কনফারেন্স হবে। মিটিং চলবে। ননস্টপ চলতেই থাকবে। তারই মাঝে উঠে আ-:বেন যে কোনও একজন রাষ্ট্রপ্রতিনিধি, এসে আমাদের জানিয়ে যাবেন, 'ডেজ প্রোসিডিংস।'

উঠে গিয়ে আমরা দু'জনে দু গেলাস ক ফি খেয়ে এলুম। লন্ডনের আবহাওয়ায় চায়ের চেয়ে কফিটাই ভালো।

এদিকে আফ্রিকার ইতিহাসের পাতায় ফনিসিয়ানদের অভিযান শুরু হয়ে গেছে। যাদের বলা হয় সমুদ্রের যাদুকর। 'উইজার্ড অফ দি সি'।

সেই আফ্রিকান মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। সেই জন্যেই শাস্ত্র বলেছেন, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। মেয়েটিব ভারি সুন্দর নাম, সুসান। সুসান আমেরিকায় লেখাপড়া শেষ করেছে। রাজনীতিই তার বিষয়। ইাংগ্রাসের খবর খুব একটা রাখে না। সাহিত্যের খবর রাখে। দক্ষিণ আফ্রিকার লেখকদের নাম গড়গড় করে বলে গেল, ফ্রাঙ্ক ব্রাউনলি, অ্যানথনি ডিলিয়াস, পলিন স্মিথ, উইলিয়াম প্লোমার, পিটার অ্যাব্রাহামস, জ্যাক কোপ, কেসি মোতসিসি, রিচার্ড রাইড, বেসি হেড, রোজ মস।

লেখক লেখিকাদের এই সব নাম শুনতে শুনতে আমার একটি আন্দোলনের কথা মনে পড়ে গেল। জেয়ারের প্রথম সারির নেতা মোবুতু সেসে সেকো এই নামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। খ্রীস্ট ধর্ম আর ইসলাম ধর্ম শুধু দেশ নয় মানুষের নামকেও গ্রাস করে তার জাতীয়তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। নাম শুধু মানুষকে সনাক্তকরণে সাহায্য করে না, তার জাতি, ধর্ম, আদর্শ, ঐতিহ্য, সংস্কার, লিঙ্গ সবই বোঝায়। এই যে সুসান, এই খ্রীস্টান নাম থেকে আমি এইটুকু বুঝতে পারছি, কোনও

এক সময়ে তার পূর্বপুরুষ ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তার আসল জাত কি, ভাষা কি ছিল, কি ছিল তার আদিধর্ম। আফ্রিকায় বাইবেল আর কোরাণ ঢোকার আগে প্রতিটি মানুষের তার নিজস্ব জাতীয় নাম ছিল। তার পোশাকে নয়, তার নামেই ছিল সমগ্র পরিচয়। তার জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ফুটে উঠত নামে। কত রকমের নাম—'চাগা' নাম, 'ল্যোরা' নাম, যেমন বাঙালী, বিহারী, মারাঠী, গুজরাটী, সেই রকম 'য়োরুবা' 'নেবেলে', ইসলাম আসার আগে 'সোমালী', 'জুলু'। নামেই প্রকাশ পেত তার সমাজের পরিচয়। আর সেইটাই ছিল আদর্শ ছাঁচ।

ইতিহাসের অন্য কোনও শক্তি নয়, খ্রীস্ট আর ইসলাম ধর্ম মানুষের নাম আর তার সমাজের বৈশিষ্ট্যের মাঝের যোগসূত্রটিকে ছিন্ন করে দেবার এক অদ্বিতীয় অস্ত্র। একমাত্র এই দুটি ধর্মই জোর করে বোঝাতে চেয়েছে, খ্রীস্টান নাম, ইসলাম নাম একটা আলাদা ব্যাপার। তুমি আগে কি ছিলে ভুলে যাও, ভুলিয়ে দাও। এই নামই তোমার ধর্ম, তোমার পরিচয়ের স্ট্যাম্প। সেমিটিক নাম, বেশির ভাগই ইওরোপের বা আরবের মাটি থেকে তুলে আনা। জন, জেমস, আলি, মুসা, পিটার, মহম্মদ। লক্ষ লক্ষ আফ্রিকাবাসীর এই হলো পরিচয়।

মোবুতুই প্রথম রুখে দাঁড়ালেন। এ হতেই পারে না, খ্রীস্টান নাম কখনও হেব্রেইক বা ইওরোপীয় নামের সমান হতে পারে না। খ্রীস্ট ধর্ম যদি বিশ্বধর্মই হবে তা হলে নামের বেলায় কেন ইওরোপীয়-হিব্রু ভাণ্ডার হাতড়াতে হবে! মোবুতুর চ্যালেঞ্জে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ভীষণ বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন। মোবুতু সমস্ত আফ্রিকাবাসীকে তাদেব পাসপোর্টে প্রকৃত আফ্রিকান নাম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্য কোনও আফ্রিকান নেতা এই প্রশ্ন তোলেন নি। তিনিই প্রথম দেশীয় নাম আর ইওরো-হেব্রেয়িক নামকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আফ্রিকার বহু দেশে সরকারী ফর্মে নাম লেখার জন্যে দুটো কলাম থাকে। প্রথম ঘরে লেখা হবে খ্রীস্টান নাম, দ্বিতীয় ঘরে পদবী। দুটোই বিদেশী পদ্ধতি। পশ্চিমের খ্রীস্টান নামের পুঁজি থেকে বেছে নিতে হবে নাম আব পদবী হবে আফ্রিকান যেমন, জুলিয়াস নেয়েরেরে, কেনেথ কউন্ডা, মিল্টন ওবোটে, জোসুয়া নোকোমা, রবার্ট মুগাবে, নেলসন ম্যান্ডেলা, ওমর বোঙ্গো, আবুবকর মাযাঞ্জা। প্রথম সারির নেতাদের নামেও এই জগাখিচুড়ি। কিছু আফ্রিকান নেতা অবশ্য দুটো নামকেই দেশজ করে নিয়েছেন। নাম আর পদবী। যেমন, নামদি আজিকিন্ডয়ে, ওবাফেমি আওলোও, আর মোবুতু সেসে সেকো নিজে।

অন্যদিকে কারুর নামের পুবোটাই হয় সেমেটিক না হয় ইওরোপীয়ান। লাইবেরিয়া আর সিয়েরা লিয়োঁর অংশ বিশেষে এই প্রথা বর্তমান কারণ সেখানে মুক্ত ক্রীতদাসদের বসবাস। তারাই ইওরোপ থেকে ইওরোপীয় নাম আর পদবী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। লাইবেরিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের পত্তনের কাল থেকেই ইওরোপীয়ান পদবী। যেমন 'ডো'-র নিজের পদবী। আধুনিক দু'জন আফ্রিকান নেতার নাম ও পদবী দুটিই মুসলমানী, যেমন নাইজেরিয়ার মুরতালা মুহম্মদ, সর্বত্র যাঁর প্রশংসা। আর একজন উগান্ডার ইদি আমিন, সর্বত্র যাঁর নিন্দা।

পর্তুগীজরাও নামের ওপর ছাপ ফেলে গেছে। পর্তুগীজ পদবী আছে, পর্তুগীজ খ্রীস্টান নামও আছে। আঙ্গোলা আর মোজামবিকের দুই প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতির নাম, আগোস্টিনহো নেটো, সামোরা মাচেল। পর্তুগীজ শাসিত অধুনামুক্ত অঞ্চলের বহু আফ্রিকানের পদবী ডিসুজা, পেরেইরা, ডা কোস্টা প্রভৃতি।

সুসানকে দূর থেকে যতটা অ্যাংলিসাইজড মনে হয়েছিল কাছে আসার পর ধারণা বদলাতে হলো। ঘরোয়া বাঙালী মেয়ের মতো সেই মিষ্টি হাসি। কথায় কথায়, ও মা, তাই না কি বলতে চায়, ভাষাই বাধা, বলে, আই সি, ইজ ইট, হাউ ফানি। হাসিটিও ভারি সুন্দর। শুনলে মনে হয়, এত হাসি আছে, এত প্রাণ আছে, এত গান আছে।

পর্দায় ঘোষণা হলো, এইবার প্রেস ব্রিফিং হবে, ল্যাঙ্কাস্টার হাউসে। সুসান আঙুল তুলে বললে, নাও ইট কামস। ল্যাঙ্কাস্টার হাউসে যেতে গেলে আর এক দফা সিকিউরিটির ছাড়পত্র চাই। আমি আর কুমকুম নেমে এলাম পথে। ওল্ড বাথ ক্লাব থেকে ল্যাংকাস্টার হাউসের দূরত্ব বেশি নয়। পিনাক সাহেব এবার ছোট একটা টিকিট দিলেন। লাল রঙ। মাঝখানে ইউনিয়ান জ্যাক। বৃটিশ সিংহ হুঙ্কার ছাড়ছে। ছোট্ট করে লেখা সিকিউরিটি। বুকে তখমার ওপর তখমা ঝুলছে, তার পাশে বাটান-হোল

রোজের মতো এই বিশেষ ডেকরেশান।

হাল্কা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাল গাছের মতো লম্বা, মোমের মতো সাদা পুলিসদের লোহার টুপিতে শিশিরের মতো বিলিতি বৃষ্টির মিহিদানা কাশীর চিনির মতো জড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে তাঁরা হাসছেন মুচকি মুচকি, কিন্তু সে হাসিতে জড়িয়ে আছে সাম্রাজ্য হারানোর করুণ বেদনা। এক সময় এদেশে আমাদের কম ঠ্যাঙান ঠেঙিয়েছে। ভারতবর্ষের অবস্থাও তো এক সময় আফ্রিকার মতোই ছিল। তবে সুপ্রাচীন হিন্দু সভ্যতাকে হাজার চেষ্টা করেও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

লিট্‌ল সেন্ট জেমস স্ট্রিট ধরে আমরা কিছু দূরে এগিয়ে ডান দিকে বাঁক নিতেই দেখি রাস্তার ওপর রেলের লেভল ক্রসিং-এর মতো গেট পড়েছে। অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সিকিউরিটি বাহিনীর লোকজন। বুকে ঝোলানো স্পেস্যাল ওই পদক দেখে একে একে সবাইকে ছাড়ছেন। এই দেশটা মনে হয় মৌনীদের দেশ। কারো মুখে কোনও কথা নেই। শুধু অ্যাকসান। ডিসিপ্লিনটা এঁরা যেভাবে রপ্ত করেছেন তার সিকির সিকি যদি আমরা পারতাম তাহলে আজ কোথায় আমাদের উত্তরণ হতো!

সিকিউরিটি আমাদের ঠেলে দিল যে জায়গায় সেটা একটা সিমেন্ট বাঁধানো বিশাল বিশাল উঠান। সামনে এক বিশাল প্রাসাদ, সেই চত্বর আর সেই বিশাল প্রাসাদের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে আমার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা মনে পড়ছিল বারে বারে। সামনে ঝুঁকে সবাই হাঁটছেন। কালো হেলমেটে সাদা সান্ত্রী। কালো বেঁটে হাতল, বেঁড়ে নলঅলা বেশ ডাঁটো চেহারার মানুষ মারা অস্ত্র। আমাদের কারুর পিঠে ক্যামেরা, কারুর পিঠে ঝোলা। এই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল ৪২'-এর সাইরেন বেজেছে, আমরা সব রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বৈমানিক, গুড় গুড় করে ছুটছি টারম্যাকে দাঁড়িয়ে থাকা বিমানের দিকে। অ্যালুমিনিয়ামের ডানায় পিটিরপিটির বৃষ্টি বিষণ্ণতার রেণু হয়ে ঝোড়ো বাতাসে উড়ছে।

ল্যাঙ্কাস্টার হাউস নামটাই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে ল্যাঙ্কাস্টার বম্বারের কথা। অ্যাভরো ৬৮৩ ল্যাঙ্কাস্টার প্রথম আকাশে পাখা মেলেছিল ১৯৪১ সালের ৯ জানুয়ারী। ৪২'-এর যুদ্ধের আকাশে ল্যাঙ্কাস্টার অ্যাভরো হিরো। মহা মহা ঘটনার মহাকুশলী। উইং কম্যান্ডার গাই গিবসনের পরিচালনায় 'ড্যামবাস্টারস রেড' হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'এপিক'। চচ্চড়ে দিনের আলোয় ল্যাঙ্কাস্টারের ঝাঁক উড়ে গেল লা ক্রিউসটের জার্মান ঘাঁটির দিকে। ডুবিয়ে দিয়ে এল জার্মান রণতরী 'তিরপিৎজ'। ল্যাঙ্কাস্টার অ্যাভরোর কম ক্ষমতা ছিল! বারো হাজার পাউন্ড 'টলবয়' বোমা বাইশ হাজার পাউন্ড 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' বোমা বহন করার ক্ষমতা ছিল। ৪২ থেকে ৪৫-এর মধ্যে ল্যাঙ্কাস্টারের ঝাঁক ১৫৬০০০ বার আকাশে উঠেছে আক্রমণে। মোট ৬০৮, ০০০ টন বোমা ফেলেছে শত্রু এলাকায়। আকাশের এই বীর বৃটিশ গরুড় পক্ষী ১৯৫৬ সালে অবসর নিয়ে যুদ্ধ-যাদুঘরে বিশেষ প্রদর্শনী।

সেই 'হার্ডকোর্ট' ধরে হাঁটতে হাঁটতে নানা বিমানের মহা মহা নাম মনে পড়তে লাগল, হকার হারিকেন, গ্লস্টার গ্ল্যাডিয়েটার, ডগলাস ডাকোটা, সুপারম্যারিন স্পিটফায়ার, টাইগার মথ, মসকুইটো। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, মাথায় যেন শকুনি এসে পড়ল। আমার মাথাটা যেন তবলা, একসঙ্গে তিন জোড়া ওস্তাদ চতুর্দিক থেকে হাতুড়ি ঠুকে আমাকে সুরে বাঁধতে চাইছে। সঙ্গে জলতরঙ্গ হাসি।

২১

সেই বিশাল ইমারত, যার নাম ল্যাঙ্কাস্টার হাউস, তার দেউড়িতে পা রেখেই মনে হলো বাড়িটা আমার। দুশো বছর ধরে নানা কলোনির মাল মশলা হাতিয়ে দেশটাকে একেবারে জমিয়ে তুলেছে সায়েবরা। সোনা, দানা, হীরে, জহরত, যেখানে যা ছিল সব তুলে এনে লুঠে এনে, বিশাল প্রাসাদ, বিপুল ডেকরেশান। যা হবার খুব হয়ে গেছে এক সময়। এখন অবশ্য পড়তির সময়। এখন যা ছিল তা ধরে রাখার সাধনা চলেছে। আমাদের দেশের পড়তি রাজা-মহারাজাদের মার্বল প্যালেসে

ঝুল, ঝাড় লণ্ঠনে ধুলো, দেয়ালের পঙ্খের কাজে পানের পিক, এখানে সেটা নেই। এই যা তফাৎ। রাজত্ব শুকিয়ে এলেও মানুষগুলো শুকিয়ে যায় নি। হতাশায় পঙ্গু হয়ে পড়ে নি। প্রাণ নিয়ে ছটফট করে বেড়াচ্ছে। খাদ্য আর জল হাওয়ার গুণে বেশ তরতাজা।

আমার সেই সব দিনের কথা মনে পড়ছে। ভাইসরয় লর্ড কার্জন যখন বোম্বাইতে এসে নামলেন, লাল কার্পেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো তাঁর অবতরণের স্থান। যে পথ দিয়ে তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে গেলেন, সেই পথের দুপাশে অগণিত মানুষ আর সশস্ত্র সৈনিক। চারপাশে স্বর্ণছত্রের সমারোহ, প্রভুত্বের প্রতীক। দেশীয় মানুষ ঘব সংসার ছেড়ে ছুটে এসেছে মহাপ্রভুকে সমাদর জানাতে। ওদিকে গোরা-ব্যান্ড বেজে চলেছে—গড সেভ দি কুইন। কার্জন হয়তো শুনছেন, গড সেভ দি কিং। সেই রাতে কার্জনের সম্মানে ভোজ দেওয়া হলো। প্রায় হাজার দুয়েক অভ্যাগতের সমাবেশে কার্জনকে দাঁড় করানো হলো সোনার কার্পেটে। পবের দিন ভাইসরিগ্যাল ট্রেনে চেপে কার্জন যাত্রা করলেন রাজধানী কলকাতার দিকে। গোটা ট্রেনটাকে সাদা রঙ করা হয়েছে। কলকাতা সেই চিরকালের কলকাতা। রাস্তার দু'পাশে প্রায় লাখ দুয়েক লোকের ভিড়। ভাইসবয় দেখার জন্যে ছুটে এসেছে দিগ্বিদিক থেকে। ভাইসরয়ের গাড়ির আগে আগে চলেছে অশ্বারোহী সৈনিক, পিছে পদাতিক, ভাইসরযের দেহরক্ষী বাহিনী, শতাধিক তলোয়ারধারী, বল্লমধারী সৈনিক। ওদিকে গুড়ুম গুড়ুম তোপধ্বনি। স্ট্র্যান্ড রোড, হেস্টিংস স্ট্রিট, হেয়ার স্ট্রিট কেঁপে কেঁপে উঠছে। গড সেভ দি কুইন।

কলকাতার যে বাজভবন দেখে আমরা হাঁ হয়ে যেতুম, সেই রাজভবন সম্পর্কে লাট সায়েবের স্ত্রীর নানা অভিযোগ ছিল। গভর্নমেন্ট হাউস তৈরি হয়েছিল 'কেডলেসটন'-এর আদলে। আকাবে বড় হলেও জাঁকজমক আর সাজসজ্জায় একটু মাটো। ইটেব তৈরি তাব ওপর রং। 'কেডলেসটন' পুবোটাই ছিল পাথরে গড়া। কার্জন সাযেবের স্ত্রীব মতে গভর্নমেন্ট হাউস বেঢপ। তিনতলা কুৎসিত একটা কাঠামো। কেডলেসটনের এক একটা ঘব ছিল বিশাল, সুরম্য, সুদৃশ্য, সুসজ্জিত। কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসের ঘর সব আকারে ছোট। অন্ধকার। যেমন তেমন। কেডলেসটনের গম্বুজ ছিল দেখার মতো। অ্যাডামের বিখ্যাত সৃষ্টি। কলকাতার রাজভবনের সেই গম্বুজ একটা গুদামখানা। কার্জন সায়েবের স্ত্রী তাঁর বাবা-মাকে চিঠিতে লিখছেন, 'এর চেয়ে অখাদ্য আর অসুবিধেজনক বাড়ি আমি দুটো দেখিনি। এক প্রান্তে আমার ঘর আর আমার ছেলেমেয়েদের ঘর আর এক প্রান্তে। মাঝে দুস্তর ব্যবধান।'

মেরি যখন এই চিঠি লিখছেন, তখন তাঁব দুই সন্তান। একজনের বয়স তিন বছর, অন্যটির বয়স মাত্র ৬ মাস। মেবি লিখছেন, 'আমার ঘর থেকে তাদের ঘরে যেতে হলে, প্রথমে পেরোতে হবে একটা বারান্দা, পেরোতে হবে বিশাল একটা বসার ঘর, পেরোতে হবে কয়েক একর জায়গা জুড়ে তৈরি নাচঘব, তারপরে আবার একটা বসাব ঘর, সেটাও বিশাল, তারপর আরও একটা বাবান্দা, অবশেষে সেই ডে নার্সারি। রান্নাঘর থেকে বাড়ির সবচেয়ে কাছের অংশের দূরত্ব দুশো গজ। রান্নাঘবটা পড়েছে কলকাতার এক গলির দিকে। বান্নাঘর থেকে খাবার আনতে হয় ডিশে করে, কাঠের বাকসে পুরে, বাগান পেরিয়ে। সেই বাগানের গাছে গাছে ঝুলছে বাদুড়, থেকে থেকে শেয়ালের ডাকে চমকে উঠতে হয়, আর আছে সিভেট ক্যাট।'

সিভেট ক্যাট এক জাতের বেড়াল, যার পেটের থলি থেকে সেন্টে ব্যবহার করার নির্যাস পাওয়া যায়। সেন্টে সিভেট না দিলে গন্ধ স্থায়ী হয় না। এক বাতে চকচক শব্দে মেরির ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা থেকে ঘাড় তুলে দেখেন প্রায় ফুট পাঁচেক লম্বা একটা বেড়াল, তাঁর বিছানার পাশের টেবিলে রাখা এক গেলাস দুধ চুকচুক করে খাচ্ছে।

কি বেড়াল, কে জানে! পাঁচ ফুট লম্বা বেড়াল হয়! এত বছর কলকাতায় আছি চোখে পড়ল না!

কলকাতার রাজভবনের ভেতরের লন পর্যন্ত আমার দৌড়। গ্র্যাভেল ঢাকা পথে চলতে পা হড়কে যায়, এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। দরবার হলের ঝাড় লণ্ঠন দূর থেকে দেখেছি; কিন্তু ল্যাঙ্কাস্টার হাউসের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে গেলুম। সামান্য একটা বাড়ি মাথা ঘুরিয়ে দিলে। শুধু পয়সা ঢাললেই হয় না, ক্ল্যাসিক্যাল টেস্ট থাকা চাই। কলকাতার গলির গলি তস্য গলিতে থাকি, নাকে রুমাল দিয়ে পথ চলি, যৌবন উড়িয়েছি রকে বসে তেলেভাজা আর ডবল হাফ মেরে। দু' একটা জমিদার

বাড়ি দেখেছি। আমার তো তাক লেগে যাবারই কথা! লাল কার্পেট চলেছে তো চলেছেই চওড়া সিঁড়ির দিকে। এত চওড়া যে একটা মিছিল কি এক বাহিনী সৈন্য পাশাপাশি ওপরে উঠে যেতে পারে। সিঁড়ি কিছু দূর উঠে দুপাশে দুভাগ হয়ে গেছে। একটা বাঁ দিক দিয়ে আর একটা ডান দিক দিয়ে দোতলায় উঠেছে। লাল কার্পেট মোড়া কাঠের সিঁড়ি। দোতলায় গোল হয়ে ঘুরে গেছে বারান্দা। নিচে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে এক লহমার জন্যে ওপর দিকে তাকিয়েছিলাম। দৃষ্টি সোজা গিয়ে ঠেকল সর্বোচ্চ ছাদের ভেতর দিকে। সারা ছাদ জুড়ে অসাধারণ ফ্রেস্কো। কোন শিল্পীর কাজ তা জানি না। দেয়ালে দেয়ালে গিল্টির কাজ। সব যেন ঝলমল করছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তুই বেটা আম খেতে আমবাগানে ঢুকেছিস পেট ভরে আম খেয়ে যা। তোর কি দরকার হিসেবে, কটা ডাল আছে, প্রতি ডালে কটা আম আছে। আমার কিন্তু মনে মনে হিসেব শুরু হয়ে গেছে। এই যে কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার কার্পেট, ঝকঝক করে তাকিয়ে আছে, কারা ঝাড়ে, কি ভাবে ঝাড়ে, কতক্ষণ সময় লাগে! দেয়াল কে পরিষ্কার করে! কি ভাবে সাফা করে সোনার জলে আঁকা লতাপাতা। কোথাও এতটুকু ঝুল নেই। ঝাড় লণ্ঠনের ওই জটিলতায় কে ফুঁ দিয়ে ধুলো ওড়ায়!

এই সব হিসেব করতে করতে ঢুকে পড়লুম কনফারেনস রুমে। সর্বত্র বড় বড় শিল্পীদেখ আঁকা ছবি ঝুলছে। গিল্টি করা ফ্রেমে। সবই প্রেমোদ্দীপক ছবি। এক সময় এইটাই তো ছিল বিলাসকুঞ্জ। লর্ড, ব্যারন, ব্যারনেস, ডাচ, ডাচেসরা আসতেন। হুইস্কির ফোয়ারা। কোমর ধরাধরি করে বল নাচ। কোথায় গেল সেই সব দিন! রাজা আছে রাজত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গরা একটু বেশি প্রেমিক। দেহবাদী, আত্মাটাত্মার খোঁজ খবর রাখে না তেমন। ভোগবাদী। ইট ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি। পূর্বজন্ম বা পরজন্মের ধার ধারে না। কলকাতার বেলভেডিয়ারে হেস্টিংস সায়েব নাচতেন। এক ইংরেজ রমণীর অধিকার নিয়ে স্যাব ফিলিপ ফ্রানসিসের সঙ্গে ডুয়েল পর্যন্ত লড়ে গেলেন। লর্ড কার্জনও কিছু কম যেতেন না। মহিলাসক্তির জন্যে বেশ বিখ্যাত ছিলেন। শিকাব যখন অরণ্যে তখন বনপথে একা রমণীর মুখোমুখি হলে ছেড়ে কথা কইতেন না। বিশাল ইমারতেব করিডরে কোনোও সুন্দরী মহিলাব পাশ কাটিয়ে যাবাব উপায় ছিল না। কার্জন সায়েব একবার শিকার-পার্টিতে লর্ড আব লেডি এলকোব অতিথি হলেন। সেই দলে মিস বাফোর নামে এক মহিলাও ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাইসরয় কার্জন তাঁকে পাকড়াও করলেন। মধুর মধুর নানা কথা, শেষে একদিন একা পেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে···।

সেই একই ধারা নেমে এসেছে বর্তমান দশকেও। প্রোফুমো, কিলার, জেফ্রি আর্চার, মন্ত্রীসভার পতন, নতুন কিছু নয়। পিল কালচারের সাদা দুনিয়ায় মর‍্যালিটিব অন্য ব্যাখ্যা। কার্জন সায়েব স্ত্রী-বিয়োগের পর এলিনর গ্লিন নামক এক মহিলাকে রক্ষিতা রেখেছিলেন দীর্ঘকাল। যে ভদ্রলোক যৌবনে কবিতা লিখলেন :

> I sing of the attractions of the Belles
> London Belles
> Society Belles
> Of the manifold allurements of the Belles
> Oh what rhapsodies their charm deserves;
> How dilicious and delirious are the curves
> With which their figure swells
> Voluptuously and voluminously swells

তিনিই একদা হয়ে এলেন ভারতের দন্ডমুন্ডের কর্তা। চরিত্র আমাদের কাছে সব চেয়ে আদরের গুণ। কারণ আমাদের ঋষি ছিলেন মনু। আমরা যতই বাঁকা পথে চলার চেষ্টা করি লেজ আমাদের সোজা। আমাদের সংস্কারে ঢুকে আছে :

> ত্রৈবিদেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দন্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
> আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাশ্চ লোকতঃ॥

ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥

রাজাকে রাজধর্ম পালনের জন্যে নিজেকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করতে হবে। তিনি শান্ত, দান্ত হবেন, জিতেন্দ্রিয় হবেন। প্রজার হিতে রত থাকবেন। তিনি ত্রি-বেদজ্ঞ দ্বিজগণের কাছে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় অধ্যয়ন করবেন। দন্ডনীতি, তর্কশাস্ত্র, আত্মবিদ্যা ও বার্তাগ্রন্থাদির পাঠ নেবেন। রাজাকে দশ কামজ ও অষ্ট ক্রোধজ ব্যসন সযত্নে বর্জন করতে হবে। দশ কামজ ব্যসন কি কি? মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরচর্চা, কামিনী, মদ্যপান, বাদ্য, নৃত্যগীত আর বৃথা পর্যটন। আর অষ্ট ক্রোধজ ব্যসন কি কি? কুটিলতা, দুঃসাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, পরস্বাপহরণ, বাকপারুষ্য, অর্থাৎ অন্যের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ আর দন্ডপারুষ্য তার মানে অযথা তাড়না।

তা পৃথিবী জুড়ে গদিতে গদিতে যাঁরা সমাসীন ছিলেন বা এখনও আছেন তাঁদের ক'জনের এই সব গুণ ছিল বা আছে! কিং সোলোমনকে দিয়েই শুরু করা যাক। ডেভিড আর বাথসেবার পুত্র। ইস্রায়েলের তৃতীয় নৃপতি। চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল সাতশো। রক্ষিতার সংখ্যা ছিল তিনশো। এর পর নীল নদের দেশের রানী ক্লিয়োপেট্রার কথাই ধরা যাক। তিনি একটি মন্দির তৈরি করিয়ে সেখানে যুবক পুষতেন আর তাদের খাওয়াতেন উত্তেজক ওষুধ। এক রাতে একশো পুরুষের সঙ্গে সহবাস ছিল তাঁর কাছে নস্যি। মিশরের এই মহারানী অবশ্য ৩৮ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেছিলেন। সম্রাজ্ঞী থিওডোরা, তাঁরও অনেক গুণ ছিল। তিনি আবার একটি সমিতি করেছিলেন, 'দি প্রোটেকট্রেস অফ ফেথলেস ওয়াইভস'। সপ্তদশ শতকের শুরুতে আর এক রানী ধরাধামে এলেন, কুইন জিঙ্গুয়া। তিনি আবার করতেন কি ক্রীতদাস পুরুষদের ধরে এনে বিকলাঙ্গ করে দিতেন। কারণ, 'দি লেম বেস্ট পারফর্ম দি সেকস অ্যাক্ট।' দু'জন পাঠ্ঠা পুরুষে লড়াই বাঁধিয়ে দিতেন, যে জিততো তাকে নিয়ে যেতেন বিছানায়। তারপর সকালে তাকেও মেরে ফেলতেন। মাকড়সা রানী। এই শহরের পিকাডিলিতে, সকালে আমি আর কুমকুম যেখানে গিয়েছিলুম, সেই রাস্তায় ১৭২৪ থেকে ১৮১০ সাল পর্যন্ত বসবাস করে গেছেন এক ধনকুবের 'ডার্টি ওল্ড ম্যান' উইলিয়াম ডগলাস, থার্ড আর্ল অফ মার্চ', ফোর্থ ডিউক অফ কুইনসবেরি। সেই যুগের খুব ধনী আর ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। সারা দিন রাস্তার ধারের জানালায় বসে থাকতেন। পছন্দমত সুন্দরী মহিলা গেলেই, ঝিকে বলতেন ধরে আনো। যখন আশি পেরিয়ে গেলেন তখন রাজা পঞ্চদশ লুই-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে নিযুক্ত করলেন ভোগের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। ৮৬ বছর বয়সে মারা গেলেন গুরু ভোজনের ফলে। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেট আর এক উদাহরণ। টোঙ্গার রাজা দ্বিতীয় লাপেটামাকা। তিনিও এক ইতিহাস। ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুই এক ইংরেজ আইরিশ নর্তকী লোলা মন্তাজকে রাজত্বটাই দিয়ে দিলেন। লোলা রাজাকে একেবারে পাগল করে দিয়েছিল। এই লোলা একবার পোল্যান্ডের ভাইসরয়কে দূর করে দিয়েছিল, কারণ তাঁর দুপাটি দাঁতই ছিল বাঁধানো। লোলার জন্যে ব্যাভেরিয়ায় বিপ্লব হয়ে গেল। রাজাকে রাজত্ব ছাড়তে হলো। লোলা পালিয়ে গেল ইংল্যান্ডে। মাতাহারি কি কান্ডই না করেছিলেন সেই সময়। ১৮৭৬ থেকে ১৯১৭। এই সুন্দরী মহিলা ছিলেন জার্মানির গুপ্তচর। জন্ম হল্যান্ডে। ফাঁদে ফেলেছিলেন, সব মহা মহা রথীদের। ফরাসী মন্ত্রীসভার প্রধান জুল ক্যামব্রোঁ, জার্মানীর মুকুটধারী যুবরাজ, ডাচ প্রাইম মিনিস্টার, ডিউক অফ ব্রানসউইক। মাতাহারির জন্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার অ্যালায়েড সোলজারকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। অত প্রাচীন সভ্যতা মহাচীনের জেনারেল চ্যাং চুং চাংও কুখ্যাত ছিলেন। ১৮৮০ থেকে ১৯৩৫। তাঁকে বলা হতো 'ডগ মিট জেনারেল'। কুকুরের মাংস খেয়ে সম্ভোগ ক্ষমতা বাড়াতেন। রাজা ইবন-সউদ। রোমানিয়ার রাজা দ্বিতীয় ক্যারল তো গোটা-কতক মেয়েকে মেরেই ফেললেন।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এই হলো বিলিতি আর ইওরোপীয় রাজামহারাজার চরিত্র। আমি গীতার দেশের মানুষ। এই ল্যাঙ্কাস্টার হাউসের 'পম্প আর গ্র্যাঞ্জার'-এর চেয়ে আমার বটতলা হাটতলাই ভালো। আমার শান্তিনিকেতন ভালো। যে দেশে মন্দির নেই, মা কালী নেই, শ্রীচৈতন্য নেই, কৃষ্ণ বংশীধারী, ভোলামহেশ্বর নেই, আরতির শঙ্খঘণ্টা নেই, সে দেশের পরিবেশ বড় ম্লেচ্ছ। সে দেশে

ভারতীয় মন কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে ওঠে। জাঁকজমক, পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেখে কতক্ষণ আর চলে।

কনফারেনস হলের প্রথম সারিতে বসে আছি। সেই সারিতেই বসে আছে সুসান। আমার বাঁ পাশে কুমকুম। কুমকুম একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। পড়ারই কথা। ব্যাপারটা বড় এক ঘেয়ে। আমাদের সামনেই স্টেজের মতো একটা জায়গা। দেয়ালে ঢুকে আছে। বিশাল একটা ফায়ার প্লেস যেন। লম্বা ঝকঝকে একটা টেবিল। পেছনে সার সার চেয়ার। ইংরেজদের চেয়ার যেমন হয়। পেছনের ঠেসান দেবার জায়গাটা যাকে বলে ব্যাক-রেস্ট, বড় উদ্ধত।

দেখতে দেখতে সব চেয়ার ভরে গেল। ভরবেই তো। সাংবাদিক নিউজ এজেনসি আর ব্রডকাস্টিং নেট ওয়ার্কের প্রতিনিধিতে গিজগিজ করছে ঘর। অস্ট্রেলিয়া আছে, আছে বৃটেন, কানাডা, ভারত, জাম্বিয়া, জিম্বাবয়ে। এসেছেন এজেঁসে ফ্রাঁসে প্রেস, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, বিবিসি, ক্যানেডিয়ান ব্রডকাস্টিং, ক্যানেডিয়ান প্রেস, আই টি এন, প্রেস অ্যাসোসিয়েসান, রয়টার। সবাই কি ফ্রি, ফুল অফ কনফিডেনস। বিদেশী মেয়েরা, মেয়েলিপনার বেড়া ভেঙে আজ কোথায় চলে গেছে! শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাহসিকতায়। ভাবাই যায় না, এঁরা কোনও দিন মা হবেন। কোলে বাচ্চা, স্তনদায়িনী, ন্যাতা কাঁথা, ট্যাঁ ভ্যাঁ। একেই বলে ইমানসিপেসান। এক একজনকে তো বিশ্ব-সুন্দরী বলা চলে।

টেলিভিসান নেটওয়ার্কের টেকনিসিয়ানরা মাতিয়ে রেখেছেন। বিবিসি মনে হয় আলো ফিট করছে। সে এক এলাহি ব্যাপার। আলুমিনিয়ামের একটা মই এসেছে। সিলিং তো ভীষণ উঁচু। সদাহাস্য সুটেড বুটেড এক যুবক মই বেয়ে তরতর করে টঙে উঠে গেল। হাতল লাগানো হ্যালোজেন বাতি পটাপট ঝুলিয়ে দিল। নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষাকৃত প্রধান এক সায়েব তদারকি করছেন। তাঁর গলায় ঝুলছে আলো মাপার মিটার। ওপর নিচে রসিকতাও চলছে। প্রধান নবীনকে বলছেন, 'বেশি কারদানি দেখাতে গিয়ে পপাত হয়ো না।'

নবীন বলছেন, 'ডোন্ট ওয়ারি। আমার সারা শরীর অ্যানাটমি ধরে ধরে ইনসিওর করা আছে।'

আমাদের সবার পেছনে লম্বা একটা ডায়াস সেখানে মেশিনগানের মতো তেঠ্যাঙার ওপর সার সার ক্যামেরা। আইপিসে চোখ রেখে সব দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে পেছনে কথা চলেছে। আলো ঘোরাও আলো সোজা করো, বাঁয়ে একটু হেলাও। এই বাড়িতে ঢোকার সময় এই ক্যামেরা-স্ট্যান্ডই আমার মাথায় খুলে পড়েছিল। মনে হয়েছিল কেউ যেন সজনে ডাঁটা দিয়ে আমার মাথায় গাজনের ঢাক বাজিয়ে গেল। বেশ মনে আছে সরি বলে নি।

আমার অস্বস্তি হচ্ছে, অত সুন্দর সোনার জলে কাজ করা দেয়াল আলুমিনিয়ামের মইয়ের ঘষা লেগে নষ্ট হয়ে না যায়। দেখতে দেখতে মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে গেল, এখন কুশীলবদের আগমনের অপেক্ষা। সেই সকাল থেকে কমানওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সভা চলেছে তো চলেছেই। এইবার কিছু খবর আসার দরকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা পাবার পর যেই সিদ্ধান্ত নিল কমানওয়েলথে যোগ দেবে অমনি আধুনিক কমানওয়েলথের জন্ম হলো। এই কমানওয়েলথের প্রধান নীতিটা কি? নন-রেসিয়ালিজম। জাতিবৈষম্য বর্ণবৈষম্য ছিঁড়ে ফেল। পৃথিবী বিজ্ঞানে, মতবাদে, চিন্তায়, ভাবনায়, জীবনযাত্রার ধরনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সেখানে মানুষের গায়ের রঙ সুখ সুবিধা উপভোগে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। গায়ের রঙ মানুষ নিজে লাগায় না, প্রকৃতি লাগিয়ে দেয়। অস্ট্রেলিয়ার কাক সাদা, ভারতের কাক কালো। জেব্রার গায়ে ডোরাকাটা, ঘোড়ার গায়ে ডোরা নেই। মোঙ্গলিয়ানরা পীতবর্ণ, ভারতীয়রা শ্যাম, ইংরেজ ফ্যাকফ্যাকে সাদা।

সাদা কালো সব দেশের মানুষই স্বীকার করবেন আধুনিক পৃথিবীতে জাতিবৈষম্য বর্ণবৈষম্যের স্থান নেই। এক সময় যা হয়ে গেছে। ১৯৫৭ সালে স্বাধীন হবার পর ঘানা চলে এল কমানওয়েলথে। দেখতে দেখতে আফ্রিকা কারিবিয়া আর প্যাসিফিকের বিভিন্ন দেশ কমানওয়েলথের সদস্য হলো। জমজমাট সংগঠন। ১৯৬১ সালে এল শক্তির পরীক্ষা। দক্ষিণ আফ্রিকা আর দক্ষিণ রোডেসিয়ায় তখন যাচ্ছেতাই সব কান্ড ঘটে চলেছে। শ্বেতাঙ্গরা সেখানে দেশীয় মানুষের হাতে মাথা কাটছেন। সমস্ত সুযোগ সুবিধে কেড়ে নিয়ে অশ্বেতাঙ্গদের খাঁচার পশু করে তুলেছে।

এখান থেকে আমার ১৭৮৭ সালে পেছিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। ল্যাঙ্কাস্টার হাউসের মঞ্চে নাটক এখনও শুরু হয় নি। কনফারেনস্ চেয়ারম্যান বাহামার প্রধানমন্ত্রী স্যার লিনডেন পিশুলিং আর একটু পরেই আসবেন। এসে বসবেন ওই চেয়ারে। ততক্ষণ ইতিহাসের কনসার্ট চলুক। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মিশনারীদের একটা ঢেউ আফ্রিকার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাইবেল বনাম অন্ধকার। প্রথমে ভারত তারপর আফ্রিকা। মিশনারীদের উদ্দেশ্য ছিল দুটো। খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে দাস প্রথার বিলোপ সাধন। ১৭৮৭ সালে সিয়েরালিওতে সোসাইটি ফর দি অ্যাবলিশান অফ স্লেভারি বসতি স্থাপন করে কাজ শুরু করে দিল। বারো বছর পরে স্থাপিত হলো চার্চ মিশনারী সোসাইটি। ফ্রিটাউনে এই চার্চ মিশনারী সোসাইটির স্কুলে ১৮২২ সালে একটি বালককে ভর্তি করা হলো। পরে তাঁর পরিচয় হলো স্যামুয়েল অজায়ি ক্রোথার নামে। ১৮২২ সালে এই বালকটিকে পর্তুগীজ দাস চালানকারী পোত থেকে উদ্ধার করেছিল একটি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ। স্যামুয়ে ল অজায়ি ক্রোথার পরে এক বিখ্যাত প্রোটেস্টান্ট বিশপের মর্যাদা পেলেন। তিনিই প্রথম অ্যাফ্রিকান বিশপ। স্যামুয়েল ক্রোথারই প্রথম জোর গলায় বলতে পেরেছিলেন, 'that if Africa could be 'lifted up' by education and religion, the continent would be transformed.' শিক্ষায় কি হয় সে তো দেখতেই পাচ্ছি, এই সারিতেই বসে আছেন তিনজন আফ্রিকান মহিলা সাংবাদিক তাঁদের একজনের নাম সুসান।

২২

ঘাড় ঘুরিয়ে বিশাল সেই সভাকক্ষটিকে একবার দেখে নিলাম। দেয়ালে দেয়ালে মানব-মানবীর প্রেম-লীলার উদ্দীপক ছবি। বড় বড় শিল্পীরা তেলরঙে এঁকেছেন। মানুষে মানুষে ঘর ভরে গেছে। একটা আসনও আর খালি নেই। পেছনে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মে গোলন্দাজদের মতো দাঁড়িয়ে গেছেন নানা দেশের ক্যামেরাম্যান। ক্যামেরা আমাদের একেবারে ঘিরে ধরেছে। উজ্জ্বল আলো থইথই করছে চারপাশে। সভাকক্ষে এত আলো, এর সামান্যও যদি ওই দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া যেত।

রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায় আর তাঁর সহকারী ক্যামেরা-কাঁধে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের বাঁ পাশে। কুমকুম বসে আছে আমার বাঁপাশে। কোলের ওপর নোট খাতা আর ছোট্ট টেপ রেকর্ডার। আমরা প্রস্তুত, এবার শুরু হলেই হয়। মঞ্চের বাঁপাশে কারুকার্য করা দরজা দিয়ে ঢুকলেন এক আফ্রিকান নেতা। সঙ্গে তাঁর সহকারী মহিলা সেক্রেটারি। বাহামার প্রধানমন্ত্রী এই কনফারেনসের চেয়ারম্যান স্যার লিনডেন পিশুলিং। দুজনে আসন নেওয়া মাত্রই ঠাস ঠাস শুরু হয়ে গেল ক্যামেরার ফায়ারিং। আওয়াজে আধুনিক ক্যামেরা আর বন্দুকে কোনও তফাত নেই।

স্যার লিনডেনের চেহারার মধ্যে বেশ একটা অথরিটি আছে। ভালো লাগে দেখতে। ছোট্ট একটি বৃটিশ শাসিত দ্বীপ ছিল এই বাহামা। আটলান্টিকে ভেসে আছে মোচার খোলার মতো। ক্যাট, সানসালভাডোর আর নিউ প্রভিডেনস। ছোট দেশ হলে কি হবে, মানুষটির মধ্যে বেশ একটি ব্যক্তিত্ব আছে। একেই বলে শিক্ষা আর দীক্ষার গুণ। বাহামার রাজধানী নাসাউতে ২১শে অক্টোবর ১৯৮৫, কমানওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি সমাবেশ হয়েছিল। তীব্র প্রতিবাদের সেই সমাবেশে বলা হয়েছিল :

১।। কমানওয়েলথ মনে করে দক্ষিণ আফ্রিকার আচার আচরণ একটা চ্যালেঞ্জের মতো। বর্ণবিদ্বেষ তারা ছাড়তে প্রস্তুত নয়। জোর করে নামিবিয়া দখল করে রেখেছে। প্রতিবেশী দেশের ওপর নানা ভাবে উৎপাত করে চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যে কমানওয়েলথের সমস্ত মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতি আজ বিপর্যস্ত। এই দুর্বিনীত দেশটিকে আর কোনও ভাবেই সহ্য করা যায় না। নয়াদিল্লির সমাবেশে আমরা যা চেয়েছিলাম তা হলো দক্ষিণ আফ্রিকার অশান্ত পরিবেশকে চিরতরে শান্ত করার একটিই মাত্র পথ, বর্ণ-বিদ্বেষ হটাও আর সংখ্যাগুরুর হাতে তুলে দাও শাসন ক্ষমতা। অবিভক্ত, সংযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সাবালকরা পক্ষপাতশূন্য ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠন করুক। বহু বছর বিফলে

চলে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকার আমাদের নানা চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন না। আফ্রিকায় আন্দোলন যত জোরদার হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ সরকারের দমন পীড়নও তত বাড়ছে। এই যখন অবস্থা তখন আমাদের উচিত কালবিলম্ব না করে অবিলম্বে কার্যকরী কিছু ব্যবস্থা নেওয়া।

২।। প্রিটোরিয়া সরকারকে আমরা জানাচ্ছি কোনও রকম চালাকি না করে দ্রুত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করুন :

(ক) ঘোষণা করুন বর্ণবিদ্বেষী নীতি আমরা ফেলে দিলাম। বিশেষ অর্থবহ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজেদের উদ্দেশ্যের সত্যতার প্রমাণ দিন।

(খ) সারা রাজ্য জুড়ে যে জরুরী অবস্থা চালু রেখেছেন তার অবসান ঘটান।

(গ) বর্ণবিদ্বেষী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ যে সব নেতাদের জেলে ভরে রেখেছেন তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিন।

(ঘ) রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনে আফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিন।

(ঙ) উভয় তরফের অবিরাম সঙ্ঘর্ষ বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় বসার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করুন, সমস্ত বর্ণের রাজনৈতিক ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতিনিধিদের আলোচনা সভায় গঠিত হোক সর্বজনস্বীকৃত উদার মতবাদের একটি সরকার।

স্যার লিন্ডেন সেই নাসাউ চুক্তির উল্লেখ করে বললেন, এতক্ষণের সভায় আমরা আমাদের অনমনীয় ভাব বজায় রেখে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে যুক্তি তর্কে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছি। ভদ্রমহিলা ভীষণ একগুঁয়ে। নাসাউ অধিবেশনে এই দক্ষিণ আফ্রিকার অগ্নিগর্ভ সমস্যার মোকাবিলার জন্যে বিশিষ্ট কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। সেই কমিটিতে আছেন, জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, অস্ট্রেলিয়ার প্রাইম মিনিস্টার, আমি আছি আর আছেন ভারত কানাডা বৃটেন ও জিম্বাবোয়ের প্রধানমন্ত্রী। সেই সভায় আমাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কমানওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল সিদ্ধার্থ রামফলের সঙ্গে বসে কার্যকরী একটি পরিকল্পনা রচনা করার, যাতে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকার সমস্ত বর্ণের সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন।

আমরা, সেই 'গ্রুপ অফ এমিনেন্ট পার্সনস'রা এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বই। আমরা বলেছি আপনারা লিখে নিন,

(১) সাউথ আফ্রিকাকে যে সমস্ত দেশ অস্ত্র সাহায্য করেন, তাঁদের অবিলম্বে সেই সাহায্য বন্ধ করতে হবে। এই ব্যাপারে আমরা ইউনাইটেড নেশানস সিকিউরিটি কাউনসিলের ৪১৮ ও ৫৫৮ নম্বর সিদ্ধান্তকে কাজে লাগাবো। এই ধারা ভঙ্গ করে যে সমস্ত দেশ অস্ত্র সাহায্য করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা আইনমোতাবেক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।

(২) ১৯৭৭-এর গ্লেনইগলস ঘোষণাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সাউথ আফ্রিকার কোনও ক্রীড়ানুষ্ঠানে কমানওয়েলথভুক্ত দেশের খেলোয়াড়রা অংশ নেবেন না।

(৩) অন্যান্য দেশের কাছে আমাদের অনুরোধ, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিতেই হবে যেমন :

(ক) দক্ষিণ আফ্রিকাকে নতুন করে আর কোনও ঋণ দেওয়া চলবে না। ওই দেশের সরকারকে, এমন কি ওই দেশের কোনও সংস্থাকেও।

(খ) সমস্ত দেশকে একজোট হয়ে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে 'ক্রুগেরান্ড' আমদানী বন্ধ হয়।

(গ) দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও প্রদর্শনী অথবা বাণিজ্য মেলায় ট্রেড মিশান পাঠানো বন্ধ করতে হবে।

(ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বাহিনী, পুলিস অথবা নিরাপত্তা বাহিনীতে ব্যবহারযোগ্য কম্পিউটার বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

(ঙ) নতুন করে পারমাণবিক সামগ্রী মালপত্র অথবা প্রযুক্তি বিক্রির চুক্তি আর করা চলবে না।

(চ) তেল বিক্রি অথবা রপ্তানী বন্ধ করতে হবে।

(ছ) দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সাঁজোয়াগাড়ি কি আধাসামরিক জিনিসপত্র আমদানী বন্ধ করতে হবে।

(ছ) কোনও রকম সামরিক সহযোগিতা ওই দেশকে দেওয়া চলবে না।

(ঝ) কোনও রকম সাংস্কৃতিক বা বৈজ্ঞানিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করা যাবে না। ব্যতিক্রম, যদি সেই অনুষ্ঠান বর্ণবিদ্বেষ দূর করতে সাহায্য করে অথবা সেই নীতিকে উস্কানি না দেয় তাহলেই শুধু অংশগ্রহণ করা যেতে পারে।

নাসাউতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যদি ছ'মাসের মধ্যে এই নীতিতে কোনও কাজ না হয় তাহলে আমরা আরও চাপ সৃষ্টি করবো। কাজ যখন হলো না তখন আমরা আরও কঠোর হতে চলেছি। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর দ্বিধা থাকলেও আমাদের পরবর্তী নীতি হলো :

(ক) দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিমানসংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

(খ) দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসার ফলে যে লাভ হলো সেই লাভের অর্থ আর পুনর্বিনিয়োগ করা যাবে না।

(গ) ওই দেশের কৃষিপণ্য অন্য দেশ আর আমদানী করতে পারবে না।

(ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ডবল ট্যাকসেসান চুক্তির অবসান।

(ঙ) কোনও দেশ ওই দেশকে আর সরকারী সাহায্য দেবে না, কোনও রকম বাণিজ্যিক চুক্তিও করবে না।

(চ) কোনও দেশের সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কোনও কিছু সংগ্রহ করবে না।

(ছ) যে সব প্রতিষ্ঠানে শ্বেতাঙ্গদের অংশ বড় সেই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য দেশ কোনও সরকারী চুক্তিতে যাবে না।

(জ) দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যটন শিল্পকে কোনও রকম মদত দেওয়া হবে না।

স্যার লিন্ডেনের সভা-পরিচালনার সুন্দর ক্ষমতায় আমি অবাক। চোস্ত ইংরেজী। দৃঢ় ভঙ্গী। স্যার উপাধি পেয়েছেন বলে থ্যাচারকে তেল দেবার কোন প্রয়াস নেই। রাজীব গান্ধীর প্রশংসা করলেন। বললেন, থ্যাচার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সহসা কোনও কড়া ব্যবস্থা নেবার পক্ষপাতি নন। বলছেন, 'এই সব ব্যবস্থা, যাকে আমাদের ভাষায় বলছি 'স্যাংশানস', এই সব ব্যবস্থা নিলে অর্থনীতি একেবারে কাহিল হয়ে পড়বে তাতে ক্ষতি হবে 'ব্ল্যাক মেজরিটি'র। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী সমানে যুদ্ধ করে চলেছেন। উই ওয়ান্ট স্যাংশানস। নো মারসি। ডিসমেন্টল অ্যাপারথিড।'

স্যার লিন্ডেন তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে চলেছেন। পাশে বসে আছেন তাঁর সেক্রেটারি। তিনি নোট নিচ্ছেন। থেকে থেকে ক্যামেরার চোখ জ্বলে জ্বলে উঠছে। আজ প্রায় বিশ বছর ধরে কমানওয়েলথ পৃথিবী থেকে বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। বড় কঠিন কাজ। মার্টিন লুথার বড় দুঃখ করে বলেছিলেন, We see men as Jews or Gentiles, Cathelics or Protestants, Chinese or Americans. Negroes or whites, we fail to think of them as feellow human beings made from the same basic stuff as we, molded in the same divine image.

মার্টিন লুথার আমার বড় প্রিয় চরিত্র। আমার এই ক্ষুদ্র, খড় কুটোর জীবনকে একটা বৃত্ত দিয়ে ঘিরে রেখেছি। মহামানবের বৃত্ত। যীশু, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম, রামকৃষ্ণ, রাসেল, রাদারফোর্ড, লুথার, গান্ধী। একবার এঁর মুখের দিকে একবার ওঁর মুখের দিকে তাকায়। সময় এঁদের হরণ করে নিতে পারেনি। মার্টিন লুথার আর গান্ধীতে কি অসাধারণ মিল! জীবনের শেষ দিন, এপ্রিল ৪, ১৯৬৮। মেমফিসের মালবেরি স্ট্রিটে লোরেইন হোটেল। তিনতলার একটি ঘর। নিহত হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁর সহকর্মীদের বললেন, 'এ দেশের আত্মাকে জাগাবার একটি মাত্র পথ অহিংস আন্দোলনের পথ। যীশু আর গান্ধীর দিকে তাকিয়ে দেখো। আমি তাঁদের কথা ভেবে মৃত্যুভয়কে জয় করতে পেরেছি। হতাশায় ভেঙে পড়ো না। মানুষের বিশ্বাস হারিও না। ভগবানে তো নয়ই। আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে, ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের মনের কুসংস্কার একদিন ঘুচে যাবে, ঘৃণার উপত্যকা থেকে প্রেমের শিখর চূড়ায় সেই মন একদিন উঠবেই।'

মেমফিসের আগের রাতটি ছিল বড় দুর্যোগের রাত। প্রচন্ড বৃষ্টি। আবহাওয়ায় ঘূর্ণীঝড়ের সঙ্কেত। চার তারিখেও মেঘমুক্ত ছিল না। সারাটা দিন হোটেলের ঘরে দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায়

কাটল। এলো বিকেল। যেতে হবে সভায়—'পুওর পিপলস ক্যামপেন।' কিং সভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলেন হোটেলের ব্যালকনিতে। নিচে গাড়ি রাখার জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কয়েকজন বন্ধু। তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। হঠাৎ একটা শব্দ, গুলির শব্দ। কিং পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। বহু দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল মেরে ফেলার হুমকি। মার্টিন লুথার হাসতে হাসতে বলতেন, A man who wo'nt die for something is not fit to live.

পুত্রের মৃত্যুর সংবাদে পিতা কিং-এর কি হলো! তিনি জানতেন, 'ছেলেকে একদিন মরতেই হবে। যীশু রেহাই পান নি। পান নি মহাত্মাজী। সেই মহান মৃত্যুর পদশব্দ আমরা নিয়তই শুনতাম। উদ্বেগের দিন আসে আর যায়। রাতের নিদ্রা কবেই চলে গেছে। যে কোনো শব্দেই চমকে উঠি। খেতে পারি না। তাকিয়ে থাকি খাবারের দিকে। তারপর কয়েক সেকেন্ডে বেতার-ঘোষণা, সব উদ্বেগের চির অবসান। আমার প্রথম পুত্র। এই সেই ঘর। এই ঘরেই সে জন্মেছিল। তাব জন্ম মুহূর্তে আমার এত আনন্দ হয়েছিল যে ঘরের বাইরের হলে এসে মেরেছিলুম এক লাফ। হাত ঠেকে গিয়েছিল ছাদে। শিশু। শিশু থেকে পন্ডিত। পন্ডিত থেকে ধর্মপ্রচারক। আমি অতীত দেখতে পাচ্ছি। কিশোর। কখনও হাসছে। কখনও গান গাইছে। আমার পুত্র—চিববিদায়। সব শান্ত। গীর্জায় নেমে এসেছে অসীম প্রশান্তি। কর্মীরা জেনে গেছে কি হয়েছে। সব চোখ উপচে জলেব ধারা নেমেছে; কিন্তু কোনও শব্দ নেই। নিঃশব্দে অশ্রু মোচন'।

মার্টিন বলতেন, Take my hand precious Lord সেই ভযানক দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়া মাত্রই সমগ্র আমেরিকায় শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কব দাঙ্গা। সারা জীবন যিনি ছিলেন অহিংসার পূজারী, তাঁর মৃত্যুকে তাঁর ভালবাসার জনেরা ববণ করে নিল হিংসাব পথে। এ যেমন দুঃখের তেমনি পরিহাসের। দেশ যাদের নরক ছাড়া কিছু দিতে পারেনি, যে বস্তির অন্ধকাবে অসন্তোষ এতকাল ধোঁয়াচ্ছিল সেই অসন্তোষ সারা জাতির ওপর ফেটে পড়ল আততাযীর একটি মাত্র বুলেটে। এত বড় মারমুখী আন্দোলন আমেরিকার মানুষ আগে কখনও দেখেনি। মার্টিন লুথার কিং-এব মৃত্যুতে সমগ্র জাতি স্তম্ভিতপ্রায়। কেনেডির মৃত্যুর পর এই আর একবার জাতি এমন হতবাক হলো। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের কাছে এই মৃত্যুর একটিই অর্থ—হিংসা দিয়ে অহিংসাব বিচাব। এব চেয়ে নিষ্ঠুবতম মর্মর-ফলক আর কি হতে পারে! স্টোকলি কারমাইকেল বলেছিলেন, 'গত বাতে সাদা আমেরিকা ডক্টব কিংকে হত্যা করে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবেছে। আমেবিকা যদি র‍্যাপ ব্রাউন কি স্টোকলি কারমাইকেলকে হত্যা করত তাহলে কিছু বলার ছিল না। কিণ্তু ডক্টর কিংকে হত্যা করে আমেরিকা হেরে গেল। আমাদের জাতিতে একটি মাত্র মানুষ ছিলেন, তিনি মার্টিন লুথার কিং। আমাদের শেখাতে চেয়েছিলেন ভালোবাসা! শ্বেতাঙ্গদের ভালোবাসো, করুণা করো, তাদের দয়া কবো।' ফ্লয়েড ম্যাক কিসিক বললেন, 'অহিংসার শেষ যুবরাজ ছিলেন মার্টিন লুথার কিং। অহিংসা হলো মৃত জীবনদর্শন। কৃষ্ণাঙ্গরা সেই দর্শনকে হত্যা করেনি। হত্যা করেছে শ্বেতাঙ্গরা।'

অত মারাত্মক শক্তিশালী বৃটিশ সাম্রাজ্য তো হাজাব বছর টিকলো না। চার্চিল তো মহাত্মা গান্ধীকে 'নেকেড ফকির' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভারতপুবাণেব মহত্তম মুহূর্তের মালায় গাঁথা থাকবে গান্ধীজীর নাম। ইতিহাসের বিংশ শতাব্দীর রেলগাড়িতে চার্চিল তাঁর সহযাত্রী গান্ধীকে ঠিক চিনতে পারেন নি। তার চেয়েও কম চিনেছিলেন আফ্রিকার মানুষের সম্মান লাভ ও স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীর চার্চিল বড় ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলেন ১৯৪১-এর আগস্টে রুজভেল্টের সঙ্গে 'আটলান্টিক চার্টারে' সই করে। তাঁর ভেতরের সমস্ত বিরোধ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেই চুক্তি-পত্রে ছিল বিশ্ব রাজনীতিতে বৃটেন আর আমেরিকার নীতি কি হবে! তারই উল্লেখ :

কোন্ সরকারের অধীনে মানুষ থাকবে তা বেছে নেবার অধিকার রইল এই চুক্তিতে। সেই নির্বাচনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেবে এই চুক্তি। যে সব দেশেব স্বাধীনতা জোর করে হরণ করা হয়েছে, তাদের সার্বভৌমত্ব ও স্ব-শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

কলোনি সমূহের শিক্ষিত মানুষের মনে এই চুক্তির সাঙ্ঘাতিক প্রতিক্রিয়া হলো। শুধু বৃটিশ কলোনিতে নয়। যেমন আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা মুহম্মদ হারবি। দেশবাসীকে সচেতন করে তুললেন, বললেন, দ্যাখো, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বৃহৎশক্তির সমর্থন রয়েছে। ওদিকে আফ্রিকান ন্যাশন্যাল

কংগ্রেস। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস এই অ্যাটলান্টিক চার্টারের ভিত্তিতে সভা করলেন। সদস্যরা সভাপতিকে ভার দিলেন, আমাদের স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত তৈরি রাখুন, যুদ্ধশেষে শান্তি সম্মেলনে সেই বিল পেশ করা হবে।

বেসিল ডেভিডশন অবশ্য বলেছিলেন, অ্যাটলান্টিক চার্টার সম্পর্কে আফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের কিছু ভ্রান্তি থাকলেও, ১৯৪২-এর ২ জানুয়ারি এই ঘোষণায় আরও ২৬টি দেশ সম্মতি স্বাক্ষর দিয়ে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রূপরেখাকে আরও বলিষ্ঠ করলেন। বিশ্বব্যাপী যে সব দেশ মহাযুদ্ধের সময় ক্ষমতা হারিয়েছে, তাদের মুক্তি আর তাদের স্বাধীনতাই বিশ্বশক্তির কাম্য। এই হলো নয়া দুনিয়ার চিৎকার।

অ্যাটলান্টিক ঘোষণায় সই করে বিপদে পড়ে গেলেন চার্চিল। একবারও তাঁর মনে হয় নি, এমন ডালে বসে ডাল কাটার মতো কান্ড তিনি করে বসে আছেন। তখন হাউস অফ কমান্স থেকে শোনা গেল তাঁর কণ্ঠস্বর। এশিয়া আর আফ্রিকার নানা দেশ স্বপ্ন দেখছিল স্বাধীনতার। চার্চিল সেই সব দেশের মাথা ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি জানালেন, 'অ্যাটলান্টিকের সভায় আমরা সব দেশের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের কথা বলিনি, আমরা বলেছিলাম, যে সব দেশ নাজিদের অধিকারে চলে গিয়েছিল সেই সব ইওরোপীয় দেশের কথা। বৃটিশ ক্রাউনের অধিকারে যে সব দেশ আছে, জাতি আছে তাদের কথা আলাদা। সেখানে স্বায়ত্ত শাসন ধীরে ধীরে কোথায় নিয়ে যেতে পারে পরে ভাবা যাবে।'

চার্চিল চেয়েছিলেন সাদা দুনিয়ার মানুষ স্বাধীন হোক, সরকার গড়ুক। এশিয়া আর আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষের আবার স্বাধীনতা কি! বৃটেন ওই সব এলাকায় যেমন চেপে আছে সেই রকমই থাক। কিন্তু রুজভেল্টের দৃষ্টি ছিল আরও উদার। তিনি বললেন, না, না, তা কেন, চার্চিলের কথা ঠিক নয়, আমরা অ্যাটলান্টিক চার্টারে সমগ্র মানবজাতির মুক্তির কথাই বলেছি। তিনি আফ্রিকার মুক্তি চেয়েছিলেন। ভারতে বৃটেনের নীতি সমর্থন করেন নি। চার্চিলের সঙ্গে এই ছিল তাঁর তফাৎ। চার্চিল ছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একজন 'আনরিপেন্টান্ট ইমপিরিয়ালিস্ট'।

স্যার লিন্ডেন ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আপাতত আর কিছু বলার নেই।

২৩

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের পাগলামি এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যখন মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং কি জুলিয়াস নেয়েরেরের শান্তি-আন্দোলনের নীতি আর চলে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ সেই কারণে হিংসার পথ ধরেছে। সব অচল করে দাও। ভেঙেচুরে দাও। শ্বেতজাতির অভিমানে চার্চিল আর হিটলারে বেশ মিল ছিল। তবে চার্চিল এই ব্যাপারে হিটলারের চেয়ে অনেক নরম ছিলেন। আনরিপেন্টান্ট ইম্পিরিয়ালিস্ট হলেও, নানা ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন আফ্রিকার সঙ্গে। যেমন উগান্ডা। চার্চিল উগান্ডাকে বলেছিলেন, পার্ল অফ আফ্রিকা। আফ্রিকার মুক্তো। ১৯০৭ সালে তিনি সেখানকার কলোনি অফিসের জুনিয়ার মিনিস্টার ছিলেন। সেই সময় এই বিশেষণ দিয়েছিলেন। উগান্ডার মানুষ আজও গর্বের সঙ্গে সে-কথা স্মরণ করেন। আফ্রিকার বিভিন্ন ইংরেজ কলোনিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ তিনি অধিকার করেছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাহক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি যখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী তখন ইথিওপিয়াকে ইটালির অধিকার থেকে মুক্ত করে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছিলেন। ফ্রান্স যখন জার্মানির দখলে তখন তাঁরই সিদ্ধান্তের ফলে ফরাসী কলোনিগুলি যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করতে পেরেছিল। সবচেয়ে বড় কথা চার্চিল রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই হিটলারের উৎকট বর্ণ অহঙ্কার পৃথিবীকে গ্রাস করতে পারেনি। ১৯৬৫ সালে চার্চিলের মৃত্যুর পর ঘানার প্রেসিডেন্ট কাওয়ামে নক্রুমা তাঁকে বিংশ শতাব্দীর সর্বোত্তম নেতা বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, The memory of his inspiring leadership will long survive.

তাঁর মৃত্যুর পর আফ্রিকার মানুষের কাছে চার্চিলের আরও দুটি অবদান ধরা পড়েছিল। প্রথম, ইউনাইটেড নেশানসের তিনি ছিলেন অন্যতম জনক। দ্বিতীয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যাঁদের প্রচেষ্টায়

পশ্চিম ইওরোপ একতাবদ্ধ হতে পেরেছিল, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। চার্চিল ইওরোপকে মুক্ত করেছিলেন; কিন্তু নিজেদের সাম্রাজ্যের বাঁধন শিথিল করতে চাননি। কিন্তু নিয়তির লেখা পড়তে পেরেছিলেন। 'আয়রন কার্টেন' শব্দটি চার্চিলেরই দেওয়া। তিনি দর্শন করেছিলেন, লৌহ যবনিকা ইওরোপকে দুভাগ করে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ইওরোপ ভাগ হয়ে যাচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিমে। যেমন আফ্রিকা দেখেছিল গত শতাব্দীর শেষে। যখন তারা বল্লম ফেলে নতজানু হতে বাধ্য হয়েছিল ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পর্দার সামনে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের ক্ষমতামঞ্চ থেকে পশ্চিম ইওরোপকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। সরে গেছে রাশিয়া আর আমেরিকার বিশাল ছায়ায়। এই ঘটনা ইওরোপকে শুধু টুকরোই করেনি, ইওরোপের মুঠো আলগা হয়ে আফ্রিকা বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর এই মহাশক্তিধর দেশ দুটির একটা প্রাচীন সংস্কার আছে। সেটি হলো পশ্চিম ইওরোপীয় ধরনের সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা। ফলে আফ্রিকার রাজ্যপাট গুটিয়ে ফেলার জন্যে তাঁরা চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

তবে আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে যুদ্ধোত্তর 'সুপার-পাওয়ার'দের ভূমিকার চেয়ে আফ্রিকার মানুষদের ভূমিকা অনেক বেশি। তাদের নিজেদের ইচ্ছা, নিজেদের সঙ্কল্প। সার্বভৌমত্ব আমরা উদ্ধার করবই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আন্দোলনকে জোরদার করেছে, কিন্তু তার ঢের আগে ইওরোপের লোভী থাবা যখন আফ্রিকার সম্পদ ও স্বাধীনতা গ্রাস করতে আসছে তখন থেকেই আফ্রিকার প্রতিরোধ সমানে চলছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফ্রিকার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য তিনটি ধারায় প্রবাহিত। একটি হলো প্রতিরোধের স্বদেশী পদ্ধতি, দ্বিতীয়টি হলো মুসলিম পদ্ধতির লড়াই, তৃতীয়টি হলো পশ্চিমী ঢঙের প্রতিরোধ কিছুটা ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত।

আফ্রিকার নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রতিরোধের ধারা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র পশ্চিমী যুদ্ধ পদ্ধতি মাঝে মধ্যে আদিম প্রথার সামনে হটে যেতে বাধ্য হয়েছে। যখনি পশ্চিমী শক্তি এগোতে চেয়েছে তখনই প্রয়োগ করা হয়েছে প্রতিরোধের দেশী পদ্ধতি। যেমনি হোক, তারও এক দীর্ঘ ইতিহাস, যেমন, ঘানার অশান্তি যুদ্ধ, দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলুদের লড়াই, জিম্বাবোয়ের নেডবেলে-সোনা, উগান্ডার বুম্যুরো লড়াই, পশ্চিম আফ্রিকার যোরুবাল্যান্ড আর দাহোমে যুদ্ধ। তানজানিয়ার হেহে, কিনিয়ার নন্দী, নাইজারের গিরিয়ামা, আইভরি কোস্টের বাআউলে। একেবারে স্বদেশী ঢঙে, স্বদেশী পদ্ধতি ও বিশ্বাসে লড়াই। ১৯৫০ সালে মাউমাউরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল কিকুউ ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে। স্বদেশী যুদ্ধপ্রতীক মাউমাউদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধের আগে সঙ্কল্প পাঠ। রক্তঃপান। যুদ্ধে ইংরেজের কাছে তাঁরা হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে মাউমাউরাই জয়ী হয়েছিলেন। ইংরেজদের প্রাথমিক মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগুরুদের স্বায়ত্তশাসনের দরজা খুলে দিয়েছিল। ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ এই নটি বছর ধরে চলেছিল মাউমাউদের আধিপত্য।

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত ট্যাঙ্গানায়িকার মাজি মাজি যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। এখানে বিদেশী শক্তি আগেও স্থানীয় যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে। ১৯০৫ সালের যুদ্ধ সেই ধারারই অনুসরণ তার সঙ্গে মিশেছিল দেশজ অকৃত্রিম সংস্কৃতির অদ্ভুত এক অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। কি সেই বিশ্বাস! মাজি হলো কিসয়াহিলি শব্দ। অর্থ জল। জল ছিটিয়ে যোদ্ধাদের দীক্ষিত করে দিলে জার্মান বুলেট আর কিছু করতে পারবে না। এই বিশ্বাসের ফল হলো প্রাণঘাতী। জার্মানরা গুলি চালিয়ে সব শেষ করে দিলে। অভ্যুত্থান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। পরাজয় হলেও, একটা কাজ হলো। পরবর্তী কালে জার্মানদের দমনপীড়ন অনেকটা নরম হয়ে গেল।

শ্বেতশক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগ্রাম ছিল তাঁদের ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ 'জিহাদ'। ধর্মাবতার মুহম্মদের সময় থেকেই চলে আসছে এই 'জিহাদ'-এর আদর্শ। আরবের রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে তাঁকে অনবরত লড়তে হয়েছে। তাঁর নীতি ছিল যতক্ষণ পারো প্রতিরোধ করে যাও, না পারলে চলে যাও নির্বাসনে। এই নীতির অনুসারী হয়েই তিনি একদা মক্কা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মোদিনায়। ইওরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাধিক আন্দোলন করেছেন মুসলমানেরা। উনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকার ইতিহাস এই মুসলিম প্রতিরোধের ইতিহাস। সুসম্বদ্ধ, সংগ্রামী মুসলিম শক্তি ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের লেখার হরফ ছিল, দেশ গঠনের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল,

আর ছিল তাঁদের বিশ্বব্যাপ্ত ধর্মের ঐক্য-শক্তি। ধর্মের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় বাঁধা। রাজনীতি যা পারে না, ধর্ম তা পারে। রাজনীতি টুকরো করে, ধর্ম এক করে। আল্লার নামে এক হয়ে ইসলাম খ্রীস্টান শক্তিকে ঠেকাবার জন্যে বিশাল এক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর নাইজেরিয়ার ইতিহাস। সেখানে তখন সোকোতো খালিফদের রাজত্ব চলেছে। সুলতান, আট্টাহিরু আমাদু। ইওরোপীয়দের চাপ যখন প্রতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল তখন তিনি 'হিজরা'-র কথা ভাবলেন। ধর্মের নির্দেশ—বিধর্মীদের ঢুকতে দিও না, না পারলে সরে যাও। সোকোতোর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন। ঐতিহাসিক মাইকেল ক্রোডারের বিবরণ থেকে জানা যায়—ইংরেজরা সুলতানের পিছু পিছু ধাওয়া করে তাঁকে বুরমির কাছাকাছি একটা জায়গায় ধরে ফেললেন। আমাদুর জীবন গেলেও তাঁর অনুসরণকারীরা সুদানে স্থান পেলেন। সেখানে তাঁরা, তাঁদের বংশধরেরা এখনও বসবাস করছেন। আমাদুর নাতি, মোহম্মাদু ভান মাই উরনু তাঁদের দলনেতা।

সুদানে মহম্মদ আমেদ-এল-মাহ্দি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, সেই আন্দোলন ছিল ধর্ম আর দেশাত্মবোধের সমন্বয়। সোমালিয়াতে সায়েদ মহম্মদ আবদিল্লে হাসানের প্রতিরোধের ধারাতেও মিশেছিল দেশাত্মবোধ আর ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস। ইংরেজরা তাঁর নাম রেখেছিলেন, 'ম্যাড মোল্লা'। ইংরেজরা তাঁকে উম্মাদ বললেও, প্রতিরোধে তাঁর দেশাত্মবোধের অভাব ছিল না। ১৮৯৯ থেকে ১৯২০, প্রায় দু'দশক ধরে তিনি ছিলেন ইংরেজের দুঃস্বপ্ন। একদিকে ইংরেজের প্রতিরোধ অন্যদিকে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও জাগ্রত করা, এই ছিল তাঁর ব্রত।

পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে ধাক্কা খেতে হয়েছে ইসলাম প্রতিরোধে। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সেনেগালের বিক্ষুব্ধ ইতিহাস। একদিকে কায়েলের শাসক, লাট-ডিওর ডিওপ, অন্যদিকে সাররাকোলের শাসক মামাদৌলামিন। টোকোলোরের সম্রাট আমাদু, অন্যদিকে মার্নদিনকার সম্রাট সামোরি টৌরে।

ইংরেজ রাজত্ব চালালেও ইসলামের প্রতিরোধী শক্তিকে ভয় করত মনে মনে। উত্তর নাইজেরিয়ার মুসলিম প্রভাবিত অঞ্চলে ইংরেজ বিশেষ জোর ফলাবার চেষ্টা করেনি। কারণ ইংরেজ 'জিহাদ'কে ভয় পেত। উত্তর নাইজেরিয়ায় বৃটেন জোর করে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেনি। ফরাসীরাও তাঁদের এলাকায় অনুরূপ নীতিই অনুসরণ করতো।

যেমন ভারতে বৃটিশ নীতি। দু মুখো। মুসলমানদের জন্যে একরকম, অন্যান্যদের জন্যে আর এক রকম। শেষে ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান। এই পার্টিশান আফ্রিকার জাতীয় চেতনায় ছায়া ফেলেছিল। নামদি আজিকিয়ে আর কোয়ামে নক্রুমা, দু'জনেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন—ইসলাম যদি বিচ্ছিন্নতাকামী হয়ে ওঠে, তাহলে আফ্রিকার আন্দোলনের শক্তি কমে যাবে। পশ্চিম আফ্রিকার চিত্র অবশ্য অন্যরকম। ইসলামের নীতি সেখানে আগে বাড়ো, স্বাধীন হও। পাকিস্তানের মতো বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা কোরো না।

তিরিশের দশকে আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতবর্ষে হিন্দু আর পশ্চিমী ধারার মিশ্রণে যে আন্দোলন চলছিল, তার প্রভাব পড়ল। মহাত্মা গান্ধী হলেন আদর্শ পুরুষ। ১৯৪০-এর শেষ থেকে ১৯৫০-এর শুরু পর্যন্ত ঘানার আন্দোলনে নক্রুমা ইংরেজদের বিরুদ্ধে গান্ধীর নীতি প্রয়োগ করলেন। জাম্বিয়ার কেনেথ কউন্ডাও গান্ধীর শিষ্য।

সত্যাগ্রহ, গান্ধীজী যাকে বলতেন 'সোল ফোর্স', সেই শক্তির ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল আফ্রিকায় পশ্চিমী শিক্ষার প্রসারের ফলে। এ এক বেশ মজার ঘটনা—খ্রীস্টধর্ম ঢুকলো দাসত্বের বন্ধন নিয়ে, আবার সেই ধর্মের শিক্ষাই প্রেরণা যোগালো 'সোল ফোর্স' দিয়ে বন্ধন খুলে ফেলতে। নক্রুমা আর কউন্ডা খ্রীস্টান ছিলেন বলেই গান্ধীজীর মতবাদ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পেরেছিলেন বলেই দায়িত্বশীল আন্দোলনের পুরোভাগে আসা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৫৮ সালে ঘানার আকরায় অল আফ্রিকা পিপলস কনফারেন্সে সব নেতাই একমত হলেন, সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলন আমাদের পথ নয়, আমাদের পথ গান্ধীজীর নন-ভায়োলেন্স। সেই সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজেরিয়া লড়ছিল। ফলে আলজেরিয়ার অন্যান্য আফ্রিকান দেশের সমর্থন পাওয়া কষ্টস্বর হয়ে উঠল।

আফ্রিকার বিপ্লবের নেতারা কেন সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন। কেন তাঁরা গান্ধীজীর মতবাদে বিশ্বাসী হলেন! কেন তাঁরা শক্তি আর হিংসার পথ ছেড়ে সরে আসতে চাইলেন। কি কারণ। দুর্বলতা। পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে অস্ত্রে পেরে উঠবেন না বলে! তা নয়। প্রথম কারণ হলো, পশ্চিমের প্রভাব, খ্রীস্ট ধর্মের প্রভাব। আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের অনেকেই পশ্চিমে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা দেশেরই মিশনারী স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখেছেন। যেমন, নক্রুমা, সেনঘর, নেয়ারেরে, আজিকিওয়ে, আওলোও, বান্দা, কউন্ডা, হাউপ হাওয়েত-বোইগনি।

দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক বাস্তব বুদ্ধির উন্মেষ। যেমন ট্যাঙ্গানিকায় হেহে আর মাজি মাজি যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে সে-কালের জাতীয়তাবাদী নেতাদের জার্মানির হাতে শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল। জুলিয়াস নেয়ারেরের ভাষায় : 'টানু, ট্যাঙ্গানায়িকা আফ্রিকান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ানের পক্ষে তখন নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল দেশের মানুষকে বোঝানোর শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সম্ভব এবং সে-পথেও স্বাধীনতা আসা সম্ভব। তার মানে এই নয়, এ-দেশের মানুষ ভীরু অথবা কাপুরুষ। সেই কারণেই অহিংস-আন্দোলনের পথ ধরতে চাইছে। না, তা নয়। তারা লড়তে জানে। তবে একবার তারা চরম পরাজয় বরণ করেছে। আর সেই পরাজয়ের পথ ধরে এসেছে চরমতম নিপীড়ন।'

তৃতীয় আর একটি কারণ হলো, ভাবতে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য। ইংরেজ একের পর এক অধিকার ছাড়তে ছাড়তে শেষে ৪৭ সালে ভারত ছেড়েই চলে গেল।

এর পাশাপাশি কি কারণে আফ্রিকার কোনও কোনও দেশের আন্দোলন সহিংস পথে পা বাড়াল! সরাসরি লড়াই নয়। গরিলা যুদ্ধ অন্তর্ঘাত। যেমন, কেনিয়ায়, আলজেরিয়ায়, পর্তুগীজ আফ্রিকায় আর শ্বেতশাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায়। কারণ একটাই ক্ষমতা আর রাজ্যলোভী শ্বেতাঙ্গদের অনমনীয় মনোভাব। যাদের দেশ তাদের আমরা কিছুই দেবো না। শুধুই শোষণ করবো।

কেনিয়ায় মাউমাউ, আলজেরিয়ায় এফ এল এন, অ্যাঙ্গোলার বিভিন্ন আন্দোলন, মুগাবের জানু, জিম্বাবোয়েতে নোকোমার জাপু, কলোনিয়াল পাওয়ারের সঙ্গে সরাসরি সংগ্রামে জিততে পারেনি। তবে পলিটিক্যাল ভিকট্রি অবশ্যই হয়েছিল। কলোনির প্রভুদের মনোবল ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। গিনি বিসাউতে পি এ আই জি সি পর্তুগীজদের হাত থেকে দেশের বেশির ভাগ অংশই উদ্ধার করতে পেরেছিল। পরে পর্তুগীজরা দেশ ছেড়ে একেবারেই চলে গেল।

তাহলে আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এক, গান্ধীপন্থা। অহিংস সত্যাগ্রহ। 'সোল ফোর্স'-এর প্রয়োগ। কিন্তু যেখানে চেপে বসা শক্তি একেবারেই বর্বর সেখানে সংগ্রামই একমাত্র পথ, গরিলা যুদ্ধ।

সেই সশস্ত্র সংগ্রামই চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নামিবিয়ায় আর দক্ষিণ আফ্রিকায়। সামনাসামনি লড়াই নয়, গরিলা যুদ্ধ। একদিকে সোয়াপো, সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকান পিপলস অর্গানাইজেসান অন্যদিকে আফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের মিলিটারি উইং উমখোন্তো উই সিজওয়ে, যার মানে জাতির বল্লম। ১৯৬৬ সালে স্যাম মুজোমার নেতৃত্বে সোয়াপের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রপাত। ওই বছরই ইউনাইটেড নেশানস জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি দক্ষিণ আফ্রিকা সবকাবের শাসন কবার নির্দেশনামা খতম করে দিলেন। সোয়াপোর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা প্রথমে নামিবিয়ার ভেতর থেকে আন্দোলন চালাচ্ছিল। ৭৫ সালে অ্যাঙ্গোলা স্বাধীন হবার পর, ঘাঁটি সরিয়ে আনা হলো অ্যাঙ্গোলায়। ১৯৫০ সালে আফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের গান্ধীপন্থা ব্যর্থ হয়ে গেল। আফ্রিকানের সমর্থিত ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি গভর্নমেন্ট কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগুরুদের কোনও সুবিধেই দিলে না। উল্টে বর্ণবৈষম্য নীতি ক্রমেই চেপে বসতে লাগল। বাড়তে লাগল তার পরিধি। তখন আফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের কয়েকজন র‍্যাডিক্যাল নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে স্থাপন করলেন উমখোন্তো উই সিজউই। ১৯৬১ সালে।

বর্ণবৈষম্যকে দক্ষিণ আফ্রিকা আজ যেখানে নিয়ে গেছে তার কোনও তুলনা নেই। ৮০ ভাগ মানুষকে আবর্জনার মতো দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সব রকমের বঞ্চনার শিকার তারা। নাগরিক অধিকার অপহৃত। রাজনৈতিক অধিকার নেই। নেই সামাজিক স্বাধীনতা। আশ্চর্য ব্যাপার।

কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ দেশের কোথায় কোথায় বাস করবে, তারা কি কাজ করবে, কাদের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে, কোন্ সম্পত্তি তারা অধিকার করতে পারবে, কোন্ কোন্ এলাকায় যেতে পারবে,

কাকে তারা বিয়ে করতে পারবে, বন্ধু হিসেবেই বা কাকে গ্রহণ করতে পারবে, কোন্ স্কুলে তারা পড়তে পারবে, কোন্ জায়গায় গিয়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করবে, ছুটি কাটাবার জন্যে কোন্ কোন্ জায়গায় যেতে পারবে, কোথায় খেতে পারবে, কোথায় পান করতে পারবে, কোন্ সিনেমা হলে যেতে পারবে, কোন্ মাঠে খেলতে পারবে, জীবনেব প্রতিটি মুহূর্ত শ্বেতাঙ্গ শাসকদের নিয়ন্ত্রণে। কৃষ্ণাঙ্গদের যে যে সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয় শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় তা অত্যন্ত নিম্ন মানের। সাদাদের জন্যে স্বর্গ, কালোদের জন্যে নরক। সাউথ আফ্রিকাব কৃষ্ণকায় মানুষ আর বসবাসকারী ভারতীয়দের ক্রীতদাস করে রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে কাদের জোরে, সশস্ত্র পুলিসের বিশাল বাহিনী। নিরাপত্তা রক্ষীদের বিশাল জাল ছড়ানো আছে সারা দেশে। আর আছে অসংখ্য কারাগার, আটক কেন্দ্র আর কৃষিশ্রম কারাগাব।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের অদ্ভুত সব তুলনাহীন কান্ডকারখানা। কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে তারা দশটি আলাদা আলাদা ভুতুড়ে রাজ্য করেছেন। নাম দিয়েছেন বান্টুস্থান। এই সব তথাকথিত রাজ্য সারা দেশের মাত্র ১৩ শতাংশ ভূমি দখল করতে পেরেছে আর এর মধ্যেই থাকতে হবে বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গদের। ইতিমধ্যেই জোর করে নিষ্ঠুরভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের ভিটেমাটি থেকে সমূলে তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে এই সব দরিদ্র গ্রামীণ এলাকায় যেখানে এমনিই রয়েছে হাজার হাজার মানুষ যারা কোনও রকমে বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করছে। এই বর্ণবিদ্বেষী সরকাব সম্প্রতি চারটি বান্টুস্থানকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে সব চেয়ে বড় সুসম্বন্ধ উন্নত বান্টুস্থান ট্রানস্কেয়ি, ১৯৭৬ সালে বহু বাধা বিপত্তি কাটিয়ে প্রথম স্বাধীন হয়েছে।

পরের বছর কমানওয়েলথ নেতাদের লন্ডন সামিটে ঘোষণা করা হয়, এই সব বান্টুস্থান সার্বভৌম রাজ্য নয় অতএব কমানওয়েলথভুক্ত দেশ সমূহ এদের স্বীকৃতি দেবে না। কমানওয়েলথের বাইরেও এদের স্বীকৃতি নেই। এই হলো দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টুস্থানের স্বাধীনতার মর্যাদা।

দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে সারা বিশ্বের নজর পড়ে ৬০ সালে। সেই বছরই 'পাসল'-র বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের আন্দোলন চরমে ওঠে। ২১ মার্চ ১৯৬০ সাল। স্থান শার্পভিল। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। অথচ পুলিস নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৬৯ জনকে সেইখানেই মেরে ফেললে।

'পাসল'টা কি বস্তু! এই আইনে কৃষ্ণাঙ্গদের গতিবিধি ও কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত। সব সময় কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে রাখতে হবে একটি পাস। বান্টুস্থানের বাইরে ঘুরে বেড়াবার ছাড়পত্র। এই যে হবু লাইসেন্স, এতে সই করবে লেবার ব্যুরো তারপর সপ্তাহে সপ্তাহে এতে সই করবেন পাসধারী যেখানে কাজ করেন তার মালিক। মেয়েদের ক্ষেত্রে আরও একটি সইয়ের প্রয়োজন, স্বামীর অথবা অভিভাবকের। চাওয়া মাত্রই আইনের প্রতিনিধিদের এই পাস দেখাতে না পারলেই সাজা, হয় ফাইন না হয় কারাবাস অথবা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বান্টুস্থানে ফেলে দেওয়া।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত বর্ণবৈষম্য নীতি প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে এই 'পাসল' হলো সবচেয়ে ঘৃণিত, কুৎসিত। মানুষের স্বাধীন কাজকর্ম, চলাফেরার ওপর নিয়ন্ত্রণ, সেই সঙ্গে এক পরিবার থেকে আর এক পরিবারকে আলাদা করে ফেলার চমৎকার ব্যবস্থা।

২৪

সভা শেষে সভাগৃহ যেমন মনমরা হয়ে যায় সেই রকম হয়ে গেল। বক্তারা যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই বিদায় নিলেন। শ্রোতাদের পদধ্বনি কাঠের সিঁড়িতে অপসৃয়মাণ। টিভি আর ক্যামেরার জন্যে চড়া চড়া যে সব আলো লাগানো হয়েছিল তা জ্বলতেই লাগল। প্রহরীরা স্থাণুর মতো জায়গায় জায়গায় মোতায়েন। দেওয়ালের এখানে ওখানে বিশাল বিশাল তেল রঙের পটে অতীত পৃথিবীর উলঙ্গ, অর্ধোলঙ্গ নরনারীর জীবনচর্যার দৃশ্য এখন আরও স্পষ্ট।

ধীরে ধীরে আমরা আসন ছেড়ে উঠে পড়লুম। এক প্রহরী হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন, 'ফিলিং স্লিপি!'

আর তখনই মনে পড়ল, সত্যই তো, গত ছত্রিশ ঘণ্টায় দু চোখের পাতা এক করার সময় মেলে নি। কেন জানি না ওই ছ'ফুট লম্বা বিশাল প্রহরীর প্রশ্নের উত্তরে মনে হলো একটু সাহিত্য করি। মুখের ওপরটা টুপির আড়ালে অদৃশ্য। হালকা নীল চোখের মণি দুটো ঝকঝক করছে। চিজ, মাখন আর ফল প্রচুর পরিমাণে খেতে পেলে আমার চোখও ওই রকম সুইমিং পুলের মতো টলটলেই হতো।

আমি খুব হালকা হেসে অরসন ওয়েলসের ঢঙে বললুম :

Me thought I heard a voice cry, 'sleep no more'!
Macbeth does murder sleep, the innocent sleep
Sleep that knits up the ravelled sleave of care.

প্রহরী ভদ্রলোক চোখ নাচিয়ে বললেন, 'এ রিয়েল পিস অফ শেকসপীয়ার। দ্যাটস ফাইন।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলুম। পেছন থেকে কে একজন কাঁধে হাত রাখল। সুসান। আমার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিল কিছু টফি। আমার পাশে পাশে নামতে নামতে বললে, 'এ দেশের কেক, প্যাস্ট্রি, টফি খুব সুন্দর। একটা খেয়ে দ্যাখো।'

কাগজ খুলে কমলালেবু রঙের অতি স্বচ্ছ একটি লজেন্স জিভে ফেললুম। সত্যিই সুন্দর। অপূর্ব সুবাসে ভেতরটা জুড়িয়ে গেল। বাইরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে টিপটিপ করে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত বৃষ্টি। সারা দেশের স্পিরিটটাকে ড্যাম্প করে দেবার প্রাকৃতিক চক্রান্ত। ধূসর আলো, কালো রাস্তা, খয়েরী রঙের বাড়ি, সাদা শার্ট, কালচে টাই। বেশির ভাগই গ্রে স্যুট, গ্রে স্কার্ট। আমার জ্যোতিষী বন্ধু সুবীর চট্টোপাধ্যায় পাশে থাকলে জিজ্ঞেস করতুম, এ দেশের ওপর কোন্ গ্রহের প্রভাব? 'তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন শুনেছি কেতুর প্রভাবে। এদেশ নিশ্চয় রাহুর অধীন। ম্লেচ্ছর দেশ। ঠিক এই সন্ধের মুখে আমার দেশে কি হতো। মন্দিরে মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা। এখনও সেখানে ঘরে ঘরে শাঁখ বাজে। ধূপ জ্বলে। সব বাড়িতেই একটি ঠাকুর ঘর আছে। যে যে-জীবিকারই নারী, পুরুষ হোন না কেন তাঁর নিজের একটা ধর্মবিশ্বাস থাকে। আমার পরিচিতা এক গাইনকোলজিস্ট আছেন, তাঁর ছুরির হাত এত ভালো, পেট কাটছেন না পাঁউরুটি কাটছেন বোঝাই যায় না। জীবন কাটাচ্ছেন সন্ন্যাসিনীর মতো। আমার এক আত্মীয়া আছেন, সোস্যাল ওয়ার্কার। সারা দিন বস্তিতে বস্তিতে ঘোরেন; কিন্তু রোজ বেরোবার আগে ঘণ্টা দেড়েক পুজো চাই, তাতে যদি কোনও দিন অভুক্ত বেরোতে হয় তো হয়। কোনও ক্ষোভ নেই। এঁরা তো ইচ্ছে করলেই মেম সায়েব হয়ে যেতে পারতেন। ভারত আমার দেবভূমি। গঙ্গা যে দেশে হর হর সঙ্গীত প্রবাহিতা। উত্তরের হিমগিরির যে দেশে হেমকান্ত মহাদেব, সে দেশের মানুষের কাছে এই ম্লেচ্ছ ভূমি মানুষের জৈব ইচ্ছার বার্তাবাহী। ভোগ আর ভোগ। যন্ত্র নিয়ে, অর্থনীতি নিয়ে, দেহ নিয়ে, দুর্বিপাক নিয়ে নাস্তানাবুদ। রাজ্য বিস্তার, যুদ্ধ, আণবিক বোমা, রাইফেল, রিভলভার এর বাইরে জীবাত্মা যে বটচ্ছায়ে ধ্যানাস্থ হতে পারে, আর পারলে যে মহাসুখ, সেই বোধটাই হারিয়ে গেছে। প্লান্ডরার, একসপ্লোরার। ওয়ারিয়ার, র‍্যাভেজার। জীবনের ধরনটাই আলাদা। খ্রাইস্টকে কোট প্যান্ট পরিয়ে এমন করেছে ক্রুশের যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ড্রিপিং ব্লাড। যৌবন যেই গেল অমনি হাহাকার। এদের দেশে তো পরিবার পরিজন বলে কিছু নেই। ছেলে যেই ষোল হলো, ভেগে পড়ল। তারপর তার জীবনটা কেমন! বিয়ে, এই ডিভোর্স আবার বিয়ে আবার ডিভোর্স। দেখা গেল একটা দেশের সকলেই সকলকে বিয়ে করে আর ছেড়ে বসে আছে। এর সঙ্গে নতুন আমদানী উৎপাত, ড্রাগস আর এডস। যাক যাদের ব্যাপার তারা বুঝুক। আমি বুঝেছি রাম, রামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ।

১৬০১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে জাহাজটি ইংল্যান্ড থেকে ভারতের দিকে যাত্রা করেছিল তা যেন একটি মোচার খোলা। ৬০০ টনের ছোট্ট একটি জাহাজ। ভারতের বিশাল আয়তনের কাছে ইংল্যান্ড একটা ছোট্ট রুটির টুকরো। পাহাড় ঘেরা, সমুদ্র ঘেরা দুর্ভেদ্য ভারতকে সাহসী বিদেশী বণিকরা ভেদ করতে পেরেছিল। পারেনি তার ধর্ম আর বিশ্বাসকে জয় করতে। বেদের কাল থেকেই ভারতে হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি হলো ভারত। আবার বণিক আর এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা এনেছিল ইসলাম। আকবরের সভায় সেন্ট থমাস এসেছিলেন। জেসুইট ধর্মপ্রচারকদের তিনি খাতির করেছিলেন অন্য কারণে। উলামাদের সঙ্গে আকবরের সম্পর্ক তেমন মধুর ছিল না।

তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলতে চেয়েছিলেন মিশনারীদের। ভারতীয় কৃষকদের জীবনে খ্রীস্ট ধর্ম তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হিন্দু ধর্মেরই আর একটি রূপান্তর জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলো। আর হিন্দু ও ইসলামের মধ্যে সেতু তৈরি করল শিখ ধর্ম ষোড়শ শতকে।

সায়েবদের কাছে, ইসলাম অনেক 'ক্রিয়ার কাট, 'ইনডিভিজুয়্যালিস্টিক', ডেমোক্র্যাটিক'। হিন্দুধর্ম বড় জটিল। ব্যক্তি মানুষের কথা ভাবে না। অগণতান্ত্রিক। ভয়ঙ্কর রকমের দুর্বোধ্য। তা তো হবেই, বেদান্ত বোঝার ক্ষমতা সায়েবদের ছিল না। যে ধর্মের কথাই হলো, জীবনের জন্ম নেই, লয় নেই, ক্ষয় নেই, জলের বিম্ব জলেই লয় হচ্ছে, সে ধর্মের গূঢ়ার্থ মেটিরিয়ালিস্টরা কি বুঝবে! যে কারণে গান্ধীজীর ট্রুথ অ্যান্ড নন ভায়োলেনস ইংরেজদের বড় জব্দ করেছিল। খ্রীস্ট ইংরেজদের বেদান্তও দিয়েছিলেন। নিউ টেস্টামেন্টের 'সার্মন অন দি মাউন্ট'-এর সঙ্গে গীতার অনেক সাদৃশ্য আছে। সার্মন বলছেন, 'দুষ্টকে বাধা দিও না। তোমার ডান গালে কেউ চড় মারতে চাইলে মারতে দাও, তারপর তার দিকে বাঁ গালটাও বাড়িয়ে দাও। কোনও লোক যদি তোমার কোটটা খুলে নেয়, তাহলে তাকে জামাটাও দিয়ে দাও।' বাইবেলের মণিমুক্তো কে আর গ্রহণ করছে জীবনে! বাইবেল হয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার।

ব্র্যাডলাফ ছিলেন ইংল্যান্ডের একজন বড় নাস্তিক। তিনি মারা গেলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় মোহনদাস উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি আর কয়েকজন ধর্মযাজক স্টেশানে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আরও অনেকে রয়েছেন। ব্র্যাডলাফ নাস্তিক, তাঁর ফিউনারেলে বাছা বাছা নাস্তিকরাই আসবেন। প্ল্যাটফর্মে এক নাস্তিক যাজকদের টিটকিরি দিতে শুরু করলেন। নাস্তিকের প্রশ্ন, 'আপনি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?'

ধর্মযাজক নিচু গলায় বললেন, 'করি।'

'আচ্ছা পৃথিবীর বেড় যে ২৮০০ মাইল, একথা আপনি স্বীকার করেন?' নাস্তিকের মুখে অহংকারের হাসি।

'তা হবে।' ধর্মযাজকের প্রত্যুত্তর।

'তাহলে এইবার বলুন, আপনার ভগবানের আকার আকৃতি কত বড়, আর তিনি থাকেনই বা কোথায়?'

যাজক তাঁর শান্ত গলায় বললেন, 'আহা, এই সত্যটাই যদি আমাদের জানা থাকত, তিনি যেমন এই আমার হৃদয়ে আছেন তেমনি তিনি আপনার হৃদয়েও আছেন ভাই।'

সারা পৃথিবী জুড়ে এই নাস্তিকতাই বাড়ছে। আরও বাড়বে। আর যত বাড়বে ততই পৃথিবীর চেহারা ঘোলাটে হবে। টিপ টিপ বৃষ্টিতে পথ হাঁটছি। হোটেলে ফিরে জামা-কাপড় বদলাবো। ভারতীয় দূতাবাসে রাতে খানা আছে। সঙ্গে পিনাও থাকবে। এ দেশে পিনা ছাড়া তো কিছুই হয় না। রাস্তাঘাট ফাঁকা। এ দেশে আড্ডা নেই। এমন কোনও মানুষ নেই যার সঙ্গে দু দণ্ড প্রাণের কথা বলা যায়।

হোটেলের কাউন্টারে সেই হাসিমুখ তরুণী দুটি দাঁড়িয়ে আছে। তটস্থ হয়ে। চাবি চাইলুম। সামনে ঝুঁকে পড়ে নাচের ভঙ্গিতে সামনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে কাউন্টারের নিচের দিকে খোপেখাপে আমার ঘরের চাবি খুঁজতে লাগল। বেশ ভালো লাগছিল দেখতে। হোটেল ব্যবস্থাপনায় এখনও তেমন পোক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। না পারলেও দুই বোনের এই 'ক্লামজি' ভাবের বেশ একটা মাধুর্য আছে। পরীর মতো নেচে নেচে একজন এদিকে যায় তো আর একজন ওদিকে আর তারা কেবলই বলতে থাকে, 'জাস্ট এ মোমেন্ট, জাস্ট এ মোমেন্ট।'

হঠাৎ কি মনে হলো, আমি আমার উইন্ডচিটারের পকেটে হাত ঢোকালুম। চাবি আমার পকেটে। বের করে চোখের সামনে দোলাতে দোলাতে বললুম, 'হিয়ার ইট ইজ।'

দু'জনেই সোজা হয়ে, কাউন্টারের ওপাশে পাশাপাশি একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। দু'জনেরই চোখে বিস্ময়। ভুরু জোড়া ধনুকের মতো হয়ে উঠেছে। একজন প্রশ্ন করলে, 'কোথায় ছিল?'

হেসে বললুম, 'আমার পকেটে।'

অপরজন বললে, 'স্ট্রেঞ্জ!'

আমি বললুম, 'ভুলে গিয়েছিলুম বোন। ক্ষমা কোরো। তোমাদের একটু ব্যায়াম হলো।'

মেয়ে দুটি সমস্বরে বললে, 'ইয়েস, দ্যাটস গুড ফর হেলথ।'

সেই জটিল পথ ধরে আমি আমার ঘরে ফিরে এলুম। একটা বিশাল ঘর, বিশাল একটা খাট। বিশাল দুটো জানালা। আলখাল্লার মতো পর্দা। কেউ কোথাও নেই। দূরের টেবিলে টিভি অন্ধকার মুখ করে বসে আছে। পাশে ফলের টুকরি আর জনিওয়াকারের বোতল।

ভাবছি, কি করব? টিভি চালাবো? না বেশ জম্পেস করে চান করব? এমন সময় দরজায় তিনটে টোকা। দরজা খুলতেই সামনে পাঁচটি হাসি মুখ মেয়ে। কি রে বাবা!

একটি মেয়ে প্রশ্ন করলে, 'ডু ইউ ওয়ান্ট ইওর বেলি টু বি আপটার্নড?'

বেশ থতমত খেয়ে গেলুম, এ আবার কি প্রস্তাব? পাঁচ পাঁচটা সুন্দরী মেয়ে আমার বেলি, মানে আমার পেটটাকে আপটার্ন করবে, মানে উল্টে দেবে। সেটা কি জিনিস! কি ভাবে করবে। তাতে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে! ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। মেয়ে পাঁচটি হাসছে। পাঁচজনের পাঁচরকম মুখ, পাঁচরকম চুল। ধড়ফড় করে বললুম, 'ও নো নো। থ্যাঙ্কস। মেনি থ্যাঙ্কস।'

তারা খিল খিল করে হাসতে হাসতে করিডর পেরিয়ে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে সোজা বাথটাবে। এইখানেই আমার বেলি আপটার্ন করি। বাথটাবে খলবল করতে করতেই শুনছি টেলিফোন বাজছে। একেবারে বিলিতি সিনেমার নায়ক। বাইশশো বাইশ মাপের তোয়ালে জড়ানো দিশি শরীর। কানের পাশ দিয়ে ফোন ঝরছে। হাতের মুঠোয় টেলিফোন।

কুমকুম। 'দাদা, কি করছো?'

যাক এই পৃথিবীতে আমি ছাড়া আরও একজন বেঁচে আছে। এই সব ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে মনেই হয় না বাইরে জীবজগৎ বলে একটা কিছু আছে! এই সব ঘরে টেলিভিশানই প্রাণীজগতের দিকে একমাত্র জানালা। হোটেলে একটা মানুষকে খুন করা কত সহজ! ডেডবডি পড়েই থাকবে। পচে গন্ধ না বেরনো পর্যন্ত খোঁজই পড়বে না।

কুমকুমকে জবাব দিলুম, 'আরাম করছি। তুমি কি করছ?'

'আমি শুয়ে আছি। তুমি চলে এসো না। এখুনি তো বেরোতে হবে।'

'যাচ্ছি।'

কোট প্যান্ট পরা হলো। যেন ইটনের সায়েব। টাইটা আর কিছুতেই বাঁধতে পারি না। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। এপাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে ন্যাজা ধরে যতবার টান মারি গরুর গলার দড়ির মতো গাঁট পড়ে যায়। তবে চেষ্টায় কি না হয়! বাঁদরকে টাইপরাইটারে বসিয়ে দিলে, অনবরত খটাসখটাসে একদিন না একদ্দিন একটা সনেট টাইপ করে ফেলবে। আমারও তাই হলো। গাঁটাগাঁটি করতে করতে একসময় গল-ফাঁস লাগল।

ফায়ার একজিট খুলে সেই ভুতুড়ে সিঁড়ি। কেউ কোথাও নেই। কোনও শব্দ নেই। কণ্ঠস্বর নেই। কেবল পেতলের লেখা দেয়ালে দেয়ালে। দরজায় দরজায় ঘরের নম্বর আর তীর চিহ্নসহ ওয়ে টু এলিভেটার। আর রকম রকম ছবি। কুমকুমের দরজায় টোকা মারতেই, 'চলে এসো, খোলা আছে।'

মেয়ে একেবারে 'মুঘলে আজম' হয়ে শুয়ে আছে। আর কাল থেকে যা যাচ্ছে, কাত হয়ে পড়ারই কথা। বসতে না বসতেই টেলিফোনের ঝিনঝিনি, 'নেমে এসো সব নিচে। গাড়ি তৈয়ার।'

সেই সুদৃশ্য মিনিবাসে চেপে, এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে ভারতীয় দূতাবাসে। বেশ জমকালো পথঘাট। আলোর রোশনাই। পথের দুপাশে গাছের সারি। বলতে পারবো না কি গাছ! ভারত হলে বলতে পারতুম কৃষ্ণচূড়া কি দেবদারু। কলকাতায় পাওয়ার শর্টেজ, এত নিয়ন সাইন বহুকাল দেখিনি। রাতের শহর আলোয় না সাজলে হয়।

দূতাবাসের চেহারায় বেশ একটা ভারিক্কি চাল। ঢোকার দরজাটা বেশ ঘোরালো। অনেক রকমের খাঁচাটাচা করা আছে। কূটনীতির ব্যাপার একটু কূটকচালে তো হবেই। আমরা দোতলায় উঠে গেলুম। বিশাল হলঘর। একপাশে বার। আমরা আসার আগেই অনেকে এসে গেছেন। শুরু করেও দিয়েছেন। আমি আর কুমকুম ভিড় বাঁচিয়ে একপাশে দেয়াল ঘেঁষে বসলুম। অভ্যাগতের সংখ্যা বেশি নয়। কোনও হইচই নেই। এক মহিলা পানীয় নিয়ে এগিয়ে এলেন। আমরা দুজনেই খুব সফ্ট গলায় বললুম, 'সফ্ট'।

মহিলা ট্রে নিয়ে চলে গেলেন। যাবার পথে টপটপ সব গেলাস খালি হয়ে গেল। আমার বাঁ

পাশে বসেছিলেন প্রবীণ এক সাহেব। আলাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোক ঐতিহাসিক অধ্যাপক। এতক্ষণে একজন মানুষ মিলল যাঁর সঙ্গে কথা বললে আমার জ্ঞান বাড়বে। ঈশ্বরবিশ্বাসী। যুদ্ধবিরোধী। কথায় কথায় অ্যাটেনবরোর গান্ধীপ্রসঙ্গ এসে গেল। পৃথিবীতে অশান্তি যত বাড়ছে, গান্ধীর জীবন ও জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনাও হতে শুরু করেছে। পশ্চিমের ভোগ দুনিয়া 'সোল ফোর্স'-এর অভাবে ক্রমশই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

অধ্যাপক বললেন, পর পর দুটো বিশ্বযুদ্ধ আর অজস্র খন্ড যুদ্ধে মানুষ ক্রমশই যুদ্ধবিরোধী হয়ে উঠছে। আজ অথবা কাল হিটলার লন্ডন আক্রমণ করলে লড়াই করার ছেলে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানুষের প্রয়োজন নাও হতে পারে। লড়াই করবে কম্পিউটার।

অধ্যাপক আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ। গান্ধীজী বিশেষজ্ঞ। আবার হিন্দুদর্শনেও অগাধ জ্ঞান। আমাদের মতো তিনিও নরম পানীয় নিয়েছেন। এক এক চুমুক খাচ্ছেন আর অতীতের কথা বলছেন। হঠাৎ বললেন, 'বৃটিশ সাম্রাজ্য কেন কুঁচকে ছোট হয়ে এল জানেন? অহঙ্কার আর রেড টেপ। যেখানে যত বেশি রেড টেপ সেখানেই ৩ত বেশি করাপসান। জাস্টিস ডিলেড মিনস জাস্টিস ডিনায়েড। সময় পেলে জিম করবেটের মাই ইণ্ডিয়া বইটা পড়বেন। আপনারা কি গান্ধীজীকে ভুলে আসছেন?'

'ঠিক ভুলিনি। তবে গুলিয়ে ফেলেছি।'

'আমরাও আমাদের জীবনেব অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি। মজা কি জানেন, একটা দেশ যত সুসভ্যই হোক ৩ার অসভ্য বর্বব অংশটাই বাইবে বেবিয়ে আসে। রাজ্যপাট বিস্তার করে সাম্রাজ্যের স্তম্ভ হয়ে ওঠে। তারাই যেমন একটা দেশের বিজয় কেতন, সেই রকম আবার এফিটাফ। শেকসপীয়ার কোনও দিন ইন্ডিয়ার ভাইসরয় হবেন না। নিৎসেব কথা আপনার মনে পড়ে, সভ্যতার ফাউন্ডাব হলো বর্বর মানুষেরা। লড়াই, রেপ, নির্যাতন, থ্রোন। সম্রাট সিংহাসনে বসলেন, কোয়ার্শন মেশিনারি চালু হয়ে গেল। তাবপর তার মনে হলো, এইবার সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, দার্শনিকদেরর ডাকা যাক। ঐতিহাসিক আসুক, এসে আমার ইতিহাস লিখুক। ৩খন চেষ্টা হলো ইমেজ বিল্ডিং-এর। আপনাব মনে আছে, ভারতে মোগল সম্রাটদের কেউ কেউ রোজ দুপাতা করে কোরান কপি করতেন আর ভাইয়েব গলায় ছুরি চালাতেন। পিতাকে ধরে কারাগাবে পুরতেন।'

গান্ধীজীর কথায় মনে পড়ল, দক্ষিণ আফ্রিকাব শ্বেত শাসকদেব সঙ্গে তাঁব পদে পদে সঙ্ঘর্ষের কথা। 'অ্যাপারথিড'-এর বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন তো তিনিই শুরু করেছিলেন। নাটালের কোর্টরুমে গেছেন, মাথায় পাগড়ি। জজসাহেব এজলাসে ঢুকেই আদেশ করলেন, পাগড়ি খোলো। কেন খুলবো? একমাত্র মুসলমানবাই তাদের টুপি পরে আসতে পারে, নট ইউ। ইউ আর এ কুলি ব্যারিস্টার। সব ভারতীয়ই সায়েবদের চোখে কুলি।

সেই ১৮৯৩ সালের কথা। আন্দোলনের সূত্রপাত। গান্ধীজী সংবাদপত্রে এই নির্দেশের প্রতিবাদে লিখলেন। পক্ষে বিপক্ষে জনমত তৈরি হয়ে গেল। বিপক্ষেই বেশি। তিক্ত সমালোচনার মুখোমুখি হলেন মহাত্মাজী। কাগজে কাগজে বাদ প্রতিবাদ। গান্ধীজীকে বলা হলো 'আনওয়েলকাম' ভিজিটার। পাগড়িটা শিশু শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল।

ডারবান থেকে গান্ধীজী ট্রেনে চলেছেন প্রিটোরিয়া। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। রাত নটায় ট্রেন এসে থামলো মারিৎসবুর্গে। রেলের কর্মচারি এসে জিজ্ঞেস করে গেল, বেডিং চাই কিনা। শীতকাল। দক্ষিণ আফ্রিকাব উঁচু জায়গায় আরও শীত। হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। পাঁচটা শিলিং বাঁচাবার জন্যে মোহনদাস বললেন, বেডিং চাই না। এর পরেই কম্পার্টমেন্টে এলেন এক সায়েব। রুদ্রমূর্তি। ক্লিয়ার আউট ইউ কুলি। টিকিট, রিজার্ভেশান যাই থাক, চলে যাও ভ্যান-কম্পার্টমেন্টে।

নাম তাঁর মোহনদাস। পরে চার্চিল যাঁকে বলবেন, 'নেকেড ফকির', মার্টিন লুথার কিং হবেন যাঁর মন্ত্র শিষ্য, আমাদের যিনি হবেন 'ফাদার অফ দি নেশান', তাঁকে কি অত সহজে টলানো যায়। ঘাড় ধরে গান্ধীজীকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো প্লাটফর্মে। তাঁব লাগেজ নিয়ে ট্রেন ছুটলো প্রিটোরিয়ার দিকে।

হাড় কাঁপানো শীত। রাত গভীব। মারিৎসবুর্গ স্টেশনের অন্ধকার ওয়েটিং রুমে বসে আছেন মোহনদাস করমচাঁদ। হাত ব্যাগটি হাতে ধরা। লাগেজের ভেতর তাঁর ওভারকোট। ব্ল্যাক ম্যানের লাগেজ পড়ে আছে হোয়াইট ম্যানের কম্পার্টমেন্টে। ট্রেন ছুটেছে প্রিটোরিয়ার দিকে। 'প্রোটেস্ট'। অন্ধকার, শী:, রাত্রি। নিঃসঙ্গ এক বিদেশী। আবার এক আন্দোলনের মুখোমুখি।

২৫

অপমান পকেটস্থ করে পরের ট্রেন ধরে প্রিটোরিয়া চলে যাবো, না ফিরে যাবো ভারতে, না প্রতিবাদে একক আন্দোলন? সেই অন্ধকার ওয়েটিং রুমে হিলহিল করছে দক্ষিণ আফ্রিকার শীত। গায়ে গরম জামা নেই। পায়ের তলায় ব্রিফকেস। অপমানিত মোহনদাস, বিলেতফেরত তরুণ ব্যারিস্টার বসে বসে ভাবছেন কি তাঁর করা উচিত! ওয়েটিং রুমে আর এক যাত্রী এলেন। দু চারটে কথা বলে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন। গান্ধীজী নীরব। ভেতরে ভেতরে ফুঁসছেন।

যে কাজে, যার কাজে প্রিটোরিয়া চলেছেন, সে কাজ ফেলে ভারতে ফিরে যাওয়া হবে কাপুরুষতা। যে দুর্বিপাকে পড়েছেন সেটা একটা রোগলক্ষণ। অসুখটা হলো বর্ণ-বিদ্বেষ। সেই ভয়ঙ্কর ব্যাধির মূলোৎপাটন করতে হবে। তার জন্যে যদি আরও কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন হয় তো হবে।

গান্ধীজী ঠিক করলেন পরের ট্রেন ধরে প্রিটোরিযা যাবেন।

পরের দিন সকালে রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন। আর ডারবানে যার কাজে গিয়েছিলেন সেই আবদুল্লা শেঠিকে সব ঘটনা জানালেন। আবদুল্লা সঙ্গে সঙ্গে দেখা করলেন জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে। ম্যানেজাব বললেন রেল কোম্পানি কোনও অন্যায় করেনি। তবে হ্যাঁ, মারিৎসবুর্গ স্টেশানে, স্টেশান মাস্টারকে তিনি বলে দিয়েছেন, মোহনদাস যাতে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে।

আবদুল্লা শেঠি মারিৎসবুর্গে তাঁব পরিচিত ব্যবসায়ীদের তার করে অনুরোধ করলেন, তাঁরা যেন স্টেশানে মোহনদাসের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা গান্ধীজীর তদারকিব জন্য স্টেশানে ছুটে এলেন। তাঁবা তাঁদেব জীবনের নিয়ত ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে মোহনদাসকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। যা ঘটেছে, তা নতুন কিছু নয়। সাদা মানুষরা কালোদের ওপর এইভাবেই অত্যাচার করে আসছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষের এইটাই হলো স্বাভাবিক পাওনা। বিকেলের ট্রেনে মহাত্মাজী চলে গেলেন চার্লসটাউন।

গান্ধীজী আর আফ্রিকা আলাদা করে ভাবা যায় না। অতীত মনে এসে ভিড় করবেই। এইবার তিনি চার্লসটাউন থেকে যাবেন জোহানেসবার্গ। সে আর এক তিক্ততম অভিজ্ঞতা। এবার আর ট্রেনে নয যেতে হবে স্টেজকোচে। ডারবান থেকেই কেনা ছিল কোচের টিকিট। একদিন দেরি হলেও টিকিট বাতিল হয়ে যাবার কথা নয়। কিন্তু সাদা চামড়া এজেন্ট বদমাইশি কববেই। তাব ছুতোর অভাব নেই। কারুর কাছে তার কাজেব জবাবদিহিও করতে হবে না। সে যেই দেখলে যে মানুষটি অচেনা একজন আগন্তুক, সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'তোমার টিকিট তো ক্যানসেল হয়ে গেছে।' গান্ধীজী তাকে উপযুক্ত জবাব দিলেন। দিলে কি হবে, সে তো কোনও আইনের ধার ধাবে না। এজেন্টকে বলা হতো কোচের লিডার। তার তত্ত্বাবধানেই গাড়ি চলবে দীর্ঘ পথ। গান্ধীজীকে যাত্রী করতে হলে তাঁকে ভেতরে সাদা প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে বসাতে হবে। ফলে জায়গা থাকলেও টিকিট বাতিল। অচেনা একজন কুলি সায়েবদের সঙ্গে বসে যাবে?

গাড়ির চালককে বসতে হয় ওপরে। তার দুপাশে দুটো বসার আসন। সেই আসনের একটায় বসে চালকের সাহায্যকারী, অন্যটায় বসে লিডার। শেষে ঠিক হলো লিডাব ভেতরে যাত্রীদের সঙ্গে বসবে, গান্ধীজী বসবেন কোচ বক্সে লিডারের আসনে। অতি অপমানকর প্রস্তাব; তবু মেনে নিতে হলো, যেতে যখন হবে, উপায় কি। প্রতিবাদে যা হবে তা তো জানাই আছে, মোহনদাসকে ফেলে রেখে গাড়ি চলে যাবে? পরের দিন পরের গাড়িতে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

গাড়ি চলেছে। বেলা তিনটে নাগাদ যে জায়গায় এলো, সেই জায়গাটার নাম, পারদেকোফ। লিডার বেরিয়ে এল ভেতরের আসন ছেড়ে। এইবার তার একটু মুক্তাসনে বসার বাসনা। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বাকি পথ যাবে। ময়লা চিট একটা থলে টেনে নিয়ে পাদানিতে বিছিয়ে দিয়ে গান্ধীজীকে বললে, 'এইবার তুমি এইখানে বোসো। আমি এইবার ওপরে ড্রাইভারের পাশে বসবো।'

গান্ধী আর পারলেন না। এত বড় অপমান হজম করা শক্ত। ভয়ে বাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,

'শোনো সায়েব, আমি একজন যাত্রী। আমার ভেতরের আসনেই বসার কথা। তুমি আমাকে বাইরে বসিয়ে অপমান করেছো। ওই পর্যন্ত আমি মেনে নিয়েছি। আর না, এখন তুমি বলছ, বাইরে বসে সিগারেট ফুঁকবে আর আমাকে বসতে হবে তোমার পায়ের তলায়। তোমার এই প্রস্তাব আমি মানতে রাজি নই। আমি ভেতরের আসনে বসতে রাজি আছি।'

কথা তখনও শেষ হয় নি। অসভ্য সেই সায়েব গান্ধীজীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কান দুটো ধরে আচ্ছা করে মলতে লাগল। গান্ধীজীর হাত ধরে আসন থেকে টেনে নামিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল। কোচ বক্সের পেতলের রেলিং দু হাতে শক্ত করে ধরে আছেন মোহনদাস। লোকটা টেনে নামাতে চাইছে। বলশালী মানুষ। টানের জোরে মনে হচ্ছে দুর্বল হাতের কবজি না ভেঙে যায়। লোকটা অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে আর হিড়হিড় করে টানছে। অন্যান্য যাত্রীরা এই অত্যাচারের নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে। শেষে জনাকয়েক যাত্রীর মায়া হলো। তাঁরা বললেন, 'ওহে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ওকে আর মেরো না। ভদ্রলোকের তো কোনও দোষ নেই। হি ইজ রাইট। সে রকম হলে ভেতরে পাঠিয়ে দাও। আমাদের এখানে তো জায়গা রয়েছে।'

লোকটা চিৎকার করে বললে, 'ভয় নেই।' কিন্তু অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের সমর্থন না পাওয়ায় হতাশ হলো। মার বন্ধ করে গান্ধীজীর হাত ছেড়ে দিল। আরও কিছুক্ষণ গালিগালাজ করে, অন্য আসনে যে হটেনটটটি বসে ছিল তাকে পাদানিতে নামিয়ে দিয়ে সেই আসনটি নিজে দখল করে নিল।

গোলমাল থামায় যাত্রীরা আবার যে যার আসনে বসে পড়ল। বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। কোচবক্সের একপাশে গান্ধীজী অন্যপাশে সেই রাগী সায়েবটি। গাড়ি ছুটছে। লোকটি আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে শাসাচ্ছে। আঙুল তুলে বলছে, স্ট্যান্ডারটনে চলো তারপর আমি তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

এ দেশের একালের মাস্তান আর সে-দেশের সেকালের মাস্তান বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। সিন্নি দেখলে এগোয় কোঁতকা দেখলে পেছোয়। স্ট্যান্ডারটন পৌঁছতে রাত নেমে গেল। দাদা আবদাল্লা সেখানকার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের টেলিগ্রামে জানিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর ব্যারিস্টার মোহনদাসজী যাচ্ছেন। গান্ধীজী গাড়ির টং থেকে নেমেই অনেক ভারতীয় মুখ দেখতে পেলেন। এখন তিনি দলে ভারি। সেই সাদা মাস্তানের হুমকিই সার হলো ভারতীয়রা সদলে গান্ধীজীকে নিয়ে এলেন ঈশা শেঠের দোকানে। তাঁরা সব শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। সেই একই সান্ত্বনা, এখানে আমরা এই অত্যাচার সহ্য করে চালিয়ে যাচ্ছি।

গান্ধীজী ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। সেই রাতেই কোচ কম্পানির বড় কর্তাকে চিঠিতে সব জানালেন। লিখলেন, কাল সকালে যে গাড়ি ছাড়বে, সেই গাড়িতে যেন ভদ্রোচিত ব্যবস্থা থাকে। এজেন্ট বোধহয় ভদ্র ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে জানালেন, স্ট্যান্ডারটন থেকে কাল সকালে যে গাড়ি ছাড়বে সে গাড়ি অনেক বড় আর তার ইনচার্জও আলাদা। আপনার জন্যে গাড়ির ভেতরেই আসনের ব্যবস্থা থাকবে।

পরের দিন সকালে ঈশা শেঠের লোকজন গান্ধীজীকে গাড়িতে তুলে দিলেন। তিনি ভদ্রভাবেই সে রাতে জোহানেসবার্গ-এ পৌঁছে গেলেন। আবদাল্লা শেঠ জোহানেসবার্গের বড় ব্যবসায়ী কসম কামরুদ্দিনকে জানিয়ে রেখেছিলেন। স্টেজ স্টেশানে তাঁকে নেবার জন্যে ওই ফার্মের প্রতিনিধিও এসেছিলেন। বিশাল কর্মব্যস্ত শহর। অসংখ্য লোকজন। কামরুদ্দিনের প্রতিনিধি গান্ধীজীকে চিনতে পারলেন না। গান্ধীজীও চিনতে পারলেন না। কয়েকটা বড় বড় হোটেলের নাম জানা ছিল। একটা গাড়ি ভাড়া করে গান্ধীজী চলে গেলেন গ্র্যান্ড ন্যাশনাল হোটেলে। জানা ছিল না হোটেলও বর্ণ-বিদ্বেষী। রিসেপশানিস্ট এক নজর দেখে নিয়েই বললেন, দুঃখিত, আমাদের এখানে কোনও ঘর খালি নেই। গান্ধীজীর কাছে আবদাল্লা শেঠের ঠিকানা ছিল। গাড়ি ঘুরিয়ে সেখানে চলে গেলেন। সেখানে তাঁরা হোটেলের ঘটনা শুনে, হো হো করে হেসে উঠলেন।

'আপনি কি করে ভাবলেন হোটেল আপনাকে ঘর দেবে?'

গান্ধীজী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন দেবে না?'

'এখানে কয়েক দিন থাকলেই আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন। এখানে আমরা হাজার অপমান সহ্য

করে পড়ে আছি টাকার জন্যে। যত দিন থাকবো, এই ভাবেই থাকতে হবে।'

শেঠ আবদুল গনি তখন অপমান আর অত্যাচারের ফিরিস্তি দিলেন।

বললেন, 'এদেশ আপনার মতো মানুষের জন্যে নয়। এই তো কাল আপনি প্রিটোরিয়া যাবেন। আপনাকে যেতে হবে থার্ড ক্লাসে। এখানে কালা আদমিদের ফার্স্ট কি সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণের অধিকার নেই।

নাটালের চেয়ে এই ট্রানসভালে বর্ণ-বিদ্বেষের মাত্রা অনেক বেশি।

গান্ধীজী বললেন, 'আপনারা অনবরত কেন চেষ্টা চালাচ্ছেন না। অধিকার তো অর্জন করতে হবে।'

'আমাদের আবেদন নিবেদনে কোনও কাজ হয় নি। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের লোকেরাও প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে চায় না। তারা তৃতীয় শ্রেণীই পছন্দ করে।'

গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে এক খন্ড 'রেলওয়ে রেগুলেশান' চেয়ে আনালেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। দেখলেন বহু ফাঁকফোকর রয়েছে। পুরনো ট্র্যানসভাল আইনের ভাষা মোটেই স্পষ্ট নয়, যথোচিত নয়, নির্দিষ্ট নয়। বহু রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে। রেলের আইনকানুন তো গোলমেলে। বইপত্তর ঘেঁটে গান্ধীজী শেঠকে বললেন, 'আমি ফার্স্টক্লাসেই যেতে চাই। আর তা যদি না পারি, তাহলে একটা গাড়ি ভাড়া করে, টানা গাড়িতেই প্রিটোরিয়া যাবো, মাত্র সাঁইত্রিশ মাইলের তো ব্যাপার। এমন কিছু দূর নয়।

শেঠ টানা গাড়িতে যাওয়াটা সমর্থন করলেন না। বেশি সময় লাগবে, বেশি টাকা লাগবে। শেঠ বললেন, তার চেয়ে আপনি বরং প্রথম শ্রেণীতেই চেষ্টা করুন। তখন স্টেশান মাস্টারকে একটা নোট পাঠানো হলো। সেই নোটে গান্ধীজী লিখলেন, 'আমি একজন ব্যারিস্টার। আমি সব সময় প্রথম শ্রেণীতেই ভ্রমণ করে থাকি। আমার জরুরি কাজ আছে। কালই আমাকে প্রিটোরিয়া যেতে হবে। এই নোটের উত্তর পাঠাবার সময় আপনার নেই। কাল স্টেশানে আপনার সঙ্গে আমার যখন দেখা হবে, তখনই উত্তর দেবেন। তবে আমি আশা করব, আপনি আমাকে ফার্স্ট ক্লাসের একটি টিকিট দেবেন।'

লিখিত উত্তর না চাইবার কারণ, লিখিত উত্তরে স্টেশানমাস্টার সরাসরি না বলে দিতে পারতেন, সামনাসামনি না বললে আইনের ধারা তুলে তর্কবিতর্ক চালানো যাবে। ছেঁদো আইন নিয়ে কর্তৃপক্ষ বেশিক্ষণ লড়তে পারবেন না। তা ছাড়া কুলি ব্যারিস্টার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে স্টেশান মাস্টার বুঝতে পারবেন, কি ধরনের কুলি। কোন্ জাতের কুলি। পাক্কা সায়েব সেজে যাবেন। চোস্ত ইংরেজী বলবেন। কিংস ইংলিশ।

পরের দিন গান্ধীজী নিজেকে নিখুঁত করে সাজালেন। পরনে ফ্রক কোট। গলায় নেকটাই। কাউন্টারে একটা 'সভরেন' ফেলে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট চাইলেন।

স্টেশান মাস্টার অনুমানে চিনলেন। প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কাল আমাকে একটা নোট পাঠিয়েছিলে?'

'ঠিক তাই। তুমি যদি আমাকে একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট দাও, বড় বাধিত হব, কারণ আজই আমাকে প্রিটোরিয়া যেতে হবে।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। চোখে সহানুভূতির দৃষ্টি। বললেন, 'শোনো, আমি ট্র্যানসভালের মানুষ নই। আমি হল্যান্ডের লোক। আমি তোমার যন্ত্রণা মনে মনে অনুভব করতে পারছি। তোমার প্রতি আমার সহানুভূতিরও অভাব নেই। আমি তোমাকে টিকিট দোবো, তবে একটি শর্ত, ট্রেনের গার্ড যদি গন্ডগোল করে, তোমাকে যদি থার্ড ক্লাসে পাঠাতে চায় আমাকে কোনও ভাবে জড়ানো চলবে না। তার মানে রেল কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করা চলবে না। দেখেই বুঝতে পারছি, তুমি নিপাট ভদ্রলোক। এই নাও টিকিট। আই উইশ ইউ এ সেফ জারনি।'

গান্ধীজীর সঙ্গে শেঠ আবদুল গনিও স্টেশানে এসেছিলেন। তিনি বেশ অবাক হলেন। অনড় গান্ধীজী অন্তত সাময়িক ভাবে নড়াতে পেরেছেন। তবু তাঁর সন্দেহ ঘুচলো না। তিনি বললেন, 'ভালোয় ভালোয় প্রিটোরিয়া পৌঁছতে পারলে হয়। আমার ঘোর সন্দেহ আছে, গার্ড আপনাকে ফার্স্টক্লাসে শান্তিতে থাকতে দিলে হয়। গার্ড ছেড়ে দিলেও যাত্রীরা সহজে ছাড়বে কি!'

গান্ধীজী গাড়িতে উঠে পড়লেন। ট্রেন ছেড়ে দিল। যাত্রীদের তরফ থেকে কোনও আপত্তি উঠল

না। কয়েক স্টেশান পরেই কম্পার্টমেন্টে গার্ড এল টিকিট মেলাতে। কালো আদমি গান্ধীজীকে দেখেই মহা খাপ্পা। আঙুল উঁচিয়ে বললে, 'এখানে কেন? যাও, যাও, থার্ডক্লাসে যাও।'

গান্ধীজী সেই ক্ষিপ্ত শ্বেতাঙ্গকে তাঁর টিকিটটি দেখালেন।

সে বললে, ও সব টিকিট-ফিকিট তোমার পকেটে রাখো। টিকিট দেখিয়ে কিছু হবে না। যাও, যাও থার্ডক্লাসে চলে যাও।'

কম্পার্টমেন্টে তখন একজন মাত্র ইংরেজ যাত্রী। তিনি গার্ডকে ধমক লাগালেন, কি হচ্ছে কি? কেন, তুমি শুধু শুধু ভদ্রলোকের পেছনে লেগেছ! দেখতে পাচ্ছ না, ভদ্রলোকের কাছে ফার্স্ট ক্লাস টিকিট রয়েছে। উনি যদি এই কম্পার্টমেন্টে থাকেন আমার কোনও অসুবিধা নেই, আপত্তি নেই।'

গার্ডকে দাবড়ে ভদ্রলোক গান্ধীজীকে বললেন, 'আপনি আরাম করে বসুন।'

গার্ড বিড়বিড় করে বললে, 'ঠিক আছে, আপনি যদি কুলির সঙ্গে ভ্রমণ করতে চান, তো করুন। আমার কি!'

১৮৮৮ আর ১৯৮৭। সময়ের স্রোতে একশোটা বছর গড়িয়ে গেল। অবস্থা, যথা পূর্বম্, তথা পরম্। সেই ট্রান্সভাল, সেই অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট। সেই দক্ষিণ আফ্রিকা। থেকে থেকেই সংবাদপত্রের পাতায় ভেসে ওঠে নাম। দক্ষিণ আফ্রিকা একটি মালভূমি। তিনটে বিশাল নদী এই ভূভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত—জাম্বেজি, লিমপোপো আর অরেঞ্জ। দূর অতীতে ১৬৫২ সালে 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' কেপ অফ গুড হোপে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৭৯৫ সালে সেই কলোনি হাত বদল হয়ে চলে গেল ইংরেজদের হাতে। শুরু হলো সংগ্রামের শতক। আফ্রিকায় বসবাসকারী ওলন্দাজদের বলা হতো 'বোয়ার'। তিন পক্ষের লড়াই শুরু হলো। ব্রিটিশ, বোয়ার আর আফ্রিকান। অধিকারের সংগ্রাম। ইংরেজ শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে কেপ কলোনির প্রায় অধিকাংশ বোয়ার তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেল অরেঞ্জ নদীর পরপারে। ইতিহাসে এর নাম 'গ্রেট ট্রেক'। মানুষের ইতিহাসে এই অদৃষ্ট যাত্রার অভাব নেই। ১৮৩৫ সালে বোয়াররা যেখানে বসতি স্থাপন করল তার নাম হলো 'অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট।' তারা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল ভাল নদীর ওপারে। জায়গাটির নাম হলো, 'ট্রান্সভাল'। লোভী ইংরেজরা সেখানেও নাক গলাতে চাইল। সেই নাক গলানো থেকে বেধে গেল 'বোয়ার যুদ্ধ'।

আফ্রিকা যেন একটা বোম্বাই কেক। সভ্যতার দরজা খুলে পশ্চিমী দেশের ডাকাবুকোরা ঢাল তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খাবলাখাবলি ব্যাপার। দক্ষিণ আফ্রিকায় দুটি ইওরোপীয় শক্তি একই সঙ্গে থাবা বাড়াবার চেষ্টা করেছিল। আর ইতিহাসের শুরু সেই সময় থেকে।

১৮৩৩ সালের আগে এই দুটি শক্তির রূপরেখা খুবই স্পষ্ট ছিল। বোয়ার যারা উত্তমাশা অন্তরীপে প্রথম ঘাঁটি গেড়েছিল চরিত্রগত ভাবে তারা ছিল কর্কশ প্রকৃতির, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, স্বাধীনচেতা। তারা চেয়েছিল নির্বিবাদে, নিজের মতো করে দেশটাকে শোষণ করতে। দেশের জমিজমা, প্রাকৃতিক সম্পদ। তাদের ধর্ম, তাদের মন যে বোধটা সৃষ্টি করেছিল তা হলো ও দেশের কালো আদি মানব, যাদের তারা ক্রীতদাস করেছে, তারা নিকৃষ্ট, ইতর। তারা দাস হবার জন্যেই জন্মেছে। আমরা প্রভু। পরবর্তী কালে মিশনারীরা এসে যখন এই নিপীড়িত মানুষের মানবিকতা ফিরিয়ে দেবার আন্দোলন শুরু করলেন তখন বোয়াররা প্রমাদ গণলেন। ছোট ছোট মানবগোষ্ঠী আফ্রিকার এক একটি অঞ্চল দখল করে পুরুষানুক্রমে স্বাধীন ভাবে, নিজেদের মতো করে রাজত্ব চালাচ্ছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রের সভ্য হলে যে সব বিধিনিষেধ মানতে হয় তা তাদের জানা ছিল না। মানসিক প্রস্তুতিরও অভাব ছিল। সেই কারণেই পাশাপাশি বাস করেও বোয়ার আর ব্রিটনরা মিলতে পারে নি। মিলেমিশে এক হয়ে যেতে পারে নি।

১৮৩৩ সালে দাস প্রথার উচ্ছেদ হলো। অন্য অনেক কারণের মধ্যে 'গ্রেট ট্রেক'-এর প্রধান কারণ হলো দাস প্রথার অবসান। বোয়াররা সরে গেল অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে আর ট্রান্সভালে। ইংরেজরা বসে পড়লেন কেপ প্রভিনসে আর ডারবানের চারপাশে নাটালে। ওই সময় ইংরেজরা বড় চাপে ছিল। এক দিকে বোয়ার। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক। অন্য দিকে আফ্রিকার আদিবাসীদের বিদ্রোহী মনোভাব। ফলে ইংরেজরা বোয়ারদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়ে রেখেছিল।

এর পরের কুড়িটা বছর ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রসারের ইতিহাস। আর বোয়ার প্রজাতন্ত্রের টালমাটাল

অবস্থা। নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার আর আদিবাসীদের সঙ্গে অনবরত সঙ্ঘর্ষ। ইংরেজ মিশনারী আর ব্যবসায়ীরা ক্রমশই সংখ্যায় বাড়তে লাগল। বোয়ারদের অধিকৃত অঞ্চলের চারপাশ দিয়ে ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যের সীমা বাড়িয়েই চলল। ট্রান্সভালের পাশ দিয়ে পশ্চিমে, উত্তরে বেচুয়ানাল্যান্ড।

ত্রিমুখী সংগ্রামের জমি তৈরি হলো। তিনটি পরস্পর মারমুখী শক্তি। ইংরেজ, বোয়ার আর দেশীয় মানুষ। দেশীয় মানুষদের বিদ্রোহীভাব ক্রমশই বাড়ছিল। বাড়তে বাড়তে বিপদসীমা পেরিয়ে যাবার অবস্থা। মোশেষের নেতৃত্বে বাসুতোরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জাতি গঠন করে ফেলেছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে এক প্রবল দেশীয় শক্তি। তার চেয়েও প্রবল প্রতিপক্ষ, জুলু প্রধান সেটেওয়ায়ো।

এই যখন রাজনীতির ঘোলাটে অবস্থা, তখন ১৮৫৯ সালে কিম্বারলেতে বেরিয়ে পড়ল অনন্ত সম্পদ। হীরের খনি। ছোটখাটো নয়। বিশাল এক এলাকা। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের সীমানা ঘেঁষে। বোয়ারদের চোখের সামনে সেই সম্পদ চলে গেল ব্রিটিশদের গ্রাসে।

২৬

মনমরা ভোজ সভা। কোনও প্রাণ নেই। ভারতীয় দূতাবাসের হলে নির্বাচিত কয়েকজন নিমন্ত্রিত গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, চুমুকে চুমুকে শুধু স্কচ খেয়ে চলেছেন। দু-একজনের কথা এরই মধ্যে জড়িয়ে এসেছে। লন্ডনের বাতাসে সব সময় একটা ডিপ্রেসান খেলছে। রাস্তায় ঘাটে গোমড়ামুখো সাহেব মেম। আর সরকারি ভোজ সভায় বিরসবদন অতিথিরা। আমার ঐতিহাসিক বন্ধু বললেন, এর জন্যে দায়ী লন্ডনের আবহাওয়া।

পানপর্ব আর দু এক রাউণ্ড গড়িয়েই থেমে গেল। ডাক পড়ল আহারে। আয়োজন পাশের ঘরের বিশাল টেবিলে। ভাগ্য ভালো ভারতীয় মেনু। পাঞ্জাবী প্রথায় রান্না। 'কেমন খেতে'? এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো, 'ওই এক রকম।' খাবা খাবা এক রকম মাছ ছিল। কি মাছ কে জানে, যার এমন গতর! অনেকে বেশ ভালই টানলেন। কুমকুমটা তেমন খেতে পাবল না। আহারের শেষে অফুরন্ত হোয়াইট ওয়াইনের ব্যবস্থা। সেও বেশ ভালোই উড়ল। এক এক জনের ওজন চার পাঁচ কেজি বেড়ে গেল। বেশ রাত হয়েছে। এইবার আমাদের সেই বিমর্ষ ভূতুড়ে হোটেলে ফিরতে হবে। বিদায় নিতে হলো সেই ঐতিহাসিক বন্ধুর কাছ থেকে। জানি, আর কোনও দিন দেখা হবে না, তবু বললুম, মিট ইউ এগেন। এই সব দূর ভ্রমণে মানুষেব সঙ্গে একবারই দেখা হয়।

কিছু তন্দ্রাতুর যাত্রী নিয়ে গাড়ি ফিরে এল হোটেলে। লন্ডনের আকাশে চাঁদ উঠেছে। কেমন যেন অবাক লাগছে। চাঁদ তো আমাদের দেশের জিনিস। অচেনা আকাশে আমার পরিচিতি চাঁদ। হোটেলের কার্পেট মোড়া করিডর সেই পরিচিত পাক মেরে চলেছে। আমার ঘরের আলো তো জ্বালা ছিল না। কে আবার জ্বেলে গেল! গা ছম ছম করছে। এত বড় একটা ঘর। ঢাউস একটা বিছানা। দ্বিতীয় কোনও প্রাণী নেই। হঠাৎ সেই পঞ্চ সখীর কথা মনে পড়ে গেল। হেসে হেসে জিজ্ঞেস করলেন। 'ডু ইউ ওয়ান্ট ইওর বেলি টু বি আপটার্নড?' যদি বলতুম, 'ইয়েস' তা হলে কি হতো?

কুমকুমকে ফোন করলুম, 'কি শুয়ে পড়েছ?'

'প্রায়।'

প্রায় শোয়াটা কি জিনিস! যাক, একজন মহিলার প্রায় শোয়া নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন নেই। সন্ধের ঘটনাটা বর্ণনা করে, জিজ্ঞেস করলুম, ভাই আপটার্ন জিনিসটা কি? কোনও বিলিতি যোগ ব্যায়াম!

কুমকুম হাঃ হাঃ করে হাসল। হেসে বলল,, 'দাদা, বেলি আপটার্নড, বেড। বুঝেছো? ওরা বিছানা করতে এসেছিল।'

বিছানা তো করাই আছে।'

'তবু ঝেড়েঝুড়ে, পারফিউম টারফিউম দিয়ে দিত।'

'গুড নাইট।'

'গুড নাইট। কাল ভোরে ডেকো। এক সঙ্গে বেরবো।'

পর্দা সরিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। চাঁদের আলোর ঝাপসা আঁচল দুলছে। সামনের সেই বাড়িটা কালো সিলুয়েট হয়ে আকাশের পটে আটকে আছে। ঝুল বারান্দার তলায় পড়ে আছে নির্জন পথ। আলো অন্ধকারে রহস্যময়। আর একটু পরেই এই পথ দিয়ে হেঁটে যাবে, হাঞ্চ ব্যাক অফ নোতরদাম। মনে পড়ে গেল অভিনেতার নাম, লনচ্যানি। হঠাৎ যদি ড্রাকুলা এসে হাজির হয় সামনের বারান্দায়। তাড়াতাড়ি পর্দাটা টেনে দিলুম।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি, এখনও হয়তো কমানওয়েলথ কনফারেনস্ চলেছে। আন্তর্জাতিক সভা তো এই রকমই হয়। সময়ের জ্ঞান থাকে না। ১৮৬৯ সালে কিম্বারলেতে ইংরেজরা হীরে পেয়ে গেল। আর দক্ষিণ আফ্রিকার পাওয়ার পলিটিকস নতুন দিকে মোড় নিল। এতকাল টানপোড়েন চলেছিল, মিশনারী স্থানীয় মানুষ আর কৃষিজীবীদের মধ্যে। হঠাৎ শিল্প ঢুকে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে গেল। হীরে তোলার জন্যে চাই টাকা, চাই শ্রমিক আর যন্ত্র। টাকা এল বিদেশ থেকে। কিন্তু শ্রমিক তো খুঁজে বের করতে হবে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের দৃষ্টিভঙ্গী পালটে গেল। শ্বেতাঙ্গ ধর্মপ্রচারকরা দাসপ্রথার অবসান চাইছিল এতকাল। হীরে পেয়ে স্থানীয় মানুষদের শিল্পে কি ভাবে নিয়োগ করা যায় সেই চিন্তাটাই বড় হয়ে উঠল। ধর্মটর্ম সব ভেসে গেল।

আর ইতিহাসের ঠিক এইরকম পটপরিবর্তনের মুহূর্তে দুর্ভাগ্যক্রমে স্থানীয় মানুষরা অশান্ত হয়ে উঠল। তারা ইতিমধ্যেই বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ভালো ভালো নেতার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পেরেছে। প্রথমে এদের হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। সেই অস্ত্রও এসে গেছে বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে। স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে অনেক বেশি। একদিকে সংখ্যাধিক্য, অন্যদিকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ইংরেজদের বেশ ভয়ের কারণ হলো। আরও বেড়ে ওঠার আগেই একটা কিছু করা দরকার, তা না হলে ইংরেজদের হয় মেরে শেষ করে দেবে নয় তো দূর করে দেবে সম্পদের স্বর্গভূমি থেকে। ১৮৭০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজরা যে সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিল ইতিহাসের কোনও সময় আর এমনটি হয় নি।

ঠিক এই সময় বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে ডিজবেলি ক্ষমতায় এলেন। তিনি বৃটেনের দক্ষিণ আফ্রিকা নীতিকে আরও সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে ভাবলেন ফেডারেশানই হলো পথ। জোহানেসবার্গে একজন কমিশনার পাঠালেন। তিনি এলেন তদন্তে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ কি পেতে পারে! কতটা পেতে পারে! আর জুলুদের দিক থেকে কোনও ভয়ের সম্ভাবনা আছে কি না। সব দেখেশুনে কমিশনার সিদ্ধান্তে এলেন, সমস্ত সমস্যা সমাধানের একটিই মাত্র পথ, বোয়ার শাসিত অঞ্চল নিজেদের অধিকারে আনা।

আফ্রিকার ইতিহাস এত জটিল, মাঝবাতে বিদেশ বিভুঁয়ে বসে পাটপাট করে না সাজালে সব এলোমেলো। পঞ্চদশ শতক শেষ হয়ে এল, সমুদ্রবীর পর্তুগীজদের কাছে আফ্রিকা তখনও শুধু মাত্র ভৌগোলিক বাধা নয়। তার চেয়েও বেশি কিছু। আফ্রিকার কূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সব সামুদ্রিক অভিসারের একটিই মাত্র লক্ষ্য, দূরপ্রাচ্যে পৌঁছোবার একটি সামুদ্রিক পথ খুঁজে বের করা।

ভাস্কো ডা গামা। সমুদ্র অভিযানে অবিস্মরণীয় একটি নাম। ১৪৬০ সালে এই মানুষটির জন্ম। সেই বছর, যে বছর 'হেনরি দি ন্যাভিগেটার' ভারতে পৌঁছোবার সমুদ্র-পথ খুঁজতে খুঁজতে প্রায় হতাশ হয়েই মারা গেলেন। ডা গামা চারটি ছোট জাহাজ আর মাত্র ১৬০ জন নাবিক নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছিলেন। ভাস্কো ডা গামার নিজের জাহাজের নাম ছিল 'সেন্ট গ্যাব্রিয়েল'। ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হলে যা হয়। কেপ ভার্দে দ্বীপ পর্যন্ত ডা গামার পাইলট ছিলেন ডিয়াজ। এইখানেই ভাস্কো ডা গামার কৃতিত্ব। গামা এইবার নিজে যাত্রাপথ স্থির করলেন। আফ্রিকার তটভূমি আঁকড়ে থাকার চেষ্টা না করে সরে গেলেন দূর আটলান্টিকে। বিষুবরেখা পর্যন্ত না গিয়ে দক্ষিণমুখো হলেন না। স্থলভাগ থেকে যখন প্রায় দু'হাজার মাইল দূরে, ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকর্নের কাছে ডা গামা পশ্চিমা-বাতাসে পড়ে গেলেন। এই বাতাস তাঁকে কেপের কাছে সেন্ট হেলেনা বে-তে পৌঁছে দিল। সাহসিকতা ও নৌ-চালনার দক্ষতার বিচারে ভাস্কো ডা গামার এই কৃতিত্ব পাঁচ বছর আগে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সমতুল্য।

স্কার্ভি, অর্থাৎ ভিটামিন সি-এর অভাবে ডা গামার নাবিকরা মারা যেতে লাগল ; তবু অবিচলিত

গামা এগিয়ে চললেন। অবশেষে ভারত মহাসাগরে। খ্রীস্টমাসের দিন তিনি যে তটভাগের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তার নাম রাখলেন 'নাটাল'। ইতিহাস অভিযাত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রাজনৈতিক উত্থানপতনেও সেই নাম আজও বজায় আছে। মালিন্দি থেকে সেই সাহসী নাবিক একজন পাইলট ভাড়া করলেন। তাঁর নাম আহমদ ইবন মজিদ। ভারতের পথ তিনিই দেখালেন। কালিকটের মালাবার বন্দরে ভাস্কো ডা গামাকে যে অভ্যর্থনা জানানো হলো, তা অনেকটা যুদ্ধেরই মতো। বুদ্ধিমান বীর তবু কায়দা করে জাহাজ বোঝাই মশলা আর জহরত নিয়ে দেশে ফিরলেন। রাজাকে দেবার মতো দর্শনীয় উপঢৌকন। কিং ইমান্যুয়েল অফ পর্তুগাল। ২৪ হাজার মাইলের এই পাড়ি শেষ করতে ডা গামার দুবছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। ১৪৯৯ সালের আগাস্টে ফিরে এলেন দেশে। ফিরে এল দুটি মাত্র জাহাজ আর ষাটজন মাত্র নাবিক। ক্ষয়ক্ষতি যাই হোক তিনি ভারত মহাসাগরে ইওরোপের বাণিজ্য-পথ খুলে দিলেন।

হোটেলের বিশাল বিছানার সুকোমল আরামে ভাসতে ভাসতে আমি আটলাণ্টিক আর ভারত মহাসাগরের ঢেউয়ের গর্জন শুনছি। ভাবছি মানুষের শক্তি আর সঙ্কল্পের উৎস কি! ধর্ম, রাজনীতি না লোভ? আফ্রিকা আর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকার পর্তুগীজরা অনেক আগেই পেয়েছিল প্রায় একশো বছর আগে। ভাস্কো ডা গামার একশো বছর আগেই উত্তর আফ্রিকার সেউটা পর্তুগীজরা দখল করেছিল। সেই উপনিবেশের ওপরই এসে পড়ল ডা গামার সাফল্য। পর্তুগীজদের জাহাজ, নাবিক, অর্থ সবই কম ছিল। একশো বছর আগে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ডা গামার আমলে ইওরোপের অন্যান্য শক্তি অনেক বেশি তৎপর। সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হলো স্পেন। পর্তুগীজরা পূর্ব আফ্রিকায় আরবদের সঙ্গে আবার এক চুক্তিতে আসতে বাধ্য হলো। আফ্রিকার কি বরাত। মানুষের আদি জন্মস্থানে বিশ্ব শক্তির তাণ্ডব। কে জানত পৃথিবীর ইওরোপ নামক অঞ্চলে মানুষ হঠাৎ বাষ্পের শক্তি আবিষ্কার করে বসবে। আবিষ্কার করে বসবে গান পাউডার আর আদমের ইডেন আফ্রিকায় সৃষ্টিকর্তা সাজিয়ে রাখবেন দারু চিনির বাগান, হীরে আর সোনা। মানুষ টপকে আসবে সমুদ্রের বাধা, সাহারার মরুভূমি।

ডা গামার জাহাজ কেপ ঘুরেই যে জায়গায় নোঙর ফেলল, সে দেশটি ছিল হটেনটটদের। নাবিকরা স্থলভাগে পা রাখতেই তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে এল সৈকত ভূমিতে। তারা নাচতে আর গাইতে লাগল। দলপতিরা এগিয়ে এল ভাস্কো ডা গামার সঙ্গে কথা বলতে। কেউ কারুর ভাষা জানে না। কথা হচ্ছে আকারে ইঙ্গিতে। ডা গামা কথা বলছেন আর লক্ষ্য করছেন ঝোপঝাড়ের আড়ালে ওঁত পেতে বসে আছে তরুণতররা অস্ত্র উঁচিয়ে। ডা গামার দলের সভ্যরা ছোট ছোট উপহারের বিনিময়ে তাদের খুশি করতে পারলেও পরে যে জায়গায় অবতরণ করলেন সে অঞ্চলের অধিবাসীরা আবার সম্পূর্ণ অন্য রকম। অনেক রাগী। মেজাজ ভীষণ উগ্র। কোনও উপহারেই তাদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব হলো না। তাদের পরিধানে বহুমূল্য পোশাক। বোধহয় ব্যবসায়ী আরবদের দান। তাদের কেউ কেউ দূর সমুদ্রে ভ্রমণ করেছে। পর্তুগীজ জাহাজের মতো বড় জাহাজও দেখেছে।

মোম্বাসায় ডা গামা আরও বেশি বাধা পেলেন। এখানকার অধিবাসীরা একেবারে মারমুখী। খুবই স্বাভাবিক। যে কোনও অঞ্চলে পৌঁছবার আগেই পৌঁছে যাচ্ছে তাদের অপকীর্তির কাহিনী। মোজাম্বিকে তাঁরা জোর করে কিছু স্থানীয় মানুষকে জাহাজে তুলেছিলেন বন্দী হিসেবে। এই বন্দীদের কাজ হলো পথ দেখানো। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো নতুন নতুন কূলে। আমরা জাহাজ বোঝাই করি তোমাদের সম্পদে। সাহসে যেমন পর্তুগীজদের তুলনা নেই, অত্যাচারেও তারা অতুলনীয়। পথ দেখাতে অস্বীকার করলে কি ভুল তথ্য দিলে ডা গামা আর তার দলের লোকেরা বন্দীদের গায়ে গরম তেল ঢেলে দিত।

মোম্বাসা বন্দরে, সেখানকার সুলতান বিদেশীদের প্রথমে পাঠালেন উপহার। মাংস আর ফলের টুকরি। তারপর রাত যেই গভীর হলো, নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল নৌকোর পর নৌকো। প্রতিটি নৌকোয় সশস্ত্র মানুষ। সুলতানের নীতি মাংস খাও, মাংস দাও। একমাত্র আরও উত্তরে, মালিন্দি বন্দরে ভাস্কো ডা গামার কূটনীতি সফল হয়েছিল। স্থানীয় কোঁদলকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। মালিন্দি আর মোম্বাসার মধ্যে আকচাআকচি চলছিল। তিনি কিছু লোককে হঠাৎ বন্দী করে ফেললেন। আজ আমরা বিমান ছিনতাই, জাহাজ ছিনতাই, হোস্টেজ, এই সবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এ কিছু আধুনিক ব্যাপার নয়। পাঁচশো বছর আগেই পর্তুগীজ ডা গামা ইতিহাস তৈরি করে রেখে গেছেন।

এই বন্দীদের ভাঙিয়ে ভাস্কো ডা গামা মালিন্দি আর মোম্বাসাকে একটা চুক্তিতে আসতে বাধ্য করলেন।

ডা গামা যে পথ, যে সম্ভাবনার দরজা খুলে দিলেন সেই পথ ধরেই পর্তুগীজদের পরবর্তী অভিযানের ইতিহাস। ১৫০০ থেকে ১৫১০ এর মধ্যে তারা ছটি শহরে পরপর আক্রমণ চালাল। তাদের ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। প্রতিরোধকারীদের তরোয়াল আর তীর ধনুক আধুনিক অস্ত্রে বলীয়ান পর্তুগীজদের কাছে পরাভূত হলো। জাঞ্জিবারে পর্তুগীজ ক্যাপটেন রাভাস্কো যখন স্থানীয় কয়েকটি নৌকো আটক করলেন তখন সেখানকার সুলতান চার হাজার সৈনিকের বিশাল এক বাহিনী পাঠালেন বদলা নেবার জন্যে। মুষ্টিমেয় কিছু পর্তুগীজ সৈন্য স্রেফ কামান দেগে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। অধিকৃত অঞ্চলের সুলতানদের পর্তুগীজরা থাকতে দিত একটি শর্তে। সে শর্ত হলো, নিয়মিত নজরানা দেওয়া।

পর্তুগাল ভাস্কো ডা গামাকে 'ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া' খেতাব দিল। পঞ্চদশ শতক শেষ হয়ে এল। সামুদ্রিক অভিযানে উপলব্ধ জ্ঞান আর অভিজ্ঞতায় পৃথিবী স্থিত হতে চাইল। প্রশ্ন উঠল নতুন মহাদেশ শাসন করবে কে? ১৪৯৪ সালের টরডেসিলাস সন্ধিতে একটা সমাধান পাওয়া গেল। সন্ধির শর্ত নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিলেন, পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার, কুখ্যাত রডরিগো দ্য বোরগিয়া। আলেকজান্ডার দুম করে ইওরোপের বাইরের জগতকে দুভাগে ভাগ করে ফেললেন। পশ্চিম ভাগ দিলেন স্পেনকে আর পূর্ব ভাগ দিলেন পর্তুগালকে। পর্তুগালের কাছে এ এক চ্যালেঞ্জ। পূর্বার্ধ দখলে রাখতে হলে যে শক্তি আর সম্পদ চাই তা কি পর্তুগালের ছিল? পর্তুগাল চেয়েছিল ভারত মহাসাগরে একচ্ছত্র বাণিজ্যের অধিকার। সেই অধিকার অর্জন করতে হলে প্রয়োজন ছিল আফ্রিকার মরক্কো থেকে মোগাদিশু পর্যন্ত ১২ হাজার মাইল উপকূল ভাগের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন। এছাড়াও ভারত এবং দূর পূর্বাঞ্চলও দখলে আনা। উপনিবেশ স্থাপন করা।

কেপ অফ গুড হোপ থেকে আরও উত্তরে এগিয়ে পাক মেরে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে যে দুই পর্তুগীজ ঘাঁটি স্থাপন করলেন তাঁদের নাম দ' আলমিডা আর আলবুকার্ক। ভাস্কো ডা গামার পর এঁরা দুজন ভাইসরয় হয়েছিলেন। ডা গামার প্রত্যাবর্তনের ঠিক আট বছর পরে মোজাম্বিকে একদল পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক পা রাখলেন। প্রথম শ্বেতাঙ্গদের দল যারা বিষুবরেখার দক্ষিণে গেলেন উপনিবেশ স্থাপন করতে। কিন্তু সূচনাটা হলো অশুভ।

অর্ধভাগের অধিকার পর্তুগীজদের ছেড়ে দেওয়া হলেও পূর্ব আফ্রিকা তাদের খুবই হতাশ করল। তারা ভেবেছিল তটভাগ থেকে ভেতরে যেতে পারলেই, সোনা দানা গজদন্ত প্রচুর মিলবে; কিন্তু হতাশ হতে হলো। দোষ তাদের নিজেদের। পর্তুগাল বন্দর শাসনে যে ক্যাপটেনদের নিযুক্ত করলেন, তারা নিজেদের স্বার্থ, নিজেদের লোভ আর লাভটাকেই বড় করে তুলল। তারা আরব বণিকদের হটিয়ে আফ্রিকানদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করল। তাদের সেই ভয়াল আর ভয়ঙ্কর পদ্ধতিতে শুরু হলো ভীতির রাজত্ব। ফলে তারা তাদের উপকূল ভাগের দুর্গ ছেড়ে ভেতরে বেশি দূর এগোতে পারল না। অনেকটা সেই বর্গী এলো দেশের মতো আতঙ্কে স্থানীয় মানুষ পর্তুগীজদের নিষ্ঠুরতায় পালাতে লাগল। মোজাম্বিকের দক্ষিণে সোফালার চারপাশেই তারা সীমাবদ্ধ রইল। ভেতরে ঢোকার সাহস আর হলো না।

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভাগে সাহস করে প্রথম যে শ্বেতাঙ্গ মানুষটি এগিয়ে গিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, তিনি একজন পতিত পর্তুগীজ সরকারী কর্মচারী। নিজের দেশে নানা অপকর্মের জন্যে যাঁর মানসম্মান কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই আন্তোনিয়ো ফার্নান্ডেজকে লিসবন থেকে পাঠানো হলো সোফালায়। তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়ল, যে ঘাঁটি থেকে সোফালায় সোনা আসে সেই ঘাঁটির অনুসন্ধান। ১৫১৪ সালে লিসবন থেকে ফার্নান্ডেজের যাত্রা শুরু হলো। লক্ষ্য জিম্বাবোয়ে। খুবই সাহসের ব্যাপার। সোফালায় পর্তুগীজ উপনিবেশ তখন টলটলায়মান। আরব আর তাদের আফ্রিকান সঙ্গী সাথীদের বার বার আক্রমণে বিপর্যস্ত। অন্তর্ভাগে মূল ভূখণ্ডে রাজত্ব করছেন সাংঘাতিক এক আফ্রিকান দলপতি মত্তয়েনে মতাপা। ইতিহাস যাঁকে খেতাব দিয়ে রেখেছেন, 'দি গ্রেট প্লান্ডারার'। পর্তুগীজরা যাঁর নাম রেখেছিল, মোনোমোতাপা। কিংবদন্তী, এই সেই ভূখণ্ড 'ওফির' যেখান থেকে রাজা সোলোমন তাল তাল সোনা সংগ্রহ করতেন। সেই কোন্ শৈশবে দেখেছিলাম সিনেমা—'কিং সোলোমনস মাইন'। নির্বাসিত সরকারী অফিসার ফার্নান্ডেজ আসছেন সেই কিং সোলোমনস মাইনের সন্ধানে।

ফার্নান্ডেজ জাহাজে একটি পর্বতমালার পাশ দিয়ে প্রবেশ করলেন 'সাবি' উপত্যকায়। আধুনিক কালে যে জায়গাকে বলা হয় রোডেশিয়া। এই সাবি উপত্যকা থেকে ফার্নান্ডেজ সেবার ফিরে গেলেন। পরে আবার একবার এলেন। সেবার ফিরে গিয়ে কিংকে জানালেন, উপত্যকাটি স্বাস্থ্যকর, ইওরোপীয়দের বসবাসের উপযোগী। তিনি বললেন, কর্তৃপক্ষের উচিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্যে অভ্যন্তর ভাগে দুর্গ স্থাপন করা। যদিও অঞ্চলটির ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব মনোমোতাপা অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েক হাজার আরবের।

ইসলাম না খ্রীস্টান, কার শক্তি বেশি? প্রশ্নটা করে বিছানায় উঠে বসলুম। হোটেলের সেই বহু মূল্য ঘরটি কেমন যেন ভৌতিক হয়ে উঠেছে। নেমে পর্দা সরিয়ে আকাশটা একবার দেখে নিলুম। লন্ডনের আকাশ পুরোপুরি অন্ধকার হয় না। আকাশের চোখে ঘুম নেই। আমার চোখেও ঘুম নেই। আবার ফিরে এলুম বিছানায়। বিলিতি সিনেমায় বিলিতি শয়ন দেখেছি। মাথার তলায় থাকে ঢাউস দুটো বালিশ। মাথা আর ঘাড় থাকে দোতলায়, শরীরটা থাকে একতলায় চিৎ হয়ে। ফাস্ট ফ্লোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর টেকনিক। সেই ভাবেই শুয়ে পড়লুম আবার। ওদিকে লিসবনে পঞ্চাশটা বছর হতোদ্যমে কেটে গেল। ফার্নান্ডেজের সুপারিশ রাজদপ্তরে চাপা পড়ে রইল। মোনোমোতাপার রাজধানী ছিল ফুরা পর্বতে। আর একজন মাত্র সাহসী পর্তুগীজ ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী না বলে সওদাগর বলাই ভালো, সওদাগর আন্তোনিও কোইআদো সবার অলক্ষ্যে বসবাস করছিলেন সেই ফুরা পর্বতের রাজধানীতে। বর্তমান স্যালিসবেরির খুব কাছাকাছি একটি অঞ্চল। সেই আন্তোনিয়োকেও পর্তুগীজরা দূত হিসেবে কাজে লাগাতে পারল না।

১৫৬০-এর দরজায় এসে আমার জাহাজ থামল। এবার ইতিহাস এগিয়ে আসছে অন্যদিক থেকে। গোয়া বন্দর থেকে বাইবেল হাতে জাহাজে উঠছেন এক জেসুইট.পাদরি, গনসালো দা সিলভেইরা। সোনা নয়, হীরে নয়, তিনি মনোমোতাপা অঞ্চলে চলেছেন পাপী-তাপীর সন্ধানে। 'তাহাদিগকে উদ্ধার কর, যাহারা মৃত্যুর কাছে নীত হইতেছে। যাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে বধ্যাস্থানে যাইতেছে, আহা! তাহাদিগকে রক্ষা কর।'

২৭

আফ্রিকা আর ভারত ইতিহাসের একটা সময়ে প্রায় সমান দুর্ভাগ্যের অধিকারী। ভারত কাটাতে পেরেছে ধর্মের জোরে, সংস্কৃতির জোরে। আফ্রিকার সমস্যা, বিশাল বিপুল ভূখণ্ডের অঞ্চলে অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটলেও মূল সুর ছিল যুদ্ধ। শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করা যায় না। শক্তি আপেক্ষিক শব্দ। স্তর আছে। ভেদ আছে। আমি শক্তিশালী। আমার চেয়ে সে আরও বেশি শক্তিশালী। আফ্রিকায় কেউ সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে ঢুকেছে। কেউ ধর্ম নিয়ে ঢুকেছে। ধর্ম সাম্রাজ্যবাদের চেহারা নিয়েছে। অফুরন্ত সম্পদ থাকার এই বিপদ।

ডন গনসালো ডা সিলভেয়িরা। গোয়া থেকে জাহাজে চাপলেন। নামলেন এসে মোনোমোতাপার রাজত্বে। ভয়ঙ্কর সেই ট্রাইব্যাল চিফ। ১৫৬০ সাল। জেসুইট পাদরি এলেন.মানবমুক্তির সদুদ্দেশ্যে। মোনোমোতাপা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনাই জানালেন। কিন্তু নিজের দোষে সেই ধর্মপ্রচারক দুর্ভাগ্য ডেকে আনলেন। মোনোমোতাপা তাঁকে ভালোবেসে উপহার দিলেন ক্রীতদাস, গাভী আর সোনার তাল। সিলভেয়িরা উপহার প্রত্যাখ্যান করলেন। আরবরা ফুরা পর্বতের রাজধানীতে গুজব ছড়িয়ে দিলেন, পর্তুগীজ পাদরি আসলে একজন যাদুকর। অশুভ শক্তির প্রভাবে রাজাকে বশ করতে এসেছে। সিলভেয়িরা পঞ্চাশজন আফ্রিকানকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। সিলভেয়িরা আর সেই পঞ্চাশজনকে একে একে খুন করা হলো। এরপর আরও কয়েকজন ধর্মপ্রচারক এলেন, কিন্তু দাঁত ফোটাতে পারলেন না।

কোথাকার জল কোথায় গড়ায় বলে একটা কথা আছে। আফ্রিকাতেও ঘটনার জাল দূর বিস্তৃত। পাঁচশো বছরের ট্র্যাডিশান চলছে তো চলছেই। সাল ১৫৬৯। পর্তুগালের রাজা তখন সেবাস্তিয়ানো।

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভাগ জয় করার জন্যে এবার তিনি এক শক্তিশালী বাহিনী পাঠালেন। সেই বাহিনীর পরিচালক হলেন ফ্রানসিসকো ব্যারেটো। ব্যারেটোর বাহিনী মোনোমোতাপায় নেমে দেখল, সেখানে আদিবাসীদের যুদ্ধ চলেছে। ব্যারেটো বুদ্ধি করে মোনোমোতাপার পক্ষ অবলম্বন করলেন। কিন্তু ভাবলেন এক হলো আর এক। চালে ভুল হয়ে গেল। যুদ্ধে মোনোমোতাপার আর ব্যারেটো কোম্পানির হার হলো। হটতে হটতে তাঁরা চলে এলেন উপকূল ভাগে। সেখানে ব্যারেটোর মৃত্যু হলো। পর্তুগীজদের দ্বিতীয় অভিযান আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেও শেষমেষ ফিরে এল মার খেয়ে।

পর্তুগীজদের তখন আশাব আলো হয়ে দাঁড়াল 'খ্রীস্টান ইথিওপিয়া'। খ্রীস্টান ইথিওপিয়ার সঙ্গে পর্তুগীজদের একটা আঁতাত হলো। অটোমান টার্ক তখন প্রাচ্যের বাণিজ্য পথে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পর্তুগীজরা তুর্কিদের সেই আধিপত্য খর্ব করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। এই বাণিজ্য থেকে ইজিপ্টের সুলতানের আয় তখন বাৎসরিক দুলক্ষ নব্বই হাজার পাউন্ড। আলেকজেন্ড্রিয়ায় তখন তিন হাজার ভিনিসিয়ের বসবাস। তারাই সুলতানকে উস্কে দিল পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। আফ্রিকার আর এক প্রান্তে আর এক নাটক। ১৫০৯ সালে শুরু হলো ইথিওপিযাব যুদ্ধ। বোম্বাইয়েব উত্তরে দিউ-এর কাছে পর্তুগীজরা আলমিডার নেতৃত্বে তুর্কির নৌবহর ডুবিয়ে দিল। সমুদ্রপথ পর্তুগীজদের জন্যে উন্মুক্ত হলো। তারা তখন লোহিত সাগরের মাসমায়া পর্যন্ত সহজেই যাতায়াত করতে পারে। ১৫২০তে ইথিওপিয়ার সঙ্গে পর্তুগালের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো। ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের পেছন পেছন গিয়ে হাজির হলো জেসুইট মিশনারীর দল। মাত্র সাত বছরের সুসময়। ১৫২৭ সালে তুর্কিরা ইথিওপিয়া আক্রমণ করে প্রায় পুরোটাই দখল করে নিল। খ্রীস্টানদেব অবশিষ্ট দল পালিযে আশ্রয় নিল পাহাড়ে পর্বতে। পনেরটা বছর চলে গেল। ১৫৪১ সালে ভাস্কো ডা গামার পুত্র তুর্কী অবরোধ ভেঙে দিল। চারশো সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে লোহিত সাগবের কূল থেকে তুর্কিদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তিনি ইথিওপিয়ায় পৌছলেও প্রথম যুদ্ধেই নিহত হলেন। সেই দলেরই একজন জীবিত সৈনিকের উদ্যমে শেষপর্যন্ত ইথিওপিয়ানরা মানা হ্রদের কাছে তুর্কিদের নিশ্চিহ্ন করে দিল। সেই পর্তুগীজ বীর কেমিস্ট্রি জানতেন। স্থানীয় সোরা আর গন্ধক থেকে তিনি বারুদ তৈবি কবে ফেললেন। সেই বারুদে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল।

কিন্তু আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে ভাগ্যদেবী সহজে পর্তুগীজদের দিকে মুখ তুলে তাকাননি। ১৫৮৬ সালে মিরালে বে বণতবীব বহব নিযে জিদ্দা থেকে যাত্রা কবলেন। পূর্ব আফ্রিকার আরবদেব বলে গেলেন আমি পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে জিহাদে চলেছি। পর্তুগীজ অধিকৃত কিছু শহর দখল করে পঞ্চাশজন শ্বেতাঙ্গ বন্দী সহ জিদ্দায় ফিবে এলেন। গোয়া থেকে পর্তুগীজরা নৌবহর পাঠালেন মোম্বাসায়। কারণ মোম্বাসায় তুর্কিরাই মিরালে বেকে সাহায্য করেছিল। তাদের শায়েস্তা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই সময় খেলাটা বেশ জবরদস্ত জমে উঠল। মিরালে বে একদিকে আর কুড়ি হাজারের মতো এক নরখাদক বাহিনী আর একদিকে। এই নবখাদকেব দলেব নাম ছিল ওয়াজিম্বা। ওয়াজিম্বারা পর্তুগীজ ঘাঁটি তছনছ করতে লাগল। প্রায় হাজার তিনেক পর্তুগীজ যোদ্ধা নিহত হলো। কিছু কিছু চলে গেল রোস্ট হয়ে পেটে। মোম্বাসার তুর্কীরা তখন সেই ওয়াজিম্বাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেলল। তারপর সেই যুক্তবাহিনী পর্তুগীজ ঘাঁটি ধ্বংস করতে কবতে ক্রমশ ভেতর দিকে, আরো ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু গানপাউডার। কারলাইলের কথায় : The three great elements of modern civilisation, Gunpowder, Printing and the Protestant relegion. পর্তুগীজরা অবশেষে মিরালে বেকে বন্দী করে ফের ক্ষমতায় ফিরে এল। মিরালেকে চালান করে দেওয়া হলো লিসবনে। কিনিয়ার উপজাতিরা নরখাদক ওয়াজিম্বাদের মেরে শেষ করে দিল। মাত্র শ'খানেক নরখাদক কোনও রকমে প্রাণে বেঁচে পালাতে পেরেছিল।

ষোড়শ শতকে ইওরোপীয়দের কাছে আফ্রিকা মধু, মরিচ, সোনা, হাতির দাঁত নয় আরও বেশি কিছু। ক্রীতদাস। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ইওরোপীয়দের চাষবাস বাড়ছে, বাগবাগিচা তৈরি হচ্ছে। সেই লাভের ব্যবসায় খাটবে কে! রোদে পুড়বে, জলে ভিজবে। আফ্রিকার অসহায় কালো মানুষ। ১৪৬০ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল পর্তুগীজদের দাস-ব্যবসা। আফ্রিকা থেকে কালা আদমি ধরে এনে লিসবনে বিক্রি করত। ষোড়শ শতকে দাসবাজার আরও জমে উঠল। নতুন নতুন উপনিবেশ তৈরি হচ্ছে আর

জাহাজ বোঝাই দাস আসছে আফ্রিকা থেকে।

আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের খুব কাছে সাও থোমে আর ফারনান্দো পোতে পর্তুগীজের রমরমা চিনির ঘাঁটিতে দাস। আখ আর চিনি যত মিষ্টি তার পেছনের কাহিনী তত তিক্ত। পেড্রো কাবরাল ১৫০০ সালে আবিষ্কার করলেন ব্রাজিল। আমেরিকার বিশাল সম্পদ আয়ত্তে আনতে চাই শ্রমিক। ইউরোপীয় প্রভুরা স্থানীয় মানুষের কর্মক্ষমতায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। লোভের সঙ্গে শ্রম পাল্লা দিতে পারে না। ক্যারিবিয়ায় প্রথম প্রথম নিগ্রোর চালান আসত স্পেন থেকে, পর্তুগাল থেকে। হঠাৎ ইওরোপীয় প্রভুদের মনে হলো বোকামি হচ্ছে। সোজা অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা থেকে ধরে আনাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। সুবাতাসে পাড়ি দিতে পারলে মাত্র চার সপ্তাহের পথ। অ্যাটলান্টিকের এপার আর ওপার। দাস ব্যবসার কেতাবে এই পথের নাম 'মিড্‌ল প্যাসেজ'। এই মধ্য পথ ধরে দাস চালানের প্রথম রেকর্ড পাওয়া যায় ১৫১৮ সালের। ১৫১৮ সালে শুরু তারপর ক্রমশই বাড়তে লাগল।

ষোড়শ শতকে স্পেনের রাজা পর্তুগীজদের হিস্পানিওলাতে দাস চালানোর লাইসেন্স দিলেন। ইতিহাসে রেকর্ড আছে, জনৈক পর্তুগীজ দাস ব্যবসায়ী ন'বছরে মোট ৩৮ হাজার দাস চালান দিয়েছিল। এরপর দাস-চালানের দ্বিতীয় আর একটি পথ খুলে গেল। শুধু খুলল না, বেশ কিছুকাল রমরমা ব্যবসা চলল সেই পথে। এই পথটি খুলে গেল ব্রাজিলের অ্যাঙ্গোলা আর বাহিয়ার মধ্যে। সপ্তদশ শতকে কঙ্গো থেকে প্রায় দশ লক্ষ আফ্রিকানকে দাস হিসেবে পর্তুগীজরা চালান করে দিল এই পথে।

আমার চোখের সামনে ভাসছে দুই শতকের সেই দৃশ্য। মানুষ চিরকালই কত ভণ্ড। দৃশ্যটা এই রকম : লুয়াণ্ডার জাহাজ ঘাটে শ্বেত পাথরের চেয়ারে বসে আছেন বিশপ। একেবারে জলের ধারে। নৌকো বোঝাই দাস বিশপের সামনে দিয়ে জাহাজে যাবার আগেই তিনি জল ছিটিয়ে তাদের খ্রীস্টান করে দিচ্ছেন। একের পব এক দাস বোঝাই নৌকো আসছে আর তারা বুঝুক আর না বুঝুক ধর্মান্তরিত হযে জাহাজেব খোলে গিয়ে ঢুকছে। 'সদাপ্রভু আপন দাসদেব প্রাণ মুক্ত করেন। তিনি তাঁহার অস্থি সকল রক্ষা কবেন। তাহাব মধ্যে একখানিও ভগ্ন হয় না'।

তা ঠিক, একখানিও ভগ্ন হয় না। দাস জাহাজের খোলের ভেতব যে ব্যবস্থা ছিল তাতে প্রাণ মুক্ত হবারই কথা। ধৃতদাসদের প্রথমত শবীরে ছ্যাঁকা দিয়ে একটি চিহ্ন দেগে দেওয়া হতো। 'ওয়ানস্ স্লেভ। স্লেভ ফর এভার'। তাবপব খোলে বোঝাই ওই দাসদের বার-সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে পুরুষদের চাবকানো হতো আর মেয়েদের ধর্ষণ। কোনও দাস অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে জাহাজের খোল থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হতো সমুদ্রে। খাবাব আর জলেব অভাব হলেও বেছে বেছে দুর্বলদের, অসুস্থদের চলে যেতে হতো হাঙরের ভোজে। দেখা যেত আমেরিকান প্ল্যান্টারদের কাছে বেচার আগেই প্রতি পাঁচজনে একজন মারা গেছে। আফ্রিকা মহাদেশে প্রভুর কৃপায় দাস হবার মতো নর নারীর অভাব ছিল না। পিলপিল করে জন্মাতো আর ইওবোপের দাস-কলে দাগা মারা হয়ে বাকি জীবন চাবুক খেয়ে কাটাতে হতো। দাস-জাহাজে তাদের যে ভাবে ভরা হতো তাব একটি নকশা পাওয়া গেছে। ভাবতে ভয় লাগে ওই সময় আফ্রিকায় জন্মালে কি হতো! পৃথিবী মানবিকতায় অবশ্যই কিছুটা এগিয়েছে। সে যুগের দাস-ব্যবসায়ীরা বলত জাহাজে—স্পেস ওয়াজ মোর প্রেসাস দ্যান লাইভস।

দাস-ব্যবসার এই বিস্তৃত জালকে বলা হতো 'গ্রেট সার্কিট'। ইওরোপ তখন ধনেজনে সম্পদে ঐশ্বর্যে তেড়েফুঁড়ে উঠছে। তখন মানবিকতা নয় পাশবিকতা। মানুষকে নিঙড়েই তো মানুষের অগ্রগতি। প্লেটোর কথা মনে পড়ছে : Every kıng springs from a race of slaves and every slave has had kings among hıs ancestors. মানুষের ইতিহাসও এক 'গ্রেট সার্কিট'। দাস ব্যবসার বিশাল চক্র থেকে যা লাভ হলো তাতে তৃতীয় বিশ্বের কিছু হলো না, হলো ইওরোপের। ইওরোপ ঝলমল করে উঠল। ওদিকে কঙ্গোর প্রায় সমস্ত শক্ত সমর্থ মানুষকে চালান করে দেওয়ায় মনিকঙ্গোর প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতন হলো। গ্রামকে গ্রাম সব ভোঁভাঁ। এই দাস ব্যবসার বাড়বাড়ন্তের ফলে পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সব কিছু অচল হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ অভিযান, জীবন সমীক্ষা সবেতেই ভাঁটা পড়ে গেল। ভেতরে যাবার প্রয়োজন নেই। উপকূলে কয়েকটি পূর্ণ আর সুরক্ষিত ঘাঁটিই যথেষ্ট। পর্তুগীজদের এজেন্টরা ভেতর থেকে মানুষ ধরে ধরে আনত। দুর্গে তাদের রাখা হতো বন্দী করে। হিউম্যান কমোডিটি ফর একসপোর্ট।

এই সময়ে অবশ্য দুটি উল্লেখযোগ্য অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৬১৮ সালে একটি বৃটিশ জাহাজ গাম্বিয়া নদী ধরে প্রায় চারশো মাইল ভেতরে ঢুকে গেল। জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন জর্জ থম্পসন। থম্পসন কিন্তু ফিরে আসতে পারলেন না। নিহত হলেন। তবে ইতিহাস তাঁকে স্মরণে রেখেছে। ১৬৫২ সালে এক মিশনারী ফাদার মন্টেসারচিও কঙ্গো অভিযানে গিয়েছিলেন। তিনি স্ট্যানলিপুল পর্যন্ত এগোতে পেরেছিলেন। সেখানে দেখেছিলেন পর্তুগীজদের দাস ঘাঁটি। নিগ্রোদের আটকে রাখা হয়েছে পরে চালান করা হবে বলে।

মার্লবোরো হাউসের সভাকক্ষ এই মধ্যরাতে আঁধারে ছাওয়া। চেয়ার টেবিল বহু বহু মানুষের বসার স্মৃতি নিয়ে যেন সব প্রাজ্ঞ সভাপতি। কাল সকালে যাঁরা সভা করতে আসবেন তাঁরা অতীতের কথা ভাববেন না। বর্তমানের দাবি নিয়েই লড়াই করবেন; কিন্তু বর্ণবৈষম্যের শিকড় যে কত গভীর থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করছে, সেই তথ্যটি সামনে ধরলে ফ্রাফসে ফ্যাননের সেই নিষ্ঠুর উক্তিটি মনে পড়ে : For the black man there is only one destiny. And it is white.

পশ্চিম আফ্রিকার দাস-ব্যবসায়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগালকে প্রথম চ্যালেঞ্জ জানাল ইংরেজ। প্লিমাউথের জন হকিন্‌স দেশবাসীর চাপে নেমে পড়লেন দাস-ব্যবসায়ে। তাঁর দেখাদেখি উত্তর ইওরোপের বিভিন্ন বন্দর থেকে ভেসে পড়ল জাহাজ। প্রথমেই এল ওলন্দাজ। পর্তুগীজদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিযোগী। সরাসরি সঙ্ঘর্ষ। ১৬২০ সালের মধ্যেই ওলন্দাজরা পশ্চিম আফ্রিকার কূলে দুর্গ আর বাণিজ্য চৌকি খুলে ফেলল। ১৬৩৭-এ তারা দখল করে নিল শক্তিশালী ঘাঁটি এলমিনা ক্যাস্টল।

ওলন্দাজদের পেছন পেছন এল ফরাসীরা, তারপর সুইডেন আর প্রুসিয়া। বিভিন্ন দেশের দাস-ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেঁধে গেল লাঠালাঠি। মাঝখান থেকে পর্তুগীজদের একচেটে দাপট চলে গেল। কঙ্গো নদীর মুখে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের দাস-ব্যবসা কেন্দ্র বসে গেল। মানুষ ধরো আর চালান দাও।

লন্ডনে একটা কোম্পানি খোলা হলো--'কম্পানি অফ অ্যাডভেঞ্চারারস অফ লন্ডন ট্রেডিং ইনটু পার্টস অফ আফ্রিকা।' ১৬১৮ সালে প্রথম জেমস এই কোম্পানিকে স্বীকৃতি দিলেন। ১৬২০ সালে আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশে প্রথম দাসদলের চালান এল। তারপর অ্যাটলান্টিকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে দাস-চালানের ব্যবসা রমরম করে জমে উঠল। ষোড়শ শতকে আফ্রিকা থেকে দশ লক্ষ দাস চালান করা হয়েছিল। ১৬৫০ সালে দেখা গেল চাহিদার যেন শেষ নেই। ১৬৮০ সালে দেখা গেল ওয়িদাহ বন্দরে বৃটিশ এজেন্টরা বছরে ১৫ হাজার দাস কিনছে। বেচতে বেচতে জায়গার প্রায় সব মানুষই শেষ হয়ে গেল। তখন তারা সরে গেল মোজাম্বিকের দিকে। সেখান থেকে আরও দূরে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে দাস-ব্যবসার রমরমা বেড়ে গেল। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের উৎপাদন বাড়ার ফলে দাস কেনার অনেক সুবিধে হলো। কাপড়ের বিনিময়ে ক্রীতদাস। পর্তুগীজরা ক্রমশই তাদের আধিপত্য হারাতে লাগল। গাম্বিয়া থেকে বেনিন, সুদীর্ঘ উপকূল ভাগে যাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তারা সব হারাতে হারাতে ক্রমশ ভেতর দিকে পালাতে লাগল। একদিকে ওলন্দাজ, অন্যদিকে আরব। মোম্বাসা বন্দরে আরবদের ঠেকাবার জন্যে পর্তুগীজেরা তৈরি করলে ফোর্ট জেসাস। সেই দুর্গ দখল করে নিল সুলতান ইউসুফ খুব কায়দা করে। সুলতান ইউসুফ ভারতে মানুষ। ছিল ক্যাথলিক পরে আবার ইসলাম। ইউসুফ আর তার তিন শো অনুসরণকারী ফোর্ট জেসাস দুর্গে প্রবেশ করল বন্ধুর ছদ্মবেশে। প্রত্যেকেরই জোব্বার ভেতর লুকনো ছোরা। দুর্গবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা, খোশ গল্প চলছে। বন্ধুতে বন্ধুতে যেমন হয়। হঠাৎ সঙ্কেত একসঙ্গে তিনশো জন ছোরা হাতে লাফিয়ে পড়ল বিপক্ষের বুকে। এ যেন সেই মোগল বর্গীর কৌশলের লড়াই। ভারতে ছিল হিন্দু-মুসলমান, আফ্রিকার মোম্বাসায় খ্রীস্টান-মুসলমান। সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হচ্ছে। দেখা গেল ওই ফোর্ট জেসাসেই অবরোধ। ভেতরে এক বাহিনী পর্তুগীজ সেনা ইতিহাসের সুদীর্ঘ অবরোধ। পর্তুগীজেরা ভেতর থেকে তিন বছর লড়েছিল। অবশেষে পতন। রোগ, সরবরাহের অভাব। যুদ্ধে মৃত্যু। সব মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ফোর্ট জেসাসের শেষ পর্তুগীজ বাহিনী।

মানুষ মরে, মানুষের স্পিরিট মরে না। এক যায়, আর এক আসে। কেউ সাম্রাজ্যলোভী, কেউ জ্ঞানলোভী। পর্তুগীজদের এই ডামাডোল, এই উত্থান পতনের মধ্যেও সেই 'কনকুইস্তাদোর' স্পিরিট

গেল না। অ্যাঙ্গোলায় দুর্গ গড়ে, ভেতরে থাকার চেষ্টা হলো। অভিযাত্রী লোপেস কঙ্গোর বুকে পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলেন টাঙ্গানায়িকা হ্রদ। গ্যাসপার বোকারো লিভিংস্টোনের দুশো বছর আগেই নিয়াসা হ্রদ আবিষ্কার করে ফেলেন। লেক নিয়াসার কাছে বোকারো খুব উন্নত, শক্তিশালী ও সম্পন্ন উপজাতির দেখা পান। তাদের নাম হলো 'মারাভি'। পরবর্তী কালের পর্তুগীজ ম্যাপে এই নাম পাওয়া যায়। আধুনিক 'মালাওয়ি' নামটির উৎসও এই মারাভি। নিয়াসা হ্রদ ধরে আরও ওপরে উঠে বোকারো আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যপথের সন্ধান পেয়ে গেলেন। রোভুমা নদীর উপত্যকার ভেতর দিয়ে চলে গেছে সেই পথ। শেষ হয়েছে কিলোয়াতে। বোকারো এই দীর্ঘপথ খুব দ্রুত অতিক্রম করেছিলেন। পূর্বের কোনও পর্যটকের এই গতি ছিল না। দুমাসে তিনি প্রায় হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছিলেন। পরে জানা গিয়েছিল ভয়ে। বোকারো লিখছেন, 'অত সম্পদ অত প্রাচুর্য, নয়নলোভন দৃশ্য, সবই পড়ে আছে অশুভ এক সম্ভাবনার ছায়াতলে। জনপদে জনপ্রাণী নেই। প্রকৃতিও স্তব্ধ আতঙ্কে। এই বুঝি তারা এল। নাচতে নাচতে। বিচিত্র দামামা বাজাতে বাজাতে। সেই ওয়াজিম্বার দল।' সেই ওয়াজিম্বা। 'ক্যানিবল'। মানুষখেকোর দল। তারা মাঝে মাঝেই নেমে আসত কঙ্গোর দিক থেকে। সেই ওয়াজিম্বাদের ভয়ে বোকারো দু মাসে হাজার মাইল ভ্রমণ করেছিলেন।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। কাক না ডেকেই ভোর। লাফিয়ে খাট থেকে নেমে পড়লুম। মনে হচ্ছে এতক্ষণ আফ্রিকায় শুয়েছিলুম। পৃথিবীটা যে কেমন জায়গা, মানুষ যে কেমন জীব তা বুঝতে বুঝতেই মানুষ টেঁসে যায়। পর্দা সরিয়ে আকাশের দিকে তাকালুম। বৃষ্টি নেই। নির্মেঘ নিত্যানন্দ।

চা খেলে হয়। হোটেলের চা খাবো না। যেমন দাম তেমনি অখাদ্য। বড় বেশি বিলিতি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আর কুমকুম পথে নেমে এলুম। কাল অনেক রাতে হোটেলের কোথায় কি হচ্ছে দেখার জন্যে চোরের মতো পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিলুম। সে যে কি অ্যাডভেঞ্চার! আমি চোর নই অথচ বুক দুরদুর করছে। কেন ভয়, কিসের ভয় কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছিল আমি কঙ্গো নদীতে ভেসে চলেছি; যে কোনও মুহূর্তে মুলোর মতো বিশাল বিশাল দাঁত বের করে সামনে এসে দাঁড়াবে ওয়াজিম্বা ক্যানিবল। ভয় পেতে যে এত ভালো লাগে আগে জানা ছিল না। কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই। আলো আছে, কার্পেট আছে, দেয়ালে দেয়ালে ছবি আছে। সুদৃশ্য পটে, পটে গৃহপালিত সব গাছ। কি অদ্ভুত যে লাগছিল। তারপর হঠাৎ যেন ভেলকি হয়ে গেল। ভৌতিক সব চরিত্রের মতো মাটি ফুঁড়ে উঠল এক রাশ সুন্দরী। কারুর হাতে ভ্যাকুয়ামক্লিনার, কারুর হাতে ব্রাশ, কারুর হাতে ডাস্টার। নানা অস্ত্রে সুসজ্জিতা ফুলকুমারীরা মাঝরাতে নেমে পড়েছে ঝাড়পোঁছে। চাকা লাগানো মই এসেছে। এক জোড়া উঠে পড়েছে আলোর শেড পরিষ্কারে। কেউ লেগে গেছে যেখানে যত পেতলের ফিটিংস আছে সেই সব পালিশের কাজে। ওদিকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালু হয়েছে। বেশ ভদ্র ঘোড়ার মতো একটানা চিঁহি সুরে কার্পেটের ধুলো টেনে নিচ্ছে। আমি যেন মাঝরাতে সার্কাস দেখছি। ভোরবেলা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝকঝকে একটি হোটেল রাহিকে যাতে ঝকঝকে একটি গুড মরনিং জানাতে পারে তারই আয়োজন। কাজের পরিমাণের কথা ভেবে আমি কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়লুম। মেয়েরা কিন্তু বেশ খোশমেজাজেই সব করে চলেছে। একজন আমাকে একটা স্ট্যাচু ভেবে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালিয়ে দিলে। গ্রাহ্যই করল না। লক্ষ্যই করল না। আমার নিশ্বাস পড়ছে, চোখের পাতা পিটপিট করছে। বুঝলাম এরা সবাই মহিলা চার্লি চ্যাপলিন। অভ্যাসের 'অটোমেশান'। ফ্ল্যানেল দিয়ে নাকের ডগাটা মোছার চেষ্টা করেছিল। আমি প্রাণ ভয়ে বলেছিলুম, 'মিস, দ্যাটস লেদার, নট মেটাল।'

মিস খিলখিলিয়ে বললে—'স্ট্রেঞ্জ, ইট স্পিকস।'

ভেতরে বুঝিনি, বাইরে ঠান্ডা বাতাস বইছে। কাজের লন্ডন এরই মধ্যে জেগে উঠেছে। কোনাকুনি রাস্তার ওপরে, দুটি রাস্তার সংযোগ স্থলে একটি কাফে। শুনেছি সেখানে স্যান্ডউইচ পাওয়া যায়। গরম কফি পাওয়া যায়। আমরা সেই দিকে এগিয়ে গেলুম।

রেস্তোরাঁটা এত নম্র, এত ভদ্র! নরম গলায় যেন বলছে সুপ্রভাত। প্রবীণ আর প্রবীণা, স্বামী আর স্ত্রী। কাউন্টারে হাস্যমুখ।

২৮

সায়েবের সায়েবী দোকান। স্বল্প পরিসরে সাজিয়ে গুজিয়ে বেশ জাঁকালো করে বসেছেন মালিক। কাউন্টারের ওপাশে বসার একটা উঁচু চেয়ার থাকলেও মালিক অ্যাপ্রন পরে দাঁড়িয়ে আছেন। আপাতত আমরা দু'জন মাত্র খদ্দের। কাউন্টারের ওপরে হরেক রকম পাঁউরুটি পাশাপাশি সাজানো। আমরা টেবিলে মুখোমুখি বসা মাত্র একটি বাচ্চা মেয়ে এল রুটি কিনতে। ইংরেজরা কি সুন্দর ইংরিজি বলে! দুজনে চড়রবড়র কি কথা হলো। মেয়েটি দেড় হাত মাপের লম্বা একটি রুটি নিয়ে প্রায় নাচচে নাচতে চলে গেল। এ দেশেও বাচ্চাদের দোকান-বাজার করতে হয়। সব দেশের জনজীবনই প্রায় এক রকম।

বৃদ্ধ আমাদের যত্ন করেই ব্রেড অ্যান্ড বাটার আর কফি পরিবেশন করলেন। ভদ্রলোকের মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখের রঙ ঈষৎ রোদে পোড়া। কপালে দীর্ঘ বলিরেখা। শার্লক হোমস হলে বলতেন, এই মানুষটির জীবনের দীর্ঘ সময় প্রাচ্যে কেটেছে। দাম মেটাতে গিয়ে আবার সেই সমস্যা! বারো পেন্‌সে এক শিলিং, কুড়ি শিলিং-এ এক পাউন্ড না অন্য কিছু। ভদ্রলোক এক মুঠো খুচরো দিয়েছেন। সেই খুচরোর মধ্যে দু'ধরনের মুদ্রা রয়েছে, শিলিং আর নিউ শিলিং। কোন্‌টা কি! মাথা খারাপ হয়ে গেল। বৃদ্ধ এবার একটু ধৈর্য হারিয়ে বললেন, 'কতদিন লন্ডনে থাকবে?'

বললুম, 'কয়েকদিন।'

'তাহলে তো খুবই সমস্যা। অনেককে জ্বালিয়ে মারবে। লুক হিয়ার, মেট্রিক সিসটেম জানো?'

'জানি। দশ, একশো, হাজার। মাল্টিপ্‌ল অফ টেন।'

'দ্যাটস রাইট। দি সেম সিসটেম ওয়ার্কস হিয়ার। কুড়ি শিলিং-এ আর পাউন্ড হয় না। নাউ ইট ইজ হান্ড্রেড শিলিং।' সাত সকালে অঙ্ক ভালো লাগছে না অথচ বৃদ্ধ অঙ্ক শেখাতে বদ্ধপরিকর। খুব মাথাটাথা নেড়ে আমরা বললুম, 'আর কোনও প্রবলেম নেই। জলের মতো সহজ হয়ে গেছে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ওয়াটার।'

•

দোকানের বাইরে এসে দেখি উল্টো দিকের ফুটপাথে বিশাল লাইন। লাইনের মাথাটা রয়েছে দূরে একটা বাড়ির সামনে। সায়েবের পেছনে সায়েব, তার পেছনে সায়েব। যেন সায়েবদের মোচ্ছব লেগে গেছে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। সব এক রকমের পোশাক। আর প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পড়ছেন। খুব কৌতূহল হলো। কিসের লাইন! রেস্তোরাঁয় ঢুকে এই সায়েবকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কিসের এত বড় একটা লাইন সায়েব? কেরোসিন তেলের?'

আমাদের দেশে তেলের লাইন, রেশনের লাইন, সিনেমা টিকিটের লাইন, রবীন্দ্র রচনাবলী দেবে বলে ব্যাঙ্কের সামনে লাইন, এক সময় এইচ এম টির ঘড়ির জন্যেও এই রকম লাইন পড়ত। সায়েব বলে তো আর পীর নয়। তাদের জীবনেও এই সব থাকা উচিত। রেস্তোরাঁ-সায়েব অবাক হয়ে বললে, 'কেরোসিন' অয়েল? কেরোসিন তেল দিয়ে কি করবে?'

'আমি নয়, ওই সায়েবরা। ওদের বউরা জনতা জ্বালাবে, আর একসট্রিম কেসে, স্বামী, দেবর অথবা শাশুড়ীর অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলে গায়ে ঢেলে আগুন জ্বালাবে। আত্মহত্যা আর কি!'

রেস্তোরাঁ-সায়েব বললে, 'ও নো নো, দ্যাটস নট দি কেস। কে অয়েলের ব্যাপার নয়।'

'তোমাদের দেশে কেরোসিন তেল আছে? জনতা আছে?'

'কে অয়েল আছে। হোয়াট ইজ জনতা?'

'কেরোসিন অয়েল কুকার।'

'না নেই।'

'হোয়াট এ ব্যাকওয়ার্ড কান্ট্রি? আনথিঙ্কেবল। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।'

'হোয়াট ইজ ছ্যাঃ ছ্যাঃ।'

'দ্যাটস এ গ্রুপ অফ অব্যয়।'

'হোয়াইট ইজ অবব .।'

'ব্যাস, ব্যাস, আর না, আর না। ও তোমার জিভের কর্ম নয়। তোমাদের ল্যাঙ্গোয়েজও ভেরি পুওর. কোনও যুক্তাক্ষর নেই। উচ্চারণ করো তো কুজ্ঝটিকা। প্রোনাউন্স।'

'আই ক্যান প্রোনাউন্স রাম।'

'তাই বা হচ্ছে কোথায়? রামের বদলে র‍্যাম হয়ে যাচ্ছে। বামের ভ্রাতা লক্ষ্মণে এসে কি করবে? রাবণ যদিও পারো রাবণের ওয়াইফ মন্দোদরীতে এসে কি করবে? তোমার জিভেতে তালুতে এনট্যাঙ্গলড হয়ে বসে থাকবে।'

সায়েবের মুখে একটা অসহায় ভাব। এতক্ষণে বাগে পেয়ে গেছি। একটু আগে ভুরু কুঁচকে খুব পাউণ্ড শিলিং পেনস হচ্ছিল। শেষে সায়েব বললে, 'তা আমি এই সব উচ্চারণ করব কেন? হোয়াট ফর?'

'তোমার জানা উচিত, তোমাদের ল্যাঙ্গোয়েজ কত ডিফেকটিভ। ফনেটিকেলি ভেরি পুওর। আমাদের ল্যাঙ্গোয়েজের ভাইব্রেশান শোনো, উদ্দালক উদ্দাম হইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল। তোমারা হলে কি বলবে, উদ্দালক কমিটেড সুইসাইড।'

সায়েব এবার খুব অবাক হয়ে বললে, 'তুমি তো জিজ্ঞেস করলে, রাস্তার ওপারে কিসের লাইন? তারপর কি করে ল্যাঙ্গোয়েজে চলে এলে!'

'বেড়াতে বেড়াতে। এইবার তুমি বলো কিসের লাইন?'

আমার আক্রমণ-মুক্ত হয়ে ভদ্রলোক কিছুটা সুস্থ হলেন। নিজের জাতের ওপর ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'আরে বোলো না, সময়ে কাজ কবার হ্যাবিট ইংরেজদের নেই। সব সময় লাস্টমোমেন্টে হুড়োহুড়ি। ভেকেশান এসে গেছে। বাবুরা সব বাইবে যাবেন। তাই পাসপোর্টের জন্যে লাইন মেরেছে। ইংরেজ আর সে ইংরেজ নেই। এরা সব লেজি, আইড্‌ল, ইনডিসিপ্লিনড অ্যাণ্ড হোয়াট নট। এই ইংরেজের জন্যে আমাদের আর কোনও গর্ব নেই।'

আমাদের দেশের একজন বৃদ্ধ যেমন একালকে সহ্য করতে পারেন না, অবিকল সেই উক্তি। সব দেশেই দেখি সেকাল আর একালের লড়াই। আমবা আরও দু কাপ কফি নিয়ে আবার বসে পড়লুম মৌজ করে। এই সকালটার জন্যে আফ্রিকা আমাদের মুক্তি দিয়েছে, শুরু হবে আবার সেই দুটোর পরে।

সায়েবের সঙ্গে অকারণে বাজে বকে এখন বোকা বোকা লাগছে। বাক সংযমের কথা বারে বারে ভাবি, ভাবাটাই হয়। তার বেশি কিছু হয় না। পুরুষ আর মহাপুরুষে এই তফাৎ। আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন, সঙ্কল্প আব প্রতিজ্ঞার সংজ্ঞা কি? আমাব উত্তর হবে, যা করা হয় না করার জন্যে। আমার পাড়ার চায়ের দোকানে এই ভাবে বসে থাকলে পথের যে-সব দৃশ্য চোখে পড়ত তা পড়ছে না বলেই জায়গাটা বিলেত। কুমকুমকে বললুম, 'ধরো এখন যদি পথ দিয়ে একটা গরু ধুঁকতে ধুঁকতে যেত কেমন হতো, কেমন হতো যদি একটা ঠেলা গাড়ি যেত!'

'তাহলে তুমি অ্যাট হোম ফিল করতে।'

ভীষণ ইনটেলিজেন্ট উত্তর দিয়েছে। ভুলেই গেলুম, বসে আছি বিলেতেব চায়ের দোকানে। হ্যা হ্যা করে একটা দিশি হাসি ছাড়লুম। তখন থেকে লক্ষ্য করছি দোকানের কর্তাব মুখ দিয়ে কথা সরে না। পাশেই গিন্নি। এতক্ষণ এসেছি, একটাও কি কথা বলা যেত না! এতটা বাক-সংযম আবার বাড়াবাড়ি।

কুমকুম বললে, 'দাদা, তুমি অতটা জোবে হেস না। তোমাকে পুলিসে ধরবে। এ হলো পালিশের দেশ।'

বৃদ্ধ মালিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রিনসিপ্যালের মতো কাউন্টাবের ওপাশ থেকে খর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর তাঁর স্ত্রী কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছেন। সামান্য একটা হাসির কি এফেক্ট। আর হবে না-ই বা কেন! আমাদের দেশের অত বড় একটা শিল্প স্রেফ হাসির জোরে চলেছে, যাত্রাশিল্প।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আমরা পাশের একটা স্টেশনারি দোকানে ঢুকলুম, জন মেঞ্জিস। লজেনস্ চকোলেট, পাগল করা বাহারে থরে থরে সাজানো। অসাধারণ সব নোট বুক। বড় ছোট লেখার খাতা। পাশাপাশি একই শয্যায় শুয়ে আছে, লোভনীয় পার্কার, সেফারস, ওয়াটারম্যান। আহা, চোখ জুড়িয়ে গেল। পকেট ধরে টানছে। পেনফুল হয়ে আছি তবু পেন চাই। দুটি মেয়ে, একজন এ কাউন্টারে একজন ও কাউন্টারে। 'ভাই, পেনগুলো একবার বের করো। কিনতে না পারি অন্তত হাত বুলোই।'

বাঙলাতেই বললুম। ইংরেজ মেয়ে গোমড়া মুখে একগাদা কলম বের করে সামনে রাখল। অন্য কিছু না বুঝুক, পেন শব্দটা বুঝেছে। বাকিটা অনুমান করে নিয়েছে। সাত পাউন্ডের মতো গরিব হয়ে হোটেলে ফিরে এলুম। কলম আর খাতার মতো কিছু নেই। দুইয়ের মিলনে কত কি জন্মাতে পারে। জীবে জীবে মিলনে জীবন হয়। কাগজে কলমে তৈরি হয় জীবনদর্শন। যা হয়নি হবে না কোনও দিন, তাও হয়। কোনও মানুষ ভাবার আগেই ভাবনা জন্মে যায়। যে মানুষ ছিল না, থাকবে না কোনওদিন, তার আদল তৈরি হয়ে যায়। সাদা পাতা আর ভালো একটি কলমের কি রহস্য?

হোটেলের লাখ টাকা দামের বিছানায় সাত পাউন্ডের নোটবুক আর কলম ছড়িয়ে চুপ করে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। পার্কার, নামটাই যেন এক ইতিহাস। যেমন ছবি আঁকার রঙের জগতে উইনসর অ্যান্ড নিউটস। পৃথিবীতে অতুলনীয়। নোটবুকের কাগজ দেখে তাক লেগে গেছে। আমাদের দেশে তো আজকাল আর ভালো কাগজ পাওয়া যায় না। না লেখার, না ছবি আঁকার। সেফারস, পার্কার পেলিক্যান মঁব্লাঁও তৈরি হবে না।

ভেবেছিলুম খুব শীতে কনকনে ঠান্ডা জলে স্নান করে গান্ধীজীর রেকর্ডের কাছাকাছি চলে যাবো। সে আর হলো না। সেন্ট্রাল হিটিং-এর ব্যবস্থায় হোটেল কমফার্টেবলই ওয়ার্ম। স্নানঘরে ঢালাও গরম জলের ব্যবস্থা। শীত আর ভোগ করার উপায় নেই। কাল রাতে আমরা যখন ঘুমিয়েছিলুম, তখন লন্ডনের ইস্টএন্ডে এক পুলিস অফিসারকে একা পেয়ে একদল দুর্বৃত্ত সার্জিক্যাল ডিসেকসান করেছে। আজ সকালে এক ঝোপের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। সকালের টিভি শুরু হলো এই সুসমাচার দিয়ে। 'নাথিং ইজ রটন ইন দি স্টেটস অফ ডেনমার্ক। সামথিং ইজ রটন ইন দি স্টেটস অফ ডেনমার্ক।' কি এ দেশ, কি ও দেশ, স্বদেশ বিদেশ সর্বত্র এক অবস্থা। টুডে ভায়োলেন্স ইজ দি রেটোরিক অফ দি পিরিয়াড।

কুমকুমের এক আত্মীয় এসেছেন। মাসীমা। লন্ডনেই থাকেন। তিনি আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবেন। সরকারী প্রতিনিধিদের পাত্তা নেই। তাঁদের এ ব্যাপারে কোনও আয়োজনও নেই। হোটেলে ভরে দিয়ে গেছেন। চরে খাও। মাসীমা মানুষটি ভারি ভালো। তবে বেশ আত্মসচেতন। শীতের দেশে সাজ-পোশাকে বেশ ছিমছাম থাকা যায়। ফর্সা মহিলা। দীর্ঘ লন্ডন বাসে আরও ফর্সা হয়েছেনে। অবশ্যই সুন্দরী। মধ্যবয়েসের শান্ত সৌন্দর্য। তবে ঠোঁটে বিলিতি লিপস্টিক আর লিপগ্লসের এনামেল। গায়ে হাল্কা রঙের কার্ডিগান।

প্রথম পরিচয়ে ভদ্রমহিলা তেমন সহজ হতে পারলেন না। বাঙালীদের মধ্যে এই গুণ যতটা আছে, অন্য জাতির মধ্যে ততটা নেই। তাঁরা একটু চাপা স্বভাবের। সহজে ধরা দিতে চান না। তবে তিনি মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমাকে ধরলেন। বিধির বিধানে। ধরতে বাধ্য হলেন। হোটেলের সামনে দাঁড়াতেই ফ্রম নোহোয়ার লন্ডনের বিখ্যাত কালো ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়াল। ডিসিপ্লিন এখনও আছে। আমাদের দেশ থেকে সেটা প্রায় অদৃশ্য। কলকাতা হলে প্রথমেই একটা তিরিক্ষি প্রশ্ন হতো, কোথায় যাবেন? তারপর শুরু হয়ে যেত কচলাকচলি। তারপর দৃশ্যটা হতো এইরকম নাছোড়বান্দা যাত্রী দরজার হাতল ধরেছেন আর ট্যাকসি হুস করে ছেড়ে দিয়েছে। হাত থেকে হাতল ছিটকে চলে গেছে। যাত্রী পেছন পেছন কিছুটা দৌড়ে শেষে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার একপাশে রাগ রাগ, বোকা বোকা মুখে স্থির হয়ে আবার আর এক জনের পায়ে তেল দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। এই হলো নিত্য দৃশ্য। অথচ কতই না ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপন, প্রচার—ট্যাকসি কি আপনাকে রিফিউজ করেছে? করলে এইখানে জানান, সেইখানে ফোন করুন। সব টিট করে দেওয়া হবে। সব ব্যাপারেই তাই। রান্নার গ্যাস? ফোন করুন, সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে। সিলিন্ডারে গোলমাল দেখলে জানান, আমাদের লোক তেড়ে গিয়ে মেরে আসবে। টেলিফোন, বিদ্যুৎ, সব প্রতিষ্ঠানই বিজ্ঞাপনে লাখ লাখ টাকা এই ভাবে নষ্ট করছেন। সকলেই কিন্তু অলীকবাবু।

কালো ট্যাকসির সুদর্শন ড্রাইভার বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসলেন। যার অর্থ, প্লিজ গেট ইন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বীরের মতো, পেছনের দরজা খুলতে গেছি। ইচ্ছেটা এই, দু'জন মহিলাকে কেতাবী কায়দায় বলবো, প্লিজ গেট ইন। বোকা জানে না, এ কলকাতার ট্যাকসি নয়। হোয়্যার ইজ লক! একটা প্রোজেকসান রয়েছে; কিন্তু অনড়। যে সব ছেলেদের লালা পড়ে তাদের বুকের কাছে ছোট্ট একটা তোয়ালে ঝুলিয়ে

দেওয়া হয়। তাকে বলে ল্যাপেল। লন্ডনের কালো ট্যাকসির লকটা ওইরকম ল্যাপেলের তলায় থাকে। প্রোজেকসানের তলায় লুকনো আছে লক। আমার কসরত কসরতই রইল কুমকুমের মাসী এগিয়ে এসে টুক করে দরজাটা খুলে উঠে পড়লেন। মানুষ যখন লজ্জা পায় তখন তার হাসি দীর্ঘ হয়। ওয়্যারিং এ ব্রড স্মাইল আমি গাড়িতে উঠলুম।

ট্যাকসির ভেতরে যে সিট পাতা রয়েছে তাতে তিনজন বসতে পারে। সামনে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। মনে মনে ভাবছি, বাঃ দাঁড়িয়ে যাবারও ব্যবস্থা রয়েছে বেতো রুগীদের জন্যে, যাদের হাঁটু ভাঙে না। এদিকে তিনজনে টাইট হয়ে বসে আছি। কুমকুমের মাসী বললেন, 'হোয়াই ডোণ্ড গো টু দি ফ্রন্ট সিট।'

ফ্রন্ট সিট! হ্যাঁ সামনের আসনটা মোড়া রয়েছে। টেনে বসতে হয়। স্প্রিং সিসটেম। উঠে দাঁড়ানো মাত্রই সিটও উঠে পড়ে। পশ্চাদ্দেশে লাথি মারার কায়দায়। এ সব তো জানা ছিল না সিটটা টানা আর আমার পেছনটা ফেলার মধ্যে, সময়ের হিসেবে সামান্য গোলমাল হয়ে গেল। সিট পেছন দিক থেকে মারলে এক ঠেলা। আমি প্রোজেকটাইলের মতো মহিলা দু জনের ঘাড়ে। কেউ একজন 'হররিব্‌ল' বললেন। কুমকুম না কুমকুমের মাসী বুঝতে পারলুম না।

গাড়ি কিন্তু থেমে নেই। সমানে চলছে। মসৃণ তার চলন। ড্রাইভারেব বাঁ পাশে, গাড়ির ভেতর দিকে, যাত্রীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসানো ছোট্ট চৌকো মিটার। ওপরের খোপে উঠছে ফেয়ার। তলায় উঠছে একস্ট্রা। পরিষ্কার অক্ষর। কোনও লুকোচুরি নেই। ভেতরে আর একটি যন্ত্র রয়েছে। ওয়্যারলেস। মাঝে মাঝেই সেটা গজরগজর করে উঠছে আর আমাদের চালক সায়েব ঘাড় না ঘুরিয়ে মাথাটাকে যন্ত্রের কাছাকাছি এনে দুর্বোধ্য ইংরেজিতে কি সব বলছেন।

আমি মনটাকে ওই সব খুঁটিনাটিতে ফেলে রেখেছি। একটু আগের লজ্জা তো ভুলতে হবে। ডবল লজ্জা। দরজা খুলতে না পারার লজ্জা, আব কোলের ওপর গোঁত্তা খেয়ে পড়ে যাবার লজ্জা। মিটার উঠছে ফোব পাউন্ড, ফোর পাউন্ড টেন টোয়েন্টি, ফর্টি। একস্ট্রা, ফর্টি সিকসটি।

দুই মহিলার আলাপ আলোচনা থেকে বুঝলুম আমাদের গন্তব্য, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার। আজ থেকে একশো তিন বছর আগে এই ভাবে শুরু হয়েছিল ইতিহাস : এক তরুণ উদ্বাস্তু ইহুদী, তার নাম মাইকেল মার্কস, লিডস শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্কগেট ধরে হেঁটে চলেছে। যুবকটি খুঁজছে জামাকাপড় তৈরির একটি কারখানা। বছর দুই হলো ছেলেটি পোল্যান্ড থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ইংল্যান্ডে চলে এসেছে। আর সেই থেকে সে একজন ফেরিওয়ালা। উত্তর ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরের পথেঘাটে ছেলেটি নানা জিনিস ফিরি করে বেড়ায়। তার পিঠে থাকে একটি বোঝা। আব সেই বোঝায় থাকে পিন, ছুঁচ, কাপড়, মোজা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জামাকাপড। ১৮৮৪ সালের সেই দিন। কার্কগেটেব পথে মার্কস। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ছেলেটি একজন পথচারীকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বলতে পাবেন বারান্‌স কোথায়?' বারান্‌স হলো জামা কাপড় তৈরির একটি কারখানা। মার্কস সেই কারখানাটাই বহুক্ষণ হলো খুঁজছে। ঈশ্বরের কি খেলা! মার্কস যাকে জিজ্ঞেস করল সেই ভদ্রলোক একজন ছেঁড়া কাপড়ের ব্যবসায়ী। ইয়র্কশায়ারের মানুষ। নাম আইজাক ডিউহার্স্ট। ডিউহার্স্টের সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি অল্পস্বল্প ইডিশ ভাষা জানতেন। দু'জন যুবক মাইকেল মার্কসের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। মার্কসের বয়েস তখন মাত্র একুশ বছর। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ডিউহার্স্ট এত মুগ্ধ হলেন যে তৎক্ষণাৎ তাকে পাঁচ পাউন্ড ধার দিতে রাজি হলেন। শুধু তাই নয় মাইকেলকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাপড়ের গুদামে।

ওই বছরই মাইকেল মার্কস ঠিক কবলেন কার্কগেটের খোলা বাজারে একটা দোকান দেবেন। শেষে সত্যি সত্যিই একটা স্টল নিলেন আর যে ভাবে দোকান সাজালেন, সে যুগের পক্ষে খুবই অভিনব। অন্যান্য প্রতিযোগী দোকানে জামা কাপড় সব এক জায়গায় ডাঁই করে মিলিয়ে মিশিয়ে রাখা হতো। লাটের মাল। মার্কস করলেন কি সমস্ত জিনিস আলাদা আলাদা করে এক একটা বাস্কেটে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলেন। যার যেমন প্রয়োজন এসো, আর তুলে নাও। সে যুগের মতো করে সেলফ সার্ভিসের প্রথম প্রচলন। প্রত্যেকটি বিভাগে ঝুলিয়ে দিলেন নির্ধারিত দামের টিকিট। দরাদরির কোনও ব্যাপার নেই। সে যুগের কেনাকাটায় দরাদরি ছিল বিরক্তিকর একটা দিক। যে সব জিনিসের দাম মাত্র এক

পেনি, সেই বিভাগের মাথার ওপর মার্কস ঝুলিয়ে দিলেন তাঁর স্লোগান, 'ডোন্ট আস্ক দি প্রাইস, ইট ইজ এ পেনি।'

দোকানদারির জগতে এত সুন্দর ও সফল স্লোগান আগে অথবা পরে কেউ ভাবতে পারেনি। এটাও একটা ইতিহাস। মার্কসের বৈষয়িক প্রতিভার একটা দিক। স্লোগানটির মধ্যে একটা ইহুদী সুলভ সুর থাকলেও, সহজ, সরল সরাসরি ক্রেতাকে স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে। কার্কগেটে মার্কসের আদি দোকানের এই স্লোগান শিল্পশ্রমিকদের মনে গেঁথে গেল। কম দামে, নিজেরা পছন্দ করে এক কথায় কেনাকাটা করার সুন্দর জায়গা হয়ে দাঁড়াল মার্কসের 'পেনিস্টল'। মার্কস ঠিক করলেন, তিনি তাঁর সব জিনিসের এক দর বেঁধে দেবেন, আর সেই দামে কথা-কাটাকাটি না করে কেনাকাটা চলবে। কার্কগেটের স্টলের সাফল্যের পর মার্কস লিডসে একটা দোকান দিলেন। দেখতে দেখতে ইয়র্কশায়ার আর ল্যাঙ্কাশায়ার মিলিয়ে শিল্প শহরে মার্কসের স্টলের সংখ্যা দাঁড়াল আট। সর্বত্রই এক স্লোগান, 'ডোন্ট আস্ক দি প্রাইস, ইটস এ পেনি।'

মাত্র দশ বছরের মধ্যে মার্কসের ব্যবসা একেবারে ফুলে ফেঁপে উঠল। ১৮৮৪ সালে যে ছেলেটি পথে পথে হেঁকে বেড়াত জামা চাই, শায়া চাই, শেমিজ চাই, ছুঁচ চাই, মোজা চাই, ১৮৯৪ সালে বিভিন্ন শিল্প শহরে তাঁর দোকানের পর দোকান। মার্কসের এই দোকানের মালাকে বলা হতো 'লিটল চেন অফ পেনি বাজারস'।

ব্যবসা এত বেড়ে গেল যে ১৮৯৪ সালে মার্কস ঠিক করলেন যে একজন পার্টনার নেবেন। কোথায় যাবেন! কার কাছে যাবেন! চলে গেলেন সেই দশ বছর আগে পথে যে সহৃদয় ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, যে ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে প্রথম আলাপেই পাঁচ পাউন্ড ধার দিয়েছিলেন, সেই আইজাক ডিউহার্স্টের কাছে। দশ বছর ধরে মার্কস এই ডিউহার্স্টের গুদাম থেকেই মালপত্র কিনছিলেন। মার্কস ডিউহার্স্টের কাছে প্রস্তাব রাখলেন, পার্টনার হবার। ডিউহার্স্ট যে কোনও কারণেই হোক রাজি হলেন না। তিনি বললেন, আমি না, তুমি বরং আমার ক্যাশিয়ার থমাস স্পেনসারকে বলে দেখ।

এই হলো মানুষের ভাগ্য। হতে পারত মার্কস ডিউহার্স্ট, হয়ে গেল মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার। থমাস স্পেনসার মার্কসের প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি অংশীদার হিসেবে যোগ দিলেন। ইনভেস্ট করলেন তিনশো পাউন্ড। ব্যবসার অর্ধাংশের মালিক হলেন।

সেই মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের সুবিশাল দোকানের সামনে ট্যাকসি থেকে আমরা একে একে নামলুম। এবার আমি সাবধানী। ধীরে ধীরে আসন থেকে নিজেকে ওঠাচ্ছি, যাতে আসন আমাকে পেছন থেকে দুম করে ঠেলে না দেয়। আমি উঠছি, আসনও ধীরে ধীরে উঠছে।

২৯

আমি জানতুম এই রকমই হবে। দুই মহিলা মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের দোকানে ঢুকেই পাগলের মতো হয়ে গেলেন। ওই সাংঘাতিক এলাহি ব্যাপারে নিজেকে সংযত রাখা সহজ নয়, আমি জানি, তবে প্রবেশ মাত্রই আমাকে ভুলে যাবে, আশা করিনি। সাত সকালেই দোকান ভিড়ে ভিড়াক্কার। কুমকুম আর তার মাসী ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাঁচা গেল। এবার আমি একা একা যা পারি করি। একশো বছর আগের শিল্প শ্রমিকদের 'পেনি শপ' আর নেই। এখন ধনীদের পাউন্ড শপ। ঝলমল ঝলমল করছে। এদিকে চলন্ত সিঁড়ি, ওদিকে চলন্ত সিঁড়ি, সেদিকে চলন্ত সিঁড়ি। সুড়সুড় করে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। সিঁড়ি কোথায় কোন্ অদৃশ্যলোকে চলেছে কে জানে।

সিঁড়ি নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই! একতলার আয়োজনেই আমার মতো বিত্তবান কাত হয়ে যাবে। হাজার হাজার পাউন্ড পকেটে নিয়ে এই সব রাজকীয় জায়গায় আসা উচিত। গ্রাউন্ড ফ্লোরে শুধু কসমেটিকস, কস্ট্যুম জুয়েলারি, স্টেশনারি আর কম্‌প্লিমেন্টস। কাউন্টারের পর কাউন্টার। চলাচলের পথ। মাঝে মাঝে প্রশস্ত খোলা জায়গা। সেলসম্যান বলে কিছু নেই। সবই সেলস গার্ল।

ফ্যাল ফ্যাল করে এদিকে ওদিকে খানিক ঘুরে বেড়ালুম। আরব্য রজনীর দেশে এসে গেছি। সাবানের পাহাড়, সেন্টের মিছিল। পৃথিবীতে যা আছে, যা তৈরি হয় সব এখানে আছে। আমি পরীক্ষা করার জন্যে সেন্ট কাউন্টারের মহিলাকে জিজ্ঞেস করলুম, অগুরু আছে ভাই! অহঙ্কারী ইংরেজ মহিলা হলে হবে কি। চাকরির খাতিরে হাসিহাসি মুখে কথা বলতেই হবে। মেয়েটি বললে, হোয়াট ইজ দ্যাট? আমি বললুম, সেন্ট। স্পিরিচ্যুয়াল সেন্ট। নো, উই ডোন্ট হ্যাভ। ডু ইউ হ্যাভ গোল্ডেন আমলা হেয়ার অয়েল? নো। ডু ইউ হ্যাভ কাপড় কাচা সোডা? মেয়েটি বললে, প্লিজ তুমি আমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করো। আমাদের একটা ইগজটিক ডিপার্টমেন্ট বেসমেন্টে, সেখানে সব ট্রাইব্যাল জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তুমি প্লিজ সেইখানে যাও।

দোকানে জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংল্যান্ড আছে নেই ভারত। ভারতের সুগন্ধী নির্যাস মিলিয়ে মিশিয়ে বিদেশী প্রতিষ্ঠান বহু মূল্য সেন্ট তৈরি করে অসাধারণ সুন্দর শিশিতে ভরে বাজারজাত করছেন। তাতে ভারতের পরিচিতি থাকছে না, এই যা দুঃখ। এ অনেকটা গানের রেকর্ডের মতো। কণ্ঠশিল্পীর পরিচয়টুকুই ফলাও, সুরকার, গীতিকার নেপথ্যে। শুনেছি রাজস্থানের একটি প্রতিষ্ঠান 'আর্থফ্লেভার' 'মিট্রিকা সুগন্ধ' তৈরি করেন। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী সুগন্ধ। প্রথম বৃষ্টি মাটিতে পড়লেই সুন্দব একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ বের হয়। সেই গন্ধটুকু তাঁরা অসাধারণ কায়দায় শিশিতে ভরে ফেলেন। এই গন্ধের কোনও তুলনা নেই, বৃষ্টির ঘ্রাণ।

আমার তো কিছু কেনার নেই। আমি ঘুরে ঘুরে দেখি আর ভাবি, ভোগের জগতের চেহারাটা কেমন! আর দেখি ডিসিপ্লিন। ভেতরে এত মানুষ অথচ কোনও গোলমাল নেই। চিৎকার চেঁচামেচি নেই। ছবির মতো সব হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমবায়িকা বা খাদি গ্রামোদ্যোগের কথা মনে পড়ছে। কর্মচারীদের মুখে অসীম বিরক্তি। একটার বেশি দুটো জিনিস দেখতে চাইলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। সর্বোপরি ক্যাশ কাউন্টারেব সামনে লাইন। তীর্থের কাকেব মতো দাঁড়িয়ে থাকো। খুচরো ফেরত দেওয়া নিযে থেকে কথাকাটাকাটি। এমন অভিজ্ঞতাও আছে খুচরো চল্লিশটা পয়সা দিতে পারলুম না বলে, ক্যাশের বাঁ পাশে পড়া না পারা ছাত্রে মতো ঘণ্টাখানেক দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। কি কড়া মেজাজ! দাঁড়িয়ে থাকুন, খুচরো হলে দেওযা হবে।

মুজতবা আলির সেই গল্প, 'ও সাবান বিক্রির নয়'। আলি সায়েব ভেবেছিলেন পাড়ার ছেলে দোকান করেছে। প্যাট্রোনাইজ করবেন। প্রয়োজন ছিল একটি গায়ে মাখা সাবানের। আসার পথে অনেক অনেক, বড় বড় দোকান পেয়েছিলেন। সব ছেড়ে সেই স্থানীয় দোকানটিতে এলেন। দুপুরবেলা। ছেলেটি ভাতঘুমে কাতর। আলি সায়েব বললেন, ভাই সাবান আছে। ছেলেটি আধখোলা চোখে বললে, না সাবান নেই। আলি সায়েব বললেন, কেন, ওই তো সাবান রয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। ছেলেটি এবার চোখ বুজিয়ে বললে, ও সাবান বিক্রির নয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ সরকারী, বেসরকারী দোকানে এই হাল। কর্মচারীরা সদা বিক্ষুব্ধ। প্রাণের বড় অভাব।

সাফল্যের দুটি মন্ত্র, সততা আর শ্রম। কলকাতার একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ভাসা ভাসা ইতিহাস মনে পড়ছে। বস্ত্র ব্যবসায়ী জহরলাল পান্নালাল। শুনেছি প্রতিষ্ঠাতা হরিধন দাঁ মহাশয় কিশোর বয়সে ভাগ্যের সন্ধানে ম্যাঞ্চেস্টার চলে গিয়েছিলেন। প্রায় একশো বছর আগে একটি কিশোরের এই দুঃসাহস অভাবনীয়। সারা ভারতে জহরলাল পান্নালাল এক সময়ে অদ্বিতীয় বেনারসী ব্যবসায়ীর গৌরব অর্জন করেছিলেন। মার্কসের জীবনের সঙ্গে বেশ মিল আছে। এই রকম কাহিনী আরও কত আছে। ফ্রম র‍্যাগস টু রিচেস। কমলালয় স্টোর্স, ইস্টবেঙ্গল স্টোর্সের জন্যে এখনও দুঃখ হয়। শেষের দিকে 'কমলালয় স্টোর্স' আমি দেখেছি। কলকাতায় মানে ভারি সুন্দর একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স ছিল। ভেতরের রেস্তোরাঁটি ছিল সাহিত্যিকদের। আড্ডা দেবার জায়গা। অপূর্ব সুস্বাদু মাংসর সিঙ্গাড়া পাওয়া যেত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সেলুন ছিল। বাইরের শো উইন্ডোতে দাঁড়িয়ে থাকত, প্যান্ট আর বুশ শার্ট পরা ম্যানিকুইন। এক সময় টুপিও বিক্রি হতো। কি ভাবে দোকানটা উঠে গেল!

হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, আমি ঘড়ির কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। একসঙ্গে এত রকমের ঘড়ি আমি কখনও দেখিনি। দশ বারো পাউন্ড থেকে শুরু করে পাঁচ শো সাত শো পাউন্ড পর্যন্ত উঠে গেছে। ভেতরে লোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঘড়ি যে কত সুন্দর হতে পারে আমার ধারণা

ছিল না। একটা ঘড়ি দেখি সাবেক আমলের স্যান্ড ক্লকের মতো। ওপরের অংশ থেকে সোনালী বালি নিচের আধারে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে। পড়তে পড়তে স্তূপ মতো হয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন করে পড়ছে, যেই চূড়া মতো হয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে ভোজবাজির মতো। আসলে বালি নয় আলোর খেলা। সোনালী রঙের স্বচ্ছ আধারে এই ম্যাজিক চলেছে। সোনার কাঁটায় সময়ের সঙ্কেত ডায়ালে মণিমুক্তার ফোঁটা। হাজার দশেক টাকার বিনিময়ে ওই ঘড়িটার মালিক হওয়া যায়। আর একটা ঘড়ি দেখলুম যা কথায় চলে। স্টপ বললে থামবে। গো বললে চলবে। এইট ফিফটিন বললে আটটা পনের বাজবে। মজা মন্দ নয়। সুইস ঘড়ি, জাপানী ঘড়ি, জার্মানীর ঘড়ি পাশাপাশি শুয়ে বসে গল্প করছে, পরামর্শ করছে।

কতটা ভেতরে চলে এসেছি খেয়াল নেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা মনে পড়ছে, যতই এগোবে, প্রথমে শাল, সেগুন, আরও এগোও চন্দন কাঠ, আরও এগিয়ে যাও, সোনার খনি, হীরের খনি। শুধু এগোও। আমি বসে পড়লুম। আর পারা যায় না। মানুষের সৃষ্টিই মানুষকে পাগল করে দেবে। একশো বছর আগের সেই 'নিলামবালা ছ আনা,-যা লেবে তা ছ আনা'র দোকানের স্মৃতি রাখা আছে, তখন মানুষ এত কিছু তৈরি করতে শেখেনি। কাঠের চামচ, কাঁটা উল, পদ্মকাটা বাটি, কাঠিম, ছোবড়া, বোতাম, ছুঁচ। জীবন সহজ, প্রয়োজনও সরল।

শুধু মাত্র ব্রিটেনেই মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের বিভিন্ন শাখায় মোট কর্মীর সংখ্যা ৪৫ হাজার। ভাবা যায় না। মাথা ঘুরে যায়। ১৫০টি শাখায় এই কর্মীরা নিয়োজিত। এক সপ্তাহের গড় হিসাব নিলে দেখা যাবে সাপ্তাহিক ক্রেতার সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। ধন্য মার্কস। সাফল্যের কি কোনও সীমা নেই। ভগবান যাকে দেন ছপ্পড় ফুঁড়ে দেন আর যার নেন ছপ্পড় ফেঁড়ে নেন। ইংল্যান্ডে মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার শুধু বিরাট একটা দোকান নয়, ভাষার অঙ্গ, এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সকলের। ইংল্যান্ডের মানুষ ভালোবেসে যার নাম রেখেছে মার্কস অ্যান্ড মার্কস।

স্পেনসার মারা গেছেন। বংশধরেরাও নেই। এখন যিনি চেয়ারম্যান তাঁর নাম লর্ড সিয়েক, প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল মার্কসের নাতি? ইংরেজদের রক্ষণশীলতা নিয়ে অনেক ঠাট্টা তামাশা করা হয়, কিন্তু রক্ষণশীলতার গুণে তাদের জীবন ও প্রতিষ্ঠান অনেক স্থায়ী হতে পেরেছে, বর্ধনশীল হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে কটি প্রতিষ্ঠান শতায়ু হতে পেরেছে! কেন পারে নি, তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডিউহার্স্ট কোম্পানীরও সমান উন্নতি হয়েছে। একশো বছর আগে এই ডিউহার্স্টের কাছ থেকেই পথের পরিচয়ে পাঁচ পাউন্ড ধার নিয়েছিলেন মার্কস। ডিউহার্স্টের কাছ থেকেই মার্কস কাপড় কিনে পোশাক বানাতেন। শতবর্ষ ধরে এই জিনিস চলে আসছে। এই নীতির অদলবদল হয় নি। এ দেশ হলে কি হতো! এক পুরুষেই কত অদলবদল হয়ে যায়। আর এ তো তিন পুরুষের ব্যাপার! মার্কস বলেছিলেন, আমি হব খুচরো বিক্রেতা, রিটেলার। আমি ম্যানুফ্যাকচারিং-এ যাবো না। ডিউহার্স্ট কোম্পানীর কাপড় আমার স্পেসিফিকেশান, এরপর ম্যানুফ্যাকচারিং করবে অন্য প্রতিষ্ঠান। এই চক্রে ব্যবসা আজও ঘুরছে। মাকর্স অ্যান্ড স্পেনসার যত বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে ডিউহার্স্ট কোম্পানী। দু'জনেই আর নেই; কিন্তু বংশধরেরা এই নিয়মেই চলছেন। পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাও সাফল্যের অন্যতম কারণ। জেন বুদ্ধিস্টিরা বলেন, পুত্র পিতাকে কতটা শ্রদ্ধা করে বোঝা যায় পিতার দেহাবসানে। দেখতে হবে পুত্র পিতার নীতি থেকে, প্রদর্শিত ধারা থেকে সরে গেছে না ধরে আছে। পিতাতে সে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে কি না!

দেখছি বহু পর্যটক এধারে ওধারে ঘুরছেন। পাগলের মতো কেনাকাটা করছেন; কিন্তু কজন এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস জানেন। আমি একটা দোকান আর চোখের সামনে ফেলে রাখা কয়েক কোটি টাকার দ্রব্যসম্ভার দেখছি না, দেখছি ব্রিটিশ প্রিনসিপ্‌ল কাকে বলে! কাকে বলে ব্রিটিশ ম্যানেজমেন্ট। চটকদারী বিজ্ঞাপনে একটি শিলিংও এঁরা খরচ করেন না। বিজ্ঞাপনের কি প্রয়োজন! দেড় কোটির মতো মানুষের আসা যাওয়া। নতুন আকর্ষণ কি এলো সে তো সাজানোই আছে। এসো দেখে যাও। আমেরিকান কায়দায় মোটিভেশানের তো দরকার নেই! বিজ্ঞাপনের টাকা কর্মচারীদের পেছনে খরচ করলে তাঁরা খুশি হবেন। মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার পৃথিবীর আদর্শ এমপ্লয়ার, যাঁরা কাজ করেন তাঁরা বলেন। যাঁরা করেন না তাঁরাও বলেন। শতকরা ৮২ জন এই প্রতিষ্ঠানে একবার ঢুকলে চাকরি জীবন

শেষ না করে বেরোন না। মোটা টাকা মাইনে। উন্নতির অফুরন্ত সুযোগ। দু তিন বছরে মাইনে ডবল হয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। মাইনে ছাড়া কর্মচারীদের অন্যান্য বহুবিধ সুযোগ দেওয়া হয়। যেমন সব চেয়ে গর্বের, পাঁচ বছর চাকরি হলেই একটি করে শেয়ার। ইচ্ছে করলে প্রাপক সেই শেয়ার বিক্রিও করে দিতে পারেন, কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেনি। কর্মচারীদের গর্ব তাঁদের প্রতিষ্ঠান। মালিকপক্ষ শত বছরের ব্যবস্থাপনায় এই ভালোবাসা জাগাতে পেরেছেন। আমাদের দেশের মাড়োয়ারী মালিকরা একটু ভেবে দেখতে পারেন। দিবা রাত্র পরিশ্রমের বিনিময়ে ওঁরা কি দেন।

মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের কর্মচারীরা প্রত্যেকেই দুপুরে তিন 'কোর্সের' সুন্দর একটি 'মিল' পান। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য সচেতন এই প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, ও পোশাকের জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করেন। রোজ সকালে তাঁদের দিকে তাকালে মনে হবে 'ফ্রেশ ফ্রম দি গার্ডেন'। যেমন এখন আমার মনে হচ্ছে। সপ্তাহে একবার পায়ের ডাক্তার এসে পা পরীক্ষা করেন। কারণ এখানে অধিকাংশেরই পায়ের কাজ। সারাদিন দু'পায়ে খাড়া থাকতে হয়। বছরে দুবার আসে দাঁতের ডাক্তার। বছরে একবার জেনারেল চেপ আপ। প্রতিদিনই হেয়ার ড্রেসাররা এসে মাত্র এক পাউন্ডের বিনিময়ে মেয়েদের চুলের কায়দা করে দিয়ে যান। ডানা কাটা পরী হবার দরকার নেই। সুশ্রী, ঝকঝকে, তকতকে বুদ্ধিমতী মেয়ে হওয়া চাই। আর চাই সেবার মনোভাব, ভালোবাসা।

সেই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়ান নেই। কোথাও কোনও অসন্তোষ নেই। আমি এবার উঠে পড়লুম। অকসফোর্ড স্ট্রিটের এই শাখাটি হলো দ্বিতীয় বৃহৎ। সব চেয়ে বড় হলো মার্বেল আর্চের দোকান। হেড কোয়ার্টার, বেকার স্ট্রিট, যেখানে শার্লক হোমসের বাড়ি।

মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার মাঝে মাঝেই 'শপ অফ দি ইয়ার'-এর পুরস্কার পেয়ে থাকেন। ম্যানিকুইন রাখার কি কায়দা। চমকে উঠতে হয়! আমাদের দেশে নয় বিদেশে ম্যানিকুইন তৈরির শিল্প প্রতিষ্ঠানে দিবা রাত্র গবেষণা চলেছে। সম্প্রতি 'লাইফ' ম্যাগাজিনে সচিত্র একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছে। ভাত কাপড়ের আশু সমস্যা মিটে গেলে মানুষেব মাথা ঘামাবার মতো আরও কত কি আছে! আমরা এসব ঠিক বুঝবো না। আমাদের হাওড়ার হাট আর মঙ্গলার হাট। ফুটপাথে সার সার ছেঁড়া চট আর প্লাস্টিকের ঘেরাটোপ দেওয়া দোকান। আসল দোকান আড়ালে চলে গেছে। দেখা যায় না।

সোফায় পায়ের ওপর পা তুলে এক মহিলা বসেছিলেন। পাশ দিয়ে যাবার সময় গায়ে পা ঠেকে গেল। ভেবেছিলুম 'সরি' বলবেন। কিছুই বললেন না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললুম, 'হোয়াই ডোন্ট ইউ সে সরি।' দেখি চোখের পাতা নড়ছে না। বুঝলুম ম্যানিকুইনকে মানুষ বলে ভুল করেছি। কিছুক্ষণ পরেই বুঝলুম এদিক ওদিক দেখা যায় না এই রকম এক বিশাল দোকানে, বহু মানুষও ম্যানিকুইন হয়ে আছে। জায়গায়, জায়গায় সিকিউরিটি স্টাফ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। তাঁদের চোখ দুটোই শুধু ঘুরছে। শপ লিফটারস-এর অভাব নেই। এখন বুঝলুম, আমি যখন বসেছিলুম, তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মূর্তিটি, ম্যানিকুইন নয়, সিকিউবিটি। ফিরে এসে ওই সায়েবকেই জিজ্ঞেস করলুম, "হোয়্যার মে বি দি টয়লেট।"

সায়েব আঙুল দিয়ে দোতলাটা দেখালেন। কোনও কথা নয়। চলন্ত সিঁড়িতে নিজেকে তুলে দিলুম। নিমেষে দোতলা। সামনেই আর একজন। তিনি নির্দেশ দিলেন, এগিয়ে যাও। দেখবে জুতো। জুতোর পাশেই তোমার টয়লেট। দেখতে দেখতে চলেছি। লাগেজ। লাগেজের পরেই জুতো। জুতোর পাশেই সেই। অতি পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। বেরিয়েই কি ভাবে কি বাঁক নিলুম জানি না। জুতো, লাগেজ, দুটোই হারিয়ে গেল। এসে গেল বই। হারিয়ে গেল সিঁড়ি। বোকার মতো কিছুক্ষণ ঘুরলুম। আশ্চর্য, নিচে নামবো কি করে! আবার সেই 'ফায়ার এগজিট'। মানে সিঁড়ি। থাক আর কোনও সমস্যা নেই। তরতর করে নেমে গেলুম। কোথায় সেই সুদৃশ্য দোকান। নেমে এলুম একটা ঘরে। অজস্র ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি গোঁ গোঁ করছে। দাঁড়িয়ে আছেন একজন সায়েব। চোখ দেখে মনে হলো বেশ অবাক হয়েছেন। অতএব আমার খুব স্বাভাবিক আর স্মার্ট থাকাই উচিত। আমি বললুম, 'হ্যালো! হাউ আর ইউ?'

সায়েব একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'ইয়েস, ওয়েল।'

আমি বললুম, 'এভরিথিং অলরাইট। নো ট্রাবল।'

'নো ট্রাবল। মে আই নো, হু ইউ আর?'

'আই অ্যাম ফ্রম দি কমানওয়েলথ।'

'আই সি।'

আমি তখন বুদ্ধি করে বললুম, 'দিস মুভস দি এসকেলেটার?'

'রাইট ইউ আর।'

সায়েব এইবার মনের মতো ছাত্র পেয়ে আমাকে তাঁর যন্ত্রের কল-কৌশল বোঝাতে লাগলেন। ভোলটেজ, ফ্রিকোয়েনসি, অ্যালার্ম ডিভাইস। স্লো, ফাস্ট করার কায়দা। অটো কন্ট্রোল। শেষে বললেন, 'নো বডি কামস হিয়ার।'

মনে মনে বললুম, কেন আসবে সায়েব! কি দুঃখে আসবে। আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।

আবার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ফিরে এসে, একটু এদিক ওদিক করতেই আর একটা চলমান সিঁড়ি পেয়ে গেলুম। সেই আগেরটা। এ সিঁড়িও উর্ধ্বমুখী। নিজেকে তুলে দিলুম, দেখাই যাক না কি হয়। এইবার সিঁড়ি আমাকে যে তলাতে নিয়ে এল সেই বিভাগটি ভারি সুন্দর। চতুর্দিকে থরে থরে সাজানো মহিলাদের পোশাক। ক্রেতারাও সব মহিলা। এই বিভাগে ম্যানিকুইনের সংখ্যাও বেশি। অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় সব উঠে বসে আছে। মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার মেয়েদের অন্তর্বাসের জন্য বিখ্যাত। দামও তেমনি। গিনেস বুক অফ রেকর্ডস বলছে, পোশাকের দাম ব্যবহৃত কাপড়ের ফুট হিসেবে বিচার করলে দাম সব চেয়ে বেশি। তবু ভিড় উপচে পড়ছে। কারণ একটাই, কোয়ালিটি। আর একটি কারণ আভিজাত্য। পোশাকের চেয়ে পোশাকের লেবলের ইজ্জত অনেক বেশি। যেমন বিশ্বের আর একটি প্রতিষ্ঠান র‍্যাংলার। র‍্যাংলারের জিনস, টি শার্ট। মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার একবার শিশুবিভাগের সমস্ত জামাকাপড় সরিয়ে ফেলেছিলেন সামান্য কারণে। জনৈক ক্রেতা এসে অভিযোগ করেছিলেন, লেবেল খুলে যাচ্ছে। 'হোয়াট ইজ ইন এ লেবেল' বলে ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করা হয় নি। সেটাও একটা খুঁত।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় চোখ পড়ল, দু'জন ভাবতীয় মহিলা প্রায় হামা দেবার মতো করে, পোশাকের একটা র‍্যাকের সামনে একবার এদিকে যাচ্ছে, একবার ওদিকে যাচ্ছে। 'দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ওই'। যা ভেবেছি তাই, আমাদের কুমকুম এবং তার মাসী। এমন কিছু পেয়ে গেছে, যার ফলে এই কাঙালের শাকের ক্ষেত দেখার অবস্থা। কুমকুমেব মাসী এক একটা প্যাকেট টেনে টেনে বের করছেন আর বলছেন, টেক দিস ওযান, টেক দিস ওয়ান অলসো। 'অলসো' আব 'টু'-এর বন্যা বইছে।

আমি ভূলুণ্ঠিতা সুন্দরীকে পেছন থেকে ডাকলুম, 'হেই কুমকুম।'

আমার পাশ দিয়ে এক বিদেশিনী যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, 'হাই।'

নিশ্চয় অ্যামেরিকান। তা না হলে এমন রসিকতা করবেন কেন? কুমকুম সেই অবস্থাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'দাদা, তুমি কোথায় ছিলে?'

'তুমি কি কিং সলোমনস মাইনেব সন্ধান পেয়েছ?'

কুমকুম বললে, 'জানো, আমাদেব কি ভাগ্য, আজ এইগুলো সব কম দামে দিচ্ছে।'

পলিথিনের প্যাকেটে মোড়া ওগুলো মহিলাদের যে কোন্ পবিধেয় বুঝতে পারলুম না। দুই মহিলা আবার হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। মার্কসেব দোকানের এই বৈশিষ্ট্য, বছরের বিশেষ একটা সময়ে অন্যান্য দোকানের মতো ঢালাও 'এ টু জেড' সেল দেবাব ব্যবস্থা নেই। রোজ সকাল আটটার সময় বেকার স্ট্রিটের হেড কোয়ার্টার থেকে ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজারদের কাছে একটা লিস্ট আসে। বিশাল সেই তালিকায় থাকে, নতুন কি এল তার বিবরণ। আর থাকে সেইদিন কোন্ জিনিসের সেল 'প্রোমোট' করতে হবে তার নির্দেশ। ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে সেই মতো ব্যবস্থা নেন। সে এক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। অল্প সময়ের মধ্যে দোকানের গোছগাছ বদলে ফেলতে হয়। নির্দেশিত জিনিসগুলিকে এমন জায়গায় রাখতে হয় যাতে সবার আগে ক্রেতাদের নজরে আসে। যে ম্যানেজার ছ-হাজার দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড মাইনে পান তাঁকে তো এই ঝামেলা পোহাতেই হবে।

জেনেট রিচার্ডসন একজন সেলস গার্ল। মেয়েটি গ্র্যাজুয়েট। ইংল্যান্ডে আমাদের দেশের মতোই বেকার সমস্যা। পাশ করার পর জেনেট অনেক দিন বসেছিল। এখানে ওখানে দরখাস্ত করে। ডাক আর আসে না। বেকার ভাতায় হতাশার দিন চলে যায়। অবশেষে ট্রেনি হিসেবে ছ মাসের জন্যে মার্কস

অ্যান্ড স্পেনসারে এসেছিল। তার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। ছ মাস নয় সারা জীবন তাকে এখানে চাকরি করতে হবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে কাজে লেগে গেল। ছ মাসে তার দক্ষতা দেখে চেয়ারম্যান সিয়েফ জেনেটের চাকরি পাকা করে দিলেন। জেনেট এখন এই প্রতিষ্ঠানের একজন গর্বিত কর্মী। সকাল আটটা চল্লিশের মধ্যে সে চলে আসে। ম্যানেজারের নির্দেশ মতো কাউন্টার সাজায়। তারপর সাজ-পোশাক নিখুঁত করে, নিখুঁত মেকআপ নিয়ে সারা দিন ক্রেতাদের সেবা করে। ছুটি পায় পাঁচটা চল্লিশে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাতটা বেজে যায়। জেনেট নটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তার পা ব্যথা করে। ক্লান্তি লাগে। লাগলেও সে তার জীবিকাকে ভীষণ ভালবাসে। চলমান সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে নামতে, বিশাল ঝকঝকে দোকানের মাথার ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে যেতে যেতে মনে হলো, সাফল্যের উৎস শুধু 'গুড ম্যানেজমেন্ট নয়, কর্মীদের ভালবাসাও একটা ফ্যাক্টার। এই প্রতিষ্ঠানের অবিবাহিতারা বিয়ের দু'বছর আগেই কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন, বিয়ে করতে চলেছি, কয়েক মাস সামান্য অসুবিধে হতে পারে। সন্তানসম্ভবা হবার সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেন, যাতে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারেন।

এই সব আমরা ভেবে দেখতে পারি। না ভাবলেও অসুবিধে নেই কিছু। যেমন চলছে তেমনি চলবে। এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত। আর তো আমাদের মোক্ষম মন্ত্রই আছে—দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। আমাদের কিছু হবাব দরকার নেই, আমাদের তো হয়েই আছে। উই হ্যাভ আওয়ার ওন ওয়েজ অফ ডুইং থিংস।

৩০

অকসফোর্ড স্ট্রিটের সকাল বেশ প্রাণচঞ্চল। কেমন মনেব আনন্দে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটাই লক্ষণীয়, সকলেই তরুণ তরুণী। এ-দেশেব বৃদ্ধরা কোথায়। বৃদ্ধারা কোথায়! সবাই কি ওল্ড-এজ হোমে গিয়ে মৃত্যুর দিন গুনছেন। এ-দেশেব মানুষ তো ভারতীয়দেব মতো মৃত্যু নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। যাক আমার ওই গবেষণায় প্রয়োজন নেই। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে বেকার স্ট্রিটের দূরত্ব খুব বেশি নয়।

কাল থেকেই একজনের কথা ভীষণ মনে পড়ছে। তিনি হলেন শার্লক হোমস। মাঝ রাতে জানলার পর্দা সরিয়ে বারান্দার দরজা খু অনেক উঁচু থেকে নিচের রাস্তাব দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, তখন সময় আমাকে ঠেলে নিয়ে গেল ১৮৯৫ সালের লণ্ডনে। ট্রাম নেই, লাল ডবল ডেকার নেই, কালো ট্যাকসি নেই। গ্যাসের আলো। ঘরে ঘরে মোমবাতি। নির্জন রাস্তায় ঘোড়াব গাড়ি। মধ্যরাতে মাতাল টলতে টলতে বাড়ি ফিরছে। মাঝে মধ্যে একটা দুটো ঘোড়ার গাড়ি। চাকার ছড ছড় শব্দ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ। যাত্রী কোনও সায়েব। মাথায় টপ হ্যাট। দু হাঁটুর মাঝখানে ছড়ি। কোটের বুকপকেট থেকে উঁকি মারছে ভাঁজ করা রুমাল। পকেট ঘড়িব সোনার চেন বুকের কাছে দুলছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিস, জন র‍্যানস রাতের টহলে বেরিয়েছেন। তাঁব ডিউটি রাত দশটা থেকে ভোর ছটা।

রাত এগারোটার সময় হোয়াইট হার্টে একটা মারামারির ঘটনা বাদ দিলে, শান্ত রাত। টহল দিয়ে বেড়ানো ছাড়া র‍্যানসের আর কিছু করার আছে মনে হলো না। রাত একটার সময় ঝেঁপে বৃষ্টি এল। আর ঠিক সেই সময় র‍্যানসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হ্যারি মারচাবের। মারচার ছিলেন হল্যান্ড গ্রোভের বিটে। হেনরিয়েটা স্ট্রিটের কোণে দাঁড়িয়ে দু'জনে অনেকক্ষণ কথা বললেন। রাত দুটো নাগাদ র‍্যানসের মনে হলো ব্রিকস্টন রোডের দিকটা একবার দেখে আসি, সব ঠিক চলছে কি না! ব্রিকস্টন রোড বেশ নোংরা, তেমনি নির্জন। কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই। একটা দুটো ঘোড়ার গাড়ি পাশ দিয়ে চলে গেল। র‍্যানস তখন ভাবছেন, গরম জলে এক সঙ্গে চার পেগ জিন যদি এই বৃষ্টির রাতে পাওয়া যেত তাহলে কেমন হতো! র‍্যানস আর মারচার রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথায় ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের মধ্যে বর্ষা রাতের এই সব অকল্পনীয় সুখের কথা বলাবলি করছেন। হঠাৎ র‍্যানসের চোখে পড়ে গেল ব্রিকস্টন রোডের কিছুটা দূরে লরিস্টন গার্ডেনসের একটি খালি বাড়ির জানালা থেকে আলোর রেখা

উঁকি মারছে। কি হলো! খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার। যে বাড়িতে কেউ থাকে না সেই বাড়িতে আলো জ্বালালে কে। পাশাপাশি দুটো বাড়িই খালি পড়ে আছে। ওই বাড়ির শেষ ভাড়াটে টাইফায়েডে মারা গেছেন। পেছনে একটা নর্দমা আছে। ওই নর্দমাই হলো অসুখের উৎস। যতদিন না নর্দমার কিছু হচ্ছে ততদিন কে আর সাহস করে মরতে আসছে। র‍্যানস তখন সেই সন্দেহজনক আলোর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মন বলছে, সামথিং রং। অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটছে ওই তিন নম্বর বাড়িতে।

তিন তলা বাড়ি, অন্ধকার ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। জানালার ওপর জানালা সব বন্ধ। এখানে ওখানে 'টু লেট' নোটিস ঝুলছে। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে অসুস্থ এক ফালি বাগান। টাকে চুল গজানোর মতো কয়েকটা চারা গাছ এখানে ওখানে। বৃষ্টিতে মাটি সপসপে ভিজে। র‍্যানস বাগানের গেট খুলে বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে আবার ফিরে এলেন। ওই জনমানবশূন্য এলাকার নিস্তব্ধ নির্জন বাড়ির একটি মাত্র জানালায় একটি মাত্র বাতির আলো কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। বাগানের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভুতুড়ে বাড়িটার দিকে র‍্যানস ভালো করে তাকালেন। কোথায় মানুষ! ভীতু না হলেও ভূতের ভয় হলো, মনে হলো, যে টাইফায়েডে মারা গেছে সে ফিরে এসে নর্দমাটা পরিদর্শন করছে না তো! হয়তো দেখছে, এই নর্দমাই তার মৃত্যুর কারণ। এইখান থেকেই উঠে এসেছিল মৃত্যুর পরোয়ানা। এক সময় বাকিংহাম প্যালেসের পেছনেও খোলা, কাঁচা নর্দমা ভ্যাটভ্যাট করত। রাজপরিবারের কয়েকজন সেই দূর অতীতে টাইফায়েডে মারা গিয়েছিলেন। রাজার আত্মীয় বলে অসুখ ক্ষমা করেনি।

একা ভেতরে ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না বলে র‍্যানস মারচারকে খোঁজার জন্যে রাস্তায় এলেন। কোথায় মারচার! তার লণ্ঠনের আলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। র‍্যানস একা। বৃষ্টিভেজা ফাঁকা রাস্তা। একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। তখন সাহস করে র‍্যানস আবার ফিরে গেলেন তিন নম্বর বাড়ির দরজার সামনে। দরজা হাত দিয়ে ঠেলা মারতেই খুলে গেল। ভেতরটা থমথম করছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। র‍্যানস তখন পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন সেই ঘরটির দিকে যে-ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলেন আঁতকে ওঠার মতো সেই দৃশ্য। বাতিদানে লাল একটি মোমবাতি কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। ঘরে কোনও আসবাবপত্র নেই। মেঝের ওপর পড়ে আছে সুবেশ এক পুরুষের মৃতদেহ। চারপাশে থকথক করছে রক্ত।

শার্লক হোমস বললেন, 'ইয়েস, আই নো অল দ্যাট ইউ স। সারা ঘরে আপনি বেশ কয়েকবার গোল হয়ে ঘোরাঘুরি করলেন। তারপব মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর উঠে চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে, তারপর—

জন র‍্যানস চমকে উঠলেন। মুখে ভয়ের রেখা, চোখে সন্দেহ, 'আপনি কোথায় লুকিয়েছিলেন স্যার। কি করে আপনি এত সব জানলেন?'

শার্লক হোমস হাসলেন। ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে বসে আজও তিনি হাসছেন। মুখে পাইপ। পরিধানে ড্রেসিং গাউন। বাজপাখির ঠোঁটের-মতো নাক। ছয় ফুটের ওপর লম্বা। অদূরে বসে আছেন চিরসাথী ডক্টর ওয়াটসন। কাবুল প্রত্যাগত আর্মি ডক্টর। ভিনসেন্ট স্টারেট লিখেছিলেন : শার্লক হোমস আর ওয়াটসনের জন্যে পৃথিবীতে কোনও দিন কবর রচিত হবে না। এই বেকার স্ট্রিটে তাঁরা দুজনে চিরকাল বসবাস করবেন। এই যে আমি লিখছি, এখনও কি ওঁরা দুজন ওখানে নেই? বাড়ির বাইরে রাস্তা ধরে ছুটছে ঘোড়ার গাড়ি। বৃষ্টি পড়ছে ঝিপঝিপ করে। গাড়ির চাকার শব্দ দুপাশের বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে। সেই শয়তান মরিয়ারটি যে হোমসকে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিয়েছিল রাইখেনবাখে, সে আজও নতুন নতুন শয়তানির পরিকল্পনা এঁটে চলেছে। হোমসের বসার ঘরের ফায়ার প্লেসে সামুদ্রিক-কয়লা ধীরে ধীরে জ্বলছে। এই মুহূর্তে হোমস আর ওয়াটসন তাঁদের কষ্টার্জিত আরাম নিশ্চিন্তে উপভোগ করছেন। ওয়াটসনের পাশে তাঁর স্ক্র্যাপবুক। হোমসের পাশে তাঁর বেহালা। যাঁরা তাঁকে ভালবাসেন, তাঁদের কল্পনা-প্রবণ হৃদয়-প্রকোষ্ঠে হোমস আর ওয়াটসন আজও জীবিত—ইন এ নস্টালজিক কান্ট্রি অফ দি মাইন্ড। হোয়্যার ইট ইজ, অলওয়েজ এইট্টিন-নাইনটি ফাইভ।

কারুর কোনও সাহায্য ছাড়াই শার্লক হোমস সেন্টারে। এই সেই বেকার স্ট্রিট। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিখ্যাত স্ট্রান্ড ম্যাগাজিনে কোনানডয়েল তাঁর সৃষ্ট চরিত্র শার্লক হোমস আর নিজের সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ডয়েল নিজে ছিলেন অসাধারণ একজন মানুষ। সে-যুগের

মানসিকতা আর এ-যুগে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দুঃখ করে লাভ নেই। সে-যুগে বড় মাপের মানুষ তৈরি হতো। ডয়েল লিখছেন : সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে আমি কয়েকদিন ধরে আমার পুরনো চিঠির বাক্‌স হাতড়ে কিছু চিঠি খুঁজে বের করেছি। চিঠিগুলি সরাসরি অথবা ঘুরিয়ে লেখা হয়েছে মিস্টার হোমসকে (নোটোরিয়াস মিস্টার হোমস)। অনেক চিঠিই হারিয়েছে। এখন থেকে আমি ভাবছি আর একটু সতর্ক হব। হোমসের জীবনীকার হিসেবে আমি ভাগ্যবান। দেশে বিদেশে আমার অনেক পাঠকপাঠিকা। এঁরা বিদেশী। ভালো করে আমার অথবা শার্লক হোমসের নাম লিখতে পারেনি। বানান ভুল। তা হোক। বেশির ভাগ চিঠিই এসেছে রাশিয়া থেকে। রাশিয়ান ভাষায় চিঠি আমি পড়তে পারিনি। না পড়েই পড়া হয়ে গেছে ভেবে উত্তর দিয়েছি। আর ইংরেজিতে লেখা চিঠিগুলি সত্যিই অদ্ভুত। সংগ্রহে রাখার মতো।

পাঠিকারা চিঠি শুরু করতেন 'গুডলর্ড' সম্বোধনে। ডয়েল একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন এই লেখায়। চিঠিটি এসেছিল ওয়ারস থেকে। মহিলা লিখেছিলেন, আমি প্রায় দু'বছর হয়ে গেল শয্যাশায়ী। এই অবস্থায় আপনার বই-ই আমার একমাত্র সঙ্গী। ডয়েল লিখছেন, চিঠিটা পড়ে আমি একেবারে গদগদ হয়ে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত বই অটোগ্রাফ করে একটা পার্সেল তৈরি করে ফেললুম আমাব সেই ভক্ত পাঠিকাকে পাঠাবো বলে। নেহাত আমার বরাত ভালো। হঠাৎ আর এক লেখক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কথায় কথায় আমি তাঁকে এই চিঠির কথা বলতেই তিনি বাঁকা হেসে পকেট থেকে অনুরূপ একটি চিঠি বের করে দেখালেন। চিঠির সেই একই বয়ান, গত দু'বছর ধরে আপনার বই-ই এই অক্ষমের একমাত্র সঙ্গী। আমি জানি না, আরও কতজন লেখক লেখিকা এই ধূর্ত পাঠিকাব শিকার হয়েছেন। এইভাবেই মহিলাটি হয়তো মজার একটি লাইব্রেরি তৈরি করে ফেলেছেন।

শার্লক হোমসের স্রষ্টাব জীবনে অনেক মজার মজার ঘটনা ঘটে গেছে। নাইট উপাধিতে ভূষিত হবার অব্যবহিত পরে ডয়েল দিন কয়েকের জন্যে একটি হোটেলে গিয়ে উঠেছেন। কিছু কেনাকাটা করেছিলেন। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিল পাঠিয়েছে স্যার শার্লক হোমসের নামে। ডয়েল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। জীবনে অনেক রসিকতা সহ্য কবেছেন, এ বসিকতাটা যেন বড় বেশি উৎকট। সঙ্গে সঙ্গে কড়া একটা চিঠি পাঠালেন। প্রতিষ্ঠানেব এক কর্মচারী ছুটে এলেন। অত্যন্ত দুঃখিত। বারে বারে ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু মাঝে মাঝেই বলতে লাগলেন, 'আই অ্যাসিওর ইউ, স্যার, দ্যাট ইট ওয়াজ বোনাফাইড।' ডয়েল জিজ্ঞেস করলেন, তার মানে? বোনাফাইড মানে?' প্রতিনিধি বললেন, 'আমার সহকর্মীরা বলছিল, আপনি নাইট উপাধি পেয়েছেন। নাইটেড হবার পর মানুষ নাম বদলে ফেলে। ওরা বলছিল আপনার নতুন নাম এখন স্যার শার্লক হোমস।

স্যার শার্লক হোমসের বাড়ির সামনে। দোতলায় সেই বিখ্যাত বসার ঘর। বেহালার শব্দ কি ভেসে আসবে! দোতলার জানালার ধারে বসে ডক্টর ওয়াটসন কি এই মুহূর্তে আমাকে দেখিয়ে হোমসকে প্রশ্ন করবেন, 'আই ওয়ান্ডার হোয়াট দ্যাট ফেলো ইজ লুকিং ফর।'

শার্লক হোমস বলবেন, 'অ, তুমি ওই সঞ্জীবের কথা বলছ! কলকাতার ছেলে। কাগজের অফিসে কাজ করে।' আমি শুনতে পাচ্ছি না ওঁদের দুজনের আলোচনা। ওয়াটসন আর মেময়ার্স লিখবেন না, তাহলে লিখতেন :

'বন্ধু আমার যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে। জানে তো তার এই অনুমানের সত্যাসত্য আমি কোনও দিনই যাচাই করতে পারবো না'।

এই ভাবনার পরই ওয়াটসন লিখতেন : কথাটা মনে মিলিয়ে যেতে না যেতেই দেখি, যে লোকটি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা, সে আমাদের বাড়ির নম্বর দেখতে পেয়েছে। রাস্তা পার হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। শুনতে পাচ্ছি দরজায় টোকা মারার বিরাট শব্দ। নিচে মিনমিনে কণ্ঠের প্রশ্ন। মৃদু পদধ্বনি উঠে আসছে সিঁড়ি ভেঙে।

'আপনি শার্লক হোমস?' ভেতবে ঢুকতে ঢুকতে লোকটির প্রশ্ন।

হাতের মুঠোয় তোমাকে পেয়ে গেছি। বন্ধু, তোমার অনুমানের সত্যাসত্য এখনি যাচাই হয়ে যাবে। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিজ্ঞের মতো অনেক কথাই বলেছিলে। জানতে না যে এখানেই

আসবে। সরাসরি প্রশ্ন করলুম, 'খোকা, তোমার নামটি কি?'

'আজ্ঞে সঞ্জীব।'

'তুমি থাকো কোথায়?'

'কলকাতায়?'

'করো কি?'

'খবরের কাগজে চাকরি।'

আমার বন্ধুর ক্ষমতায় হতভম্ব। 'হোমস তুমি কি করে বললে? আমি কনফাউন্ডেড, ডাম্বফাউন্ডেড।'

'ওয়াটসন বাড়াবাড়ি কোরো না। আসলে তোমার দেখার ক্ষমতা নেই। তুমি ওর মুখটাই দেখছ। বুকপকেটের দিকে তাকাওনি। ওখানে একটা হলুদ রঙের লেবেলে ওর ছবি আর নাম লেখা। আর সবার ওপরে লেখা কমানওয়েলথ সামিট, উইথ প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া।'

'মাই গড, আই মাস্ট রিটায়ার। কাগজে চাকরি কি ভাবে বললে?'

'ভেরি সিম্পল, চেহারা দেখে বোঝাই যায় মন্ত্রী নয়, এম পি নয়। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গী আর কে হতে পারে! কাগজের লোক। দিস ইজ ডিডাকসান মাই ডিয়ার ওয়াটসন।'

'আর কলকাতা বললে কি করে?'

'ভেরি সিম্পল। রোদে পোড়া ডিসপেপটিক লুক। আর কোন্ দেশের মানুষের এমন চেহারা হয়! এ কেস অফ টেনসান অ্যান্ড বদহজম।'

হোমস আমাকে বললেন, 'বসুন। আমি আর এখন প্র্যাকটিস করি না। আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই স্যার আর্থার কনান ডয়েল আমাকে রিটায়ার করিয়ে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি এখন সাউথ ডাউনে মৌমাছি পালন করি।'

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন স্যার আর্থার কনান ডয়েল। চেহারা দেখেই চিনেছি। বিশালদেহী সহৃদয় মানুষ। বোয়ার যুদ্ধে ডাক্তার হিসেবে গিয়েছিলেন। ওয়াটসন গিয়েছিলেন আফগানিস্থানে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন। ডয়েলকে জিজ্ঞেস করলুম, 'একবার তো আপনি শার্লক সায়েবকে মেরেও ফেলেছিলেন।'

চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, 'ফর দ্যাট অনেক গালাগালও খেয়েছি। আমি তো মরিনি আমি প্রফেসার মরিয়ারটিকে দিয়ে আমার হিরোকে খাদে ফেলে দিয়েছিলুম। তাতে এক মহিলা লিখলেন, ইউ ব্রুট।'

'তারপর তো শার্লক সায়েবকে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন।'

'সে তো অনেক পরে।'

'আমি তা জানি। রাইখেনবাখ ফলে ওয়াটসন সায়েব সিগারেট কেস-চাপা বন্ধুর শেষ চিঠিটি পেলেন। লিখলেন দি ফাইন্যাল প্রবলেম। তিনি কি জানেন তখন হাজার হাজার মাইল দূরে বাল্টিমোর শহরে ওই লেখা পড়ে দশ বছরের এক শিশুর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল! এখন তিনি বিরাট। তাঁর নাম ক্রিস্টোফার মরলে। তিনি লিখছেন, 'আমি তখন শিশু। বোঝার ক্ষমতা খুবই কম। শার্লক হোমস আর প্রফেসর মরিয়ারটি দুজনে জড়াজড়ি করে রাইখেনবাখ ফলে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাবার ফলে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য পাঠকদের জগতে যে হাহাকার সেদিন উঠেছিল তা আমি হয়তো জানতে পারিনি, কারণ জানার বয়েস হয়নি; কিন্তু দি ফাইন্যাল প্রবলেমের শেষ ছত্রটি পড়ে আমার শিশুমন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের খাঁজে শার্লক হোমসের রেখে যাওয়া সেই সিগারেট-কেসের বেদনা আমার অসহ্য মনে হয়েছিল। সেই পরিষ্কার, ঋজু হাতের লেখায় হোমসের চিঠি।' 'ডয়েল সাহেব মরলে তারপর আপনার সব বই পড়ে ফেলেছিলেন, দি ফার্ম অফ গার্ডলস্টোন, দি ক্যাপটেন অফ দি পোলস্টার, রাউন্ড দি রেড ল্যাম্প। দি হোয়াইট কম্পানি। শিশুর ভালবাসা দেখুন। হোমস নেই তো কি হয়েছে। কনান ডয়েলের অন্য সৃষ্টি তো আছে।'

'শার্লকের বয়েস হলো একশো বছর, আর কতকাল সে বাস্কারভিলের কুকুরের পেছনে ছুটবে; এখন তার ছুটি। এই তো আমার পুরনো চিঠির বাকসে কত চিঠি।' ডয়েলে সাহেব চিঠি বের করলেন,

'এই চিঠিটা লিখেছেন অজ্ঞাত এক মহিলা। লিখছেন, শার্লক হোমস খ্রীষ্টমাসে তাঁর গ্রামের বাড়িতে দেখাশোনা করার জন্যে একজন ভালো মহিলা চান কি? আমার সন্ধানে একজন আছে, যে গ্রামের শান্ত জীবন পছন্দ করে, বিশেষভাবে মৌমাছি তার অতি প্রিয়। আর একজন সরাসরি হোমসকে লিখেছেন, ভোরের খবরে-কাগজে পড়লাম আপনি না কি অবসর নিয়ে গ্রামে চলে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে মৌমাছি পালন করবেন। তাই যদি হয় তাহলে আমি আপনাকে নানা ভাবে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত আছি। আপনি আমার জীবনের বহু মুহূর্ত আপনার জীবনের ঘটনা দিয়ে আনন্দময় করে রেখেছেন তাই আমার এই সাহায্যের হাত প্রসারিত। আশা করি সেই মনোভাব নিয়েই এই চিঠিটি পড়বেন। তাহলে দেখুন অবসর গ্রহণ করানোর সিদ্ধান্ত মানুষ ভালোভাবেই নিয়েছেন। তা ছাড়া সময় কত বদলে গেছে। এখন আর মাথা ঘামাবার মতো অপরাধ হয় কোথায়! আর জানেনই তো বুদ্ধিমান অপরাধী আর অপরাধ না পেলে আমার বন্ধু অস্থির হয়ে ওঠেন আর সেই অস্থিরতা কাটাবার জন্যে তাকে কোকেন নিতে হয়। কোথায় সেই গ্যাসের আলো, ব্রুহাম গাড়ি, কোথায় সেই খালিখালি বাড়ি, টু লেট নোটিস, লণ্ঠন হাতে চৌকিদার আর রাতের পথে রোঁদে বেরোয় না। সিভিলাইজেসান মাই ডিয়ার ওয়াটসন।'

হোমস ঠোঁট থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন, 'সেই জন্যেই আপনি এক মাফিয়াকে প্রথম আমদানী করে, তার হাত দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।'

'হু ইজ হি?'

'প্রফেসার মরিয়ারটি। হি ওয়াজ এ মাফিয়া। ক্রাইম সিন্ডিকেটের নায়ক।'

'দ্যাটস ট্রু। সে এসে গেল, আসবে বলে, আসতে হবে বলে। ডেমোক্রেসির সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল অর্গ্যানাইজড ক্রাইম। প্রতিরোধের উপায় নেই।'

শার্লক হোমসের বসার ঘরের দিকে তাকালুম। ঠিক সেই রকমই আছে, যেমন ছিল একশো বছর আগে। স্টাডি-ইন-স্কারলেটে ওয়াটসন আর হোমস যেভাবে সাজিয়েছিলেন। দরজা। ঢুকেই বাঁ পাশে ওয়াটসনের টেবিল। তার ওপর খোলা রিভলবার। ডান দিকে হোমসের ছোট কেমিকেল ল্যাবরেটারি। বাঁ দিকে জানালা। তার পাশেই ওয়াটসনের বুককেস। চন্দ্রাকৃতি পর্দাঘেরা একটা জায়গা। তার আড়ালে জানালা। জানালার ধারে বসার আসন। মাস্টার যখন নিরিবিলিতে বসে কোনও সমস্যার কথা ভাবতেন, চলে আসতেন এই নিভৃতিতে। এখানকার দেয়ালে ঝুলছে জীব-বিজ্ঞানের চার্ট। দরজা। দরজার ওধারে হোমসের শয়ন-কক্ষ। দরজার পাশে পাইপ-র‍্যাক। তার পাশে ফায়ার-প্লেস। তার পাশে হোমসের টেবিল। খোলা রিভলবার। গঁদের আঠার শিশি। দরজা। ওপাশে ওয়াটসনের শয়ন-কক্ষ। দরজার পাশে বইয়ের র‍্যাক। কাবার্ড। তার ওপর বাতিদান। তার পাশে বেহালা। পুরনো মডেলের টেলিফোন। আবার জানালা। জানালার সামনে হোমসের টেবিল। তারপরে আবার একটি বুককেস। সেখানে যত ক্রাইম রেকর্ড। হোমস একবার অপরাধীকে বোকা বানানোর জন্যে মোম দিয়ে নিজের একটি মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন। সেই মূর্তিটি জানালার ধারে সোফায় বসানো। আসল হোমস ভেবে নকল হোমসকে গুলি করো। ঘরের মাঝখানে কোনাকুনি রাখা ডিনার টেবিল। দু'পাশে দুটি চেয়ার। একটি হোমসের একটি ওয়াটসনের। ফায়ার-প্লেসের পাশে দু'জনের বসার জন্যে দুটি আরাম কেদারা। তৃতীয় একটি বেতের সোফা।

ওয়াটসন সায়েবকে জিজ্ঞেস করলুম, 'মনে পড়ে ,সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটি?'

'ইয়েস। তখন আমার শরীর আফগান যুদ্ধে একেবারে ভেঙে গেছে। ইংল্যান্ডে কোনও আত্মীয় নেই। কোনও রোজগার নেই। ক্রাইটেরিঅন বারের সামনে উদ্দেশ্যহীন ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। স্ট্র্যান্ডের একটা ছোট হোটেলে থাকি। থাকার মতো একটা ঘর খুঁজছি; কিন্তু ভাড়ার ভয়ে এগোতে পারছি না। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল হাসপাতালের পুরনো সহকর্মী স্ট্যামফোর্ড-এর সঙ্গে।'

ওয়াটসন বললেন, 'যান না, সেই বারটা দেখে আসুন। ক্রাইটেরিঅন লংবার। হোমসের জাপানী ভক্তরা সেখানে একটি স্মৃতিফলক লাগিয়ে দিয়ে গেছেন, ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে। লেখা আছে—This Plaaque commemorates the historic meeting early in 1881 at the original

critarion long bar of Dr. Stamford and Dr. John which led to the introduction of Dr. Watson to Mr. Sherlock Holmes. মাই ডিয়ার সান শার্লক হোমস আমার গর্ব। তার জীবনের খুঁটিনাটি আমি যত না জানি তার চেয়ে বেশি জানে ভক্তরা। কত প্রশ্ন? ওই যে বসে আছেন ওয়াটসন সায়েব, ওঁর প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন দ্বিতীয় স্ত্রী কি ভাবে এলেন। কবে আবার আমি তাঁর বিয়ে দিলাম! গ্রেগসন আর লেসট্রেডকে কেন দূরে ঠেলে দিয়েছি। কেন স্ট্যামফোর্ডকে আমি আর আনিনি। অনেক অনেক প্রশ্ন রে ভাই। তবে যাই বলো আমার গর্বের শেষ নেই। সেদিন কি হয়েছে জানো, ওই যে জাপানী ভক্তরা দি ব্যারিতসু চ্যাপ্টার ওরা যখন ক্রাইটেরিয়ন 'বারে' মেমোরিয়াল প্লাক উন্মোচন করছিলেন, তখন খুব মজা হলো। অভিনেতা কার্লটন হব্‌স শার্লক হোমস সেজে একটা ঘোড়ার গাড়ি চেপে এলেন। জানো তো আমার হোমস ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর কিছু চাপতেন না। হব্‌স গাড়ি থেকে নামছেন, পাশ দিয়ে দুজন পথচারী যেতে যেতে তাকালেন। একজন বললেন, আরে উইনস্টন, ও শার্লক হোমস। ব্যাপারটা বুঝলে, উইনস্টন চার্চিল আর শার্লক হোমস আমাদের কত প্রিয়। তুমি জানো, ১৯৫৪ সালে আমেরিকান ভক্তরা সেন্ট বারথোলোমিউ হাসপাতালে 'আফগানিস্থান প্লার্ক লাগিয়ে দিয়ে গেল। জানো তো এই হাসপাতালেই স্ট্যামফোর্ডের সঙ্গে ড: ওয়াটসন এসে কেমিস্ট্রি রুমে শার্লকের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিল। মনে পড়ে কত সাল?'

'ইয়েস। আঠারো শো একাশি। সে বর্ণনা ভোলা যায়! করিডর পেরিয়ে আর্চের তলা দিয়ে বারান্দা যেখানে দু ভাগ হয়েছে বাঁ দিকে ঘুরে শেষ মাথায় কেমিস্ট্রি রুম। বিশাল ঘর। টেবিলের পর টেবিল। শিশি বোতল, টেস্ট টিউব, বুনসেন বার্নার, ঝলমলে আলো। দূরের টেবিলে একজন মাত্র মানুষ সামনে ঝুঁকে আছেন। তন্ময়। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন, আমি পেয়েছি। রক্তের তলানি ফেলার নতুন রিএজেন্ট।'

'ওয়াটসনকে দেখে কি বললেন?'

'ইউ হ্যাভ বিন ইন আফগানিস্থান। আই পারসিভ।'

'রাইট। আর স্মৃতিফলকে সেই কথাটাই লেখা আছে। যাও না গিয়ে দেখে এস। অতীতে বেঁচে ওঠার যে কত আমেজ।'

টেবিলের ওপর এক খন্ড 'হুজ হু' পড়ে ছিল। প্রকাশক অ্যাডাম অ্যান্ড চার্লস ব্ল্যাক ও লাইব্রেরি কমিটি ফর দি বারো অফ সেন্ট মেরিলিবোন। এই 'হুজ হু'তে শার্লক হোমস রয়েছেন :

হোলমস শার্লক প্রাইভেট কনসাল্টিং ডিটেকটিভ। জন্ম জানুয়ারি ১৮৫৪। ইংলিশ কান্ট্রি স্কোয়ার পরিবারে শিক্ষা, পাবলিক স্কুলে ও কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটিতে। ইত্যাদি ইত্যাদি করে বিশাল এক জীবন কথা। যার শুরু আছে শেষ নেই। এতক্ষণ আমি যে অতীত তৈরি করেছিলুম তা লন্ডন মিস্টের মতো উবে গেল। কোথায় ওয়াটসন, কোথায় হোমস, কোথায় ডয়েল। তিনি ছিলেন না, তিনি আজও নেই। তিনি ছিলেন, ভীষণ ভাবে ছিলেন, থাকবেন চিরকাল। বেকার স্ট্রিটে বেরিয়ে এসে নেশাগ্রস্তের মতো জিজ্ঞেস করলুম, 'হোয়্যার ইজ দি ক্রয়াম?'

পথচারী বললেন, 'ইন দি মিউজিয়াম।'

তারপর হাহা করে হেসে বললেন, 'ইনটকসিকেশান অফ দি পাস্ট।'

আমার মনে হলো যে জাতের কল্পনা আছে তারা কত ভাগ্যবান। কত সুখী! এই ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীতে কেমন অতীত নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে, সৃষ্টি নিয়ে, স্রষ্টা নিয়ে বেঁচে থাকা যায়!

৩১

চমক! চমক অপেক্ষা করেছিল পথের বাঁকে। 'আশ্চর্য লোক তুমি দাদা! কোথায় পালিয়েছিলে?' কুমকুম একা দাঁড়িয়ে আছে! তার মাসী মিসিং। একগাদা সুদৃশ্য প্যাকেট ঝুলছে এ হাতে ও হাতে।

মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ রেগে গেছে। 'জানো, ওই অত বড় দোকানটা আমি তিন তিনবার খুঁজে এসেছি। রাস্তার এধারে ওধারে হন্যে হয়ে তোমাকে খুঁজছি।

'আমি ভাবতেই পারিনি তুমি আমাকে খুঁজবে।'

'তা কেন পারবে। আমি তো জানি, তুমি তিন মিনিটের মধ্যে হারিয়ে যাবে। তোমার তো হারিয়ে যাবার প্রতিভা অসাধারণ। কোথায় ছিলে?'

'যা নেই তা দেখতে গিয়েছিলুম। ২২১ বি, বেকার স্ট্রিট। স্যার শার্লক হোমসের বাড়ি। সেই বিশ্ববিখ্যাত অমর ডিটেকটিভ। ছিলেন না নেই, অথচ ভীষণ ভাবে আছেন।'

'বাঃ, আমাকে নিয়ে গেলে না।'

'তুমি তো হারিয়ে গেলে।'

'আমি হারালুম, না, তুমি হারালে?'

'সেটা অবশ্য গবেষণার ব্যাপার। জানো তো, আমি ছেলেবেলায় রথের মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলুম। খুঁজে পাবার পর আমার কাকা এই মারেন তো এই মারেন। আমি বললুম বাবে। আপনি হারিয়ে গেলে আমার কি দোষ।'

'চলো, কটা বেজেছে দেখেছো। প্রেস সেন্টারে যেতে হবে না।'

এইবার মজাটা বেশ জমে গেল। দু'জনেই অকূল পাথারে। উত্তর দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম সব জ্ঞান হারিয়ে গেল। আমরা এখন পথ মানচিত্রের কোথায় আছি কে জানে। বাঁ দিকে যাবো, না ডান দিকে। সামনে না পেছনে। চক্কর লেগে গেল। কুমকুম বলে, "দাদা কোন দিক?" আমি বলি 'কুমু কোন দিক?' কুমকুমকে বললুম, 'দ্যাখো, আর যাই করো, কোনও সাহেবকে জিজ্ঞেস কোরো না। হিপ পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে কেবল বলে যাবে, ইউ আর হিয়ার। ইউ আর হিয়ার। এরা কেউ কিছুই জানে না।'

হঠাৎ বাঁ পাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একটা তীর চিহ্ন, স্পষ্ট লেখা 'টু আন্ডার গ্রাউন্ড'। কুমকুমকে দেখালুম। সিদ্ধান্ত হলো ওপরটা বড় জটিল, ভূগর্ভে মনে হয় সহজ সমাধান পাওয়া যাবে। বিদায় রাস্তা, বলে আমরা নামতে লাগলুম। প্রথমে চাতাল। তারপর সেই চলমান সিঁড়ি। ঘুরঘুর করে নিচে নামছে। ক্রমশই চলেছি পাতালের গভীরে। নামছি তো নামছিই। আরও কত দূর অধঃপতন হবে কি জানি। অবশেষে একটা ল্যান্ডিং পাওয়া গেল। সেখানে একজন পশ্চিম ভারতীয়কে জিজ্ঞেস করলুম। সহৃদয় ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে নয়, আরও নিচে চলে যাও। তোমাদের যেতে হবে ব্লু লাইনে।'

নাঃ, পাতালেও তো ব্যাপারটা সহজ হলো না। যিন ব্লু হোয়াইট। সেই এক জটিলতা। পাতালেও দেখছি পথের জাল পাতা। এখানেও এক তলা, দোতলা। পাতালের গ্রাউন্ড ফ্লোর কোনটা হবে। কোন্ দিক থেকে গণনা শুরু হবে। আবার এসকেলেটার। এবার মনে হয় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে চলে এলুম। আন্ডার গ্রাউন্ডে যেন জমজমাট আর একটা শহর তৈরি হয়েছে। সবই আছে কেবল দিনের আলোটা নেই। প্রথম একজন বৃদ্ধ সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। বগলে ছাতা। দাঁড়িয়ে আছেন লাইনে। প্রশ্নটা সেই প্রবীণকেই করা হলো 'ব্লু-লাইনটা কোথায়?'

তিনি একটিও কথা না বলে আঙুলটা স্বর্গের দিকে তুললেন। ভুল হয়ে গেল। আমি পাতালে, তার মানে তিনি মর্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। আমরা দুজনেই ওপর দিকে তাকালুম। একটা বোর্ড ঝুলছে 'ব্লু-লাইন'। ভারতীয় অভ্যাস চারপাশে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করি না। 'হ্যাঁ মশাই বলতে পারেন করেই জীবনটা কাবার হয়ে গেল। আধুনিক বিশ্বে সবই নোটিস হয়ে ঝুলছে। জানা থাকলে আর অসুবিধে হবার কথা নয়। সভ্যতা আর একটু এগোলে মানুষের গায়েও নোটিস ঝোলানো হবে, ম্যান, ওম্যান। ওম্যানের ক্লাসিফিকেসান হবে ম্যারেড, আনম্যারেড, ডিভোর্সড। সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তরে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। মানুষের প্রতিযোগী এখন রোবট।

দশ বারোজনের পেছনে আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সামনেই টিকিট কাউন্টার। আর আমাদের সামনে সেই বৃদ্ধ সাহেব। তিনি হঠাৎ কোটের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা লন্ডন ম্যাপ বের করে কুমকুমের হাতে দিয়ে বললেন, 'কিপ ইট। উইল হেলপ ইউ।'

ম্যাপ দেখে জানা গেল আমরা অকসফোর্ড সার্কাসে দাঁড়িয়ে আছি। ম্যাপটা পেয়ে খুব উপকার

হলো। কোথায় যেতে হবে সেটাও জানা গেল। তা না হলে কাউন্টারে গিয়ে অনেক বোকা বোকা কথা বলতে হতো। আমাদের যেতে হবে সেন্টজেমস পার্ক। ট্রেনের সময় জানা নেই। যখন হোক আসবে।

প্ল্যাটফর্ম কোন্ দিকে! ডান দিকে। নানা রকম বেড়া টপকে যেতে হবে। একটা বাক্স। সেই বাক্সে টিকিট ফেললে গেট খুলবে। তারপর প্ল্যাটফর্ম। কাউন্টার ছাড়া তদারকি করার জন্যে কোনও মানুষ নেই। ইলেকট্রনিকস। গোটাকতক বাক্স অত বড় একটা স্টেশন সামলাচ্ছে। বেকার সমস্যা বাড়বে না কেন? অফিসটাইম নয় বলে স্টেশনে ভিড় নেই বললেই চলে। প্ল্যাটফর্মে একজন মাত্র নিগ্রো যাত্রী আপন মনে দাঁড়িয়ে। বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো। এ পরবাসে রবে কে! সাদাদের দেশে কালোদের এই ভাবেই থাকতে হবে। মানুষ অনেক সভ্য হলেও গাত্রবর্ণ আর সোনার মোহরের অহঙ্কার গেল না। সি' করে ট্রেন এসে গেল। শেয়ালদার যাত্রী আমি। প্রস্তুতিটাও সেই রকম নিয়েছিলুম। ওয়ালথামস্টো সেন্ট্রাল থেকে এই সুদৃশ্য ট্রেনটি আসছে। সে বহুদূর : কিন্তু ভিড় নেই। প্রথম পাতাল রেলে চাপছি। সামান্য ভয় ভয় করছে। তা ছাড়া যে সাংঘাতিক গতিতে আকাশ বাতাস, না আকাশ তো এখানে নেই, ডায়াফ্রাম ওয়াল কাঁপিয়ে এলো! তীরের মতো! থামা মাত্রই ফুস করে আমাদের সামনের কামরার দরজা খুলে গেল। জানা আছে, বেশিক্ষণ থামবে না। কুমকুম বললে, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, উঠে পড়ো।' অপরকে তাড়া দিলে যা হয় নিজের একাগ্রতা কমে যায়। একটা প্যাকেট হাত থেকে পড়ে গেল। আর একটু হলেই লাইনে পড়ে যেত। পৃথিবীতে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে, হয়তো এক মুহূর্তের জন্যে, যে ঘটনা সেই প্রশ্নটিকেই বড় করে তোলে, 'কে বলেছে স্বর্গ অনেক দূরে।' নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা সেই নিগ্রো ভদ্রলোক, ক্রিকেটের খুব একটা কঠিন ক্যাচ ধরার কায়দায়, প্যাকেটটি ধরে ফেললেন। না ধরলে গাড়ি আর প্ল্যাটফর্মের মাঝে ঢুকে যেত। অমি ভিতরে, কুমকুম কম্পার্টমেন্টে প্রবেশোন্মুখ, ভদ্রলোক প্যাকেটটি লুফে নিয়ে এক লাফে ভেতরে ঢোকা মাত্রই ইলেকট্রনিক দরজা সুড়সুড় করে বন্ধ হয়ে গেল। কামরায় মাত্র তিনজন যাত্রী ছিলেন। আমি বসে পড়েছি। কুমকুম ভদ্রলোকের হাত থেকে প্যাকেটটি নিতে নিতে অজস্র ধন্যবাদ জানাতে লাগল। ভদ্রলোক হাসছেন আর বলছেন, 'ও দ্যাটস নাথিং, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।' অত সুন্দর হাসি আমি কখনো দেখিনি। ধবধবে সাদা দাঁতের সারি। আর ডিপ ব্যারিটোন ভয়েস। ভদ্রলোক আমার পাশে বসলেন। আমিও বললুম, 'মেনি থ্যাংকস।' আবাব সেই হাসি। পরিচয় হলো, যা ভেবেছি তাই। ভদ্রলোক একজন সঙ্গীত শিল্পী।

আমাদের যেতে হবে মাত্র দুটো স্টেশান। অকসফোর্ড সাকাস, গ্রীনপার্ক, সেন্ট জেমস পার্ক। নিমেষেই নামার সময় হলো। ভদ্রলোক যাবেন বহু দূর পিমলিকো। করমর্দন করে, বিদায় নিয়ে আমরা নেমে পড়লুম। লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড এক ফলাও ব্যবস্থা। মাটির তলায় লাইনের জাল পাতা। আমাদের কলকাতায় যা হচ্ছে, তা লন্ডনের তুলনায় কিছু নয়। শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা এক জোড়া লাইন পাতা। যাওয়া আর আসা। লন্ডনের মতো বহুধাবিভক্ত ব্যাপার নয়। আন্ডারগ্রাউন্ডে আর একটা লন্ডন ঢুকিয়ে দিয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম সব দিকেই যোগাযোগ। একটা লাইন আবাব গোল করে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। বেকাবলু লাইন, সেন্ট্রাল লাইন, সার্কল লাইন, ডিস্ট্রিক্ট লাইন, জুবিলি লাইন, মেট্রোপোলিটান লাইন, ইস্টলন্ডন লাইন, নর্দার্ন লাইন, পিকাডিলি লাইন, ভিক্টোরিয়া লাইন। সকাল ছটা থেকে রাত বারটা, একের পর এক ট্রেন ছুটছে। বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল তো বৃটেনেরই দান। এই সত্য পৃথিবী আজ ভুলতে বসেছে। আমেরিকা ভাবে তাদের রেলপথই প্রাচীন। রাশিয়া ভাবে তাদের। এই ব্যাপারে ইংরেজরাই কিন্তু পায়োনিয়ার। ১৯৮০ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। লিভারপুল-ম্যাঞ্চেস্টার উৎসবের সময় বৃটেন একটা 'রকেট' ট্রেন তৈরি করেছিল। সেই আদি ট্রেন বৃটেন পরিক্রমার পর ইওরোপ বেড়াতে গেল। কানে ট্রেনটিকে দেখে দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল— 'আমেরিকান আমেরিকান'। ইংরেজ উদ্যোক্তাদের একজন সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটির ইঞ্জিনের সামনে একটি ইউনিয়ান জ্যাক পতাকা উড়িয়ে দিল। C'est Americain নয় দিস ইজ বৃটিশ।

১৮০১ সালে রিচার্ড ট্রেভিথিক একটি লোকোমোটিভ তৈরি করেছিলেন, যা নিজের স্টিমে চলত। সেই হিসেবে লোকোমোটিভের তিনিই ছিলেন প্রথম স্রষ্টা। ১৮০৮ সালে তাঁর এই স্টিম ইঞ্জিন এখন যেখানে ইউস্টন স্টেশান, তার চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরে একটা ইতিহাস রেখে গেলেও তিনি নানা কারণে সফল হতে পারেন নি। কোনও একটা ব্যাপারে বেশি দিন লেগে থাকতে পারতেন না বলে

তিনি পথ পরিবর্তন করে চলে গেলেন জলের তলার স্টিমড্রেজার তৈরির কাজে। ট্রেভিথিকের সাংঘাতিক প্রতিভা ছিল, ধৈর্য ছিল না।

এর পরের ইতিহাস ইয়র্কশায়ারে। ১৮১৩ সাল। জন ব্লেনকিনসপ তাঁর কোলিয়ারিতে একটি লোকোমোটিভ চালু করলেন। সে তেমন সুবিধের নয়। উল্টে পড়ে যাবার ভয়ে রেলগাড়িটাকে গোঁজ দিয়ে লাইনের ওপর চেপে বসানোর ফলে গতি ভীষণ মন্থর। সেই গাড়ি দেখে অনেকেই হতাশ হয়েছিলেন। স্মুথ রেলে কোনও দিন ট্রেন চালানো কি সম্ভব হবে! এই সংশয়ও দেখা দিয়েছিল।

আরও এই ধরনের ছোটখাটো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। সে যুগের মানুষ এই সব উদ্ভাবনকে ফ্যানসি, নভেলটি বা কোলিয়ারির প্রয়োজন বলে মনে করত। বৃটেনে রেলগাড়ির প্রকৃত জনকের নাম জর্জ স্টিফেনসন। এই মানুষটির জীবনেতিহাস উল্লেখ না করলে ব্রিটিশ-ক্যারেক্টার ঠিক ঠিক অনুধাবন করা যাবে না। স্টিফেনসন আট বছর বয়েস থেকেই কর্মী। কোনও এডুকেশান ছিল না। কখনও কোনও স্কুলে যান নি। স্টিফেনসনের সব চেয়ে বড় যে গুণটি ছিল, তা হলো 'ডগেড টেনাসিটি'। সকলে যখন পরাভূত হয়ে একে একে সরে পড়লেন তখন লেগে রইলেন স্টিফেনসন। একে একে সব সমস্যার সমাধান করে এগোতে লাগলেন। ট্রাক থেকে বয়লার থেকে চাকা থেকে ভায়াডাক্ট, কোথাও আর কোনও সমস্যা রইল না। প্রোফেস্যানাল ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, রাজনীতিকদের ধাঁতানি, জনসাধারণের কটাক্ষ, সব কিছু উপেক্ষা করে ট্রায়াল অ্যান্ড এরারের মাধ্যমে স্টিফেনসন অসম্ভবকে সম্ভব করে প্রমাণ করলেন তাঁর প্রতিভা।

স্টিফেনসনের কথা আর একটু বলি। স্টিফেনসন জন্মেছিলেন নিউক্যাস্টলের অদূরে উইলাম অন টাইনে। কোলিয়ারি এলাকা। সেখানে তখন রেল লাইনে কয়লা বোঝাই গাড়ি টানত প্রথম প্রথম গরুতে তারপর ঘোড়ায়। পশুদের ক্লেশ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিন তখন ব্যবহার করা হচ্ছে পাম্পে। গাড়ি চালাবার কাজে ব্যবহার করার কথা কেউ চিন্তা করেন নি। খনির গর্ত থেকে জল ছাঁচাতেই সীমাবদ্ধ। স্টিফেনসন চাইলেন সেই ইঞ্জিনকে সচল করতে। 'নেসাসিটি ইজ দি মাদার অফ ইনভেনসান।' যাঁর কোনও ফর্মাল এডুকেশান ছিল না, সেই স্টিফেনসন কালে নিযুক্ত হলেন কোলিয়ারির রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে। ১৮১৪ সালে তিনি যখন কিলিংওয়ার্থ কোলিয়ারির ইঞ্জিনিয়ার তখন সমস্ত অবিশ্বাসীকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে ১৬টি লোকোমোটিভ নির্মাণ করে ফেললেন। কোলিয়ারিতে নতুন লাইন বসালেন। সমালোচকদের দেখিয়ে দিলেন, স্টিম ইঞ্জিন চলে। ১৮২৫ সালে বিশেষজ্ঞদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে পৃথিবীর প্রথম পাবলিক রেলওয়ে নির্মাণ করে ফেললেন। লোকোমোটিভ চালু হলো স্টকটন অ্যান্ড ডার্লিংটন।

স্টকটন অ্যান্ড ডার্লিংটন কোলিয়ারি এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকায় বিশ্বে সে ভাবে আলোড়ন তুলতে না পারলেও, ১৮৩০ সালে তিনি যখন জনসাধারণের জন্যে লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেস্টার লাইন খুলে দিলেন তখন হইহই পড়ে গেল। ব্রিটেনে প্যাসেঞ্জার রেলওয়ের আগমন। সেখান থেকে সারা বিশ্বে।

রানী ভিক্টোরিয়ার ব্রিটেনে স্টিফেনসন হয়ে গেলেন 'হিরো'। তাঁর জীবনী লিখলেন স্যামুয়েল স্মাইলস। আজ ইংল্যান্ডের সমস্ত স্কুলের ছাত্র জানে 'রকেট' ইঞ্জিন কাকে বলে। স্টিফেনসন ১৮৪৮ সালে মারা গেলেন। যাবার আগে দেখে গেলেন তাঁর আবিষ্কার সভ্য পৃথিবীর চেহারা কেমন বদলে দিয়েছে! পৃথিবীর বুকে আজ রেললাইনের জাল পাতা এক সময় মানুষ গতি বললে বুঝতো দ্রুতগামী অশ্বের গতি। স্টিফেনসনের পর, সময়, দূরত্ব, গতির সাবেক ধারণা পাল্টে গেল। সভ্য মানুষের জন্যে এসে গেল সভ্যতর যান।

লিভারপুল ম্যাঞ্চেস্টার লাইন পাতা হয়ে যাবার পর সংশয় দেখা দিয়েছিল, ইঞ্জিন আর কোচ একই লাইনে থাকবে, না ইঞ্জিন পাশের লাইনে থেকে টানবে! তখন রেনহিলে পরীক্ষা হলো। কিছু প্রাচীন ধরনের ইঞ্জিন আনা হলো। ট্রায়ালে মাত করে দিল স্টিফেনসনের 'রকেট'। উপস্থিত বিশাল এক জমায়েত সহর্ষে লক্ষ্য করল, রকেট ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে একই লাইনে থেকে কোচগুলোকে টেনে নিয়ে সামনে ছুটছে।

সম্প্রতি রেনহিলে ১৮২৯ সালে জর্জ স্টিফেনসনের সেই সাফল্যের স্মরণে ব্রিটিশ রেল দশ লক্ষ পাউন্ড খরচ করে এক উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। জর্জ স্টিফেনসনের জীবন আলোচনা

করলে, একটি কথাই মনে হবে আমাদের দেশের কোনও ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলে শুধু প্রতিভার গুণে অতদূরে যেতে পারতো কি?

আজ বেশ চড়া রোদ। শরৎকালের আকাশের মতো আকাশ। তকতকে হোটেলের ঝকঝকে দরজা বলছে, আসতে আজ্ঞা হোক। রিসেপসানের মেয়েটিকে যেই বললুম, 'চাবি।'

পরী হাসি হাসি মুখে বললে, 'সার্চ ইওর পকেট।'

সেই এক ব্যাপার, চাবি আমার পকেটে।

৩২

বিদেশী শ্বেতশক্তির অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ছিল, প্রাচীন সভ্যতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো তারপর সব নয়ছয় করে দাও। ইতিহাসের আদিতে এই উৎপাত না থাকলে পৃথিবীর চেহারাটাই অন্যরকম হতো। এখন যেন সব একাকার। সর্বত্র চেপে বসে আছে হোয়াইট ওয়েস্ট। সমুদ্রে ভাসতে শেখাটাই হলো মহা বিপদের। প্রকৃতি জল দিয়ে, পাহাড় দিয়ে, মরুভূমি আর অরণ্য দিয়ে এক একটি জায়গাকে কেমন ঘিরে রেখেছিলেন। এক একটি পরিবেশে এক এক রকমের সভ্যতার কেমন বিকাশ হচ্ছিল। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিশ্বাস, অবিশ্বাস। বারুদ, ধর্ম, লোভ, নিষ্ঠুরতা, সাহসিকতা, অজানাকে জানার ইচ্ছা, পৃথিবীর টুকরো টুকরো মায়া জগৎকে তার নিজের দোলনা থেকে ঠেলে ফেলে দিলে। ইতিহাসে চিরকালের জন্যে একটা ঘোঁট পাকিয়ে গেল। সর্বত্র বিরোধ আর অসন্তোষই হয়ে দাঁড়াল সভ্য দুনিয়ার প্রাণবায়ু। পৃথিবীর চারিদিকে এত অসন্তোষ বোধহয় কোনও কালে ছিল না।

আফ্রিকাকে বিদেশী শক্তি পদানত করার আগে সেখানে এমন একটা জীবনদর্শনের বিকাশ হয়েছিল যা পশ্চিমী সভ্যতার ধারণার বাইরে। ওয়াজিম্বা, হটেনটট, বুশম্যান জাতীয় বন্য মানুষের কথা বলছি না। বন্যেরা বনেই সুন্দর ছিল। সেই আফ্রিকার কথা বলছি, যেখানে রাজা ছিল, রাজত্ব ছিল। সেই সব রাজাদের কাহিনীর কিছু কিছু ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন পর্যটক দু চাইল্লু আফ্রিকার গাবুন নামক রাজত্বের রাজা 'কিং গ্লাসে'র কথা লিখেছেন।

''যখন আমি গাবুনে ছিলাম (১৮৬১ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ, এক্সপ্লোরেশানস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারস ইন ইকোয়েটোরিয়াল অ্যাফ্রিকা) তখন বৃদ্ধ রাজা গ্লাস মারা গেলেন। উপজাতির প্রজারা বৃদ্ধ রাজাকে নিয়ে একেবারে জেরবার হয়ে পড়েছিল। সবাই ভাবতে শুরু করেছিল রাজা এক ক্ষতিকারক যাদুকর। তুকতাক মারণউচাটনের শক্তি তার ক্রমশই বাড়ছে। মুখে না বললেও রাজা গ্লাসকে সবাই সন্দেহের চোখে, ভয়ের দৃষ্টিতে দেখত। রাতে তার আস্তানার সামনে দিয়ে কেউ ভয়ে যেত না। তবু রাজা যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন সকলেরই খুব কষ্ট হলো। কিন্তু আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু আমাকে আড়ালে বললেন, সারা শহর মনে মনে চাইছে রাজার মৃত্যু হোক। এবং রাজা মারা গেলেন। একদিন খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুনি রাজ্যের সবাই তারস্বরে কাঁদছে আর বিলাপ করছে। কি হলো? বুঝলুম রাজা মারা গেছেন। সারা শহরের মানুষ ছদিন ধরে হা হুতাশ করল, শোক পালন করল। মৃত্যুর দ্বিতীয় দিবসে বিশ্বস্ত কয়েকজন রাজার মরদেহ গোপন কোনও এক স্থানে কবর দিয়ে এল। যে জায়গার সন্ধান আর কেউ পাবে না। রাজ্যে যখন শোক চলেছে, তখন গ্রামের প্রবীণরা নতুন একজন রাজার অনুসন্ধানে ব্যস্ত। এই রাজা খোঁজার ব্যাপারটা খুব গোপনে করা হয়। তিন চারজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। সাধারণ মানুষ জানতে পারে সপ্তম দিনে। আর সেই দিনই নতুন রাজার অভিষেক হয়। কিন্তু যাকে রাজা করবে সে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারে না। সৌভাগ্য সম্পূর্ণ আচমকা সেই মানুষটির মাথায় মুকুট তুলে দেয়।

''একেই বলে বরাত। সেবার হলো কি, আমারই এক বিশিষ্ট বন্ধু নজগোনিকে নির্বাচকরা গোপনে রাজা নির্বাচিত করলেন। তাকে রাজা নির্বাচিত করার কয়েকটি কারণের মধ্যে একটি হলো, ভালো

বংশের ছেলে। দ্বিতীয় কারণ হলো, নজগোনিকে সকলেই ভীষণ ভালবাসত। যার ফলে নির্বাচকরা সকলেই তাকে ভোট দিয়েছিলেন। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস নজগোনি নিজে কিছুই জানতে পারেনি। সপ্তম দিনের সকালে সে আপন মনে সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ রাজ্যের প্রায় সমস্ত মানুষের বিশাল একটি দল নজগোনিকে ঘিরে ধরল। রাজা মুকুটিত হবার আগে প্রথামত তাদের অনেক কাজ করতে হয়। অনেক অনুষ্ঠান। অনেকটা লোকাচারের মতো। রাজা হবার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা না থাকলে সাধারণ মানুষের পক্ষে সে সব সহ্য করা এক কঠিন ব্যাপার।

"জনতা নজগোনিকে নিমেষে ঘিরে ফেলল। তার আর পালাবার পথ রইল না। শুরু হলো অশ্রাব্য গালিগালাজ। অতি কুৎসিত খিস্তি খেউড়। যা শোনা যায় না। কান পাতা যায় না। এরপর সবাই তার মুখে, তার সর্বাঙ্গে থুতু ছিটোতে আরম্ভ করল। একই সঙ্গে বর্ষিত হতে লাগল কিল, চড়, লাথি। অতঃপর তার দিকে ছোঁড়া হতে লাগল যত নোংরা আর আবর্জনা। ভিড়ের মধ্যে যারা তার নাগাল পাচ্ছে না, তারা চিৎকার করে গালাগাল দিয়েই সন্তুষ্ট। শুধু নজগোনিকে নয়, তার বাবা মা, ভাই, বোন ঊর্ধতন চতুর্দশ পুরুষও বাদ গেল না। যে কোনও আগন্তুক এমন জীবনের জন্যে এক কানাকড়ি মূল্য দিতেও প্রস্তুত নয়, অথচ লোকটি আর একটু পরেই কি না রাজা হবে।

"এই সাঙ্ঘাতিক চিৎকার, চেঁচামেচি, আর দুর্বাক্যের মধ্য থেকে মারমুখী জনতার এমন কিছু কথা ভেসে এল, যা শুনে এই লোকাচারের লোক দর্শন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক একজন পালা করে এগিয়ে আসছে আর প্রচণ্ড এক একটা ঘুষি আর লাথি মেরে বলছে, 'তুমি ব্যাটা এখনও আমাদের রাজা হওনি, একটু পরেই হবে। এই ফাঁকে আমরা যা পারি তাই করে নি। কারণ রাজা হবার পর তুমি যা চাইবে তাই আমাদের করতে হবে।'

"এই সব মারাত্মক কাণ্ড যাকে ঘিরে চলেছে, সে কিন্তু শান্ত। মুখে মৃদু হাসিটি তার লেগে আছে। একবারের জন্যেও বিচলিত হচ্ছে না। আধঘণ্টা ধরে ওই অনুষ্ঠান চলার পর জনতা নজগোনিকে টেনে নিয়ে গেল মৃত রাজার আস্তানায়। সেখানে তাকে বসানো হলো আসনে। আর এক প্রস্থ অভিশাপ ও গালিগালাজ।

"তারপর হঠাৎ সব চুপচাপ। উদ্বেল সমুদ্র যেন মন্ত্রবলে শান্ত। সেই নৈঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন বয়স্করা। ভক্তিভরে নজগোনিকে বললেন, 'আজ থেকে আপনিই আমাদের রাজা হলেন। হে রাজন, আমরা আপনার কথা শুনবো। আপনার সমস্ত আজ্ঞা পালন করব।' বৃদ্ধদের প্রশস্তির পর জনতার সকলেই, একে একে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করে নতজানু হলো।

'আবার নীরবতা। তখন একজন একটি সিল্কের টুপি এনে নজগোনির মাথায় পরিয়ে দিল। রাজকীয়তার প্রতীক। তাকে পরানো হলো রাজপোশাক, লাল একটি জোব্বা। এতক্ষণ যারা কিল, চড়, লাথি, মারছিল, থুতু ছিটোচ্ছিল, গালাগাল দিচ্ছিল, তারা সবাই আভূমি নত হয়ে তাদের বিনীত সম্মান জানাতে লাগল সদ্যনির্বাচিত, মুকুটিত রাজাকে।

এরপর টানা ছ'দিন ধরে চললো উৎসব। নতুন রাজাকে পুরনো রাজারই নাম নিতে হলো। নজগোনির বদলে গ্লাস। বেচারা রাজা। এক নাগাড়ে ছ'দিন ধরে অসংখ্য অতিথি অভ্যাগতকে নিজালয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হলো। আপ্যায়নের ত্রুটি থাকলে চলবে না। রাজা গৃহবন্দী। ছ'দিন ধরে প্রজারা শুধু খেয়েই গেল। খাচ্ছে তো খাচ্ছে। আকণ্ঠ পান করতে লাগল নিকৃষ্ট 'রাম'। মাতলামির চূড়ান্ত। উৎসবের মতো উৎসব। আশপাশের গ্রামের অচেনা মানুষও সেই মত্ত উৎসবে ছুটে এল নতুন রাজাকে সম্মান জানাতে। সকলেই সঙ্গে এনেছে উপহার—আরও 'রাম', তাড়ি, খাবারদাবার। রাজ দুয়ার এই ছ'দিন সকলের জন্যেই উন্মুক্ত।

"প্রয়াত রাজা গ্লাস, যার জন্যে অত চোখের জল ফেলা হলো, তাকে সবাই ভুলে গেল। আর নতুন রাজা গ্লাসের সে কী অবস্থা! ছ'দিন তার ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। দিবারাত্র তাকে প্রস্তুত থাকতে হলো, কখন কে আসে না আসে। সাদরে প্রত্যেককে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। সারাক্ষণ ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। শেষে এমন হলো, শরীর যেন আর চলে না। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসতে চাইছে অথচ বিশ্রাম নেবার উপায় নেই।

"অবশেষে সব মদ শেষ হয়ে গেল। ছ'দিনের উৎসব সমাপ্ত হলো। রাজ্য ফিরে গেল স্বাভাবিক

অবস্থায়। নতুন রাজা রাজকার্যে মন দিল। রাজাকে বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো অবশেষে।"

দার্শনিকতার কোন্ স্তরে পৌঁছলে একজন রাজার অভিষেক এমন হতে পারে? পশ্চিমের শ্বেতসভ্যতার মাথায় আসবে না। প্রথমত, যে রাজা চলে গেলেন, দীর্ঘ শাসনকালে তাঁর প্রতি প্রজাদের ক্ষোভ জন্মেছিল; কিন্তু আধুনিককালের মতো কোনও অভ্যুত্থান ওই যুগ, ওই সমাজের মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। রাষ্ট্রব্যবস্থা বাঁধা ছিল দার্শনিকতার সুরে। অভিষেকের প্রাকমুহূর্তে সেই ক্ষোভ তারা ঢেলে দিল নির্বাচিত রাজার ওপর। নতুন রাজাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো তিক্ত সম্ভাবনার কথা, পূর্বের রাজার দীর্ঘশাসনে তারা অসন্তুষ্ট। তিনি সম্মানের আসন থেকে স্খলিত হয়েছিলেন ভীতির আসনে। শাসনের শেষপাদে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঘৃণ্য। নতুন রাজাকে সিংহাসনে বসার পূর্বভাগে জানিয়ে দেওয়া হলো, প্রজারা বিদ্রোহী হলে, কি হতে পারে! একটা হুঁশিয়ারি দিয়ে শুরু হলো নয়া রাজার রাজত্বকাল। রাজা, তুমি সাবধান। ক্ষমতার মদগর্বে প্রজারঞ্জক হতে ভুলো না। বিদ্রোহের পরিবেশে তোমার এই অভিষেক। এই বিদ্রোহ তোমার বিরুদ্ধে নয়। যে বিদ্রোহ হতে পারত তুমি তার উত্তরাধিকারী। তোমার আসন সিংহাসন টলানো এই বিদ্রোহের সম্ভাবনার ওপর। তোমার আসন স্বেচ্ছাচারিতার নয়, আত্মসুখের নয়। তোমার ধর্ম হলো সেবা আর ভালবাসা। তুমি রাজা, তুমি আমাদের পিতা।

এরপর ওই ছ'দিনের ঢালাও উৎসব, পানভোজনের ব্যবস্থা, তারও একটা গভীর অর্থ আছে। দিয়তাং, ভুজ্যতাম্। রাজা তোমার শাসনকালে দেশজুড়ে যেন এমনই প্রাচুর্যের বন্যা বয়ে যায়। ভোজ্য আর পানীয়ের অমৃতধারা। তোমার শাসনকালের শুরুতেই এই, যত দিন যাবে প্রাচুর্যের প্রবাহ যেন বাড়তেই থাকে। প্রজারা যেন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আহার্য পায়। তোমার প্রজারা যেন দুধেভাতে মহাসুখে, মহানন্দে দিনাতিপাত করতে পারে।

আজকের সুসভ্য প্রজাতন্ত্র এই রাষ্ট্রদর্শন কল্পনাতেও আনতে পারবে না। নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়করা মূলতঃ গ্রুপ-ডিকটেটার। একজন নয়, গোটা একটা দল সংবিধানকে হাতিয়ার করে হাত তোলা পার্লামেন্টের লোকদেখানো স্বীকৃতি নিয়ে শোষণ চালিয়ে যান। সেই ১৯১৭ সালের গোড়াতেই লেনিন তাঁর দি স্টেট অ্যান্ড দি রেভলিউশান গ্রন্থে এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন: A democracy is a state which recognises the subjection of the minority to the majority, that is, an organisation for the systematic use of violence by one class against the other, by one part of the population against another. নেহরুজি বলেছিলেন, 'গণতন্ত্র ভালো বলছি এই কারণে, অন্য সমস্ত ব্যবস্থাই এর চেয়ে খারাপ।' আর. উইল রজার্স তাঁর আত্মজীবনীতে বলছেন (প্রকাশিত ১৯৪৯ সাল), গণতন্ত্রের একটিই দোষ, যাঁকে নির্বাচিত করা হলো তিনি মনের মতো না হলে, ফেলে দেবার উপায় নেই। মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মানিয়ে চলতে হবে। খাঁটি কথাটি বলে গেছেন উইলিয়াম পেন সেই ১৬৯৩ সালে (সাম ফ্রুটস অফ সলিচিউড)। Let the people think they govern and they will be governed. প্রকৃতই তাই। আমাদের কি হচ্ছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত। আমরা ভাবছি, আমরাই আমাদের শাসন করছি, সত্যিই কি তাই!

প্রাচীন আফ্রিকার শাসনপদ্ধতিতে যে সব প্রতীকী ব্যাপার ছিল তা তুলনাহীন। অথচ শুনে আসছি আফ্রিকা অসভ্যের দেশ। অতীতে নাইজেরিয়ায় কি ছিল দেখা যাক। নাইজেরিয়ায় জুকুন বলে একটা জায়গা ছিল। এখন তার কি নতুন নাম হয়েছে জানি না।

জুকুনের অধিবাসীদের চোখে তাদের রাজা ছিলেন ঐশ্বরিক পুরুষ। তাঁর রাজকীয় জীবনে ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না বললেই চলে। বহুরকমের নিয়ম মেনে তাঁকে চলতে হতো। জুকুনের রাজাকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হোত না। শাসন ব্যবস্থায় মাথা ঘামিয়ে জ্ঞানের পরিচয় দেবারও প্রয়োজন হতো না। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হবারও প্রয়োজন ছিল না। রাজাকে মনে করা হতো বিভিন্ন মঙ্গলদায়ী শক্তির আধার। সেই শক্তি জীবন্ত আধার, যে শক্তি মানুষের জীবনকে প্রাণ শক্তিতে ভরপুর করে দেবে, সমৃদ্ধ করবে। এই সব শক্তির যিনি জীবন্ত আধার সেই রাজার প্রতিদিন, জীবনের প্রতিটি বছর নানা অনুষ্ঠান দিয়ে বাঁধা।

জুকুনের রাজা কদাচিৎ লোকসমক্ষে হাজির হতেন। রাজার নগ্নপদ যেন ভূমি স্পর্শ না করে। কারণ ফসল জ্বলে যাবে। নিচু হয়ে কোনও কিছু মাটি থেকে তোলা নিষিদ্ধ ছিল। রাজা কখনও

নত হবেন না। রাজা কখনও অসাবধানে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মেরে ফেলা হতো। রাজার অসুস্থ হবার উপায় ছিল না। অসুস্থ হলেই নির্জনে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলা হতো। কারণ অসুস্থ রাজার গোঙানি জনসাধারণের কানে গেলে তাদের বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা। জনসমক্ষে রাজার হাঁচার অনুমতি ছিল। রাজা কোনও কারণে হেঁচে ফেললে, সভাস্থ সকলে সসম্মানে উরুতে চাপড় মারতেন। রাজাকে শরীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা ছিল অসম্মানের। শরীরের প্রসঙ্গ তোলাটাই ছিল অপরাধের। তাঁর শরীরকে সাধারণ মানুষের শরীর বলে মনে করা হতো না। ভাগবতী তনু। রাজার ব্যক্তিত্ব বোঝাবার জন্যে বিশেষ কোনও শব্দ ব্যবহার করা হতো। রাজার যে কোনও কাজের জন্যেও অনুরূপ শব্দ ব্যবহৃত হতো। রাজার সমস্ত কিছুই ছিল বিশিষ্ট। রাজার মুখ নিঃসৃত বাণী ছিল দেব-বাণী।

রাজা আহারে বসামাত্রই তাঁর অনুচরেরা বিশাল চিৎকার করে উঠতেন, আর অন্যান্য সকলে উরুতে গুনে গুনে বারবার চাপড় মারতেন। তখন তো তোপ ছিল না, এইটাই ছিল এক ধরনের ঘোষণা। হুঁশিয়ারি। রাজা আহারে বসেছেন। রাজপ্রাসাদের সকলে নীরব হও। অখণ্ড নীরবতা। এমন কি সারা শহর নিস্তব্ধ। কথা বন্ধ, কাজ বন্ধ। রাজা আহারে বসেছেন। রাজার আহার মানে সাধারণ মানুষের আহার নয় দেবভোগ। অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজাকে ভোগ নিবেদন করা হতো। আহার শেষ হওয়া মাত্র রাজানুচরেরা বহিরাঙ্গনে গিয়ে আবার চিৎকার করতেন, উরুতে চাপড় মারতেন। স্বাভাবিক কাজকর্ম, কথাবার্তা শুরু হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে।

রাজার রেগে যাওয়াকে একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপাব বলে মনে করা হতো : রাজা কারুর দিকে আঙুল তুলে কিছু বললে অথবা ক্রোধে মাটিতে পা ঠুকলে ভয়ঙ্কর একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় মানুষ আতঙ্কিত হতো। রাজার ক্রোধ মানে দেশ ধ্বংস হয়ে যাওয়া। ফলে সকলেই নজর রাখত রাজা যেন রেগে না যান। রাগার সম্ভাবনা দেখলে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা হতো। রাজার মুখ-নির্যাসকে মনে করা হতো পবিত্র। আর রাজা স্বয়ং তাঁর চুল আর নখ সযত্নে একটি থলিতে ভরে রাখতেন। মৃতদেহের সঙ্গে কবরে দেবার জন্যে। রাজাকে মনে করা হতো উর্বরতার কারণ ফলে প্রজারা তাঁকে বলত, আমাদের গরুতে খাবার শস্য, আমাদের চিনে বাদাম, আমাদের বরবটি। সকলেই বিশ্বাস করত বাজা বৃষ্টি আর বায়ু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ফলে খরা হলে, কি ফসল না হলে মনে করা হতো রাজার শক্তি কমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে গোপনে গলা টিপে তাঁকে হত্যা কবা হতো।

এই দেশে রাজ বরণের স্বতন্ত্র একটি প্রথা ছিল। নব নির্বাচিত বাজাকে একটি ঢিবি তিনবার প্রদক্ষিণ করতে হতো। এই প্রদক্ষিণের ..এয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কিল চড় মারতেন সমানে। এরপব তিনি একজন ক্রীতদাসকে হত্যা করতেন। নিজে হত্যা করার সাহস না থাকলে ছুরি দিয়ে খোঁচা মেরে ছেড়ে দিতেন, তখন তাঁর প্রতিনিধি হয়ে অন্য কেউ ভঁ ;ই বল্লম ও ছুরি দিয়ে দাসটিকে হত্যা করত।

অভিষেকের সময় রাজন্যবর্গীয় কোনও নেতা তাঁকে রাজধর্মেব পালনীয় কর্তব্যটি শুনিয়ে দিতেন; আজ থেকে আপনাকে আপনার পিতার প্রাসাদটি দেওয়া হলো। আপনি এখন সারা পৃথিবীর মালিক। আপনি আমাদের 'গিনি-কর্ণ' (শস্য)' আমাদের বিনস, আমাদের আত্ম-শক্তি, আমাদের ভগবান। এখন থেকে আপনার পিতাও নেই মাতাও নেই। আপনিই এখন সকলের পিতা-মাতা। আপনি আপনার পূর্ব-পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রজাপালক হয়ে উঠুন। কারুর অনিষ্ট করবেন না। প্রজারা যেন আপনার আদেশ পালন করে। আপনার রাজত্বকালের শেষ দিন পর্যন্ত আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী থাকুন।

এরপর সবাই রাজার পদপ্রান্তে পড়ে নিজেদের মাথায় মুঠো মুঠো ধুলো ছিটোতে থাকে আর সমস্বরে বলতে থাকে, 'রাজা, তুমি আমাদের শস্য, তুমি আমাদের বারি-ধারা, তুমি আমাদের স্বাস্থ্য, তুমি আমাদের ঐশ্বর্য।'

রাজা সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, হলেও, তাঁর অত্যাচার থেকে বাঁচার অনেক পথ করে রাখা হতো। উপদেষ্টামণ্ডলীর নির্দেশ তাঁকে মেনে চলতেই হতো। এই উপদেষ্টামণ্ডলীতে থাকতেন দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা। তাঁদের প্রধানকে বলা হতো অ্যাবো, অর্থাৎ একালের প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ। রাজার কাছে যে কোনও সময় যেতে পারতেন এই অ্যাবো বা প্রধানমন্ত্রী। যে কোনও বেচালের জন্যে রাজাকে

তিরস্কারের ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন তিনি।

রাজা সাধারণতঃ যুদ্ধে যেতেন না; কিন্তু অন্য রাজ্য আক্রমণ করে লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্পদ কেউ নিয়ে এলে রাজা তার অধিকারী হতেন। একের তিন অংশ দিয়ে দেওয়া হতো যে এনেছে তাকে। পুরস্কার হিসেবে। এক ধরনের উৎসাহ। কখনও কখনও অর্ধেকও দিতেন। যাতে ভবিষ্যতে সে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ এইভাবেই রাখতে পারে।

যোগ্যরাজা এইভাবে সাত বছর ক্ষমতায় আসীন থাকতেন তারপর ফসল উৎসবের সময় যখন মাঠে মাঠে ধান কাটা, গম, যব, ভুট্টা কাটা শুরু হয়েছে তখন রাজাকে একান্তে নিয়ে গিয়ে বলি দেওয়া হতো।

এই অসাধারণ প্রাচীন প্রথা থেকে সভ্য পৃথিবী রাজাটিকে তুলে এনেছে। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে প্রবল প্রতাপ, ভোগ বিলাসিতা করার যথেচ্ছ স্বাধীনতা। তুলে নেওয়া হয়েছে রাজাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বলগা। সামরিক অভ্যুত্থান ছাড়া একালের রাজাকে সহসা সিংহাসনচ্যুত করা অসম্ভব। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারও তো অনুরূপ এক 'ডিভাইন' ব্যাপার। বিপ্লবের আগে রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানির কাইজার। ইতিহাসের একটা সময় ধরে এই সব মহারাজেরা কি না করেছেন। যুদ্ধ, ব্যভিচার, প্রজা নিপীড়ন। মানুষ যখন মানুষের কিছু কেড়ে নেয়, লুঠপাট করে তখন সে অপরাধী। রাজা যখন অন্য দেশের সব কেড়ে বিগড়ে নিয়ে আসেন তখন তিনি বীর। পাঠ্যপুস্তকের অধীতব্য বিষয়। ইংল্যান্ডের রাজা সম্পর্কে আর এক রাজা, মিশরের কিং ফারুকের একটি সুন্দর উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। ১৯৫০ সালে লাইফ পত্রিকার ১০ এপ্রিল সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, In a few years there will be only five kings in the world—the king of England and the four kings in a pack of cards. এখন প্রায় সেই অবস্থাই হয়েছে।

ভয় থেকে ভগবান। আফ্রিকার ইতিহাস বলছে ভয় থেকে রাজা। সাধারণত সভ্য দেশের ইতিহাস বলবে ঔদ্ধত্য থেকেই রাজা। পরবর্তীকালে আফ্রিকার সুলতানরা অতীত একটা ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে হাস্যকর করে তুললেন। যেমন সুলতান হাঁচলে, কাশলে, কি নাক ঝাড়লে সভাসদদেরও সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে অনুকরণ করতে হবে। তা না হলে গর্দান যাবে। রাজা যদি খুঁড়িয়ে হাঁটেন তো প্রজাদেরও খোঁড়াতে হবে। যুদ্ধে গিয়ে রাজার ডান হাতটা যদি উড়ে যায়, তাহলে প্রজাদেরও ডান হাত উড়িয়ে দিতে হবে। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক আরব পর্যটক ডারফুর রাজসভায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই পর্যটকের বৃত্তান্তে অনেক মজার মজার প্রথার উল্লেখ আছে। কথা বলতে বলতে সুলতান হয়তো খুক্ করে একবার কাশলেন, প্রজারা অমনি চুকচুক করে উঠলেন। সুলতান হঠাৎ হেঁচে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাসদেরা এক যোগে টিকটিকির মতো টিকটিক করে উঠল। সুলতানের নিয়ম। সুলতান যেতে যেতে বেসামাল হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে পেছন পেছন যারা আসছিল তারাও পুতুলের মতো উল্টে পড়ল। যদি দেখা যেত কেউ তা করেনি, তা হলে সে যতই কেউকেটা হোক, তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে মাটিতে ফেলে বেদম প্রহার করা হতো। এখনকার উগান্ডায় কি নিয়ম ছিল? রাজা হাসলে সকলকেই হো হো করে হাসতে হতো। রাজা যদি বলতেন, ওহে আমার ভীষণ সর্দি, সভাসদেরা অমনি নাকে রুমাল চেপে বলত আমাদেরও সর্দি। রাজা চুল কাটলে সকলকেই চুল ছাঁটতে হতো। ধর্ম যেমন দর্শন হারিয়ে আচার আচরণ আর প্রথায় পরিণত হয়, তেমনি রাজদর্শনও দর্শন ভুলে ক্ষমতা আর মোসায়েবদের মোসায়েবী হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাবেই শেষ হয়ে যায় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। কোথায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কোথায় গোপাল ভাঁড়! দেবতা চলে যায় দানবের গ্রাসে। মহম্মদ তুঘলকেরাই তো ইতিহাসের ভাগ্য নির্ধারণ করেন।

সেই আফ্রিকা কোথায় গেল, যেখানে নবনির্বাচিত রাজার গলায় দড়ি রেখে দু'জনে দুদিক থেকে টানাটানি করত, আর রাজা একটা থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তুলে আনতেন এক মুঠো পাথর। একে একে সেই পাথরের টুকরো গোনা হতো, রাজার পরমায়ু। একটি করে বছর যায়, রাজা ভাবতে থাকেন শেষ তো এগিয়ে আসছে। মৃত্যুকে চোখের সামনে রেখে যে জীবন, সে জীবন বিনীত হতে বাধ্য। কে শাসক কে শাসিত! হাতের চেটো থেকে শেষ পাথরটি পড়ে যাওয়া মাত্রই, সেই দু'জন, সেই দড়িটি নিয়ে এগিয়ে এল। এবার ফাঁস। দু মাথা ধরে টানা মাত্রই, কিং ইজ ডেড লং লিভ দি কিং।

৩৩

কেপ অফ গুড হোপ। ভারতবর্ষে যাবার পথে যে কোনও ইওরোপীয় জাহাজের সব চেয়ে বড় নিরাপদ পোতাশ্রয়। 'টেবল বে'-র আড়ালে যে বন্দরটি তৈরি হয়েছে তার কোলে আশ্রয় নিতে পারলে দক্ষিণ অতলান্তিকের ভয়াবহ ঝড় কোনও জাহাজকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু এই নিরাপদ পোতাশ্রয়ে সভ্য মানুষের প্রথম অভিজ্ঞতা সুখের হয় নি। দীর্ঘদিন ধরে ওই অঞ্চলে যারা বসবাস করছিল সেই হটেনটটরা বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের সাদর-আপ্যায়ন জানাতে পারে নি। এই হটেনটটদের পরিচয় কি? বুশম্যান আর হেমিটিক প্রজাতির মিশ্রণ। অসভ্য এক সম্প্রদায়। চাষবাসই যাদের জীবিকা।

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত এই হটেনটটদের কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে নি। শতাব্দী গড়াতে না গড়াতেই শুরু হয়ে গেল দু দেশের প্রতিযোগিতা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের লড়াই। ১৬০৮ সালে জন জুরডেন, ব্রিটিশ জাহাজ 'অ্যাসেনসান'-এর প্রধান বণিক সমুদ্র ঘুরে এসে খবর দিলেন, 'টেবল-বে' ভারতগামী সমস্ত জাহাজের অতি চমৎকার, নিরাপদ, ঠেকখাওয়ার বন্দর হতে পারে। সেখান থেকে জাহাজে তুলে নেওয়া যেতে পারে সম্মুখ সারির প্রয়োজনীয় রসদ।

যেমন আন্দামানে হয়েছিল সেইরকম ১৬১৪ সালে আটজন দণ্ডিত অপরাধীকে নিয়ে একটি ইংরেজ বসতি স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ছ'বছর পরে এল পাঁচটি জাহাজ। নেতা আন্ড্রু শিলিঞ্জ ও হাম্ফ্রি ফিজ-হারবার্ট। 'টেবল-বে'-তে তাঁরা উড়িয়ে দিলেন ব্রিটিশ পতাকা। ওড়ানোই হলো। পরের চেষ্টা ভেসে গেল উদাসীনতায়। ভাগ্যের এমনই কল, ১৬৪৮ সালে একটি ওলন্দাজ জাহাজ 'হারলেম', প্রবল ঝটিকায় ঢেউয়ের আঘাতে কেপ অফ গুড হোপের স্থলভাগে এসে আটকে গেল। বৈরী হটেনটটরা তেড়ে এলো না। ইতিমধ্যে হটেনটটদের মনে হয় কিছু মানসিক পরিবর্তন হয়েছিল। জাহাজ ভেড়া মানেই সাদা সাদা কিছু মানুষ, আর অদ্ভুত সব উপহার। আন্দামানে যেমন জারোয়াদের বশ করা হয়েছে। লাল, নীল, হলুদ কাপড় দিয়ে। আয়না দিয়ে। দেশলাই দিয়ে পাথরের মালা দিয়ে।

ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত সেই ওলন্দাজ জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে যীশুর কৃপায় হটেনটটদের ভীষণ ভাব হয়ে গেল। হটেনটটরা তাদের মাংস উপহার দিল। স্থানীয় মানুষের আতিথেয়তায় দিন কতক খুব খানাপিনা হলো; তারপর 'হারলেম' আবার ভেসে পড়ল জলে। দেশে ফিরে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতেই, ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতারা দেখলেন এই হলো সুযোগ। জোহান ভান রাইবিকের নেতৃত্বে ছোট্ট একটি নৌবহর ভেসে পড়ল সমুদ্রে।

ভান রাইবিক ১৬৫২ সালে নামলেন 'টেবল-বে'-তে। সংখ্যায় তাঁরা একশো তিরিশ জন। সেই দলের সঙ্গে এই প্রথম কিছু মহিলা এলেন। ভান রাইবিকের নিজের, জায়গাটা তেমন পছন্দ হলো না। তবু দশ বছরের মধ্যে তিনি একটা কলোনি মতো করে ফেললেন। চাষবাস শুরু করিয়ে দিলেন। নিজেদের দলের কারুর কারুর সঙ্গে হটেনটট মেয়েদের বিয়ে দিলেন। অ্যাঙ্গোলা থেকে কিনে আনলেন কিছু দাস। শুধু চাষ নয়, পশুপালনও শুরু করলেন। রাইবেক ছিলেন একজন তরুণ সার্জেন। পর্তুগালের ইতিহাসে তখন স্বর্ণযুগ চলেছে। ইওরোপীয়রা যে বন্দরটিকে এতকাল মনে করতেন, 'ট্যাভারন অফ দি সিজ', রাইবিক দশ বছরে সেই স্থানটিকে করে তুললেন সমৃদ্ধ একটি উপনিবেশ।

রাইবিক বাটাভিয়ার গভার্নার হয়ে চলে যাবার পর সরকার, সাইমন ভানভার স্টেলকে 'টেবল-বে' উপনিবেশের শাসক করে পাঠালেন। সঙ্গে এলেন তাঁর পুত্র উইলিয়াম অ্যাড্রিয়ান। সাইমন ছিলেন হাফকাস্ট। জন্ম, মরিসাসে। ইতিমধ্যে কেপ অফ গুড হোপে ওলন্দাজরা দুর্গ তৈরি করে ফেলেছে। ওলন্দাজ জাহাজ মাদাগাস্কার, সিলোন কী জাভা থেকে যাওয়া আসার পথে নিত্য থামছে। জমি উর্বর, আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মপ্রধান অন্যান্য অঞ্চলের মতো স্যাঁতসেঁতে গরম নয়। রাজ্যপাল সাইমন হল্যান্ড থেকে আরও বসবাসকারীর আগমনের পথ সুগম করে দিলেন। জমি দেবার ব্যবস্থা করলেন। দেখতে দেখতে শ্বেত জনসংখ্যা বেড়ে উঠল। রোমানরা ত্রিপোলিতে ঘাঁটি গড়ার পর এই আর এক দৃষ্টান্ত। দূর সমুদ্রের এক মহাদেশের সর্বদক্ষিণ এক বিন্দুতে আর একটি শ্বেত উপনিবেশ।

প্রথম দিকে সাহসী ওলন্দাজরা সমুদ্রকূল ছেড়ে ভেতরে ঢোকার সাহস করে নি। যতই হোক জীবন খুব নির্বিঘ্ন ছিল না। বন্দর এলাকায় নিজেদের আধিপত্য। অন্তর্ভাগে, হটেনটটদের সন্দেহের সদা জাগ্রত চোখ। চাষের জমি কেড়ে নিতে চায়। চারণ-ক্ষেত্র দখল করতে চায়। বিজাতীয় এরা কারা! যাঁদের কোমরের পিস্তল থেকে আগুন বেরোয়। রক্ত ঝরে কালো মানুষের বুকে। ওই শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে শুধু ওলন্দাজ ছিল না। ছিল ফরাসী, জার্মান, সুইডিশ। যারা ধর্মীয় অত্যাচারের ভয়ে সেই যুগে, দেশ ছেড়ে হল্যান্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। নতুন মহাদেশে তারাই এল ভাগ্যের সন্ধানে। যদিও এই সব উপনিবেশ স্থাপনকারীদের কেউ কেউ তাদের ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে গেছে বউ করে, তবুও এরা সন্দেহভাজন। এসেছে নিজ-দেশে দেশেরই মানুষকে পরবাসী করতে। হটেনটটদের ছোট ছোট দল লুকিয়ে থাকত অভ্যন্তর ভাগের ঝোপেঝাড়ে, জঙ্গলে। শ্বেতাঙ্গরা ভেতরে আসার চেষ্টা করলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত তীর ধনুক নিয়ে।

সে বড় কঠিন ঠাঁই। প্রকৃতির বেড়া ঘেরা। দুরধিগম্যতার জন্য ইতিহাসের আদি উপনিবেশ-স্থাপনকারীরা আফ্রিকাকে তেমন পছন্দ করত না। পৃথিবীর বিমর্ষ ইতিহাস যে শতাব্দীতে নতুন উত্তেজনার দিকে মোড় নিচ্ছে, সেই সময় নতুন জগতের অবগুণ্ঠন খুলতে এগিয়ে এসেছিলেন তিন দুঃসাহসী। খ্রীস্টোফার কলম্বাস, জন ক্যাবট আর ম্যাগেলান। জেনোয়ার ছেলে কলম্বাস বিয়ে করেছিলেন এক পর্তুগীজ নাবিকের মেয়েকে। শ্বশুর মশাইয়ের কাগজপত্র আর ডায়েরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে কলম্বাস শুনতে পেতেন অজানা সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ। কল্পনার চোখে ভেসে উঠত অজানা মহাদেশের ঠিকানা। সমুদ্রে তাঁকে ভাসতে হবেই। গভীর রাতে তাঁর স্ত্রীকে পরিকল্পনার কথা বলতেন। স্বপ্নের কথা। নাবিক দুহিতার রক্তেও ছিল সমুদ্রের আহ্বান। কে যেন ডাকছে, অন্ধকার উত্তাল সমুদ্র থেকে 'সেলারস অ্যাহয়'। শতাব্দী ঘুরছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। ভূগোল ছটফট করছে নতুন সীমানায় পা রাখার জন্যে।

১৪৮৬ সালে কলম্বাস তাঁর ভাই বারথোলোমিউকে পাঠালেন, ইংল্যান্ডের রাজার কাছে। যদি তিনি সাহায্য করেন কলম্বাস ভেসে পড়বেন নতুন মহাদেশের সন্ধানে। এমনই বরাত, ফরাসী উপকূলে বারথোলোমিউ পড়লেন জলদস্যুদের খপ্পরে। ছাড়া পেয়ে ইংল্যান্ডে এসে নতুন রাজা হেনরি টিউডরের নজরে যখন পড়লেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কলম্বাস ইতিমধ্যে স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড আর ইসাবেলার সাহায্য পেয়ে গেছেন। ১৪৯২ সালে কলম্বাস সমুদ্রে ভাসলেন। ভাগ্য তাঁর অগোচরেই তাঁকে তিনমাস পরে তুলে দিল বাহামাস-এর একটি দ্বীপে। কলম্বাস চেয়েছিলেন প্রাচ্যে যাবার নতুন একটি জল-পথের সন্ধান, তার বদলে পেয়ে গেলেন বিশাল এক মহাদেশ। বাহামাস, কিউবা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। ১৪৯৮ সালে কলম্বাস জাহাজ ভেড়ালেন দক্ষিণ আমেরিকার নিম্ন ভূভাগে।

আফ্রিকা নয়, দেশে দেশে তখন একটিই আর্তনাদ, 'চলো আমেরিকা।' নিউ ওয়ার্লড! কি নেই সেখানে! সোনা, দানা, রুপো। ইতালির কলম্বাস ওদিকে স্পেন আর পর্তুগাল যখন সাত সাগর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে, ইংল্যান্ড তখন নেদারল্যান্ড নিয়েই সন্তুষ্ট। নেদারল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্যেই যথেষ্ট অর্থাগম হচ্ছে যখন, তখন কে পাড়ি দেয় অতলান্তিক! কে ছোটে প্রশান্ত মহাসাগরের অচিন দেশে। হেনরি টিউডর অবশ্য আর এক জেনোয়াবাসীকে সমুদ্রে ভাসালেন জন ক্যাবট তাঁর নাম। ১৪৯৭ সালে তিনি গিয়ে ঠেকলেন কানাডার কাছে কেপ ব্রেটনে। তখন কিছুই ছিল না সেখানে। বাণিজ্যের সম্ভাবনাও ছিল না। পেছনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে অগম্য অজানা এক মহাদেশ। ক্যাবট দ্বিতীয়বারের অভিযানে পৌঁছালেন ফ্লোরিডা। চারপাশে স্পেনের বাণিজ্য-এলাকা। হেনরি স্পেনকে চটাতে চান না; অতএব ক্যাবট ইংল্যান্ডকে কিছুই দিতে পারলেন না।

কলম্বাস আবিষ্কার করলেন, কলম্বাস খুলে দিলেন সমৃদ্ধ প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসের পথ। স্পেন আর পর্তুগাল তাদের স্বাভাবিক হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন মহাদেশ, নিউ ওয়ার্লডের বুকে। গোপন উদ্দেশ্য লুঠ, ব্যক্ত উদ্দেশ্য পৌত্তলিকদের দুনিয়ায় খ্রীস্ট ধর্মের প্রচার। দুনিয়াদারির মালিক তখন পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার। মানচিত্রের ওপর উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা রেখা টেনে পোপ স্পেন আর পর্তুগালকে বললেন, এইটা তোমার অংশ, ওইটা তোমার অংশ। পোপের নির্দেশ অনুসারে বিবদমান দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো সন্ধির শর্ত। মিটে গেল দখলের লড়াই। পর্তুগাল চলে গেল ব্রাজিল দখল করতে।

পর্তুগাল ছোট্ট এতটুকু একটা দেশ। তার সাধ্য কি, নতুন দুনিয়ার তার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাকে ধরে রাখে। এই ধরে রাখার চেষ্টায় পর্তুগালের প্রায় অর্ধেক লোক প্রাণ হারাল। দেখতে দেখতে বৃহৎ স্পেন হয়ে উঠল সমুদ্র পারের সমস্ত নতুন দেশের অধিপতি। স্পেনের অর্থে পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন ম্যাগেলান ভেসে পড়লেন দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশ্যে। বৃহৎ তাঁর পাড়ি। দক্ষিণ আমেরিকা হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে সারা পৃথিবীকে তিনি জলপথে প্রদক্ষিণ করবেন। কি বিশাল পথ! টু সেল রাউন্ড দি ওয়ার্লড-এর প্রথম অভিযাত্রী। ফিলিপিনস-এ ম্যাগেলান নিহত হলেও, তাঁর জাহাজের চিফ-অফিসার কেপ অফ গুড হোপ ছুঁয়ে জাহাজটিকে স্পেনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন।

নতুন দুনিয়ার সম্পদে ষোড়শ শতকের ইওরোপ জবজব করে উঠল। স্যার উইনস্টন চার্চিল, 'এ হিস্ট্রি অফ দি ইংলিশ-স্পিকিং পিপলস'-এ লিখছেন—The wealth of the New World soon affected the old order in Europe. কর্টেস হারনানডো, একজন 'স্প্যানিশ অ্যাডভেন্চারার'। তিনি মেকসিকো দখল করে মায়া-সভ্যতা শেষ করে দিয়ে এলেন। আমরা প্রধানমন্ত্রী রাজীবের সঙ্গে লন্ডনের অধিবেশন শেষ করে সেখানেও যাব পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সমাবেশে। আমাদের ভ্রমণ সূচিতে মায়া-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনও আছে।

পিজারো ফ্রানসিসকো স্পেনের আর এক জন দুর্দান্ত 'অ্যাডভেন্চারার'। তিনি স্পেনের হয়ে পেরু দখল করে, ইনকা সাম্রাজ্য শেষ করে দিলেন। পরে অবশ্য নিজের লোকেরাই তাঁকে মেরে ফেললেন। হায় কলম্বাস! নতুন দুনিয়ার পথ খুলে দিয়ে কি সর্বনাশই করলেন! অতলান্তিকের বুকের ওপর দিয়ে কনকোয়েস্তাদর-দের জাহাজ যায় আর আসে। অ্যান্টওয়েৰ্প বন্দরে পর্বত-প্রমাণ মাল খালাস হয়, সোনা, রুপো, মশলা, তামাক, আলু আর আমেরিকার চিনি। নতুন পৃথিবীকে ধ্বংস করে ইওরোপের সমৃদ্ধি। জনসংখ্যা থেমেছিল আবার বাড়তে শুরু করল। কৃষির উৎপাদন হুহু করে বেড়ে গেল। কলকারখানায় প্রাণ ফিবে এল। আরও অর্থ চাই, আরও অর্থ। নতুন নতুন অভিযানে যেতে হবে। নয়া উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে। নতুন বাড়ি, নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন শাসন ব্যবস্থা।

সে যুগের রাজা-মহারাজা, কি সাধারণ মানুষ, অর্থনীতি তেমন বুঝতেন না। নাড়াচাড়ার কায়দাটা তেমন জানা ছিল না। নানা প্রয়াসে রাজকোষ যতখানি খালি হতে লাগল ততই তাঁরা মুদ্রামূল্য কমাতে শুরু করলেন। ফলে জিনিসপত্রের দাম সাংঘাতিক ভাবে চড়তে শুরু করল। আমেরিকার চাঁদির চাপে গোটা ইওরোপে 'ইনফ্লেশানে'র যে ঢেউ খেলে গেল তার তুলনা মেলে একমাত্র বিংশ শতাব্দীতে। প্রাচীন ভূস্বামী কৃষকদের যুগ শেষ হয়ে গেল। তাঁদের আধিপত্যের পাল থেকে বাতাস কেড়ে নিল বণিক, ব্যবসায়ী আর মহাজনেরা। যেমন জার্মানির 'ফাগার' পরিবার। রেনেসাঁ শিল্পে বিপুল অর্থ খাটিয়ে এই পরিবার এক সময় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিল। পোপ আর সম্রাট সকলেরই চলত ফাগার পরিবারের ঋণে।

তবু ইতিহাস স্বীকার করে এমন জাগরণের যুগ আর আসে নি। ঘুম ভাঙানোর যুগ। দেশের আয়তন বাড়ছে। দিগন্ত বিস্তৃত হচ্ছে। ভূগোল নতুন চেহারা নিচ্ছে। নতুন নতুন পণ্যসামগ্রীতে বাজার ভরে উঠছে। নতুন ব্যবসা, নতুন জীবিকার ছড়াছড়ি। দেহে-মনে মানুষ অফুরন্ত উল্লাসে জেগে উঠছে। নৃত্য, গীত উৎসব, প্রাচুর্যের একটি শতাব্দী। পূর্বশতকে এই দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ মানুষ হতো ব্ল্যাক ডেথ-এর শিকার। সেই মুহ্যমান ইওরোপে সমুদ্র এনেছে নতুন প্রাণের উল্লাস। চলো আমেরিকা। কে যায় আফ্রিকায়। ভীতিপ্রদ এক মহাদেশ। যে যায় সে কি আর ফেরে! মানুষের সন্ধানী প্রবৃত্তি কোথাও না কোথাও যাবেই। থেমে থাকার নয়।

কেন আমেরিকা! গাল্‌ফ অফ সেন্ট লরেন্‌স দিয়ে ঢুকলেই সোজা কানাডা। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার তটভাগ সহজ হলেও অভ্যন্তরভাগ বড় বন্ধুর। তটভাগে ছড়িয়ে আছে স্বাভাবিক বন্দর। ভেতর দিকে ঢুকে গেছে সহজগম্য নদী; কিন্তু তারপরেই অন্য চেহারা। খাড়া উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়, বালিয়াড়ি। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। অতি অশান্ত ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র। তেমনি তার স্রোত। আরও ভেতরে পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতশ্রেণী। পশ্চিমে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ওঠা সম্ভব হলেও, ধুধু চারপাশ, গাছ নেই, খাদ্য নেই, নেই তৃষ্ণার জল। পশ্চিম দিক থেকে পাহাড় টপকাতে যাওয়া মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা। দক্ষিণ আর পূর্ব দিক থেকে প্রায় দুঃসাধ্য। ভীষণ খাড়া, তেমনি উঁচু।

ইওরোপীয় অভিযাত্রীদের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল প্রকৃতির আতঙ্ক।

ওলন্দাজরা ইংরেজের চেয়ে অনেক ডাকাবুকো ছিল। তাদের সমস্ত সাধনা ঢেলে দিলে আফ্রিকার বুকে। আমেরিকায় তারা স্পেনের কাছে হার স্বীকার করেছে। ১৬৬০ সালের অব্যবহিত পরে জন ডানকায়ের্টে বারোজনের একটি দল নিয়ে ভেতর দিকে যাবার চেষ্টা করলেন। দলে ছিল দু'জন জার্মান। উত্তর মুখে তাঁরা এগিয়ে চললেন। লক্ষ্য মোনোমোতাপা। মোনোমোতাপার স্বর্ণখনি। ডানকায়ের্টে-এর দল ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। প্রকৃতির উত্তুঙ্গ বাধা টপকাতে পারলেন না।

এর কয়েক বছর পরে এলেন এক দিনেমার, পিয়েটার মিরহফ। মিরহফ বেশ কিছুটা ভেতরে ঢুকলেন। পিয়েটার এভেরায়ের্ট পশ্চিম উপকূল ধরে নামাকুয়াল্যান্ড অবধি গেলেন। কিন্তু ১৭০০ সাল না আসা পর্যন্ত সব অভিযানই রয়ে গেল নিষ্ফলা। ১৭০০ সালে কেপ কলোনির জনসংখ্যা ছিল ১৭০০।

যাদের জীবিকা ছিল চাষবাস, তাদের বলা হতো 'বোয়ার'। এই বোয়াররা ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কান্ডকারখানায় মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। তারা ক্রমশই হটেনটটদের এলাকার দিকে ঠেলা মারবার চেষ্টা করতে লাগল। ওদের হাতে ধনুর্বাণ এদের হাতে গাদা বন্দুক। মৃত্যুর হার ও-তরফেই বেশি। সঙ্ঘর্ষে যারা জীবিত তারা শৃঙ্খলিত। দাসে পরিণত। ডান রাইবিক তাঁর ডায়েরিতে এই আদিবাসী হটেনটটদের সম্পর্কে উল্লেখ করে গেছেন, 'ডাল, রুড, লেজি অ্যান্ড স্টিংকিং নেশান'। ওলন্দাজদের গাদা পিস্তল এদের যত না মারল, মেরে শেষ করে দিল ভারতাগত এক মহা শত্রু। ওলন্দাজ জাহাজে চেপে ভারত থেকে এল 'স্মল পকস'। মায়ের দয়ায় শেষ হয়ে গেল, এই ডাল, রুড, লেজি, স্টিংকিং নেশান। সুন্দর, স্বাস্থ্যকর উর্বর টেবল বে তে 'স্মলপকস' ঢুকে সব ছারখার করে দিল। মারা গেল অর্ধেকেরও বেশি নিগ্রো ক্রীতদাস। ওলন্দাজ কৃষকরা পালাতে লাগলেন 'অরেঞ্জ রিভারে'র দিকে কেপ থেকে যার দূরত্ব প্রায় তিন শো মাইল। ১৭১৯ সালে এই নদী প্রথম যে ভদ্রলোক পার হয়েছিলেন, তিনি একজন গণিতজ্ঞ। ব্যাভেরিয়ার মানুষ। তাঁর নাম ছিল পিটার কোল্ব। পদব্রজে তাঁর ওই দুর্গম অভিযানের বিবরণ তিনি রেখে গেছেন। পঞ্চাশ বছর পরে স্কটিশ এক ভদ্রলোক, ক্যাপ্টেন রবার্ট গর্ডন আবিষ্কার করলেন অরেঞ্জ আর ডাল নদীর সঙ্গম। তিনি ওলন্দাজদের চাকুরিতে ছিলেন। ওই সময় কেপ কলোনি বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। জনসংখ্যা প্রায় সাত হাজার। অর্ধেক শ্বেতাঙ্গ, অর্ধেক কৃষ্ণাঙ্গ দাস। ডাচ কালচার, ডাচ স্টাইলের বাড়ি, ঘর, বাজার কেপটাউনকে সবাই তখন বলতে শুরু করেছেন, 'লিটল প্যারিস'।

ভাগ্য এমনই এক চাকা, যা ঘুরতেই থাকে। ইতিহাস চিরটাকালই বড় অস্থির। 'অলিম্পিক দৌড়'-এর মতো। প্রথমে যাকে মনে হলো পেছিয়ে আছে, সেই দেখা গেল সবার শেষে বিজয়ী। ইংল্যান্ড ছিল পিছিয়ে। সমুদ্র জয়ে, উপনিবেশ স্থাপনে স্পেন, পর্তুগাল ছুটছে সবার আগে। নেদারল্যান্ডের এক চতুর্থাংশ তো সমুদ্রতলের নিচে। সমুদ্র থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে চাষবাস, বসবাস। আজ নয়, সেই ১১০০ সাল থেকে। ওলন্দাজরা সমুদ্রের সঙ্গে খেলা করতে জানে। সমুদ্রের ওপর টিলা তৈরি করে তার ওপর মানুষের সংসার। রাইন বদ্বীপে বসবাসকারী এই জার্মানিক শাখার মানুষদের সম্পর্কে রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস লিখেছিলেন, সমুদ্রের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তৈরি হয়েছে ওলন্দাজ চরিত্র। অতি সুসভ্য তবে ব্যবহারে কর্কশ। খ্রীস্টিয় প্রথম শতকেই প্লিনি, দি এলডার দেখেছিলেন, চারপাশে সমুদ্র ফুঁসছে মাঝখানে মানুষের তৈরি টিলা। টিলার পর টিলা। তার ওপর বসতি, 'লাইক সেলারস অন এ শিপ, হোয়েন দি সারাউন্ডিং ল্যান্ড ইজ ফ্লাডেড।' এই ধরনের টিলাকে ওলন্দাজরা বলেন 'পোল্ডার'। এই জাতি সম্পর্কে একটি বিখ্যাত উক্তি—God created the world but the Dutch made Holland.

কিন্তু হল্যান্ডকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল ব্রিটেন। অষ্টাদশ শতক শেষ হয়ে আসছে। ইতিহাস বলছে, 'ইম্পিরিয়াল ফিউচার' আর ডাচ-দের হাতে নেই। মুকুট নাচছে হয় ইংরেজদের জন্যে, না হয় ফরাসীদের ভাগ্যে। নেপোলিয়ান ফরাসীদের ভাগ্য বুনছেন। সেই 'লিটল ম্যান অন হর্স ব্যাক'। তিনি ওলন্দাজদের সমুদ্রপারের বিবিধ বাণিজ্যরেখা মুছে দিয়েছেন। যেখানে যেখানে ডাচ কলোনি ছিল, সব উপড়ে ফেলে দিয়েছেন। অতলান্তিকের জলে ডাচ জাহাজ আর ধোঁয়া ছাড়ে না। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, শেয়ার হোলডারদের শেষ ডিভিডেন্ড দিয়েছেন ১৭৮২ সালে। ১২ বছর পরে

কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেল। বাজারে ঋণের পরিমাণ এক কোটি পাউন্ড। এরপর ইতিহাস আরও কিছুদুর এগলো। হল্যান্ড আর ক্ষমতা ধরে রাখতে পারল না। ফরাসীদের হাতে পরাজিত হলো। স্থাপিত হলো পাপেট স্টেট, 'বাটাভিয়ান রিপাবলিক'। মুখিয়ে ছিল ইংরেজ। শত্রু এলাকা বলে সঙ্গে সঙ্গে দখল করে নিল কেপ কলোনি। ১৮১৪ সালের শান্তিচুক্তি অনুসারে, ৬০ লক্ষ পাউন্ড ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ইংরেজ কেপ কলোনির দখলিস্বত্ব পেয়ে গেল।

প্রথম দিকে ইংরেজরা কোনও বাধা পেলেন না। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তেমন জনপ্রিয় হতে পারে নি। ডাচ কোম্পানির নির্দিষ্ট কোনও নীতি ছিল না ওলন্দাজি রীতি নীতি, আচার অনুষ্ঠানেরই চল ছিল। ইংরেজ খুব সহজেই সেখানে গেড়ে বসল। বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হলো রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে। যেখানে বান্টুরা অনবরতই একটা চাপ সৃষ্টি করত। ঠেলে চলে আসতে চাইত রাজ্যসীমানায়। এই সীমান্তই হলো ইংরেজদের স্থায়ী সমস্যা। 'ফিশ বিভার'-এর ধার বরাবর প্রায়ই গবাদি পশু তুলে নিয়ে যাবার ঘটনা ঘটতে লাগল। বোয়ারদের সঙ্গে বান্টুদের প্রায়ই লেগে যেত লড়াই। ১৭৭৯ সালে বেঁধে গেল বড় রকমের কাজিয়া। এই লড়াই দিয়েই শুরু হয়ে গেল পরবর্তী একশো বছর 'কাফি'র যুদ্ধ। ওলন্দাজদের কৃষিভূমি দীর্ঘ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় প্রায়ই তাদের সাহায্য চাইতে হ'ত কেপটাউনে। ডাচ কর্তৃপক্ষ প্রায়শই সাড়া দিতেন না; এইবার ক্ষমতায় ইংরেজ। ইংরেজদের পালা। আর্তকে বাঁচাতে হলে ছুটে যেতে হবে।

ইংরেজ হলো গুড-প্ল্যানার। তাঁরা দেখলেন, ফিশ রিভারের সীমানা বরাবর রাজ্য সীমান্তকে সুরক্ষিত করতে হলে ইংরেজ বসবাসকারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাঁরা ১৮২০ ও ২১ সালে ব্রিটেন থেকে পাঁচ হাজার বাসকারীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে এলেন। ইংরেজ বসবাসকারীর আগমন ইংরেজ নীতির পরিবর্তন সূচনা করল। কেপটাউন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হতে চলল। যা কিছু ওলন্দাজ ভাবাপন্ন ছিল সব পালটে ফেলে ইংরেজি করার কাজ জোর কদমে শুরু হলো। ডাচ ভাষার বদলে চালু হলো ইংরেজি। আনা হলো বিচার বিভাগীয় পরিবর্তন।

সেই যার শুরু দীর্ঘ দেড়শো কি দুশো বছরে আজ তা বিষাক্ত।

৩৪

এক গাদা বইপত্তর, নোটস, হ্যান্ডআউটস ঘরের পুরু কার্পেটের ওপর ছড়াছড়ি। আফ্রিকার তিন শো বছরের জটিল ইতিহাস। ম্যাপ চাই। খাতা চাই। লিখে, ডায়াগ্রাম এঁকে তিল তিল করে বুঝতে হবে। সময়টা দুপুর। রবিবার নয় তবু একটা রবিবার রবিবার ভাব। এ দেশে এসে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে। হোটেলে অসম্ভব দাম। বাইরে কে যায়! কিন্তু মানুষের খাই খাই স্বভাবটা যাবে কোথায়। তা যে দেশের মানুষ, সে দেশে তো খালি পেটে কাপ কাপ চা খাবার বিধান অর্থনীতিতে পাকা হয়ে আছে।

গোলাপী টেলিফোন তুলে শূন্য ছয় ঘোরালেই রিসেপসান। মধুর বালিকা কণ্ঠ। ওনলি টি। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল টি। রিসিভার শুইয়ে রেখে মনে হলো বাইরের জগৎ নয় আমার ঘরের বাইরের জগৎ একবার দেখে আসি। আমাদের মাপা জীবনে সবই তো একবার। জন্মেছি একবার। পাঁচতারা হোটেলে এসে ঢুকেছি একবার। চলে যাওয়ার পর এই ঘরে আমার মন পড়ে থাকবে। অনেকটা ওই আয়নার মতো। বুকে ধরে সামনের টেবিলের প্রতিচ্ছবি। ফলের ঝুড়ি, মদের বোতল, সিগারেটের প্যাকেট, ডোমে ঢাকা বাহারী আলো। বিশাল খাটের ফুলকি কভার। আর কেউ আসবে। আবার আসবে। আবার কেউ আসবে। আমি আর আসবো না ফিরে।

চা বলেছি। আসবে। ততক্ষণ করিডরের পাকে পাকে একলা আমি নির্জনতার হাত ধরে বেড়িয়ে আসি। ঘরের চাবি আমার পকেটে। সেই রিসেপসানিস্ট ছেলেটি আমাকে কায়দা শিখিয়েছিল। এই নবটা ধরে ডান অথবা বাঁ যে কোনও একটা দিকে ঘুরিয়ে দিলে দরজা বন্ধ হবে, কিন্তু তালা বন্ধ

হবে না। সহজ বিজ্ঞান। এলিমেন্টারি মাই ডিয়ার ওয়াটসন। আমার বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা বললে, কাম আউট অ্যান্ড ট্রাই ইট।

ডান, বাঁ ভুলে গেছি। তাতে কি! একবার ডাইনে ঘোরাই একবার বাঁয়ে। বাইরে আসতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আচ্ছা এবার ঠেলে দেখি খোলে কিনা! যাঃ বন্ধ হয়ে গেছে। তালা লেগে গেছে। এ আবার কি পদার্থ বিজ্ঞান। যাক ভয়ের কিছু নেই। হবে কি হবে না ভেবে চাবিটা তো পকেটেই রেখেছি। বিলিতি দরজা তুমি কি আমাকে অতটাই দিশি বোকা ভাবো!

তালার গর্তে চাবি লাগিয়ে ঘোরালুম। ও বাবা এ যে খোলে না। এদিকে ঘোরাই ওদিকে ঘোরাই। জয় ভগবান। জয় মা। তবু খোলে না। ভালো কোনও স্তোত্রও মনে আসছে না। অনেক আগে একটা আমেরিকান সিনেমা দেখেছিলুম। 'কোল্ড সোয়েট'। নায়ক চার্লস ব্রনসন। ঠান্ডাতেও আমি গলগল ঘামছি। আবার বোকা বানিয়ে দিলে। ভেতরে ফোন বাজছে। একটা স্তোত্র মনে পড়েছে, 'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবী সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়োমুদিরয়েত।'' কোথায় কি! এগণ্ডয়ে ইংরেজ তালা। বুঝেছি, ভারতীয় ভগবানে হবে না। জয় যীশু। জয় খ্রীস্ট। খুলে দাও বাবা। গড সেভ দি কিং। ভেতরে ধরাচূড়া। সব মালমশলা পড়ে আছে। এখুনি যে প্রেসসেন্টারে যেতে হবে। পি সি আছে।

পুরু কার্পেটে ভারি পায়ের শব্দ। এগিয়ে আসছে। ছিপছিপে লম্বা এক তরুণ দু'হাতে একটা ট্রে ধরে এগিয়ে আসছে। কারুকার্য করা টিকোজি শির উঁচিয়ে আছে। আমার চা আসছে নেচে নেচে।

''আপনার চা।''

মোনালিসার মতো হেসে বললুম, ''রাখুন।''

''কোথায় রাখবো? ভেতরে চলুন।''

''লুক হিয়ার মাই ডিয়ার স্যার, তুমি ভূতে বিশ্বাস করো? ঘোস্ট?''

ছেলেটির মুখ কেমন হয়ে গেল। ''ঘোস্ট!''

''ইয়েস ঘোস্ট। তোমাদের এত সুন্দর হোটেল! বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না; কিন্তু এই উইং-এ ভূত আছে। আই এম সিওর অফ ইট। স্পেশ্যালি ইন দিস রুম। এই ঘরে। এই করিডরে। কোনও সন্দেহ নেই।''

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে, ''তুমি প্রমাণ পেয়েছো কি?''

''পাই নি? প্রমাণ ছাড়া আমি কিছু বলি না। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। তুমি দ্যাখো আমি যবে থেকে এই ঘরে ঢুকেছি, তবে থেকে এই দরজাটা আমার সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করছে। দবজা তো আর মানুষ নয়। করছে কোনও ইভ্‌ল স্পিরিট। সে চায় না যে আমি এ ঘরে থাকি। এই দ্যাখো আমার হাতে চাবি; কিন্তু তালা খুলছে না। দিস টাইম দ্যাট স্পিরিট ইজ প্লেয়িং ওয়ার্স্ট এভার জোকস উইথ মি?''

''দরজা খুলছে না?''

''কি করে খুলবে! সেই স্পিরিট তো ভেতর থেকে লক করে বসে আছে।'

'ইজ ইট!''

এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেটি চায়ের ট্রে-টা পেছনের জানলার চওড়া গবরেটে রাখল।

''কই দেখি চাবিটা। গিভ মি দি কি।''

হাঁটু গেড়ে কার্পেটের ওপর বসে যুবকটি ফুটোয় চাবি ঢোকালো। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। ভয় করছে। অস্বস্তি হচ্ছে। সারা হোটেল রটে না যায়, এক ইন্ডিয়ান নুইসেন্‌স এসে সব জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আবার একটা পুরনো গানও এই দুর্যোগের মুহূর্তে গুনগুন করে গাইতে ইচ্ছে করছে। অনেক আগে রেকর্ড করেছিলেন লালচাঁদ বড়াল, সম্প্রতি করেছেন রামকুমার। 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।। এমন সময় বগামামা বার করলে তার বুদ্ধির ধামা।। শেষে কস্তাকস্তি ধস্তাধস্তি, প্যাঁঅ্যাঁক করে হাড় বেরিয়ে গেল।।'

অনেক কস্তাকস্তি হলো বটে, খুট করে তালা কিন্তু খুললো না। যুবক উঠে দাঁড়িয়ে লালচে মুখে বললে, ''স্ট্রেঞ্জ! ডবল লক হয়ে গেছে। কে করলে?''

'ওই যে বললুম তোমাকে, দ্যাট মিসচিভাস স্পিরিট। অশরীরী সামওয়ান ইজ ইনসাইড।''

জানলার গবরেটটা বেশ চওড়া। হাতের ভর দিয়ে টক করে উঠে বসলুম। ঠ্যাং ঝুলিয়ে আমার চল্লিশ টাকা দামের চা জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে। যুবককে বললুম, "এসো, আমার সঙ্গে একটু চা খাও।"

এই বড়লোকের হোটেলে এমন প্রস্তাব তাকে বোধহয় কেউ কোনও দিন দেয়নি। ছেলেটি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বললে, "ও নো নো। আমি চা খাবো না। আমি চা খুব কম খাই। আপনি খান। আমি কি তৈরি করে দোবো?"

ততক্ষণে আমি এক কাপ তৈরি করে ফেলেছি। একটা লম্বা চুমুক মেরে বললুম, "বুঝলে, ইন মাই কান্ট্রি, যেখানে তোমার ফোরফাদার্সরা চাকরি করত, নানারকম সব গোলমাল টোলমাল করত, মারতো মরতো, সেখানে প্রায় সব ডাকবাংলো আর রেস্টহাউস, আর সার্কিট হাউসই হন্টেড। ভূতে ভরা। দিনের বেলা একা একা যদিও থাকতে পারো, আই ক্যান বেট রাতের বেলা তোমার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে যাবে। আমার নিজের এরকম কত যে একসপিরিয়েনস আছে!"

ছেলেটি আমার দিকে বেশ কিছুটা সরে এল। দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছে। মুখটি ভারি সরল। চোখ দুটো বেশ পবিত্র। হিপি সিমটম ধরেনি। সাপ প্যাঁচানো নির্জন করিডর। পুরু কার্পেট। ভারি বাতাস। শীত শীত অনুভূতি। তৃতীয় কোনও প্রাণী নেই। এই দুপুরেই গা ছমছম পরিবেশ।

ছেলেটি বললে, "আপনার কি মনে হয়? হোটেলের এই অংশটা একটু উপদ্রুত?" "কোনও সন্দেহ নেই। আমি ডেড সিওর, দিস পার্ট ইজ অ্যাফেকটেড। তোমরা নিচে রিসেপসানে থাকো। কি বুঝবে বলো? ভূতের সঙ্গে ইন্ডিয়ায় আমার অনেকবার এনকাউন্টার হয়েছে। আই নো হোয়াট ইজ হোয়াট।"

"এই দিকটায় বেশ গোলমাল আছে, তাই না?"

ছেলেটি আমার দিকে আরও খানিকটা সরে এলো। ভারি সরল ছেলে।

"আছে মানে? আমি প্রমাণ পেয়েছি। এই তো দেখ না, তোমার কি মনে হচ্ছে না, এখানকার বাতাস অনেক ভারি! থিক, ক্লটেড এয়ার।"

ছেলেটি বোঝার চেষ্টা করল। জোরে নিঃশ্বাস নিল। হাত নাড়ল। তারপর বললে, "আগে বুঝি নি, এখন মনে হচ্ছে আপনি যা বললেন, ঠিক সেইরকমই।" "তুমি জানো, আমি তো মিটিং কনফারেন্স, এই সব সেরে বেশ রাতে ফিরি। পাস্ট মিডনাইট। আর ওই লিফ্ট থেকে ঘরটা বেশ দূর। লং অ্যান্ড লোনলি প্যাসেজ। কাল কি হলো জানেন? আমি যাচ্ছি, আমার আগে আগে বেশ কিছুটা দূরে আর একজন। বেশ বাঙ্কি চেহারা। আমার সন্দেহ হলো। লোকটির চলাটা কেমন যেন। একটু জোরে পা চালিয়ে কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করলুম। আশ্চর্য কিছুতেই ব্যবধান কমাতে পারলুম না। আর তখনই লক্ষ্য করলুম লোকটি হাঁটছে না। হি ইজ জাস্ট ফ্লোটিং এ ফিউ ইঞ্চেস অ্যাবাভ দি ফ্লোর। হি ইজ গ্লাইডিং।"

ছেলেটি আরও একটু সরে এল কাছে।

"তুমি ভাবছো, আই ওয়াজ ড্রাঙ্ক? না। আমি মদ খাই না। প্রথমে মনে হলো ভয়ে উল্টো দিকে ছুটি। তারপরে মনে হলো, সেটা ঠিক হবে না। আই মাস্ট ফলো দ্যাট স্ট্রেঞ্জ ফিগার। বাঁকের পর বাঁক ঘুরে যাচ্ছি। যেন নেশা করেছি। সময়ের হিসেব ভুলে গেছি। এক একবার মনে হচ্ছে, হাউ ক্যান ইট বি, লিফট থেকে আমার ঘরের দূরত্ব তো এত নয়! করিডর কি হঠাৎ লম্বা হয়ে গেল। তখন আর উপায় নেই। আমার আর ওই লোকটির মধ্যে অদৃশ্য একটা লিঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে। এ শর্ট অফ ম্যাগনেটিক পুল। ইউ ক্যান কল ইট এ স্পেল। তারপর তুমি জানো?"

"আমি? না আমি তো জানি না।"

"তোমাকে রিসেপসানে কেউ কিছু বলে নি! কাল শেষ রাতে কি হয়েছিল।"

"না তো।"

"রাত তখন তিনটে। হঠাৎ দেখি আমি তোমাদের বেসমেন্টে লন্ড্রিতে পড়ে আছি। একটা ডিমলাইট জ্বলছে। বয়লার। ওয়াশিং ম্যাট, মেশিন, চিমনি। আর দেখি কি এক গাদা জামা কাপড়ের ওপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে সুন্দরী একটা মেয়ে। ভয় হলো, যদি চিৎকার করে ওঠে। আলো অন্ধকারে বয়লার আর চিমনির পাশ দিয়ে কাছে গিয়ে বুঝলুম, নট বিফোর এইট। প্রচুর খেয়েছে। কি করি।

কোথায় দিয়ে বেরোই! টেবিলের ওপর ফোন। তোমাদের রিসেপসান তো অবাক। যে মেয়েটি ধরেছিল সে কেবলই বলে, হাউ ক্যান ইট বি! লন্ড্রিতে জামা কাপড় যায়। আস্ত একটা মানুষ যাবে কি করে। কিছুতে বোঝাতে পারি না। সে বারে বারে প্রশ্ন করে, তুমি কি ড্রাঙ্ক? আরে না রে বাবা ড্রাঙ্ক কেন হব। শেকসপীয়ার শোনালুম। দেন আই ওয়াজ রেসকিউড।"

ছেলেটি আরও সরে এল। আমার বেশ ভালো লাগছে। সায়েব ভূত বিশ্বাস করছে, এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! নিজেকে সেই আদিযুগের মিশনারী মনে হচ্ছে। এক অবিশ্বাসীকে অন্তত ভূতে কনভার্ট করতে পেরেছি। ভূতে বিশ্বাস হলে ভগবানেও বিশ্বাস আসবে। তারপর ভগবানকে নিয়ে আসবো আত্মায়। সেখান থেকে বেদান্তের সোঽহং। মেটিরিয়ালিস্টকে করে তুলবো স্পিরিচ্যুয়ালিস্ট।

ছেলেটি বললে, "হোয়াট ইজ ঘোস্ট?"

"ঘোস্ট! ভেরি সিম্পল থিং। এসেন্স অফ লাইফ। যেমন ধরো জল। জল যে পাত্রে রাখবে সেই পাত্রের আকার পাবে। আবার ধরো জলকে তুমি বাষ্প করে উড়িয়ে দিতে পারো। তার মানে এই নয় যে জল আর রইল না! অন্য ফর্মে রইল। তুমি যেই কনডেন্স করবে আবার জল। ব্যাপারটা বুঝলে? একটা সাইক্‌ল!"

ছেলেটি ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধ ঘরে সিঁ-ফ্যাঁস করে একটা সাংঘাতিক শব্দ হলো। এবার আমি ছেলেটির দিকে সরে গেলুম। কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর এক বন্ধু ভূতের গল্প লিখেছিলেন। একদিন রাতে সমরেন্দ্রবাবুর দোতলার ঘরে খাওয়া দাওয়ার পর বন্ধু গল্পটি পড়ে শোনালেন। রাত বারোটা নাগাদ পড়া শেষ হলো। ভূতের গল্প শুনে সমরেন্দ্রবাবুর গা ছমছম করল না, পিঠ সিরসির করল না। ভূত বলে কিছুই মনে হলো না! অথচ লেখক নিজে ভূতের ভয়ে একা বাথরুমে যেতে পারেন না।

ঘরের শব্দটা ছেলেটির কানে গেছে। ফ্যাকাশে মুখে তাকালো আমার দিকে। ঠোঁট কাঁপল, শব্দ নেই। চোখে প্রশ্ন। আয়না থাকলে আমার মুখও পাণ্ডুর হয়ে গেছে, দেখতে পেতুম। এবার আমার প্রশ্ন করার পালা।

"কী বলো তো?"

ছেলেটি বড় সরল। বানিয়ে কিছু বলতে পারে না। তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি বললুম, "ভেতরে একটা কিছু হচ্ছে।"

ছেলেটি বললে, "দাঁড়ান আমি নিচে থেকে 'মাস্টার কি'টা নিয়ে আসি।"

সে চলে যাবার পরেই ভয়টা আরো চেপে এলো। এ কথা ঠিক, পরিবেশটা বেশ ভৌতিক। গভীর রাতে সত্যিই কেমন যেন লাগে। ওদিকে সব আগা-পাশতলা ঝকঝকে কাঁচমোড়া বিশাল বিশাল জানলা। বাইরে ঘষা কাঁচের মতো লন্ডনের বিষণ্ণ আকাশ। বিশাল বিশাল সাবেক ধরনের বাড়ির রহস্যময় সিল্যুয়েট। ঘুম আসে না। বিশাল ঘর। কেবলই মনে হয় টানা বারান্দায়, এই বুঝি কালো একটা ছায়া এসে কাঁচে আরো একটা মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো বলে। কপাল ঢাকা টুপির কানার তলায় চোখের বদলে দুটো গর্ত।

ভাবা মাত্রই গা শিউরে উঠল। চোঁ করে বাকি চাটুকু খেয়ে ফেললুম। ছেলেটি তাড়াতাড়ি ফিরে এলে হয়। আর সে কি এখানে! যাবে আসবে! কিন্তু ঘরের ভেতর ওই বিচিত্র আওয়াজটা হলো কিসের!

ছেলেটি লম্বা এতখানি একটা চাবি নিয়ে এল। আমার সঙ্গে ভূতের আলাপ আছে বলে বেশ যেন একটা শ্রদ্ধার ভাব। ফুটোয় চাবি গলাতে গলাতে বললে, "স্যার ভাববেন না, আমি উইদিন মিনিটস দরজা খুলে দিচ্ছি।"

অতই সহজ! বিলিতি তালা, তার আবার ডবল লক। একবার বাঁয়ে ঘুরিয়েছি, একবার ডাইনে। ভূত তো আমি। বসে আছি জানলার গবরেটে ঠ্যাং ঝুলিয়ে। ছেলেটি বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছে। এইবার আমার ভূতের ভয় নয়, তালার ভয়। যদি না খোলে, কোম্পানিকে খবর দিতে হবে। সেখান থেকে কবে আসবে মেকানিক কে জানে! আমার সব কিছু পড়ে আছে ঘরে। পাসপোর্ট, ব্যাগ, পাউন্ড, ডলার।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "মিস্টার, এবার তাহলে কি হবে! খুলবে তো!"

'মাস্টার কি তে খুলল না। আর একটা চাবি আছে গ্র্যান্ডমাস্টার।"

খুব ভরসা পেলুম, "সে তো থাকবেই ভাই। তোমাদের এত বড় হোটেল। কত এমার্জেনসি হবে। তা চাবিটা আনলে হয় না' আমাকে আবার প্রেস-সেন্টারে যেতে হবে।"

"সে চাবি আছে আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে।"

"তিনি কোথায় ভাই?"

"খুঁজে বের করতে হবে।"

আমি ছেলেটিকে আরও একটু আপ করার জন্যে বললুম, "ভাই তোমরা মেটিরিয়েলি অনেক এগিয়েছ এইবার ম্যাটারের সঙ্গে একটু স্পিরিট যোগ করো দেখবে গড হয়ে গেছ।"

ছেলেটি বড় বড় চোখে তাকালো। তারপর আমার ঘরের পাশে আর একটি মাত্র যে ঘর সেই ঘরের দরজায় টোকা মারতে লাগল। ভেতর থেকে কোনও সাড়া শব্দ এল না। 'লতেই দরজাটা খুলে গেল। আমার ঘরের দরজাও দরজা, আর ওই ঘরের দরজাও দরজা। আকাশপাতাল তফাৎ। আমারটা দানব আর ওইটা দেবতা। ঘরে ঢুকে ছেলেটি কি দেখে বেরিয়ে এল।

প্রশ্ন করলুম, "কি দেখে এলে? ওই ঘরের ওপাশের বারান্দা দিয়ে এই ঘরে এসে, ভেতর থেকে দরজা খুলবে? এই রকম কোনও পরিকল্পনা।"

"নো নো, দ্যাটস ইম্‌পসিবল। আমি একটা ফোন করে এলুম।'

"কোথায় ভাই, ফায়ার ব্রিগেড।'

"ফায়ার সার্ভিসে করব কেন?'

' আমাদের দেশে যে কোনও বিদঘুটে কাজে তাই করে যেমন ধরো হাওড়া ব্রিজের মাথার ওপর পাগল উঠেছে, তাকে নামাতে হবে। অথবা বাগবাজারে তিনতলা বাড়ির ছাদে ষাঁড় উঠে গেছে। পাতকুয়ায় মাতাল পড়ে গেছে।"

"আমি চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ফোন করে এলুম।"

আমি আকুলি বিকুলি করে জিজ্ঞেস করলুম, "গ্র্যান্ড মাস্টার পাবে ভাই?"

"লেট মি সি।"

ছেলেটি চলে যেতেই আমার মনে পড়ে গেল পঞ্চতন্ত্রের সেই কৌতূহলী বাঁদরটার গল্প একটা বাঁশ, না একটা কাঠ। একটা কাঠ লম্বালম্বি খানিক চিরে, একটা কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে মিস্ত্রিরা টিফিন করতে গেছে। কোথা থেকে একটা বাঁদর এসে সেইটার ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে গোঁজের কাঠটা ধরে টানাটানি করছে। আমার মতো বিজ্ঞানমনস্ক বাঁদর। হঠাৎ গোঁজটা খুলে গেল আর দুফাঁক কাঠটা ফটাস করে এক হয়ে গেল, আর মাঝখানে আটকে গেল তার ন্যাজ। আমার সেই দশা।

এই তালা ভাঙা যায় কি না জানি না। যদি যায়, তাহলে বিশাল একটা অঙ্কের বিল এসে যাবে আমার নামে। যাক তরুণকুমার ফিরে এল। তার হাতে আর এক ধরনের চাবি। আর একটু কস্তাকস্তি। এক সময় ছেলেটি উজ্জ্বল মুখে তাকাল।

"কি হলো ভাই, হয়েছে?"

"ইয়েস, ইট হ্যাজ ওপেনড।"

"যুগ যুগ জিও। কিন্তু জেনে রাখো, দিস রুমিস ইজ হন্টেড।"

তালা তো খুলল, এখন কে আগে ঢুকবে। এইবার সেই শব্দের কথা মনে পড়ছে। বিদঘুটে একটা শব্দ হয়েছিল। কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন বুঝছি, মারোয়াড়িরা কেন, আপ উঠিয়ে, আপ যাইয়ে কবেন। শুধুই কি সহবত। আগে যেতে ভয় করে। বাংলা প্রবাদ—আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে বাজা হয়।

ছেলেটি চাবিটা খুলে নিয়ে বললে, "একসকিউজ মি। আমি অনেকক্ষণ এসেছি, এইবার যাই, তবে আপনাকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। যে বিষয়ের কথা বলছিলেন, সেই বিষয়ে আমার খুব উৎসাহ।"

"শোনো, আমার কাছে অনেক ভালো ভালো বই আছে, তোমাকে উপহার দোব। তোমার সোল-ফোর্সটাকে একটু জাগাও, দেখবে জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। ভোগের সঙ্গে যোগের যোগাযোগ ঘটাও।"

দু'হাতে ট্রে নিয়ে সেই ছিপছিপে তরুণটি চলে গেল। দরজা খুলে ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকলুম। যা

ছিল, যেমন ছিল সবই ঠিক আছে। টিভি তো বন্ধ, তাহলে শব্দটা কিসের! বিলেতের একটা সুবিধে, সিলিং-ফ্যান বা টেবিল ফ্যানের প্রয়োজন হয় না। ওই শিল্প এদেশে অচল। পাখার শব্দ নয়, টিভির শব্দ নয়। তাহলে কি রে বাবা!

খাটের তলা, ওয়ার্ডরোব সব দেখলুম। বলা যায় না, হিচককের 'সাইকো' ছবির মতো ঘুপ করে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে, হাতে একটা চপার নিয়ে। কুমকুমকে ফোন করলুম। বেজেই গেল। নো রিপ্লাই। আমাকে ফেলে চলে গেছে। যেতেই পারে। ওই যে তখন এই ঘরের ফোন বেজেছিল। ভেবেছে, আমিই চলে গেছি।

যেই মনে হলো, আমি একা। একা একা সেই কত দূরে প্রেস-সেন্টারে যেতে হবে অমনি বিষাদে মনটা ছেয়ে গেল। যে সব মানুষ পৃথিবীতে সত্যিই একা, তাদের কেমন লাগে! কিন্তু, শব্দটা হলো কিসের! হে রহস্য উন্মোচিত হও।

৩৫

জেলখানা থেকে ছাড়া পাবার পর লোকে একটা মুক্তির স্বাদ পেয়ে বলে ওঠে আঃ। আর আমি আমার ঘরে ঢুকে বহুমূল্য বিছানায় ধপাস করে উল্টে পড়ে বললুম, আঃ। কিছুক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে রইলুম। শুয়ে শুয়ে এপাশে, ওপাশে তাকিয়ে খুঁজছি কোথাও একটু ঝুল কি ধুলোর দর্শন মেলে কি না! এ সব জায়গায় ঝুল আর ধুলোই হলো ভগবান, কারণ ঈশ্বরের মতোই। আছেন, কিন্তু দর্শন মেলে না। সাধনা চাই। যে সাধনায় আমাদের দেশ সিদ্ধি লাভ করেছে। কলকাতায়, এই সেদিন দুটি সুরম্য গৃহতলের উদ্বোধন হয়েছে। একটি কেন্দ্রীয়, অন্যটি রাজ্য সরকারের। ইতিমধ্যেই সেখানে ধুলোর স্মৃতিচূর্ণ আর লযাবয়া ঝুলের আলপনা বেশ জমে উঠেছে।

যাক যস্মিন্ দেশে যদাচার। এখন ভাবিয়ে তুলেছে শব্দটা সিঁ ফ্যাস করে এ ঘরেই হয়েছে। কিসের শব্দ! পরে ভাবা যাবে। আপাতত ধরে নি, কোনও একটা জায়গা দিয়ে স্পিরিট লিক করেছে। উঠে পড়লুম খাট থেকে। আমার সঙ্গী সাথীরা আমাকে ফেলে হাওয়া। এইবার একা একা প্রেস সেন্টারে যেতে হবে। বইপত্তর যে ভাবে ছড়ানো আছে সেই ভাবেই থাক। গভীর রাতে আবার বসা যাবে।

হোটেলের সদরে সেই সুঠাম সাহেব। তাঁর টুপির কার্নিসের তলায় জ্বলজ্বলে চোখ। ঠোঁটে ছলছলে হাসি। হাসিকে হাসি দিয়ে ছুঁয়ে নেমে এলুম পথে। পথে দাঁড়িয়ে মনে হলো, বিশাল এই বিজাতীয় শহর আর আমি এক ছোট লোক। হোটেল থেকে প্রেস সেন্টারে যাবার আলাদা একটা ম্যাপ আমাদের হাইকমিশনার অফিস থেকে দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণে আর্মি নেভি স্টোরস ও অন্যান্য দোকান। ওদিকে যাবো না। ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। যেতে হবে উত্তরে। বেশ কিছুটা হাঁটলে ত্রিকোণ একটা জায়গা। বাকিংহাম গেট বাঁ দিকে রেখে। বাকিংহাম প্যালেস ঘুরে সেন্ট জেমস পার্কের সামনে দিয়ে গিয়ে পড়তে হবে মলে। মল থেকে বাঁ দিকে গেছে স্টেবল ইয়ার্ড রোড। শেষ মাথায় ল্যাংকাস্টার হাউস। তারপরই বড় রাস্তা পলমল। ডাইনে বাঁক নিয়ে কিছুটা হাঁটলেই সেন্ট জেমস স্ট্রিট। সেই রাস্তায় ঢুকে বাঁয়ে লিট্ল সেন্ট জেমস স্ট্রিট। এসে গেলুম প্রেস-সেন্টারে। ম্যাপে এলুম। আসলে যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে এল সেই বিখ্যাত কালো ট্যাকসি। হাত তুলতেই অবাক, দাঁড়িয়ে পড়ল। সকালে অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন খুব স্মার্ট। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি, এখানকার ট্যাকসি ড্রাইভাররা ভীষণ স্মার্ট। যেমন সাজপোশাক তেমনই সুপুরুষ। মিটার ফ্ল্যাগ নামাবার ক্রিং শব্দ হলো না। মনে হয় কম্পুটারাইজড। টক টক করে সংখ্যা উঠছে। পেছনের ঝকঝকে আসনে বসে আছি রাজার মতো। তবে যে ভদ্রলোক চালাচ্ছেন তাঁর সাজ পোশাক আর চেহারার সঙ্গে তুলনা করলে আমি হেল্পার। হঠাৎ মনে হলো আমি বিখ্যাত নট ডেভিড গ্যারিক। স্যামুয়েল জনসন আমার গুরু। রয়্যাল থিয়েটারে অভিনয করতে চলেছি। ১৭০০ সালের লন্ডন আমার

দু'পাশ দিয়ে উল্টো দিকে ছুটছে।

ড্রাইভারের পেছনের রেডিও যন্ত্রে উড়ে এল কথা। গজর গজর অজস্র শব্দ। মুখটা স্পিকারের কাছে এনে ড্রাইভার সমানে উত্তর দিয়ে গেলেন। এক সময় যন্ত্র স্তব্ধ হলো। ড্রাইভার আমাকে বললেন, 'চার পাউন্ড ফাইন হয়ে গেল।'

'কেন?'

'তোমাকে আমি রং এন্ড থেকে পিক-আপ করেছি।'

ব্যাপারটা আমার কাছে দুর্বোধ্য। রাইট এন্ড, রং এন্ড, কোন্‌টা কি, আমার জানার প্রয়োজন নেই। আর চার পাউন্ড ফাইন হলে আমারই বা কি করার আছে, তাও বুঝলুম না। এইটুকুই জানলুম, আইন খুব কড়া, যে কারণে রাস্তায় ঘাটে গাড়ি চলে ছবির মতো। আমাদের দেশের মতো, এলোমেলো জলতরঙ্গ নয়। দেখতে দেখতে আমার গন্তব্যস্থল এসে গেল। মিটার আর একস্ট্রা নিয়ে চার নব্বই হয়েছিল। পাঁচ পাউন্ডের একটা নোট দিয়ে নেমে গেলুম। ভাগ্য ভালো। আকাশ পরিষ্কার।

নেমে দু'কদম এগোতে না এগোতেই একজনকে দেখে ভয়ে থমকে গেলুম। আচড়ে কামড়ে দেবে না তো! সময়টা আবার সন্ধ্যে সন্ধ্যে। শাস্ত্রমতে কালবেলা। উল্টো দিক থেকে যে আসছে, শরীরের গঠন দেখে মনে হচ্ছে, এক সময় সে মেয়ে ছিল। রমণীয় রমণী। তারপর সে বোধহয় কাউন্ট ড্রাকুলার খপ্পরে পড়েছিল। আঁচড় কামড় খেয়েছে। চুল চারপাশ থেকে কামানো। যে কয়েক গাছা আছে মাথার মাঝখানে, বেঁটে বেঁটে হাইভোল্টেজ ইলেকট্রিক তারের মতো অজস্র অ্যান্টেনার মতো খাড়াখাড়া। চলার তালে তালে স্প্রিং পাকিয়ে নাচছে। চোখের চারপাশে গোলাপী রঙের বৃত্ত। এক গালে লালের স্প্রে, আর এক গালে ম্যাজেন্টা। পাতলা ছিপছিপে শরীর। চলার ছন্দে দেহের জোড়া যৌবন দুলে দুলে উঠছে। আমাকে অতিক্রম করে চলে যাবার সময় বলে ফেললুম, চাপার চেষ্টা করেও চাপতে পারলুম না, 'কে এই সর্বনাশ করলে মা?' বিস্ময় শব্দটাকে কেউ যদি রঙ তুলি দিয়ে আঁকতে বলে, তাহলে এই চেহারাই হবে। মানুষ যদি বহুরূপী হতো তাহলে বিস্মিত হলে ভেতর থেকে এই রকমই একটা চেহারা ঠেলে বেরিয়ে আসত। রমণী তার বিস্ময়কর প্রভাব ছড়াতে ছড়াতে চলে গেলেন, আর তখনই মনে হলো, এঁদেরই বলা হয়, 'পাঙ্ক'। এ একটা দল, যাদের বলা হয় 'রেবেল কাল্ট'। শহরের বঞ্চিত যুবক যুবতীরা ১৯৭৬ থেকে ৭৮ এই সময় সীমার মধ্যে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শ্বেতাঙ্গ সমাজের বাগী অংশ। বিদ্রোহের মাধ্যম হলো সংগীত। কি রকম সংগীত! আদিম সংগীত—primitive rock, but with more cacophony, obscenities and angry themes এঁদের আর এক নাম, 'সেক্স পিস্তল'। The Sex Pistols became stars but shocked society আমিও সেই 'শক' খেয়ে প্রেস সেন্টারে ঢুকে পড়লুম। ভেতরটা ফুল অফ আফ্রিকা।

বিখ্যাত আফ্রিকানিস্ট বেসিল ডেভিডস লিখছেন, 'If the history of Africa seems a jungle, it is more likely a jungle of ignorance' রোলান্ড অলিভার, আর এক আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ লিখছেন, ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে ইউরোপের মানুষ সারা পৃথিবীতে উপচে পড়ল। যে সব জায়গায় তারা কলোনি স্থাপন করতে গেল, সেই সব জায়গার আদিবাসীরা ইওরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের পদানত হলো। আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা আর অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ছিল সবচেয়ে অপ্রস্তুত ফলে সহজেই তাদের হতে হলো নিজভূমে পরবাসী। এই দুটি দেশে বহিরাগত শ্বেতাঙ্গরা আদিবাসিন্দাদের চেয়ে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে দুই কি তিন শতকের মধ্যে তাদের প্রায় লোপাট করে দিল। ওই দুটি দেশের প্রকৃত মানুষরা এখন টিংটিং করে জ্বলছে গুটিকয় প্রদীপের মতো। তারা এখন নৃতত্ত্বের প্রদর্শনী।

ওই একই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে আফ্রিকা কিন্তু অত সহজে পরাভূত হয় নি। বরং মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে শতাব্দীর ঝাপটার সামনে। একমাত্র সর্ব দক্ষিণের এক চিলতে অঞ্চল, যেখানে চাষবাসের কোনও সুবিধে ছিল না, সেখানে বসবাস করত একদল ব্যাধ, একদল খাদ্যশিকারী। ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকরা কেবল মাত্র এই অঞ্চলটুকুতেই দাঁত ফোটাতে পেরেছিল। অন্যত্র আফ্রিকানরাই ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ। স্বশাসিত অঞ্চলেই হচ্ছিল তাদের জীবনের পূর্ণবিকাশ। বিদেশী প্রভুদের কাছে সাময়িক বশ্যতা স্বীকার করলেও বিংশ শতকের বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রতিটি অঞ্চল তাদের সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়। উনবিংশ শতকের শেষপাদে আর বিশ শতকের প্রথম দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও,

শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা কোনও সময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে নি। ইনকা পেরু, কি মায়া মেকসিকোর মতো সংস্কৃতিকে শেষ করে দিতে পারে নি।

দুর্ভাগ্য দক্ষিণ আফ্রিকার। ১৭৯৫ সালে এসে বসল ইংরেজ অকারণে। গ্ল্যাডস্টোন চান নি, ডিসরেলি চান নি। ইংরেজ এসেছিল ফরাসীদের ভারত বাণিজ্য পথের ঠেক খাওয়ার বন্দরটিকে গ্রাস করতে। নেপোলিয়ান পরাজিত হলেন। ফ্রানসের বিশ্ব-প্রতাপ স্তিমিত হলো, তবু ইংরেজ সরল না। বরং ওলন্দাজ, যারা সাহস করে, কষ্ট করে এখানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেই আফরিকানারদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল ইংরেজদের কড়া আইন। যে আইন একটু আগে আমার ট্যাক্সি ড্রাইভারকে চার পাউন্ড ফাইন করেছে। দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করে ইংরেজ আফরিকানারদের সবচেয়ে বড় অসুবিধে করেছিল।

১৮৩০ সালে আফরিকানাররা ইংরেজ আইনের হাত এড়াতে যা করেছিল, তা ইতিহাস। গ্রেট ট্রেক। আগেই বলেছি। অনেকটা এ কালের লং মার্চের মতো। 'ভ্যালি ফোর্জ।' ছ হাজারের মতো আফরিকানার 'ব্রিটিশ সেটলমেন্ট' ছেড়ে পদযাত্রা করল। পেছনে গরুর গাড়ির দীর্ঘ সারি। সেই গাড়িতে বোঝাই তাদের মালপত্র। স্ত্রী পুত্র পরিবার। এই ভাবে ডাল নদীর ধারে ধারে, শত শত মাইল পথ পেরিয়ে তারা যেখানে এল, সে এক নিরালা, নির্বান্ধব, ভীষণ বনাঞ্চল।

বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই লড়তে হলো প্রথম লড়াই। হিংস্র বান্টুরা নেমে আসছে ওপর থেকে নিচে। উত্তর থেকে দক্ষিণে। নতুন জমির খোঁজে। এক যুগ ধরে এই সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। তাদের বসতির সীমান্তে এই বান্টুরা বারে বারে এসে হানা দিয়েছে। নতুন ভূখণ্ডের খোঁজে দক্ষিণে তারা আসবেই। তাদেরও জীবনমরণ সমস্যা। ফলে আফরিকানারদের জীবনে শান্তি ছিল না স্বস্তি ছিল না। তলায় ইংরেজ মাথার ওপর মারমুখী বান্টু, মাঝখানে সর্বদিক থেকে বিচ্ছিন্ন ছ হাজার মানুষের ছোট্ট একটি উপনিবেশ।

চারপাশে স্থলভাগ। প্রতিকূলতার বেষ্টনী। মাঝখানে ছোট্ট দুটি রাজ্য, 'ট্রান্সভাল' আর 'অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট'। হাজার ছয়েক আফরিকানার। দেশও তাদের ভুলে গেল, তারাও ভুলে গেল মাতৃভূমি। সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ওলন্দাজ বলে আর চেনার উপায় রইল না। এমন কি ভাষাও বদলে গেল। এখন আফরিকানারদের নিজস্ব ভাষা তৈরি হয়েছে। নিজস্ব ভূমি। ইওরোপে নিজেদের দেশে ফিরে যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সেখানে কেউ নেই কিছুই নেই। আপনজন নেই। পূর্বপুরুষদের কোনও স্মৃতি নেই। বাইরের পৃথিবী তাদের নিভৃত, বিচ্ছিন্ন সংগ্রামের কোনও খবরই রাখত না। সভ্যতার যাবতীয় উন্মেষ পাশ দিয়ে চলে গেল। শিল্পবিপ্লব এদের স্পর্শই করল না।

তারপর ১৮৬৭ সালে অরেঞ্জ রিভারের কাছে কে একজন কুড়িয়ে পেল একখণ্ড হীরে। ডায়মণ্ড দি ইনক্রেডিবল ক্রিস্ট্যাল। কেউ বলেন ১৮৬৭, কেউ বলেন ১৮৬৬। ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম। হোপটাউনে একদল শিশু নুড়ি নিয়ে খেলছিল একটা খামারে। হঠাৎ ঝলসে উঠল একটি পাথর। সাধারণের চেয়ে অসাধারণ। অভিজ্ঞরা ছুটে এলেন। হইচই পড়ে গেল। শিশুরা খেলতে খেলতে হীরে কুড়িয়ে পেয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কৃত সেই প্রথম হীরকখণ্ডটির নাম পরে রাখা হলো, 'ইউরেকা'। সেই সময়কার ব্রিটিশ কলোনিয়্যাল সেক্রেটারী বললেন, 'জেন্টলমেন, দিস ইজ দি রক অন হুইচ দি ফিউচার সাকসেস অফ সাউথ আফ্রিকা উইল বি বিল্ট।

ঠিক তাই। ভাগ্যান্বেষীরা ছুটে এল। 'গোল্ডরাশের' মতো 'ডায়মণ্ডরাশ'। বিশাল এলাকা খোঁড়াখুঁড়ির জন্যে ভাগ হলো এই ভাবে। প্রত্যেকে ৩১ বর্গফুট পরিমাণ জমি পাবে। অর্থাৎ একজন লোক একটি কোদাল, একটি বালতি নিয়ে কোনও রকম নড়াচড়া করার মতো এক টুকরো জমি। ওই সব একক অনুসন্ধানকারীরা প্রত্যেকে কতটা লাভবান হতেন বলা শক্ত। ফলে টুকরোকে জুড়ে বড় ধরনের একটা কিছু করার প্রয়োজনীয়তা সকলে অনুভব করলেন। তখন দু'জন প্রবাদ-পুরুষ এগিয়ে এলেন। একজন মিতবাক সিসিল রোডস। অন্যজন একেবারে বিপরীত স্বভাবের, বারলে বারনাতো। দুজনেই চাইলেন তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। প্রত্যেকেই ছোট্ট ছোট মালিকানা স্বত্বসমূহ কিনতে শুরু করলেন। জোর প্রতিযোগিতা। শেষে রোডসের কাছে বারনাতো হেরে গেলেন। পেছিয়ে পড়লেন। তারপর রোডস বারনাতোকে কিনে নিলেন। সেইটাই ছিল রোডসের সবচেয়ে বড় অঙ্কের চেক। ৫৩,৩৮,৬৫০

পাউন্ড। অর্থাৎ একালের ডলারে ১৮,৬০,০০০০০। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো অঙ্ক। রোডস তাঁর হীরে কোম্পানীর নাম রাখলেন De Beers Consolidated Mines Ltd. কেন এই নাম! সিসিল রোডস খুব বড় মাপের মানুষ ছিলেন। ইতিহাস বলছে, তিনি ছিলেন, ইংলিশ এম্পায়ার বিল্ডার। ১৮৫৩ সালে বিশপস স্টর্টফোর্ড জন্মেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারে। স্বাস্থ্যও পেলেন। হীরেও পেলেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেন। তখনকার কেপ কলোনির প্রধানমন্ত্রী হলেন। জিম্বাবোয়ে ও জাম্বিয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। বাইরের ছাত্রদের বৃত্তি দেবার জন্যে অক্সফোর্ডে প্রচুর অর্থ দান করে গেছেন।

ডি বীয়র নাম রাখার কারণ, ডি বীয়র ভ্রাতৃদ্বয়ই প্রথম দুটি খনির অধিকারী ছিলেন। পৃথিবীর হীরের ব্যবসায় এই প্রতিষ্ঠানটি এখন 'সিন্ডিকেট' নামে পরিচিত। ১৮৬৭ সালে হীরে পাওয়ার মুহূর্তে ব্রিটিশ কলোনিয়্যাল সেক্রেটারি বলেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ হলো এই পাথর। খাঁটি সত্য! পরের শতাব্দীতে, অর্থাৎ আজ পর্যন্ত যত হীরে উত্তোলিত হয়েছে, তার পরিমাণ 'সিন্ডিকেট'-এর খাতায় লেখা আছে—এ কোয়ার্টার অফ এ বিলিয়ান ক্যারাটস।

হীরে সম্পর্কে বলা হয়, The four c's determine worth চারটে সি-র প্রথমটা হলো ক্যারাট। প্রাচীন মাপ। একটি 'ক্যারব' বীজ-এর যা ওজন। এখন ক্যারাট হলো একের পাঁচ গ্রাম। পরের তিনটে সি হলো, কাট, ক্ল্যারিটি, কলার।

হীরে পাওয়া গেল আফরিকানারদের এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশরা বললে, ট্রানসভাল আর অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ব্রিটিশ এলাকা। আর সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে ব্রিটিশ মাইনাররা ছুটে এল হীরের খোঁজে। আর কপাল যখন ভালো হয়, দু'দশক পরেই ট্রানসভালের মাটি থেকে পাওয়া গেল সোনা।

এই সোনা আর হীরেই হলো যত অশান্তির উৎস। হীরে পর্যন্ত সহ্য হয়েছিল, সোনাতেই সব তালগোল পাকিয়ে গেল। উইটওয়াটার স্যান্ড এর বিশাল স্বর্ণসম্পদ ট্রানসভালের চেহারা পাল্টে দিল। সবই হলো ব্রিটিশ পুঁজি আর শ্রমের কল্যাণে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে জোহানেসবার্গ হয়ে উঠল বিশাল এক শহর। নেটিভ বোয়াররা ইংরেজদের বলত, 'উইটল্যান্ডারস' বা 'আউটল্যান্ডার'। জনসংখ্যায় বোয়ারদের সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও ট্র্যানসভাল সরকার তাদের রাজনৈতিক অধিকার দিতে অস্বীকার করল। রাজস্বে তারা মোটা টাকার ট্যাক্স দেয় অথচ রাজনৈতিক অধিকার নেই, এ কেমন কথা! পল ক্রুগার তখন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। সেই ক্রুগার, যিনি গ্রেট ট্রেক পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর বয়স তখন সত্তর পেরিয়ে গেছে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর রিপাবলিকের চরিত্র ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে।

কেপ কলোনির প্রধানমন্ত্রী সিসিল রোডসের সঙ্গে, কেপ কলোনির ওলন্দাজদের সম্পর্ক ভালোই ছিল। তারা রোডসকে সমর্থন করত। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের সঙ্গে কেপ কলোনির সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। ট্রানসভাল হলো ফ্রন্টিয়ার। সেখানে বসবাস করত ভীষণপ্রকৃতির ওলন্দাজ কৃষক সম্প্রদায়। এই বোয়াররাও চেয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যাংলোবোয়ার ফেডারেশানের সম্ভাবনাও উঁকিঝুঁকি মারছিল। সব স্বপ্ন চুরমার করে দিলে সোনালী ধাতু, সোনা।

ক্রুগার ছিলেন আপোসহীন, স্বাধীনচেতা বোয়ারদের দিকে। ইংরেজদের কিছু দেবার পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে চার্চিলের মন্তব্য : He headed the recalcitrant Dutch unwilling to make common cause with the British and opposed to the advance of industry though ready to feed on its profits.

বিশাল স্বর্ণখনি আন্তর্জাতিক উদ্যোগে বিশাল আকার ধারণ করছে। ক্রুগার ভীষণ আতঙ্কিত হলেন। তিনি যাদের দলনেতা তারা হলো চাষী। দিনে চাষবাস করে আর রাতে পারিবারিক পরিবেশে বাইবেল পড়ে। আধুনিক আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রয়াসের প্রতি এই আবদ্ধ জনসমষ্টির উদার দৃষ্টিভঙ্গি না থাকাই স্বাভাবিক। ক্রুগারের ভীতি আরও বাড়িয়ে দিলেন সিসিল রোডস। তাঁর ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানি ইতিমধ্যেই উত্তরে ঠেলা মেরে সব জায়গাজমি দখল করে নিয়েছে। পরে যার নাম হবে রোডেসিয়া। রোডস ধীরে ধীরে পশ্চিমে বেচুয়ানাল্যান্ডের দিকেও এগোচ্ছেন। র‍্যান্ডে, রোডস বিরাট টাকা ঢেলেছেন। তিনি ইউনাইটেড সাউথ আফ্রিকার স্বপ্ন দেখছেন। কেপ থেকে কায়রো রেল লাইন বসাবেন। ইচ্ছা

পুরো রেলপথটাই যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সীমার মধ্যে থাকে। 'উইটল্যান্ডার' ইংরেজদের অসন্তোষ দিনে দিনে বাড়তে লাগল। সংখ্যায় আফ্রিকানারদের সমান সমান অথচ রাজনীতিতে কোনও ভূমিকা নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকেও বঞ্চিত। হেভি ট্যাকস। ফল ভোগী ওলন্দাজ প্রশাসন। বারুদ ক্রমশই উত্তপ্ত হচ্ছে।

৩৬

আগ্নেয়গিরি নয় আফ্রিকা। বারুদ, পারস্পরিক অসন্তোষের বারুদ ক্রমশই উত্তপ্ত হচ্ছে। ১৮৯৫ সাল। ব্রিটিশ কলোনিয়্যাল সেক্রেটারি চেম্বারলেন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত। চেম্বারলেন জানেন না অন্যদিকে সিসিল রোডস আর এক কান্ড বাধাতে চলেছেন। পরিকল্পনা পাকা। জোহানেসবার্গে হবে ব্রিটিশ অভ্যুত্থান আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সভাল আক্রমণ করবে কোম্পানীর সামরিক বাহিনী। এই আক্রমণ পরিচালনা করবেন রোডেসিয়ার অ্যাডমিনিসট্রেটার, ডক্টর লিঅ্যান্ডার স্টার জেমসন। সে যুগের কমিউনিকেসান সিস্টেম। চেম্বারলেন জানেন না রোডস কি করবেন। জেমসন জানেন না, শেষ মুহূর্তে রোডস জোহানেসবার্গে ব্রিটিশ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা বাতিল করে দেবেন। সে এমন এক কনসার্ট, তিন শিল্পী তিন সুরে গান গাইছেন। জেমসন জানেন ট্রান্সভাল আক্রমণের দায়িত্ব তাঁর। রোডস তাঁকে কিছুই জানালেন না। ২৯ ডিসেম্বর জেমসন তাঁর কোম্পানির পাঁচশো সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ট্রান্সভালে। চেম্বারলেন পরে ভীষণ রেগে গিয়ে এই আক্রমণকে বলেছিলেন— a disgraceful exhibition of filibustering কারণ জেমসন গোহারান হেরে ২ জানুয়ারি ডুবনকাপ বোয়ারদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। শেষে ইংরেজরাই বলতে বাধ্য হলেন, বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। এই পরাজয়ের পরিণতি হলো সুদূরপ্রসারী। দক্ষিণ আফ্রিকার এতকালের শান্ত আবহাওয়া চিরতরে ঘুলিয়ে গেল। জাতি ও বর্ণবৈষম্যের সূত্রপাত। আমি বোয়ার, তুমি ব্রিটিশ। আমি ব্রিটিশ, তুমি বোয়ার। আমি সাদা, তুমি কালো। নীলকণ্ঠের গলার বিষ ছড়িয়ে গেল সারা দেহে। ১৮৯৬ সাল হলো দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের এক টার্নিং পয়েন্ট। সুস্থ, সুন্দর একটা পরিবেশ মোড় নিল উগ্রতার দিকে। ব্যাপক হানাহানির দিকে। কেপটাউনের ওলন্দাজদের পূর্ণ সমর্থন ছিল ট্রান্সভালের বোয়ারদের প্রতি। দু'প্রান্তের দুটি হাত মিলে গেল। অসহ্য ইংরেজদের মনে হতে লাগল আরও অসহ্য। ছিটেফোঁটা ভালবাসাও আর রইল না। ইংরেজদের অবস্থা কোণঠাসা। সর্বত্র বিদ্রোহের সুর। প্রাইম মিনিস্টার রোডসের আসন টলে গেল। তিনি পদত্যাগ করলেন।

এই পদত্যাগে বোয়ারদের সন্দেহ ঘুচলো না। সিসিল রোডস ইংলান্ডে অসম্ভব জনপ্রিয়। ডুবনকাপে জেমসনের পরাজয়, জোহানেসবার্গে রোডসের পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা, পদত্যাগ, কোনও কিছুই স্বদেশে রোডসের সুনামের কোনও ক্ষতি করতে পারল না। ফলে বোয়ারদের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। ধারণা হলো ইংরেজ আরও গভীর কোনও চক্রান্তের জাল বুনছে। বোয়ারদের ছোট্ট রিপাবলিক বুঝি আর থাকে না। যে কোনও দিন ইংরেজ আরও বেশি শক্তি নিয়ে গ্রাস করবে। দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসছে ধীরে। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের মানুষ কট্টর, সন্দেহবাদী, রক্ষণশীল ক্রুগারের হাতে ভাগ্য সমর্পণ করলেন। ট্রান্সভালে ক্রুগারের দাপট বাড়ল। হাত শক্ত হলো। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্ষমতা বাড়ল। আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে প্রচুর সমরসম্ভার কেনা হলো।

পরের তিনটে বছর কাটল দু'পক্ষের ব্যর্থ আলাপ আলোচনায়। চেম্বারলেন একগুঁয়ে। তাঁর চেয়েও অনমনীয় বোয়ার নেতা ক্রুগার। সমঝোতার পাঞ্জার লড়াইয়ে কে হারে কে জেতে। ইতিমধ্যে ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার হাই কমিশনার হলেন একজন কৃতবিদ্য ইংরেজ রাজকর্মচারী, স্যার আলফ্রেড মিলনার। প্রশাসক হিসেবে তাঁর কোনও তুলনা ছিল না, কিন্তু কূটনীতিক হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পদে বহাল হবার মাস কয়েক পরেই তিনি চেম্বারলেনকে চিঠিতে জানালেন—There is no ultimat way out of the political troubles of South Africa except reform in the Transvaal

are worse than ever দুটো পথ, সংস্কার অথবা যুদ্ধ। সংস্কারের আশা ঘুচে গেছে। সংস্কারের পথে শান্তি, আগে হলে হয় তো সম্ভব হতো। এখন খোলা আছে একটি মাত্র পথ—যুদ্ধ। হাল্লার রাজা, যুদ্ধ যুদ্ধ। চেম্বারলেন ছিলেন ঘোরতর যুদ্ধবিরোধী। চেম্বারলেনের নাম, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নানা প্রসঙ্গে বহুবার শুনেছি। কে এই চেম্বারলেন।'

আমরা যে চেম্বারলেনের নাম শুনেছি, তিনি নেভিল চেম্বারলেন। ১৯৩৭ থেকে ৪০ বৃটেনের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন। ১৯৩৮ সালে হিটলারের সঙ্গে মিউনিখ চুক্তিতে তাঁর একটা বড় ভূমিকা ছিল। হিটলারের তাৎক্ষণিক সন্তোষ বিধান করেছিলেন। আফ্রিকার চেম্বারলেন জোসেফ। নেভিলের পিতা। বার্মিংহামের পৌর প্রশাসন দিয়ে শুরু। গ্লাডস্টোনের সময় ছিলেন 'লিবারেল'। পরে মত বদলে হয়েছিলেন কনজারভেটিভ। আয়ারল্যান্ডে 'হোমরুলের' ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন। গ্লাডস্টোন জোসেফ চেম্বারলনকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর দ্বিতীয়বারের প্রধান মন্ত্রীত্বকালে এই ধরনের কিছু লিবারেল সদস্যদের জন্যে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। নবাগত র‍্যাডিক্যাল জোসেফের মতো বন্ধুদের চেয়ে হুইগসদের সঙ্গে কাজ করা, তাঁর কাছে অনেক সহজ মনে হতো। গ্ল্যাডস্টোন তাঁর নতুন ক্যাবিনেটে, জোসেফ চেম্বারলেনকে বোর্ড অফ ট্রেডের প্রেসিডেন্ট করে মহা ভুল করেছিলেন। গ্ল্যাডস্টোনকে বলা হতো, গ্র্যান্ড ওলড ম্যান অফ ইংল্যান্ড। বয়স ৭১। প্রখর ব্যক্তিত্ব। নিরলস কর্মী। বিশাল স্বপ্ন। রিফর্মিস্ট। অনেকটা আমাদের বিধান রায় অথবা জ্যোতি বসুর মতো। মন্ত্রীসভায় একা একশো। মাথা উঁচু করে ঝড় ঝাপ্টা সামলাচ্ছেন, When he was away from cabinet, it was as though he had left us mice without the cat ইঁদুরগুলো পড়ে আছে বেড়ালটা নেই।

সেই ১৮৮০ সাল থেকে ইংরেজদের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা হলো 'সাউথ আফ্রিকান পাজল।' গ্ল্যাডস্টোন তিনটি সমস্যায় জেরবার হয়ে গিয়েছিলেন, সুয়েজ, সাউথ আফ্রিকা আর আয়ারল্যান্ড। লিবারালরা সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী। অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট। কিন্তু তাঁদের এমনই বরাত যখনই টোরিদের হটিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন তখনই টোরিদের পাপ ঘাড়ে চেপে বসেছে। এমন সব কাজ করতে হচ্ছে যা তাঁদের অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট নীতির বিরোধী। ১৮৮০ র সাউথ আফ্রিকায় সেই একই ব্যাপার। ট্রানসভালে বোয়ারদের ছোট্ট রিপাবলিক অনেক আগে থেকেই হাজারটা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। প্রথমত, অর্থাভাব। দ্বিতীয়ত, এলোমেলো প্রশাসন। তৃতীয়, পূর্ব সীমান্তে জুলু যোদ্ধাদের লাগাতার হামলা। ডিজরেইলির কনজারভেটিভ সরকার এই ক্ষুদ্র রিপাবলিকটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্যে অধিগ্রহণ করেছিলেন। তখন কোনও বাদ প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনি। ডিজরেইলির বিশাল একটা স্বপ্ন ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত শ্বেতাঙ্গদের এক করে ক্যানাডার ছাঁচে স্বশাসিত কনফেডারেশান গড়ে তুলবেন। সেই মুহূর্তে পারেন নি কারণ তখনও সময় হয়নি। সময় যত এগলো পরিস্থিতি ক্রমশই ঘোরালো হতে লাগল। বোয়াররা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির সুযোগ খুঁজতে লাগল। কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশ নীতি তারা পছন্দ করে না বড় বেশি রিফাইনড। তারা দাসপ্রথা তুলে দিতে চায়। ইংরেজ লিবারালদের সম্পর্কে গ্ল্যাডস্টোন নিজেই বলেছেন natural leaders of the Liberal cause were a small leisured, cultured aristocracy বোয়াররা অপেক্ষায়, অপেক্ষায় রইল সেই ১৮৯৭ সালে ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্র জুলুদের মারতে মারতে ঠান্ডা করে দিল, যখন তারা দেখলে কাঁটা তোলা হয়ে গেছে তখনই ইংরেজ শাসনের কাঁটাটিকে তুলে ফেলার জন্যে তৎপর হলো।

ডিজরেইলির পর গ্ল্যাডস্টোনের লিবারাল সরকার ক্ষমতায় আসার পর বোয়ার নেতাদের ধারণা হয়েছিল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট নীতির পরিপোষক গ্ল্যাডস্টোন তাঁদের স্বাধীনতা দেবেন। ট্রানসভাল যখন ব্রিটিশ অধিকারে আনা হয়েছিল, গ্ল্যাডস্টোন সমর্থন করেননি। নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরই দলের বেশ কিছু ক্ষমতাশালী সভ্য বোয়ারদের চেয়ে আফ্রিকার আদিবাসীদেরই বেশি পছন্দ করতেন। কিন্তু বৃদ্ধ গ্ল্যাডস্টোন, তাঁর বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন, 'সাউথ আফ্রিকান পাজেল'-এর একমাত্র সমাধান ফেডারেশন। চাপ সত্ত্বেও হঠাৎ কোনও নীতির পরিবর্তন তিনি করলেন না।

আর ঠিক তখন ঘটে গেল দুঃখজনক ঘটনা। ১৮৮০ র শেষে বোয়াররা একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আর বোয়ারদের ক্ষমতা না বুঝেই ক্ষুদ্র এক ব্রিটিশ বাহিনী গেল বিদ্রোহীদের ঠান্ডা করতে। মাজুবা পাহাড়ে বোয়াররা তাদের যাকে বলে কচুকাটা, সেই কচুকাটা করে ছেড়ে দিল। ইংরেজের

অপমান। রাজার জাতকে মেরে শেষ করে দিলে একদল চাষা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজের বিশাল বাহিনী মজুত। দাবি উঠল বোয়ারদের শেষ করা হোক। যেমন ডায়ার করেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে। যেমন করা হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে। গ্ল্যাডস্টোন তাঁর নীতিতে অনড়। না, যা করেছে করেছে। আমরা বদলা নেব না। বরং মাজুবার দুঃখজনক ঘটনার আগে আলাপ আলোচনায় বসার চেষ্টা চলছিল সেই পথেই চেষ্টা হবে শান্তি ফিরিয়ে আনার। ফলে ১৮৮১ সালে বসল 'প্রিটোরিয়া কনভেনশান'। কনভেনশানে গৃহীত নীতিকে অদলবদল করে ১৮৮৪ সালে ট্রানসভালকে স্বাধীনতা দেওয়া হলো। এই উদার নীতির প্রয়োগে ট্রানসভালে বোয়ার-শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হলো।

কিন্তু। সব ব্যাপারেই একটা কিন্তু থাকে। সেই কিন্তু হলো সোনা। বোয়ার রিপাবলিকের একেবারে মধ্যস্থলে পাওয়া গেল বিশাল এক সোনার খনি। উইটওয়াটারস্যান্ডের র‍্যান্ডে। কত সোনা যে আছে সেখানে। প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে স্রষ্টা আফ্রিকাকে একেবারে ভরে দিয়েছেন। পৃথিবীতে এখন যত সোনা উৎপন্ন হয় তার একের চার ভাগ ওঠে এই র‍্যান্ড গোল্ড মাইন থেকে। হঠাৎ যেন ভোজবাজি হয়ে গেল। যেখানে ছিল সবুজের সংসার, চাষবাষ, ছোট ঘর, ছোট আশা, সেখানে হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল আন্তর্জাতিক শহর। র‍্যান্ড। কোটি কোটি টাকার কারবার। আর ঠিক এই সময় হীরক-মানব সিসিল রোডস কেপটাউনে রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছেন। গ্ল্যাডস্টোনের এক স্বপ্ন, রোডসের আর এক স্বপ্ন। রোডস চান সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা ইংরেজের কবজায় এনে, নিটোল একটি ডমিনিয়ান। চার্চিল রোডস সম্পর্কে বলেছিলেন, endowed by nature with the energy that often marks dreams come true.

সাউথ আফ্রিকার ব্যাপারটা গ্ল্যাডস্টোনের হাত থেকে চলে গেল রোডসের হাতে। যেমন আয়ারল্যান্ড। জমিদার, মজুতদার, শিল্পপতি, দেশ তো এঁরাই শাসন করেন। নির্ধারণ করেন নীতি। হাউস অফ লর্ডসের টোরি নেতা সলিসবেরি গ্ল্যাডস্টোন সম্পর্কে বলেছিলেন, Gladstones exhortation to unity was an exhortation to hypocrisy.

১৮৮০ র মাজুবা পাহাড়ের ঘটনার প্রতিশোধে ১৮৯৫ সালে ট্রানসভাল আক্রমণ। তার পরিণতিও দুর্ভাগ্যজনক। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। কোথায় স্বাধীনতা! কোথায় ক্যানেডিয়ান ধাঁচের কনফেডারেশন। কোথায় শান্তি! শান্তি-পথের সন্ধানে এলোমেলো ছোটোছুটি। চেম্বারলেন ক্রুগারে ঠোকাঠুকি। ক্ষীণ আশা, চাপে পড়ে ক্রুগার হয়তো যুদ্ধের পথ ছেড়ে, যুক্তির পথে, চুক্তির পথে আসবেন। মিলনার, রোডস, চেম্বারলেন ক্রুগারকে বুঝতে ভুল করেছিলেন।

এপ্রিল ১৮৯৯, ঘটনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ২০ হাজার উইটল্যাণ্ডারে সই সহ একটি দরখাস্ত ডাউনিং স্ট্রিটে এসে হাজির। পেছন পেছন এল মিলনারের নোট। 'হাজার হাজার ইংরেজ প্রজা চিরকালের জন্যে ক্রীতদাস হয়ে থাকবে? দৃশ্যটা কি খুব গৌরবের! দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজের এই হীন অবস্থা মহাবানীর দুনিয়ায় ইংরেজ জাতি সম্পর্কে কি ধারণা তৈরি করছে! কুইনস ডমিনিয়ানে ইংরেজের একটা অন্যরকমের দাপট আছে। অহঙ্কার আছে। ইংরেজ সরকারের বদনাম হয়ে যাচ্ছে।'' দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের আলোচনা শুরু হলো। পাঁচ বছরের ওপর বসবাসকারী প্রত্যেক ইংরেজ নাগরিকের ভোটাধিকার চাই। ট্রানসভাল সরকারে তারা তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে চায়। অধিকারের দাবিতে ট্রানসভালের ইংরেজরা উত্তাল। জুন মাসে ব্লোয়েমফনটেইনে ক্রুগার আর মিলনারের বৈঠক ব্যর্থ হলো। বৈঠক শেষে মিলনারের ধারণা হলো দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাচ ইউনাইটেড স্টেটস স্থাপনে ক্রুগার বদ্ধপরিকর। কোনওভাবেই সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে টলানো যাবে না। আর ক্রুগারের ধারণা হলো, তাদের সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা হরণ করার জন্যে ইংরেজ একেবারে মুখিয়ে আছে। তিনি যখন মিলনারকে বলছেন, It is our country you want, তখন তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। চেম্বারলেন উভয়পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন কিছুকাল। টু লেট। উভয় পক্ষই এগিয়ে পড়েছেন যুদ্ধের পথে। সমাধান খুঁজছেন যুদ্ধের মাধ্যমে। অক্টোবর ৯। বোয়াররা একটা 'আলটিমেটাম' পাঠালেন ব্রিটিশ ক্যাম্পে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ ফোর্স তখনও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তবু এই আলটিমেটাম পেয়ে তিন দিন পরে ব্রিটিশ সৈন্য এগিয়ে গেল বর্ডারের দিকে।

ব্রিটিশ সৈন্য বর্ডারের দিকে এগোচ্ছে আর এদিকে ল্যাঙ্কাস্টার হাউসে আমরা এগোচ্ছি। সামনের দিকে। এবারের কমানওয়েলথ মিনিতে ভারতীয়দের দাপটই বেশি দেখছি; কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ইমেজ। কথায় আছে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। দেশে হাজারটা দল, হাজার রকমের ইন্টারেস্ট রাজীবকে আসনচ্যুত করতে চাইছে। দেশে আমাদের রাজনীতির চেহারা হয়েছে আমেরিকান ফুটবলের মতো। 'পাওয়ার গেম'। বিদেশে রাজীবের সাংঘাতিক ইমেজ। সুদর্শন যুবক। চটপট কথা বলেন। সে কথায় হিউমার থাকে। স্যাটায়ার থাকে। মুখে থাকে সারকাস্টিক স্টাইল। প্রেস কনফারেন্সে রাজীব অদ্বিতীয়। ল্যাঙ্কাস্টার হাউসের বিশাল নাচঘরে আমরা সব সময় প্রথম সারিতে স্থান পাচ্ছি। আমাদের ফটোগ্রাফার, টিভি, রেডিও সব সময় 'ভান্টেজ পোজিশানে'। বিবিসিরও খুব তৎপরতা। আজ সকালের প্রচারে নিজেকে দেখতে পেয়েছি। ছুঁচোর মতো বসে আছি সামনের সারিতে। প্রেস কনফারেন্সের ধরনধারণ দেখে মনে হচ্ছে সব ব্যাপারেই আমাদের প্রধানমন্ত্রীব প্রাধান্য। তিনিই যেন নেতা। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে ভাবতের কণ্ঠস্বরই সোচ্চার। ভারতও দীর্ঘ সংগ্রামের পর, কখনও সহিংস, কখনও অহিংস, ইংরেজের মুঠো থেকে বেরোতে পেরেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্ভাগ্য এখনও পরাধীন। সত্যিই 'সাউথ আফ্রিকান পাজ্‌ল'। আফ্রিকা মহাদেশের শেষ মাথায় এখনও প্রায় 'নো ম্যানস ল্যান্ড'। সভ্য মানুষ জলে ভাসতে শিখল। অজানা পৃথিবীকে জানার আকাঙ্ক্ষায় সাহসী নাবিক ভেসে পড়ল সমুদ্রে। ওই একখন্ড ভূভাগ হয়ে দাঁড়াল জাহাজের যাত্রাপথে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। ভারতে যেমন এসেছিল শক, হূন দল, মোগল, পাঠানা, সেইবকম দক্ষিণ আফ্রিকার 'কেপ অফ গুড হোপ', এল, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান। জাহাজ আসে। পোতাশ্রয়ে দাঁড়ায়। জল নেয়, ফল নেয়, মাংস নেয়। চলে যায় ভারতের দিকে, দূর প্রাচ্যের দিকে। কে মাথা ঘামায়। ভেতরে কি আছে। জানাই তো আছে, জঙ্গল, দুর্গম পাহাড়, বন্যপ্রাণী, বন্যমানুষ। ভেতরে, সমুদ্রের কূল ছেড়ে ঢোকার চেষ্টা করলেই, তেড়ে আসে, বান্টুরা, জুলুরা।

তীর ছেড়ে ভেতরে যারা গেলেন তাঁরা হল্যান্ডের সাহসী নাবিকের দল। তাঁরাই হলেন বোয়ার। দ্বিমুখী সংগ্রামে ট্রান্সভাল, ওদিকে ইংরেজের হাতে গেল কেপ কলোনী। তারপর বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। ইংরেজ বোয়ারে ঠোকাঠুকি। এখন কার স্বাধীনতা কে পায়! সামনের আসনে বসে মাথা নিচু করে ভাবছি। যার ধন তার নয়। হঠাৎ আলোর ঝলকানি। চমকে উঠলুম। সারা ঘরে একটা চাঞ্চল্য। মাথা নিচু করে ছিলাম তাই দেখিনি। সামনের আসনে এসে বসেছেন রাজীব। আজ প্রেস-কনফারেন্স করবেন রাজীব।

৩৭

মেয়েটির বয়স বেশি নয়, কিন্তু খুব চটপটে। বিদেশী পোশাক বদলে শাড়ি ব্লাউজ পরিয়ে দিলে কলকাতার কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। সঙ্গে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পেছনের আসন থেকে দু'জনে সামনের ডায়াসের দিকে এগিয়ে আসছেন। রাজীবের দিকে। রাজীবের পাশে বসে আছেন তাঁর প্রেস অ্যাডভাইসার সারদাপ্রসাদ। প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিলেন। আমরা শুনলাম। অস্ট্রিয়ার এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। মেয়েটি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, তার মানে বয়েস তখন আরও অনেক কম ছিল। জন্ম-সাংবাদিক নাকি! মেয়েটিকে পুতুলের মতো দেখতে। একটা বড় ডল পুতুল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাজীব হেসে হেসে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করলেন; চারদিকে অসংখ্য ক্যামেরার চোখ দোর্দণ্ডপ্রতাপে জ্বলছে নিভছে। সারা সভাকক্ষে অসংখ্য যোদ্ধা যেন আলোর তরোয়াল হাতে লড়াইয়ে নেমেছে। রাজীবের 'মিট দি প্রেস' শুরু হলো কিশোরীর প্রশ্ন নিয়ে।

মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'এই যে পৃথিবী জুড়ে সাদা কালোর লড়াই, এটা কি রঙের লড়াই, না অর্থনীতির লড়াই।' প্রেস-কনফারেন্স যেমন হয়! চতুর্দিক থেকে প্রশ্নের তীর ছুটে এল। লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব।

আগেই বলেছি, প্রেস কনফারেনসে রাজীব অদ্বিতীয়। বোকা বোকা প্রশ্ন, খোঁচা মারা প্রশ্ন। সমস্ত প্রশ্নেরই সুন্দর জবাব দিচ্ছেন হাসি হাসি, প্রসন্ন মুখে। উত্তর শুনে বিদেশী প্রশ্নকারীরা খুশি হয়ে মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে উঠছেন। দেখতে দেখতে প্রশ্নের আসর সাংঘাতিক জমে উঠল। ধাক্কা মারা প্রশ্নের খোঁচা মারা উত্তর। ভারতীয় সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্ন নেই। ঘরের মানুষের কাছে আবাব প্রশ্ন কি? সমস্যা তো একটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্। আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের ওপর থেকে হাত ওঠাও। স্বাধীনতা দাও।

প্রেস কনফারেনস যখন প্রশ্নোত্তরে বেশ জমে উঠেছে, যখন বিদেশী সাংবাদিকদের চোখাচোখা উত্তরে আমাদের সুদর্শন প্রধানমন্ত্রী একে একে ধরাশায়ী কবে দিচ্ছেন, তখন এক সায়েব এসে আমাদের মধ্যে কিছু লিফলেট বিলি করে গেলেন। 'অ্যান্টি অ্যাপারথিড মুভমেন্টের' প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ ট্রেভর হাডলস্টনের বিবৃতি। আজকের সভায় তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণের প্রতিলিপি।

> বন্ধুগণ,
>
> আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি। কমানওয়েলথভুক্ত ছয়টি দেশেব প্রধানরা তিন দিনের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে যে সব অর্থনৈতিক সাজার কথা ঘোষণা করেছিলেন তা কার্যকব করতে পারলেন না। না পারলেও তাঁরা যে একটা মহৎ উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই যে ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী, সেইটাই আমাদের কাছে আশার আলো। আমাদের কাছে মানে, সেই সব মানুষের কাছে, যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায় মানুষদের মুক্তি দেখতে ইচ্ছুক। তিনটি দিনের সমস্ত আলোচনা অর্থহীন হয়ে গেলেও ছ'জন দেশনায়ক এক হতে পেরেছেন এর চেয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা আর কি হতে পারে।
>
> শ্রীমতী থ্যাচারের একগুঁয়ে আচরণ এ দেশের লজ্জা, প্রিটোরিয়ার সান্ত্বনা। শ্রীমতী থ্যাচার বর্ণবিদ্বেষ বাঁচিয়ে রাখতে চান। সারা পৃথিবী যাব বিরুদ্ধে তিনি তার পক্ষে। ব্রিটেনের সহযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ নীতি প্রাণ পাবে, ভাবতেও আমার লজ্জা করছে।
>
> এই সভায় শ্রীমতী থ্যাচাব বর্ণবিদ্বেষ নীতিব অবসানে সামান্যতম ব্যবস্থা নিতেও অরাজি। তাঁর বক্তব্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকাবের চেতনা নিজে থেকেই আসবে। বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ অর্থহীন কথা। শ্রীমতী থ্যাচারের এই উক্তিতে সামান্যতম কাজও হবে না।
>
> এই সভায় শ্রীমতী থ্যাচার অদ্ভুত একটি যুক্তি খাড়া কবেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাব সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক দীর্ঘকালের। সেই সম্পকও অতি প্রগাঢ়। কমানওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশ সে সম্পর্কের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না; সুতরাং ব্রিটেনেব পক্ষে রূঢ় হওয়া অসম্ভব। বর্ণবিদ্বেষ নীতিতে ব্রিটেনের বিশাল স্বার্থ জড়িত থাকার ফলে, উচ্ছেদ সাধনে আমাদের আরও বেশি শক্তি প্রয়োগেব প্রয়োজন হবে।
>
> আমরা যারা বর্ণবিদ্বেষ নীতির ঘোরতর বিরোধী তারা আজ শক্তিশালী এক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি। ব্রিটেনের মতো প্রতিপক্ষকে ব্রিটিশ নাগরিকরাই নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করতে পারেন। কমানওলেথ-কর্মসূচী, রূপায়ণে আগ্রহী করে তুলতে পারে একমাত্র ব্রিটিশ জনমত।। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা আমরা নিতে চাই, তা আমাদের নিতেই হবে। সে যে ভাবেই হোক।

স্মারকটি পড়ে আমাদের আশা জাগল, যাক, ব্রিটেনের সব শ্বেতকায়ই বর্ণবিদ্বেষী নয়। মানবতাব পুরোপুরি মৃত্যু হয় নি। ব্রিটিশ জনমত বলে একটি শক্তি এখনও আছে, যে শক্তির কাছে আবেদন করা যায়, যার চাপে সরকারও নতি স্বীকার করতে পারেন। দেশে দেশে গণতন্ত্র এখনও সক্রিয়।

কে একজন রাজীবকে প্রশ্ন করলেন, 'হোযাট আর দি স্যাংশানস।'

স্যাংশান শব্দটা বেশ লাগিয়েছেন এঁরা। স্যাংশান মানে মঞ্জুর, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে কেড়ে নেওয়া। বিভিন্ন অধিকার হরণ করা। রাজীব উত্তরে বললেন,

দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করার প্রস্তাব। দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন ভাবে কোনও দেশ শিল্পবাণিজ্য করতে যাবে না। যে সব প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই আছে, সেই

সব প্রতিষ্ঠান লভ্যাংশ নতুন করে বিনিয়োগে বিরত থাকবে। কোনও দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষিপণ্য আমদানি করবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যে 'ডবল ট্যাকসেসান' অ্যাগ্রিমেন্ট ছিল তা বাতিল করা হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য বা শিল্প স্থাপন করতে চায় দেশীয় সরকার আর তাদের অর্থসাহায্য করবেন না। কোনও বিদেশী সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কিছু কিনবেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার যে সব প্রতিষ্ঠানে দক্ষিণ আফ্রিকার 'শেয়ার' বেশি সেই সব প্রতিষ্ঠানকে অন্যদেশের সরকার এড়িয়ে চলবেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিদেশীরা আর বেড়াতে যাবেন না। অর্থাৎ ট্যুরিজমের উচ্ছেদ সাধন।

এ ছাড়া আরও কিছু নতুন আক্রমণের ধারা উদ্ভাবন করা হয়েছে। রাজীব হেসে সভার গম্ভীর পরিবেশকে সামান্য নরম করে দিলেন। আর এক প্রস্থ ক্যামেরার চোখ ঝলসে উঠল চারপাশে। সেই তরুণী অস্ট্রিয়ান সাংবাদিক বয়সের তুলনায় গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন, যে প্রশ্নের মূল সুর হলো, হু উইল বেল দি ক্যাট। রাজীব তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, সাম ওয়াইজ র‍্যাটস। সবাই হোহো করে হাসলেন। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, সভাসমিতি করে কিছু হয় না। ইতিহাসে 'ট্রিটিজ' আর 'এগ্রিমেন্টের' ছড়াছড়ি। কনফারেনস, সামিট। গড়তেও যতক্ষণ, ভাঙতেও ততক্ষণ। আসলে বাহুবলই সব। আফ্রিকাকে আফ্রিকা দিয়েই তুলতে হবে। ভেতর থেকে বিস্ফোরণ। যা শুরু হয়েছে সেখানে। আয়ারল্যান্ডকে শান্ত করা গেছে কি! জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট বহুবার হয়েছে। জেন্টলম্যানের অভাব নেই সেখানে তবে সবাই জোতদার আর মজুতদার। তারা চায় নিজের কোলে ঝোল টানতে।

রাজীব বললেন, নতুন যে সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবা হচ্ছে তাব মধ্যে আছে দক্ষিণ আফ্রিকাব পাবলিক সেক্টার কি প্রাইভেট সেক্টারকে কোনও ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কমানওয়েলথভুক্ত কোনও দেশ, কয়লা, লোহা, ইস্পাত, ইউরেনিয়াম কিনবে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় কমানওয়েলথভুক্ত দেশের কনস্যুলেট থাকবে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাহায্য করার জন্যে নয়। নিজের দেশ ও তৃতীয় কোনও দেশের সহায়তার জন্যে।

হঠাৎ প্রেস কনফারেন্স শেষ হয়ে গেল। রাজীব টক্ করে উঠে পেছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অনেকটা ভোজবাজির মতো। আসলে সিকিউরিটি ঘেরা জননায়কের জীবনে শিথিল হবার কোনও অবকাশ নেই। এসো ভাই বলে মেলামেশার ঝুঁকি হলো রক্তাক্ত মৃত্যু। আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। জুতোর শব্দ সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলেছে। সভাকক্ষ প্রায় শূন্য। এক সময় কুমকুম বললে, 'চলো দাদা, হোটেলে আমার মাসীমার মেয়ে আসবে। সে লন্ডনেই থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি করে। কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আজ রাতে আমরা ওদের বাড়ি ভাবতীয় খানা খাবো।'

আমবা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে ফিরে এলুম। লন্ডনের আবহাওয়ার একটা মজা, মানুষ সহজে ক্লান্ত হয় না। সব সময় বেশ ফ্রেশ লাগে। ঘামটাম হয় না। রাতে ঘুমও আসে না। আবার সব সময় কাজ করতে ইচ্ছে করে। হোটেল লাউঞ্জে ছিপছিপে সুন্দর, লম্বা একটি মেয়ে বসে আছে। হালকা নীল রঙের স্কার্টস আর ব্লাউজে বড চমৎকার মানিয়েছে। কুমকুম তার বোনের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলে। মেয়েটির নাম অজন্তা। কোনও গুমর নেই, অহঙ্কার নেই। সহজ সরল, মিশুকে একটি মেয়ে। সব সময় কি যেন একটা ভাবে রয়েছে। কিছুক্ষণ কথা বলেই মনে হলো, মেয়েটি বেশ 'স্পিরিটেড'। দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আমার ঘরে চলে এলুম। এখন দুই মেয়েতে অনেক প্রাণের কথা হবে, আমার না থাকাই ভালো। কুমকুম বলে দিলে, রেডি হয়ে নাও, রঞ্জিৎ ফিরে আসলে, ওদের গাড়িতেই আমরা যাবো। বেশ দূর আছে। লন্ডনের ও মাথায় অজন্তাদের বাড়ি।

আমার সেই বিখ্যাত ঘরের, ভুতুড়ে দরজাটা খুলতেই দেখি কার্পেটের ওপর রঙীন একটা খাম। কার চিঠি! এখানে কে আমাকে চিঠি লিখবে। বেশ পুলক লাগছে। এই হোটেলেরই রঙীন লেফাফা। মুখটা আঠা দিয়ে জোড়া। খুলে ফেললুম। সুন্দর রঙচঙে কাগজ। কালো কালির ইংরেজি হরফ। যে ছেলেটিকে আমি ভূতের গল্প শুনিয়ে ভীত করে তুলেছিলুম, সেই মাইক স্মিথ লিখছে, 'আমার ছুটি হয়ে গেল। আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কাল আমার দেখা হবে না। কারণ কাল আমার অফ ডে। তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লেগে গেছে। তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলার অনেক ইচ্ছে ছিল। ডিউটি আওয়ার্সে গল্প করা যায় না। তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। তোমার সঙ্গে

সারাজীবন আমার যোগাযোগ রাখতে ইচ্ছে করছে। আমাকে তুমি ভুলে যেও না। তুমি আমার ভালবাসা নিও। ইতি, তোমার মাইক স্মিথ।'

চিঠিটা পড়ে মন ভরে গেল। যাক এই বিদেশ বিভূঁয়ে একজনও অন্তত আমাকে ভালবেসে ফেলেছে। মানুষের ভালবাসা যেন কোহিনুর হীরে। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর মানুষের জীবনে কি থাকতে পারে। বিভোর হয়ে বসে আছি; এমন সময় মৃদু জলতরঙ্গের মতো ফোন বেজে উঠল। গ্রেট কুমকুম। 'দাদা তোমার ঘরের মিনি বক্সটা খোলো। ওপরের খোপে এক প্যাকেট রোস্টেড বাদাম পাবে। আগেই খেয়ে ফাঁক করে দাওনি তো?'

'না রে বাবা! খাবে কি? ও তো বাদাম নয়, রোস্ট করা পাউন্ড, শিলিং, পেনস।'

'লক্ষ্মী ছেলে। ওটা নিয়ে নেমে এসো আমার ঘরে।'

কুমকুমের দরজা আধখোলা। কুমকুমের ঘরে দুটো খাট। দু'খাটে দুই বোন, আরামে পিঠে বালিশ দিয়ে গল্প করছে। চা এসেছে। নিজেদের বাদাম শেষ। ডিশে আমারটা পড়ল। আসর বেশ জমে উঠল। অজন্তা অতিশয় বুদ্ধিমতী! নানা বিষয়ে অনর্গল কথা বলতে পারে। জানেও অনেক। সায়েবদের দেশে বেশ মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে।

রঞ্জিতবাবুর কাজ শেষ হতে হতে দশটা বেজে গেল। তার মানে অজন্তাদের বাড়িতে আমাদের মিডনাইট পার্টি হবে। প্রথম গাড়িতে আমি, রঞ্জিত, কুমকুম, অজন্তা। চালক আমাদেব রবিনস সায়েব। দ্বিতীয় গাড়িতে রাও আর তাঁব দুই সহকর্মী। চালক পিটার সায়েব। আরামপ্রদ বাতানকুল, ভলভো গাড়ি। লন্ডনের লম্বা পরিচ্ছন্ন রাস্তা ধরে ছুটছে। রাতেব শহর দুপাশ দিয়ে সাঁই সাঁই ছুটছে বিপরীত দিকে। রবিনসের পাশে পাশে আমাদের গাইড অজন্তা। রবিনস সায়েব তাকে ক্রশ বেল্ট দিয়ে সিটের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছেন। এদেশেব নিয়ম, সামনেব আসনে বসলেই বেল্ট বাঁধতে হবে।

রাতের লন্ডন, বাড়িঘর আলো নিয়ে ভেসে চলেছে দুপাশ দিয়ে। স্বপ্নের মতো লাগছে। রাস্তা আছে পথচাবী নেই। মায়াবী শহরের মায়া যবনিকা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। হঠাৎ দূরে দূরে নিঃসঙ্গ কোনও সায়েব বা মেম চোখে পড়ছে। ঘরে ফেবা গরুর মতো ক্লান্ত চরণেব পথচলা। ফুটপাথেব একপাশ দিয়ে বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে। কোথাও তো অন্ধকার নেই। আলোকের ঝরণাধাবায় শহর প্লাবিত। যে শহর রাতে আলোকমালায় সেজে থাকে, সে শহর কত সুন্দর! মনে মনে শ্রীমতী থ্যাচাবকে ধন্যবাদ জানালুম। সাবাস মেমসায়েব। ভাঙা শহবের ভুতুড়ে শহরের এই অর্বাচীন তোমাকে প্রশংসা জানাচ্ছে। তোমার ব্যবস্থাপনায় দেশটা তেমন হতশ্রী হয়নি। বেশ আছে। এর নাম ব্রিটিশ অ্যাডমিনিসট্রেশান। 'মবাল ডিজেনারেশান'-এব কি করবে বলো! মেটিরিয়্যাল ডিজেনারেশানটা ঠেকাতে পেরেছ।

আমাদের দুটো ভলভো গাড়ি ছাড়া পথে আর কোনও গাড়ি নেই। না লাল বাস, না কালো ট্যাকসি। মাবাত্মক গতিতে আমরা সামনে ছুটছি। রবিনস আর অজন্তা চুটিয়ে গল্প করছে। আমবা তিনজন চুপচাপ বসে আছি পেছনে। বেশ বুঝতে পাবছি ববিনস অজন্তাব প্রেমে পড়ে গেছেন। আব প্রেমে ফেলার মতোই মেয়ে। মডেল হলে বহু টাকা রোজগার কবতে পারতো। কুমকুম মাঝে মাঝে বোনকে সচেতন করে দিচ্ছে, 'হ্যাঁরে আমরা ঠিক যাচ্ছি তো!' কুমকুমও ধবে ফেলেছে। রবিনস সায়েবের রাস্তার দিকে নজর নেই। ঘাড় অধিকাংশ সময়ই অজন্তার মুখের দিকে ঘোরানো। সেই ধারালো সুন্দর মুখ আলো-ছায়ায় ভেসে ভেসে চলেছে। মাঝে মাঝে হাসিতে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। উঃ, প্রেমের কি চেহারা! বাত্রির চেয়ে মোলায়েম, মোহময়ী।

বহুক্ষণ আমরা চলেছি। এতক্ষণ যে লন্ডন ফুরিয়ে যাবাব কথা। হঠাৎ গাড়িব গতি শ্লথ হলো। ববিনস আর অজন্তার মুখ কাছাকাছি হলো! দুজনের গভীর আলোচনা। রবিনস ডান দিকে চায়, অজন্তা বাঁ দিকে। দু'জনেই কিছু একটা খুঁজছে। কুমকুম বললে, 'কি হলো?'

অজন্তা বললে, 'ববিনস একটা ভুল করেছে। যেখানে ডানদিকে ঘোবার কথা ছিল, সেই জায়গাটা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।'

ব্যাপার না বুঝেই আমি বললুম, 'এই তো ডানদিকে যাবার এত পথ, গেলেই তো হয়।' না সে উপায় নেই। 'ব্রিটিশ ল'। যেখানে সেখানে ডানমুখো হওয়া যাবে না। কেউ দেখছে না; কিন্তু সবাই দেখছে। রবিনস সায়েব পয়লা ডান ভুল করে, আরও এগিয়ে এমন বাঁক নিলেন কিছুক্ষণের

মধ্যেই আমরা হারিয়ে গেলুম। অজন্তা আর কিছুই চিনতে পারছে না। বেশ মজা। আমার খুব ভালো লাগছে। যত হারিয়ে যাই ততই ভালো। শহরের আরও নানা দিক দেখতে পাবো। সারা রাতই হারিয়ে থাকি না কেন।

ঈশ্বর সেই ব্যবস্থা আরও পাকা করে দিলেন। বিকট শব্দে বাজ পড়ল। আর শুরু হলো বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি আমি আগে দেখিনি। একেই বোধহয় ক্লাউড বার্স্ট বলে। উইন্ডস্ক্রিনের ওপর দিয়ে প্লাবনের মতো জলের ধারা বইছে। ওয়াইপার হেরে যাচ্ছে দৃষ্টি পরিষ্কার করতে। তবু গাড়ি চলছে। ব্লাইণ্ড ড্রাইভিং। আলোকিত, বৃষ্টিসিক্ত, পথঘাট, ছবির মতো সব বাগানঘেরা কটেজ। লন্ডন শহরে যেন পালিশ পড়েছে। কুমকুম ভীষণ বিরক্ত হয়ে বোনকে জিজ্ঞেস করছে, 'তুই রোজ বাড়ি ফিরিস কি করে?' অজন্তা বললে.'আমি তো আন্ডার গ্রাউন্ডে ফিরি।'

'তা রাস্তাঘাট জানিস না যখন গাইড হতে গেলি কেন।'

'আমি কি করবো রবিনস যে মিস করল।'

রবিনস বললেন, 'আরে সব ঠিক হয়ে যাবে এখুনি। হলো কি দশ বারো মাইল ঘুরে যেতে হবে।'

এই খবরটা আমার কাছে ভীষণ সুখবর। দশ বারো কেন, আরও বেশি হোক না। প্রেমের পথ তো ঘোরালোই হয়। সেই গান আছে, চাঁদের আলোয় চালতা-তলায় যেও না। সেই রকম ভারতীয় সুন্দরীকে বসিয়ে পাশে সায়েব আর কখনও গাড়ি তুমি চালিও না।

বৃষ্টির দাপট কিছু কমল। গাড়ি বাঁয়ে বেঁকে বিশাল একটা বৃত্ত ঘুরে ডান দিকে এগলো। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ল্যাম্পপোস্ট ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। চারপাশ দেখে মনে হচ্ছে এইবার আমরা শহরের বাইরে চলে এসেছি। অজন্তা ঘাড় ঘুরিয়ে আশার কথা জানালো আমরা প্রায় এসে গেছি।

দুপাশে একই ধরনের সার সার বাড়ি। সব বাড়িই তিন তলা। ঢালু ছাদ। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে ঝোপঝাপ বাগান। উইকার গেট। মাঝখানে চওড়া রাস্তা। দুপাশে ঘাসের ফুটপাথ। দেখেই মনে হলো শার্লক হোমস এই সব জায়গাতেই ছুটে আসতেন। জ্যাক দি রিপার এইসব ঝোপের আড়ালেই লুকিয়ে থাকত। ভয়, কল্পনা, স্বপ্ন, রোমান্স, অ্যাডভেঞ্চার মেশানো একটা অঞ্চল। কোথা থেকে সব বাড়ির গায়েই একটা আলো এসে পড়েছে। মায়াবী আলো। হাল্কা হলুদ রঙের সব বাড়ি। তেমন আমুদে নয়, একটু গম্ভীর প্রকৃতির।

বাঁ দিকে একটা গেটের সামনে গাড়ি থামলো। চিলিংচিলিং করে কোথায় একটা ঘড়ি বাজছে। রাত মাত্র বারোটা। আসতে ঘণ্টা তিনেক লেগেছে। তার মানে কলকাতা থেকে কল্যাণী। গাড়িটা থামার পর যা ঘটল তা অভাবনীয়। রবিনস তাঁর আসন থেকে চট করে নেমে গেলেন। তখনও সিপসিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি ভুলেই গেলুম শহরটা লন্ডন। যেখানে এসেছি সে জায়গাটার নাম ক্যামডেল। আমি ভাবলুম বারাসত কি বনগাঁয়ে আছি। চিৎকার করে বললুম 'রবিবাবু গরমজামা ভিজে যাবে।' রবিনস শুনলেন কি না জানি না। তিনি ঘুরে এপাশে এসে দরজা খুলে গাড়ির পেছন থেকে লম্বা একটা ছাতা বের করে খুলে দাঁড়ালেন, নামা মাত্রই আমাদের মাথায় ধরবেন বলে। নিজে কিন্তু সমানে ভিজে চলেছেন। নেমে ছাতার তলায় যেতে যেতে বললুম, 'আপনার সবই যে ভিজে গেল।'

রবিনস হেসে বললেন, 'ডিউটি ফার্স্ট'।

জাত ইংরেজের কথা। লম্বা ছ ফুট চেহারা। পরিধানে নিখুঁত গ্রে স্যুট। গেটের পর বাগান। বাগানের পর বাড়ি। রবিনস একে একে সকলকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। গৃহস্বামী মেয়ের জন্যে, আমাদের জন্যে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। বাড়িটা একপেশে। বাঁদিকে বারান্দা। ডানদিকে পরপর ঘর। প্রথমটা বসার ঘর। দ্বিতীয়টা খাবার ঘর। বারান্দার শেষ মাথার প্রশস্ত অংশে আধুনিক কায়দার রান্নাঘর।

আমরা বসার ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলুম। রবিনস আর পিটার কিন্তু আমাদের দলে ভিড়লেন না। রান্নাঘরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খেতে লাগলেন। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। তার ওপর ভেজা হয়েছে বৃষ্টিতে। অজন্তার মা আশা করেছিলেন কুমকুমকে। এসে হাজির গোটা একটা দল।

রাত সাড়ে বারোটায় নতুন করে রান্না চাপল। রবিনসের ছাতাটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলুম। অজন্তা শবাসন করছে অ্যাটিকে। বড় ক্লান্ত। বৈঠকখানায় লাল জলতরঙ্গ। রহস্যময় জায়গাটাকে দেখার জন্যে রাস্তা ধরে পা বাড়ালুম সামনে।

৩৮

ইংরেজ শিল্পী জ্যাক মারিয়াটের আঁকা প্রকৃতি চিত্রে যেমন ইংরেজ পল্লীচিত্র দেখা যায়. বাস্তা দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে, দু সার বাগানঘেরা শান্ত গৃহের মাঝখান দিয়ে ক্যামডেনের এই রাস্তাটিও সেই রকম। কিছুদূর এগিয়ে মনে হলো অন্ধকার জমাট হয়ে আসছে। রাস্তা ক্রমশ ঢালু হচ্ছে। ছাতায় অনবরত বৃষ্টি ঝরে চলেছে ঝপঝপ। টমাস হার্ডির গল্পে এই রকম রাস্তার বর্ণনা আছে। যে রাস্তা দিয়ে জেল-পলাতক আসামী যায় কৃষকের কুটীরে। যে রাস্তা দিয়ে আসে কালো স্যুটপরা হ্যাংম্যান।

হঠাৎ মনে এল বিলেতে কি ব্যাঙ আছে। গ্যাঙোর গ্যাঙোর। এমন বর্ষার রাতে ডাকছে না কেন! সায়েবরা কখনও খিচুড়ি, ইলিশ মাছ ভাজা খেয়েছে? ক্যুইজ কন্টেস্টের প্রশ্ন সব। বেশ কিছুদূর এগিয়ে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। পেছনে একটা কটেজের অন্ধকার গেট। গেটের মাথায় আর্চ। আর্চে লতিয়ে উঠেছে লতানে গোলাপ। বেগোনিয়া। গন্ধে গন্ধে অন্ধকারের নেশা ধরে গেছে যেন। গলা ছেড়ে গান ধরলুম, 'অন্ধকাবে অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে।' সঙ্গে সঙ্গে সমঝদাব শ্রোতার কান ফাটানো ঘেউ ডাক। পেছনের কটেজের অন্ধকার বাগানে অ্যালসেসিয়ান ঘুরছিল। তারই প্রতিবাদ।

তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম। বলা যায় না এখুনি তেড়ে আসবে লন্ডন ববি।

রাত প্রায় দেড়টার সময় আমরা বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলুম। বৃষ্টি থেমে গেছে। এক ফালি চাঁদ উঁকি মারছে মেঘের আড়াল থেকে। শীত বেশ জমেছে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর আমার মনে পড়ল কুমকুমেব মাসি বলেছিলেন, লন্ডনে এলে সোহো দেখা উচিত। সেই ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্রই, ববিনস বললেন, 'অল-রাইট আই উইল শো ইউ।'

গাড়ি কোথা থেকে কোথায় বাঁক নিল বলতে পারবো না, হঠাৎ দৃশ্য বদল হলো। বাড়ির চেহারা আলাদা। দোকানের সাজসজ্জা অন্যরকম। রাস্তার আলোর চেহারা সামন্য সন্দিগ্ধ। মনে হলো রাত নেমেছে অভিসারে। প্রায় সমস্ত বাড়িরই সিঁড়ি উঠেছে ফুটপাথ থেকে। একটি বাড়ির সিঁড়ির ধাপে ধাপে দাঁড়িয়ে আছে সুবেশ মহিলারা। উগ্র তাদের রূপ। এদের না দেখেই তুলসী লিখেছিলেন, বাঁতকা বঘিনী পলক পলক লহু চোষে। একটা সাদা বঙের বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে একটি ছেলে আব মেয়ে কি সব করছে। পাশেই কুমকুম; কিন্তু লজ্জা করছে না; কারণ ভাবতীয় জীবনচর্যাব বাইরে। এডাল্ট সিনেমার মতো। একটি আলোকিত দোকানের সাইনবোর্ড সেক্সশপ। ভগবান বক্ষা করো। একটি বাড়ির দোবগোড়ায় নেশাগ্রস্ত একটি ছেলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এর নাম 'সোহো'। এই শহবেব আনন্দ মহল্লা। আমাদের গাড়ি প্রায় নিঃশব্দে সোহোব পথে পথে টহল দিয়ে চলেছে। নাইট ক্লাব। পাব। শপ। হঠাৎ কোনও মেয়ে। ব্যাঞ্জো বগলে হিপি যুবক। এখনও এ পাড়ায় মধ্যরাত পেরোয়নি। সবে সন্ধে হয়েছে যেন। কলকাতা থেকে কোনও ফুলঅলাকে ধরে আনতে পারলে হতো; আর একজন মালাই বরফঅলা। হেঁকে যেত নেশা জড়ানো গলায়, চাঁই বে-ল-ফু ল। কুলফি মা-লা-ই।

ঘড়ি আর দেখিনি। দুটোও হতে পারে আড়াইটেও হতে পারে। ফিবে এলুম হোটেলে। রিসেপসানে নিদ্রালু দুই যুবতী। বিশাল শূন্য লিফ্ট। পাক মারা, কার্পেট মোড়া, নির্জন করিডর। টবে টবে রাত জাগছে বাহাবী গাছ। আজ রাতে আর বিছানায় শুতে যাবো না। অদ্যই শেষ রজনী। কমানওয়েলথ কনফারেন্স তাহলে ব্যর্থ হলো। লৌহরমণী শ্রীমতী থ্যাচার অনমনীয়। মহিলা দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস স্মরণে রেখেছেন।

অক্টোবর ৯, ১৮৯৯। ঠিক আজকের মতোই ক্রুগার আর মিলনারের আলোচনা ভেস্তে গেল। বোয়াররা 'আলটিমেটাম' দিয়ে বসল। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ সৈন্য তখনও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ১২ অক্টোবর বোয়ার সৈন্য সীমান্তে মোতায়েন হলো। যুদ্ধের শুরুতে বোয়ার সৈন্যের সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার। ইংরেজ সৈন্যের প্রায় দ্বিগুণ। অস্ত্রে ইংরেজদের চেয়েও শক্তিশালী। তারা জার্মানদের কাছ থেকে ভারি ভারি কামান সংগ্রহ করেছিল। বেশির ভাগ সৈন্যই ছিল অশ্বারোহী। সীমান্তের বিভিন্ন দিক থেকে তারা ব্রিটিশ এলাকায় ঢুকে পড়ল। তাদের হাতে ছিল 'মানলিকার' আর 'মসার' রাইফেল। লক্ষ্যভেদে তারা ছিল সুদক্ষ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বোয়াররা পূবে লেডিস্মিথ আর পশ্চিমে মাফেকিং আর কিম্বারলে দখল করে নিল। নাটাল সীমান্তের লেডিস্মিথেই হলো ইংরেজের বড় প্রথমের পরাজয়। স্যার জর্জ হোয়াইটের নেতৃত্বে দশ হাজার ইংরেজ সৈন্য ঘেরাও হলো। দু

ব্যাটেলিয়ান ইংরেজ সৈন্য পড়ে গেল ফাঁদে। নিকলসনস নেকে অস্ত্রশস্ত্রসহ তারা অসম্মানজনক আত্মসমর্পণে বাধ্য হলো।

মাফেকিং নামক একটি জায়গায় কলোনেল বাডেন-পাওয়েল ছোট একটি বাহিনী নিয়ে লড়ছিলেন। পেটি ক্রোনজের নেতৃত্বে বিশাল এক বোয়ার বাহিনী তাদের ঘিরে ফেললে। কিম্বারলেতে সিসিল রোডস আর বিশাল এক জনসমষ্টি অবরুদ্ধ হলা। গ্রামের মানুষ বোয়ারদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। বোয়াররা বেশ আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছিল। গ্রীষ্মে উপত্যকার সব ঘাস তারা ইচ্ছে করে পুড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে বর্ষাব বিচরণ ক্ষেত্র আরও সবুজ হয়ে উঠল। পশুচারণের খাদ্যের কোনও অভাব বইল না। যুদ্ধ পরিচালনায় গ্রামেব মানুষেব সহযোগিতার খুব প্রয়োজন ছিল। সারা বিশ্বের মানুষ বোয়ারদের দিকে। ব্রিটিশরা সর্বত্র ধিক্কৃত।

ইংরেজ আজও নাছোড়বান্দা। সেদিনও নাছোড়বান্দা। তিন ডিভিসান ব্রিটিশ সৈন্য স্যা" রেডভারস বুলারের পরিচালনায় এগিয়ে এল পরিস্থিতির সামাল দিতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সাজো সাজো রব। ভলান্টিয়ারবা প্রস্তুত। প্রয়োজন হলেই ঝাঁপিয়ে পডবে। ইংরেজের শক্তির অভাব ছিল না। বীর যোদ্ধার অভাব ছিল না। অভাব ছিল বাস্তব অবস্থাব জ্ঞানে। কাব সঙ্গে লড়ছি কোন্ দেশে, কি পরিবেশে লড়ছি! কোন্ অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছি।

ক্রুগার চেয়েছিলেন নোনা জলেব একটি বন্দর নিজেদেব দখলে আনতে। বহুদিনের বাসনা। বোয়ার বিপাবলিক ছিল স্থলবেষ্টিত। কোথাও কোনও বেরোবার পথ নেই। ক্রুগার দেখলেন, ওই তো পর্বতের শুরু। গিরিপথ অতিক্রম করলেই ডারবান বন্দর। নাটাল পর্বতমালার ওপাশ থেকে ডারবান বন্দরের হাতছানি ক্রুগারকে অদম্য করে তুলেছিল। ডারবান তার চাই। ডারবান থেকে ট্রান্সভাল পর্যন্ত সুন্দর একটি রেললাইন পাতা আছে। কেপটাউনের মতো দৈর্ঘে অত বিশাল নয়। সহজ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আর একেবারে তাঁর দোর গোড়ায়। বন্দর আব রেললাইন দুটোকে দখলে আনতে পারলে বহু সমস্যার সমাধান। শুল্ক আর ভাড়া নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও ঝামেলা থাকবে না। স্বাধীন ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে। ফলে এই একটি এলাকাব ওপব দু'পক্ষের চাপ পড়ল। ইংরেজরা রাখতে চায়, বোয়াররা অধিকার করতে চায়। পর্বতমালাকে মাঝে রেখে দুপক্ষ মুখোমুখি।

বুলার তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। একটি নয় একাধিক ফ্রন্ট তৈরি হলো। একটি বাহিনী গেল নাটাল রক্ষা করতে। আর একটি বাহিনী ছুটল কিম্বারলে বাঁচাতে। তৃতীয়টি গেল উত্তর-পূর্ব দিকের কেপ কলোনিতে। বোয়ারদের ঝাঁক ঝাঁক গুলিগোলার মধ্যে ইংরেজ সৈন্য বেশ কিছু দূর এগোলেও বিজয়ী হতে পারল না। জায়গায় জায়গায় তারা পরাজিত হলো। কোথাও কোথাও নির্মূল হয়ে গেল। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বিশাল। লোকক্ষয়, অস্ত্রক্ষয়। নাটালের কোলেনসোতে কি হলো! সেখানে ছিলেন বিখ্যাত বুলার। কিম্বারলের পথে মডার নদীর ঘাটি আগলাচ্ছিলেন বুলার। আর কেপ কালোনির পূর্ব দিকে স্টর্মবার্গে ছিল বোয়ার সৈন্য। বুলার বাধা দেবার আগেই বোয়াররা ঢুকে পড়ল সেই অঞ্চলে। এক হাজারের মত ইংরেজ সৈন্য নিহত হলো। আধুনিক যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় সংখ্যাটি নগণ্য হলেও, সেই যুগের বিচারে বিশাল। ব্রিটেন এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে হই হই পড়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রেও নেমে এল হতাশার ভাব। মহারানী ভিক্টোরিয়া দেশবাসীকে সেই সময় যে কথা বলেছিলেন, আজও তা স্মরণীয়। পার্লামেন্টে বালফোর প্রশ্নোত্তরের জন্যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন, কুইন বললেন, 'দয়া করে বোঝাবার চেষ্টা করুন, সভায় কেউই কিন্তু তেমন ভেঙে পড়েন নি। আমরা কেউই পরাজয়ের সম্ভাবনার কথা শুনতে আগ্রহী নই; কারণ পরাজয় শব্দটা আমাদের অভিধানে নেই। কান্দাহার খ্যাত লর্ড রবার্টসকে নিয়োগ করা হলো নতুন কম্যাণ্ডার ইন চিফ। খারটুম খ্যত লর্ড কিচেনারকে নিযুক্ত করা হলো রবার্টসের চিফ অফ স্টাফ। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজের প্রাথমিক পরাজয়ে ব্রিটেনে হইচই পড়ে গিয়েছিল। ১৮৯৯ সালের ৯ থেকে ১৭ ডিসেম্বর কুখ্যাত 'কাল সপ্তাহ' পালিত হবার পরই প্রায়বৃদ্ধ লর্ড রবার্টসকে যুদ্ধে টেনে আনা হলো। কিচেনার ছিলেন রবার্টসের প্রিয় অন্যের অপ্রিয়।

সফল যোদ্ধা হলেও মানুষ হিসেবে কিচেনার ছিলেন সাংঘাতিক। রোদে পুড়ে পুড়ে মুখের রঙ ইটের মতো লাল। চামড়া শক্ত আর There is not one atom of sentiment in him. এক কনাও ভাবাবেগ ছিল না। তাঁর নীতি ছিল, তোমার কাছ থেকে আমি এই কাজ চাই। শরীর খারাপ, অমুক তমুক, এ সব শুনতে চাই না। হয় মারো না হয় মরো। চিফ অফ স্টাফ থাকাকালীন, তিনি মাঝে

মাঝে কেপটাউনে ক্লাব অথবা হোটেলে ঢুকে পড়তেন। যেই দেখতেন যুবক স্টাফ অফিসাররা বসে বসে আড্ডা মারছে ; তাদের টেনে বার করে এনে বলতেন, ' তোমাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে—হয় এখুনি ইংল্যাণ্ডের টিকিট কাটো নয়তো বোয়ার-ফ্রন্টে চলে যাও।' সকলেই তাঁকে যমের মতো ভয় করত; এমন কি লর্ড রবার্টসও।

দুই লর্ড, লর্ড রবার্টস আর লর্ড কিচেনার পরিস্থিতির হেরফের ঘটালেন। তাঁরা দেখলেন, সৈন্যবাহিনীকে ছড়িয়ে দিতে হবে আর আক্রমণ করতে হবে সর্বদিক থেকে। জায়গায় জয়গায় যুদ্ধ করে পেরে ওঠা যাবে না। লক্ষ্য হবে বোয়ার রাজধানী ব্লোয়েম ফন্টেইন দখল করা, তারপর প্রিটোরিয়া। এই সময়ে তাঁরা প্রথম ধরলেন রোমেলের কায়দা। ওয়ার অফ ডিসেপসান। রোমেল এই আফ্রিকাতেই ডেজার্ট-ওয়ারে নানা কায়দা দেখিয়ে 'ডেজার্ট ফক্স' উপাধি পেয়েছিলেন। এমনিই তাঁর সৈন্যসম্ভার কম ছিল, কিন্তু শত্রুপক্ষকে বুঝতে দেন নি। তাঁর ফ্রন্টে তিনি যে কটা ট্যাঙ্ক ছিল একবার এদিকে চালাতেন এক বার ওদিকে। মরুভূমির প্রখর সূর্য। রোমেলের ফ্রন্টে বালির ঝড়, যেন কতই 'ট্রুপস মুভমেন্ট' হচ্ছে। রোমেল সাধারণত সামনাসামনি আক্রমণ করতেন না। পেছন দিক থেকে আচমকা আক্রমণে বিপর্যস্ত করে দিতেন।

রবার্টস আর কিচেনার সেই পথই ধরলেন। মাফেকিং-এ বসে আছেন বোয়ার বীর ক্রোঞ্জে। ইংরেজরা এমন একটা ভাব দেখাল, যেন এখুনি তারা কিম্বারলে আক্রমণ করবে। কিম্বারলে হীরেখনির অল্প দক্ষিণে মেগারসফন্টেইনে ক্রোঞ্জে তাঁর বাহিনীকে সরিয়ে আনলেন। সেখানেই ট্রেঞ্চ খুঁড়ে তিনি ইংরেজ আক্রমণের অপেক্ষায় রইলেন। লর্ড রবার্টস অবশ্য কিম্বারলেই পুনর্দখল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেইটাই তিনি করলেন সোজাসুজি নয়, ঘুরপথে। জেনারেল ফ্রেঞ্চকে দায়িত্ব দিলেন। তিনি তাঁর অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অনেকটা ঘুরে ক্রোঞ্জেকে পেছন থেকে আক্রমণ করলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি কিম্বারলে মুক্ত হলো। ক্রোঞ্জে তার ট্রেঞ্চ ছেড়ে সরে গেলেন উত্তর-পূর্ব দিকে। সেখানে অপেক্ষায় ছিলেন দুদান্ত কিচেনার। মুখোমুখি সংগ্রামে ক্রোঞ্জে পরাজিত হলেন। বারোদিনের যুদ্ধে বার হাজার সৈন্য সহ ক্রোঞ্জের আত্মসমর্পণ। এরপর দ্রুত পটপরিবর্তন। ভাগ্যলক্ষ্মী বোয়ারদের হাত ছাড়া হলো। পরের দিনই বুলার লেডিস্মিথ পুনর্দখল করে নিলেন। ১৩ মার্চ রবার্টস হাজির হলেন ব্লোয়েমফন্টেইনে। ৩১ মার্চ জোহানেসবার্গের পতন। ৬ জুন প্রিটোরিয়া। ২১৭ দিন অবরোধের পর মাফেকিং এর পতন হলো। ক্রুগার পালিয়ে গেলেন। লণ্ডনে বিশাল বিজয়োৎসব। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট আর ট্রান্সভাল চলে এল ব্রিটিশ অধিকারে। ১৯ শো সালের হেমন্তে বিজয়ী লর্ড রবার্টস ফিরে এলেন স্বদেশে। ব্রিটিশদের আনন্দ আর ধরে না। বোয়ার যুদ্ধ তাহলে শেষ হলো। চেম্বারলেনের উপদেশে লর্ড সলিসবেরি আর একবার সাধারণ নির্বাচনে নেমে বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফিরে এলেন! শ্রীমতী থ্যাচারের ফকল্যাণ্ডের মতো ঘটনা। ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে।

২২ জানুয়ারী, ১৯০১ কুইন ভিক্টোরিয়ার দেহাবসান হলো। চৌষট্টি বছর একটানা রাজত্ব করেছিলেন, যাঁকে বলা হয় মহীয়সী মহিলা। ভারতীয়রা বলতেন, মাতা ভিক্টোরিয়া। তিনি ছিলেন একটি যুগের ধারক— ভিক্টোরিয়ান এজ। তাঁর কালে এম্পায়ার সর্বদিক থেকে উঠেছিল শীর্ষে। ১৮৮৭ আর ১৮৯৭, মহারানীর জুবিলি-বছরের দুটি অনুষ্ঠান মানুষের স্মৃতিতে ধরা ছিল বহুদিন। বিশাল একটা এম্পায়ারকে ভিক্টোরিয়া তাঁর হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছিলেন। প্রতিটি জাতির জীবনে একটা সময় আসে যখন শিল্পে, সাহিত্যে, অর্থনীতিতে সেই জাতি তুঙ্গে উঠে যায়। তারপর সময়ের যা ধর্ম। চিরদিন কি এমনি যাবে! ভোলা মন! মন আমার।

অসবোর্নে আইল অফ উইটে, দেশের গৃহে রানী ভিক্টোরিয়ার মরদেহ শায়িত। পঞ্চান্ন বছর আগে প্রিন্স অ্যালবার্ট যে ভাবে এই বাড়ি নিজের পছন্দমতো সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই আছে। ভিক্টোরিয়া এক চুল এদিক ওদিক করেন নি। রানী সঙ্কল্প করেছিলেন, প্রিন্স অ্যালবার্ট জীবনের সুর ও ছন্দ যে ভাবে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সেই ভাবেই জীবন চালাবেন। সেই দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে তিনি এতটুকু বিচ্যুত হন নি। তাঁর বৈধব্য জীবনের দীর্ঘ সময় নিষ্কম্প প্রদীপের মতো জ্বলেছিল। তাঁর চোখের সামনে সাম্রাজ্যের পরিসর বাড়তে বাড়তে এমন হলো যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য আর অস্ত যায় না। বহুজাতিক বিশাল এক পরিবার, তার মাথার ওপর ব্রিটিশ ক্রাউন। ফ্যামিলি অফ নেশানস। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড রোজবেরির দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি নাম রাখলেন, 'কমানওয়েলথ'।

এই গৌরবের পিছনে ছিলেন দুজন। দুটি শক্তি। ডিজরেইলির দূরদৃষ্টি আর চেম্বারলেনের উৎসাহ। রানী ভিক্টোরিয়াও নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন মহৎ ভূমিকা পালনের উপযোগী করে। তিনি তাঁর পুত্র প্রপৌত্রদের সাম্রাজ্যের এক এক অংশে সরকারী পরিদর্শনে পাঠাতেন। ইংল্যান্ডে রাজদরবারে তিনি সকলের সঙ্গে, সব দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেন। স্বগৃহে নিযুক্ত করেছিলেন ভারতীয় পরিচারক। তাদের কাছ থেকে শিখেছিলেন হিন্দি। একটা মমতার বন্ধনে সাম্রাজ্যটিকে বেঁধে রেখেছিলেন। এক একটি চরিত্র পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ এইভাবেই এসে পড়েন। তাঁদের কারণেই সব হয়। এই রানীর জন্যেই বিশাল প্রজাকুল ক্রাউনের প্রতি অনুরক্ত ছিল। অদ্ভুত ধরনের একটা জাতীয়তাবোধ, অদ্ভুত একটা চেতনার উন্মেষ হয়েছিল সেই কালে। রাজকবি সেই কালেই, লিখতে পেরেছিলেন—

England where the Sacred flame
Burns before the inmost shrine
Where the lips that love thy name.
Consecrate their hopes and thine

রানী ভিক্টোরিয়ার বয়স যখন আশি তখন তিনি শেষ বারের মতো আয়ার্ল্যান্ডে গেলেন। তিনি আয়ার্ল্যান্ডে হোমরুল জারির পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি মনে করতেন হোমরুল সাম্রাজ্যের ঐক্যের বিরোধী। আয়ার্ল্যান্ডের সেনারা দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল। রানী সেই কারণেই ১৯০০-র এপ্রিলে ডাবলিনে এলেন। তাঁর টুপি আর জ্যাকেটে পরিধান করলেন, আয়ার্ল্যান্ডের জাতীয় চিহ্ন, ত্রিপত্র শ্যামরক। আয়ার্ল্যান্ডের প্রজারা, এমন কি উগ্র জাতীয়তাবাদীরাও রানীকে বিপুল সম্বর্ধনা জানালেন। ইংল্যান্ডের রাজসিংহাসনের প্রতি একটা শুভেচ্ছার স্রোত তখনও প্রবাহিত ছিল, একধরনের ভালোবাসা। দুর্ভাগ্য ব্রিটিশ সরকার কাজে লাগাতে পারেন নি। যেমন পারেন নি অন্যান্য জায়গায়।

১৯০০ সালে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১০ লক্ষ আর তার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা সেই সময় ৩৪ কোটি। ওই সময়ের মারকেটরের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে পঞ্চমহাদেশ জুড়ে ছাপকা লাল দাগ ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের চিহ্ন 'লাইক স্পিলড ক্ল্যারেট অর শেভ ব্লাড'। পৃথিবীতে ১৯০০ সাল ছিল ইংরেজদের শতক এ পার্মানেন্ট নাইনটিনথ সেঞ্চুরি। ঐশ্বর্যে, ক্ষমতায় অহঙ্কারে যেন ফেটে পড়ছে। কোনও প্রতিযোগী নেই। তার সাম্রাজ্যবাদ তখনও তেমন নিন্দিত নয়। বিশাল প্রজাকুলে তেমন কোনও অসন্তোষ নেই। প্রতিবাদ নেই। The empire seemed immovable, inevitable, winning all its battles in the end, appearing to have no serious rivals and bearing itself with the serenity of absolute assurance

কটিবস্ত্র থেকে রাজমুকুট। ইংল্যান্ডের ইতিহাস সেই ধরনেরই এক বিস্ময়। ইওরোপের এইটুকু একটা দেশ। একপাশে জলে ভাসছে রুটির টুকরোর মতো। সেই দেশ ১৮৭০ থেকে ১৯০০-র মধ্যে, মাত্র তিরিশ বছরে, পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ ভূভাগের অধিপতি। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ ব্রিটিশ প্রজা। ঐতিহাসিকদের মন্তব্য The British Empire was one of history's odder phenomena. সমসাময়িক কালে এমন অভূতপূর্ব বিস্তারের নজির নেই। সাম্রাজ্যের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। অতীতে কোনও শক্তি এমন বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারে নি।

এই ঘটনাই ইংরেজ চরিত্রকে শ্রদ্ধেয় করেছে, ঘৃণিত করেছে, হাস্যকর করেছে। কখনও নিষ্ঠুর, কখনও যীশু।

৩৯

রাজনৈতিক মতবাদ আর জনমত দুপথে চলে। বোয়ার যুদ্ধে প্রাথমিক পরাজয়ে ইংলন্ডে 'ব্ল্যাকউইক' পালিত হয়েছিল। আবার লর্ড কিচেনারের নিষ্ঠুরতম আচরণও ধিকৃত হলো। স্টার জেমসনের ট্রান্সভাল

দখলের যুদ্ধ বোয়ার বাহিনীর প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ায় ইংল্যান্ডের মানুষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে হেসে উঠেছিলেন। পরাজিত জেমসন ইংরেজি ভাষায় নিজের স্থান করে নিলেন। 'জেমসন রেড' বলে একটা শব্দই তৈরি হয়ে গেল, 'বয়কটে'র মতো। যে কোনও ব্যর্থ অভিযানকে বলা হয় 'জেমসন রেড'।

কিচেনারের বরাত ভালো। তাঁর 'স্ট্র্যাটেজি' সফল হলো। শুরু হলো তাঁর নিষ্ঠুরতা। অনুভূতিশূন্য একজন মানুষ। নিজেকে জাহির করার কায়দাটা তিনি ভালই রপ্ত করেছিলেন। তাঁর স্বদেশবাসীরাই কিচেনারকে বলতেন, 'বুলি' 'ফুজিউজি'। দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার আগে তিনি সুদানে যা করে এসেছিলেন, তা সহজে ক্ষমা করা যায় না। অত্যন্ত অমানবিক আচরণের জন্যে কুখ্যাত। যুদ্ধের ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেনি। সিদ্ধান্ত নিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা আহত শত্রু সৈন্যদের গুলি করে মেরে ফেলা হবে। রেড-ক্রসের কোনও ভূমিকা থাকবে না। তাঁর ঘোড়ার পেছনে পেছনে চেনে বাঁধা শত্রুবাহিনীর প্রধানদের মার্চ করিয়েছিলেন। আমি কঠোরতম, আমি ভয়ঙ্কর, আমি এক দৈত্য, এই রকম একটা ভাবমূর্তি তৈরি করে ফেলেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই নিষ্ঠুরতার চরম প্রকাশ। ইংরেজরাই ছি ছি শুরু করলেন। হাই কমিশানার আলফ্রেড মিলনার দেশে লিখলেন, 'লোকটার সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। স্বেচ্ছাচারী। কারোর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না।' চেম্বারলেনকে পরে লিখলেন, 'কিচেনারের নীতি ভুল। আমাদেরই বিপদ ডেকে আনবে। 'চিন্তা' শব্দটা কিচেনারের অভিধানে নেই। ভদ্রলোক ক্রুকেড'।

যুদ্ধে পরাজয়ের পর একগুঁয়ে স্বাধীনচেতা বোয়াররা হাল ছাড়ল না। শুরু হলো গেরিলাযুদ্ধ। বিস্তীর্ণ ক্ষেত খামার। আত্মগোপনের প্রচুর সুযোগ। কৃষকদের সহযোগিতা। খবর আদান প্রদানের সুব্যবস্থা। গেরিলাদের এই সবই ছিল শক্তি। তারা তখন বেপরোয়া অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। আর এক অতীত ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, কোরিয়া।

বোয়াররা যত ক্ষিপ্ত কিচেনার তত নিষ্ঠুর। 'স্কর্চড আর্থ পলিসি' বা পোড়ামাটি নীতির তিনি অন্যতম জনক। কিচেনার ক্ষেত খামার জ্বালাতে শুরু করলেন। গৃহপালিত পশু, শস্যভাণ্ডার ধ্বংস করতে লাগলেন। হিটলার এসেছিলেন অনেক পরে। কিচেনার তার অনেক আগেই চালু করেছিলেন 'কনসেনট্রেশান ক্যাম্প'। সমস্ত পুরুষ, মহিলা, শিশু, গবাদি পশু, কাফ্রি, সব ধরে ধরে চালান করে দিলেন কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে। যে ক্যাম্পসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল সৈন্যবাহিনীর ওপর। কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের অতি শোচনীয়, অমানবিক অবস্থায় মানুষ মরতে লাগল হাজারে হাজারে। এ খবর চেপে রাখা গেল না। সভ্য দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ ধিক্কারে ফেটে পড়ল। ব্রিটেনে ইংরেজরাও বোয়ার বিদ্রোহ দমনের এই ইতর ব্যবস্থায় নীরব থাকতে পারলেন না। কয়েক দফা তদন্ত হয়ে গেল। তদন্তকারীদের মধ্যে ছিলেন জন বুচান। তিনি ক্যাম্প পরিদর্শন করে লিখলেন, Make my hair grey.. they were terrible.

সহস্র সমালোচনা; কিন্তু কিচেনার অচল অটল। অনেকটা ডায়ারের চরিত্র। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ডায়ারের আপসোস, পাঁচিলের জন্যে কামান ঢোকাতে পারলুম না, তাহলে আরও মারা যেত প্রাণ খুলে। হাইকমিশানার মিলনার আর সহ্য করতে পারলেন না। দেশে পালালেন। কিচেনার তাঁর সামরিক ভূমিকার সঙ্গে মিলনারের দায়িত্বও কাঁধে নিলেন। নিপীড়ন যন্ত্র আরও জোরদার হলো। কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে মৃত্যুর হার আরও বেড়ে গেল। প্রতি তিনজনে একজন শিশুর মৃত্যু। যুদ্ধে যত বোয়ার সৈন্য মারা গিয়েছিল, তার তিনগুণ মারা গেল ক্যাম্পে।

মিলনার চেম্বারলেনকে আর একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন, 'একজন সৈনিক নাগরিকের মতামতকে তেমন পাত্তা দেয় না। অবমাননাও করে থাকে। কিচেনারের মধ্যে এই ভাবটা অতি প্রবল। বন্ধুভাবাপন্ন, শুনতেও অরাজি নয়, কিন্তু কোনও ফল হয় না। আমার মত হলো, কঠোর ধারণা, কঠোর চরিত্রের একজন সামরিক ডিকটেটারকে চালনা করা অসম্ভব ব্যাপার। নিজের মতো করে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন, আর কিছু তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে, কিচেনারকে বলা যায় না! ভারতে আপনার ভীষণ প্রয়োজন।' ভারত আপনাকে ডাকছে। হিজ ম্যাজেস্টির মতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ার গেরিলাদের পেছনে অনবরত না ছুটে, ভারতে গিয়ে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করুন। বর্তমানে সেখানেই আপনার প্রয়োজন বেশি।'

দক্ষিণ আফ্রিকাব বোদ ঝলসানো প্রান্তবে একটি সাদা ঘোড়া ছুটছে। পেছনে একদল ভারতীয় বর্শাধাবী। লালচে পোশাক। সোনালী বেখা টানা। অন্যতম সেনাধ্যক্ষ স্যাব বিগুন ব্লাড শ্বেতঅশ্বারোহী, বক্তপিপাসু কিচেনাব সম্পর্কে লিখছেন, 'যুদ্ধেব কঠিন শ্রমে শবীব ভেঙে পড়েছে। শবীব বক্ষাব জন্যে কোনও ব্যায়াম কবেন না, কৃশ হয়ে পড়েছেন, বঙ ঝলসে গেছে, তাঁব ভেতবে কোথাও একটা মাবাত্মক বকমেব গোলমাল হয়ে আছে।'

বোযাব গেবিলাবা ইতিমধ্যে মবণপণ সংগ্রামে নামলেন। বিস্তীর্ণ কৃষি এলাকায় বিভিন্ন খামাব বাড়ি ছড়িয়ে ছিটিযে ছিল তখনও। গেবিলাদেব আশ্রয়েব অভাব নেই। খাদ্যেব অভাব নেই। ঘোড়াব অভাব নেই। পাঁচ দুর্ধর্ষ কম্যাণ্ডো নেতা, বোথা, ক্রিৎজিঙ্গাব, হেবতজগ, ডিওযেট, ডিলা বে হয়ে দাঁড়ালেন ইংবেজ-ত্রাস। কিচেনাব একে থামান তো ও মাথা চাড়া দেয। ওকে থামান তো সে মাথা চাড়া দেয। সঙ্ঘর্ষ। কিচেনাব উদ্ভ্রান্ত। কখনও ইংবেজ হাবে, কখনও বোযাব। সতেব মাস ধবে চলল এই সংগ্রাম। ইংবেজদেব প্রাণ বেবিয়ে যাবাব অবস্থা। ১৯০১ সালেবা ফেব্রুযাবি মাসে বোথা তাঁব বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিযে পড়লেন নাটালেব ওপব। পাবলেন না নাটাল উদ্ধাব কবতে। জেনাবেল ফ্রেঞ্চ তাঁকে হটিয়ে দিলেন। নাটালেব বিশাল এলাকা ধ্বংস হয়ে গেল এই লড়াইযে। অন্যান্য কম্যাণ্ডো নেতাবা কেপ কলোনি অক্রমণ কবলেন। তাঁবা আশা কবেছিলেন কলোনিব ওলন্দাজ প্রজাবা ভেতব থেকে সাড়া দেবে। কার্যত তা হলো না। বোযাব আক্রমণ কোনও ক্রমে প্রতিহত কবতে পাবলেও, শান্তিব আশা ক্রমশই হাবিয়ে যেতে বসল। ফেব্রুযাবিব শেষে কিচেনাব আব বোথা আলোচনায় বসলেন। যদি শান্তি আসে অবশেষে উভয় নেতাই বিদ্রোহীদেব ক্ষমা কবাব প্রস্তাবে এক মত হলেন। হাইকমিশানাব মিলনাব ক্ষমাব প্রস্তাব মেনে নিতে পাবলেন না। লণ্ডনেব মন্ত্রীসভা মিলনাবকেই সমর্থন কবলেন। গেবিলা নেতাবা আলোচনাব টেবিল থেকে ফিবে গেলেন তাঁদেব স্বাত্ত্বগোপন আশ্রয়ে। কিচেনাব ফিবে গেলেন তাঁব শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে।

কিচেনাব চিবকালই স্বাধীনচেতা। কাকব তোযাক্কা কবেন না। মতামতেব ধাব ধাবেন না। তিনি এবাব সম্পূর্ণ নিজেব মতো বিদ্রোহীদেব মুখোমুখি হলেন। উদ্ভাবন কবলেন পোড়া মাটি নীতি। বেললাইন ধবে ধবে নির্মাণ কবালেন ব্লক হাউস। গ্রামেব অন্য সীমানা ধবে ধবে বসালেন বেড়া। স্থানে স্থানে পাহাবা চৌকি। দুর্ভেদ্য এক একটি অঞ্চল তৈবি হলো। সব চেয়ে সাহসী কম্যাণ্ডোব পক্ষেও ওই ঘেবা অঞ্চলে ঘুবে বেড়ানো সম্ভব ছিল না। অবধাবিত মৃত্যুই হতো দুঃসাহসেব পুবস্কাব। তাবপব হিটলাবী কাযদায বোযাব গ্রাম থেকে সকলকে ঝেঁটিযে এনে ঢোকানো হলো সেই খোঁযাড়ে। কিচেনাবেব এই জঘন্য কাজেব পেছনে একটিও যুক্তি ছিল না, বোযাব গেবিলাবা সাদা পোশাকে, সাধাবণ মানুষেব সঙ্গে মিশে ছিল, অতএব বিশল্যকবণীব সন্ধানে গন্ধমাদন। গ্রামকে গ্রাম ধবে খোঁযাড়ে ভবো।

১৯০২ সালেব ফেব্রুযাবিব মধ্যেই ক্যাম্পে মৃতেব সংখ্যা দাঁড়াল বিশ হাজাবেবও বেশি। ছজনে একজন মৃত। প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষ ঘটনাব সত্যতা অস্বীকাব কবলেন বললেন অপপ্রচাব। তাবপব বললেন, কোনও সুবাহা সম্ভব নয। অবশেষে এক ইংবেজ বমণী, এমিলি হবহাউস সভ্যসমাজে সব ফাঁস কবে দিলেন। দুনিযা স্তম্ভিত। সভ্যমানুষ এমন বন্য আচবণ কবতে পাবে। অনুসন্ধানে দেখা গেল পাবে। ক্যাম্পবেল ব্যানাবম্যান পবে প্রধানমন্ত্রী হযেছিলেন, তখন ছিলেন বিবোধী দলে। তিনি এই কনসেনট্রেশান ক্যাম্পকে ধিক্কাব জানালেন। বললেন, কিচেনাব যে পদ্ধতি বেব কবেছেন একে বলে, 'মেথডস অফ বাববাবিজম'।

চেম্বাবলেন তখন সামবিক অধিকাব থেকে ক্যাম্পগুলিকে মুক্ত কবে অসামবিক কর্তৃপক্ষেব হাতে তুলে দিলেন। দেখতে দেখতে অবস্থাব উন্নতি হলো। শেষে ১৯০২ সালেব ২৩ মার্চ বোযাববা শান্তিব আবেদন জানাল। তিন দিন পবে মাবা গেলেন প্রবাদ পুরুষ সিসিল বোডস। হৃদবোগে অক্রান্ত হয়ে। তিনি তাঁব শেষ ভাষণে বলে গেলেন, 'তোমবা ভাবছো বোযাবদেব তোমবা পবাজিত কবেছ। তা কিন্তু নয। ওলন্দাজবা পবাজিত হয নি। পবাজিত হয়েছে ক্রুগাবিজম। দুর্নীতিপবাযণ, দুষ্ট একটি সবকাব। যে সবকাবেব মধ্যে ওলন্দাজ চবিত্রেব ছিটেফোঁটাও ছিল না। ইংবেজ চবিত্রেবও স্পর্শ ছিল না। ওলন্দাজেবা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রাণেব মানুষ। শক্তিশালী, কর্মোদ্যোগী। তাবা আগেও যেমন অপবাজেয ছিল এখনও তাই। এই দেশ যেমন তোমাদেব সেই বকম এদেশ তাদেবও। এখনও। অতীতে দুটি

জাতি যেমন পাশাপাশি সদ্ভাবে সহাবস্থান করেছে, কাজ করেছে, এখন আবার সেই ভাব, সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।' শেষ কথাটি বলে বিদায় নিলেন কর্মবীর রোডস।

মে ৩১। স্থান, ভিরিনিগিং। ইংরেজ আর ওলন্দাজদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো সন্ধিচুক্তি। সন্ধির শর্তে রোডসের শেষ বক্তব্যের ছায়া পড়ল। এত উদার শর্তে আর কোনও সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ইতিহাস সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বত্রিশটি বোয়ার কম্যাণ্ডো বাহিনী তখনও গ্রামাঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, অপরাজিত। প্রতিটি বাহিনী থেকে দু'জন করে দূত এলেন ব্রিটিশ দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। দীর্ঘ আলাচনার পর তাঁরা অস্ত্র-সমর্পণে সম্মত হলেন। চুক্তি অনুসারে কারোর বিরুদ্ধেই কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। শীঘ্রই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি ছিল সন্ধিতে। সন্ধি অনুসারে ব্রিটেন তিরিশ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। শেষের শর্তটি অতি অসাধারণ। আজ পর্যন্ত এমন উদারতার দৃষ্টান্ত বিরল। সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পরই লর্ড সলিসবেরি পদত্যাগ করলেন। শেষ প্রধানমন্ত্রী যিনি হাউস অফ লর্ডসে বসতেন। তাঁর সময়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব বিস্তৃতি হয়েছিল। পবের বছরই তিনি মারা গেলেন। আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ রাজনীতি থেকে চির বিদায় নিল এক ধরনের ভদ্র উদাসীনতা। প্রাচীন বলে পরিত্যক্ত হলো এত কালের অনুসৃত পদ্ধতি। সন্ধির সমস্ত শর্তই রক্ষিত হলো। দক্ষিণ আফ্রিকাকে গড়ে তুললেন মিলনার। ইংরেজ পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল। বাহিনীতে শুধু ইংরেজ সৈন্য নয়, ভারতীয়, ক্যানেডিয়ান ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের সৈন্যও ছিল। মৃত্যুর হার দশজনে একজন। যুদ্ধে ইংরেজের খরচ হয়েছিল ২২ কোটি পাউণ্ডেরও বেশি।

গান্ধীজি বোয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্মৃতিকথায় লিখছেন, যুদ্ধ ঘোষিত হবার পর, প্রথমে আমার সহানুভূতি ছিল বোয়ারদের প্রতি। পরে মনে হলো বোয়ারদের সমর্থন করার অধিকার আমার নেই। দক্ষিণ অফ্রিকায় ইংবেজ শাসনের আমি অনুগত। অতএব এই যুদ্ধে ইংরেজদেরই সমর্থক হওয়া উচিত। আমার মনে হলো, ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবেই আমি আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি যখন, তখন সাম্রাজ্য রক্ষার যুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষই আমকে অবলম্বন করতে হবে। সেই সময় আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌছেছিলাম, ভারত যে পথে তার মুক্তি খুঁজে নিতে পারে, সে পথ হলো, ভেতরে থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই সাহায্যে। আমি তখন যতজন সম্ভব ততজন বন্ধু সমবেত করে একটি দল গঠন করি। অনেক তদবিরের পর অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী হিসেবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। সাধারণ ইংরেজদের চোখে ভারতীয়রা ছিল ভীরু, ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা নেই। নিজের স্বার্থ ছাড়া ভারতীয়রা আর কিছু বোঝে না। আমার বহু ইংরেজ বন্ধু আমাকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করেন। একমাত্র ডক্টর বুথ আমাকে সমর্থন করেন। তিনি আমাদের উদ্ধার ও শুশ্রূষার কাজে ট্রেনিং দিলেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমরা ফিট সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলাম।

পরে লটন আর এসকম্ব গান্ধীজীর পরিকল্পনা সমর্থন করলেন। মহাত্মাজি যুদ্ধ সীমান্তে যাবার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করলেন। আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করে ব্রিটিশ সরকার জানালেন, এই মুহূর্তে আপনার সেবায় আমাদের প্রয়োজন নেই। ভারতীয়রা ইংরেজকে সাহায্য করার জন্যে যুদ্ধে যাবে, তাও কত ভজকট। শেষে ডক্টর বুথের সুপারিশে নাটালের বিশপকে ধরে গান্ধীজীর সেবাদল যুদ্ধে গেল। দলে ছিলেন ১১০০ ভলান্টিয়ার। প্রথমে কাজ করেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে। পরে স্পিয়ন কপ-এর বিপর্যয়ের পর, জেনারেল বুলার অনুরোধ জানালেন, 'আপনাদের বাধ্য করার অধিকার আমার নেই তবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত সৈনিকদের সরিয়ে আনার দায়িত্ব যদি আপনারা নেন তাহলে বাধিত হব।' স্পিয়ন কপে গান্ধীজীর সেবাদল গুলিগোলার মধ্যেই কাজ শুরু করেন। প্রতিদিন কুড়ি থেকে পঁচিশ মাইল স্ট্রেচার ঘাড়ে করে হেঁটেছেন। গান্ধীজী লিখছেন, আহতদের মধ্যে জেনারেল উডগেটের মতো সৈনিককে বহন করার মহান অধিকারও আমরা অর্জন করেছিলাম। বোয়ার যুদ্ধকে অবলম্বন করে ভারতীয় সেবাদল গঠন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের মধ্যে একটা ঐক্যের ভাব এনে দেয়। তারা পরস্পরের আরও কাছে চলে আসে। সংবাদপত্রে ভারতীয়দের প্রশংসা করে লেখা হয়। প্রকাশিত হয় কবিতা, যার প্রথম লাইনটা ছিল এই রকম, We are sons of Empire after all.

যুদ্ধ শেষ হলো। ইংরেজ হলো সর্বময় কর্তা। British reigned supreme over the sullen and resentful Afrikaners. দুজন বোয়ার সামরিক নেতা, লুই বোথা (বর্তমান প্রেসিডেন্ট বোথার কোনও পূর্বপুরুষ নয়) আর ইয়ান খ্রিশ্চিয়ান স্মাটস ইংরেজ আর পরাজিত ওলন্দাজদের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব ফিরিয়ে আনার জন্যে খুব চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের দু'জনের সহায়তায় ব্রিটেন ১৯১০ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চলকে এক করে প্রতিষ্ঠা করলেন, ইউনিয়ান অফ সাউথ আফ্রিকা। বোথা আর স্মাটস হলেন এই ইউনিয়ানের প্রথম দুই প্রধানমন্ত্রী। দেখতে দেখতে এসে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটেনের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিচেনার হলেন সেক্রেটারি অফ ওয়ার। লর্ড কিচেনারের শেষটা কিচেনারেরই মতো। বিখ্যাত কম্পোজার ভাগনারের কায়দায়। যাচ্ছিলেন রাশিয়ায়। ক্রুজার 'হ্যাম্পশায়ারে' অর্কনের বরফগলা শীতল জলে যুদ্ধ জাহাজ সমেত তলিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে। সলিল সমাধি। বড় সুন্দর রোমান্টিক মৃত্যু।

যুদ্ধ শেষ হলো। মিটমাট হলো। শান্তি এল। এটা হলো বাইরের প্রশান্তি। তলে তলে দানা বেঁধে উঠল আর এক আন্দোলন। আণ্ডারগ্রাউণ্ড মুভমেন্ট। যে আন্দোলনের সুর ছিল, 'আফ্রিকানার সলিডারিটি'। আফ্রিকানদের ঐক্য। ইংরেজ আর কালোদের প্রতিহত করা। এই দলের নাম হলো 'ব্রায়েডারবণ্ড' বা ব্রাদারহুড। ১৯১৮ সালে স্থাপিত হয় এই গুপ্ত সমিতি। এই সমিতিটি যে সময় স্থাপিত হয়েছিল সেই সময় বোয়ার বা আফ্রিকানারদের অবস্থা শোচনীয়। চাষবাস নষ্ট হয়ে গেছে। চাকরি নেই। ইংরেজ শাসনে ভারতের অবস্থার মতো। ভালো চাকবি ইংরেজদের। সর্বত্র ইংরেজদের অগ্রাধিকার। ভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজির স্টিম রোলার। 'ব্রায়েডারবণ্ডের' আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, অফ্রিকান ভাষার ব্যবহার আরো ব্যাপক করা। ডাচ ভাষারই রূপান্তর এই আফ্রিকান ভাষা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এই ভাষা লিখিত ভাষার মর্যাদা পায়।

কোনও টেলিফোন ডাইরেক্টারিতে ব্রায়েডারবণ্ডের নাম ঠিকানা পাওয়া যাবে না। সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১২ হাজার। আটশো সেল ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বোথা যে সেলের সদস্য তার সভ্যসংখ্যা ৪,৪৮৭। চার্চ এবং রাষ্ট্রের অধিকাংশ নেতা এই 'ব্রায়েডারবণ্ডে'র সদস্য।

ড্যানিয়েল মালান 'ব্রায়েডারবণ্ডে'র একজন উৎসাহী সদস্য। গোঁড়া বর্ণবিদ্বেষী। ১৯৩৪ সালে তিনি এখাকার 'ন্যাশন্যাল পার্টি' স্থাপন করেন। বিভিন্ন স্তরে গোপনে কাজ করতে করতে আফ্রিকানদের অপমানের প্রতিশোধ নিলেন ১৯৪৮ সালে। নির্বাচনে স্মাটসকে ও তাঁর ব্রিটিশ প্রভাবকে পরাভূত করলেন। মালানের শ্লোগান ছিল 'অ্যাপারথিড'। সাদারাই বর্ণশ্রেষ্ঠ। অশ্বেতকাযরা বর্ণাধম। দক্ষিণ আফ্রিকা শ্বেতাঙ্গদের স্বর্গভূমি। নির্বাচক মণ্ডলী এই শ্লোগানে মালানের দিকে টলে গেলেন। অ্যাপারথিড-কে নতুন শ্লোগান মনে হলেও, পুরনো একটি নীতিরই নয়া আবির্ভাব। ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ বটল। ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয় 'সাউথ আফ্রিকা অ্যাক্ট'। যে আইনে বলা হলো, আইন সভায় অশ্বেতকায়রা বসার অধিকারী নয়। ১৯১৩ সালে এল 'দি নেটিভস ল্যাণ্ড অ্যাক্টস'। অতি সাংঘাতিক আইন। দেশটাকে ভাগ করে ফেলা হলো। শ্বেত এলাকা কৃষ্ণ এলাকা। দেশের ৮৫ ভাগ শ্বেতাঙ্গদের জন্যে, আর ১৫ ভাগ রইল অশ্বেতকায়দের জন্যে। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের আলদা করে দেওয়া হলো গরু ছাগলের মতো। ১৯০২ সালের আর একটি আইনে শ্বেতাঙ্গ আর অশ্বেতাঙ্গ বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আইন ছিল ; তবে আইনের প্রয়োগ কঠোরতার অভাব ছিল। শ্বেতজাতির অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণকায়দের তেমনভাবে কোণঠাসা করা হয় নি।

মালানের আফ্রিকানার ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি 'অ্যাপারথিড' শ্লোগান তুলে অত্যাচারের শক্তিশালী একটি রূপরেখা তৈরি করে ফেললেন। ১৯৪৯-এ তাঁর দল নিয়ে এলেন 'প্রহিবিশান অফ মিক্সড ম্যারেজেস অ্যাক্ট।' শুরু হলো আইনের প্রয়োগ। আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গেল মহা সমস্যা। কে কোন্ জাতির, নির্দিষ্ট করাই মুশকিল। ১৯৫০ সালে এল, পপুলেশান রেজিস্ট্রেশান অ্যাক্ট। চেষ্টা চলল, সংজ্ঞা নির্ধারণের। নিয়ন্ত্রণের। ফল হলো কি? প্রতি বছর কমপক্ষে, জাতি পাল্টাবার জন্যে হাজার দরখাস্ত পড়ে। ১৯৫০-এ বিধিবদ্ধ হলো, 'গ্রুপ এরিয়াজ অ্যাক্ট'। এই আইনে সরকার ইচ্ছামতো যে কোনও অঞ্চল থেকে কালা আদমিদের উচ্ছেদের অধিকার পেলেন। কেপটাউনের ডিস্ট্রিক্ট সিক্স-এ এই আইন প্রয়োগ করা হলো। প্রাণচঞ্চল, কর্মব্যস্ত একটি সুন্দর জনপদ থেকে ৭০ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে জোর

করে দূরে প্রায় খোঁয়াড়ের মতো একটি জায়গায় ফেলে দিয়ে আসা হলো। বুলডজার দিয়ে সত্তর হাজার মানুষের এই শহরটিকে গুঁড়িয়ে ফেলা হলো। উদ্দেশ্য, শ্বেতকায় মানুষদের বাড়ি তৈরি হবে, বাজার হবে, সুপার মার্কেট হবে, বহুতল বাণিজ্যিক কেন্দ্র হবে। হোয়াইট সিটি, হোয়াইট কমার্শিয়াল প্লেস। সবই হলো, কিন্তু বহু শ্বেতাঙ্গ মানুষ, যাঁদের মানবিকতা আছে, তাঁরা এই পরিকল্পনা বয়কট করলেন। ফলে বহু অঞ্চল পড়ে আছে অনধিকৃত।

এলো ১৯৬৫ সাল।

৪০

বাড়তে বাড়তে ১৯৬৫ সালে বর্ণবিদ্বেষ চলে গেল প্রায় পাগলামির পর্যায়ে। যুক্তিতর্কের সীমানা লঙ্ঘন করে গেল। একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। স্থান জোহানেসবার্গ। পাত্রপাত্রী, একটি অন্ধ শ্বেতাঙ্গ বালিকা সঙ্গে তার অশ্বেতাঙ্গ পরিচারিকা। তারা একটি ট্যাক্সি ডাকল। চালক, একজন শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানার। ট্যাক্সিচালক স্পষ্ট বললে, আমি অন্ধ শ্বেতাঙ্গ বালিকাটিকে নিতে রাজি আছি। কালো পরিচারিকাটিকে উঠতে দেবো না। হাস্যকর হলেও বর্ণবিদ্বেষীদের জগতে এই ঘটনা ঘটছে।

আর একটি উদাহরণ, বেডএর সের শিশুমেলা। ঘোষণা হলো, সাদা আর কালো শিশুরা একই সঙ্গে মেলায় যোগ দিতে পারবে না। তৃতীয় উদাহরণ, ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা জানালেন, কোনও অভ্যর্থনা সভায় কালো অতিথিদের উপস্থিত হবার সম্ভাবনা থাকলে, তাঁরা সে সভায় যাবেন না। বর্ণবিদ্বেষের চতুর্থ শিকার স্বয়ং একজন আফ্রিকানার কবি ব্রেটেন ব্রেটেনবাক। তাঁর স্ত্রী ভিয়েতনামের একটি কালো মেয়ে। কবি তাঁর স্ত্রীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় এনে পিতামাতার সঙ্গে পরিচয় করাতে চান। সরকার অনুমতি দিলেন না। পঞ্চম উদাহরণটি আরও হাস্যকর। ইলেকট্রিকের ওয়্যারিং হচ্ছে। মিস্ত্রী শ্বেতাঙ্গ, সাহায্যকারী অশ্বেতকায়। বদ্ধপাগল দেশের নিয়মকানুন হবু রাজার দেশের মতো। অশ্বেতাঙ্গ সাহায্যকারী দুটো তার ধরে থাকতে পারবে, জুড়তে পারবে না। তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ।

এই ঘৃণ্যতম পাগলামির অন্যতম শক্তিশালী গোঁয়ারগোবিন্দ হলেন মালানের স্থলাভিষিক্ত, হেন্ড্রিক ভেরওয়ার্ড। বেতারভাষণে তিনি দেশবাসীকে জানালেন,'কালো আর সাদাকে আলাদা করে এই যে দেশগঠনের ব্যবস্থা এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, সকলের সুখ, নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব। এই দ্বৈত ব্যবস্থায় বান্টুরাও সুখী হবে, শ্বেতাঙ্গরাও সুখি হবে।' অ্যান্ড্রিজ ট্রিউবিনিক্ট কি বলছেন শোনা যাক। ইনি একদা ব্রায়েডারবণ্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। সেখান থেকে ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে কনজারভেটিভ পার্টি স্থাপন করেছেন। তার উক্তি We believe that justice is best attained by way of differentiation or seperate development '

সুখ আর ন্যায়বিচারের এই নিষ্ঠুর পন্থা বিশ্ব জনমতকে আলোড়িত করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষী নীতির অবসানে বিশ্বব্যাপী প্রচার চলেছে। গতবছর আমেরিকা জনমতের ক্রমবর্ধমান চাপের কাছে নতি স্বীকার করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক নীতি নির্ধারণে বাধ্য হয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন সরকারী যৌথ উদ্যোগে আমেরিকান ডলার আর লগ্নি করা হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইস্পাত, লোহা, কয়লা ইউরেনিয়াম ও বস্ত্রাদি আমেরিকায় আমদানি করা হবে না। আমেরিকা থেকে কম্পিউটার আর পেট্রোলিয়াম দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানি করা হবে না। এই একই শাস্তির ব্যবস্থা নিয়েছেন ইওরোপিয়ান কমিউনিটি, কমনওয়েলথ আর জাপান।

বিবাদপ্রিয় বোথা কিন্তু এখনও গরম কথা বলে চলেছেন। সহজে নতিস্বীকার করার মতো চরিত্র তিনি নন। আফ্রিকানার ঐক্যের ঐতিহ্যকে তিনি জাগিয়ে রেখেছেন। শাস্তিমূলক সমস্ত ব্যবস্থাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার মনোবল তিনি সঞ্চিত রেখেছেন। তাঁর নীতির বিরোধী সমস্ত দেশকে বলেছেন, 'মনুষ্যবিদ্বেষী, ভণ্ড'। আফ্রিকানাররা বোথার নীতিকে সমর্থন করলেও অনেকেই বুঝে গেছেন, এই

নীতি বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না। অবাস্তব নীতি। প্রাচীন কালে চললেও চলতে পারত। আধুনিক শিল্পসভ্যতায় অচল। শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত অর্থনীতিতে অশ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণ মানুষদের প্রয়োজন আছে। একই অফিসে, একই কারখানায় সাদা আর কালো মানুষকে পাশাপাশি কাজ করতে হবে তা না হলে সব অচল হয়ে যাবে। স্বেচ্ছাচারী বোথা চাপের কাছে সহজে নতিস্বীকার করার মানুষ নন। তবু তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন,'অ্যাপারথিড' শব্দটি তাঁর পছন্দ নয়। তিনি চান 'কো-অপারেটিভ কো-এগজিসটেনস'। সহাবস্থান ও সহযোগিতা।

খুঁতখুঁতে মন নিয়ে বোথা অবশেষে সংস্কারের কথা ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ সামান্য কিছু দিয়ে খিদে মেটাও। তিনি আবার নির্বাচনের আয়োজন করলেন। ভাবলেন বর্ণবিদ্বেষের মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে জিতে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেবেন। এই ঘোষণায় বোথা বামপন্থী সমালোচনার প্রবল স্রোতে ভেসে গেলেন। বামপন্থী মানে আফ্রিকানারদের গোঁড়া ঐতিহ্যের বিরোধী। তিন দিক থেকে এই সমালোচনার ঝড় উঠল। সবচেয়ে বড় আক্রমণ এল আফ্রিকানার বুদ্ধিজীবী মহল থেকে। বর্ণবিদ্বেষী নীতি চালু রাখতে হলে বুদ্ধিজীবীদের সেই নীতির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে হবে। বুদ্ধিজীবীদের ঘাঁটি হলো কেপটাউনের সন্নিহিত স্টেলেনবস্ক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকরা বোথা সরকারের ঘোরতর বিরোধী। একজন দু'জন নয় সাতাশজন প্রবীণ অধ্যাপক প্রতিবাদে ন্যাশন্যাল পার্টি থেকে সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন। শুধু পদত্যাগ নয় একটি ইস্তাহারে বর্ণবিদ্বেষের ছিটেফোঁটাও আর যাতে অবশিষ্ট না থাকে সেই দাবি তুলেছেন। কেপটাউনের ন্যাশন্যালিস্ট সংবাদপত্র 'ডাই বার্গার' লিখলেন, সাতাশ জনের পদত্যাগ এমন কিছু ব্যাপার নয়। এই প্রতিবাদ, দুর্বল প্রতিবাদ কারণ ফ্যাকাল্টিতে সাতশোরও বেশি শিক্ষাবিদ আছেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনশো জন সদস্য ইস্তাহারে সই দিলেন, আর জানালেন বাকি সদস্যরাও শীঘ্রই সই করবেন।

বর্থনিতের সুপরিচিত অধ্যাপক টেরেব্লাঁশ লিখলেন, সরকার অর্থহীন বাগাড়ম্বরের দাস হয়ে পড়েছেন। এই সরকার কিছুতেই তাঁর খাতির স্বীকার করতে চান না। বর্ণবিদ্বেষ নীতি এঁরা পরিহার করবেন না। ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি হলো আফ্রিকানার পার্টি। এঁরা ক্ষমতা শ্বেতাঙ্গদের হাতে নয় আফ্রিকানারদের হাতেই রাখতে চান। এই সরকার সংশোধন চান না। ওপর ওপর সংশোধনের প্রলেপ বুলিয়ে আফ্রিকানার শাসনই কায়েম রাখতে চান। টেরেব্লাঁশ ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির একজন বড় উপদেষ্টা ছিলেন। ব্রোয়েডারবণ্ডেরও সদস্য ছিলেন। সাউথ অ্যাফ্রিকান ব্রডকাস্টিং করপোরেশানের ভাইস চেয়ারম্যান। ইস্তাহারে সই করার অপরাধে বিতাড়িত।

সাতাশ জনের আর একজন দর্শনের অধ্যাপক ইস্টারহুয়েস জোহানেসবার্গের 'সানডে টাইমস' এ লিখলেন 'সঙ্কীর্ণ রাজনীতি আর গতানুগতিক স্লোগানে কেউ আর সন্তুষ্ট নয়। মানুষ শুধু নতুন ধারণাই চায় না। রাজনীতির নতুন ধরন চায়, ছন্দ চায় যা সকলের পক্ষেই সন্তোষজনক হবে। ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি ও তার সদস্যদের কাজে সকলেই অখুশি। এই অসন্তোষে সংশোধন ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত সংশোধনের ধারা লক্ষ্য এবং নীতি।' অধ্যাপক ইস্টারহুয়েস লিখছেন এই মত শুধু কয়েকজন অধ্যাপকের নয়, এই মত পোষণ করেন ডাক্তার, ব্যবসায়ী এবং যুবকরাও।

বিরোধীদের দল দিনে দিনে বড় হচ্ছে। ঔপন্যাসিক আঁদ্রে ব্রিঙ্ক প্রোগ্রেসিভ ফেডারেল পার্টির নেতা, ফ্রেডারিক ভান জিল স্ল্যাবর্টি। তিনি এক সময় সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। স্ল্যাবর্টি বলছেন, 'বোথা ক্ষমতাগর্বী প্রেসিডেন্ট। প্রশ্নে তাঁর অস্বস্তি। আলাপ আলোচনায় অস্বস্তি। অতীতে ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। এখন বোথা পার্টিকে হুকুম করেন। এর ফলে পার্লামেন্ট পৌরুষ হারিয়েছে। দলের বিশ্বস্ত সদস্যদের ধারণা, নিয়তির ওপর তাঁরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন।'

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যালভিনিস্ট চার্চ ছিল বর্ণবিদ্বেষের একনিষ্ঠ সমর্থক। এতকাল চার্চ ধর্মভীরু আফ্রিকানারদের বুঝিয়ে এসেছেন, শ্বেতাঙ্গরাই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। সাদা আর কালোয় অবস্থাগত একটা পার্থক্য থাকবেই। সেইটাই আমাদের প্রভুর অভিপ্রেত। এতকাল যাঁরা বর্ণবিদ্বেষের স্বপক্ষে ধর্মকে খাড়া করেছিলেন তাঁরাই এখন বেঁকে বসেছেন। ট্রান্সভাল অথবা অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে হামেশাই এমন দৃশ্য চোখে পড়ত, পিকআপ ভ্যানের আসনে বসে আছে সাদা চামড়ার আফ্রিকানার আর জায়গা থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গ যাত্রী উবু হয়ে বসে আছে পেছনের পাদানিতে। বিশেষ দোকানের বিশেষ কাউন্টার

থেকে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক দুধ রুটি কিনে—পথের পাশে বসে মধ্যাহ্নাহার সারছে, আর ভেতরে আরামে লাঞ্চ করছে শ্বেতাঙ্গ প্রভু। কৃষ্ণাঙ্গরা এইটাকেই মেনে এসেছে প্রভুর ইচ্ছা বলে। উভয়েই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। প্রভুর নির্দেশেই বৈষম্য। সেই চার্চ এখন আর প্রেসিডেন্ট বোথাকে সমর্থন করতে চাইছেন না। ট্র্যাডিশান থেকে সরে আসছেন। ১৯৭৪ সাল থেকেই ভিন্ন মতের সুর শোনা যায়, ১৯৮০ সালে আটজন থিওলজিয়ান একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করলেন। চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বিভিন্ন বর্ণের মানুষকে ঈশ্বরের নির্দেশমতো একই বিশ্বাসের ছায়ায় একত্র করতে অসমর্থ হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার চার্চ। ১৯৮২ সালে এই আটজন সংখ্যায় বেড়ে হলেন ১২৩ জন। তাঁরা চার্চকে ফতোয়া দিলেন, ধর্মের প্রকৃত বিধান অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের অবসান ঘটিয়ে চার্চকে ঢেলে সাজানো হোক। প্রাচীন সংস্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নববিধানে, চার্চসার্ভিসে শ্বেত আর কৃষ্ণকে একই সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রার্থনার অধিকার দেওয়া হোক।

গত অক্টোবরে চার্চের নীতি সংশোধনী সভায় প্রায় একটি বিপ্লব ঘটে গেল। ১৬৬২ সালে প্রথম ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে এসেছিল ডাচ রিফর্মড চার্চ। প্রথম কৃষ্ণদাসটি প্রভুর পাশাপাশি দাঁড়িয়েই প্রার্থনা করার অধিকার পেয়েছিল। ১৮৫৭ সালে প্রথম ফতোয়া জারি হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গদের জন্য আলাদা সার্ভিস হবে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে আলাদা। গত অকটোবর সম্মেলনে চার্চ ঘোষণা করলেন, 'রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণবৈষম্য নীতির প্রয়োগ ডাচ রিফর্মড চার্চ এন জি কে সমর্থন করতে পারে না। কারণ এই নীতি সামগ্রিক ভাবে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করছে। এই নীতির ফলে একদল মানুষের উপকার হচ্ছে, আর এক দল মানুষ ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। এই নীতি খ্রিস্টের নীতির বিরোধী। তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন পারস্পরিক ভালবাসা আর সত্য ধর্ম।' অকটোবর-অধিবেশনের পরেই চার্চের দরজা খুলে গেল সকলের জন্যে।

সংস্কার সহজে কি যায়! সোনার খনির শহর জার্মিস্টোনে বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গ চার্চবাসী চার্চ চত্বর ছেড়ে চলে গেলেন। কারণ সেখানে চার্চের এলডার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ। প্রিটোরিয়ায় তিন হাজার শ্বেতাঙ্গ স্বতন্ত্র একটি চার্চ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রিফরমেশানের কথা বলা যায়, সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ সহজে মেনে নিতে পারে না।

জনৈক স্থপতির মত, 'দক্ষিণ আফ্রিকা কালা আদমিদের হাতে চলে যাক, তা সহ্য করতে পারব না। তবে কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা আর সহ্য করা যায় না। আমি আমার কৃষ্ণাঙ্গ কর্মচারিদের ভালই মাইনে দিই। তারাও আমার সঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসে। তার মানে এই নয় যে তারা আমার পাশের ঘরে বসবাস করুক। তবে র‍্যান্ড স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে যখন চারপাশে তাকাই তখন দেখি অজস্র কালো মানুষ। সংখ্যায় ক্রমশই বাড়ছে। শ্বেতাঙ্গদের বাঁচতে হলে এদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতেই হবে।'

ইয়ান ভ্যান রেনসবার্গ একজন রেলকর্মী। একটি লঙ্গরখানার পরিচালক। যেখান থেকে প্রতিদিন তিনশো দরিদ্র আফ্রিকানারকে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। রেনসবার্গ বলছেন, 'আমি এখনও মনস্থির করতে পারি নি। কোনও পার্টি, কোনও নীতি আমাকে খুশি করতে পারে নি। যা হচ্ছে তার কোনওটাই আমি সমর্থন করি না। রাতারাতি তো আর নিজেকে বদলাতে পারি না।'

জর্জ ওয়াকার, ব্যাঙ্ক অফিসার। চাকরি ছেড়ে বর্তমানে একটি ফাউন্ডেশানে যোগ দিয়েছেন। যে ফাউন্ডেশান বর্ণবিদ্বেষ দূর করার জন্যে সংগঠিত। ওয়াকার বলেছেন, 'এ দেশের পরিবর্তন আফ্রিকানারদেরই আনতে হবে। আমি সেই কাজেই নেমেছি।'

জোহানেসবার্গের শ্বেতাঙ্গ গৃহবধূ বলছেন, 'নেতারা যদি বলেন তোমার পাশেই কালোরা বাস করবে, তাহলে আমি আর কি করতে পারি। তারা যদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়, গোলমাল না হয়, তাহলে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু আমি চাই কালোরা ঢোকার আগেই আমার ছেলেমেয়েদের স্কুলের পড়াটা যেন শেষ হয়ে যায়।'

ডয়ি ক্রোয়ুস একজন ট্র্যাফিক পুলিশ। তাঁর বক্তব্য : 'কালোদের ঘৃণা করা খুব সহজ। কালো ড্রাইভারদের দেখে দেখে আমার এই ধারণা হয়েছে। ওদের মতো ক্রিমিন্যাল খুব কমই দেখা যায়। হেন ক্রাইম নেই যা ওরা করতে পারে না। নির্বোধের দল। এদের হাতে দেশ চলে গেলে, এরা কোন্ আইনে চালাবে কে জানে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার জাতির, অর্থাৎ আফ্রিকানারদের সঙ্গেই থাকতে আনন্দ পাই। তবে পরিবর্তন তো আসবেই। আসুক আমি ভয় পাই না।'

জোহান দ ভিলিয়ারস একজন কৃষক। লিমপোপো নদীর ধারে পাঁচ হাজার একরের একটি খামারের

মালিক। জোহানের বক্তব্য ঃ 'আমরা শ্বেতাঙ্গরা আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় চিন্তায় পড়েছি। আমরা সাদা চামড়ারা অত্যন্ত লোভী। আমরা কেবল, আরো চাই। আরো আরো চাই। আফ্রিকানরা অন্য ধরনের। ক্ষবা হলে ওরা ঠিক চালিয়ে নিতে পারে। মানিয়ে নিতে পারে। ওরা যদি জন্মের হার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আর আমরা যদি আমাদের লোভ সংযত করতে পারি তাহলে কেন আমরা পবস্পব পরস্পরেব সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারব না। আমরা পরিকল্পনা করব ওরা কাজ করবে।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি উত্তাল। প্রেসিডেন্ট বোথাব বয়স হলো একাত্তর। বৃদ্ধ স্টেটসম্যানের ক্ষীণ ঘোষণা ঃ Aspirations of urban blocks and the fulfilment of them must form part of the strategy for the protection of every one South Africa.

৪১

দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সংখ্যা দু কোটি যাট লক্ষ। বর্ণসঙ্কবেব সংখ্যা ৩০ লক্ষ। ইংরেজি ভাষা ভাষী শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা মাত্র ১৫ লক্ষ। ভাবতীয় আব এশিযাব অন্যান্য অঞ্চলেব মানুষের সংখ্যা সাকুল্যে ১০ লক্ষ । এই হলো অবস্থা। তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষেব মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা মাত্র তিরিশ লক্ষ। এই তিরিশ লক্ষ মানুষ সাড়ে তিন কোটির ওপর ডাণ্ডা ঘুরিয়ে চলেছে। দেশের প্রতিটি ইঞ্চি তাদেব দখলে। অর্থনীতি তাদের হাতের মুঠোয়।

সোয়েটোব পুলিশ প্যাবেড গ্রাউণ্ডেব পাশ দিয়ে একটা লবি চলেছে। সোয়েটো হলো জোহানেসবার্গের বিবাট কৃষ্ণাঙ্গ শহর। লবিব পেছন দিক থেকে একটা গ্রেনেড ছুটে এল। প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাঝখানে ফাটল শক্তিশালী গ্রেনেড। কৃষ্ণাঙ্গ একজন শিক্ষার্থী সঙ্গে সঙ্গে মাবা গেলেন। মারাত্মক ভাবে আহত হলেন আবও চৌযট্টি জন। ঠিক ছ ঘণ্টা পর, শ্বেতাঙ্গ অঞ্চল মেফেয়ারে একটি পার্ক করে রাখা গাড়ির তলায় বোমা ফাটল। চারপাশেব বাড়ির কাচ ভেঙে গেল। গাড়িতে ধরে গেল আগুন।

নতুন কবে শুরু হলো ভায়োলেনস। এ তো দুটি সামান্য ঘটনা। আরো বড় ঘটনা অপেক্ষা করে ছিল অন্যত্র সাবা দেশ জুড়ে। বেল ধমঘট। ১৮ হাজার কর্মী সেই ধর্মঘটের সামিল হয়েছেন। ছয় সপ্তাহ ধবে ধর্মঘট চলাব পর সরকাব ফতোয়া জারি কবলেন ধর্মঘটীরা বুধবাব কাজে ফিরে না এলে ছাঁটাই কবা হবে। বুধবার দিন মাত্র দু হাজার কর্মী ভয়ে ভয়ে কাজে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাকি যোল হাজাবকে নোটিস ধবান হলো।

তখন জন পঞ্চাশ কৃষ্ণাঙ্গ কর্মী হাতে কুড়ুল আর লাঠি নিয়ে সাউথ আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের অফিস থেকে যাত্রা করে কাছাকাছি ডুর্নফন্টেইনে বেল স্টেশানে এসে হাজিব হলেন। পুলিশ তাদেব ছত্রভঙ্গ কবার চেষ্টা করলেন। টিয়াবগ্যাস ছাড়া হলো। কোনও ফলই হলো না। মারমুখী ধর্মঘটীর দল স্টেশানের অফিসাবদের ছুরি, কাতুবি, লাঠি আর কুড়ুল দিয়ে কোপাতে শুরু করল। পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন নিহত, পাঁচজন আহত। সেই রক্তের ধারা গড়িয়ে গেল ইউনিয়ান অফিস পর্যন্ত। পুলিশ অফিস ঘেরাও করে, জোর করে ভেতরে ঢুকে চারশোজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। জোহানেসবার্গেব পূর্বপ্রান্তে জারমিস্টোনেও পুলিশের সঙ্গে অনুরূপ একটি সঙ্ঘর্ষ ঘটে গেল ধর্মঘটীদের। তিনজন বিক্ষোভকারী নিহত হলেন। সোয়েটোব কৃষ্ণাঙ্গরা হঠাৎ মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ কবে দিলেন। বোথা সবকারেব পুলিশবাহিনী তেড়ে এল। ঘাড় ধরে সব ভিটে থেকে বের করে দিল টেনে টেনে। সারা শহরে বিলি হলো উড়ো ইস্তাহার। প্রতিবাদ পালন করো। তিন দিনের সাধারণ কর্মবিরতি। সত্যিই সব অচল। কেউ কাজে গেল না। স্কুল বন্ধ। কৃষ্ণাঙ্গ বিক্ষোভকারীরা ইট পাটকেল ছুঁড়ে যানবাহন বন্ধ করে দিল। সোয়েটো আর জোহানেসবার্গের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

বিদ্রোহ চারিদিকে। শুধু জোহানেসবার্গে নয়। ভারত মহাসাগরের তীবে ডারবান বন্দর। ডারবানের পাশেই কৃষ্ণাঙ্গ উপনিবেশ উমলাজি। উমলাজিতে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সন্ত্রাসবাদীদের সন্ধানে একটি

বাড়ি ঘিরে ফেলল। বাসিন্দাদের বললে বেরিয়ে আসতে। একজন বেরিয়ে এল গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। পুলিশের গুলিতে সে আবার ঢুকে গেল ভেতরে। তখন আর একজন বাড়ির জানালা থেকে পুলিশের ওপর গুলি বর্ষণ শুরু করল। পুলিশের গুলিতে সে ঘায়েল হলো। পুলিশ তখন বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দুটি মৃতদেহ, আর একগাদা এ. কে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল।

সরকার এই সব হিংসাত্মক কাজের জন্য দায়ী করলেন, আফ্রিকান ন্যাশান্যাল কংগ্রেসকে। দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তর সীমান্তের বিভিন্ন দেশ, জাম্বিয়া প্রভৃতিকে খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন আফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া বন্ধ করুন। এক শনিবার, দক্ষিণ আফ্রিকার কম্যাণ্ডো বাহিনী জাম্বিয়ার লিভিংস্টোন শহর আক্রমণ করে দুটো বাড়ি উড়িয়ে দিল। পাঁচজন খতম। তাঁরা না কি সকলেই এ. এন. সির গেরিলা।

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের রূপরেখা ক্রমেই পালটে যাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও জায়গায়, যে কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কৃষ্ণাঙ্গরা বুঝেই গেছেন বর্ণবিদ্বেষী বোথা সরকারকে আর কোনও ভাবেই নতি স্বীকার করানো যাবে না। বোথা সাহেব কিন্তু সমানে গর্জন করে চলেছেন, 'আমি কোনও আপসের মধ্যে যেতে প্রস্তুত নই। বর্ণবৈষম্যের নীতি, সরকারী প্রতিষ্ঠানে, বিদ্যালয়, আবাসন প্রকল্পে চলছে চলবে। তাঁর আফ্রিকানার ভায়ারা কিন্তু মনে করেন, অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতেই হবে। 'People are really concerned about the choices they must make.'

বর্ণবৈষম্য নীতির সবচেয়ে বড় পিলার ছিল ডাচ রিফরমড চার্চ। বিদঘুটে বিশাল এক নাম, নেডারডুইৎসে গেরিফরমীরডে কার্ক। আফ্রিকানাররা ধর্মভীরু। সে ধর্মটা যে কি ধর্ম কে জানে! মানব ধর্ম অবশ্যই নয়। তা না হলে এমন কৃষ্ণ বিদ্বেষ আসে কোথা থেকে। এই ধর্মভীরু আফ্রিকানারদের চার্চ এতকাল শিখিয়ে এসেছে, 'ঘৃণা করো। কৃষ্ণাঙ্গদের দূরে রাখো। নির্যাতন করো, নিপীড়ন করো, বিকজ দে আর ব্ল্যাক। ভগবান নিজে শ্বেতাঙ্গ। রেসিয়াল সিগ্রিগেসান, সেপারেসান হলো স্বর্গের নীতি। আফ্রিকানারদের জীবনছন্দ খুব শান্ত। জীবনের চাহিদাও খুব কম। চাষের জমি, আকাশ, বৃষ্টি, বীজ, চারা, ফসল, একটি কি দুটি সন্তান, কিছু ভালো বই, অবশ্যই একটি বাইবেল। দেয়ালে দুটি ছবি চাই, আব্রাহাম লিঙ্কন আর ক্রুশবিদ্ধ যীশু। এই ওলন্দাজ বংশধরদের সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র হলো, খ্রাইস্ট আর লিঙ্কন।

হঠাৎ কি হলো সুপ্রাচীন সেই বিশ্বাসে চিড় ধরে গেল। সংশয় জন্ম নিল সাহিত্যে। বিশ্বাসে। জীবনবোধে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেক্ষাপটে আর একবার যাচাই হয়ে গেল, পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড। অ্যালান প্যাটন সেই কথাই প্রমাণ করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। এখন তাঁর বয়েস ৮৪ বছর। শ্বেতাঙ্গ এই শিক্ষক ১৯৩৫ সালে ডিয়েপক্লুফ রিফরমেটোরি স্কুল ফর আফ্রিকান বয়েজ-এর অধ্যক্ষ পদ থেকে ১৯৪৮ সালে অবসর নেন। তাঁর অবসর জীবনের কাজই হলো, জাতিবৈরিতার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম। সাহিত্য আর বক্তৃতা। স্থাপন করেন লিবার‍্যাল পার্টি অফ সাউথ আফ্রিকা। এই বছরই প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম উপন্যাস, 'ক্রাই দি বিলাভেড কান্ট্রি'। পাঠকদের প্রশংসাধন্য সাহিত্যিক জীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠা এনে দিল।

এই উপন্যাসে তাঁর একটি চরিত্র লিখছে, 'সত্যটা তাহলে কী। আমাদের খ্রীষ্টান সভ্যতা সংশয়ে দুলছে। আমাদের ধর্ম বলছে মানব ভ্রাতৃত্বের কথা অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই শিক্ষা অচল। আমাদের বিশ্বাস বলছে, ঈশ্বর মানুষকে বহু রকমের সম্পদ দিয়েছেন, জীবনের পূর্ণতা নির্ভর করছে সেই সম্পদ, সেই দানের নিয়োগে, উপভোগে; কিন্তু সেই বিশ্বাসের গভীর অনুসন্ধানে আমরা ভীত। আমরা বলছি, যারা নিচে আছে, তাদের সাহায্য করতে হবে; কিন্তু তারা যেন নিচেই থাকে। আমরা খ্রীষ্টান, এই বোধটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, বজায় রাখার জন্যে, আমরা যা করতে বাধ্য হয়েছি তা হলো, নিজেদের হীন স্বার্থ, নীচ উদ্দেশ্যকে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে চালাতে চাইছি। তাঁর মুখে বসাচ্ছি আমাদের কথা। সেই পরম পিতা সৃষ্টি করেছেন সাদা আর কালো। মানুষের ইচ্ছেতেই তিনি মানুষকে কালোদের অগ্রগতিকে দাবিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। আমাদের এত বড় আস্পর্ধা, ঈশ্বরকে দিয়ে আমরা এমন কথাও বলিয়েছি যে কালা আদমিরা সাদা মানুষের জন্যে কাঠ কেটে দেবে জল তুলে দেবে। এত বড় আস্পর্ধা আমাদের সেই পরম পিতাকে দিয়ে বলিয়েছি, এই পৃথিবী, তাঁর দেওয়া যত সম্পদ সবই তিনি দিয়েছেন

শ্বেতাঙ্গদের ভোগ করার জন্যে। কৃষ্ণাঙ্গদের বঞ্চিত করাই আমার নির্দেশ। অদ্ভুত আমাদের যুক্তি, কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখবার কোনও প্রয়োজন নেই; কারণ ঈশ্বর তাদের কোনও বুদ্ধিই দেন নি। বুদ্ধি না থাকলে শিক্ষার কোনও প্রয়োগই হবে না। কালোদের জন্যে প্রতিভা বিকাশের কোনও ব্যবস্থা নেই কারণ তাদের কোনো প্রতিভাই নেই। 'শ্বেতাঙ্গদের যুক্তি হলো হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় আমরা উন্নতি করেছি, কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে এখনই অত চিন্তার কি আছে! হাজার হাজার বছর আগেকার এরই মাঝে কোনও কৃষ্ণাঙ্গ বিশেষ কোনও কৃতিত্বের জন্যে বিখ্যাত হয়ে পড়ল, শ্বেতাঙ্গ সমাজ সেই মানুষটির জন্যে করুণা প্রকাশ করে। বেচারা বিখ্যাত হয়ে পড়ল, শ্বেতাঙ্গ সমাজ সেই মানুষটির জন্যে করুণা প্রকাশ করে। বেচারা বিখ্যাত হয়ে নিজের সমাজচ্যুত হলো। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। একঘরে হয়ে গেল মানুষটি। খ্রীষ্টান দুনিয়ার সুবিচার আর দয়ার কোনও তুলনা নেই, তারা কৃষ্ণমানুষদের আটকে রেখেছে বলেই, কেউ কেউ হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে, বিরাট হয়ে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ভোগ করছে না। কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে অবস্থার এই সমতাই প্রমাণ করে খ্রষ্টীয় দয়ার প্রকটতা। খ্রীষ্টানের কি দয়া। এর ফলে আমাদের ভগবানও ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছেন। সবচেয়ে অসংলগ্ন একটি চরিত্র। কালা আদমিদের যিনি উপহার দিতে প্রস্তুত; কিন্তু স্থায়ী কোনও জীবিকা নয়। আমাদেব সভ্যতা যে ক্রমশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছে, তাতে তো অবাক হবার কিছু নেই। রূঢ় হলেও সত্য, আমাদের সভ্যতা খ্রীষ্টীয় সভ্যতা নয়। শোচনীয় এক মিলিত মিশ্রিত পদার্থ। এই মিশ্রণে আছে বিরাট আদর্শ ভীতিপ্রদ অভ্যাস, ভয়ঙ্কর প্রয়োগ, আছে গগনছোঁয়া আশ্বাস, লাগামছেঁড়া দুর্ভাবনা, প্রীতিপ্রদ দয়ার কথা আছে, আছে সম্পদ ছিনিয়ে নেবার লোভী থাবা।

স্বভাবতই এই স্পষ্টবক্তা সাহিত্যিককে শ্বেতাঙ্গরা সুনজরে দেখবেন না। প্যাটন একসময় লিবার‍্যাল পার্টির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার প্রহিবিশান অফ পলিটিক্যাল ইন্টারফিয়ারেনস বিল পাশ করে ১৯৬৮ সালের মে মাসে লিবারেল পার্টি নিষিদ্ধ করে দিলেন। তার অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল দমনপীড়ন। লিবার‍্যাল পার্টির প্রথম সারির নেতারা দেশ ছাড়া। কিছু জেলে। প্যাটনকে দেশছাড়া করা হলো না ; কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে ফ্রীডাম পুরস্কার নিয়ে ফেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হলো।

চুরাশি বছরের এই প্রধান সংগ্রামী দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান পরিস্থিতির সুন্দর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই সেদিন। ইংরেজরা বাহুবলে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিকার করেছিলেন। পার্লামেন্টারি ট্র্যাডিশান আর সিভিল সার্ভিসের তাঁরাই ছিলেন প্রবর্তক। মাটি খুঁড়ে সোনা আর হীরে বের করেছিলেন ইংরেজরাই। রাস্তা তৈবি করেছিলেন ও ফ্যাকট্রি বসিয়েছিলেন। কিন্তু একটু একটু করে শাসন ক্ষমতা থেকে তাঁরা সরে এসে, এখন পাকাপাকি ভাবে ।বরোধী দলের ভূমিকায়। তিরিশ লক্ষ আফ্রিকানার আর মাত্র পনের লক্ষ ইংরেজ। ইংরেজরাও এখানে সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু হলেও 'প্রসপাবাস মাইনরিটি।' দেশের ৮০ ভাগ অর্থনীতি ইংরেজের দখলে। সর্বাধিক সম্পদের অধিকারী ইংরেজ রাজনীতিতে কেন ক্ষমতাহীন, দুর্বল?

অপোজিসান এম পি হেলেন সুজম্যানের ব্যাখ্যা, 'The English didin't realize that Government was the biggest business in the country.' অন্যান্য বিরোধী সদস্য যেমন বিখ্যাত গলফ খেলোয়াড়, গ্যারি প্লেয়ার, ঔপন্যাসিক নাদিন গর্ডিমার, নর্তকী জুলিয়েট প্রাউজ, টেনিস খেলোয়াড় কেভিন কারেন মনে করেন, 'আফ্রিকানাররা ইংরেজদের সংখ্যায় হারিয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে সিভিল সার্ভিসে।'

দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যাংলো অ্যামেরিকান করপোরেশান বিশাল একটি সংস্থা। বিশাল খনির অধিকারী। কারখানা আব দোকানের মালিক। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড মাইনিং জায়েন্ট। দেশের এক চতুর্থ ভাগ সম্পদ এঁদের নিয়ন্ত্রণে। প্রতিষ্ঠাতার পুত্র হ্যারি ওপেনহাইমার, এক সময় সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন। লিবার‍্যাল সদস্য হিসাবে পার্লামেন্টে বসতেন। বিরোধী দল প্রোগ্রেসিভ ফেডারাল পার্টি ওপেনহাইমারের অর্থানুকূল্যে চলত। যাঁদের হাতে শিল্প, যাঁরা অর্থনীতির এত বড় নিয়ন্ত্রক, রাজনীতি কিন্তু তাঁদের হাতে বাড়তি কোনও ক্ষমতা তুলে দিতে পারল না। কেন? রাজনীতিতে তাঁরা কেন এত দুর্বল? অ্যাংলো অ্যামেরিকানের বর্তমান চেয়ারম্যান গ্যাভিল বেলির সহজ উত্তর ' We are from the wrong tribe'.

অ্যালান প্যাটনের ব্যাখ্যা, 'আমরা ইংরেজরা বোয়ারদের মতো ঐতিহাসিক পদযাত্রা, গ্রেট ট্রেক

করিনি, বোয়ারদের মতো নতুন কোনও ভাষা উদ্ভাবন করিনি। বোয়ারদের মতো আমরা কোনও যুদ্ধে পরাভূত হইনি, পথের ধুলো থেকে নিজেদের ঝেড়ে তুলে সিংহাসনে বসাইনি। ইংরেজরা এখানে সবকিছু, সব মানুষকে শাসন করতে চায় না। আফ্রিকানার ও ইংরেজ উভয়েই দেশকে ভালবাসে তবে আফ্রিকানারদের ভালবাসা অনেক বেশি, ফিয়ার্স, মোর অ্যাগ্রেসিভ। ইতিহাস তাদের এই ভাবেই গড়ে তুলেছে। এই চারিত্রিক গুণ ইতিহাসের দান। Afrikaners' tribal sense outweighed the English fondness for making money and playing golf.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোয়াররা ছিলেন নাজি সমর্থক। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচন সমাপ্ত হবার পর, আড়াই লক্ষ যুদ্ধ প্রত্যাগত ইংরেজ শাসন ক্ষমতা আফ্রিকানারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই আড়াই লক্ষ ইংরেজের প্যারা-মিলিটারি সংবিধানের নাম হয়েছিল 'টর্চ-কম্যান্ডো'। ওপেনহাইমার এই সংগঠনে প্রচুর টাকা ঢেলেছিলেন। কিন্তু আফ্রিকানারদের রাজক্ষমতা থেকে সরানো সম্ভব হয়নি। নাটাল হলো ইংরেজদের ঘাঁটি। ১৯৫৩ সালে আর একবার ৬০-৬১ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকা যখন নিজেকে রিপাবলিক ঘোষণা করে কমানওয়েলথ থেকে বেরিয়ে এল, অসন্তুষ্ট ইংরেজরা নাটালকে রিপাবলিক থেকে আলাদা করে নেবার চেষ্টা করেন। সবই ব্যর্থ। সংখ্যালঘু ইংরেজ সুখের জীবনের কোলে সমৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোর। পাশ ফিরতে ফিরতে তাঁরা বলছেন, 'লিভ অ্যান্ড লেট লিভ।' ইংরেজের এখন প্রধান লক্ষ্য ধনাগম। পার্সোন্যাল ট্যাকসের শতকরা ৬০ ভাগ আর করপোরেট ট্যাকসের শতকরা ৭৫ ভাগ ইংরেজরাই দিয়ে থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান অবস্থা; অর্থনীতি আফ্রিকানদের মুঠোয়, কৃষ্ণাঙ্গদের মুঠোয় শুধু বাতাস। ইংরেজরা এমন বর্ণবিদ্বেষী নয়। বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকরা ব্যাপারটা একটা যুক্তিপূর্ণ সহজ সমাধান চান। বর্তমান দুনিয়ায় বন্দুকের কুঁদো দিয়ে রাজত্ব চালানো যায় না। ধনজনের অগ্রগতির জন্যে চাই শান্তির পরিবেশ। অ্যাংলো আমেরিকান করপোরেশানের চেয়ারম্যান গ্যাভিন রেলি ও আরও কয়েকজন 'বিগ শট' ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায় গিয়ে, অ্যাফ্রিক্যান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নির্বাসিত প্রেসিডেন্ট অলিভার ট্যাম্বোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এলেন। রেলি সেই আলোচনা সভার বিবরণ দিতে গিয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'আমরা সকলেই এক মত হয়েছিলাম, সুসম্বদ্ধ নতুন একটি সমাজ আমরা দেখতে চাই। যে সমাজে ন্যায়বিচার থাকবে, থাকবে আইনসিদ্ধ আদালত প্রযুক্ত বিল অফ রাইটস।' জোহানেসবার্গ চেম্বার অফ কর্মাসের চেয়ারম্যান মুবে হফমেয়ার, শিল্পনায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন, অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বারলো র‍্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মসচিব মাইকেল রোসহল্টও ব্যবসায়ী নেতাদের কাছে রিফর্ম সমর্থন করুন।

অশান্ত দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে উঠছে, অ্যাফ্রিক্যান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের হিংসাত্মক আন্দোলনের জন্যে। এ. এন. সির সদস্যদের মধ্যে বিপ্লবী কম্যুনিস্টদের অনুপ্রবেশও অনেকের চিন্তার কারণ। এ. এন সিকে পুরোপুরি সমর্থনের আগে, পরিণতির কথা চিন্তার প্রয়োজন আছে। ওপেনহাইমার বলেছেন, হিংসার পথ না ছাড়লে, এ. এন. সি আমাদের কাছ থেকে কিছুই পাবে না, neither moral support nor material support.

এদিকে 'ব্রেন ড্রেন' শুরু হয়ে গেছে। আগে শিক্ষিত ম্যানেজার প্রযুক্তিবিদদের স্বর্গ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। আগে তাঁরা আসতেন। দেশকে সমৃদ্ধ করতেন। এখন তাঁরা বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছেন। এই মনুষ্য সম্পদ চলে যাওয়ার ফল ফলবে শিল্প অর্থনীতিতে, পরিকল্পনায়। এ পর্যন্ত ৫৫০০ জন গেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রকৃতই এখন সংকটের মুখোমুখি।

৪২

লন্ডনে অদ্যই শেষ রজনী। আফ্রিকা পর্ব শেষ। বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠী কি করেন দেখা যাক। অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে দক্ষিণ আফ্রিকায় নবযুগ যদি আনা যায়! এই ফাঁকে নেলসন ম্যান্ডেলার দিকে একবার

তাকানো যাক। সর্বত্যাগী এই বিপ্লবীর বয়স হলো ৬৯ বছর। আজ থেকে ২৫ বছর আগে ১৯৬২ সালে ম্যান্ডেলার কারা জীবনের শুরু। প্রথমে ছিলেন রোবেন দ্বীপের কারাগারে। ১৯৮৩ সালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে কেপ টাউনের পোলসমুর কারাগারে। যুবক ম্যান্ডেলা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। চুল অল্প অল্প পেকেছে। যখন যুবক ছিলেন তখন তাঁর গায়ের রঙ ছিল কফিবীজের মতো। এখন সেই রঙ আর নেই। গায়ের রঙ এখন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

১৯৫০ সালে ম্যান্ডেলা ছিলেন জোহানেসবার্গ মেজিস্ট্রেটের কোর্টে সবচেয়ে ব্যস্ত আইনজীবী। সেই ব্যস্ত, সদাজাগ্রত, প্রখর মানুষটি দীর্ঘ কারাবাসে, বয়েসের ভারে কিঞ্চিৎ শ্লথ হয়েছেন। হাঁটা চলায় ধীর। সোজা তাকিয়ে থাকেন সামনে। সব সময়েই গভীর কোনও চিন্তায় মগ্ন। তবু দীর্ঘকায় ম্যান্ডেলা এখনও শক্তিশালী, সক্ষম একজন মানুষ। হয়তো সামান্য একটু সামনে ঝুঁকে চলেন, কিন্তু শরীরে সামান্যতম বয়সের মেদভার নেই। অন্যান্য সহবন্দীদের মতো দেহের মধ্যভাগ স্ফীত হয় নি। যৌবনে, বন্দীদশা শুরুর আগের জীবনে, সামনে টেরি কেটে সমান দু'ভাগ করে চুল আঁচড়াতেন। আমরা সাধারণত তাঁর সেই ছবিই দেখি। এখন আর সেই ভাবে চুল আঁচড়ান না।

রাজনৈতিক জীবন, ব্যবহারজীবী জীবন ছাড়াও নেলসনের খোলামেলা একটা সামাজিক জীবন ছিল। 'গ্রুপ এরিয়া অ্যাক্ট' আইন হবার আগের কাল পর্যন্ত জোহানেসবার্গে কালা আদমিদের ব্যবসা করার অধিকার ছিল। তখন ওখানে একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ ছিল ব্লু-লেগুন। মালিক ছিলেন একজন অশ্বেতাঙ্গ এই রেস্তোরাঁটি ছিল নেলসনের বড় প্রিয় জায়গা। দিনান্তে ব্লু লেগুনে এসে বসতেন। মেলামেশা, আলাপ আলোচনা সবই হতো ওখানে। ওইখানেই বসে তৈরি হতো আন্দোলনের ব্লু-প্রিন্ট। পার্লামেন্টে গ্রুপ এরিয়া অ্যাক্ট পাস হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লু-লেগুনকে ব্যবসা গোটাতে হলো।

জেলে অন্যান্য বন্দীরা ম্যান্ডেলাকে তাঁর গোষ্ঠীর নামেই ডাকেন। সেই নামটি হলো মাধিবা। দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে ওয়ার্ডারবা কয়েদীদের নম্বর ধরে ডাকেন। একমাত্র ব্যতিক্রম নেলসন। নেলসনকে তাঁরা ম্যান্ডেলা বলে ডাকেন। রোবেন দ্বীপের জেলে কোনও কোনও সার্জেন্ট তাঁকে মিস্টার ম্যান্ডেলাও বলতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কারাগারে যা ভাবা যায় না। আগে কখনও কারুর ক্ষেত্রে হয়নি। কারারক্ষী, কারা পরিচালকরা ম্যান্ডেলাকে শ্রদ্ধা করেন। এ এক অসম্ভব ব্যাপার। ম্যান্ডেলা একজন নিপাট ভদ্রলোক। ধীর, মৃদু কথাবার্তা, সুভদ্র ব্যবহার। অসাধারণ তাঁর ইংরেজি বাচনভঙ্গি। জায়গায় জায়গায় সামান্য 'খোসা' জাতীয় উচ্চারণ। মায়ের দেওয়া জিভটাকে তো পুরোপুরি বিদেশী ভাষাকে দান করা যায় না।

বিশুদ্ধ ইংরেজি ও ১৯৫০ সালে ইংরেজির শহুরে রূপান্তর, অর্থাৎ রকেন ভাষা বা 'ফ্লাইতাল', দুটোতেই তিনি সমান অভ্যস্ত। একটি কথা তিনি প্রায় প্রত্যেককেই বলে থাকেন, সেইটাই তাঁর অভ্যাস, 'ওকে বয়।'

রোবেন দ্বীপের কারাগারে কড়া বিধিনিষেধ ও পাহারা থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য বন্দীদের সমস্ত খবরাখবর রাখতেন। যার সঙ্গেই দেখা হতো তাকেই জিজ্ঞেস করতেন তার পরিবারের কথা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করতেন পরিবারের ইতিহাস। প্রায় সব বিষয়েই ম্যান্ডেলার জ্ঞান। বিশ্ব রাজনীতিতে তিনি সুপণ্ডিত। তাঁর রাজনৈতিক স্বপ্ন হলো শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলা। স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি নতুন সমাজের জন্ম দেখতে চেয়েছিলেন। অ্যাফ্রিক্যান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের 'ফ্রীডাম চার্টার' তাঁর কাছে এখনও একটি জীবন্ত দলিল। এই দলিলে প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র জাতির ইচ্ছা। এই সনদ শেষ কথা নয়। লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার একমাত্র পথ।

মাধিবা অনেক পড়েছেন। তাঁর সবচেয়ে প্রাণের বিষয় হলো রাজনৈতিক অর্থনীতি আর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। কিউবাই হোক আর নিকারাগুয়াই হোক সংগ্রামের ইতিহাস সংগ্রহ করে, তাঁর পড়া চাই। জেলের গ্রন্থাগার তাঁর দখলে। সমস্ত সংবাদপত্র তিনি খুঁটিয়ে পড়েন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভক্ত, বিশেষ ভক্ত 'হ্যান্ডেলের'। কনসার্ট কন্ডাক্টারের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে তিনি প্রায়ই হ্যান্ডেলের সেই গানটি আপন মনে গেয়ে থাকেন,. 'আনটু আস এ চাইল্ড ইজ বরন'।

পরিধানে জেলখানার পোশাক, ফনট্রাউজার, গ্রীন শার্ট অথবা হাসপাতাল থেকে পাওয়া নীল রঙের টাওয়েলিং গাউন। খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করে স্কিপিং করেন। যৌবনে বকসিং করতেন। এখনও

মাঝে মধ্যে 'শ্যাডো বকসিং' করেন। মাধিবাকে কখনো শুয়ে বা বসে থাকতে দেখা যাবে না। প্রায় সারাটা দিনই তিনি জেলখানার উঠানে পায়চারি করেন। 'রিভোনিয়াট্রায়ালে' আফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অন্যান্য অভিযুক্ত সদস্য, যেমন ওয়াল্টার মিসুলু, রেমন্ড মাহলাবা, আহমেদ কাথরাডা, উইলটন মকোয়াই, সকলেই মাধিবার সঙ্গে আলোচনা করেন নানা বিষয় নিয়ে।

কারাগারেও মাধিবার আইনজ্ঞ জীবন অব্যাহত আছে। বন্দীদের অসংখ্য সমস্যায় আইনের পরামর্শ দেন। হয় তো কোনও বন্দীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না, মাধিবা তাঁদের চিঠির বয়ান লিখে দেন। বাইরের আইনজ্ঞ যাঁরা বন্দীদের হয়ে আইনের তরোয়াল চালাচ্ছেন মাধিবা জেলখানা থেকে তাঁদের যথোচিত আইনের পরামর্শ পাঠিয়ে দেন।

মাধিবা সারাটা দিন এত ব্যস্ত যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। এই দেখা করার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই। জেলখানার উঠানে দেখা হতে পারে, এমন কি স্নান ঘরেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায়। তিনি ডায়েরি রাখেন না, মনই তাঁর ডায়েরি।

তাঁর সেলে গেলে কেউ শুধু মুখে ফেরে না। জেলখানার দোকান থেকে বাদামের টিন কিনে এনে রেখে দেন। দর্শনপ্রার্থীকে সেই বাদাম দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। আর নিজে চিবোন শুকনো রুটি। ধূমপান করেন না; তবে ধূমপায়ীর জন্যে বিছানার তলায় একটা ছাইদান রাখেন।

কথায় কথায় তাঁর অতীত জীবন বেরিয়ে আসে। শহরজীবনের কথা, কারাজীবনের কথা। ১৯৬১ সালে কি ভাবে তিনি দেশ ছেড়ে পালালেন। এ এন সির ইউথ লিগের সদস্য জীবনের কথা। আবদুল নাসের ও আলিজিরিয়দের প্রশংসা করেন। মাধিবার আফ্রিকা সফরের সময় তাঁরা 'এ এন সি'কে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে আদালতে আসামীর কাঠগড়া থেকে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণের স্মৃতি আজও অম্লান তাঁর মনে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের কি কাণ্ড। ৬০ সালে তাঁকে জেলে ভরা হলো, আর ৬৪ সালে, মানে দু'বছর পরে তাঁকে ধরানো হলো যাবজ্জীবন কাবাবাসের দণ্ডাদেশ। মাধিবার কণ্ঠস্থ হয়ে আছে সেই ভাষণ। মাঝে মাঝেই আবৃত্তি করেন অংশ বিশেষ। 'রিভোনিযা ট্রায়াল জাজমেন্টের' একটি কপি নিজের কাছে রেখেছেন সযত্নে।

মাঝে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রে একটি আষাঢ়ে খবর ছাপা হয়েছিল। খবরটি সংগৃহীত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার গুপ্তচর গর্ডন স্পাইয়ের গ্রন্থ থেকে। সংবাদটি পড়ে মাধিবা হাসতে হাসতে তাঁর সহবন্দীদের বলেছিলেন, দেখো কি উদ্ভট জিনিস ছেপেছে। লিড্‌নিউজ। 'রোবেন দ্বীপ থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। এক সাহসী মহিলা পাইলট হেলিকপ্টাবে চেপে এসেছিল। হেলিকপ্টার থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল দড়ি। কারাগারেব ছাদ থেকে সেই দড়ি ধরে হেলিকপ্টাবে উঠে পালাতে গিয়ে আমি ধরা পড়ে গেছি।'

শ্রোতাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, 'সত্যিই এইরকম একটা পবিকল্পনা হলে আপনি মুক্তির চেষ্টা করতেন?'

'কমরেড তোমার মাথাটা পরীক্ষা করাও। পালানো মানে আত্মহত্যা। আমি কি কাপুরুষ যে সংগ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবো!'

রোবেন আইল্যান্ডে মাধিবা যে কারাকক্ষে থাকতেন তা দৈর্ঘ্যে ছিল মাত্র ৮ ফুট। ৬৪ বর্গফুট এলাকায় একটি মানুষের বসবাস। ঘরের বাঁ দিকে একঠি কাবার্ড। তার তিনটি পাল্লা। একটা খোপে তাঁর জামা কাপড়। ওপরের দুটি শেল্‌ফে ঠাসা বই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিখুঁত। প্রতিটি বই, কাগপত্র সুচারু সাজানো। অত পরিষ্কার সেল রোবেন দ্বীপে আর দ্বিতীয় ছিল না। দেয়ালে ঝুলছে তাঁর পরিবারের সাদা কালো একটি ছবি। তার পাশে ঝুলছে নিজের তৈরি ক্যালেন্ডার। পড়ার রুটিন। ছোট ঘর, নিখুঁত সাজানো। সব ওলটপালট হয়ে যাবার ভয়ে খাবার ঘরের ডাইনিং টেবিলে বসে চিঠিপত্র লেখালিখির কাজ করতেন।

মাঝে মাঝেই তাঁর মনে পড়ে যায় স্ত্রী ওয়াইনির কথা। ছেলেমেয়েদের কথা। স্ত্রীকে তিনি জামি বলে ডাকেন। স্ত্রীর আসল নাম নোমজামো থেকে জামি এসেছে। হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল। জেলে যাঁদের যাবজ্জীবন থাকতে হবে তাঁদের ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে কাঁচের জানালা দিয়ে বাবাকে দেখে গেলে তারা বড় হবে কি করে। সপ্তাহে একবার বাবাকে তারা যদি ছুঁতে না পায় তাহলে তাদের

মনের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। মনে হওয়া মাত্রেই তিনি আন্দোলন শুরু করলেন। এই কয়েক বছর আগে কারাকর্তৃপক্ষ তাঁর আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছেন।

নেলসন হয়তো গীতা পড়েন নি ; গীতার সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগে তাঁর জীবনের সুর বেঁধে ফেলেছেন। তাঁর ক্রোধ নেই। কেউ কখনও তাঁকে রাগতে দেখেনি। তিনি সকলেই আত্ম-সংযমের পরামর্শ দেন। যে কোনও সঙ্কটে তিনি মানুষকে আত্মস্থ থাকতে বলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ো না। নেলসন নিজে একজন বড় আত্মসমালোচক। নিজের ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা চাইবার সৎসাহস তাঁরও আছে। ধর্মবিশ্বাসী না হলেও তিনি প্রায়ই গির্জায় যান ; হয় তো পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার জন্যে। এই হলো নেলসেন ম্যান্ডেলা। দেশের মানুষ যাঁকে মাধিবা বলে ডাকতে ভালবাসেন। তাঁর স্ত্রী ওয়াইনি হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের প্রতীক। বিশ্বের সমস্ত মানুষ আজ নেলসনের মুক্তি চায়। বোথা সরকারের কানে ঢুকছে না। কমানওয়েলথ শেষ হয়ে গেল। ছেলে ঘুমলো। পাড়া জুড়লো। আমরা অবশ্য কেউই ঘুমোলুম না। লন্ডনে অদ্যই আমাদের শেষ রজনী। শহরটাকে আমরা ভালোবেসে ফেলেছি। যেন পরীর দেশ। একসময় কলকাতাও ছিল দ্বিতীয় লন্ডন। জুয়েল অন দি ক্রাউন। বোম্বাইকে বলা হতো নেকলেস। মধ্যরাত। বিগবেনে ঘণ্টা কি বাজছে। বাইরে আলোকিত আকাশ। লন্ডনের রাত পুরোপুরি অন্ধকার হয় না।

কুমকুমের ঘরে ফোন করলুম। জেগে বসে আছে। 'কি হলো তোমার?'

'মন খারাপ। কাল সকালেই তো চলে যেতে হবে। ওই অকসফোর্ড স্ট্রিট। পিকাডেলি সার্কাস। পলমল। হাইড পার্ক। বাকিংহাম কোর্ট। সব পড়ে থাকবে পেছনে।'

'আমারও ভীষণ মন খারাপ।'

'চলে এস আমার ঘরে।'

আমাদের দলের আর কে কোথায় আছে জানি না। আমরা দু'জনে এই সিদ্ধান্তে এলুম, আজ আর ঘুম নয়। প্রথমে সারা হোটেলটা ঘুরে দেখবো। তারপর বেরিয়ে পড়ব পথে। একটাই ভয় লন্ডন ববিরা না ধরে। দু'নম্বর ভয় সাদা আদমিরা কালো চামড়া দেখে পিটিয়ে না দেয়। পুলিশে ধরলে ছাড়পত্র বুকে ঝোলানই আছে।

প্রথমে আমরা হোটেলের চাইনিজ রেস্তোরায় গেলুম। কোণের দিকে। যেন গা ঢাকা দিয়ে বসে আছি। রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা ড্যানসিং ফ্লোরে চলে এলুম। ফাঁকা। অন্ধকার। নর্তকীরা চলে গেছে। কোণের দিকে প্লাটফর্মের ওপর বাদ্যযন্ত্ররা ঘুমোচ্ছে।

আমাদের সাহস বেড়ে গেছে। যেদিকে খুশি সেইদিকে চলে যাচ্ছি। আজ শেষ রাত। একটা কাঁচের দরজার ওপর লেখা ফ্রেঞ্চ রেস্তোরা। ভেতরে একটি মাত্র আলো জ্বলছে। সব ফাঁকা। কুমকুম বললে, 'কনজারভেটিভ জায়গা। এদেরই তো উপদেশ আরলি টু বেড অ্যান্ড আরলি টু রাইজ। চলো দাদা রাস্তায় যাই।'

লবিতে রিসেপসানে একটি ছেলে বসেছে। সে বললে, 'গুড মরনিং।'

তার মানে সকাল হয়ে গেছে। নির্জন রাজপথ এদিকে গেছে। লোক নেই জন নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। কলকাতা হলে পথে কিছু কুকুর থাকতো। ছাইগাদায় সাদা একটা বেড়াল। ফুটপাথে শুয়ে থাকতো সারি সারি মানুষ। কলকাতার চোখে ঘুম নেই। লন্ডন শুয়ে পড়েছে। মোটর সাইকেলে একজন পুলিশ সার্জেন্ট চলে গেল। আমাদের দেখেই মনে হয় থামবো থামবো করছিল। থামল না চলে গেল। বাকিংহাম প্যালেস গেটে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন নিশ্চল প্রহরী। রাস্তাঘাটে ঝাড়ু দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

আমার সেই সুন্দর সুরম্য ঘরে সকাল হলো। ড্রেসিং টেবিলের ডান দিকে রঙীন টিভির পর্দায় বিবিসির সংবাদপাঠক। ফলের ঝুড়িতে একটা আপেল আর এক থোলো র‍্যাস্পবেরি পড়েই রইল। ঘরে সেখানে যা কিছু ছড়ানো ছিল সব ভরে ফেললুম। ঘর আমাকে বিদায় জানাবার জন্যে প্রস্তুত। এই ঘরে আর কোনও দিন আসা হবে না। ভাবতেই কেমন যেন লাগছে। বেশ করে চান করলুম। শেষ চান। পর্দা সরিয়ে বাইরের নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকালুম। একটাও পাখি নেই।

নিচের লবিতে সব জড়ো হয়েছেন। সকলেই অল্পবিস্তর বিষণ্ণ। হোটেলের পাওনা মেটাবার জন্যে

রিসেপসান কাউন্টারে হুড়োহুড়ি। মেয়ে দুটি অনভিজ্ঞ। সামাল দিতে পারছে না। পিনাক সায়েব দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ছফুট লম্বা শরীর নিয়ে। আমাদের মালপত্র সিকিউরিটি চেকিং-এ নিয়ে যাবার জন্যে ভারতীয় হাইকমিশানের আর এক অফিসার এসেছেন। আমার সেই বন্ধু যাকে আমি ভূত দেখিয়েছিলুম সে নেই। হাইকমিশান থেকে একটা অপূর্ব পোর্টফোলিও দিয়েছিল রিসেপসানের মেয়েটির হাতে দিয়ে বললুম, আমার বন্ধুকে দিও।

রোদ ঝলমলে দিন। লন্ডনে ওয়ালের পাশ দিয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে হিথরো এয়ারপোর্ট। মনে হচ্ছে আরও সাতটা দিন থাকতে পারলে বেশ হতো। শীত শীত করছে। এয়ারপোর্টের কিছু আগে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল ব্রিটিশ সিকিউরিটি। পিনাক সায়েব নেবে গিয়ে গলগল করে বিশুদ্ধ ইংরিজি বললেন। ব্যারিকেড সরে গেল।

কথায় বলে ওস্তাদের মার শেষ রাতে। এয়ারপোর্টের টারম্যাকে নেমে মনে হলো, কোর্টের ডান পকেটটা ভারি ভারি লাগছে। হাত ঢুকিয়ে নিজেই অবাক, সর্বনাশ! হোটেলের ঘরের চাবি আমার পকেটে। দিয়ে আসতে ভুলে, গেছি। কি হবে! চাবিটা পিনাক সায়েবের হাতে দিতেই, তিনি আমাকে বললেন, 'এ কি? দেখলেন বটে! আপনি আমাকে মারবেন মশাই।' আমি বললুম, 'ভাগ্যিস ভূমিতেই ধরা পড়েছে। আকাশে হলে কি হতো!'

৪৩

লন্ডন থেকে মেকসিকো দীর্ঘপথ। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান এক পেট ভি আই পি নিয়ে সকাল এগারোটা নাগাদ হিথরো ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ল। লন্ডনে যা সবচেয়ে অস্বাভাবিক তাই হয়েছে। চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। আকাশের অল্প উচ্চতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, নিচে পড়ে আছে ছবির মতো লন্ডন শহর। বিদায় শ্রীমতী থ্যাচার। বিদায় কুইন এলিজাবেথ। শেকসপীয়ার, চসার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বেন জনসন, কীটস, শেলি, বায়রন, ব্রাউনিং। সব বিদায়। এই উদার অকৃপণ রোদ দেখে গ্রাউচো মার্কসের মতো বলতে ইচ্ছে করছে, I am leaving because the weather is too good. I hate London when it is not raining. সত্যিই তাই, বৃষ্টি না হলে লন্ডন যেন বেমানান। যে সব সময় কাঁদে, সে যদি হঠাৎ হাসতে থাকে, ভালো লাগে কি?

কুমকুম এক কাণ্ড করেছে। দল ছাড়া হয়ে ইলেকট্রনিকস মার্কেটে গিয়েছিল কমপ্যুটারাইজড টাইপরাইটার কিনতে। প্লেন যখন ছাড়বো ছাড়বো, করছে, সিঁড়ি যখন সরিয়ে নেবো নেবো করছে, তখন দিদিমণি, চতুর্দিকে ঝোলাঝুলি ঝুলিয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠতে গিয়ে পড়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ির ধারালো ধারে লেগে পা ক্ষতবিক্ষত। কনুই কেটেছে। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা। পরিধানে টাইট শালোয়ার। সরিয়ে ওষুধ লাগাবে, সে উপায়ও নেই। নীরবে অশ্রুপাতের মতো রক্তপাত।

এ যাত্রাতেও আমাদের আসন পাশাপাশি। এবার আমি জানলার ধারে। প্লেন আকাশে উঠে বাতাসে সুস্থির হওয়া মাত্রই, পান ভোজনের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। যতক্ষণ পারা যায় খাইয়ে দাইয়ে ওড়ার একঘেয়ে ক্লান্তি ভুলিয়ে রাখা। দুই আসনের সারির মাঝের পথ দিয়ে একের পর এক ট্রলি বিমানের লেজের দিক থেকে মুণ্ডের দিকে চলেছে। মাথার দিকে প্রধানমন্ত্রীর এলাকা। সপার্ষদ অনেকেই আছেন। আড়চোখে দেখছি। চলেছে সুদৃশ্য কাপ ডিশ। কারুকার্য্য করা রুপোর থালা, বাটি, কাঁটা চামচ, পানীয়ের পাত্র, ফল, সুখাদ্য। বিমানসেবিকাদের যিনি হেড, তাঁর চেহারা অতিশয় গম্ভীর। মুখে হাসির ছিটোফোঁটাও নেই। পরনে লম্বা ফ্রক। পিঠের দিকে ঝুলছে লম্বা চুল। পিক পিক করে ইংরেজি বলছেন। তাঁর নির্দেশে এক ঝাঁক শাড়ি পরা সুন্দরী বিমানসেবিকা সামনে পেছনে ছোটাছুটি করছেন। করতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী আহারে বসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিমানে যাঁরা বিমানসেবিকা হন, তাঁরা অবশ্যই অত্যন্ত সুদক্ষ, সুন্দরী ও সেবাপরায়ণা।

বিমানের ভেতরের পরিবেশ যেন রবিবারের রকের আড্ডা। এত সব ভারি ভারি, নামী নামী মাথাঅলা লোক দিনের এইরকম সময়ে কেমন আয়েস করে বসে আছেন! চেয়ারে টাইট। নড়া চড়ার উপায়

নেই। বিমান একটা দ্বিমুখী ব্যাপার। চলাফেরা অতি কষ্টে এদিক থেকে ওদিক।

পানীয়র প্রভাবে বিমানের দুলুনিতে সবাই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়লেন, সেবিকারা বিমানের লেজের দিকে পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়েছেন। আমার বাঁ পাশে আহত কুককুম চোখ বুজিয়ে ব্যথা ভোলার চেষ্টা করছে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে চলেছি ইসতাফায। জায়গাটি মেকসিকোয়। সমুদ্রের ধারে একটি পর্যটন কেন্দ্র, যেমন আকাপুলকো। ইসতাফায শুরু হবে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন।

প্রথমে আমিও একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। ঘুম এল না। হঠাৎ ওযাইনি ম্যাণ্ডেলার কথা মনে পড়ল। আমরা সব ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছি, সভা-সমিতি করছি। বুঝিবে সে কি যে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। স্বামী আজ পঁচিশ বছর হয়ে গেল জেলে। আর ওয়ানি নির্বাসিত হয়েছেন ব্র্যাণ্ডফোর্টে। দশ বছর হয়ে গেল। ব্র্যান্ডফোর্ট ওযাইনির কাছে যেন এখন ছোট সাইবেরিয়া। ওয়াইনি রসিকতা করে বলে থাকেন, I am the most unmarried married woman, কারণ বিবাহের কয়েক বছর মধ্যেই নেলসন চলে গেলেন কারাবাসে। বিপ্লবীদের জীবনেও প্রেম আসে।

ওযাইনির বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক। ওযাইনিরাও জাতিতে 'খোসা'। ট্রানস্কেরি জেলার পোণ্ডোল্যান্ডে জন্ম। পিতা ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক। স্কুলের সামান্য উপার্জনে নযজনের একটি পরিবারকে টানতে হতো। হঠাৎ মা মারা গেলেন, তখন ওযাইনিকে যেতে হলো গ্রামের খামারে। 'চায বাস, গরু, ভেড়া, ছাগল'-এর জগতে। ওযাইনি এখন রসিকতা করে মাঝে মাঝে বলেন, 'সেই জন্যই আমার এমন স্বাস্থ্য। 'বাবা ছেলেবেলা থেকেই মেয়েকে ইতিহাসমুখী করে তুলেছিলেন। দিনের সব কাজ সাঙ্গ হয়ে যাবার পর, মা হারা মেয়েকে নিয়ে বাবা বসতেন দাওযায। সামনে চাঁদের আলোয ঝিরঝির করছে আফ্রিকার অরণ্য প্রান্তর। আকাশের গায়ে পাহাড়ের অস্পষ্ট রেখা। ওযাইনির সামনে উন্মোচিত হচ্ছে তাদের জাতির অতীত ইতিহাস। বাবা মেয়ের সামনে খোসা যুদ্ধের বীরত্ব কাহিনীর ছবি এঁকে যেতেন রাতের পর রাত। ইংরেজদের লেখা ইতিহাসে খোসা যুদ্ধের তেমন কোনও উল্লেখ নেই। তবে ওয়াইনির মুখে শুনলে বোঝা যায় খোসাজাতির জীবনে খোসাযুদ্ধের কি মূল্য। ন'বার এই যুদ্ধ হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গদের হানাদারি ঠেকাতে কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্ঘবদ্ধ রুখে দাড়ানো। শ্বেতাঙ্গরা দলবদ্ধ হয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের খামারে হানা দিয়ে গরু, বাছুর নিয়ে পালাত। ফেরত দেবার দাবি জানালে ফল হতো উল্টো। তারা শাস্তি হিসেবে দখল করে নিত জাযগা জমি বসত বাড়ি 'খোসাযুদ্ধে'র কথা বলতে গিয়ে ওয়াইনি এখন বলেন, 'সেই শৈশবেই আমরা বুঝে গিয়েছিলুম, শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষ বলেই মনে করে না। স্কুলে আমার বাবার অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখ হতো। তখন শিশু। এমন কিছু বোঝার বয়েস হয়নি, তবু সব শিশুই বাবাকে সম্মানের আসনে দেখলে গর্বিত হয। আমার বাবা শিক্ষক হিসেবে শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে কোনোও সম্মান পেতেন না। ঢলঢলে পোশাক। সাধারণ চালচলন। সকলের উপেক্ষা। আমার কেমন যেন লাগত। আমি তখন নিজেকে ডেকে বলতুম, খোসাযুদ্ধে বাবারা বারে বারে হেরেছেন। ন'টি যুদ্ধই পরাজয়ের মালা। আমাদের গরুবাছুর তুলে নিয়ে গেছে। জমিজমা কেড়ে নিয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এক তরফা মার খেয়েছে। খোসারা তাদের সংগ্রাম যেখানে ছেড়েছে আমি সেইখান থেকেই শুরু করব। আমি আমার জমি ফিরে পেতে চাই।

গ্রামের মেয়ে ওযাইনি মেডিকেল ওয়ার্কার হয়ে এলেন জোহানেসবার্গের মতো শহরে। কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা আগে কখনও এই সুযোগ পায়নি। ওযাইনি ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী তেমন তড়িৎ চঞ্চল। এই জোহানেসবার্গের আসরেই ওযাইনি নেলসনকে দেখেন। নেলসন ততদিনে তাঁর দেশের মানুষের চোখে নায়ক। সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। বাঘা আইনজীবী। ওযাইনি তাঁকে প্রথম দেখেন আদালতে। লম্বা লম্বা পা ফেলে, ঋজু ভঙ্গিতে আদালত কক্ষে প্রবেশ করছেন। সবাই প্রায় তটস্থ। যাঁর পক্ষে দাঁড়াবেন, জয় তাঁর সুনিশ্চিত। প্রথম দর্শনে ওয়াইনির খুব ভয় হয়েছিল। মনে হয়েছিল বিশাল এক রাশভারি পুরুষ, যাঁর সামনে দাড়াবার সাহস তার কোনও দিনই হবে না।

নেলসন ওযাইনির চেয়ে বয়সে অনেক বড। এরপর যা কিছু ঘটে গেল সবই যেন আকস্মিক। হঠাৎ নেলসনের সঙ্গে ওয়াইনির পরিচয় হয়ে গেল। নেলসন একদিন ওয়াইনিকে নিয়ে এক ভারতীয় রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেন। ওয়াইনি নেলসনের পাশে বসে আছেন অভিভূত হয়ে। কিছুই খেতে পারছেন না। দু চোখ বেয়ে হুহু করে নেমে আসছে জলের ধারা। নেলসনের কোনও খেয়াল নেই। তিনি

তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত। ওয়াইনির দিকে একবার মাত্র ফিরে তাকালেন। দেখলেন, ওয়াইনির চোখে জল। ওয়াইনি যে কাঁদছে সে কথা তাঁর মনেই এল না। তিনি বললেন, 'তোমার যদি খুব ঝাল লেগে থাকে তাহলে এক চুমুক জল খেয়ে নাও। সামলে যাবে।'

অতীতের কথা বলতে গিয়ে ওয়াইনি এই প্রথম দিনটির স্মৃতি ভুলতে পারেন না। 'নেলসন না জেনেই যেন ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেছিলেন। আমার বিয়ে হয়েছিল ঝড়ের সঙ্গে।' নেলসন যখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময় ১৯৫৮ সালে হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। ঠিক ছ'বছর পরে 'রিভোনিয়া ট্রায়ালে' নেলসনের যাবজ্জীবন হয়ে গেল। কঠোরতম সাজা। সারা জীবন জেলে কাটাতে হবে। মুখোমুখি কারোর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। শরীর স্পর্শ করা চলবে না। কি সাংঘাতিক দণ্ড! লন্ডনের অবজারভার পত্রিকার সাংবাদিক অ্যালিস্টেয়ার স্পার্কস এই দণ্ডাদেশ দানের দিনটির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন, 'আমি ভেবেছিলুম শ্রীমতী ম্যান্ডেলা যখন আদালত থেকে বেরিয়ে আসবেন, তখন দেখবো তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এক মহিলা। কিন্তু, না। ওয়াইনি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়ালেন। তাঁর ঠোঁটে ঝলসে উঠল ঝকঝকে হাসি। তাঁকে মনে হতে লাগল, যেন এক সম্রাজ্ঞী। পরাজিতার হাসি নয়। জয়ের হাসি। ঘটনাটি ঘটে গেল আফ্রিকানারদের খোদ রাজধানীতে, ওয়াইনির সব চেয়ে দুঃখের দিনে। সামনেই 'চার্চ স্কোয়ার'। মাঝে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পল ক্রুগারের মূর্তি, চারপাশে অসংখ্য মানুষ। বিচারের রায় শুনতে এসেছেন। তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলেন অপরাজিতার উজ্জ্বল হাসি।'

ওয়াইনির চিন্তা মন সরিয়ে দিল। প্রকৃতির অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। বিমান ছেড়েছিল সকালে। সূর্য ডুবতে ডুবতে ডুবলো না। রাতের আঁধার নামতে নামতেও নামল না। আকাশ লাল করে সূর্যোদয় হলো। এ কোন্ আকাশ! আবার মনে হতে লাগল, আমি একটা বাসের টিকিট। মহাবিশ্বে ভাসছি, যার এক আকাশে উদয় আর এক আকাশে অস্ত পাশাপাশি চলেছে। মৃত্যুর কোল থেকে লাফিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জন্মের কোলে। আকাশ যেন সূর্য নিয়ে খেলা করছে।

আমার ডানপাশে ভোর হচ্ছে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিমানসেবিকারা রাতের খাবার পরিবেশন শুরু করলেন। এ যেন এক মস্ত ধাঁধা। খাবার পরই ঘুমোবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা যে দেশের মানুষ, সে দেশের ঘড়ির নিয়মে এখন মাঝরাত। খাওয়া দাওয়া আর একদম ভালো লাগছে না। বিমানের আহারাদি বড় একঘেঁয়ে। তার ওপর আমার যেমন দুর্মতি, হঠাৎ চেয়ে বসেছি মাশরুম আর অ্যাসপারাগাস দিয়ে তৈরি কি এক বস্তু। গরুর খাবারের মতো বিস্বাদ। আমি কোনও দিন, খড়, বিচিলি. খইল, ভুসি প্রভৃতি সুখাদ্য খাইনি। যে প্রেপারেশনটি পরিবেশিত হয়েছে তা অভ্যাস না থাকলে খাওয়া যায় না।

রাতের খাওয়া শেষ. এদিকে বিমানের ছোট জানলা দিয়ে চড়াই পাখির মতো ছোট ছোট রোদের টুকরো ঢুকেছে। পড়ে গিয়ে কুমকুমের শরীর খুব গোলমাল করছে। কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বর এসেছে। কুমকুমের শরীরটা ঠিক থাকলে এতক্ষণ জমিয়ে গল্প করা যেত। ভেতরে সারি সারি মাথা, বাইরে অচেনা আকাশ। হরেক বর্ণের হরেক রকমের মেঘপুঞ্জ। সব পড়ে আছে তলায়। পৃথিবীটা মেঘের কম্বলে মোড়া। আমি মনে মনে নানা রকম থ্রিল তৈরি করার চেষ্টা করছি। কল্পনা করার চেষ্টা করছি, যে আকাশে আছি তার নিচে কোন দেশ পড়ে আছে! মানুষের ঘর সংসার। সর্পিল রাস্তা, বাগান-ঘেরা বাড়ি, সুবেশা তরুণী। এই মুহূর্তে জীবনের কত খেলাই চলেছে! আর আমরা কয়েকজন মানুষ আকাশের মাথায় দুলছি।

বিমান মাঝে মাঝে এয়ার পকেটে পড়ছে। তখন বেশ ভয়ই করছে। পেছন দিকে আকাশ সরে সরে যাচ্ছে। কোনও কোনও আকাশে ঘনীভূত দুর্যোগ। মেঘের ঘোর কালো রঙ দেখলেই বোঝা যায় নিচে অঝোর ধারায় ঝরছে। সকাল থেকে আবার ধীরে ধীরে সময় বিকেলের দিকে চলেছে। বিমান নামছে। ঘোষণা, আমরা বারমুডা ছুঁতে চলেছি। বারমুডা নামটা শুনলেই রোমাঞ্চ হয়। রহস্য ঘেরা একটি দ্বীপ। বারমুডা ট্র্যাংগল। জাহাজ ফোর্থ ডাইমেনসানে হারিয়ে যায়। বিমান আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পোর্টহোল দিয়ে তাকালুম। নিচে অ্যাটলান্টিক। সমুদ্রের বুকে চকচকে মাছের মতো কি ভেসে যাচ্ছে। ওই কি সেই পিরহানা মাছ। ভালো করে দেখে বুঝলুম, জাহাজ। বিভিন্ন লাইনার-এর ঝকঝকে সুরম্য জাহাজ জল ফালা করে চলেছে। যেন জলে লাঙ্গল দিচ্ছে।

বিমান যত নিচে নামছে সমুদ্র ও দ্বীপ তত স্পষ্ট হচ্ছে। জাহাজ মাপে আরও বড় হয়েছে। সমুদ্রে জাহাজের দাপট বিমানের যুগেও কিছু মাত্র কমেনি। মনে রহস্য রয়েছে বলেই দ্বীপটিকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। সমুদ্র জায়গায় জায়গায় স্থলভাগের ভেতর ঢুকে এসেছে। সেই সব খাড়িতে স্পিডবোট ঘুরছে। গোবল্ড ভাবেলের বই পড়ে ধারণা হয়েছে এই সব খাঁড়িতে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী কিলবিল করছে। দ্বীপটা যখন বারমুডা তখন প্রাণীরাও হবে কেউকেটা। অক্টোপাস, সি লায়ন, সি হর্স, মুক্তভরা ঝিনুক। কোরাল। স্টারফিস।

আকাশ থেকে দেখছি, নিচে একটা জায়গায় এক গাদা ব্যারেল ডাম্প করা রয়েছে। সেখানেও আমি রহস্য দেখতে পাচ্ছি। রাস্তায় তেমন লোক চলাচল নেই, একটা দুটো মোটর গাড়ি হুসহাস ছুটছে। আমার মনে হচ্ছে মাফিয়ারা ব্যবসায় বেরিয়েছে। সমুদ্রের ধারে ধারে নারকেল গাছ। রোদে ঝিলমিল করছে।

বিমান এবার ভূমি স্পর্শ করবে। খুব একটা জাঁকজমকঅলা সাংঘাতিক এয়ারপোর্ট নয়। তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের সময় জমজমাট হয়ে উঠবে। রানওয়েতে বেশ কিছু নিগ্রোকে দেখতে পেলুম। জায়গাটার বেশ একটা লোকাল কলার আছে।

বিমান বারমুডায় নেমে পড়ল। এখানে বেশ কিছুক্ষণ দাড়াবে। তেল নেবে খাবার নেবে। বাইরে চড়চড়ে রোদ। বিমানসেবিকারা যাঁরা দিল্লি থেকে এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা একে একে বিদায় নিলেন। বারমুডা থেকে সব পালটে গেল। ক্যাপটেন, হোস্টেস, স্টুয়ার্ড, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার।

একদল নিগ্রো মহিলা ঝাঁটা, ব্রাশ, বাস্কেট হাতে মার্চ করে এগিয়ে আসছেন। বিমান সাফা হবে। এতক্ষণে মনে হচ্ছে আমেরিকার চৌকাঠে পা রেখেছি।

৪৪

বিমান থেকে শেষ নামতেই হলো। ঝাড়পোঁছের ঠেলায়। যারা পারদার করতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন একটু বয়স্কা। বিশাল তাঁর চেহারা। তিনিই হলেন লিডার অফ দি টিম। বাকি সবাই তরুণী। একদিকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চলেছে। আর একদিকে চলেছে ব্রুশ। ভেতরটাকে এরা একেবারে নতুন করে ছেড়ে দেবেন।

বাইরে মানে এয়ারপোর্টের বাইরে যাবার উপায় নেই। বিমানের ডানার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম। অ্যাভিয়েসান ফুয়েল লেখা একটা দুধ সাদা ` ডি এসেছে। এয়ারোপ্লেনের তেলতেষ্টা পেয়েছে। কুমকুম ধপাস করে টারম্যাকে বসে পড়ল।

'তোমার জন্যে ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা দেখবো।'

'নাঃ, দরকার হবে না। রক্ত জমে গেছে। আমি একটু বসি দাদা।'

'বোসো।'

ঝোড়ো বাতাস বইছে সমুদ্রের গন্ধ মাখা। দেশ থেকে দূরে এই দ্বীপপুঞ্জ। ভাবলেই রোমাঞ্চ হচ্ছে। উত্তর অ্যাটলান্টিকে ভাসছে কোরাল দ্বীপমালা। মোট দ্বীপের সংখ্যা ৩৬০। এর মধ্যে কুড়িটি দ্বীপ মাত্র মনুষ্য অধ্যুষিত। প্রায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মতো। এই দ্বীপে জল দাঁড়ায় না। প্রবালের ত্বক বেয়ে সব জল গলে পড়ে যায়। পানীয় জলের কি ব্যবস্থা কে জানে। আন্দামানের মতো বৃষ্টির জলই হয়তো ধরে রাখা হয়। এখানে ইংরেজ আর আমেরিকানদের বিরাট নৌ আর বিমান ঘাঁটি আছে। শীতকালে আমেরিকান ভ্রমণার্থীদের বড় প্রিয় জায়গা। করমুক্ত অঞ্চল বলে শিল্প আর ব্যবসা খুব জাঁকিয়ে উঠেছে।

কুমকুমের পাশে আমিও বসে পড়লুম। 'হুডু সি'-র নাম শুনেছি। 'গ্রেভইয়ার্ড অফ দি অ্যাটলান্টিক।' অথবা 'ডেভিলস ট্রাঙ্গল'। সব চেয়ে পরিচিতি নাম হলো 'বারমুডা ট্রাঙ্গল'। পশ্চিম অ্যাটলান্টিকে

বারমুডা আর ফ্লোরিডাকে নিয়ে সমুদ্রের ত্রিকোণ অংশে ৪৫ সাল থেকে প্রায় একশটি বিমান আর জাহাজ অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রায় হাজার মানুষ বেপাত্তা। নানা ভাবে চেষ্টা হয়েছে, এই রহস্যের কোনও কূলকিনারা করা যায় নি। বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ, ব্যর্থ সেনাবাহিনী, বিফল সাহসী অনুসন্ধানকারীরা।

উত্তরে বারমুডা, দক্ষিণে ফ্লোরিডা এই হলো ত্রিভুজের একটি বাহু। আর একটি বাহু পূর্বে বাহামা দ্বীপের ভেতর দিয়ে ৪০ ওয়েস্ট লঙ্গিচিউড বরাবর পুয়ের্টোরিকো অতিক্রম করে আবার ঘুরে গেছে বারমুডায়। অ্যাটলান্টিকের এই ত্রিভুজ জাহাজ আর বিমানের চলার পথে এক ভয়ের জায়গা। গত বিয়াল্লিশ বছরে জাহাজ আর বিমান মিলে একশোটিরও ওপর অদৃশ্য হয়ে গেছে। এক হাজারেরও বেশী যাত্রী নিখোঁজ। ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন মেলেনি। একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়নি। ৪৫ সালের পর থেকে ত্রাণব্যবস্থা আরো বৈজ্ঞানিক হয়েছে। উদ্ধার কাজে অজস্র নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ত্রাণকারীদের দক্ষতাও বেড়েছে। তবু কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় নি। যেন জল আর আকাশের ফুটো গলে সব ফোর্থ ডাইমেনসানে পড়ে গেছে।

অদৃশ্য হয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে কোনও বৈমানিক বা নাবিক তাঁদের অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা বেতার মারফত তাদের যাত্রা বন্দর বা গন্তব্য বন্দরে জানাবার চেষ্টা করেছেন, তারপর সকলকে বিভ্রান্ত করে চিরতরে হারিয়ে গেছেন রাডার স্ক্রিন থেকেই নয় ভূমণ্ডল থেকে। তাঁদের পাঠান ছেঁড়া ছেঁড়া সঙ্কেত থেকে যেটুকু জানা গেছে, তা হলো, কোনও যন্ত্রই কাজ করছে না। কম্পাসের কাঁটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। পরিষ্কার মেঘমুক্ত দিন তবু চারপাশ কুয়াশায় ঘিরে এলো। হলুদ আলো। শান্ত সমুদ্র শুধু উত্তাল হলো না, তার চেহারাই পালটে গেল। যে কোনও একদিকে কাত হয়ে গেল জলতল। এর পর সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না সেই বিমান অথবা জাহাজটিকে।

ব্রিটিশ সাউথ অ্যামেরিকান এয়ারওয়েজের বিমান স্টার এরিয়েল এর হঠাৎ মধ্য আকাশ থেকে হারিয়ে যাবার ঘটনা মনে পড়তেই ভেতরটা কেমন করে উঠল। মনে হতে লাগল বারমুডার আকাশটা একটু অন্যরকমের। রোদ আছে, তবু যেন ঘোলাটে। নীল ছাপিয়ে যেন চারপাশে হলুদ আলো চুঁইয়ে পড়ছে। এত বড় আকাশ কোথাও একটা পাখি নেই। কোথা থেকে যেন অদ্ভুত একটা ছায়া এসে পড়েছে।

স্টার এরিয়েল আমাদের বিমানের মতোই যাচ্ছিল লন্ডন থেকে জ্যামাইকা। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪৯ সালের, ১৭ জানুয়ারি। বিমানটিতে ছিলেন সাতজন নাবিক ও তেরজন যাত্রী। রুট, লন্ডন থেকে সান্টিয়াগো, চিলে। পথে বারমুডায় অবতরণ। আমাদের মতোই। তেল নেবার জন্যে। সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে স্টার এরিয়েল যখন বারমুডার আকাশে উঠল, তখন আবহাওয়া অতি পরিষ্কার, সুন্দর। সমুদ্র শান্ত। ফ্লাইট ক্যাপ্টেন আকাশে ওঠার পঞ্চান্ন মিনিট পরে বারমুডায় বেতার যোগে জানালেন, "ক্যাপ্টেন ম্যাক ফি 'এরিয়েল' থেকে জানাচ্ছি। আমাদের যাত্রাপথ হলো বারমুডা থেকে কিংস্টন, জ্যামাইকা। আমরা 'ক্রুইজিং অলটিচ্যুডে' উঠেছি। সুন্দর আবহাওয়া। কিংস্টনে যথা সময়েই পৌঁছতে পারবো। আমি আমার বেতার তরঙ্গ পরিবর্তন করে কিংস্টন বিমানবন্দর ধরার চেষ্টা করছি।'

এরপর 'স্টার এরিয়েল' থেকে আর কোন খবর কেউ কখনও পায়নি। পুরো বিমানটাই আকাশ থেকে উরে গেল। ঠিক এক বছর আগে এই এয়ারলাইনসের আর একটি বিমান অনুরূপ ভাবেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সেই বিমানটির অনুসন্ধানে তখন অ্যাটলান্টিকের বিশাল এলাকা জুড়ে অনুসন্ধান চলছিল। সেই অনুসন্ধান আর গুটানো হলো না, তা ছাড়া সেই সময় ওই এলাকায় ব্রিটিশ আর আমেরিকার নৌবাহিনীর মহড়া চলছিল। এই সমস্ত বাহিনী এক সঙ্গে মিলে অ্যাটলান্টিকের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অদৃশ্য বিমান 'স্টার এরিয়েলে'র অনুসন্ধানে নেমে পড়ল। বাহাত্তরটা অনুসন্ধানী বিমান প্রায় ডানায় ডানায় লাগিয়ে, যেখান থেকে শেষ বেতার বার্তা ভেসে এসেছিল, সেই এলাকা থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে জ্যামাইকা পর্যন্ত গোটা এলাকা ঘুরে এল। সমুদ্রের কোথাও বিমানটির সামান্যতম ধ্বংসাবশেষও খুঁজে পাওয়া গেল না। জানুয়ারির ১৭ তারিখে বিমানটি অদৃশ্য হয়েছিল, ১৮ তারিখ রাতে একটি ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমান বেতারে অনুসন্ধানকারীদের জানাল সমুদ্রের বিশেষ একটি জায়গা থেকে অদ্ভুত একটি আলোর আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানকারীরা সেই অঞ্চলে ছুটে গেল। কিছুই কিন্তু পাওয়া গেল না। ২২ জানুয়ারি সবাই

হাল ছেড়ে অনুসন্ধানের কাজ গুটিয়ে নিল।

'স্টার এরিয়েল'-এর আগে যে বিমানটি রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়েছিল, সেটি একটি ডিসি থ্রি বিমান। সান জুয়ান থেকে যাচ্ছিল মিয়ামি। যাত্রী ও বিমান কর্মী মিলিয়ে সংখ্যা ছিল ছত্রিশ। ক্যাপ্টেনের নাম ছিল রবার্ট লিনকুইস্ট। রাত সাড়ে দশটার সময় বিমান যখন আকাশে উঠল, তখন আবহাওয়া পরিষ্কার শ্যাম্পেনের মতোই ফুরফুরে। ক্যাপ্টেন লিনকুইস্ট বেতারে জানালেন, 'তোমরা কি জানো, আমরা এখন কি করছি? আমরা সবাই সমস্বরে খ্রিস্টমাস ক্যারল গাইছি।' ভোর চারটে তের মিনিটে বিমানটি থেকে শেষ বেতার বার্তা ভেসে এল, আমরা অবতরণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলেছি। দক্ষিণে আর মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে মিয়ামি বিমান বন্দর। আমরা মিয়ামি শহরের আলোকমালা দেখতে পাচ্ছি। সব ঠিক আছে। আর কোন গোলমাল নেই। অবতরণের নির্দেশের অপেক্ষায় রইলুম।' শেষ বার্তা পাঠিয়ে বিমানটি অদৃশ্য হয়ে গেল। মিয়ামি থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল। কোনও বিস্ফোরণ নেই আকাশে আগুনের হল্কা নেই। বেতারে এস ও এস বা মে ডে বার্তা নেই। তা ছাড়া বিমানটি যে জায়গায় অদৃশ্য হতে পারে, সেই জায়গাটি বলা হয় 'ফ্লোরিডা কি'। সমুদ্রের গভীরতা মাত্র কুড়ি ফুট। স্বচ্ছ জল। বিমান ভেঙে পড়লে, সহজেই ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া উচিত। কিছুই কিন্তু পাওয়া গেল না।

একে একে আরও বহু ঘটনার কথা মনে পড়তে লাগল। ক্যারোলিন ক্যাসসিয়ো। লাইসেন্সধারী পাইলট। হাল্কা একটি বিমানে একজন মাত্র যাত্রী নিয়ে, নাসাউ থেকে উড়েছিলেন বাহামার গ্র্যান্ডটার্ক দ্বীপে যাবেন বলে। গ্র্যান্ডটার্কের কাছাকাছি এসেছেন মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বেতারে জানালেন, 'আমি কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না। দুটি অজানা দ্বীপের চারপাশে চক্কর মারছি। অথচ নিচে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' সব শেষে ভেসে এল করুণ আকুতি 'এই ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় আছে কি?' সেই সময় গ্র্যান্ডটার্ক দ্বীপে ঘটনার যাঁরা সাক্ষী তাঁদের বিবরণ একটি হাল্কা বিমান দুই ঘণ্টা ধরে চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশ। আমরা সবাই বিমানটিকে দেখতে পাচ্ছি অথচ বিমান চালক গ্র্যান্ডটার্ক দ্বীপের ঘরবাড়ি কিছুই দেখতে পেলো না তা কেমন করে হয়।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে যে ঘটনা দিয়ে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল রহস্যের সূত্রপাত, সেই রহস্যের সমাধান আজও হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও, বিমান আর নৌমহড়া তখনও সমানে চলেছে। পৃথিবীতে শান্তি এসেছে, তবে শান্তির ভাবসাম্য তখনও সমানে চলেছে। পৃথিবীতে শান্তি এসেছে, তবে শান্তির ভাবসাম্য তখনও আসেনি। যে কোনও মুহূর্তে নতুন কোনও শত্রুর আবির্ভাব আশঙ্কায় পৃথিবী তটস্থ। ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেল ন্যাভাল এয়ার স্টেশান থেকে নৌবাহিনীর ছটি বিমান আকাশে উঠল। পূবে ১৬০ মাইল গিয়ে, উত্তরে ৪০ মাইল হয়ে, দক্ষিণ পশ্চিম পথে আবার ফিরে আসবে ফোর্ট লডারডেলে। ছটি বিমানই ছিল 'নেভি গ্রামম্যান টি বি এম থ্রি অ্যাভেঞ্জার টরপেডো বম্বারস'। প্রতিটি বিমানে হাজার মাইলেরও বেশি পথ ওড়ার মতো জ্বালানি ছিল। প্রতিটি বিমানেই সুশিক্ষিত পাইলট অফিসার। বিমানগুলির পরিচালনায় ছিলেন লেফটন্যান্ট চার্লস টেলার। বেলা দুটোর সময় বিমানগুলি যখন আকাশে উঠছে, তখন আকাশ পরিষ্কার, রোদ ঝলমল করছে, ছেঁড়া, টুকরো টুকরো, এক আধখণ্ড মেঘ। উত্তাপ ৬৫ ডিগ্রি। উত্তর-পূবে বয়ে চলেছে ধীর বাতাস। দুটো দশ মিনিটের মধ্যে ছটি বিমানই বিশাল একটি ত্রিভুজ তৈরি আকাশের শিখরে উঠে পড়ল। চলেছে বিমিনির উত্তরে 'চিকেন শোলস' নামক সমুদ্রের বিশেষ একটি অঞ্চলে। সেখানে রাখা আছে পরিত্যক্ত একটি জাহাজ। সেই জাহাজের ওপর বোমা ফেলার মহড়া শেষ করে, তারা গোটা এলাকাটা চক্কর মেরে ফিরে আসবে ফোর্ট লডারডেলে। এই ছটি বিমান নেভি এয়ার ফোর্সের কোডে 'ফ্লাইট নাইনটিন'।

ঠিক তিনটে পনের মিনিটে এমন একটা কিছু ঘটে গেল যার ব্যাখ্যা আজও মেলেনি। তিনটে পনের মিনিটের কিছু আগেই বিমানগুলি লক্ষ্যবস্তুর ওপর বোমা ফেলা শেষ করে পূর্বদিকে যখন এগিয়ে চলেছে, তখন ফোর্ট লডারডেল ন্যাভাল এয়ার স্টেশান টাওয়ারে বেতার গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ল ফ্লাইট নাইনটিনের কম্যান্ডার লেফটন্যান্ট চার্লস টেলারের গলা :

টেলার ঃ টাওয়ার, টাওয়ার। কলিং টাওয়ার। এমারজেনসি। এমারজেনসি। আমরা আমাদের নির্ধারিত পথের বাইরে চলে এসেছি। আমরা জমি দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের চোখে কিছুই পড়ছে না।

টাওয়ার ঃ তোমার অবস্থিতি জানাও।

টেলার ঃ বলতে পারবো না, আমরা কোথায় আছি। নিশ্চিত ভাবে জানাতে পারছি না আমাদের অবস্থিতি। আমরা হারিয়ে গেছি।

টাওয়ার ঃ মনে হচ্ছে, তোমরা পশ্চিমে চলেছ।

টেলার ঃ বলতে পারছি না পশ্চিম কোন্‌টা। আমাদের সব কিছু বিগড়ে গেছে। সবই এখন রহস্যময়। কোন্ দিকে চলেছি তাও জানি না। সমুদ্রকে যেমন দেখানো উচিত সেরকমও দেখাচ্ছে না।

তিনটে তিরিশ মিনিটে ফোর্ট লডারডেলের সিনিয়ার ফ্লাইট ইনস্ট্রাকটারের বেতার গ্রাহক যন্ত্রে আর একটি কণ্ঠস্বর ধরা পড়ল। ফ্লাইট নাইনটিনের আর একটি বিমানের একজন শিক্ষানবীশের গলা ঃ 'পাওয়ারস বলছি, পাওয়ারস। আমার বিমানের কম্পাসের রিডিং-এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। দয়া করে বলতে পারেন! বুঝতে পারছি না, কোথায় ভাসছি। শেষবার পাক মারার পরই আমরা হারিয়ে গেছি।' সিনিয়ার ফ্লাইট ইনস্ট্রাকটার অনেক চেষ্টা করে টেলারকে ধরলেন। টেলার উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন, 'আমার দুটো কম্পাসই কাজ করছে না। আমি ফোর্ট লডারডেল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। আমার মনে হচ্ছে, সমুদ্রের যে অঞ্চলটাকে 'কি' বলে আমি সেই অঞ্চলে ঢুকে পড়েছি, তবে কতটা নিচে নেমে এসেছি বলতে পারব না।'

সিনিয়ার ইনস্ট্রাক্টার বললেন, 'আপনার বাঁ দিকে সূর্য ; এইবার আপনি উত্তর দিকে চেষ্টা করুন। তাহলেই ফোর্ট লডারডেলে এসে পড়বেন।' নির্দেশ যাবার কিছুক্ষণ পরেই ভেসে এল কণ্ঠস্বর। টেলারের উদ্বিগ্ন গলা, 'আমরা এই মাত্র ছোট্ট একটা দ্বীপ পেছনে ফেলে এলুম। আমাদের চোখের সামনে আর কোনও স্থলভাগ নেই। মহাশূন্য ! অচেনা অজানা মহাশূন্য।'

সিনিয়ার ইনস্ট্রাক্টার বুঝলেন, টেলারের ফ্লাইট নাইনটিন 'কি' ধরে এগোচ্ছে না। অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছে। কারণ 'কি' ধরে এগোলে দু ধারেই স্থলভাগ নজরে পড়ত। নীরবতা। ও প্রান্তে আর কোথাও সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ বেলা চারটে নাগাদ, টাওয়ারের বেতার যন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠল। অস্পষ্ট বার্তা। মাঝে মাঝে বিঘ্নিত। লেফট্‌ন্যান্ট টেলার অজ্ঞাত কারণে পরিচালনভার ক্যাপটেন স্টিভারের হাতে তুলে দিয়েছেন। স্টিভার বলছেন, 'আমরা কোথায় আছি বলতে পারব না। আমার মনে হচ্ছে বেস থেকে আমরা ২২৫ মাইল উত্তর পূর্বে আছি। আমরা নিশ্চয়ই ফ্লোরিডার ওপর দিয়ে উড়ে এসে গাল্‌ফ অফ মেকসিকোয় ঢুকে পড়েছি।'

ফ্লোরিডার ওপর ফিরে আসার জন্যে ফ্লাইট লিডার মনে হয় ১৮০ ডিগ্রির একটা বাঁক নিলেন, ফলে বেতারে তাঁর কণ্ঠ আরও ক্ষীণ হয়ে এল। তার মানে ভুল বাঁক নিয়ে বিমানগুলি ফ্লোরিডা থেকে বহু দূরে পূবের দিকে সরে যেতে লাগল খোলা সমুদ্রে। ফ্লাইট নাইনটিন থেকে শেষ অস্পষ্ট যে সংবাদ এসেছিল, পরে বিশেষজ্ঞরা তার মর্মোদ্ধার করেছিলেন, 'চারপাশ দেখে মনে হচ্ছে, আমরা অদ্ভুত এক সাদা জলরাশির ভেতর প্রবেশ করেছি।' 'ইট লুকস লাইক' শব্দ তিনটি তবু স্পষ্ট বাকিটা অনেক চেষ্টায় বোঝা গিয়েছিল 'এন্টারিং হোয়াইট ওয়াটার। উই আর কমপ্লিটলি লস্ট।'

যে আকাশের তলায় বিমানের ডানায় ছায়ায় বসে আছি, আমরা ছ'জনে, এই একই আকাশ ১৯৪৫ সালে ছিল। ১৯৬৮-তে ছিল, ৭২-এ ছিল। রহস্যময় আকাশ। বিজ্ঞানীরা জানেন এই ট্র্যাঙ্গলের একটি বিন্দুতে, ফ্লোরিডা বাহামার মধ্যে একটি অঞ্চলকে বলা হয় 'রেডিও ডেড স্পট'। যেখানে বেতার তরঙ্গ প্রবেশ করে না, নির্গতও হয় না। এমন একটি বিন্দু আছে যেখানে কম্পাস অচল হয়ে যায়।

আমাদের ডাক পড়ল। বিমান এবার ছাড়বে। বারমুডা থেকে মেকসিকোর ইস্তাফা। ঘড়ি আর দেখে কি হবে! সময়ের আর হিসেব নেই। কত তারিখ তাও বলা যাবে না। আমার আবার ডিজিটাল ঘড়ি। সময় বা তারিখ বদলাতে হলে বেশ ঝামেলা করতে হবে। মেকসিকোয় পৌঁছে মেলানো যাবে। একলাফে বিমান বারমুডা বন্দর ছেড়ে অ্যাটলান্টিকের আকাশে উঠে পড়ল। আমাদের পথও অনেকটা ফ্লাইট

নাইনটিনেব পথেই মতোই। উড়ে চলেছি গাল্ফ অফ মেকসিকোব দিকে। এই অঞ্চলে আজ থেকে পনেব কুড়ি বছব আগে ফ্লাইংসসাবেব উপদ্রব হযেছিল। ফ্লাইট নাইনটিন অদৃশ্য হবাব আগে নাগাড়ে বেতাব বার্তা প্রেবণ কবেছিল। তাব কিছু ধবা পড়েছিল ফোর্ট লডাবডেলেব টাওযাবে। কিছু ধবা পড়েছিল হ্যাম বেডিওতে। ব্যক্তিগত কিছু কিছু বেডিও স্টেশান সাবা পৃথিবীতে ছড়িযে আছে, হবি সেন্টাবেব মতো। সে বকম একটি হ্যাম বেডিও স্টেশানে ফ্লাইট নাইনটিনেব একটি বার্তা ধবা পড়েছিল। টেলাবেব গলা', Don't come after me। এ কথা কাকে বলেছিলেন টেলাব? কিছু পবেই শোনা গিযেছিল, টেলাব বলছেন 'দে লুক লাইক দে আব ফ্রম আউটাব স্পেস।

বিমানে নতুন সেবিকাব' এসেছেন। সেবিকা প্রধান অবশ্য সেই একই মহিলা। তাঁব ডিউটি বদলায না। আবাব খাওযা। প্রশ্ন কবলুম, 'এটা কি?'

অত্যন্ত হাসিমুখ, প্রসন্ন বিমানসেবিকা বললেন 'এটা হলো ব্রেকফাস্ট।'

তাব মানে ভোব হলো। বিমান ছাড়াব হিসেবে। যে অঞ্চল দিযে উড়ে চলেছি, সেই হিসেবে নয়। পর্ট হোলেব গা বেযে শিবেব জটাজালেব মতো পিঙ্গল বর্ণেব অদ্ভুত এক ধবনেব মেঘ পাকিযে উঠছে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হযে এল। বুক ঢিপঢিপ কবছে। অলৌকিক কোনও অভিজ্ঞতা হবে না কি! এই তো এখন আমবা পুবোপুবি এই ডেভিলস ট্র্যাঙ্গলেব ওপব দিযে চলেছি। আকাশেব ফুটো গলে অন্য কোনও ডাইমেনসানে অন্য কোনও কালেব জগতে হাবিযে গেলে কেমন হয।

৪৫

প্যাসিফিকেব কূলে ছোট একটি সমুদ্র নিবাস। নাম তাব ইক্সতাপা। ইকসতাপাও বলা যেতে পাবে। বিমান এখন অবতবণ কবল মেকসিকোব আকাশে হঠাৎ উদয হবে এসব যেন হযে আসছে। ইতিমধ্যেই লম্বা লম্বা ছাযা পড়েছে আকাপুলকোব ১৫০ মাইল উত্তবে এই পর্যটন কেন্দ্রটি ক্রমশই জনপ্রিয হযে উঠেছে যাবা প্রশান্ত মহাসাগবেব কূলে নিবিবিলিতে সমুদ্র স্নান কবতে চান, সোনালি বালুকাবেলায শুযে বোদে পুড়ে তামাটে হতে চান তাঁবা অনাযাসে এখানে চলে আসতে পাবেন। মেকসিকো আমেবিকান ট্যুবিস্ট বেশি চান কাবণ তাদেব পযসা আছে। লস এঞ্জেলস, হাউস্টন, স্যানফ্রান্সিসকো ডালাস এবং নিউইযর্কেব সঙ্গে সবাসবি বিমান যোগাযোগ। পর্যটকদেবই উদ্দেশ্যে ইকসতাফাব প্রধান আমন্ত্রণ a golden pacific resort of uncommon innocence নির্জন সমুদ্র সৈকত। বিলাসবহুল হোটেলেব সমস্তপ্রকাব আবাম। স্বাগত ইকসতাফা। আকাপুলকোব পৌবাণিক সহোদবা। এখনও যুবতী, এখনও নির্দোষ শিশুব মতোই চপল। ইকসতাফা, মানে আনন্দ, উচ্ছ্বাস। দিবাস্বপ্ন। আবিষ্কাব। চিবকাল মনে বাখাব মতো দৃশ্য।

বিমানেব সামনেব দবজা দিযে প্রথমে নামলেন প্রধানমন্ত্রী বাজীব গান্ধী ও তাঁব সঙ্গীবা। মেকসিকো সবকাবেব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবা এসেছেন স্বাগত জানাতে। এসেছেন ভাবতেব হাইকমিশনাব ও তাঁব সহকাবীবা। বিমানেব পেছনেব দবজায যে সিঁড়ি লাগানো হযেছে তাব বিভিন্ন ধাপে দাঁড়িযে আমবা দেখছি। প্রথমে পবিচযেব পালা তাবপব হাতে হাত মেলানো। প্রধানমন্ত্রীকে নিযে সকলে চলে গেলেন। ধীবে ধীবে আমবা নেমে এলুম। আমাদেব দাযিত্ব নিলেন ভাবতীয দূতাবাসেব কর্মীবা। মেকসিকোয এখন ভাবতেব বাষ্ট্রদূত হলেন, শ্রী এ টি সাটাবাওযালা। তাঁব প্রাইভেট সেক্রেটাবি শ্রী আব সি শর্মা এগিযে এসে আমাদেব সঙ্গে পবিচয কবালেন। তাঁব সঙ্গে বযেছেন থার্ড সেক্রেটাবি, শ্রী এ কে মুদগল।

এখানে বাষ্ট্রপ্রধানদেব নিবাপত্তায নেমেছেন সৈন্যবাহিনী। গ্রে বঙেব ইউনিফর্ম। মাথায হেলমেট। হাতে স্টেনগান। তবে লন্ডনেব মতো অতটা আড়ষ্ট নয। নিবাপত্তাব আলো বাতাস মোটামুটি খেলছে। সর্বত্রই বেশ একটা ঘবোযা ভাব। আমবা অবশ্য সহজে নিষ্কৃতি পেলুম না। লবা লুনা ট্রিলো মেগেটি

বাতাসের মতো। মিষ্টি এতটুকু একটা মেয়ে। ফুলছাপ ফ্রক পরে ছিপছিপে শরীর নিয়ে কি দৌড়নোই না দৌড়চ্ছে। প্রজাপতির মতো উড়ছে।

আমাদের একে একে ফটো তোলা শুরু হলো। ইনস্ট্যান্ট ফটো। পজেটিভ ক্যামেরা। নেগেটিভের মনে হয় কোনও কারবারই নেই। ফ্ল্যাশ অ্যান্ড ফটো। সেই ফটো নিমেষে একটা আইডেন্টিটি কার্ডে ল্যামিনেটেড হয়ে আমাদের গলায় গলায় ঝুলে পড়েছে। বিজ্ঞানের কি উন্নতি! পাশেই আমেরিকা। আমার মুখের ছোট্ট ডাকটিকিটের মাপে লাল একটি ছবি বেরিয়ে এল। দেখে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন নিকারাগুয়ার কোনও পলাতক বিপ্লবী। কার্ডটা বেশ বড়। নানা রঙের ছাপা। নকশা করা। বাঁ দিকে অংশগ্রহণকারী ছটি দেশের জাতীয় পতাকা। মাথার ওপর লেখা, 'রিইউনিয়ন দ্য মেকসিকো সব্রে পাজ ওয়াই ডেসারমে'। ইকস্টাপা গ্রো। ফাইভ সেভেন অগাস্তো • ইনটিন এইটটি সিক্স। ডানপাশে ছবি, বাঁপাশে নীলের ওপর বিভাবসে ছাপা একটা গ্লোব্যাল ম্যাপ। একেবারে তলায়, স্যালোন কার্লিলডোস।

লন্ডনে এই প্যারাফারনেলিয়াটা যত সহজে হয়েছিল , এখানে তত্টা সহজে হলো না। লবা লাফাচ্ছে। মুদগল ছোটাছুটি করছেন। শমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে হোটেলে যাবার গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। প্যান্ডমোনিয়াম। চিরকাল যা হয় তাই হলো। আমি ছাড়া পেলুম সব শেষে। তখন গাড়ি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। আমাকে হয়তো ফেলে রেখেই চলে যেত। তখন কি হতো! সেই ভাবনায় আমি চলমান কোচে সামনের আসনের জানালার ধারে বসে মনে মনে নানারকম আতঙ্ক তৈরি করতে লাগলুম। নিজের ভাবনা নিয়ে বেশিক্ষণ থাকা গেল না। চারপাশ দিয়ে হুহু করে বয়ে চলেছে অচেনা দেশ মেকসিকোর দৃশ্যাবলী।

ইকসতাপা প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে নিরালা একটি সমুদ্র নিবাস। ৫২৬৩ একরের একটি ভূখণ্ড। অজস্র নারকেল গাছ, ম্যানগ্রোভ, রঙীন ফুল, আর লতাপাতা সমুদ্রের ধার ঘেঁষে মাইলের পর মাইল চলে গেছে। লোকসংখ্যা খুবই কম। নানারকমের পাখির কলকাকলি। একদিকে সমুদ্র আর একদিকে সবুজ সিয়েরামাদ্রে পর্বত। যে জায়গা দিয়ে গাড়ি চলেছে সেই জায়গাটার নাম মনে হয় যিহুয়াতানেজো। শান্ত একটি পল্লী। সর্বত্র স্পেনের স্পর্শ। মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ানদের চোখে পড়ছে। খর্বাকৃতি। গায়ের রঙ চাপা। কোথায় ইন্ডিয়া আর এদের নাম হয়ে গেল ইন্ডিয়ান! ছোট ছোট দোকান। ছোট ছোট বাড়ি। বেশ মিষ্টি একটি পরিবেশ। প্রকৃতিকে মানুষ এখানে তেমন ভাবে খর্ব করতে পারেনি। মেকসিকোর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় হলো। কাঁকুড়ে জমি। প্রচুর গাছপালা। সবই হয়তো চেনা, আমার মনে হচ্ছে অচেনা। দেশ যখন অচেনা তখন গাছ, পাখি, জীবজন্তু মানুষ প্রভৃতি সবই অচেনা হবে। যা দেখছি, সবেতেই বিস্ময়।

সন্ধের মুখে আমরা আমাদের বিশাল হোটেলে পৌঁছে গেলুম। বহুতল বাড়ি। একটা নয় একাধিক। হোটেল কমপ্লেকস। রাষ্ট্রপ্রধানরা আসছেন বলে মিলিটারি বেসক্যাম্পের চেহারা নিয়েছে। প্লেটকলারের ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র সেনাবাহিনী। মেকসিকান সৈন্যরা যেন পাথরে খোদা মূর্তি। হোটেল কমপ্লেকসের সামনে একখণ্ড ফাঁকা জমিতে দৈত্যের মতো বাডার গম্বু। নির্নিমেষ চোখ মেলে রেখেছে।

হোটেলটা এত বড়, এত উঁচু, সহজে আপন করে নেওয়া যায় না। নিচেটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ঝকঝকে কালো পাথর দিয়ে মোড়া। একপাশে রিসেপসান। মানিএকসচেঞ্জ কাউন্টার। সমস্যা একটাই। ভাষা। ইংরেজিতে কেউই তেমন সড়গড় নয়। তিন নম্বর ব্লকের চোদ্দ তলায় ছশো ছেচল্লিশ নম্বর ঘরে আমার ব্যবস্থা। পাশের ঘরে কুমকুম। এখানেও কুমকুম আমার নেভিয়ার। রিসেপসান চাবি ধরিয়ে দিয়েই কর্তব্য সমাধা করলেন। এইবার তুমি চরে খাও। মেকসিকোর হোটেল নিয়ে ভোগান্তির একশেষ। ঠান্ডা মাথায় ভাবলে ব্যাপারটা কিছুই নয়। অথচ এমন এক ভুলভুলাইয়া! কোথা দিয়ে কি গেছে! এই পথ, ওই পথ। ছত্রিশ গণ্ডা লিফ্‌ট। ঠাসা অ্যামেরিকান ট্যুরিস্ট। ছেলে, মেয়ে, শিশু, কিশোর আনন্দে টগবগ করছে চারপাশে। প্রশান্তমহাসাগর কতদূরে তখনও জানা হয় নি, তবে পরিপূর্ণ পোশাকে কারুকেই দেখছি না। বেশির ভাগই অর্ধনগ্ন। খুঁজে খুঁজে আমি আর কুমকুম একটা লিফটে উঠলুম। কে যেন বললেন এইটাই আমাদের ব্লক। এই লিফ্‌টটাই আমাদের সঠিক স্থানে পৌঁছে দেবে। আমরা ঢুকলাম আমাদের পেছনে পেছনে হুড়হুড় করে একদল মহিলা ঢুকলেন। ভিজে সুইমিং কস্টুম পরে।

কোন দিকে তাকাই। সব চেয়ে দুঃখ, আমাদের কেউ গ্রাহ্যই করছে না।

ঘরটি বড় চমৎকার। ঢোকার মুখে আলোকিত খাপে ঘরের নম্বর জ্বলছে। একপাশে লম্বা লম্বা কাচের জানালা। বিশাল বড় দুটো বিছানা। জানালায় ভারি ভারি পর্দা আছে, তবে একপাশে সরানো। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কি আছে বাইরে দেখাই যাক। অদূরে বিশাল সমুদ্র। ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস ভাঙছে। আর অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে আর একটি বিশ বাইশতলা বাড়ি। পরিত্যক্ত। পরে জেনেছিলুম দেখেও ছিলুম ফুটিফাটা হয়ে আছে। বিগত মেকসিকান ভূমিকম্পের স্মৃতি।

ঘরটা এত বড় আর এত মনোরম কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলম। বাইরের আকাশ অন্ধকার। দূরে প্রশান্ত মহাসাগর। কে বলেছে প্রশান্ত! আসলে খুবই অশান্ত। জানালার একটা পাল্লা খুলতেই এক ঝটিকা সমুদ্রের বাতাস ঢুকে পড়ল। জানালাটা খুলে বেশ অস্বস্তি হলো। হাঁটু পর্যন্ত রেলিং, তারপর ফাঁকা। সাগর আমি আসছি, বলে একটু আবেগের অর্থ, সোজা নিচে পাথর মোড়া র‍্যাম্পের ওপর। জানালাটা বন্ধ করে দিলুম।

বাথরুমের শাওয়ারটার কথা না বললে ঠিক হবে না। সে এক মজার জিনিস। কাঁচের ক্যাপসুলের ভেতর শাওয়ার। কল ঘুরিয়েই ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম। কিছু ভুল করে ফেললুম না তো। জলের বদলে ঝাঁক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি। কটাকট। খটাখট। ভটাভট শব্দ। ধীরে চোখ মেলে তাকালুম বেঁচে আছি। গুলি নয়, জলই পড়ছে। ঝাঁঝরা হইনি। গালেই ভিজেছি, কিন্তু শব্দ থামেনি শাওয়ারের দিকে তাকিয়ে অবাক। নুটি লাগানো একটা চাকা গোল হয়ে ঘুরছে। জল চরাকর মতো ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে নিচে। কাঁচের খোপের রহস্যটা এবার বোঝা গেল। কেন এত সঙ্কীর্ণ। কাঁচে ধাক্কা খেয়ে জল পাক মেরে মেরে আমাকে ঘিরে জলের একটা আবর্ত তৈরি হয়েছে। আমাকে কিছুই করতে হচ্ছে না শব্দটা সহ্য করা ছাড়া। জলের ঘূর্ণী আমাকে ঘষে মেজে দিয়ে যাচ্ছে। বাষ্পে কাঁচ আচ্ছন্ন। এমন শাওয়ার আমি আগে দেখিনি। পরেও আর দেখব না এর নাম বোধ হয় 'মেকসিকান ডেসপারাডো শাওয়ার।

মেকসিকোর প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি সুদীর্ঘ। মেকসিকোর ঐশ্বর্যই বলা চলে। এই তটভাগে আছে বন্দর মৎস্যজীবীদের গ্রাম, সব রকমের, সব রুচির শহর। হারমোসিলোর অব্যবহিত পশ্চিমে লোরেটো থেকে আকাপুলকো পর্যন্ত এই সব বন্দর গ্রাম আর শহর যেন বিশাল এক বাক্যের মাঝে কমা বসানোর মতো। থামতে বলে, কিন্তু শেষ হয় না। কোনও দুটো জায়গা সমান নয়। এক এক জায়গার এক এক বৈচিত্র্য। ইকসতাপা আর জিহুয়াতানেজো দুটি নতুন কমা। বেকার সমস্যার সমাধানে আর অর্থনীতির উন্নয়নে মেকসিক্যান সরকার সম্প্রতি 'রিসর্ট ডেভেলাপমেন্ট'-এর নতুন একটি পরিকল্পনা নিয়েছেন। জিহুয়াতানেজো অসম্ভব সুন্দর একটি শহর। কিছুকাল আগেও এখানে আসার সহজ কোনও যোগাযোগ ছিল না মহাপ্রস্থানের পথের মতো আঁকাবাঁকা প্রাচীন একটি পথ ছিল। নিজের বিমান থাকলে, সেই বিমানেও পৌঁছনো যেত। মেকসিকো সরকার জিহুয়াতানেজোর সঙ্গে সভ্য দুনিয়ার সহজ যোগাযোগের পথ খুলে দিলেও, প্রাচীন সৌন্দর্য, প্রাচীন জীবনছন্দ অটুট আছে। এখনও এক ডজন ঝিনুক আর ঠান্ডা বিয়ার হলো প্রচলিত ব্রেকফাস্ট। আর ইকসতাপার জন্মদাতা হলো কম্পিউটার। কম্পিউটারে ডিমটি পেড়েছে। আর তা দিয়েছে শহর বিজ্ঞানীরা, সমাজতত্ত্ববিদ, কুবের যাদুকর আর পর্যটন শিল্পের বিশেষজ্ঞরা।

১৯৬০ সালের ঘটনা। মেকসিকোর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে হার্ভার্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু উৎসাহী যুবক কর্মী মেকসিকোর নানা অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে দেখলেন, একটিই মাত্র পথ, পর্যটন শিল্পের বিকাশ। প্রথমে তারা চেষ্টা করেছিলেন আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়ানো। চেষ্টা করেছিলেন শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের। চেষ্টা করেছিলেন কৃষির উৎপাদন বাড়াতে, কিন্তু প্রতিবারই কম্পিউটর জানিয়ে দিল জাতীয় আয় ট্যুরিজমে যতটা বাড়বে অন্য কোনও কিছুতে ততটা বাড়বে না।

মেকসিকোর ট্যুরিজম-শিল্পের নাম 'হসপিট্যালিটি বিজনেস'। আতিথেয়তার ব্যবসা। আতিথেয়তার ব্যবসা অসংখ্য কর্ম সৃষ্টি করে। বহু মানুষের রুজিরোজগারের ব্যবস্থা হয়। যেমন কাস্টমস ইনস্পেকটার ব্যাগেজ হ্যান্ডলার, ট্যাকসি ড্রাইভার, বেলবয়, রুমক্লার্ক, চেম্বার মেড, বারটেন্ডার, ওয়েটার। এক একটা হোটেল ঘিরে এত ধরনের জীবিকা। এর বাইরে আছে হস্তশিল্প। ট্যুরিস্ট মানেই অঢেল কেনাকাটা।

হস্ত আর কারুশিল্পের ভালো ভালো দোকান গজিয়ে ওঠে। শিল্পীদেব মুখে হাসি ফোটে। দোকানে দোকানে কাজ পান আরও একদল মানুষ। মাল আনার জন্যে, নিয়ে যাবার জন্যে ট্রাকে আর ট্রাক ড্রাইভারের প্রয়োজন হয়। সঙ্গীতজ্ঞরাও সুযোগ পান। গিটাব হাতে গায়কবা যাঁরা ছুটি কাটাতে এসেছেন তাঁদের মনোরঞ্জন করেন। প্রেমিক জুটি নাচতে থাকেন সুরের তালে তালে।

মেকসিকোয় প্রেমের বাতাস একটু জোরেই বইছে। ইকসতাপায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। যত রাত বাড়ছে হোটেল যেন ততই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে সকালে ঘুম ভাঙে, এদেশে ঘুম ভাঙে রাতে। ওপাশে নারকেল কুঞ্জ। সেখানে শামিয়ানা খাটানো চারপাশ খোলা একটা খানাপিনার জায়গা। নামটা ভারি সুন্দর, 'কোয়ায়েতা'। আমাদের দলের অন্যান্যরা যে যার ঘরে ঢুকে পড়েছেন। সকলেই সাংঘাতিক ক্লান্ত। 'জেটল্যাগ' বলে একটা ব্যাপার আছে। দীর্ঘ সময় আকাশে উড়লে, এক গোলার্ধ থেকে আর এক গোলার্ধে হঠাৎ চলে এলে মানুষের শরীর ধরাশায়ী হতে চায়। আমাদের দলের নবীন আর প্রবীণ সকলেই মনে হয় ভূতলশায়ী। কুমকুমকে তেমন কাবু মনে হলো না, তবে বেচারা হিথরোতে পড়ে গিয়ে ভীষণ আহত হয়েছে। দলে আর কোনও মহিলা নেই। নিজেই নিজের পরিচর্যায় ব্যস্ত মনে হয়।

'কোয়ায়েতা' শামিয়ানায় বিখ্যাত গায়ক জুলিয়াস ইগলাসিয়াসের গান হচ্ছে। ভরাট গলা আর গিটারের সুর রাতের আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। অসম্ভব সুন্দর সুন্দর চেহারার প্রায় বিবস্ত্র ছেলেমেয়ে খানাপিনায় ব্যস্ত। জামা কাপড়ে নিজেরাই লজ্জা করছে। ইকসতাপায় জামা কাপড় চলে না। টু পিস সুইমিং কস্টুমই এখানকার আদর্শ পোশাক। আমি অসভ্যের মতো প্যান্ট, জামা, জুতো, মোজা পরে ঢুকে পড়েছি। অনেকেই তাকাচ্ছেন। বের করে দেবার আগে আমি আর একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলুম। সামনেই পাশাপাশি তিনটে সুইমিং পুল। পুল পেরিয়ে ওপাশে যাবার জন্যে ফাঁকে ফাঁকে পাথরের পিলার। লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে। আলোকের ঝরণাধারা শোনা ছিল। চোখে দেখলুম। রাত যেন দিন। সাত আট জন গম্ভীর মুখ প্রবীণ হোটেল কর্মচারী সুইমিং পুল পরিষ্কার করে জল ভরছেন। আর তো কয়েক ঘণ্টা পরেই সকাল হবে তারই প্রস্তুতি চলেছে। দুটি পুল ইতিমধ্যেই টলটলে জলে ভরে উঠেছে। পুলের এপাশে ওপাশে অজস্র ঝকঝকে ডেকচেয়ার পাতা। ধনীর দুনিয়ায় আমি এক ছিঁচকে চোর। সব চেয়ারই খালি। মনে হলো, আরাম করে বসি। সাহসে কুললো না।

ফাঁক ফাঁক পাথরের স্ল্যাবের ওপর দিয়ে টপকাতে টপকাতে যে জায়গায় এলুম, সেখানে সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে। শেষের ধাপটি একটি জলাধার। পাপোশের বদলে জলপোশ। সমুদ্র সৈকত থেকে যাঁরা ফিরে আসবেন তাঁরা বাধ্য হবেন ওই জলে পা ডুবিয়ে এদিকে আসতে। এখানে জুতো পরার রেওয়াজ নেই। আমি জুতো মোজা খুলে জল ভেঙে নেমে গেলুম বেলাভূমিতে। বেশ রাত হয়েছে। বিশাল বেলাভূমি। অজস্র ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত। ডাইনে বামে যেদিকেই তাকাই সমুদ্রসৈকত দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। চতুর্দিকে হাত পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসার মতো ফাইবার গ্লাসের তৈরি নৌকাকৃতির আসন পড়ে আছে। একটাকে একটু নিচুতে টেনে এনে বসে পড়লুম। সামনে সমুদ্রে ফুঁসছে। এত বড় ঢেউ আর এত তেজিয়ান ব্রেকার আমি আগে দেখিনি। হেলান দিয়ে শুয়েই পড়েছি। শরীর জুড়ানো বাতাস। ঢেউ ভেঙে যখন গড়িয়ে আসছে ফ্লাডলাইটের আলোয় মনে হচ্ছে দুধ সমুদ্রে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। সমুদ্র এত ফুঁসছে বলেই তারাটারা নিয়ে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের এই আকাশ যেন অনেক নিচে নেমে এসেছে।

আমার বাঁ পাশে অল্প দূরে একদল ছেলেমেয়ে আগুন জ্বেলেছে। দুপাশে দুটো খোঁটা পুঁতে কি একটা ঝলসাচ্ছে। মনে হয় মাংসখণ্ড। একটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে স্প্যানিশ গিটার বাজিয়ে 'ব্যারিটোন' গলায় গান গাইছে। বেশ শান্ত ভদ্র একটি 'বিচপার্টি।' রাত প্রায় বারোটা তবুও দলে দলে নারী পুরুষ নতুন করে সমুদ্রস্নানে কেমন আসছেন। কিশোর কিশোরীদের যে কি সাহস! ওই লাফানে রাতের সমুদ্রে কেমন অক্লেশে নেমে যাচ্ছে। দোতলা, তিনতলা সমান এক একটা ঢেউ ওদের টপকে চলে আসছে। সগর্জনে ভেঙে পড়ছে তটভূমিতে। মুহূর্তের জন্যে স্নানার্থীরা হারিয়ে যাচ্ছেন, পরক্ষণেই দুগ্ধশুভ্র ফেনায় বড় বড় কালোজামের মতো মাথা ভাসছে। অনেক দূরে তটভূমি যেখানে সর্বাধিক আলোকিত সেইখানে একটি ছেলে আর মেয়ে একজন আর একজনের কাঁধে হাত রেখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের ওপর দিয়ে ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলে যাচ্ছে। স্বপ্ন কি ভাবে তৈরি করতে

হয় মানুষ জানে। প্রশান্ত মহাসাগরের নৃত্য, সোনালি বেলাভূমি, উজ্জ্বল আলো, মধ্যরাত, ধনুকের মতো সাগর জলের ফেনা স্লেট রঙের ভিজে বালির ওপর দিয়ে ছেঁড়া দোপাটির মতো ঘুরে ওপাশে, আরও ওপাশে ক্যানক্যান, আকাপুলকোর দিকে চলে গেছে। এই সমুদ্রের ঢেউয়ের ধরন-ধারণ অনেকটা কম্যাণ্ডোদের মতো। ঢেউ ওঠা আর ভাঙার কায়দাটা সব সময়েই প্রায় এক রকম। ঢেউ আসতে আসতে ঠিক একটা জায়গায় এসে কামানের গোলা ছোঁড়ার শব্দে লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তটভাগে। অবিশ্রান্ত এই খেলাই চলছে।

হঠাৎ সমুদ্র থেকে এক মহিলা উঠে এলেন। এগিয়ে আসছেন আমারই দিকে। আমার পাশেই একটা শয়নাসন টেনে নিয়ে বসলেন। আড়াচোখে দেখলুম। তাকাবার সাহস নেই। অলিভ রঙের দেহত্বক। আর্দ্র বলে আলো পড়ে ফসফরাসের মতো জ্বলছে। তিনি এতই সজীব ও সবুজ আর আমি এতই মৃত আর নির্জীব যে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে হলো।

হঠাৎ ফটফট শব্দ আর জলের ছিটে গায়ে লাগায় তাকাতে হলো। মহিলা ইল্যাস্টিক লাগানো ব্রাটাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে ধনুকের ছিলার মতো টানছেন আর ছেড়ে দিচ্ছেন। ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি শরীরের যথাস্থানে ফিরে গিয়ে চেপে বসছে। এই আন্দোলনে সাগরের জলকণা আনন্দের বার্তার মতো, মিষ্টান্ন ইতরে জনার মতো অধমে পরিবেশিত হচ্ছে। আমি কি উঠে যাবো, না বসে বসে দেখব সি-নিম্‌ফের কাণ্ডকারখানা।

৪৬

বসে আছি তো বসেই আছি। প্রশান্ত মহসাগরের তরঙ্গভঙ্গ দেখছি। মানব মানবীর নাচ গান আর স্নানের আনন্দ দেখছি। পয়সা থাকলে মানুষ কেমন পৃথিবীকে উপভোগ করতে পারে। কোথায় আমাদের দীঘা আর কোথায় এই ইকসতাফা কিছুকাল আগেও এই ইকসতাফা ছিল সমুদ্রের ধারে অতি উপেক্ষিত একটি গ্রাম। কিছু মৎস্যজীবী, কোনওরকমে মাথা গোঁজার মতো কিছু আস্তানা। তীরে বালির ওপর উলটে থাকা কিছু জেলে-ডিঙ্গি। এখন যেখানে উদ্ভাসিত বৈদ্যুতিক আলোয় সাঁতারের পোশাক পরে একদল পুরুষ আর মহিলা ঢেউয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে, সেখানে একদিন জেলেরা জাল ফেলত। দু'হাত ভরে তুলে আনত ঝিনুক। জেলে বউরা মাছ ছাড়াতো। রোদে শুকতো। চারপাশে ঘুরে বেড়াত একপাল শূকর। রাত নামলে গিটার বাজতো। ক্লান্ত ভারি গলায় গান, আই অ্যাম দি ফিশারম্যান অফ দি সি। সেই শান্ত গ্রাম এখনও শান্তঃ আছে, তবে ছবিটা পালটেছে। পটচিত্র থেকে আধুনিক চিত্র। লম্বা লম্বা হোটেল, ফ্লাডলাইট, কম্প্যুটার, পয়সাঅলা আধুনিক মানুষের ভিড়। ওদিকে টেনিস কোর্ট, এদিকে গল্ফ কোর্স। স্কুবাডাইভিং। মেকসিকো সরকার বেশ বড় রকমের একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সফল হয়েছেন। নতুন সমুদ্র আবাস তৈরি আর নতুন মডেলের মোটর গাড়ি বাজারে ধরান. কি একটা হিট ফিল্ম করা এক জিনিস। ধরে গেল তো গেল নয় তো ফ্লপ। সব টাকা চলে গেল জলে।

খবর পাওয়া গেল পাঁচ দশ মিনিট হাঁটলে একটা সুন্দর মারকেট সেন্টার পাওয়া যাবে। সেখানে একটা ডিস্কো ড্যান্‌স সেন্টার আছে। তার সামনে একটি ছেলে রাত বারোটার সময় রোল কাউন্টার খোলে। সস্তায় ভালো খাবার পাওয়া যায়। এই সুসংবাদটি নিয়ে এলেন দিল্লি দূরদর্শনের রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, কুমকুম আর মিস্টার রাও। আমরা কেউই ট্যুরিস্ট নই। অঢেল পয়সাও নেই। কৃপণের মতো খরচ করতে হবে। খিদেও পেয়েছে। রাত প্রায় একটা। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ক্রিস্ট্যাল হোটেলের সামনে দিয়ে সেই অজানা ঠিকানায় পাড়ি দিলুম। পথঘাট খুবই নির্জন। মাঝে মাঝে এক আধটা ট্যাকসি হুস করে চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত চেহারার অটো, অনেকটা রথের মতো দেখতে বিকট শব্দ করে ছুটছে। এগুলো ভাড়া করে নিজেরাই চালান যায়। আমুদে ট্যুরিস্টরা তাই করছেন। স্বল্পবাস মহিলারা চেপে বসে আছেন। খিলখিল হাসছেন। বাতাসে তাঁদের সোনালি চুল ঘোড়ার লেজের মতো উড়ছে। এ সবই যেন স্বপ্ন।

আমরা মার্কেট প্লেসে এসে গেলুম। কল্পনাতেও এত সুন্দর স্থান তৈরি করা যায় না। সাদা পাথরে বাঁধান পথ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট স্কোয়ার। পাথরের তৈরি বসার জায়গা। ছোট ছোট মন্দিরের মতো আচ্ছাদিত বিশ্রামস্থল। আলোকিত দোকানপাট। জামা-কাপড়ের দোকান। কিউরিওর দোকান। অলঙ্কারের দোকান। সব দোকানই বন্ধ। কাঁচের দরজা টানা। ভেতরে আলো জ্বলছে। সেই আলোর মাথায় ভেতরের জিনিসপত্র সব মায়াবী হয়ে আছে। ম্যানিকুইনরা মনে হচ্ছে এখনি জীবন্ত হয়ে উঠবে। কেউ দাঁড়িয়ে আছে জানালার ধারে। কেউ বসে আছে সোফায়। কেউ অপেক্ষা করে আছে দোকানের দোতলায় ওঠার ঘোরানো সিঁড়ির মুখে। দোকানের সিঁড়ির ধাপ সব মার্বেলে বাঁধানো। মধ্যরাতে বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বিমুগ্ধ। এমন জায়গাও পৃথিবীতে আছে?

একটি রেস্তোরাঁ তখনও খোলা রয়েছে। ভেতরে খানাপিনায় রত একাধিক মানুষ। রেস্তোরাঁর বাইরে আহ্বান জানাচ্ছে বর্ম আর শিরস্ত্রাণ। এমন কায়দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে যেন সশস্ত্র এক গ্ল্যাডিয়েটার। আমরা সেই ডিস্কো ড্যানস সেন্টারের সামনে এসে গেলুম। ভেতরে ঝমঝম গান বাজনা চলেছে। আলো চমকাচ্ছে। গোটাকতক ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কাছে ঘেঁষার সাহস হলো না। শুভার্থীর উপদেশ, রাত-বিরেতে বেশি সাহস দেখিও না। সাবধান! পাসপোর্ট আর ফবেন একসচেঞ্জ চলে গেলে মরবে। ডিসকো সেন্টারের বাইরে ম্লান অন্ধকারে বিশাল একটি বাকস নিয়ে অতি সুদর্শন এক তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে অতি সুন্দরী এক তরুণী। দু একজন খদ্দেরও রয়েছে।

প্রথমে আমরা তিন জনে তিন বোতল কোকাকোলা নিয়ে একটা বন্ধ দোকানের শ্বেতপাথরের নীচু ধাপে গিয়ে বসলুম। এই দেশে কোকাকোলা খুব কম দাম। আমাদের দেশের হিসেবে দু'টাকায় ইয়া বড় এক বোতল। ঠান্ডা কনকনে। আর এক শুভার্থী বলেছিলেন, মেকসিকো অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকায় পানীয় জল ও খাদ্য সম্পর্কে খুব সাবধান; কোনও অসুখ ধরে গেলে সহজে সারানো যাবে না। এতদাঞ্চলের রোগ জীবাণুর 'স্ট্রেন' সম্পূর্ণ আলাদা। ভালই হয়েছে জলতেষ্টা পেলেই আমরা কোকাকোলা আর মিনারল ওয়াটার খাচ্ছি।

যেখানে এসে বসেছি, জায়গাটা এত পরিষ্কার আর সুন্দর যে আমরা আধশোয়া হয়ে পড়লুম। ঘুমঘুম ভাব অথচ ঘুম আসছে না; কারণ একটাই, 'বায়োলজিকাল ক্লকে' সব ওলটপালট হয়ে গেছে। এখানে রাত দেড়টা, ভারতে বেলা দেড়টা। ক্লান্তি আসছে, ঘুম আসে কি করে। রাও বোতল রেখে উঠে গেলেন। ছেলেটির কাছ থেকে গরম তিনটে হ্যামবার্গার নিয়ে এলেন। এখানকার রুটি খুব সুন্দর। নরম, সুস্বাদু।

তরুণের অদূরে যে তরুণীটি দাঁড়িয়ে আছে, সে ক্রেতা নয় প্রেমিকা। ছেলেটি ক্রেতাদের সেবা করছে। আবার যখনই অবসর পাচ্ছে, তরুণীটির পাশে সরে গিয়ে একটু আদরটাদর করে আসছে, ঠোঁটে চুমু খেয়ে আসছে। বড় সুন্দর ব্যাপার। কারুর কোনও লজ্জা নেই। রাখা ঢাকার চেষ্টা নেই। প্রেম সব সময় পবিত্র। আগেই বলেছি, মেকসিকোয় প্রেম একটু বেশি। দু'জনকে মানিয়েছে ভারি সুন্দর। দু'জনেরই সুঠাম স্বাস্থ্য। মেয়েটি এক বোতল কোকাকোলা পেয়েছে। পরনে মিনিস্কার্ট, লো নেক ব্লাউজ।

আমরা আধশোয়া হয়ে খাচ্ছি আর দেখছি। সমুদ্রের ফুরফুরে বাতাস। সমুদ্র অবশ্য ওপাশে বাড়ি চাপা পড়ে গেছে। গান আর বাজনা ভেসে আসছে। ড্যানস ফ্লোর থেকে মাঝে মাঝেই পুরুষ অথবা মহিলারা বেরিয়ে আসছেন। ঘর্মাক্ত। চাপা আলোয় তাঁদের মুখ চকচক করছে। বেশ বোঝা গেল, এ রাত শেষ হবে না। তারা জাগছে। জাগছে সমুদ্র, জেগে আছে প্রেম। যতদিন জীবন আছে, নেচে যাও, প্রেম করে যাও।

আমরা উঠে পড়লুম। কয়েক হাজার পেসো বেরিয়ে গেল। এখানকার মুদ্রার এই এক মজা, হাজারের কমে কিছু হয় না। সেই স্বপ্নময় মার্কেট প্লেসের এখানে ওখানে আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালুম। কিছু অংশ একেবারেই অন্ধকার। ফেরার পথে আমরা একটা বসত বাড়ি পেয়ে গেলুম। দরজা গোড়ায় তিন চারটি মেয়ে বসে আছে। এত রাত, তাও জেগে আছে! আমি পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'কি ঘুমোবে না?' কি বুঝল জানি না, একজন আর একজনের গায়ে হেসে ঢলে পড়ল। মেয়েরা সবখানেই সমান।

সমুদ্র-নিবাস ইকসতাফা 'ভি আই পি' সমাবেশে জমজমাট। বিভিন্ন ভিলায় তাঁরা ছড়িয়ে আছেন। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলফোনসিন, গ্রীসের প্রাইমমিনিস্টার পাপান্দ্রু, ভারতের প্রাইমমিনিস্টার রাজীব গান্ধী, সুইডেনের প্রাইমমিনিস্টার কার্লসোন, তানজানিয়ার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট নেয়ারেরে। আর মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দ্য লা মাদ্রিদ রয়েছেন তাঁর নিজস্ব আবাসে। এই ছজনকে নিয়ে, অর্থাৎ ছ'টি দেশের রাষ্ট্র-প্রধানদের নিয়ে তৈরি হয়েছে 'গ্রুপ অফ সিক্‌স'। ইকসতাফার সর্বত্র টহল দিয়ে ফিরছে সশস্ত্র সেনাবাহিনী। ট্যুরিস্টদের কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। অ্যাটম বোমা ফাটল কি ফাটল না বয়ে গেল। তাঁরা এসেছেন আনন্দ করতে। গায়ে রোদ মাখতে। এসেছেন মাছ ধরতে। 'স্কুবা ডাইভিং' করতে।

বাকি রাতটুকু বিছানায় পড়ে ব্যর্থ চেষ্টা করেছি সামান্য একটু ঘুমোবার। হায় নিদ্রা। আকাশ চিরে সামান্য আলোর উঁকি দেখে বিশাল জানালার ধারে এসে বসেছি। সামনে সেই ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বহুতল হোটেল বাড়ি। অদূরে অক্লান্ত সমুদ্র সমানে নেচে চলেছে। জিঙ্গো ড্যান্স। হঠাৎ জানালার সামনে দিয়ে জলজ্যান্ত একটা মানুষ উড়তে উড়তে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। চোখ দুটো একবার রগড়ে নিলুম। স্বপ্ন নয় তো। পরক্ষণেই একটি মেয়ে উড়ে গেল। আর বসে থাকা যায় না। ব্যাপারটা কি, দেখা দরকার। দরজা খুলে বাইরে এলুম। হোটেলের একজন মহিলা কর্মী একটা ট্রলি ঠেলে নিয়ে চলেছেন। প্রশ্ন করলুম, 'দিদিমণি, আকাশে মানুষ উড়ছে, ব্যাপারটা কী '

'সোজা ছাতে চলে যান, আপনিও উড়তে পারবেন।'

লিফটে চেপে ছাতে। বিশাল তার ব্যাপ্তি। টুপিস সুইমিং কস্ট্যুম পরে একদল পুরুষ আর মহিলা হই হই করছেন। একজনের পিঠে একটা জেট প্রপেলার বাঁধা হচ্ছে। বগলের তলা দিয়ে স্ট্র্যাপ চালিয়ে। তরুণীর সাহস আছে। ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। তরুণী টরপেডোর মতো হুস করে আকাশে উড়ে গেলেন। ফ্লাই বিউটি। উড়তে উড়তে তিনি ঝপাং করে উত্তাল সমুদ্রে গিয়ে পড়লেন। ছাতে হর্ষধ্বনি। একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়ান্ট টু ফ্লাই'

হেসে বললুম, 'আই উইল ডাই ইন দি মিড এয়ার।'

মেয়েটি হাসল। কি ভাবল কে জানে। আমি অপার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সূর্যোদয় হচ্ছে। উপোসগ্রস্ত সকাল।

এই 'গ্রুপ অফ সিকস' এর জন্ম ১৯৪৮ সালের ২২মে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উৎসাহে। ওই দিন যৌথ একটি আবেদন করা হয়েছিল পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন পাঁচটি দেশের প্রতি। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন আর ফ্রান্স হল সেই পাঁচটি দেশ। আবেদনে অনুরোধ করা হয়েছিল, পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করুন। বন্ধ করুন পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন। বন্ধ করুন বিতরণ। পৃথিবীর মানুষ ত্রস্ত। ঠিকই, ১৯৪৫ এর পর পারমাণবিক বিস্ফোরণ আর কোথাও ঘটেনি, কিন্তু মানুষের ভুলে যন্ত্রের ভুলে যে কোনও সময় সর্বগ্রাসী একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে কতক্ষণ। ওই ঘোষণার সময় সুইডেনের প্রাইমমিনিস্টার ছিলেন ওলোফ পামে। তিনি আজ নিহত। নিহত শ্রীমতী গান্ধী। জুলিয়াস নেয়েরেরে সেই সময় ছিলেন, ইউনাইটেড রিপাবলিক অফ তাঞ্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দিল্লিতে মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'গ্রুপ অফ সিক্‌সের' মিটিং ডেকেছিলেন। তখনও ওলোফ পামে জীবিত ছিলেন। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের তিনি ছিলেন অতি উৎসাহী এক উদ্‌গাতা। পৃথিবীর এমনই পরিহাস, আততায়ীর গুলিতে সেই শান্তির দূতকে অকালে বিদায় নিতে হলো।

১৯৮৫ সালের দিল্লি ঘোষণার মুখবন্ধে বলা হয়েছিল, চল্লিশ বছর আগে হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে যখন পরমাণু বোমা বিস্ফোরিত হলো, তখন মানবজাতি বুঝে গিয়েছিল সমূল ধ্বংসের অস্ত্র মানুষের হাতে এসে গেছে। আতঙ্ক হয়ে উঠল জীবনের সাথী। চল্লিশ বছর আগে পৃথিবীর সমস্ত দেশ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছিল আন্তর্জাতিক একটি সংগঠন। সেই সংযুক্ত জাতিপুঞ্জ মানুষকে দেখিয়েছিল আশার আলো।

'সম্পূর্ণ অগোচরে, গত চার দশক ধরে, প্রতিটি জাতি, প্রতিটি মানুষ একটু একটু করে তাদের জীবন ও মরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের ছোট্ট একটি দল আর কিছু যন্ত্র দূর কোনও

নগরে বসে সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। Every day we ramain alive is a day of grace as if mankind as a whole were a prisoner in the death cell awaiting the uncertain moment of execution. And like every innocent defendant, we refuse to believe that the execution will ever take place.

কেন আজ আমাদের এই অবস্থা! কারণ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশসমূহ সেই প্রাচীন যুদ্ধনীতিই অনুসরণ করে চলেছে। অথচ আজ তাঁরা যে অস্ত্রের অধিকারী সেই অস্ত্র প্রাচীন রণনীতিকে অকেজো করে দিয়েছে।

'পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্ব অথবা সমতার কী অর্থ! ওই সব দেশের সমরাস্ত্র ভাণ্ডারে ইতিমধ্যেই যে পারমাণবিক অস্ত্রের সঞ্চয় তৈরি হয়েছে, তাতে গোটা দুনিয়াকে বারোবারেরও বেশী নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। প্রাচীন নীতিই যদি ভবিষ্যতের পৃথিবীতে অনুসৃত হয় তাহলে আজ অথবা কাল মানব-সভ্যতার ধ্বংস সুনিশ্চিত। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধ নিবারণ করা সম্ভব যদি আমরা সকলে এক হয়ে সমস্বরে গর্জে উঠতে পারি, এগিয়ে দিতে পারি আন্তর্জাতিক দাবি, যুদ্ধ আমরা চাই না। আমরা বাঁচতে চাই।

'বায়ুমণ্ডল ও জীবজগতের সাম্প্রতিক নিরীক্ষা এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার ইঙ্গিত তুলে ধরেছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিমেষে জনপদ যেমন নিশ্চিহ্ন করে, প্রচণ্ড উত্তাপ আর বিকিরণী শক্তিতে জীবন ধ্বংস করে, তেমনি খুব সীমিত পারমাণবিক যুদ্ধেও পৃথিবীর হিমমণ্ডলে নেমে আসবে পারমাণবিক শৈত্যপ্রবাহ। প্রাণচঞ্চল, আলোকময় এই পৃথিবীতে নেমে আসবে চির অন্ধকার। জমে যাওয়া এই গ্রহে তখন যে ধ্বংস নেমে আসবে, তা প্রতিটি জাতিকে স্পর্শ করবে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে যারা বহুদূরে আছে তারাও রক্ষা পাবে না। এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা ভেবেই আমাদের সমবেত দাবি পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করতে হবে চিরতরে। পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে হবে।'

আমরা আছি হোটেল ডেল সলে। আর সামিট মিটিং হবে হোটেল ক্রিস্ট্যালে। হোটেল ক্রিস্ট্যাল একেবারে পাশেই। মিনিট তিনেকের পথ। বেলা একটায় হোটেলের স্যালনে সেই সভা। আমরা কিছু আগেই সভাস্থলে হাজির হলুম। হোটেলের বিপরীত দিকে ছোট একটি জমায়েত। প্রতিবাদ জানাতে এসেছে। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ। প্রত্যেকের হাতে ফেস্টুন। ঘন ঘন স্লোগান। মাঝে মাঝে কাঁসর বাজাচ্ছে। স্প্যানিশ ভাষায় কি বলছে বোঝা শক্ত। একজন অভিজ্ঞ মানুষ জানালেন, মেকসিকোর অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। আমেরিকার বর্ডার 'সিল' করে দেওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই গভীর রাতে বিপজ্জনক, হাঙর সঙ্কুল নদী পেরিয়ে মেকসিকোর মানুষ আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করে। জীবিকার সন্ধানে। এই সেদিন খরস্রোতা নদীতে নৌকাডুবি হয়ে একশো ষাট জন হাঙরের পেটে গেছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের হাত থেকে মানবজাতিকে বাঁচাবার চেষ্টায় সুরম্য ক্রিস্টাল হোটেলের সভাকক্ষে রাষ্ট্রপ্রধানদের জমায়েত হতে চলেছে অথচ ক্ষুধার বিস্ফোরণ থেকে বাঁচাবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের জানা নেই। তেল রপ্তানির টাকায় বেশ চলছিল। হঠাৎ তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম সারির ঋণী দেশগুলির অন্যতম এই মেকসিকো। জাতীয় আয় মানে ঋণ। আমেরিকার টাকায় দেশ চলছে। ঋণ শোধ করার জন্যে মেকসিকো আমেরিকার কাছেই হাত পাততে হয়। মজার অর্থনীতি।

বেঁটে বেঁটে স্টেনগান হাতে সৈন্যবাহিনী হোটেল ঘিরে আছে। হোটেলের ছাদে সৈন্য। ব্যালকনিতে সৈন্য। কার্নিসে সৈন্য। আধুনিক পৃথিবীতে রাষ্ট্রপ্রধানদের কি অবস্থা! হচ্ছে দুনিয়া শান্তির সভা। পাহারায় পাঁচ হাজার স্টেনগান।

সভা শুরু হলো। মঞ্চে প্রেসিডেন্ট মাদ্রিদ, প্রেসিডেন্ট আলফোনসিন প্রাইমমিনিস্টার শ্রীরাজীব গান্ধী। প্রাইমমিনিস্টার কার্লসোন, এক্স্ প্রেসিডেন্ট নেয়েরেরে। সভাকক্ষ বিদেশী সাংবাদিক, অভ্যাগতে উপচে পড়ছে। সামনের আসনে বসে আছেন প্রখ্যাত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কিজ, বিজ্ঞানী কার্ল সাগান, অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গলব্রেথ। সভাকক্ষের দু'পাশে দুটি কাঁচের খোপে বসে আছেন দোভাষীরা। প্রতিটি বক্তৃতা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হবে। শ্রোতারা কানে হেডফোন

লাগাবেন। হাতের রিসিভার যন্ত্রে ভাষ্যনির্দেশক কাটাটি ঘুরিয়ে নিজের ভাষায় সেই বক্তৃতা শুনবেন। চমৎকার ব্যবস্থা।

প্রথমেই মঞ্চে উঠে দাঁড়াল আট বছরের ফুটফুটে একটি শিশু, নাম মেলিসা গার্সিয়া। শিশুটি গম্ভীর মুখে পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানীগুণী বিচক্ষণ মানুষদের উদ্দেশ্যে বলল 'ভদ্রমহোদয়গণ, শিশুরা কারোকে ঘৃণা করে না। আমরা শুধু সুন্দর, ছোটখাট জিনিস ভালবাসি। আমরা আমাদের স্বপ্নের কথা বলি, আমাদের কল্পনার কথা বলি। আমরা সূর্য আর ফুলকে ভালবাসতে জানি। চাঁদ আর তারার রাত কত সুন্দর! কত সুন্দর বৃষ্টির শব্দ বাতাসের তাজা স্পর্শ।

'আমাদের শিক্ষকরা বলেছেন তোমরা নাকি সেই পৃথিবীর সাধনা করছ যে পৃথিবীতে শিশুরা নিরাপদে বড় হতে পারবে কোনও আততায়ী যেখানে তাদের হত্যার জন্যে ছুরি তুলবে না। তার মানে তোমরাও শিশু, কারণ শিশুরা কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কারোকে আঘাত করে না। আমি আশা করি শান্তির জন্যে তোমরা যা করছ তা সফল হবে। অনেক অনেক দিন ধরে সেই শান্তি বজায় থাকবে।'

শিশুটি ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে নেমে এল। সভাকক্ষে ক্যামেরার গর্জন। আরও সতের জন শিশু মঞ্চের পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আয়োজক শিশুর এবং প্রতিনিধি দল বিশ্বের যুদ্ধবাজ প্রবীণদের সংযত করতে এসেছে। যুদ্ধ নয় শান্তি। মৃত্যু নয় জীবন

বক্তার বাক্সে এবার এলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক মার্কেজ। চালচলনে কোনও অসাধারণত্ব নেই। ট্রাউজার ও নীল বুশ শার্ট পরিহিত প্রায় প্রবীণ একজন মানুষ। সামনের দিকের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে মুখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ। বুদ্ধিজীবী মানুষদের যেমন হয়। মার্কেজ যা বললেন তা যেন অসাধারণ এক সাহিত্য। ওই সমাবেশের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। মার্কেজ বললেন, পারমাণবিক বিস্ফোরণের মুহূর্তকালের মধ্যেই বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বৃহত্তম মহাদেশগুলির ধূলি ধূম্রজালে নির্বাপিত সূর্যালোক। পৃথিবীতে নেমে আসবে নিরক্র নিরবধি অন্ধকারের যবনিকা। চতুর্দিকে রক্তাভ বিষ বৃষ্টি আর তুষারের ঝঞ্ঝা শৈত্যপ্রবাহ। বিপরীতগামী কালসমুদ্র। হঠাৎ স্তব্ধ, বদ্ধগতি নদীস্রোত। তরলাগ্নিতুল্য গরমে জলরাশির মধ্যে তৃষ্ণায় ছটফটিয়ে মরে যাবে জলজ প্রাণীকুল। ডানা মেলে উড়বার নীলাকাশ নেই বিহঙ্গের। মরু সাহারা আবৃত ঘন বরফাস্তরণে। শিলাবরণ সম্পূর্ণ সংহার করবে আমাজনের অরণ্যানী। সভ্যতা তার আধুনিক অগ্রগতির সকল স্বাক্ষর বিলুপ্ত করে এ জগৎ ফিরে যাবে তার সৃষ্টিকালের আদিম বরফযুগে। তেমনি প্রলয় পেরিয়েও আতঙ্কাহত কিছু মানুষ যদি জীবিত থাকে তখনও তাদের নির্ধারিত 'ফাউস্ট'-এ বর্ণিত ভয়ঙ্কর অনন্ত নরক।

মার্কেজের বক্তৃতা শেষ হবার পর সভাস্থ সকলে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মৃত্যু যখন আসবে আসবে। মৃত্যু নিয়ে আধুনিক মানুষ তেমন ভাবে না। কিন্তু বলার ধরনে, সাহিত্যগুণে সকলেই তারিফ করতে লাগলেন। শ্রোতাদের মনে একটা আবেশ এসে গেছে। বড় সাহিত্যিকের কলমে নিষ্ঠুর পারমাণবিক ভবিষ্যতও কত মোহময় হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানলেখক কার্ল সাগান বললেন। তবে মার্কেজের ওই অসাধারণ বক্তৃতার পাশে বড় নীরস। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও পরিসংখ্যানে বোঝাই। সাগান বললেন, 'আজকের পরমাণু অস্ত্র আরো ভয়ঙ্কর। এবং যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্রাগারে আজ এই মারণাস্ত্র প্রচুর সংখ্যায় মজুত। যে বোমা হিরোশিমা ধ্বংস করেছিল তার চাইতে এই বোমা শতশত গুণ শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মজুতখানায় বর্তমানে প্রায় ষাট হাজার পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। এক মেগাটন পরমাণু বোমার একটি মাত্র যদি নিক্ষিপ্ত হয় কোনো আধুনিক শহরে তাহলে সঙ্গে সেঙ্গেই লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিসাব করে দেখেছে যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে যে পরিমাণ সমরাস্ত্র রয়েছে তার মাত্র এক তৃতীয়াংশ ব্যবহৃত হলেই এক থেকে দু হাজার মিলিয়ন নরনারীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে। পরমাণু অস্ত্রের কথা ছেড়ে দিলেও কেবল অন্যান্য সাধারণ যুদ্ধাস্ত্রের জন্য বিশ্বে প্রতি বছর এক ট্রিলিয়ান ডলার অর্থ ব্যয় হয়। একদিকে এই কোটি কোটি টাকা ব্যয় অপরদিকে অশিক্ষা, অপুষ্টি, অনাহার, শিশুমৃত্যু দুর্নিবার চলছে- পৃথিবীর বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে শুধু দারিদ্র্যের কারণে। এর কোনো নৈতিক কৈফিয়ৎ আছে কোনো তরফের। মঙ্গলগ্রহ থেকে কল্পনার কোনো জীব যদি আমাদের পৃথিবীতে এসে দেখে যে আমরা নিজেদের ধ্বংস করার জন্য

নিজেরাই এত আয়োজন করছি সে আমাদের পাগল বলে সাব্যস্ত করবে। তোমরা মরো বলে অভিশাপ দিয়ে যাবে।'

জন কেনেথ গলব্রেথ এক সময় ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বিশাল লম্বা মানুষ। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। কানেও কিঞ্চিৎ কম শোনেন। অসম্ভব পণ্ডিত মানুষ। গলব্রেথ যখন অধ্যাপনা করতেন তখন মেকসিকোর বর্তমান প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাঁর ছাত্র। গ্রীসের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পাপানুদ্র ছিলেন তাঁর সহকর্মী শিক্ষক। গলব্রেথ বলতে উঠে প্রথমেই সেই কথা জানালেন। বললেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব এমন এক পরিবারের যার সঙ্গে আমার স্ত্রী এবং আমার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। আমার এখানে উপস্থিতি দেখে নিশ্চয়ই অবাক হবেন না কেউ।' ভূমিকার পর গলব্রেথ বললেন, 'আমার মহান ও প্রিয় বন্ধু, মাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির অধ্যাপক বিসোনার যে কথা বলেছেন এবং অধ্যাপক কার্ল সাগান উদাত্ত স্বরে যাকে সমর্থন করেছেন সেই পদক্ষেপ আপনারা নিন। আপনারা ও বলুন, যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে এবং সামরিক সংগঠনের কুক্ষিতে পরমাণু বিজ্ঞানের যে তথ্য গোপন রয়েছে তার বিবরণ খুলে ফেলতে হবে। আপনাদের উদ্যোগে একটি স্বাধীন বৈজ্ঞানিক তথ্যকেন্দ্র গঠিত হোক। সব তথ্য তাঁদের পরিজ্ঞাত হোক। সকলে জানুক নক্ষত্রযুদ্ধের তথ্যাবলী। বিশ্বশান্তির এটি হবে এক মহৎ প্রতিশ্রুতি।'

'একটাই কথা বলতেই হবে। আমরা সবাই যেন সমরশক্তির নিপুণে চলে যাচ্ছি। ছোট বড় সবদেশের সরকারই তুলনামূলক বৃহত্তর শক্তিধরদের দিকে তাকিয়ে আছে, নজর রাখছে অধিকতর সমৃদ্ধ সমর সংগঠনের দিকে।' গলব্রেথ কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। অল্প বিশ্রাম নিয়ে বললেন, 'এই আলোচনায় আমরা যেন নৈরাশ্যবাদী না হই। আমরা যেন এই প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকি যে, পৃথিবী আমাদেরই দিকে। আমরা যেন একটা কথা পরিষ্কার জেনে রাখি আমাদের বিরোধীরা যে পরমাণু মৃত্যুবাণ, যে পারমাণবিক অবসান আমাদের উপহার দিতে পারে, তা কখনো রাজনৈতিক আকর্ষণীয় বস্তু হতে পারে না। মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি কখনো ভোটারদের টানতে পারে না। আমরা যদি দুর্বলতা দেখাই, বিশ্বাস হারাই, অন্যরাও আমাদের দুর্বল সংশয়ী বলে ধরে নেবে। আমাদের বলিষ্ঠ হতে হবে বিশ্বাসী হতে হবে। প্রয়োজন হলে আমরা যেন কোনোমতেই রাজনৈতিক শত্রুকে আতঙ্কিত করে তুলতে পরাঙ্মুখ না হই।'

গলব্রেথের পর উঠে দাঁড়ালেন মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট মাদ্রিদ। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা ছিল চমকাতে লাগল, শাটার টেপার ঠাস ঠাস আওয়াজ, বিভলভারের গুলি ছোড়ার মতো। সে যেন আর থামতে চায় না। যেন প্রলয় হচ্ছে। আলোর ঝলকানি, গুলির শব্দ। যেন পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ঝাড়া পনের মিনিট। প্রেসিডেন্ট ফটো হলেন। এত প্রিয়! না ক্ষমতা! না চাপ! না দমন পীড়ন! কোনটা সত্যি।

ইকসতাপা পর্ব শেষ করে দু'দিন পরে শান্ত সমুদ্রনিবাস ছেড়ে আমরা দলে উড়ে গেলুম মেকসিকো সিটি। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বিমান থেকে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল মিলিটারি ব্যাণ্ড। তালে তালে গর্জে উঠতে লাগল এক সঙ্গে ছত্রিশটি কামান। প্রেসিডেন্ট মাদ্রিদ ভারতের প্রাইম মিনিস্টারকে বলতে চাইছেন রাজ সমারোহে এসো। রাজ সম্বর্ধনা দেখে মনে হয় মুকুটের ভার এই কারণেই সহ্য হয়।

মেক্সিকোয় আমরা নামলুম বেলা চারটে বেজে পয়তাল্লিশ মিনিটে। সুন্দর একটি বাসে চেপে আমরা চলেছি আমাদের হোটেলের দিকে। একজন স্প্যানিশ মহিলা আমাদের সঙ্গে চলেছেন দোভাষী ও গাইড হয়ে। আধো আধো মিষ্টি ইংরেজিতে তিনি আমাদের শহরটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। অতি প্রাচীন সভ্যতা। প্রাচীন এক শহর। প্রাচীনের ওপর আধুনিকতার প্রলেপ। ৩৫ হাজার বছর আগে এশিয়া থেকে একদল মঙ্গোলীয় মানুষ শিকারের পেছনে তাড়া করতে করতে কখন এক নতুন মহাদেশে পৌঁছে গেল। তারা অবশ্য কলম্বাসের মতো নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দে চিৎকার করে ওঠেনি। কারণ তাদের বোঝারই ক্ষমতা ছিল না কোথা থেকে কোথায় তারা চলে এসেছে শিকারের পেছনে তাড়া করে। এশিয়া থেকে আমেরিকার ব্যবধান মাত্র পঞ্চাশ মাইল।

ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামের প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক পণ্ডিত যখন এই কথা বললেন, আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। সে আবার কি! হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আমরা ভারত থেকে এলুম, সে কি শুধু ঘুরে আসার জন্যে! ঐতিহাসিক আমাকে নিয়ে গেলেন বিশাল একটি মানচিত্রের সামনে।

উত্তর গোলার্ধে, আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বেরিং সাগরের মাথার ওপর বেরিং স্ট্রেট। এপারে আমেরিকা ওপারে এশিয়া। দূরত্ব মাত্র ৫০ মাইল। 'আইস এজে' এই বেরিং স্ট্রেট জমে বরফ হয়েছিল। মাঙ্গোলিয়ার দিক থেকে কিছু মানুষ উত্তরে উঠতে উঠতে ওপরে এসে নিজেদের অগোচরেই বরফ জমাট বেরিং স্ট্রেট পেরিয়ে চলে এল আমেরিকায়।

কলম্বাস আমেরিকায় পা রেখে যাদের দেখেছিলেন, আমেরিকার সেই মানুষেরা কোথা থেকে এলেন, কেমন করে এলেন, এই জিজ্ঞাসার উত্তর, বেরিং স্ট্রেট। ফাদার জোস দা অ্যাকোস্টার-এর এই সমাধান পণ্ডিত সমাজ সহসা খারিজ করে দিতে পারেন নি। আলাস্কা অতিক্রম করে কেমন করে মঙ্গোলীয় মানুষরা দূর দক্ষিণে গিয়ে ইতিহাসের পরতে পরতে এক এক কালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্মৃতি রেখে গেছে, অধ্যাপক আপন মনে বলে যেতে লাগলেন। শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধার ভাব এল মনে। যে শহরে সাড়ে চারশো, পাঁচশো বছরের প্রাচীন গৃহ ও স্থাপত্য আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যে দেশে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, তরোয়াল, আহার, পাশাপাশি বিরাজ করে আসছে ৩৫ হাজার বছরের আবর্তকালে, সেই শহরকে ভালো করে চিনতে হবে জানতে হবে। আপাতত হারিয়ে যাই হোটেল কামিনো রিয়্যালের বিশাল গোলোক ধাঁধায়। বহুতল মানে কত তল? অতল বলেই মনে হচ্ছে। ষাট সত্তর তলা তো হবেই। মাটির তলাতেও ঢুকে আছে বেশ কিছু তল। লম্বায় চওড়ায় জনসংখ্যায় ছোটখাট একটি শহরের মতো। একটা তল থেকে আর একটা তলকে আলাদা করা উপায় নেই। সব তলই সমান। বিসেপসান, বিশাল আন্দোলিত ফোয়ারা, রেস্তোরাঁ, বার, ড্যান্সফ্লোর, ডিসকো। কোন্ ফ্লোরে আছি বোঝার উপায় নেই। কম্পিউটার যদি বলে না দেয়। এক একটা ফ্লোরকে আবার ভাগ করা হয়েছে লেভ্‌লে, ফার্স্ট লেভ্‌ল, সেকেন্ড লেভ্‌ল, থার্ড লেভ্‌ল। কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার এই প্ল্যান!

ঘণ্টা খানেক হয়ে গেল ভারি ব্যাগ হাতে, হিসেব করলে প্রায় তিন চার মাইল, হোটেলের অলিতেগলিতে ঘোরা গেল। বিকেল গড়িয়ে রাত হলো। বহু সুন্দরীর দর্শন হলো। গানের সুর শোনা হলো। বর্ম, শিরস্ত্রাণ, অস্ত্রশস্ত্র, রথ, মায়া সভ্যতার মূর্তি, সৌরচক্র দেখা হলো। প্রতিটি বাঁকে বিস্ময়। মনকে হাজার হাজার বছর পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দেবার আয়োজন। সব হলো, হলো না কেবল আমার কক্ষ প্রবেশ। একেবারেই হারিয়ে গেছি। যাকেই জিজ্ঞেস করি, স্প্যানিশ ভাষায় একটি মাত্র উত্তর— কাবিলডোস।

শেষে বিশাল সিঁড়ির মাঝের ধাপের একপাশে বসে পড়লুম। আমার মতো অনেকেই বসে আছেন। সুন্দরী মহিলা, সুন্দর পুরুষ। সিঁড়ি উঠে গেছে বিশাল এক নাটমন্দিরের মতো মিলনকেন্দ্রে। সেখানে বহু ধরনের মানুষের কলগুঞ্জন। যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা মনে হয় আমার মতোই হারিয়ে গেছেন।

এই বিশাল শহরে, সুপ্রাচীন সভ্যতায় নিজেকে খুঁজে পাওয়া, সে আর এক দীর্ঘ কাহিনী।

৪৭

বিশাল সোপানশ্রেণীর একপাশে বসে আছি ক্লান্তশ্রান্ত। আমার পাশে এসে বসেছেন অনিন্দ্যসুন্দরী এক মেকসিক্যান ভদ্রমহিলা। বেশ একটু অস্বস্তি হচ্ছে। প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছেন তিনি। সামান্য নেশাগ্রস্ত। মেকসিক্যান মহিলাদের গায়ের রঙ ফ্যাকফ্যাকে সাদা নয়। স্প্যানিশ রক্ত বইছে ধমনীতে। দুধে আলতা রঙের মহিলার দিকে আড়ে আড়ে না তাকিয়েও পারছি না। সোপানশ্রেণীর উর্ধ্বে বাঁপাশে বিশাল নাচঘরে ডিস্কো বাজনা শুরু হয়ে গেছে। নাচও নিশ্চয় শুরু হয়েছে। মহিলা কি খেয়েছেন কে জানে, ক্রমশই তাঁর অপ্ললতা বাড়ছে। চাঁপার কলির মতো আঙুল আমার গালে ছুঁইয়ে মাঝে মাঝেই বলেছেন, হাই। আমার বাঁপাশে দেয়াল, ডানপাশে মহিলা। সরার উপায় নেই। একটি মাত্র উপায় আছে, উঠে চলে যাওয়া। আমার দুর্বলতাই আমাকে বসিয়ে রেখেছে। বিদেশিনী যাদু জানে।

এক সময় উঠতেই হলো, তা না হলে ভদ্রমহিলা আমার ওপর শুয়ে পড়তেন। শুয়ে পড়লে মন্দ লাগত না, কিন্তু ভয়। মেকসিক্যান ছেলেদের যা চেহারা! মহিলার কোনও সঙ্গী এসে একটা ফাইভ ফিফটি ফাইভ ঝেড়ে দিলে সারা জীবন বার্লি খেয়ে কাটাতে হবে। ওদিকে ট্রাম্বোন, স্যাকসোফোন, সব একসঙ্গে বাজতে শুরু করেছে। মেকসিক্যান রাত ক্রমশই মোহময়ী হয়ে উঠছে। হঠাৎ মনে পড়ল, আমার লাগেজ? আমার মালপত্রের কি হলো! সে সব তো আমার পরে আলাদাভাবে আসার কথা। এলে, কোথায় এসে পড়ল! ভদ্রমহিলার পাশ থেকে উঠে পড়লুম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়লেন। একটা হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেন। আর একটু হলেই উলটে পড়ে যেতুম।

আবার আমার খোঁজা শুরু হলো। আমার ঘর। সামনেই লিফট। মেকসিকোর সব কিছুই বিশাল বিশাল। লিফ্‌টও বিশাল। দরজা খুলতেই উঠে পড়লুম। অটোমেটিক লিফ্‌ট। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বোতাম টিপে দিলুম। সতের তলায় লিফ্‌ট এসে দাঁড়াল। নেমে দু এক কদম হেঁটে যেতেই আবার ধাঁধায় পড়ে গেলুম। যেখান থেকে এলুম, সেই একই রকম সব। কোনও পার্থক্য নেই। কেন যে এই বোকা বানাবার চেষ্টা! যাক ঈশ্বর সদয় হলেন। হঠাৎ আমাদেরই দলের কেরালার 'মনোরমা' পত্রিকার বেবি জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁরও প্রায় এক অবস্থা। ঘর হারিয়ে ফেলেছেন।

লন্ডন থেকে মেকসিকো দীর্ঘপথ বিমান-পরিক্রমায় কুমকুম ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘর অন্ধকার করে বেচারা একলা শুয়ে আছে। অসম্ভব মাথায় যন্ত্রণা। উদরে আগ্নেয়গিরি। কেউ তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন না। সকলেই সুদূর ভারত থেকে মেকসিকো উড়ে আসার আনন্দে বিভোর। এ অঞ্চলের জীবন অন্য রকম। মানুষের চালচলন, চেহারা ভিন্ন। দেনার দায়ে দেশের মাথা বিকিয়ে গেলেও সর্বত্র আনন্দের জোয়ার বইছে। এত সুন্দর সুন্দরী আর কোন্ দেশে আছে! এদেশের মেয়েরা বড় মিশুক, অতিথিপরায়ণা, সেবা পরায়ণা, সহজেই বন্ধু হয়ে যায়। আপনজন হয়ে ওঠে। মুখে বিরক্তির ছাপ নেই। সব সময়েই হাসছে। ইংরেজ মেয়েদের মতো অহংকারী নয়। বরং মেকসিক্যান ছেলেরা একটু লাজুক প্রকৃতির। সামান্য অলস-প্রকৃতির বলেও মনে হতে পারে। সুস্থ নারী-প্রগতি এখানে তুঙ্গে উঠেছে।

কুমকুমের অন্ধকার ঘরে ঢোকার সাহস হচ্ছিল না, যদি কিছু মনে করে। অসুস্থ একা পড়ে আছে। যা থাকে নশিবে! কপালে হাত রাখলুম। জ্বর এসে গেছে। ইকসভাফাণ শুনে এসেছি, মেকসিকোর অসুখ মেকসিকোতেই সারিয়ে যেতে হবে, এখানকার রোগ বীজাণুর গোত্র আলাদা। 'কুমকুম! ডাক্তার ডাকবো?' কুমকুম ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'না দাদা, আশি ডলারের ধাক্কা।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ দাদা, রিসেপসানে ফোন করেছিলুম, ওরা তাই বললে। তুমি বরং আমার স্যুটকেস খুলে দ্যাখো, লন্ডন থেকে স্টম্যাকপাউডার কিনেছিলুম, তাই একটু জলে গুলে দাও। ঠিক হয়ে যাবে।'

কুমকুম ওষুধ পত্তর খেয়ে শুয়ে পড়ল। মেকসিকোয় আমাদের তেমন কাজের চাপ নেই। প্রধানমন্ত্রী রাজীব এখানে এসেছেন মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দা মাদ্রিদের নিমন্ত্রণে মাননীয় অতিথি হিসেবে।

মেকসিকোর সকালটি ভারি মিষ্টি। নীলাভ আকাশ। নরম রোদ। বেড়াতে বেড়াতে চলে গেলুম প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের দিকে। অলিম্পিকের সময় শহরটি বেশ সেজে উঠেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা উঁচু বলে অনেকেই ভয় পেয়েছিলেন, হয়তো শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হবে খেলোয়াড়দের। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলের খেলোয়াড়দের অবশ্য কোনও কষ্টই হয়নি। বরং এই মনোরম শহরের আকাশ-বাতাস রোদ, পরিবেশ, পরশুরামের ভাষায় যেন চাঙ্গায়নী সুধা।

হোটেল আর প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের মাঝের ব্যবধান নেহাত কম নয়। মস্কোর রেড স্কোয়্যারের মতো বিশাল একটি চত্বর। পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। আমাদের কলকাতার সি ই এস সি, সি এম ডি এ, কি কর্পোরেশানের কাছে অবশ্যই খুব লোভনীয় একটি প্রাঙ্গণ। কোদাল, গাঁইতি নিয়ে হেরে রেরে করে লাফিয়ে পড়, তারপর খোবলা-খুবলি, কোদলা-কুদলি। তারপর হকার। তারপর সংগীত, এমন দেশটি কোথাও তুমি পাবে না কো খুঁজি। সকল দেশের সেরা সে যে। এইসব দেখলে নিজের দেশের কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়।

স্কোয়্যারের দূর প্রান্তে বিশাল প্রাসাদ। সিটি হল। চার্চ। বিশাল রাজপথ এপাশ থেকে ওপাশে চলে

গেছে। এপাশের রাস্তার ধারে ধারে সার সার সুসজ্জিত দোকান। গহনার দোকান। একের পর এক। বউবাজারের দৃশ্য নয়। বিদেশী আয়োজন। অসাধারণ সব কারুকার্য। ইলেকট্রনিকসের দোকান। কিছু-দূর এগোতেই ফলের রসের দোকান। বিশাল কাঁচের জারে আঙুর, বেদানা, লেবু। ছাড়ান, পরিষ্কার। আধুনিক যন্ত্রে নিষ্পেশিত হয়ে, সুদৃশ্য কাগজের গেলাসে শীতল স্পর্শ দিয়ে চলছে হাতে হাতে। তোফা তোফা। সেই রকম এক গেলাস আঙুরের রস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনে বিশাল 'মেকসিক্যান স্কোয়্যার', মধ্যযুগের ভাস্কর্যমন্ডিত বিশাল প্রাসাদ। আমেরিকান গাড়ি ছুটছে কাতারে কাতারে। মেকসিক্যান ট্র্যাফিক পুলিশের বাঁশি বাজছে অসংখ্য পাখির শিসের মতো। আঙুরের ঠান্ডা রসে চুমুক দিচ্ছি অন্যমনস্ক' হঠাৎ হাতে কার আঙুলের স্পর্শ। চমকে উঠলুম। এক বৃদ্ধা। সাদা চুল। ভাঙা মুখ। নীল অসহায় চোখ। করুণ কণ্ঠ, উন্ পেসস্। 'আমাকে কিছু দাও বিদেশী।' কালকের রাত, আজকের সকাল। হোটেলের চকোলেটওষ্ঠ মদীর সুন্দরী, সোনাঝরা সকলেব শোণকেশ বৃদ্ধা। দুই জেনারেশান। মাঝে এক ব্যবধান। এই ব্যবধানই হলো ব্যর্থ সাফল্যেব ইতিহাস। উন্ পেসস্। একটি পয়সা দাও, অ্যাটমবোমা নয়।

৪৮

পৃথিবীব এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। বিমান থেকে নেমে মনে মনে মানচিত্রটা একবার অবলোকনের চেষ্টা কবলুম। কোথায় ভারত কোথায় আমি! অবাক হয়ে গেলুম একই অক্ষাংশে দাঁড়িয়ে আছি। কলকাতা থেকে বিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ ধবে পশ্চিমে সরেছি হাজার হাজাব মাইল। আটলান্টিক পেরিয়ে যে জায়গায় এসে নেমেছি, সেই জায়গাটির নাম ইকসতাফা। মেকসিকোব সমুদ্র উপকূলবর্তী ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রাম আর নেই। ব্যস্ত একটি ভ্রমণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আকাপুলকো থেকে ভ্রমণার্থীদের চাপ সববাব জন্যে ইকসতাফাকে সাজানো হয়েছে। প্রকৃতি সাজিয়েই রেখেছিলেন। সমুদ্র দিয়ে, দুব দূরব্যাপী সোনালি সমুদ্রসৈকত দিয়ে। অকৃপণ রৌদ্রালোক দিয়ে। আর ছোট্ট একটি গ্রামীণ সংস্কৃতি দিয়ে। মেকসিকোর জাতীয় ব্যাঙ্কেব কয়েকজন তরুণ অর্থনীতিবিদ একদিন বসে বসে পরিকল্পনা করলেন, এই উপখণ্ডের অর্থনীতির অবস্থা তো কাহিল। আয়ের তো একটিই মাত্র রাস্তা ছিল, পেট্রল। বিশ্বের বাজারে হঠাৎ দাম পড়ে যাওয়ায়, অর্থনীতির মুখের ক্ষণিক হাসি আবার ম্লান হয়ে এসেছে। মেকসিকোর ঋণের বোঝা অপরিমেয়। সব চেয়ে ঋণগ্রস্ত একটি দেশ। নেগেটিভ অর্থনীতি। আমি যা খরচ করছি তা আমার উপার্জন নয়, আমার ঋণ। হাভার্ডেব সেই তরুণ কয়েকজন, তখন একটিই রাস্তা দেখলেন—পর্যটন-শিল্পের উন্নতি ছাড়া দেশের দুরবস্থার সামাল দেওয়া যাবে না। প্রকৃতির অকৃপণ দানকে কাজে লাগাতে হবে। এত রোদ, এত সমুদ্রের ঢেউ, এত সোনালি বালি, উন্মুক্ত দিগন্ত, উদার নীল আকাশ আর অন্তঃসলিলা লোকসংস্কৃতিকে যদি আধুনিক পর্যটন পরিকল্পনার মোড়কে মুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে ছুটে আসবেন দেশ বিদেশের প্রমোদ-ভ্রমণকারীবা। ডলার উড়তে থাকবে। পর্যটন-শিল্পের উন্নতিই একমাত্র বাঁচার পথ।

ইকসতাফার ছোট্ট অথচ সুন্দর বিমানবন্দর সেই পরিকল্পনারই অংশ। পৃথিবীর যে-প্রান্ত থেকে দীর্ঘপথ উড়ে এলুম, তার মাঝে ক'বার যে রাত হতে হতে দিন হল বিকেল চলে এল সকালে। সবই ঘটে চলেছে আকাশে উড্ডীয়মান অবস্থায়। কখন পায়ের তলা দিয়ে ভেসে চলে গেছে শীতের দেশ। কখনও পেরিয়ে এসেছি মরুপ্রান্তর। কখনও পেয়েছি নীল নির্মেঘ আকাশ, কখনও ঘন কালো পিঙ্গল মেঘমালা। সবই ঘটে চলেছে আমার ডানপাশে বিমানের বর্তুলাকার গবাক্ষপথে। একসঙ্গে টানা তেইশ ঘন্টা আকাশে অসহায়ভাবে ভেসে থাকার অভিজ্ঞতা শেষ হল এই একটু আগে। ইকসতাফার রানওয়েতে দাঁড়িয়ে আছি। সামনেই টার্মিনাল বিল্ডিং। মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখে ঘোর লেগে গেছে। আকাশে ভাসিয়ে রাখার অনেক আধুনিক প্রলোভন আছে। যাতে মানুষ ভুলে থাকতে পারে, অসীম শূন্যে ভেসে থাকার অসহায়তা। তবুও মাঝে মাঝেই যখন মনে পড়ছিল,

ছোট্ট একটা কলের পাখি, পেটে শ'দুই মানুষ, আকাশের উচ্চতায় টাল খেতে খেতে ভেসে চলেছে, নিচে তাকালে কিছুই নজরে আসে না মেঘ ছাড়া তখন ভয় তো করেই। ভূমি থেকে আমরা মেঘের তলার দিকটাই দেখি, মেঘের ওপর দিকের গঠন যেন এক বিস্ময়। সে এক ভিন্ন জগৎ। আপন খেয়ালে তৈরি হয়ে আছে, গড়, ইমারত, পাহাড়, পর্বত। এরই নাম হয়তো পরলোক।

ঘোর কেটে যেতে খুব একটা সময় লাগল না। বেলা শেষের রোদ পড়েছে গাছের মাথায়। ফুরফুরে বাতাস। অচেনা জায়গায় সবই অচেনা মনে হয়। মনে হচ্ছে এই গাছ, এই বাতাস, এমন কি আমার সামনে দিয়ে বিমান বন্দরের যে গাড়িটা চলেছে, সেটিতেও ভিন্ন কোনও গ্রহের মানুষ। আমি একা নই, আমার সঙ্গে আছেন এক আমেরিকান ভদ্রমহিলা। মহিলা বলি কেন। মেয়ে বলাই ভালো। সবে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। মায়া সভ্যতার উপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছে, নাম অ্যান। সঙ্গে অ্যান থাকায় ভালই হয়েছে। বিদেশের অনেক কায়দাকানুনই আমি জানি না। অ্যান জানে। আমেরিকান মেয়েরা খুব সরল ও নিরহঙ্কারী হয়। ইংরেজ বা ফরাসীদের মতো আত্মসচেতন নয়। আমি অ্যানকে আগেই বলে রেখেছিলুম—'দ্যাখো, আমি গ্রামের ছেলে। জাতে বাঙালি। সরষের তেল মেখে গঙ্গায় চান করি। আমার খানা হল ভাত, ডাল, পোস্তর বাটিতবকারি, তাতে থাকে তিনটে কাঁচালঙ্কা। আর এই যে দেখছ প্যান্ট, কোট, আর টাই, এ আমার পোশাক নয়। আমার পোশাক হল ধর্মতলার ট্রাউজার, ম্যাডান স্ট্রিটের বুশ শার্ট, চীনে বাজারের জুতো। তুমি আমাকে সামলাও।'

ক্যালিফোর্নিয়ার মেয়ে অ্যান বলেছিল, 'আমাকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে না, আমিও এক গাঁইয়া। তুমি ইন্ডিয়ার গাঁইয়া আমি আমেরিকার গাঁইয়া। আমার সাজপোশাক দেখে বুঝতে না পারার মতো গাঁইয়া তুমি নও। আমি কি এলিজাবেথ টেলার? না মেরিলিন মনরো? তোমাদের দেশ হলে আমাকে বলত চাষীর মেয়ে।'

পরে অ্যানের কান্ডকারখানায় আসছি। আপাতত যা ঘটছে তাই বলি—আমাকে বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অ্যান বললে, 'শোন, এ জায়গাটা খুব একটা কাব্যিক নয়। আর বিমান থেকে অবতরণের পর মানুষের প্রথম কর্তব্য হল, লাউঞ্জে যাওয়া, পাশপোর্ট দেখানো, মালপত্র ডেলিভারি নিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে যাওয়া। সেই কাজটা করলে কেমন হয়।'

'খুব ভাল হয়। তবে কি জানো, তোমার দেশ তো দশ হাত দূরে, আমি হলুম গিয়ে পৃথিবীর অপর পিঠের মানুষ। তাই একটু সমাধিস্থ হয়ে পড়েছি। মনের চোখে মানচিত্র দেখছি। আমি আসলে কলকাতাতেই আছি। কলকাতার অপর পিঠে।'

অ্যানের মধ্যে বেশ একটু দাদাগিরির ভাব আছে। দেখতে খুবই সুন্দরী, কিন্তু চালচলনে মেয়েলিভাব একেবারেই নেই। সাজপোশাকে আমার দাদা। কোনওরকমে একটা ফ্রক পরেছে। হাঁটুর তলা অব্দি নেমে কিছু দূরে গিয়ে থেমে পড়েছে। আর একটু গেলে মন্দ হত না। পায়ে একটা সেনরিটা শু। কস্মিনকালে ঝাড়াঝুড়ির বালাই নেই। হাতে একটা ঘড়ি। ব্যাস, এই হল তার সাজপোশাক।

অ্যান হাত ধরে এক টান মেরে বললে, 'লেটস গো। নষ্ট করার মতো সময় নেই আমাদের।' ছোট্ট এয়ারপোর্ট। ট্যুরিস্ট প্লেনের জন্যে তৈরি। আমেরিকানদের অঢেল পয়সা। গাড়ি চাপার মতো প্লেনে চাপে। অনবরতই প্লেন উঠছে নামছে। ছোট্ট লাউঞ্জ। মেঝেটা কালো পাথরের। ঝকঝকে পালিশ করা। এত চকচকে যে হাসি পায়। প্রত্যেক মানুষের পায়ের তলায় পড়ে আছে তার প্রতিবিম্ব। ডানপাশে একটা কাউন্টার। কাউন্টারে ফুটফুটে একটি মেয়ে। সে প্রায় নাচছে। যাত্রীর তুলনায় কর্মচারীর সংখ্যা কম। বেচারা সামাল দিতে পারছে না। একবার এদিকে যাচ্ছে একবার ওদিকে।

অ্যান আমাকে সিঁড়ির পাশে দাঁড় করিয়ে বললে—'চুপ করে এখানে দাঁড়াও। পাশপোর্ট আর ভিসাটা দাও। প্লেনে যে চকোলেটটা দিয়েছিল এবার সেটা বের করে খাও। আমি ছাড়পত্র নিয়ে আসি।'

অ্যান এগিয়ে গেল কাউন্টারের মেয়েটির দিকে। মেয়েটি স্প্যানিশ উচ্চারণে ইংরেজি বলছে। অ্যান তাকে প্রায় দাবড়াচ্ছে। মেয়েটি একবার এদিকে ঝুঁকছে একবার ওদিকে ঝুঁকছে। একটা ছেলে আর মেয়ে সিঁড়ির ওপাশে অকারণে ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে। বিদেশের এই ঘাটে-আঘাটে আবেগ উচ্ছ্বাসের দৃশ্যে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। ছ'ফুট চেহারার এক মেকসিকান দুর্বোধ্য ভাষায় আমাকে কিছু জিজ্ঞেস

করলেন। আমি বললুম, ইয়েস ইয়েস। ইয়েস, নো, ভেরি ওয়েল নিয়ে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করা যায়। লোকটি হেসে চলে গেলেন। আমি অবাক। কী তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যার উত্তর ইয়েস?

এখানকার নিয়ম আবার একটু বিচিত্র ধরনের। অ্যান কাউন্টার থেকে ফিরে এসে বললে, 'দোতলায় চলো। ছবি তোলা হবে।'

'আবার ছবি?'

দোতলায় ওঠার সিঁড়িটি বেশ সৌখিন! যেন বাতাসে ভেসে আছে। মাঝারি মাপের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। তিন ঠ্যাঙের ওপর একটা ক্যামেরা। ক্যামেরার পেছনে চৌকো চেহারার এক ভদ্রলোক। তাঁর মুখের একটা স্মৃতিই আমার মনে লেগে আছে। ঠোঁটের ওপর পুরুষ্টু কাঠবেড়ালির ন্যাজের মতো দর্শনীয় একজোড়া গোঁফ। মেকসিক্যানরা গোঁফ রাখতে ভীষণ ভালবাসে। মেয়েরা মেকসিক্যান পুরুষ দেখলে বলবেন, 'ভেরি ম্যানলি'।

এক বৃদ্ধার ছবি তোলা হচ্ছে। বৃদ্ধাকে দেখে আমার মনে পড়ল আগাথা ক্রিস্টির হারকিউল পয়েরোর নারী সংস্করণের কথা। মিসেস মার্পল নয় তো! ক্যামেরা থেকে ছবি আর প্রিন্ট নিমেষে বেরিয়ে আসছে। কী কায়দা কে জানে। অ্যান মনে হয় ভদ্রলোককে বলেছিল একটু হাত চালাবার কথা। ফটোগ্রাফার বললেন, 'ওয়েত ওযেত।'

আমার তেমন কোনও তাড়া ছিল না। বেশ ভালই লাগছিল। নানা দেশের নানা লোক। একসময় আমার ডাক পড়ল, ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই আমাদের দেশের নিয়ম অনুসারে একটু মুচকি হাসতে ইচ্ছে করে। আমিও বোধহয় অজ্ঞাতসারে হেসে ফেলেছিলুম। ফটোগ্রাফার বললেন, 'ডোন্ত লাফ। দিস ইজ নত ইওর ওয়েদিং ফোতোগ্রাফ।'

তিন মিনিটের মধ্যে ডাকটিকিটের মাপে লালরঙের একটি ছবি বেরিয়ে এল। চেহারা দেখে মনে হল গেয়ে উঠি—হাসিমুখে ফাঁসি বরণ করেছে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছবিটা কার্ডে ল্যামিনেট করে দিলেন আর একজন। নাম, দেশ, জাতি, বয়েস সব ছাপা হয়ে গেল। কম্পিউটারের কাণ্ডই আলাদা। অ্যান বললে, 'ভেতরের পকেটে রাখ, এইটা তোমার রক্ষাকবচ। হারিয়ে গেলে সহজেই তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।'

অ্যানের বয়েস কত হবে! কুড়ির বেশি হবে না। অথচ যেভাবে শাসন-তর্জন করছে, তাতে মনে হচ্ছে দিদি তার ছোট ভাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। আমার কান মলে দিচ্ছে না, এই আমার ভাগ্য। মলে দিলেও কিছু মনে করব না, বরং খুশিই হব।

আবার আমরা একতলায় নেমে এলুম। এয়ারপোর্ট প্রায় ফাঁকা। একটা প্লেন উড়ে চলে গেল। অ্যান বললে, 'কাস্টমস কাউন্টারে গিয়ে, বললে, 'নো তেঙ্গো নাদা কে দেক্লারার।'

'মানে?'

'মানে, অ্যাই হ্যাভ নাথিং টু ডিক্লেয়ার।'

'ইংরেজিতে বললেই তো হয়। পাণ্ডিত্য ফলিয়ে লাভ কি?'

'যে দেশে এসেছ সেই দেশের ভাষা একটু শেখ।'

সব ফাঁড়া কাটিয়ে আমরা যখন সেই ছোট্ট ছবির মতো এয়ারপোর্টের বাইরে এলুম তখন সূর্য আরও একটু ঢলে পড়েছে। মেকসিকোকে কাব্য করে বলা হয়, 'সোয়েট অফ দি সান, টিয়ারস অফ দি মুন।' রাস্তা কিছু আহামরি নয়। পিচের রাস্তা সোজা প্যাঁচ মেরে চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। অ্যান একটা ট্যাকসি ধরে ফেলল। চালকের চেহারা একেবারে রাজপুত্রের মতো। ভাঙাভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। পেছনের আসনে বসে পড়লুম। বসেই বুঝতে পারলুম, দেশের গাড়ির সঙ্গে তফাৎটা কোথায়। এ-গাড়ির শরীর, এ-গাড়ির গদি সবই ডলার দিয়ে তৈরি। শরীর যেন ডুবে গেল। মনে হতে লাগল, আমি এক আরব তেলকুবের। আমার পাশে সুন্দরী বিদেশিনী। যদিও তার গলায় হীরের নেকলেস নেই। গায়ে নেই বিলিতি খুশবু। অ্যানের সঙ্গে আমার পরিচয় লন্ডনে। মেয়েটা বাঙালি মেয়ের মতো সহজ সরল বলেই আলাপটা জমেছে। মনে হচ্ছে থাকবেও অনেকদিন, কারণ মেয়েটার ভারতীয় যোগের প্রতি, মিসটিসিজমের প্রতি ভীষণ আগ্রহ। তন্ত্রও পড়েছে। আমি ওর শিষ্য হব, না ও আমার শিষ্যা হবে, এখনও বুঝতে পারছি না। সহজ প্রাণায়ামটা শিখিয়েছি। এইবার

শেখাতে হবে রাজযোগ প্রাণায়াম কুম্ভক সহ।

অ্যান বেশ গুছিয়ে বসেছে। গাড়ি রাস্তা কামড়ে হু হু করে ছুটছে। ইকসতাফায় পৌঁছে অ্যানকে একটা হার আর একজোড়া দুল কিনে দোব। ওখানে শুনেছি পাথর আর রুপোর অলঙ্কার বিখ্যাত। মেয়েরা একেবারে নিরাভরণ থাকলে ভারতীয় চোখে ভাল লাগে না। অ্যানের মা নেই। বাবা আছেন। মেয়ের দিকে তাঁর নজর নেই। তিনি ফসলটাই বোঝেন। ভালবাসেন ট্রাকটার। হিসেব করেন ডলার।

অ্যান বললে, 'মেকসিকোর আর একটা নাম কী বল তো?'

'ধুর, আমি অত সব জানি না কি! আমি জানি এখানে অলিম্পিক হয়েছিল, ওয়ার্ল্ডকাপ ফুটবল হয়েছিল। বুলফাইট হয়। মানুষ বিশাল বিশাল টুপি পরে ঘোরে, যার নাম সমব্রেরো। আর শুনেছি মায়া সভ্যতার কথা।'

'ভালই শুনেছ। আর একটা শুনে রাখ, মেকসিকোকে বলা হয় 'ইন্ডাস্ট্রি উইদাউট চিমনিজ'। কেমন নামটা?'

'টেরিফিক। চিমনি নেই, ধোঁয়া নেই, তবু শিল্প। এইরকম একটা নাম হবার কারণ?'

'ট্যুরিস্ট ইন্ডাস্ট্রিতে চিমনি লাগে না। ১৯৮৫ সালের হিসেবে, সারা মেকসিকোতে বড় হোটেলঘরের সংখ্যা কত জান? দু লক্ষ ষাট হাজার। প্যাসিফিকের ধারে ধারে কতগুলো ট্যুরিস্ট স্পষ্ট জান? শোনো তাহলে, আকাপুলকো....।'

'আকাপুলকোর নাম থ্রিলারে পেয়েছি। ওখানে জেমস বণ্ডকে প্রায়ই যেতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত বদলোক ওখানে অপকর্ম করতে যায়।'

'চুপ! একদম চুপ। আমি যখন তোমাকে ইতিহাস কি ভূগোলের জ্ঞান দোব—তখন নিজের জ্ঞানের ঝুলিটা বন্ধ রাখবে। শোনো, আকাপুলকো, ইকসতাফা, জিহুয়াতানেজো, পুয়ের্তো, ভাল্লারতা, কেরেস, মানজানিল্লো, মাজাতলান, গুয়ামাস, সানজোস দেলকাবো, কাবো সানলুকাস লপোজ। প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে মুক্তোর মালার মতো পড়ে আছে সমুদ্রনিবাস। বিছিয়ে আছে রুপোর মতো নরম বালি। প্রকৃতির নিজের হাতে বিছানো বিছানা। আর সারাটা বছরই রোদ। রোদ ভাসা দিন, চাঁদের আলোর রূপালি রাত। আর মজা কি জান, এই অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরের জল উষ্ণ। তুমি যত হাবুডুবু খাবে ততই ফুরফুরে তাজা হয়ে উঠবে। অবশ্য দম আটকে মরে যদি না যাও।'

'জল উষ্ণ কেন? কারণটা কী? সমুদ্র অগভীর? না তলায় আগ্নেয়গিরি আছে?'

'হতে পারে। মেকসিকোর বেশির ভাগটাই তো আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরি। এপাশে সমুদ্র ওপাশে সমুদ্র। সৃষ্টির আদিকাল থেকে লাভা জমে জমে জেগে উঠেছিল ভূখণ্ড। সারা মেকসিকোতে ছড়িয়ে আছে অজস্র প্রস্রবণ। প্রচুর উষ্ণ প্রস্রবণও আছে। একসময়কার জাগ্রত আগ্নেয়গিরি যখন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন হাজার হাজার বছরের বৃষ্টিধারা পাশ থেকে ধুয়ে নিয়ে গেল লাভা। সেই লাভা নিচে নেমে এল খনিজ ঐশ্বর্য নিয়ে। তৈরি হল অজস্র গুহা। সে-সব গুহার অনবদ্য সৌন্দর্য দেখার মতো। অপূর্ব তার ভেতরের প্রাকৃতিক কারুকার্য। যুগ যুগ ধরে প্রকৃতি নিভৃতে বসে বসে আপন মনে এইসব গুহার কারুকার্য তৈরি করেছে। মেকসিকোর ভৌতিক সৌন্দর্যের কোনও তুলনা হয় না। সছিদ্র ভূত্বক বেয়ে জল নেমে যায় গভীর স্তরে। সেখান ধাতব ও খনিজ স্তরে মিলেমিশে, উত্তাপে বাষ্প হয়ে সবেগে উঠে আসে ভূস্তরে। এইরকম উত্তপ্ত মিনারেল স্প্রিং যে কত আছে।'

গাড়ি তেমন বেগে চলছে না। অ্যান সেই ফুটফুটে সুন্দর তরুণ চালককে বলে দিয়েছে, 'আস্তে চালাও আমাদের তেমন কোনও তাড়া নেই। আমরা চারপাশ দেখতে দেখতে যাব।' ছেলেটি কথা শুনেছে আর আমাদের অনর্গল কথা শুনিয়ে চলেছে। কিছু বুঝছি, কিছু বুঝছি না। সামান্য রাজনৈতিক উষ্মাও প্রকাশ পাচ্ছে। মিগুয়েল দ্য লা মাদ্রিদ হলেন মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট। তিনি কি তবে সকলকে খুশি করতে পারছেন না। যাক গে; আমরা দেশ দেখতে এসেছি। ইতিহাস, ভূগোল, শিখতে এসেছি। আমাদের রাজনীতির খবরের কি প্রয়োজন।

রাস্তার দু'পাশে সাদা রঙের ছোট ছোট একতলা বাড়ি। মেকসিকোয় স্প্যানিশ কালচারের প্রভাবই বেশি। ছেলেমেয়েদের দেখতে স্প্যানিশ বলেই মনে হয়। মেয়েরা খুবই সুন্দরী। জায়গাটা শহর নয়। সমুদ্রতীরবর্তী ছোট্ট একটি ধীবর-গ্রামকে টাকা পয়সা ঢেলে বড়লোকদের সমুদ্রনিবাসে পরিণত করা

হয়েছে। আমাদের দীঘাব মতো। আকাপুলকোব ভিড যাঁরা পছন্দ কবেন না, তাঁরা এই জিহুতানেজার পাশে ইকসতাফায এসে হাঁফ ছেডে বলতে পাববেন—আঃ ইকসতাফা। প্রচার পুস্তিকার মলাটে সেই কথাই লেখা আছে। পথেব দু'পাশে রুক্ষ, কর্কশ ভূখণ্ড দোলা খেতে খেতে, ভাঁজে ভাঁজে ভাঙতে ভাঙতে ছডিয়ে গেছে নিরুদ্দেশে। মন কেমন কবানো সন্ধ্যা নেমে এল। শাঁখটাই কেবল বাজল না।

৪৯

কখন থেকে চেষ্টা কবছি মনকে বোঝাবাব, মন তুমি পৃথিবীব বাইবে চলে আসনি। এটা পৃথিবীবই একটা দেশ। এখানকার মানুযজন তোমারই স্বজাতি। এখানকাব ভূমি তোমাব দেশেব মতোই। আগ্নেয মৃত্তিকা হওযাব ফলে হযতো কিছু কঠিন। হয়তো জলধাবণ ক্ষমতা কম। তাতে তোমাব কী! তুমি তো চাষবাস কবতে আসনি। তবু আমার মন মানছে না, কেমন যেন ঘোবে আছে। যা দেখছে তাইতেই অবাক। পথেব দু পাশের গাছপালা মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ অচেনা এমন কাণ্ড, এমন শাখা প্রশাখা, পত্রগুচ্ছ আগে দেখিনি। একটা গাছ দেখিযে অ্যানকে বললুম, 'দেখ দেখ, এমন গাছ আগে তুমি কখনো দেখেছ?'

অ্যান চ্যাটাস কবে আমাব পিঠে একটা চাঁটা মেবে বললে, 'ইযাবকি হচ্ছে! পেঁপেগাছ আমি দেখিনি?'

'ওটা পেঁপেগাছ?'

'পেঁপেগাছ তোমাব দেশে নেই?'

'আবে তাই তো, পেঁপেগাছই তো।'

'তোমাব মাথা বিগডে গেছে। স্নাযু কাজ কবছে না।'

আব কিছু বলাব সাহস হল না। দেখতে লাগলুম আপন মনে, ছোট ছোট দোকান, ছোট ছোট বাডি। বেঁটে খাটো মানুষ। সাদা ফ্রক পবা মেযে। কারুব কোনো তাডা নেই যেন সব কাজ শেষ করে বাডিব দোব গোডায দাঁডিযে আছে। কারুব কারুব চেহাবায বেশ বৈচিত্র্য আছে। নাকেব গডনে মুখেব গোল ভাবে গাযে বঙে। না জিজ্ঞেস কবে পাবলুম না, 'অ্যান, এবা কি ট্রাইব্যাল?'

'ধবেছ ঠিক, এবা হল মেকসিক্যান ইণ্ডিযান।'

'মাযা সভ্যতাব বংশধব?'

'এখন আব ইতিহাস ধবে নাই বা টানাটানি কবলে। অনেকটা পেছতে হবে।'

'কতটা?'

'তা ধবো একুশ হাজাব বছব।'

'মনে কবো পেছলুম।'

'চলে এলে মেকসিকো শহবেব কাছে তলাপাকোযা বলে একটা জাযগায। সেখানে আবিষ্কৃত হযেছে মানুষেব বসবাসেব স্মৃতিচিহ্ন। তাবা ছিল শিকাবী। তাবা অবসিডিযানেব তৈবি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার কবত। আগুন জ্বালাতে শিখেছিল।'

'অবসিডিযান বস্তুটা কী?'

'আমি আশা কবেছিলুম এই প্রশ্নটাই তোমাব দিক থেকে আসবে।' ছাত্র হিসেবে তুমি খারাপ নও।'

'তোমাকে ঠিক মাস্টাবনীব মতো দেখতে।'

'হোটেলে গিযে তোমাব জন্যে ক্লাস খুলবো। আমি জানি তুমি আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জ্বালিয়ে মাববে।'

'অবসিডিযান?'

'মেকসিকো আগ্নেয়গিরির দান মনে আছে নিশ্চয়। অবসিডিয়ান হল ভলক্যানিক গ্লাস। বুঝলে কিছু? অসীম উত্তাপে মাটির চাপে বালি হল কাঁচ। কালো রঙের কাঁচ। কালো কালো গোল গোল রেখা। অন্যান্য খনিজ পদার্থের রঙে রঙিন। অসাধারণ সুন্দর। সেই কাঁচজাতীয় পদার্থে তৈরী ধারাল অস্ত্রে তারা শিকার করত।'

'আমাকে এক টুকরো অবসিডিয়ান জোগাড় করে দেবে?'

'চেষ্টা করব। কথা দিতে পারছি না।'

'একুশ হাজার বছর আগে মানুষ এল কী করে?'

'শোন, এখন তুমি দয়া করে প্রশ্ন থামাও, লক্ষ্মী ছেলে। এখন ওই দেখ দূরে কী দেখা যাচ্ছে।'

রাস্তা হঠাৎ উঁচু হয়ে ঢালুর দিকে গড়াতে শুরু করেছে। সামনে আকাশ আটকে দাঁড়িয়ে আছে এক সার বিশাল বিশাল বাড়ি। আরব্য রজনীর মতো লাগছে। মায়াজাল। একেবারে ঝকঝকে নতুন এক সার বাড়ি।

অ্যান বললে, 'আমরা সমুদ্রের ধারে এসে গেছি। ওই দেখ সব হোটেল। হোটেলের পিছনেই সমুদ্র।'

'ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না কেন?'

'আর একটু পরেই পাবে।'

গাড়ির চালক এতক্ষণ গুনগুন করে স্প্যানিশ [illegible]। গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন হোটেলে যাবেন?'

অ্যান বললে, 'হোটেল দেল সল।'

গাড়ি আর একটু ঢালুতে নেমে সোজা একটা হোটেলের ভেতর ঢুকে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারদিকে আলোয় আলো। আমরা নেমে পড়লুম। অ্যান বললে, 'তুমি একটা কাজ করতে পারবে?'

'বলো।'

'ওই দেখ রিসেপসান। সোজা চলে যাও। ডলার ভাঙিয়ে পেসো করে আন।'

পেসো নামটা শুনেই মনে একটু দোলা লাগল। দিনার আর পেসো শুনলেই মধ্যযুগের কোনও রহস্যময় নগরীর কথা মনে পড়ে। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। বেলি ড্যানসার। ঠোঁটে ধারাল ছুরি কামড়ে ধরা কোনও নিষ্ঠুর দস্যুর মুখ। কালো পাথরের ঝকঝকে মেঝের ওপর দিয়ে রিসেপসান। ডান দিকে একটা কাউন্টার। লেখা রয়েছে। একসচেঞ্জ। সুন্দর চেহারার এক তরুণ এগিয়ে এল। ডলারের বদলে এক গোছা নোট ধরিয়ে দিলে। পেসো। এর নাম পেসো।

অ্যানের কাছে ফিরে আসতেই বললে, 'কিসের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে?'

'তার মানে?'

'অবসিডিয়ানের কালো মেঝে।'

'তাই নাকি?'

অ্যান ভাড়া মেটাতে লাগল, আমি ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলুম। কালো কাঁচের মতো ঝকঝকে মেঝে। মাঝে মাঝে সাদা রেখার আঁকিবুঁকি। ঠিক ঢোকার মুখের কিছুটা জায়গা ওইভাবে তৈরি। ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়, তবু আমি একেবারে মোহিত। একুশ হাজার বছরের ইতিহাস। তার সঙ্গে আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরি ব্যাপারটাই আমার কাছে বিস্ময়কর। সেই আন্দামানে যাবার আকাশ থেকে আগ্নেয়গিরি দেখছিলুম নবকুসুম।

হোটেলের লবিটার তিন পাশেই খোলা। বেশ বড়। রিসেপসানে 'চেক-ইন' হয়ে গেল। অ্যান বললে, 'তোমার কোনও আপত্তি আছে যদি আমরা দু-জন একই ঘরে থাকি।'

'না আপত্তি কিসের। একা একটা ঘরে থাকতে আমার ভীষণ ভয় করে।'

'আমি খরচ বাঁচাবার জন্যে বলছি।'

অ্যান রিসেপসানিস্টকে বললে, 'আমাদের যতটা পারো উঁচু তলাতে সমুদ্রমুখো ঘর দাও।'

হোটেল দেল সলে ছ-সাতটা বড় বড় ব্লক। চারপাশে ছড়িয়ে আছে। আমরা চাবি নিয়ে আমাদের

ব্লকের দিকে এগিয়ে গেলুম। আমার দিগ্বিদিক জ্ঞান খুব কম। আমি আমাদের বোঝাবুঝি নিয়ে অ্যানকে অনুসরণ করলুম। অ্যানকে আমার অভিভাবিকা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছি। এতে আমার কোন লজ্জা নেই। রিসেপসানিস্টের কোনও কথাই আমি বুঝিনি।

দু-ধারে জল। ছোট্ট একটা ব্রিজ পেরিয়ে আমরা আমাদের ব্লকে চলে এলুম। আসার পথে দেখলুম ডানপাশে শামিয়ানার তলায় মনোরম একটি খানাপিনার জায়গা। ছোট ছোট টেবিল। মুখোমুখি সাদা রঙেব চেয়ার জুলিয়াস ইগলেসিয়াসের উদাত্ত কণ্ঠের গান বাজছে। রাতের নেশা জমেছে। হঠাৎ মনে হল এইখানে, এই মুহূর্তে আমি যদি মরে যাই, কেমন হয়। দেশ থেকে বহুদূরে। প্রশান্ত মহাসাগরের জলে আমার দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হবে। চারটে সাগর আমাব দেখা হয়েছে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর। ভাবত মহাসাগরের কুখ্যাত দশ ডিগ্রি চ্যানেলে আমি জাহাজে এলোপাথাড়ি দোল খেয়েছি। প্রশান্ত মহাসাগর একটু পরেই দেখব। ওই গোলার্ধ থেকে এই গোলার্ধে এসেছি অ্যাটলান্টিক পার হয়ে। গালফ অফ মেকসিকোও দেখতে পাব। হঠাৎ আমার বিশ্বটা এত বড় হয়ে গেল কার কৃপায়?

আমরা ঘর পেয়েছি তেইশ তলায়। ঘরের বাইরে আলোর অক্ষরেব সংখ্যা জ্বলছে ছশো ছত্রিশ। করিডবের দু-পাশে ঘর। চাপা আলোয় চারপাশ ঝকঝক করছে। অ্যান চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ঘবে ঢুকল। একে একে আমাদের মালপত্র ঘরে ঢোকাল। এখানে পোর্টারের কোন ব্যবস্থা নেই বোধহয়। বিদেশে নিজেব বোঝা নিজেকেই বইতে হয়। এ কি কলকাতা যে দেহের বোঝাটাও রিকশায় চাপিয়ে দেওয়া যায়!

ঘরটা অতি চমৎকাব। বিশাল বড়। মাঝখানে পেল্লায় দুটো খাট। পরস্পর জোড়া লাগান। মাথার দিকে দেওয়াল। পায়ের দিকে দেয়ালে ড্রেসিং টেবল, রাইটিং টেবল। ডানদিকে বিশাল জানালা। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। পর্দা ঝুলছে তাই বাইবেটা দেখতে পাচ্ছি না। দরজার পর যে ফালি পথটুকু দিয়ে আমরা এলুম, তাব একপাশে ওয়ার্ডবোব আর একপাশে বাথকম। খাটে সিল্কেব বঙের মসৃণ চাদব পাতা।

মেকসিকোব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন তাপমাত্রা। মেকসিকো শহরেব তাপমাত্রা ষোল ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমবা যেখানে আছি সাতাশ। বেশ মোলায়েম উত্তাপ। অ্যানেব দিকে তাকালুম। একপাশে দাঁড়িযে ঘব দেখছে।

'কেমন?'

'উত্তম। জানালাব পর্দাটা দু-পাশে সবিয়ে দাও।'

সবাতেই বিশাল বিস্ময। অন্ধকার আকাশ যেন ঠেলে ঢুকতে চাইছে। এক ঝাঁক অচেনা তারা। পুরো দেওয়ালটাই জানালা।

অ্যান বললে, 'একটা পাল্লা খুলে দাও।'

ভয়ে ভয়ে জানালার একপাশেব একটা পাল্লা খুলতেই, এক ঝলক সমুদ্রেব বাতাস ঢেউয়ের চাপা গর্জন নিয়ে ঢুকে পড়ল। ভয়ে সরে আসছিলুম। জানালায় কোনও আগল নেই। নিচেটা মনে হল অনেক নিচে। মাটির টানে খসে পড়লেই হয়েছে।

অ্যান বললে, 'জানালার কাছে গিয়ে অন্ধকারে ভাল করে তাকাও।'

তাকালুম। সমুদ্রের ঢেউ সাদা ফেনায় একের পর এক ভেঙে ভেঙে পডছে।

'এইবার বন্ধ করে দাও।'

অ্যান হাতঘড়ি খুলে টেবিলের ওপর রাখল। আড়ামোড়া ভেঙে বললে, 'তুমি আগে স্নান করবে, না আমি আগে?'

'লেডিজ ফার্স্ট।'

অ্যান জামা খুলতে লাগল। আমি প্রথমটায় একটু হকচকিতে গিয়েছিলুম। আমাদের দেশে নিজের স্ত্রীও এমন দুঃসাহস করবে না। অ্যান গ্রাহ্যই করল না। শরীরে যতটুকু না রাখলেই নয়, ততটুকু নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

আমার ভারতীয় মন প্রাথমিক ধাক্কাটুকু সহজেই কাটিয়ে উঠল। সামান্যতম পাপবোধও আর রইল না। শৈশব থেকেই নারী সম্পর্কে আমাদের যা শেখানো হয়, তাতে আমাদের পাপ-প্রবণতাটাই

বাড়ে। আমরা ক্রমশই বদমাইশ হতে থাকি। মন বিকৃত হতে থাকে। মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে থাকে। কোথায় যেন পড়লুম সেদিন, আমরা যে-কোনও পাপই করতে চাই কোনও সাক্ষী না রেখে।

হঠাৎ বাথরুমের ভেতর থেকে স্টেনগান চালাবার মতো একটা শব্দ ভেসে এল। বাথরুমের কাছে গিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলুম, 'অ্যান কী হল? বেঁচে আছ তো?'

শব্দটা হয়ে চলেছে। কোনও উত্তর নেই। দরজার নব ঘোরাতেই খুলে গেল। রাজা মহারাজার বাথরুম। ঝলমলে আলোয় ভেতরটা যেন হাসছে। ভেতরে ডানপাশে একটা কাঁচের লম্বাটে ঘর। আওয়াজটা সেই ঘরের মাথা থেকে আসছে। কাঁচের ঘরটা বাষ্পে ভরে গেছে। ঘুরে ঘুরে পাকিয়ে পাকিয়ে জল নামছে কাঁচের গা বেয়ে, তার মধ্যে অস্পষ্ট অ্যান। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। বাবাঃ এর নাম মেকসিকান শাওয়ার। একেই বলে কনকুইস্তাদর ১৫১৯ সালে স্পেন থেকে এঁরা এসেছিলেন। সে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

কলম্বাসের কথা মনে পড়ছে। কলম্বাস স্পেনের ক্যাথলিক রানী ইসাবেলার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলেন। সমুদ্র অভিযানে যাবেন। নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার করবেন। রানী নিজের অলঙ্কার বাঁধা রেখে অর্থ জোগাড় করে কলম্বাসকে দিলেন। রাজকোষে প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। সেকালের অধিকাংশ অভিযানে অর্থ যোগাতেন কোনও না কোনও ধনী ব্যক্তি। কলম্বাস আমেরিকায় গেলেন বটে। কিন্তু জানতেন না কোথায় এসেছেন। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি পূর্ব এশিয়ায় এসেছেন। আর এক দিগ্বিজয়ী কর্টেস স্পেন থেকে মেকসিকোয় আসার পর জানা গেল, কলম্বাস পূর্ব এশিয়া নয়, একটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন। এই ক্যাপটেন কর্টেস ছিলেন প্রথম বিজেতা। কনকুইস্তাদর। এরপর আরও দু-হাজার দিগ্বিজয়ী জীবন বিপন্ন করেছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর চমৎকপ্রদ ধ্বংসের ইতিহাস আপাতত তোলা থাক। আমার মনে হল, যেমন দেশ তার তেমন শাওয়ার। জল নয়তো যেন গুলি পড়ছে।'

অ্যান বেরিয়ে এল একেবারে তাজা গোলাপ ফুলটি হয়ে। ভুরভুরে কোলনের গন্ধ ছড়িয়ে গেল সারা ঘরে।

'কী রকমের অভিজ্ঞতা হল বলো।'

'শাওয়ারটা খুলে মাই গড বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলুম। ভেবেছিলুম কোনও টেররিস্ট ঢুকে পড়েছে।'

'তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে ছুটে গিয়েছিলুম।'

'যাও এবার তুমি গিয়ে একটু অভিজ্ঞতা করে এস। ওটা শাওয়ার নয়, রোজ। ঘুরে ঘুরে জল পড়ে।'

'মিটার লাগানো আছে। গরম ঠান্ডাটা ঠিক মতো অ্যাডজাস্ট করো, তা না হলে ডিমসেদ্ধ হয়ে যাবে।'

'আমি এইট্‌টি টেন করে রেখে এসেছি।'

আধঘন্টা পরে আমরা দু-জনে বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে বসলুম। বেশ আরাম লাগছে। সমুদ্রের দিকের জানালাটা আবার খোলা হয়েছে। তাজা বাতাসে ঘর ভরে গেছে। অ্যান বললে, 'ঠান্ডা একটা কিছু খেলে হয়।'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী খাবে?'

'কোক।'

অ্যান ফোন তুলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল দুটো ঠান্ডা বড় বোতল।

'তুমি মেকসিকোটা এবার আমাকে একটু শেখাও। কোনও জ্ঞানই তো আমার নেই।'

'মেকসিকো শিখবে? তাহলে শোন। কুনকুইস্তাদর ক্যাপটেন হারনান কর্টেসের নাম শুনেছ?'

'একটু আগে সেই বীরকেই স্মরণ করেছিলুম।'

'তাহলে তো অনেক কিছুই জান।'

'ওই নামটুকুই জানি।'

'স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস কর্টেসকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘুরে তো এলেন, জায়গাটা কেমন?

কর্টেস বর্ণনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষে একখন্ড কাগজ হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে রাজার সামনের টেবিলে ফেলে দিলেন। রাজা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই কোঁচকানো-মচকানো কাগজটার দিকে। কী বুঝলে?'

'মেকসিকো একটা গিলে করা ভূখন্ড।'

'রাইট। তিনটে টেকটো প্লেটের সংযোগস্থলে পড়ে মেকসিকোর এই চেহারা হয়েছে। তিনটের মধ্যে একটা হল নর্থ আমেরিকান প্লেট, দ্বিতীয়টি হল ক্যারিবিয়ান প্লেট, তৃতীয়টি কোকো প্লেট। কোটি বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের তলে তলে এই তিনটি খন্ড পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে। এই সদাচঞ্চল তলভাগ কাছাকাছি এসেও স্থির হতে পারল না। অজস্রবার তাদের ঠোকাঠুকি। একবার এ ওব ঘাড়ে চেপে বসে একবার ও এর ঘাড়ে। এই ঘষাঘষি, ধাক্কাধাক্কি, ঠোকাঠুকির ফলে জ্বলে উঠল আগ্নেয়গিরি, ঠেলে উঠল পর্বত, ভূমিকম্পে দেবে গেল ভূত্বক। তৈরি হল দোমড়ানো মোচড়ানো একটি কাগজখন্ড। সুদীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের পথে মেকসিকোর সবকিছুই হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর রকমের জটিল, জটিল ভূপ্রকৃতি, গাছপালা, আবহাওয়া। এখানে আসামাত্রই তোমার মনটা অন্যরকম হয়ে যায় নি?'

'ধরেছ ঠিক। কেমন যেন লাগছে।'

'লাগতেই হবে।'

'এইরকম একটা জায়গায় মানুষ কবে এল, কেন এল? কেন তাদের নাম ইন্ডিয়ান হল। মঙ্গোলিয়ান ফিচারই হল বা কি করে?'

'মেকসিকো নয়, বলো আমেরিকায় প্রথম মানুষ কীভাবে এল, তারা কারা। নিশ্চয় সাগর পাড়ি দিয়ে আসেনি। আমার ব্যাগে থেকে ম্যাপটা নিয়ে এস।'

অ্যানের ব্যাগে ভাঁজ করা একটা ম্যাপ ছিল। মানচিত্র ছাড়া ভূপর্যটন হয় না। অ্যান বিছানার ওপর সেটাকে বিছিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'সরে এস।'

ম্যাপের ওপর দু'জনের মাথা ঝুঁকে পড়ল। অ্যানের নিশ্বাস আমার গালে লাগছে।

'তুমি কোন জায়গাটা দেখছ অ্যান?'

'এই দেখ বেরিং স্ট্রেট। ওপরে ওপরে। হ্যাঁ। এপারে রাশিয়া ওপারে আমেরিকার আলাস্কা। ব্যবধান মাত্র পঞ্চাশ মাইল। মাঝখানে আবার দুটো দ্বীপ। জায়গাটা কেমন।'

'ভয়ংকর। মাথার উপর আর্কটিক সার্কল।'

'এই সেই স্থান। সম্ভাব্য স্থান। তোমার এই দশ হাজার বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবীর আবহাওয়ার কোনও স্থিরতা ছিল না। হাজার হাজার হাজার বছর লেগেছে এই গ্রহটির স্থিত হতে। সেই আদিযুগে কখনও প্রচন্ড উত্তাপের কাল গেছে, কখনও নেমে এসেছে বরফের যুগ। বরফযুগ যখন শুরু হল তখন ওপরের মেরুহিম নেমে এল নিচে, আরও নিচে। সব জমে বরফ হয়ে গেল। উত্তর সাগরের জল জমে নেমে গেল তিনশো ফুট। বেরিং স্ট্রেটের গভীরতা মাত্র দেড়শো ফুট। জমাট বেরিং স্ট্রেট তখন আর প্রণালী রইল না, হয়ে গেল কঠিন একটি বরফখন্ড। তখনই ঘটেছিল ব্যাপারটা। শিকারী মানুষ রাশিয়ার ভেতর দিয়ে জমাট বেরিং স্ট্রেট পেরিয়ে চলে এল আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম মাথায়। জায়গাটা দেখ। আলাস্কা। এইখান থেকে পশ্চিমধার ধরে তারা নেমে এল নিচে। আরও নিচে। উঃ ভাবা যায় না। আহা! আমি যদি জন্ম নিতাম ওইকালে।'

'আহা! আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে।'

অ্যান বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়েছে। চোখ দুটো আর এ জগতে নেই। সমুদ্রের বাতাসে ম্যাপটা বিছানা থেকে উড়ে যেতে চাইছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের অস্পষ্ট ডাক শুনতে পাচ্ছি। জানালার বাইরে অনেকটা দূরে সমুদ্রের আরও কাছে, বিশাল আর একটা বাড়ি অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পরিত্যক্ত ইমারত। আলোর ছিটেফোঁটাও নেই। এত বড় একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে কেন? আবার প্রশ্ন।

অ্যান বলছে, 'উত্তর-পূর্ব এশিয়ার মঙ্গোলয়েডরা সেই প্রচন্ড শীতে, স্থায়ী বরফে এতটুকু কাতর হয়নি। সেই আদিযুগে পৃথিবীর ঐ চরম অবস্থায় ওই মানুষেরা এমন এক জীবনযাত্রার ধারা ও

সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পেরেছিল, যার ফলে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এস, আমরা সেই পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানাই।'

'কীভাবে?'

অ্যান বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সোনালি চুল পিঠ বেয়ে ছড়িয়ে আছে। বাতাসে একটা দুটো স্বপ্নের মতো উড়ছে। ঐতিহাসিক অ্যানের ঘোর লেগে গেছে। পৃথিবীর আদিমকাণ্ডের ভীষণ এক নেশা আছে। অ্যান হাত বাড়িয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিল। দিলে কি হবে, আকাশের আমরা এত কাছে যে অসীমের অনুভূতিটা রয়েই গেল।

অ্যান বললে, 'চলো। আর না। হোটেলের ঘরে বসে থাকার জন্যে আমরা আসিনি।'

ঘরের বাইরে এসে অবাক হয়ে গেলুম। এপাশের ওপাশের ঘর থেকে নারী পুরুষেরা সব বেরিয়ে এসেছেন। কিশোরীরাও আছে। সকলেরই পরিধানে সুইমিং কস্ট্যুম। কাঁধে সাদা তোয়ালে। সবাই এগিয়ে চলেছেন লিফটের দিকে। করুর গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। কারুব সোনালি তামাটে। শরীর থেকে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছে।

'অ্যান এরা যাচ্ছে কোথায়?'

'সমুদ্রে।'

'রাত নটার সময় সমুদ্রে?'

'তোমাকে আমি কি বললুম। এখানে আমরা এসেছি সমুদ্রে। রাতের সমুদ্রে স্নান করেছ কখনও।'

'রাতের সমুদ্রে? দিনের সমুদ্রেই একবার করেছি মাত্র।'

লিফটে চারপাশ থেকে ঠেসে ধরেছে অর্ধনগ্ন শরীর। অ্যান ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল 'কেমন লাগছে? বলেই হেসে ফেলল।

কোনও কোনও সময় অনুভূতি অসাড় হয়ে যায়। আমার সেই অবস্থা। এমন শরীর পর্দার গায়ে অন্ধকার ঘবে অনেক দূব থেকে দেখেছি। লিফট অপ্সরা-অপ্সরীদের নিয়ে ভূমিষ্ঠ হল অবশেষে। গাছের পাতা কাঁপা লবণাক্ত রাত হাত ধরে আমাদের ডেকে নিল।

হোটেলেব নিচে মুক্ত অঙ্গনে এসে মনে হল, উৎসবেব পরিবেশ। চাবপাশ থই-থই করছে মানুষে। সুখী নরনারী দেখতে কার না ভাল লাগে! প্রাণপ্রাচুর্যে সব টগবগ কবছে। ট্যুরিস্ট হোটেল আর ব্যবসাদারের হোটেলে অনেক তফাৎ। এখানে গোমড়ামুখো ব্যবসাদার একজনও নেই। একদল সমুদ্র থেকে ফিরছে, তো আর একদল সমুদ্রের দিকে ছুটছে।

অ্যান বলছে, 'আগেই আমরা সমুদ্রে যাব না। একটু সাসপেনস-এ থাকা ভাল। চলো আমরা উলটো দিকে যাই। দেখে আসি হোটেলের চারপাশে আর কি আছে!'

'এত রাতে বাইরের রাস্তায় যাবে। যদি ব্যান্ডিটের পাল্লায় পড়ে যাই!'

'ব্যান্ডিট! এটা কি তোমার ওয়েস্টার্ন ফিল্ম। ঘোড়ায় চড়ে টেকসাসের কাউবয়রা ছুটে আসবে! টেকসাস অবশ্য কাছেই।'

আমরা বেরিয়ে এলাম পথে। হোটেলের সামনেই একটা চৌমাথা তৈরি হয়েছে। এয়ারপোর্টের দিক থেকে একটা পথ এসে আমাদের হোটেলে ঢুকে পড়েছে। আর একটি পথ ডাইনে বাঁয়ে প্রসারিত। ডানদিকের পথ ঘুরে কোথায় গেছে কে জানে? বাঁদিকের পথ সোজা জলে গেছে। হোটেলের পর হোটেল বাঁয়ে রেখে। ডানদিকে কিছুই নেই। অসমতল জমি। ঢেউ খেলে চলে গেছে দূর আকাশেব গায়ে। এপাশে সাগরের ঢেউ ওপাশে জমির ঢেউ। রাস্তার দু'ধারে চড়া নীল আলো জ্বলছে। সাংঘাতিক একটা জীবন-ছাড়া রোম্যান্টিক ব্যাপার। প্রকৃতি আর মানুষের পরিকল্পনা মিলে পৃথিবীর প্রান্তসীমার একদা অখ্যাত এক অঞ্চল কী হয়ে দাঁড়িয়েছে! আমাদের প্রায় বোবা করে দিয়েছে।

পিচের রাস্তা, দু'ধারে ফুটপাথ। দু'সার গাছ। কী গাছ আমি বলতে পারব না। পাতার চেহারা সত্যই অচেনা। অ্যান আমার হাত ধরেছে ছেলেমানুষের মতো। ধরা হাত দোলাতে দোলাতে আমরা দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছি। নির্জন রাস্তা। কে আসবে এদিকে। এদিকে যে সমুদ্র নেই। হঠাৎ হঠাৎ এক একটা পেল্লায় মোটর গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে ছুটে আসছে উলটো দিক থেকে। এখানে এসেই এক ধরনের যন্ত্রচালিত তিনচাকার গাড়ি দেখেছি। চারপাশ খোলা। মাথার ওপর পাতলা এক

আচ্ছাদন। চলার সময় ভীষণ শব্দ করে। খবর নিয়ে জেনেছি, এই গাড়ি খুব কম পয়সায় ভাড়া নিয়ে যততত্র বেড়ানো যায়। ঘন্টা হিসেবে ভাড়া। অটো রিকশার দুর্দান্ত সংস্করণ। ছোটে বিপজ্জনক বেগে। পিলে চমকানো শব্দে। নিজেকেই চালাতে হয়। সেই রকম একটা দুটো অটো আমাদের অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। টু পিস সুইমিং কস্ট্যুম পরা সুঠাম তরুণীরা বসে আছে। সোনালি চুল চামরের মতো পেছনে উড়ছে। যাঁরা মেয়েদের ফিগার দেখতে ভালবাসেন, তাঁরা ওই দৃশ্য দেখলে নিঃসন্দেহে মোহিত হয়ে যাবেন। এই রাত, নীল আলো, গাছের সারি, ভিজে বাতাস, সাদা চন্দ্রাতপ লাগানো রোমান রথের মতো তেজীয়ান গাড়ি, আর সেই গাড়িতে চওড়া-পিঠ, উদ্ধত যৌবনা রমণী, চুল উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে। একটা দৃশ্যের মতো দৃশ্য।

অ্যান বললে, 'চলো আমরাও একটা অটো ভাড়া করি।'

'রক্ষা করো অ্যান। ওই শব্দ ওই গতি। তাছাড়া তোমার টু পিস কস্ট্যুম আছে?'

'আমেরিকান মেয়ে কস্ট্যুম থাকবে না। অবশ্যই আছে। তুমি একটু ভীতু, তাই না?'

'ঠিক ভীতু নই। আসলে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ভালো লাগে না। হঠাৎ উলটে গেলে হাড়গোড় ভেঙে যাবে। বেড়ানোর আনন্দ মাথায় উঠবে।'

'তা অবশ্য ঠিক! আচ্ছা, তোমরা ইন্ডিয়ানরা আগেই খারাপটা ভেবে নাও, তাই না! তোমার মাথায় প্রথম থেকেই ঘুরছে উলটে যাবার চিন্তা। ঘুরছে ব্যান্ডিটস। নির্জন পথ মানেই দস্যুব আক্রমণ।'

'এইটাই হল ভারতীয়দের দার্শনিক বৈশিষ্ট্য। আগেই পরিণতির কথা ভেবে নেওয়া। লজিক। হাত আনাড়ি। দুর্দম গতি। সম্ভাব্য পবিণতি ওলটানো।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করে না।'

কথায় কথায় আমরা প্রায় মাইল দয়েক চলে এসেছি। নীল আলোর এলাকা শেষ। পথ হারিয়ে গেছে অন্ধকারেব অনিশ্চয়তায়। বাঁপাশে হোটেল এলাকা শেষ। কয়েকটা সাদা রঙেব একতলা বাড়ি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। কোথাও কোনও লোকজন নেই। বাঁদিকে সমুদ্র, বাড়ির আড়াল আর না থাকায় স্পষ্ট। অবশ্য অনেকটা দূরে। অন্ধকাব আকাশের গায়ে সাদা ঢেউয়ের হাসি। অজস্র ঠোঁট যেন হাসছে খিলখিল করে। সামনে দিগ্‌ভ্রান্ত প্রান্তর। সেই প্রান্তরে পড়ে আছে একটি স্তূপ।

'ওটা কী বল তো অ্যান?'

অ্যান অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'ভূমিকম্প'।

'ভূমিকম্প মানে?'

'পঁচাশি সালের সেই মারাত্মক ভূমিকম্পে হয় মাটি থেকে কিছু একটা ঠেলে ওপরে ওঠার চেষ্টা করেছে, না হয় কোনও কিছু একটা ধসে পড়েছে। আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেছ, বিশাল একটা বাড়ি ভুতুড়ে হয়ে পড়ে আছে। ওটাও সেই ভূমিকম্পের ফল। নতুন হোটেল তৈরি হচ্ছিল। লম্বালম্বি ফাট ধরে চাবপাশ থেকে ফুলের পাপড়ির মতো খুলে গেছে। সেই ভূমিকম্পের ভয়াবহতা বোঝাবার জন্যে ভেঙে না ফেলে স্মৃতি হিসেবে ঘিরে রেখে দিয়েছে।'

আমরা সেই ভয়ের মুখ থেকে ফিরে এলুম। রাস্তা পার হয়ে এমন একটা জায়গায় আসা গেল, সে জায়গাটাকে হঠাৎ মনে হতে পারে রূপকথার রাজত্ব। চৌকো চৌকো পাথর বসানো বিশাল এক চত্বর। এক ফুট, দেড় ফুটের বেশি উঁচু হবে না, এইরকম পাঁচিল দিয়ে জায়গায় জায়গায় ঘেরা। গোল, লম্বা, পাথরের বেদী ইতস্তত ছড়ানো। পরিষ্কার ফুটফুটে একটি অঞ্চল। সুদৃশ্য বাতিদান থেকে চাপা সাদা আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

অ্যান বললে, 'বেশ মনোরম করে রেখেছে, তাই না?'

হ্যাঁ বলতে গিয়ে থেমে গেলুম; কিছু দূরে আলো-আঁধারি একটা জায়গায় সম্পূর্ণ নগ্ন একটি ছেলে আর মেয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বসে আছে।

আমি বললুম, 'অ্যান আর এগিও না। চলো অন্যদিকে যাই। এই জায়গাটা মনে হয় প্রেমিক প্রেমিকাদের মিলনতীর্থ।'

'সারা দুনিয়াটাই তো তাই। চলে যাবে কেন? আমরা এখানে বসব।'

'ওদিকে একবার দেখ না।'

অ্যান নির্দিষ্ট দিকে তাকাল; তারপর হঠাৎ আমাকে পেল্লায় এক চাপড় মেরে বললে, 'তুমি একটা রিয়েল গাধা। ওটা তো পাথরের মূর্তি।'

'সত্যি!'

'চলো দেখে আসি।'

ওই রকম একটা মূর্তি নয়, কায়দা করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গির মূর্তি বসিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত ভঙ্গির আবেদন একটু বেশি মাত্রায় দৈহিক। এত জীবন্ত এত স্বাভাবিক যে আসল নকল ভুল হয়ে যায়। হলও তাই। এক জায়গায় এক যুগল মূর্তিকে পাথরে গড়া ভেবে প্রায় স্পর্শ করে ফেলেছিলাম। অ্যান তাড়াতাড়ি আমার হাত চেপে ধরল। আমরা সরে এলাম। তারা এতই ব্যস্ত যে গ্রাহ্যই করল না। পৃথিবীর বাইরে চলে গেছে।

একটা পাথরের আসনে বসলাম। অ্যান একটু হেসে বললে, 'এখানে দুটি জিনিস অতি প্রবল, সেকস অ্যান্ড সি। আমাদের কিছু করার নেই। সমুদ্র উত্তাল, উত্তাল যৌবন। চুপ করে বসো। আশা করি তুমি শান্তই আছ।'

'জান অ্যান, অনেকদিন আগে কলিন উইলসনের বইয়ে পড়েছিলাম একটি চমৎকার কথা, সেকস ইজ লাইক রাইডিং এ বাইসাইকল। মানেটা কী বল তো?'

'মানে, অভ্যাস। বুঝলে আমাদের দুনিয়ায় এই এক ব্যামো। তোমরা সেই তুলনায় অনেক ভাল আছ। এই আমার পাশে তুমি না হয়ে আমার দেশের কেউ থাকলে, এতক্ষণে আমাকে জাপটে ধরে গোটা দশেক চুমু খেয়ে নিত।'

'চুমু জিনিসটা ভীষণ আনহাইজিনিক। অ্যান আমি কেমন ছেলে? একটা সার্টিফিকেট দাও।'

কিছু বোঝার আগে অ্যান আমার ঠোঁটে তার ঠোঁট চেপে ধরল, তাবপর তুলে নিয়ে বললে, 'হাইজিনিক কিস টু অ্যান ইনোসেন্ট চাইল্ড।'

অ্যানের কথায় ভীষণ আনন্দ হল। ইকসতাফায় আসার চেয়েও আনন্দ। মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় মহাদেশ আর আছে নাকি? সেই মহাদেশে আমি স্থান পেয়েছি। মেকসিকোয় কী ভূমিকম্প হয়! তার চেয়েও বড় কম্প হয়ে গেল আমার হৃদয়ে।

'অ্যান, সেই ভূমিকম্পের কথা একটু শোনাও না। বেশ ভয় পাইয়ে দাও তো আমাকে।'

'ভয় পাওয়াতে হলে তো তোমাকে আগে পোপোকাটাপেট্‌লেব সামনে দাঁড় করাতে হয়।'

'সেটা? আবার কী?'

'সেটা? দূর থেকে দেখলেই তোমার বুক কেঁপে যাবে। একটি আগ্নেয়গিরি। মেকসিকোয় চলো। আটচল্লিশ তলা হোটেলের ছাদে আমরা দাঁড়াব। মেঘমুক্ত, ধোঁয়াশামুক্ত দিনে, দেখবে আকাশ আটকে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্য তুষারের টুপি মাথায় দিয়ে। ৫৪৫০ মিটার যার উচ্চতা। মেকসিকোয় যে-কটি বড় বড় পাহাড় আছে তাদের অন্যতম। সারা বছর আকাশের ঊর্ধ্বে ধোঁয়ার পতাকা তুলে রেখেছে। স্মোকিং জায়েন্ট অফ মেকসিকো।' অ্যান আমার কাঁধে হাত রাখল, 'পৃথিবীটা কী সুন্দর, তাই না? আমার একটু শীত-শীত করছে। তোমার করছে না?'

'আমারও করছে।'

'তার মানে রাতের দিকে এখানে একটু শীত পড়বে। জান তো, মেকসিকোর সত্তর ভাগ অংশ সি-লেভল থেকে ৪৫০ মিটারেরও বেশি উঁচু। সেই উচ্চতা থেকে আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। বড় বড় পাহাড়। ক'টা আগ্নেয়গিরি আছে জান? পাঁচটা বড় বড় সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। এছাড়াও একটি নবাগত আছে পেরিকুটিন। মেকসিকো শহরের ৪০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। ১৯৪৩ সালে হঠাৎ বিস্ফোরিত হল। মেকসিকোর সব চেয়ে বড় চাষ হল কর্ন। সেই সমতল শস্যক্ষেত্রে ঠেলে উঠল চূড়ার মতো। এক সপ্তাহের মধ্যে উচ্চতা দাঁড়াল ১৪০ মিটার। দু'মাস পরে হল ৩০০ মিটার।'

'কী মজা, হঠাৎ একটা সমতল ক্ষেত্রে ফোড়ার মতো ঠেলে উঠল আগ্নেয়গিরি।'

'মজা! তোমার কাছে মজা, মেকসিকোর মানুষের কাছে মহাতঙ্ক। ন'বছর ধরে অগ্ন্যুদ্গিরণ করে

৫০০ মিটাব পর্যন্ত উঠে তিনি অবশেষে ঘুমিয়ে পডলেন। ইত্যবসবে গ্রামকে গ্রাম পুডে ছাই। অসংখ্য মানুষ গৃহহাবা। বুঝলে সোনা, এব নাম মজা।'

'আমাব ভীষণ শীত কবছে অ্যান।'

'আমাবও শীত কবছে। কাছে সবে এস। গাযে গা লাগিযে জডামডি কবে বসি। জাযগাটা তো ফাঁকা।'

'অ্যান, কোনও বন্যজন্তু আসবে না তো।'

'বন্যজন্তু! তা ধবো একটা জাগুযাব আসতে পাবে।'

'জাগুযাব! এত জন্তু থাকতে জাগুযাব আসবে কেন?'

'প্রায তিবিশ হাজাব বছব আগে মেকসিকোব আদি মানবেবা জমাট বেরিং প্রণালী অতিক্রম কবে ঢুকেছিল আলাস্কায। তাবা ক্রমশ দক্ষিণে নামতে লাগল। আলাস্কা থেকে এখনকাব মেকসিকো শহবে আসতে তাদেব প্রায আবও দশ হাজাব বছব লাগল। অর্থাৎ খ্রীস্টেব জন্মেব কুডি হাজাব বছব আগে তাবা এসে পৌঁছল মেকসিকোতে। আবও পনেবো হাজাব বছব পাব কবে দাও। তাব মানে ৫০০০ বিসি। ২০,০০০ বিসি তে পেলিও ইন্ডিযানবা এল। তখন তাবা শিকাবী। ৫০০০ বিসি তে তাবা কৃষক। কৃষিব সঙ্গে সভ্যতাব একান্ত সংযোগ। ঘুবে ঘুবে বেডালে মানুষ যাযাবব হয, সভ্য হয না। মাটিকে ধবে তাবপব উঠতে হয। তেহুযাকান উপত্যকাব মানুষ ১৫০০ থেকে ৯০০ বিসি ব মধ্যে কৃষি অর্থনীতিব জড গেডে ফেলেছিল, কিন্তু আব একটি দল ভাগ্যেব অন্বেষণে চলে গিযেছিল গালফ কোস্টেব জঙ্গলে, জলাভূমিতে। ভ্যাপসা গবম, মনুষ্য বসবাসেব অনুপযোগী। এদেব বলা হয ওলমেক। এই ওলমেকবাই সভ্যতাব তুঙ্গে উঠেছিল। আজ আমবা যে অঞ্চলকে বলি ভেবাক্রুজ আব টাবাস্কো সেইখানেই ১০০০ বিসি তে এই ওলমেকবা গডে তুলেছিল নগবসভ্যতা। আজকেব মতই জটিল উন্নত এক অবস্থা। তোমাকে ওলমেকদেব কথা কেন বলতে শুরু কবলুম।

'তা তো জানি না ম্যাডাম। তুমি জাগুযাব দিযে শুরু কবেছিলে।'

'হ্যাঁ, জাগুযাব। ওলমেকবা ভেবাক্রুজেব সানলোবেঞ্জো অঞ্চলে ৪৫ মিটাব উঁচু একটা উপত্যকাব চাবপাশ শক্ত কবে বেধে নিযেছিল। চাবপাশে ঘাস তাব ওপব ঐ মাটিব ঢিবি মতো একটা অঞ্চল। এব উপব তাবা অসীম পবিশ্রমে ঝুডি ঝুডি মাটি ফেলে চৌকো ঢিবি সাজিযেছিল। কোনও এক অজ্ঞাত বহস্যময কাবণে তাদেব এই বসতি তাবা স্থাপন কবেছিল উত্তব থেকে দক্ষিণ অক্ষবেখা ববাবব, যাক, সে কথা তোমাকে ইচ্ছে হলে পবে বলব। সানলোবেঞ্জোতে সেই লুপ্ত সভ্যতাব যে সব বিস্ময়কব নিদর্শন পাওযা গেছে, তাব মধ্যে আছে পাথবেব সাতটি বিশাল মাথা। কোনও কোনওটি তিন মিটাবেব মতো উঁচু। পাওযা গেছে ৪০ টন ওজনেব মোনোলিথিক স্লাব। সেই পাথবে খোদাই কবা হযেছিল অদ্ভুত সব জন্তু আব মানুষ। ধাবে কাছে পাথব নেই, কোথা থেকে তাবা এই পাথব পেল। ৮০ কিলোমিটাব দূবে টুকস্টলা পাহাড থেকে এইসব পাথব কেটে আনা হযেছিল। তখন না ছিল চাকা লাগানো গাডি, না ছিল হাতি। কীভাবে পাহাড কেটে পাথর আনা হযেছিল একবাব ভেবে দেখ। ওলমেক ভাস্কবদেব কোনও তুলনা ছিল না। তাদেব বেখে যাওযা কাজ আজও পৃথিবীব বিস্ময। পাথবেব তৈবি বিশাল মাথাগুলো কী বকম ছিল শুনবে, মোটাসোটা কোনও যুবকেব, গোল মুখ, পুরু ঠোঁট, ঠোঁটেব কোণ দুটো নিচেব দিকে ঝুলে আছে, চওডা অল্প চ্যাপটা নাক, চোখেব ওপবেব পাতায দুটো কবে ভাঁজ। মাথায একালেব আমেবিকান বেস বল খেলোযাবদেব মতো হেলমেট। এসব কাব মূর্তি! দেবতাব না মানুষেব! ওলমেকদেব আকৃতি কেমন ছিল জানাব উপায নেই। কবব খুঁডে যে-হাড পাওযা গেছে, তা নোনা মাটিতে প্রায গলে গেছে। সেই দেহাবশেষ দিযে কোনও তথ্যে আসা যায না, কিন্তু তাদেব ভাস্কর্য, আব পাথব খোদাই দেখে একটা অনুমানে আসা যায। খাটো, বলশালী দেহ, একটু স্থূলকায, গোল মাথা, গোল মুখ, ফোলা ফোলা গাল, মোটা ঘাড, তির্যক চোখ, পুরু চোখেব পাতা, ছোট চওডা নাক, মুখেব কোণ দুটো নিচেব দিকে টানা, পুরু ঠোঁট, চোযাল দুটো শক্ত।'

'তাব মানে মঙ্গোলিযান ফিচাব।'

'হ্যাঁ, এখনও ওই অঞ্চলে এই চেহারার মানুষ তুমি অনেক দেখবে। এদের পূর্বপুরুষ হল ওলমেক। ওলমেক কালচারের উত্তরাধিকারী না হলেও ওলমেক চেহারার উত্তরাধিকারী।'

'এইবার জাগুয়ারের কথা বল।'

'পাথরের মাথার পর যা পাওয়া গেছে, তা হল পাথরের বেদী বা সিংহাসন। এই অলংকৃত সিংহাসনের চারপাশে খোদাই করা আছে জীবনদৃশ্য আর সেই সব মূর্তি, যার অর্থ বোঝা সহজ নয়। জাগুয়ারের হাঁ করা মুখ থেকে ঠেলে উঠছে শিশু কোলে এক নারী। কোনও কোনও চিত্রে মানুষের দেহে জাগুয়ারের দাঁত বের করা মুখ। সর্বত্র জাগুয়ার। জাগুয়ারকেই হয়তো তারা দেবতা ভাবত। একটি চিত্র বড় সাংঘাতিক, এক নারী, এক জাগুয়ার মানবের সঙ্গে মৈথুন করছে। ওলমেক মানে জান? নাহুয়াতল ভাষায় ওলমেক মানে যে-দেশে রাবার জন্মায় সেই দেশের অধিবাসী। জলা আর জঙ্গলে তারা এক অতুলনীয় সভ্যতার পত্তন করেছিল, যার ৮০ কিলোমিটার দূরে শুকনো ডাঙা, আর বিশাল পাহাড়ের বেষ্টনী। সেই পাহাড়ী এলাকার জীবরা হল ভয়ংকর জাগুয়ার, বানর আর সরীসৃপ। তা ধরো, সেই জাগুয়ারই যদি একটা নেমে আসে!'

'অ্যান, তুমি এখন ওই অন্ধকারের ঢিবিটার কাছে যেতে পারবে?'

'অবশ্যই পারবো, তুমিও পারবে, তবে যাওয়াটা ঠিক হবে না। পাহাড় থেকে জাগুয়ার হয়তো নেমে আসবে না, কিন্তু সাপের কামড়ে প্রাণ যেতে পারে।'

'কী কী সাপ আছে, র‍্যাট্‌ল স্নেক, ভাইপার?'

'ঠিক এই অঞ্চলে কী সাপ আছে আমি জানি না, তবে র‍্যাট্‌ল স্নেক আমেরিকার একজন সর্পতারকা।' হঠাৎ আমাদের পেছন দিকে ফেটে পড়ল আধুনিক ইংরিজি বাদ্যযন্ত্রের বিপুল শব্দ। আমরা দু'জনেই চমকে উঠলুম।

'অ্যান, এ আবার কী গো? অন্ধকারে বাদ্যি বাজে?'

'চলো দেখে আসি।'

অ্যানের হাত আমার কাঁধে। বেশ শীত করছে দু'জনেরই। পাশাপাশি আমরা দু'জনে হাঁটছি। যতই এগোচ্ছি ততই বিস্ময়। আমার মনে হচ্ছে, এ এমন এক জায়গা যেখানে মাঝরাতে হুস হুস করে পরী এসে নামবেই।

এত সংগীত কোথা থেকে আসছে! এই অন্ধকার নিস্তব্ধ রাতে! আমার সেই গানের কলিটা মনে পড়ছে, নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়। অ্যান আর আমি গুটি-গুটি হাঁটছি। পাথর বাঁধানো বিশাল চত্বর। এদেশে মনে হয় পাথরের ছড়াছড়ি; যেমন আর্মেনিয়ায়।

অ্যান বললে,'বুঝতে পারছ, এ জায়গাটা কী? এটা হল মার্কেট প্লেস।'

চারপাশে সুন্দর সুন্দর দোকান। সব দোকানই এখন বন্ধ। কাঁচঘেরা দোকানের ভেতর নরম আলো জ্বলছে। সেই নরম আলোর মায়ায় সাজানো ভাল ভাল জিনিস। বিভিন্ন ভঙ্গির রহস্যময়ী ম্যানিকুইন। এত জীবন্ত যে, মনে হচ্ছে এখুনি নড়ে উঠবে। অ্যান আমেরিকার মেয়ে। তার কাছে এসব কিছুই নয়। আমার চোখে স্বপ্ন। ভাল জিনিস, মানুষের তৈরি মায়া দেখতে কার ভাল লাগে। কল্পনা, রুচি, সৌন্দর্যবোধ সব মিলেমিশে একটা কল্পনার জগৎ তৈরি হয়েছে।

অ্যানও আমার মতো অবাক হয়ে দেখছে। হয় ভদ্রতাবোধে, না হয় আমার ধারণাই ঠিক, মেয়েটা পাগলী। সাজতে-গুজতে ভালবাসে না। ন্যাকান্যাকা কথা বলে না। বড়লোকি চাল নেই। ঘৃণা নেই। অহংকার নেই। এইরকম একটা জায়গায় এসেছি সেই আনন্দে যেমন মাতোয়ারা, তার চেয়েও বেশি আনন্দের হয়ে উঠছে অ্যানের সঙ্গ। সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো মেয়ে।

এক একটা দোকানের সামনে আমরা হাঁ করে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছি। রঙ-বেরঙের ছেলেদের পোশাক। আকাপুলকো শার্ট। ক্যানক্যান ফ্রক। মেয়েদের জুতো। সুন্দর সুন্দর গহনা। মেকসিকোর হস্তশিল্পীদের তৈরি কাঁচের জিনিস, কাঠের পুতুল। অয়েল পেন্টিং। একটা দোকান আবার

দোতলায়। রাস্তা থেকেই সাদা পাথরের অবারিত সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। আমি আর অ্যান ছাড়া কেউ কোথাও নেই। আমরা দু'জনে যেন স্বপ্নে শপিং করছি। অ্যান বললে, 'ক'দিন তো খুব ভারতীয় দর্শন কপচাচ্ছিলে। এইবার আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দি। স্বপ্নে মানুষ অনেক কেনাকাটা করতে পারে। টাকার লেনদেন হল।'

'টাকা নয়। বলো পেসো। যে-দেশের স্বপ্ন সেই দেশের কারেনসি।'

'বেশ তাই হল। গোছা গোছা পেসো হাতবদল হল। মনে করো তুমি আমাকে ওই ফ্রকটা পরালে। আমি তোমাকে পরালুম আকাশী রঙের ওই আকাপুলকো শার্টটা। এইবার ভোর হল। ঘুম ভাঙল। সব ভোঁ ভোঁ। এইবার লজিকে এস। স্বপ্নের কোনও জিনিস যেমন জাগরণে থাকে না, শুধু অভিজ্ঞতাটাই থাকে, সেইরকম এই জীবনও এক দীর্ঘ স্বপ্ন। কোনও সন্দেহ নেই। এই মুহূর্তে প্রমাণিত। এখন রাত বারোটা। স্থান, ইকসতাফা।'

'ঠিক বলেছ। এ হল স্বপ্নের স্বপ্ন।'

অ্যান আমার কাঁধে হাত রেখেছে। দু'জনে পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে দোতলার দোকানে উঠেছি। সামনে বারান্দা। কাঁচঘেরা বিশাল ঘর, মৃদু আলোয়, চোখ ভোলানো আয়োজন স্তব্ধ হয়ে আছে। ঘরের মাঝখানে একটি যুবকের মূর্তি বিশাল সমব্রেরো টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, দোকানের মালিক, যাওয়ার আগে মন্ত্র পড়ে এক জীবন্ত প্রহরীকে স্থাণু করে রেখে চলে গেছেন। কাল সকালে এসে আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবেন।

বারান্দায় দু তিনটে সোফা পাতা রয়েছে। আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। দু'জনে পাশাপাশি, আরাম করে বসলুম। এখন তো আমাদের ছুটি। দু'জনেরই ছুটি। ছুটির মেজাজে ঘড়ির কোন স্থান নেই। সময় গড়াচ্ছে গড়াক। গড়িয়ে যাবে কোথায়! এখনও তো সে বয়েস হয়নি যে, একটা দিন চলে যাওয়া মানে ভাবতে বসা, কবরের দিকে আরও একদিন এগিয়ে গেলুম। অ্যান ভেসে আসা ডিসকো সংগীতের তালে তাল মিলিয়ে কী একটা ইংরিজি গান গাইছে। মেয়ের অনেক গুণ। গানের গলাটি বেশ ভাল। অনেকটা পল ম্যাকার্টিনির মতো।

হঠাৎ আমার মনে হল, এইভাবে বসে আছি, পুলিশ এসে চোর বলে ধরবে না তো!

'অ্যান, এইভাবে বসে থাকাটা বেআইনি নয় তো। পুলিশ এসে চোর বলে ধরবে না তো?'

'এখানে চোরের উপদ্রব আছে বলে মনে হচ্ছে! কোথাও কোনও পাহারা আছে! এটাকে তুমি স্বর্গ ভেবে নিয়ে দেবদূতের মতো বসে থাকো।'

'অ্যান, আমার যে খিদে পাচ্ছে।'

'তোমার আর কী কী পাচ্ছে একসঙ্গে বলে ফেল তো, আমার লক্ষ্মীসোনা।'

'ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে।'

'আর কী পেয়েছে? ঘুম পেয়েছে?'

'না ঘুম পাবার কোনও লক্ষণ নেই।'

'ক্ষিদে আমারও পেয়েছে। কোথায় খাওয়া যায় বলো তো?'

'কেন হোটেলে!'

'হোটেলে খাবে! শেষে খরচ সামলাতে পারবে? চল আমরা গানবাজনা লক্ষ্য করে এগোই। রাতের মাইফেল বেশ জমে উঠেছে। মনে হয় ওখানে খাবার পাওয়া যাবে।'

আমরা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। সামনে সেই পাথর বাঁধানো প্রান্তর। সেখানে ইতিমধ্যে আরও দু-একটি পরী উড়ে এসেছে। পরীর পুংলিঙ্গ কী! আমার জানা নেই। তারাও এসেছে। আমরা নিচে নেমে এলুম। বেশ কিছুটা অন্ধকারে হেঁটে এসে, আমরা একটা বাগান মতো জায়গায় এসে গেলুম। সামনেই একটা গুদামের মতো ঘর একটু উঁচুতে। বাঁপাশের খোলা জায়গায় ডজনখানেক ঝকঝকে মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতর সমুদ্রের মতন বাজনা বাজছে। মাঝে মাঝে বাইরে আছড়ে পড়ছে ঢেউয়ের মতো। ডানপাশে লম্বা একটা দোকান। সেই আগের মতোই ভেতরে মৃদু আলো জ্বলছে। সেই আলোয় থরে থরে সাজানো মায়া। দোকানের লম্বা ধাপ সাদা পাথরে

বাঁধানো। কোথাও এতটুকু আবর্জনা নেই। ধুলো নেই। বেলুড় মঠের মতোই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, তকতকে।

হলঘরের পাশটিতে চারটে চাকা লাগানো সাদা রঙের বৃহৎ একটি বাকসো। তার গায়ে স্প্যানিশ ভাষায় বড় বড় কী একটা লেখা রয়েছে। বাকসোটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। আড়চোখে অ্যানের দিকে তাকালুম। বোঝার চেষ্টা করলুম, এমন চেহারার ছেলেটিকে দেখে তার কোনও ভাবান্তর হচ্ছে কিনা! মেয়েদের যা হয়ে থাকে। অ্যানের কিছুই হয়নি। সে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, মেকসিকোর ছেলেমেয়েরা বড় সুশ্রী।

বাকসোটা একটা স্ন্যাকস কাউন্টার। নেচে-কুঁদে ক্লান্ত হয়ে, ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসে, বাকসোর সামনে ভিড় করছে, তরুণটি গরম গরম খাবার আর কোকাকোলা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ছেলেটির সামনে, অল্প দূরে এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। সে দাঁড়িয়েই আছে ; কিছু খাচ্ছে না। পরনে অতি দুঃসাহসী পোশাক। সংক্ষিপ্ততম স্কার্ট। অতি নিচু গলার ব্লাউজ। নর্তকীর মতো সুঠাম শরীর। কুচকুচে কালো, চকচকে চুলে নিপুণ খোঁপা। ফর্সা মুখটি যেন পদ্ম ফুলের মতো ফুটে আছে। চোখের যা স্বভাব! বারেবারেই মেয়েটির দিকে চলে যাচ্ছে। অকারণেই মন ভাবতে শুরু করেছে, মেয়েটি কে! কেন এখানে দাঁড়িয়ে! কলগার্ল নয়তো। মনকে এক ধমক লাগালুম, মন তুমি কেন পবিত্রতা হারাচ্ছ। মেয়েটি তোমার বিষয় নয়। তোমার বিষয় সমুদ্র, ইতিহাস, লুপ্ত সভ্যতা, ধ্বংসাবশেষ।

অ্যান আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'একটু চঞ্চল হয়েছ, তাই না!'

'হয়েছিলুম। সামলে গেছি।'

'ভেরি গুড। উইনার টেকস ইট অল।'

অ্যান সেই বিখ্যাত গানের কলিটি একবার গেয়ে উঠেই থেমে গেল। বললে, 'খাওয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে।'

'বাকসোর ভেতর থেকে কী বেরোচ্ছে, অ্যান?'

'হট ডগস, হ্যামবার্গার।'

'মাংস! অচেনা মাংস আমি খাবো না, অ্যান।'

'অত বাছবিচার করলে উপোস করে মরতে হবে। তুমি মাংস বাদ দিয়ে খোলসটা খাও।'

দুটো সুন্দর কাগজের প্লেটে তরুণটি অপূর্ব দক্ষতায় আমাদের খাবার পরিবেশন করল। আমরা দুটো বড় বোতল কোকাকোলা নিয়ে ডানপাশের দোকানের পাথরেব ধাপে পাশাপাশি হেলান দিয়ে বসলুম। তরুণটির সামনে আপাতত আর কোনও খদ্দের নেই। পরিষ্কার তোয়ালেতে হাত মুছে সে তরুণীটির দিকে এগিয়ে গেল, তারপর হাত দিয়ে বেষ্টন করে সে কী নিবিড় চুম্বন!

আনসেন্সারড্ ছবি দেখার মতো একটা অপরাধবোধে আমি চোখ সরিয়ে নিলুম। অ্যান বললে, 'বুঝতে পারছ, ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক?'

'আমি আর দেখছি না।'

'ও তুমি তো ভারতীয়। তোমাদের কাছে এসব অপরিচিত দৃশ্য। মেয়েটি হল ছেলেটির প্রেমিকা।'

ডিসকো সেন্টার থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। তার পোশাক আরও বিপজ্জনক। পোশাকের প্রতি কেন যে এদের এত অবহেলা! ভগবান সুন্দর শরীর দিয়েছেন বলে! মেয়েটিকে সামান্য সময় অপেক্ষা করতে হল; কারণ ছেলেটির আদর করা তখনও শেষ হয়নি।

আমাদের রাতের ডিনার জমে উঠেছে। দু'খণ্ড রুটির মাঝখান থেকে মালমশলা বের করে অ্যানের পাতে তুলে দিয়েছি। কোকাকোলার চুমুকের সঙ্গে মেকসিক্যান ব্রেড অমৃতের মতো লাগছে। অ্যান জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি তো বাইরের আবরণটাই খেলে, আত্মা তো আমার পাতে। পেট কি ভরল, না আরও গোটা দুই নোবো?'

'আমার পেটের একটা কোণাও ভরেনি।'

অ্যান কোলার বোতলটা রেখে উঠে গেল। বিক্রেতার প্রেমিকাটির চেয়ে অ্যান লম্বা। দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুণে অ্যানকে কত ভদ্র ও সংযত মনে হচ্ছে! প্রেমিকাটি শুধুই সুন্দরী। তার আলাদা কোনও ব্যক্তিত্ব নেই। শুধুই আদর খাওয়ার জন্যে পৃথিবীর এই সমুদ্রপ্রান্তে জন্মেছে, কি এসেছে।

আমাদের বিল হল বারো হাজার পেসো। হাজার হাজার সংখ্যা শুনে ঘাবড়ে যেতে হয়। আসলে পেসোর একসচেঞ্জ ভ্যালু ডলারের হিসেবে খুবই কম। তাই এই অবস্থা। বিশ্বের মুদ্রা ব্যবস্থায় পেসোর মর্যাদা খুবই কম। মুদ্রাদুনিয়ার দুটি স্তম্ভ, ডলার আর পাউণ্ড। বাকি সব চুনোপুঁটি।

অ্যান উঠে পড়ল, 'চলো এবার দুনিয়া দেখি।'

'তুমি তো বললে সমুদ্র দেখবে।'

'রাত আরও একটু গভীর হোক।'

'আর কত গভীর হবে গো। দুটো প্রায় বাজল।'

'দুনিয়ার এই অর্ধে দুটো মানে সন্ধে।'

অ্যান আবার আমার কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে লাগল। চলেছে ওই জগঝম্প সংগীত-ঘরের দিকে।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

'ডিসকো।'

'তোমার মাথা খারাপ! ওখানে কেউ যায়! পাগলের পাগলামি। তুমি কোনওদিন নেচেছ? নাচতে জানো?'

'নাচ জানার তো কোনও দরকার নেই। ওখানে কে আর নাচছে, সবাই তো শরীর দোলাচ্ছে। আমরাও দোলাবো।'

'অ্যান, তোমার আমার রুচিতে ও জিনিস সহ্য হবে?'

'অভিজ্ঞতা তো হবে। ভয় পাচ্ছ কেন। ভয়ের কী আছে। হোয়াইল ইন রোম বি এ রোমান। আরে আমি তো আছি তোমার পাশে।'

গোটা দশেক ধাপ ভেঙে আমরা সেই উঁচু হলঘরে প্রবেশ করলুম। লাল, নীল, হলুদ, সাদা রঙের আলোর চমকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ডানপাশে একটা কাউন্টার মতো, সেখানে বিস্ময়কর রকমের এক সুন্দরী বসে আছেন। তাঁর কাছে প্রবেশ দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থা। তাঁর দু'কানে দুটি ইয়ারিং-এ বিদ্যুৎচমক। দুটি ঠোঁট করমচার মতো লাল। দু'জনের জন্যে চল্লি হাজার পেসো জমা করে দিয়ে অ্যান আমার হাত ধরে নেমে পড়ল ফ্লোরে। সেখানে তিন ডজন সুন্দর আর সুন্দরীর পাগলামি চলেছে। তাদের চেহারা, বেশবাস, অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হল, পৃথিবীতে দেহ ছাড়া আর কিছু নেই। মোমের শরীর নৃত্য আর আলোর তালে যেন গলে গলে পড়ছে। প্রথমেই যে দুর্ঘটনা ঘটল, তা হল এক সুন্দরীর ভারী নিতম্বের ধাক্কায় আমি উল্টে পড়ে গেলুম। পড়ে হয়তো যেতুম না, পালিশ করা মেঝেতে পা হড়কে গেল।

অ্যান আমাকে হাত ধরে ওঠাতে ওঠাতে বললে, 'পড়েছে, বেশ করেছ, এখন মান-সম্মান বাঁচাতে নেচে নেচে ওঠ।'

নেচে নেচে ওঠা যায়! তবু চেষ্টা। আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতো শরীরটাকে এদিকে ওদিকে দোলাতে দোলাতে উঠে পড়লুম। হঠাৎ মনে হল, আমি কলকাতার ছেলে, কলকাতার রাস্তায় ঠাকুর বিসর্জনের কত ট্যুইস্ট-নৃত্য আমি দেখেছি, আমি নাচতে পারব না! মনে হওয়া মাত্রই আত্মবিশ্বাস এসে গেল। শুরু করে দিলুম ভূতের নৃত্য। অ্যান আমার পাশে সরে এসে বললে, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তালের দিকে নজর রাখ। ওয়ান, টু, ওয়ান, টু। কোমরের খেলা দেখাও। ওয়ান লেফ্‌ট, টু রাইট।'

তাল আর ছন্দটা ধরে ফেললুম। আমাদের চারপাশে বুক আর নিতম্ব নাচছে। মাঝে মাঝে স্যান্ডউইচ হয়ে যাচ্ছি। অ্যান তখন টেনে বের করে নিচ্ছে। সমস্ত শরীরই ঘামে পিচ্ছিল। রক্তস্রোতে আগুন ছুটছে। পেটে আড়াই বোতল কোকাকোলা গুপুক্ গুপুক্ করে গুপীযন্ত্র বাজাচ্ছে।

৫০

রাত প্রায় আড়াইটে তিনটের সময় আমরা ঘর্মাক্ত কলেবরে হোটেলে ফিরে এলুম। ভেবেছিলুম অ্যান বলবে, 'চলো দু'দন্ড বিছানায় গড়িয়ে আসি।' কোথায় কী। সে রকম কোনও প্রস্তাবই এল

না মেয়ের মুখ থেকে। আর বলব কী, হোটেল যেন গমগম করছে। সারা হোটেলে একজনও বৃদ্ধ কি প্রৌঢ় নেই। লিফ্‌ট নামছে, লিফ্‌ট উঠছে। নতুন নতুন মুখ। সবাই ছুটছে হোটেলের পেছন দিকে।

অ্যান বললে, কী হল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?'

'অনেক রাত হল।'

রাত হল তো কী হল! তোমারই বা কী, আমারই বা কী। এইবার আমরা সমুদ্র দর্শন করব। মহাসিন্ধুর শেষ রাতের বার্তা শুনবো।'

আমার আবার হাঁটতে শুরু করলুম। বাঁ পাশে দেয়ালে গাঁথা বিশাল অ্যাকোরিয়ামে ভয় পাইয়ে দেবার মতো নানারকম মাছ খেলছে। এক একটা মাছের চোখ দেখলে ভয় করে। মাছের চেয়ে মাছের চোখ বড়। ড্যাবাড্যাবা রাগী চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি মাছের চেহারা দেখে থেমে পড়েছিলুম। অ্যান হাত ধরে আলগা টান মেরে বললে, 'চলে এসো। তোমাকে আমি হিংস্র পিরহানা মাছ দেখাবো। সেই মাছের ঝাঁক এক ঘন্টার মধ্যে আস্ত একটা ঘোড়া খাবলে খেয়ে ফেলতে পারে।'

নারকেল কুঞ্জের পাশ দিয়ে, ব্রিজ পেরিয়ে আমরা সুইমিং পুলে এসে পড়লুম। চারটে বিশাল সুইমিং পুল পাশাপাশি। ফালি পথ চলে গেছে মাঝখান দিয়ে। মাঝামাঝি জায়গায় পথ নেই। কেটে এপাশে ওপাশে জল চলাচলের ব্যবস্থা। জলের ওপর একটা চারচৌকো পইঠা। লাফিয়ে পইঠার ওপর পড়তে হবে। সেখান থেকে লাফ মেরে পথে। মাঝারি মাপের একটা লাফ মারলেই হয়ে যায়, তবু একটা ভয় ভয় করছে। অ্যান হরিণীর মতো লাফ মেরে ওপাশে চলে গিয়ে, দু'হাত বাড়িয়ে বললে, 'চলে এসো।'

জায়গাটা এত সুন্দর। ঝিরিঝিরি নারকেলের পাতায় বাতাসের খেলা। চতুর্দিকে আলো। পরিচ্ছন্ন চার পাশ। ধবধবে রঙ করা সুইমিং পুলে একদল হোটেলকর্মী জল ভরছেন। পরিধানে হালকা নীল রঙের ইউনিফর্ম। কোথা থেকে জল আসছে জানি না। দুটো পুল ভরে গেছে। জল কানায় কানায় টলটল করছে। তৃতীয় আর চতুর্থটি চিনচিন করে ভরে উঠছে স্বচ্ছ পরিষ্কার জলে। যে-দুটো পুল ভরে গেছে, তার এপাশ এপাশ থেকে কর্মীরা ঝকঝকে লম্বা নলের মতো কী একটা যন্ত্র একবার করে ডোবাচ্ছে আর তুলে নিচ্ছে, আবার ডোবাচ্ছে। যে-মাথাটা ডোবাচ্ছে তার মুখে একটা ঝাঁঝরি লাগানো। কী কেরামতি হচ্ছে কে জানে!

আমার লাফটা জাম্বুবানের সমুদ্র উল্লঙ্ঘনের মতো বিশাল হয়ে গেল। সোজা অ্যানের ঘাড়ে। দু'জনেই টলে জলে পড়ে যাবার মতো হয়েছিলুম। অ্যান আমাকে জড়িয়ে ধরে শরীরের ভারসাম্য ঠিক করার অবকাশে বললে, 'তোমার কি সবই অদ্ভুত! তুমি কি ভাবলে লাফিয়ে প্যাসিফিক ক্রস করছ! দু'গত ডিঙোতে দু'শো হাতের এক পেল্লায় লাফ!'

'অ্যান, জলে ওরা কী যন্ত্র ডোবাচ্ছে?'

'ওইটা। জল ডিসইনফেক্ট করছে, কত যত্ন নিচ্ছে দেখছ!'

আরও কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। জায়গাটাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। এপাশে ওপাশে হাজার হাজার ঝকঝকে ডেক চেয়ার নিখুঁত করে সাজানো। পুল যেখানে শেষ, তার পাশে একটা চাঁদোয়ার তলায় কফি-বার। পাশ দিয়ে যেতে যেতে অ্যান বললে, 'বুঝতে পেরেছি, তোমার কফি খেতে ইচ্ছে করছে।'

'তোমার করছে না?'

অ্যান হেসে ফেলল। বিদেশী মেয়েরা ছেলেবেলায় চকোলেট খেয়ে খেয়ে দাঁত নষ্ট করে ফেলে। অ্যানের দাঁত খুব সুন্দর। বোধহয় নিম দাঁতন করে। সুইমিং পুলের দিকে মুখ করে আমরা দু'জনে দুটো চেয়ারে বসলুম। হাত পা ছড়িয়ে। কাউন্টারের কফি-বালিকা কাগজের গেলাসে কফি এনে দিলে। অ্যান বললে, 'তোমার গা থেকে তিন-চার রকমের সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে কেন? একসঙ্গে কত রকম মেখেছ?'

কোনও সেন্টই মাখিনি তো।'

'তাহলে?'

'আমার মনে হয় ওই ডিসকো থেকে নেচে আসার ফল। যে যতবার জড়িয়ে ধরেছে, তার গায়ের সুগন্ধ শরীরে ঝুলে আছে।'

'তোমার কেমন লাগল?'

'সবটাই দেহের ব্যাপার। মনের কিছু নেই।'

'ভন্ডামি করছ না তো!'

'মাইরি বলছি।'

'মাইরিটা কী?'

'ওটা আমাদের ভাষার একটা সোয়্যারিং।'

কফির গেলাস দুটো যথাস্থানে ফেলে দিয়ে আমরা উঠে পড়লুম। ডান পাশে কিছু দূর এগিয়ে তিন ধাপ সিঁড়ি। নামবো কি, শেষ ধাপে জল। জলে ভরা ছোট্ট একটা চৌবাচ্চা যেন। অবাক হয়ে অ্যানের মুখের দিকে তাকালুম। চৌবাচ্চাব ওপাশেই বেলাভূমি, ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। অনেক দূরে অন্ধকার আকাশের পটে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে।

জিজ্ঞেস করলুম, 'অ্যান, পা দেওয়ার জায়গায় এই কায়দাটা কী?'

'জুতো খুলে, হাতে নাও। এ হল জল-পাপোশ। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। সমুদ্র থেকে যখন আসবে পায়ে বালি লেগে থাকবেই। ভেতরে আসার সময় এই জলে পা ডুবিয়ে আসতেই হবে। এই ছোট্ট জলাধারটির জন্যে ভেতরটা কত পরিষ্কার রয়েছে দেখেছ!'

জুতো বগলে আমরা সি-বিচে নেমে এলুম। চারপাশ থেকে বড় বড় ফ্লাড লাইট ফেলে বেলাভূমি আলোকিত করে রাখা হয়েছে। বাঁ দিকে ভীষণ অন্ধকার। হোটেলের সীমানা ওইদিকে মনে হয় শেষ হয়ে গেছে। ওই দিকেই পড়ে আছে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত সেই বহুতল ভুতুড়ে বাড়িটি। অন্ধকারে যতটা দেখা যায় তাতে মনে হচ্ছে বেলাভূমি, ওইদিকে আর সমতল নেই। ভূকম্পনে ঢেউ খেলে গেছে। তাকাতেই ভয় ভয় করছে। ঢেউ যখন বিকট গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন সাবানের মতো সাদা ফেনা আকাশের দিকে বহুদূর পর্যন্ত ঠিকরে উঠছে। আলোকিত দক্ষিণ দিকে যত দূর দৃষ্টি যায়, দুগ্ধশুভ্র সৈকতভূমি, ধনুকের মতো পড়ে আছে। ওদিকে পরপর অনেক হোটেল। ওদিকেই আছে টেনিস কোর্ট, গল্‌ফ কোর্স। অ্যান বললে, 'এসো, দুটো মোচা টেনে নিয়ে খানিক শুয়ে থাকি। বড় মিঠে বাতাস।' মোচাই বটে। পরপর, পরপর ফাইবার গ্লাসের বড় বড় ডিঙ্গি পড়ে আছে পাশাপাশি। একটাকে ধরে টানতে গেলুম। বেজায় ভারী। আমার অসহায় অবস্থা দেখে অ্যান এগিয়ে এল। আমি বললুম, 'কী ভারী গো!'

অ্যান বললে, 'হ্যামবার্গারের আত্মা বাদ দিয়ে শরীরটুকু খেলে, ভারী তো লাগবেই খোকা। সরো, সরে এসো।'

'আমি এদিকটা ধরি।'

'কোনও দরকার নেই। এক টানে আমি নামিয়ে আনছি।'

দুটো মোচা পাশাপাশি টেনে এনে, অ্যান বললে, 'নাও চিৎপটাং হও।'

চিৎ হয়ে শোওয়ার পক্ষে জিনিসটা বেশ ভালোই। মাথাটা উঁচুতে রইল। বাকি শরীরটা গড়িয়ে নেমে গেল নিচের দিকে। শুয়ে শুয়ে সমুদ্র দেখছি। বেলাভূমির বিস্তার দেখছি। মাথার ওপর মেকসিকোর আকাশ দেখছি। আবার বাঁ পাশে ঘাড় ঘোরালে অ্যানকে দেখছি। সুন্দর সুডৌল মুখ। সুগঠিত চিবুক। আর্য নাসিকা। টানা চোখ। চোখ দুটোর বেশ বুদ্ধি দীপ্ত বাহার আছে। নরম কাপড়ের ফ্রক পরে আছে। লম্বা দুটো পা একটু আগের নৃত্যের ক্লান্তিতে এখন টান টান স্থির। জুতো নেই পায়ে। ধবধবে পাতা দুটো ফ্লাড লাইটের বিচ্ছুরিত আলোয় কেমন যেন অলৌকিক দেখাচ্ছে। অ্যানের চোখ দুটো খোলা। প্রায় ধ্যানস্থ। কথা বলার সাহস হল না।

আমাদের বাঁ দিকে হাত দশেক দূরে বসে আছে দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। শীত নেই তবু তারা আগুন জ্বেলেছে। একটি ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্প্যানিশ গিটার বাজাচ্ছে। মেয়ে দুটি খুব হাসছে। আর একটি ছেলে আগুনে কী একটা ঝলসাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার পর অ্যানকে প্রশ্ন না করে থাকা গেল না।

'অ্যান, তোমার ওপাশে আগুন জ্বেলে ওরা কী করছে!'

'জীবন উপভোগ করছে। ওকে বলে বিচ-ফায়ার।'

'কী ঝলসাচ্ছে, খরগোস?'

অ্যান ঘুরে তাকাল, 'ভুট্টা ঝলসাচ্ছে। কর্ন।'

'ভুট্টা? এখানেও ভুট্টা।'

'এটা তো ভুট্টারই দেশ। গল্প শুনবে? ভুট্টার গল্প?'

আমি উঠে বসলুম। বিদেশে সমুদ্রের ধারে শেষ রাতের গল্পের মতো জিনিস আছে? মোচার খোলে ঠিক মতো বসা যায় না। আমি নেমে শায়িত অ্যানের পাশে, ভুসভুসে বালিতে বসলুম, থেবড়ে। আমার আধ হাত দূরে অ্যানের মুখ। সুগঠিত কপালের ওপর চুল উড়ে উড়ে পড়ছে। হালকা নিঃশ্বাসে নরম জামাব তলায় নবম বুকের ওঠাপড়া। পরিষ্কার সামুদ্রিক বাতাস, দামী হুইস্কির মতো নাকে ঢুকছে। স্পেশ্যাল সাইজেব গোটা চারেক তারা আকাশে থমকে আছে। ডানপাশে আরও চড়া আলোয, একেবাবে জলের কিনারায় একটা ছেলে আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘনিষ্ঠ হয়ে। তাদের পায়ের ওপর ঢেউ ভেঙে পড়ছে।

এত বড় ঢেউ বর্ষার পুরীর সমুদ্রেও দেখিনি। ঢেউ ভাঙার কায়দাটাও বড় অদ্ভুত। দূর থেকে আসছে আসছে, হঠাৎ একটা কাছাকাছি জায়গায় এসে, কামান গর্জনের মতো শব্দ করে লাফিয়ে উঠছে। বিশাল লাফ। প্রায় তিন চার তলা বাড়িব মতো। বাতাসে সামান্য দোল খেয়ে আছড়ে পড়ছে তটে। তখন এক সাংঘাতিক শব্দ। সমুদ্রের হিসেবে কোনও ভুল নেই। ঢেউ যেন ওলিম্পিকের এক একটি হার্ডল চ্যাম্পিয়ান। কোথায় হঠাৎ থেমে পড়ে নিখুঁত একটি লাফ মারতে হবে নির্ভুলভাবে জানে। ঢেউ নয় তো, মায়ের কোলে ছুটে আসা দামাল দস্যি ছেলে। জানে, যে-ভাবেই আছড়ে পড়ুক না কেন, মায়ের কোল পাবেই।

অ্যান বললে, 'তোমাব পকেটে রুমাল আছে?'

'আছে। পরিষ্কার। দোবো তোমাকে?

'দিতে হবে না, রুমালটা পুরো খুলে আমার মুখটা ভাল কবে মুছিয়ে দাও, ভীষণ চটচট করছে। মেয়েদের সেবা করতে শেখ। তোমাদেরই শাস্ত্রেই বলে না, মেয়েরা হল দেবী।'

রুমালটা খুলে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অ্যানের মুখে চাপ দিলুম, তারপর বিউটি পারলাবে কোলন ভেজান নরম তোয়ালে দিয়ে যেভাবে মোছায়, সেইভাবে মুছিয়ে দিলুম। রুমালের তলা থেকে অ্যান বললে, 'ঠিক হচ্ছে। বেশ হচ্ছে। একে বলে আয়েস করা। বুঝলে কিছু।'

রুমালটা তুলে নিয়ে গালে আঙুল একটা রাখলুম। না. আর চটচট করছে না। নাচতে গিয়ে আমরা ঘেমেছিলুম। তাইতে জড়িয়ে গেছে সমুদ্রের বাতাসের লবণ। আমাদের বাঁ পাশে ছেলেটি মশগুল হয়ে গিটাব বাজাচ্ছে। যে ছেলেটি বসেছিল, সে তার সঙ্গী দুটি মেয়ের, সবচেয়ে স্বাস্থ্যবতী যে তাকে জড়িযে ধরে বালিতে শুয়ে আছে। যে মেয়েটি বসে আছে, সে ভুট্টা খাচ্ছে। জানি, প্রশ্ন করলেই অ্যান বলবে, দিস ইজ লাইফ। ওদিকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে স্নানকারীদের শরীর উঠছে আর পড়ছে। ফ্লাড লাইটের আলোর আভায় অস্পষ্ট হলেও বোঝা যায়, অনেকেই স্নান করছেন। ঢেউ যে জাযগায় আছড়ে পডছে, সেখানে সার্চ লাইটের আলোয় মনে হচ্ছে দুধ ফুটছে। সেই ফেনার রেখা ধরে অনেকে হেঁটে চলেছেন দূরের দিকে, স্বপ্ন-পথিকের মতো। সমুদ্রের পেছনে শেষ রাতের গাঢ় বেগুনী আকাশ মোটা পর্দার মতো ঝুলে আছে। অ্যানকে ধন্যবাদ। বিছানায় পড়ে থাকলে এ-দৃশ্য দেখা সম্ভব হত না। একেই বলে, স্বপ্নে জেগে ওঠা।

অ্যান ছিলাটান ধনুকের মতো মোচার খোলায় উঠে বসল। হাঁটু দুটো দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মেয়েলি ঢঙে বসেছে। ধনুক পিঠে ছড়িয়ে আছে ফুরফুরে সোনালি চুল। অ্যান মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'তোমার চারপাশের মনোরম দৃশ্য দেখা শেষ হয়েছে? আমি অমনোযোগী শ্রোতা পছন্দ করি না।'

'আমি চরম মনোযোগী।'

'তাহলে শোনো। ভুট্টা, বা ইন্ডিয়ান কর্নের জন্মকথা।'

'তাব আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। রাগ কোরো না বাবা। তোমার বাঁপাশে আগুনের

সামনে দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে।' 'তাই তো! একটি ছেলে একটি মেয়েকে কেমন আদর করছে। আর একটি মেয়ে মন খারাপ করে বসে আছে। গিটার ফেলে ওই ছেলেটির উচিত নয় কি, ওই মেয়েটিকে আদর করা। কেন করছে না, অ্যান?'

'যাই জিজ্ঞেস করে আসি।' অ্যান হেসে উঠল। সমুদ্রের বাতাস আর ঢেউয়ের শব্দের সঙ্গে মিশে গেল হাসির জলতরঙ্গ। অসাধারণ অর্কেস্ট্রা, যা কোনও হলে টিকিট কেটে, ফরমায়েশ মতো শুনতে পাওয়া যায় না।

বুড়ো বয়েসে গল্প শোনার নেশা। আমরা এখন আর বুড়ো নই। স্বর্গের উদ্যানে দুটি শিশু। সামনে মহাসমুদ্র। আমি একবার একটু চেষ্টা করলুম। সুরেলা গলা করে গাইবার, 'প্রভু হাসিছ, খেলিছ, এ বিশ্বলয়ে, বিরাট শিশু আনমনে।' হাঁটুর উপব চিবুক রেখে, অ্যান মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। মনে হয় ভাল লেগেছে। মুচকি হেসে বললে, ভাবী নরম সুব। মানেটা কী?

মানেটা বুঝিয়ে দিলুম। মেয়েটা বেশ তন্ময় হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ভাবস্থ থেকে বললে, 'কী সুন্দর'। তুমি আমাকে সৃষ্টির দোরগোড়ায় বসিয়ে দিলে। সেই ইটারন্যাল চাইলড! যাব খেলা আজও শেস হল না। আমরা আসি, হেসে কেঁদে চলে যাই। আবার আসি আবাব যাই। এক নাটক থেকে আর এক নাটকে। জীবন থেকে জীবনে। এক সময় থেকে আব এক সময়ে।'

'তোমাদের এই সব ভাব আসে?'

'কেন আসবে না। আমেরিকানরাও তো মানুষ না কী! তুমি ওয়াল্ট হুইটম্যান পড়েছ?'

'থোড়াথোড়া।'

'মনে আছে সং অফ মাইসেলফ-এর সেই জায়গাটা, একটি শিশু প্রশ্ন কবল, ঘাস কী জিনিস? আমার সামনে তার হাতের মুঠো মেলে ধরল, এক মুঠো ঘাস। শিশুকে আমি কী উত্তব দেবো। আমি তার চেয়েও কি বেশি কিছু জানি! হতে পারে সবুজ আশা দিয়ে বোনা আমার প্রকৃতির পতাকা; কিংবা হতে পারে, এই হল আমার প্রভুর রুমাল। গন্ধমাখা একটি দান, একটি স্মাবক ইচ্ছে করে ফেলে দেওয়া। এক কোণে তাঁর নামটি লেখা, যাতে আমরা দেখতে পাই, বলতে পারি এ কার রুমাল? হতে পারে, প্রতিটি ঘাসের ফলা হল এক একটি শিশু, পুষ্পেব শাবক।'

'হুইটম্যান তোমার মুখস্থ!'

'আমেরিকার অতি প্রিয় কবি। আমাদের চোখে এখন আর প্রকৃতি নেই। আছে ভোগ। মুরগী দেখে প্রভুর কথা মনে পড়ে না, মনে পড়ে রোস্টের কথা। ওই যে ছেলে আর মেয়েটি ভুট্টা পুড়িয়ে খাচ্ছে, ওরা কি এই মেকসিকে: ভুট্টার অবতরণের গল্পটা জানে? লিজেণ্ড অফ ইন্ডিয়ান কর্ন!'

'প্লিজ বলো।'

'এই কাহিনীটি উদ্ধার করেছিলেন আমেরিকার আর এক কবি লংফেলো। তিনি পেয়েছিলেন দি লিজেণ্ড অফ মনডাওমিন-থেকে। তার অর্থ দি ওরিজিন অফ ইণ্ডিয়ান কর্ন। এই দেশেরই সুন্দব এক অঞ্চলে বসবাস করত দরিদ্র এক ইন্ডিয়ান। তার স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে। সে শুধু দরিদ্র ছিল না, পরিবার পরিজনের জন্যে আহারাদি সংগ্রহেরও মুরোদ ছিল না। ছেলেরাও খুব ছোট। বাবাকে সাহায্য করবার মতো বয়েস তাদের তখনও হয়নি। দরিদ্র হলেও লোকটি ছিল দয়ালু ও সদাসন্তুষ্ট ধরনের। সে যখনই যা পেত, যতটুকু পেত তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাত মহাশক্তিকে, সেই গ্রেট স্পিরিটকে, যাঁর কৃপা ছাড়া জীবন বাঁচে না পৃথিবীতে। দিন যায়। যায় দিন। বড় ছেলেটি ক্রমে সাবালক হল। স্বভাবে সে বাবার মতোই হল। বাবার মতোই দয়ালু। পরাশক্তিতে বিশ্বাসী। তার যা বয়েস, তাতে সে এখন কে-ইগ-নিশ-ইম-ও-উইন ক্রিয়াটি করতে পারে।'

'সে আবার কী! কী বললে কে-ইগ-নিশ……।'

'মানে উপবাস। উপবাসে দিনের পর দিন থেকে সে জেনে নিতে পারবে, সেই মহাশক্তির কোন শক্তি হবে তার মিত্র, তার অভিভাবক, তার পথপ্রদর্শক! ছেলেটির নাম ছিল য়ুনঝ। ছেলেবেলা থেকেই, সে ছিল তোমার মতোই বাধ্য, ভাবুক, চিন্তাশীল, মৃদু স্বভাবের।'

'আমার মতো?'

'তুমিও তো ছেলেবেলায় ওইরকমই ছিলে। বলো ছিলে কিনা?'

'বড়রা অবশ্য বলত, মিটমিটে শয়তান।'

'সে অমন বলে। আমি জানি তুমি ছিলে লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে। তা য়ুনঝকে তার বাবা, মা ভাই বোন সবাই ভালবাসত। বসন্ত আসছে দেখে, তার পরিবারের সকলে নির্জন একটা জায়গায় তার জন্যে ছোট্ট একটা কাঠের ঘর তৈরি করে দিল যাতে তার দীর্ঘ উপবাসের সময় কেউ না বিরক্ত করতে পারে। ঘর তৈরি হতে হতে য়ুনঝ উপবাসের জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল। তারপর ঘর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বসে পড়ল তার অনুষ্ঠানে।

'উপবাসে থাকার প্রথম কয়েকটা দিন, সে খুব ভোরে উঠে বনে বেড়াতে যেত। বেড়াতে বেড়াতে চলে যেত দূরের পাহাড়ে। এই সময়ে সে বছরের প্রথম চারা, গুল্ম, লতা, ফুল পরীক্ষা করে করে দেখত। নিজেকে তৈরি করত রাতের মধুর নিদ্রার জন্যে।·····

উপবাসে থাকার সেই প্রথম ক'দিন য়ুনঝ মনে সংগ্রহ করে নিত সুন্দর সুন্দর ভাব যাতে রাত্রে নিদ্রার সময় সে মধুর সব স্বপ্ন দেখতে পাবে। বনে ঘুরতে ঘুরতে তার ভীষণ জানার ইচ্ছে হত, কেন এমন হয়, কিভাবে চারাগাছ বড হয়ে ওঠে, কিভাবে ঔষধি বড় হয়। কিভাবে বেরি জন্মায়। মানুষের কোন চেষ্টা ছাড়াই প্রকৃতিতে এই সব অবাক কান্ড কি করে ঘটে চলেছে। কিছু অতি সুস্বাদু, কিছু ওষুধের গুণে ভরপুর, কিছু কিছু আবার মারাত্মক বিষ। দেখতে দেখতে উপবাসে তার শরীর ক্ষীণ হয়ে এল। আর সে উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে না। তার কাঠের কুঠরিতে বসে শুধু ভাবে আর ভাবে। কেন এমন হয়! সেই গ্রেট স্পিরিট সব কিছুর স্রষ্টা, তিনিই আমাদের সাহায্য করছেন জীবন ধারণে তিনি কি আমাদের আর একটু সহজভাবে বাঁচায় সাহায্য করতে পারেন না! বাঁচার জন্যে আমাদের শিকারের পেছনে ছুটতে হয়। মাছ ধরে খেতে হয়। আমি আমার স্বপ্ন দর্শনে সেই উপায়টাই খুঁজবো।

'উপবাসের তৃতীয় দিনে যুবকটি আর উঠতে পারে না। সেই অবস্থাতেই বিছানায় পড়ে পড়ে নানারকম কাল্পনিক দৃশ্য দেখতে থাকে। প্রথমে দেখল সুন্দর পোশাক পরা সুন্দর এক যুবক নেমে এল আকাশ থেকে। যুবকটি ধীরে ধীরে তার সামনে এসে দাঁড়াল। সবুজ আর হলুদে মেশানো তার পরিচ্ছদ। সবুজেরই কত রকম। হলুদেরও নানা ভেদ। তার মাথায় গোঁজা অসংখ্য বর্ণের পালক। বাতাসে দুলছে। তার চলার ধরনটিও ভারী সুন্দর।

'সেই গগনচারী মিষ্টি গলায় বললে, বন্ধু, আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। পাঠিয়েছেন সেই মহাশক্তি, যিনি ওই আকাশ ও এই যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহের স্রষ্টা, যিনি এই পৃথিবীর সৃজনকারী। তোমার এই সাধনা তিনি দর্শন করেছেন। তিনি জানেন তুমি কিসের অন্বেষণে আজ উপবাসী। তিনি দেখেছেন, তুমি তোমার স্বজন-পরিজনের উপকারের জন্যে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। তুমি যুদ্ধের জন্যে শক্তি চাও না, যোদ্ধাদের জন্যে প্রশস্তিও ভিক্ষা করছ না। আমি এসেছি তোমাকে পথ দেখাতে। তোমাকে উপদেশ দিতে, কী করলে, তুমি তোমার আত্মীয়-পরিজনের মঙ্গল করতে পারবে।'

'সেই দিব্য যুবক তখন য়ুনঝকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানাল। আমাকে তোমার শক্তি দিয়ে পরাভূত কর। উপবাস ক্লিস্ট য়ুনঝ বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না, তো লড়বে কি। তবু অসীম মানসিক শক্তির বলে সেই দিব্য পুরুষের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে এগিয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ মল্লযুদ্ধের পরে য়ুনঝ পরাভূত হল। দুর্বল দেহ নিয়ে সে আর পেরে উঠল না। দিব্য যুবক স্বর্গীয় হাসি হেসে বললে, 'বন্ধু, আজকের জন্যে এই যথেষ্ট। আজ থাক। আমি আবার পরে আসব।' সে আবার আকাশের দিকে উঠে গেল।

পরের দিন সেই একই সময়ে সেই দিব্য যুবকের আবির্ভাব হল। শরীরের দিক থেকে, য়ুনঝ সেদিন আরও দুর্বল। শরীর উপবাসে যত দুর্বল হচ্ছে মনের শক্তি কিন্তু ততই বাড়ছে। আবার মল্লযুদ্ধ। এবারেও য়ুনঝ হেরে গেল। দিব্য পুরুষ স্বর্গীয় হাসি হেসে বললে, 'আজও আমি চলে যাচ্ছি, তবে কালই হল শেষ পরীক্ষার দিন। শক্তি সঞ্চয় করো বন্ধু, শক্তি দিয়ে আমাকে হারাতে না পারলে, তুমি বর পাবে না। আমাকে হারাতেই হবে।'

তৃতীয় দিনে ঠিক একই সময়ে তার আবির্ভাব হল। য়ুনঝ সেদিন আরও ক্ষীণ; কিন্তু প্রতিটি যুদ্ধের পরই তার মনের শক্তি উত্তরোত্তর বাড়ছে। য়ুনঝ শেষ লড়াইয়ে এই মন নিয়ে নামল,

হয় মরবে না হয় জিতবে। এর মাঝামাঝি কোনও কিছুর সঙ্গে রফা করবে না। লড়াইয়ে সে তার মনের সর্বশক্তি নিয়োগ করল। নির্দিষ্ট সময় ধরে মরণপণ লড়াইয়ের পর দিব্য যুবক বললে, ক্ষান্ত হও, তুমিই জয়ী। সেই দিনই সে প্রথম তার কুটীরে প্রবেশ করল। য়ুনঝ-এর পাশে বসে বলল, 'শোনো, এই জয়ের ফল পেতে হলে তোমাকে এরপর কী করতে হবে। সেই মহাশক্তি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তোমার ইচ্ছা তিনি পূরণ করবেন। তুমি বীরপুরুষের মতো আমার সঙ্গে লড়াই করেছ। কাল তোমার উপবাসের সপ্তম দিন। তোমার পিতা কাল তোমার জন্যে খাবার আনবেন। সেই খাদ্যগ্রহণের পর তোমার শরীরে জোর আসবে। আর কালই তোমার সঙ্গে আমার সর্বশেষ লড়াই হবে। এও জানি তুমি অবশ্যই জিতবে। এখন শুনে রাখ, তারপর তোমাকে কি করতে হবে! তার উপরেই নির্ভর করছে তোমার পরিবারের, তোমার গোষ্ঠীর মঙ্গল। কাল আমি পরাভূত হব, তুমি একে একে আমার সব পোশাক খুলে নেবে, তারপর আমাকে ফেলে দেবে মাটিতে। এক টুকরো জমি খুব ভালভাবে পরিষ্কার করবে। কোনও শিকড় বা আগাছা যেন না থাকে। জমিটাকে নরম করে সেই জমিতে আমাকে পুঁতে দেবে। আমাকে ওইভাবেই থাকতে দেবে। কোনও ভাবে আমাকে আর বিরক্ত করবে না। মাঝে মাঝে আসবে, এসে দেখে যাবে আমার সমাধি। দেখবে আমি বেঁচে উঠছি কি-না। আর একটা ব্যাপারে সাবধান হবে, ঘাস বা কোনও আগাছা আমার সমাধির ওপর জন্মাতে দেবে না। মাসে একবার আমার সমাধির ওপর ছড়িয়ে দেবে টাটকা মাটি। আমার এই নির্দেশ যদি তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারো তবেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে। তোমার সমাজের মঙ্গল করতে পারবে। তাদের শেখাতে পারবে আমার দেওয়া জ্ঞান। এই কথা বলে দিব্যপুরুষ করমর্দন করে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'অ্যান, তোমার এই গল্পের সঙ্গে ভুট্টার কী সম্পর্ক?'

'তোমার সঙ্গে আমার কী চুক্তি হয়েছিল। মন দিয়ে শুনবে, প্রশ্ন করবে না। তোমার কি শুনতে ভাল লাগছে না?'

'খুব লাগছে।'

'তাহলে শেষটুকু শোনো। উপবাসের সপ্তম দিনের সকালে য়ুনঝ-এর বাবা ছেলের জন্যে হালকা কিছু খাবার নিয়ে এলেন। ছেলেকে বললেন, পুত্র আমার, অনেকদিন তুমি উপবাসে আছ। মহাশক্তি যদি দয়া করতে চান, তাহলে এখনই তিনি করবেন। সেই সাতদিন আগে তুমি শেষ আহার গ্রহণ করেছিল। তারপর তুমি আর কিছুই গ্রহণ করোনি। তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করো না। স্রষ্টা তোমার বিনাশ চান না।

যুবক বললে, 'পিতা, সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। ওই সময় পর্যন্ত উপবাস চালাবার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে আমার। পিতা বললেন, ঠিক আছে পুত্র আমার। ওই সময়কাল পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।

'যথা সময়ে দিব্য যুবকের আগমন। অনাহারে যুবক য়ুনঝ আরও ক্ষীণ; কিন্তু মনের শক্তিতে সে আরও প্রবল। প্রবলতর। শুরু হল মল্লযুদ্ধ। দিব্য যুবক পরাভূত ও মৃত হল। নির্দেশমতো তার সব কিছু খুলে নিয়ে সমাহিত করা হল। দিব্য পুরুষ ঠিক যেমনটি বলেছিলেন,। ঠিক সেইভাবে য়ুনঝ তার সাধনকুটির ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেল। সামান্য কিছু খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করল। সে কিন্তু তার সমাহিত বন্ধুর কথা ভুলতে পারল না। সারাটা বসন্ত সে ফিরে ফিরে যায় সমাধির কাছে। ঘাস, আগাছা পরিষ্কার রাখে, জমি ঝুরঝুরে করে। দেখে মাটি যাতে নরম থাকে। তারপর একদিন দেখে কি, জমি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য সবুজ শিস। য়ুনঝ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। দিব্য বন্ধুর নির্দেশমতো জমির পরিচর্যা করে। শিসের ডগা চরচর করে বেড়ে উঠতে থাকে। য়ুনঝ কিন্তু তার পিতাকে কিছুই জানাল না। গোপন করে গেল।

'দিন যায়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায়। গ্রীষ্ম প্রায় শেষ হতে চলেছে। য়ুনঝের পিতা দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর শিকার থেকে সবে ফিরেছেন। য়ুনঝ হঠাৎ একদিন পিতাকে নিয়ে এল সেই শান্ত, নির্জন উপবাসস্থলে। কুটির আর নেই। বৃত্তাকার একখণ্ড জমি। ঘাস আর আগাছার বেড়া ঘেরা পরিষ্কার একখণ্ড জমি আর সেই জমিতে দাঁড়িয়ে আছে হিলহিলে, সবুজ, সুন্দর একটি উদ্ভিদ।

উজ্জ্বল, সোনালি রঙের কেশ ঝুলছে চারপাশে, বাতাসে দুলছে পুচ্ছের মতো শিখা, রাজকীয় পত্রসম্ভার, দু'পাশে স্বর্ণকান্তি গুচ্ছ।

ছেলেটি আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'এই তো আমার সেই দিব্য লোকের বন্ধু। আমার বন্ধু শুধু নয়, সমগ্র মানবজাতির বন্ধু। এই সেই মনডাওমিন। ভুট্টা। আর আমাদের শুধু মাত্র শিকারের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করতে হবে না। ঈশ্বরের এই দানকে যদি আমরা রক্ষা করতে পারি, মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে আর বনের পশু নয়, পৃথিবীর ভূমিই আমাদের পালন করবে।

'ছেলেটি গাছ থেকে একটি শিস ছিঁড়ে নিল। ভুট্টার দানা মুক্তোর মতো সাজানো দাঁত মেলে যেন হাসছে। পৃথিবীর প্রথম ভুট্টার শিস। সফল হয়েছে আমার উপবাস, আমার অনুষ্ঠান, দিব্যশক্তি আমার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন, আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন নতুন দান, আর মানুষকে নির্ভর করতে হবে না শুধুমাত্র শিকার আর জলের ওপর।'

'যুবকটি তখন তার পিতাকে জানাল, দিব্যনির্দেশ। মল্লযুদ্ধে পরাভূত করার পর নির্দেশ ছিল গা থেকে বিচিত্র বর্ণের পোশাক টেনে ছিঁড়ে ফেলার। ছেলেটি ভুট্টার শিসের আবরণ টেনে ছিঁড়ে ফেলল। পিতা দেখলেন। অনাবৃত শিসটি আগুনের সামনে ধরে দেখাল। ধীরে ধীরে কেমন বাদামি হয়ে আসছে। ভুট্টার দানার বাদামি আবরণের ভিতর মজুত থেকে গেল শস্যের দুধ। শুরু হয়ে গেল উৎসব। আগুনের চারপাশে সমবেত হল পরিবার-পরিজন। দৃশ্যটা একবার ভেবে দেখ। হাজার, হাজার, হাজার বছর আগে, এই ভূখণ্ডেরই নিভৃত এক অঞ্চলে সমবেত হয়েছে শিকারী মানব, তারা আস্বাদন করছে সম্পূর্ণ নতুন এক খাদ্য, পৃথিবীব ভুট্টাদানা। আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে!'

'আমার কথাটা শিখে ফেললে?'

'আমার মাথা আছে! কি বলো! কেমন শোনালুম তোমাকে গল্পটা! একটা কথা জেনে রাখ আমরা আমাদের কালের সভ্যতার যত বড়াই করি না কেন সেই দূর অতীতের অরণ্যচারী মানুষ যা করে গেছে, তাদের সেই অবস্থায়, ভাবলে অবাক হতে হয়। সময় সময় ভাবনাও স্তব্ধ হয়ে যায়। কী করে কী হল! আমরা এমন একটা দেশে এসে পড়েছি যার ওপর ঝুলে আছে রহস্যের এক বলয়। এখানকার ইতিহাস যেন ভোজবাজির ইতিহাস। সভ্যতা একটা চরম অবস্থায় এসে বেমালুম বেপাত্তা। এই দেখ না, আমাজোনের নরকের মতো জঙ্গলে যারা বসবাস করত তাদের আমরা অসভ্য, অনগ্রসরই বলব, অথচ তারা চাষবাষ শিখেছিল। তারা ম্যানিউক নামে একটি সব্জীর চাষ করত। আর এক নাম কাসাভা। কী সাংঘাতিক জিনিস জান, সম্পূর্ণ বিষাক্ত এক ধরনের গাছ। যাতে আছে হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড। এই সব্জী রান্নার কায়দাটা একমাত্র তারাই জানত। তুমি, আমি চেষ্টা করলে, খাওয়ামাত্রই মৃত্যু। ওরা সেই কাসাভার শিকড় থেকে বিষটা কায়দা করে বের করে দিয়ে পুষ্টিটা গ্রহণ করত। আবার নাচগানের সময় বা উপভোগেব সময় যখন উত্তেজনার প্রয়োজন হত তখন সামান্য একটু বিষ রেখেই রান্না হত। আবার অস্ত্রের মুখে বিষ হিসেবে মাখিয়ে হত্যার কাজেও লাগানো হত। একটি গাছ, তার তিন রকম ব্যবহাব, পুষ্টিকর আহার, উত্তেজক আবার মারাত্মক বিষ। তারা বলত ডেমা। ডেমার রহস্য। সে সব গল্প তোমাকে আমি বলব।'

আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। বাঁপাশের বিচফায়ার নিবে এসেছে। বাতাসে নেবা আগুনের ফুলকি বেলাভূমির ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ছেলেটি গিটার রেখে সটান শুয়ে পড়েছে। মেয়েটি হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। সমুদ্রের সমান অক্লান্ত গর্জন তটভূমির মানুষকে ধমকাচ্ছে।

অ্যান উঠে দাঁড়ল। মাথার ওপর দু'হাত টানটান করে শরীরকে ডাইনে বাঁয়ে মোচড়ালো। মাথার চুলে ঝাঁকি দিল। বাতাসে তার রেশমি চুল উড়ছে। অ্যান বললে, 'চলো সমুদ্রে নামার সময় হয়েছে।'

'সমুদ্রে? ওই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে!'

অ্যান আমার হাত চেপে ধরল, 'হ্যাঁ গো, ওই সমুদ্রে। চলো নাকানিচোবানি খেয়ে আসি।' আমাকে টানতে টানতে অ্যান সমুদ্রের দিকে নিয়ে চলল। যেন বলির পাঁঠা হাড়িকাঠে চলেছে। সমুদ্র নয় তো যেন বিশাল এক মুষ্টিযোদ্ধা। বেজায় একটা ঘুসির মতো ঢেউ এসে তটের

মুখে পড়ছে। সাদা ফেনা গরম দুধের মতো ফুটতে ফুটতে আমাদের দু'জনের পায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো কিছু নয়। ঢেউ যখন উঠছে, তখন ঘাড় পেছন দিকে হেলে যাচ্ছে। টুপি খুলে পড়ে যাওয়া বিশাল অট্টালিকার কথা শুনেছি। টুপি খুলে পড়ে যাওয়া বিশাল ঢেউয়ের কথা শুনিনি; চোখে দেখছি। এমন বলশালী ক্রোধী জলবিস্তার আগে দেখিনি। সমুদ্রের তলভাগ উঁচু হলে এমন হতে পারে। আমার সে গবেষণায় প্রয়োজন নেই।

অ্যান বললে, 'চলো নেমে পড়ি। জামাটা খুলে প্যান্টটা গুটিয়ে নাও।'

'তুমি আমাকে মাপ করে দাও। এ যা ঢেউ এক ঘুসিতে আমার দাঁত কপাটি খুলে ফেলে দেবে।'

'তোমার লজ্জা করছে না! ওই দেখ গোটাপাঁচেক বালক-বালিকা ঢেউয়ের মাথায় হিপির মতো নাচছে। আর তুমি ভয়ে মরছ।'

'বাচ্চাদের হাড়গোড় নরম ভাই। ওদের আছড়ে ফেললেও কিছু হবে না। জানো, আমাদের পাড়ার বোকাদা পুরী গিয়েছিল। ফিরে এল পুটলি বাঁধা তার হাড়গোড়। মালকোঁচা মেরে সমুদ্রে নেমেছিল। কোনও নুলিয়া টুলিয়া নেয়নি। প্রথম ঢেউ তুলে নিয়ে মারলে আছাড়। দ্বিতীয় ঢেউ টেনে নিয়ে গেল। তৃতীয় ঢেউ আবার তুলে আছাড়। শরীরের সব খিল খুলে গেল। গিয়েছিল বীরপুঙ্গব, ফিরে এল ঝুলঝুলে নাচের পুতুল হয়ে। তুমি ভাই আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

'তোমার বোকাদা বোকা ছিল। সমুদ্রে স্নান আর স্কিপিং এক ব্যাপার। ঢেউয়ের সঙ্গে ওঠা, ঢেউয়ের সঙ্গে নামা। সিনক্রোনাইজেশান। নাও চলো। আরে ম্যান, আমি তোমার পাশে আছি। তোমার হাত ধরে থাকবো। তোমাকে আমি মরতে দোব না।'

আমরা যখন কথা বলছি দু'জনে তারই মধ্যে আমাদের পাশ দিয়ে কত যে বীর অকুতোভয়ে সমুদ্রে গিয়ে নামল! দেখেও আমার লজ্জা নেই। অ্যান বললে, 'তুমি যদি স্বেচ্ছায় না নামো, আমি তোমাকে তুলে জলে ফেলে দেব। পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীকে ভয় পাচ্ছি। জীবনের এত বড় অভিজ্ঞতা না নিয়েই চলে যাব। হাজার হাজার ডলার খরচ করে এখানে লোক আসছে ডাঙায় উটের মতো বসে থাকার জন্যে?'

হাসিমুখে ফাঁসি বরণ করার মনোভাব নিয়ে জামা-জুতো ফেলে জলে নামলুম। অ্যান সাবধানে আমার হাত ধরে আছে। তার কাছে অ্যাটলান্টিক, প্যাসিফিক কিছুই না। ওরা ওইভাবেই মানুষ। আমরা এইভাবেই অমানুষ। আমার আর ভাবা হল না। প্রলয়পয়োধি জলে। কামানের গর্জন। সারা পৃথিবীর জলরাশি গড়াম করে ভেঙে পড়ল ঘাড়ে। শুধু অনুভব করলুম নরম একটা হাত প্রদীপের সলতের মতো আমাকে উশকে দিল। জলের উর্দ্ধচাপে টুইয়ে উঠে গেলুম ওপরে, তারপর ঘপাত করে নেমে এলুম নিচে। চিনচিনে বালিতে পা ঠেকল আবার। বালি সরে সরে যাচ্ছে। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। প্রথম ধাক্কাতেই বুকটা কেঁপে উঠেছিল। সজ্ঞানে স্বর্গারোহণের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলুম। প্রস্তুতির আর সময় কোথায়, ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে। অ্যান বললে, 'শরীরটাকে অমন শক্ত করে রেখ না। আলগা করে জলে ছেড়ে রাখ। নিজেকে ভাব মাছ ধরার ফাতনা, ফিশিং ফ্লোট।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝটকায় হুইশ করে আমরা ওপরে উঠে পড়লুম, যেন নাগরদোলায় চেপেছি।

সেই বিশাল অন্ধকার জলরাশির দিকে মুখ ফিরিয়ে আছি। অন্ধকার আকাশে গিয়ে ঠেকেছে টলটলে সমুদ্র। মনে হচ্ছে এই জলস্রোত যেন আকাশ থেকেই বেরিয়ে আসছে। ঢেউ যখন উঠছে তখন আকাশও ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে শতসহস্র নাগের মত দুলছে কালো জল। তার গায়ে নাগের পোশাকের মতো চিকচিক করছে ফরফরাসের প্রলেপ। ওই মুহূর্তেই যা ভয়। জলের বিশাল পাঁচিল কখন কি ভাবে ভেঙে পড়বে সেই আশঙ্কায় নিজের অনুভূতি ছোট্ট একটা নিরেট সুপুরির মতো হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মনে সব সময় মৃত্যুর চিন্তা, বিদেশী মনে জীবনের দোলা। অ্যান ভাবছে এই তো জীবন, আমি ভাবছি এই তো মরণ। মাথার ওপর কালো আকাশ। ধকধক করে জ্বলছে শেষরাতের গোটাকতক তারা। কালো জল অনবরত উঠছে আর পড়ছে। এত অশান্ত যে, তার নাম কে রাখল প্রশান্ত।

ক্রমশ ভয় কেটে গেল। বেশ মজাই লাগতে লাগল। আমরা যেন ঢেঁকি। এই উঠছি, এই

পড়ছি। অনবরতই কড়াক শব্দে ঢেউ উঠে গড়াম শব্দে ভেঙে পড়ছে। সমুদ্র-স্নানকে স্নান না বলে কুস্তি বলাই ভাল। একটা মিনিট সুস্থির থাকতে দেয় না। অ্যানের হাতে আমার হাত ধরা। ঢেউয়ের ওপর আমরা যখন ভেসে উঠছি তখন অ্যানের সোনালি চুল ভেসে ভেসে আমার মুখ আর কাঁধে জড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক এইরকম শেষ রাত আর কোনও দিন জীবনে আসবে না। এইরকম একটা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জন্য বাঁরে বারে, বারে বারে জন্মাতে ইচ্ছে করে। মনে গুনগুনিয়ে উঠল একটা লাইন—জন্ম জন্ম সাধ যে আমার, মায়ের কোলে আসি আবার। পরের লাইনে আর যাওয়া গেল না, গ্নাক করে নোনা জল ঢুকে গেল মুখে।

সামনের দিগন্ত হঠাৎ চড়াক করে ফেটে গেল। দিনের ঠোঁটে আলোর হাসি। সুন্দরী উষার ঝিলিক মারা হাসি। সেই আলো মুক্তোর মতো সমুদ্রের আকাশছোঁয়া অংশে ঝরে পড়ল। অ্যান বললে, রাত শেষ, আমাদের চান শেষ। চলো যাই, চলে যাই। তটে উঠে আসাও এক কায়দা। শরীরকে ভাসিয়ে তুলে দিতে হবে ডাঙায়। সে দায়িত্ব পালন করবে ঢেউ।

আমরা উঠে এসে তীরে দাঁড়িয়েছি। জল সত্যিই গরম ছিল। এতটুকু শীত করছে না। বরং ভীষণ চাঙা লাগছে। ভোরের বাতাসে গায়ের জল শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। হঠাৎ একটা ভৌতিক কাণ্ড ঘটে গেল। আমাদের মাথার উপর দিয়ে পরপর কয়েকজন জীবন্ত মানব মানবী পরীর মতো উড়তে উড়তে সমুদ্রে ঝপাং করে গিয়ে পড়ল। বেশ ভয় পেলে গেলুম। প্লেন নয়, হেলিকপ্টার নয়, জলজ্যান্ত মানুষ, ডানা ছাড়া, সশরীরে কিভাবে উড়ে গেল! আমাদের হোটেলের দিকে তাকালুম। সঙ্গে সঙ্গে বহুতল বাড়ির উঁচু ছাদ থেকে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল আরও কিছু মানুষ। মানুষের ঝাঁক আমাদের মাথার উপর দিয়ে সমুদ্র গিয়ে নামল।

ছেলেমানুষের মতো, আমাকে অবাক হতে দেখ, অ্যান বললে, 'অবাক হবার কি আছে। এর নাম বিজ্ঞান। পিঠে জেট ইঞ্জিন বেঁধে পুরো মানুষটাকেই ওরা আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছে। চলো আমরাও যাই।'

'তোমার কথায় আমি জলে নেমেছি। তোমার কথায় আমি আকাশে উড়তে পারবো না ভাই। মাঝ আকাশেই আমি হার্টফেল করব।'

'ভয় নেই, আকাশে থ্রিলার ফিল্মের ভিলেনের মতো ওড়ার ইচ্ছে আমারও নেই।'

হোটেলের ছাদে রোজ ভোরে একটা জমায়েত হয়। মানুষ ওড়াবার স্টেশন। কয়েক হাজার পেসো পেশ করলেই পিঠে একটা সিলিন্ডার মতো জিনিস বেঁধে স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দেবে। হাউইয়ের মতো সোজা আকাশে। তারপর গতিমুখ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, কিভাবে অবতরণ হবে, কি ভাবে গতি বাড়ানো, কমানো যাবে তা আমি জানি না। কারোকে জিজ্ঞেসও করিনি। কারণ এঁরা এত উৎসাহী ও সহযোগী যে সেই বাঙালি প্রবাদ, হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার কেন হবে 'সেনর'। ধর ব্যাটাকে। বাঁধ পিঠে যন্তর। দে দম।

৫১

মেকসিকো শহরের স্মগ ইকসতাফায় নেই। পরিষ্কার দিন। নীল আকাশ। এত উঁচুতে আছি যে কলকাতার মনুমেন্টকেও ছাড়িয়ে গেছি। তাহলে আকাশের গায়ে দু-একটা আগ্নেয় পাহাড় দেখা যাবে না কেন? কেন দেখা যাবে না পোপোকাটাপিটেল! কেন দেখা যাবে না সর্বোচ্চ পর্বত, পিকো দ্য ওরিয়াবা! কেন দেখা যাবে না তাক্‌নো আগ্নেয়গিরি! আমি হন্যে হয়ে আকাশের গায়ে পাহাড় খুঁজতে লাগলুম। মনে হচ্ছে, আছে দূরে জমাট হয়ে। চোখের ভুলও হতে পারে; কারণ মনের সব জিনিসই তো বাইরে বেরিয়ে আসে। তবে সমুদ্র বড় স্পষ্ট। বড় বড় পাশবালিশের মতো ঢেউ গড়াচ্ছে।

অ্যান বললে, 'শোনো, আমাদের একটু অসভ্যতা হয়ে যাচ্ছে, আমাদের জামাকাপড় এখনও

ভিজে। লেপ্টে আছে শরীরের সঙ্গে। ঘরে চলো. একটু ভদ্র হয়ে আসি।'

সব সমুদ্রের জলেই নুন থাকে। সেই জল শরীরে শুকিয়ে যাবার পর, ভীষণ চটচট করে। অ্যান বললে, 'বেশ করে গরম জলে চান করে নাও। পরিষ্কার, ফ্রেশ, জামাকাপড় পরে নাও, তারপর আমরা ব্রেকফাস্ট করতে বেরবো।'

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা নিচে নেমে এলুম। বেশ চড়া রোদ। ঝকঝকে গাছের পাতা বাতাসে কাঁপছে। তকতকে পথঘাট। ঝাঁক ঝাঁক বেদিং বিউটি, টু পিস কস্ট্যুম পরে সমুদ্রের দিকে ছুটছে। আমাদের গতি সেই মার্কেট স্কোয়্যারের দিকে। অ্যান সামান্য একটু সেজেছে। চোখে গগলস। এই সামান্য প্রয়াসেই তাকে মনে হচ্ছে হলিউডের অ্যাকট্রেস। অ্যান বললে, 'তোমার সানগ্লাস নেই?'

'ধুৎ আমার আবার সানগ্লাস! আমি ডাল, ভাত, পোস্তখেকো এক বঙ্গসন্তান। আমাদের দেশের বৈশাখের রোদের চেহারা জানো। আমার চোখে এই রোদ তো চাঁদের আলো।'

'বেশি পাকা পাকা কথা বোলো না তো। আমিও কি ফোর্ডের মেয়ে! সমুদ্রে এলে চোখটা ঢেকে রাখাই ভাল। চোখের কোল দুটো কম কালো হয়।'

অ্যান তার কাঁধব্যাগ থেকে একটা সানগ্লাস বের করে আমার হাতে দিলে, 'নাও, লাগিয়ে নাও।' তা'র এই মমতায় আমার চোখে ছায়া নামল। চারপাশের দৃশ্যে একটা স্নিগ্ধতা ঘনিয়ে এল।

অ্যান বললে, 'এবার বলো কেমন লাগছে?'

'ভীষণ ভাল।'

'তবে!'

অ্যান হনহন করে হাঁটছে। রাতের সেই পরী নামা-অঞ্চল এখন অন্যভাবে জেগে উঠেছে। অনেক দোকানপাট খুলে গেছে। অনেক খুলছে। কিছু এখনও খোলেনি। রাতের সেই ডিসকো সেন্টার দিনে ঘুমিয়ে পড়েছে। দোকানে দোকানে সুন্দরী বিক্রেতা। এই জায়গাটা যেন মেয়েরাই চালাচ্ছে। রাতে আমরা যে-জায়গাটায় বসেছিলুম, সেখানে একটি পাথরের আসনে সুন্দর একটি দৃশ্য, এক যুবকের কোলে এক সুন্দরী যুবতী তার সুঠাম পা দুটি সটান তুলে দিয়েছে, আর যুবকটি দু'হাতে পদসেবা করছে। আমি অ্যানকে বললুম, 'আহা রে, দেখেছ, অমন একটা মেয়েকে কিরকম বাতে ধরেছে!' অ্যান উত্তরে, ঠাঁই করে আমার মাথায় একটা গাঁট্টা মারল।

খাওয়া তো পরের কথা, রেস্তোরাঁ দেখেই তাক লেগে গেল। মানুষের কল্পনা আর রুচিবোধেই পৃথিবীতে সুন্দরের জন্ম। আটকাঠ বন্ধ, কাঁচের দরজা ঠাসা, আধো অন্ধকার একটা আদিখ্যেতা নয়। চারপাশ খোলা মনোরম উন্মুক্ত এক গা পরিবেশ। মথার ওপর সুদৃশ্য, কারুকার্যমণ্ডিত একটা আচ্ছাদনী। চারপাশ দিয়ে চলে গেছে বাঁধানো একটা পথ। রেস্তোরাঁর মেঝেটা পথের থেকে তিন ধাপ নিচুতে। চারপাশ কোমর সমান দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই ঘেরা জায়গায় সুন্দর সুন্দর টেবিল। প্রতিটি টেবিলের এদিকে একটা বড় সোফা, ওদিকে একটা বড় সোফা। দেওয়াল আর ওপরের আচ্ছাদনীর মাঝের ফাঁকা জায়গায় রৌদ্রোজ্জ্বল সামুদ্রিক প্রকৃতি চারপাশে ছবির মতো আটকানো। ঢুকেই ডানপাশে লম্বা একটা কাউন্টার। কাউন্টারে চারজন অতি সুন্দরী তরুণী, যেন গোয়ার আঁকা ছবির পট থেকে জীবন্ত হয়ে নেমে এসেছে। ঘেরঅলা স্কার্ট পরেছে। ফুলফুল নিচুগলার ব্লাউজ। ব্লাউজের হাত কাটা। কবিতার মতো দুটি বাহু লতিয়ে এসেছে। ভারতীয় মহিলাদের মতো কালো কুচকুচে চুলের এলো খোঁপা ঘাড়ের কাছে দুলছে। হাসি হাসি মুখ। কাউন্টারের শেষ মাথায় আধুনিক কিচেন। ঠিক উল্টোদিকে, মাঝামাঝি জায়গায় ছোট্ট একটা মন্দিরের মতো। সেখানে একটা গ্যাসের উনুন জ্বলছে। কন্দর্পের মতো দুটি যুবক সেখানে পাউরুটি তৈরি করছে। সারা জায়গাটা রুটি তৈরির অপূর্ব গন্ধে ভরে গেছে।

অ্যান আর আমি একেবারে শেষ মাথায়, ধারের দিকের একটা সোফায় পাশাপাশি বসলুম। অ্যান বললে, 'স্প্যানিশ রেস্তোরাঁর সবটাই টাটকা। আসন আর পরিবেশ থেকে শুরু করে রুটি পর্যন্ত। মানুষগুলো দেখেছ! কি অদ্ভুত ফ্রেশ!'

রেস্তোরাঁ প্রায় ভর্তি। সকলেই ছুটির দিনের বাহারি পোশাকে। কারুর কারুর মাথায় মেকসিক্যান টুপি। কোনও কোনও মহিলা নানা অলঙ্কারে সেজেছেন। দু' কানে লম্বা দুল। মাথা নাড়ার তালে

তালে দুলছে আর ঝিলিক মারছে। পৃথিবীটা সত্যিই বড়লোকের। এই ছবিতে হীন পোশাকের দরিদ্রের কোনও স্থান নেই। আমার যা সাজপোশাক, গেট আউট বললে বেরিয়েই যেতে হবে। আমার নিজের দেশে যাঁরা জামাকাপড় তৈরি করেন, তাঁদের কেতা আছে, হাঁকডাক আছে খুব, মজুরির ঠেলায় অন্ধকার; কিন্তু তাঁরা প্যান্ট বানাতে বানান দোচোঙা আর বুশশার্টের বদলে ফতুয়া। ফিটিং-এর কথা বললেই, জজসায়েবের মতো গম্ভীর মুখে বলবেন, আপনার শরীরে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট।

আমাদের ঠিক বাঁপাশের টেবিলে এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী আর তাদের দুটি শিশু। ফুটফুটে দুটি মেয়ে। স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কথা বলাতেই ব্যস্ত। স্ত্রীটি লাগদাঁই সুন্দরী। যে কোনও স্বামীর মাথা বিগড়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। উল্টো দিকে বসে স্বামী স্ত্রীর দিকে ক্যামেরা তাক করছেন। কি করে ভাল ছবি হবে জানি না। পেছনে এক ফালি উজ্জ্বল আকাশ। গাছ, বাড়ির অংশ। ছোট মেয়ে দুটি সরে সরে আমাদের কাছে চলে এল। দুটি জীবন্ত পুতুল। অ্যানের চেয়ে আমার দিকেই তাদের মনোযোগ বেশি। অ্যানের সঙ্গে তাদের মায়ের বিশেষ তফাৎ নেই, কিন্তু গোটা রেস্তোরাঁয়, আমি মাত্র এক পিস। আমার গায়ের রঙ, আমার শরীর। টিপিক্যাল পশ্চিমবঙ্গীয় কুলপুরোহিত। শালগ্রাম শিলাটি ফেলে দোনলা আর বিলিতি ফতুয়া পরে মেকসিক্যান পারে বসে আছি বিদেশিনীর পাশে।

সেই 'ফেয়ারি টেলস'-এ যেমন রঙিন ছবি দেখি, সেই রকম একটি মেয়ে প্রায় উড়তে উড়তে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, কি খাবো! পাউরুটি তো খাবই। এমন টাটকা রুটি কোথায় পাবো। মেকসিকোর ডেয়ারি খুব উন্নত, মাখন অবশ্যই। তারপর। তারপরেই থমকাতে হল। এরপর সবই তো মাংস। অ্যান বললে, 'অ্যামেরিকান হলেও, সাতসকালে হাঁউ হাঁউ করে রাক্ষসীর মতো মাংস চিবোতে পারব না, তার চেয়ে প্যাসস্ট্রিই ভাল, আর কফি।'

মেয়েটি বললে, 'এল পাইন, লা মাইন তে কি-ইহা।'

অ্যান বললে, 'সি।'

মেয়েটি বললে, 'কা ফে সো-লো? পাস টে লেস?'

'সি।'

মেয়েটি ভেসে ভেসে চলে গেল কাউন্টারের দিকে। বাচ্চা মেয়ে দুটির একটি বসেছে আমার কোলের কাছে, আর একটি অ্যানের কোল ঘেঁসে। সব দেশের শিশুরাই একটু স্নেহ পেলে পরকেও আপন করে নিতে পারে। তাদের নানা প্রশ্ন ইন্ডিয়া দেশটি কেমন। বাঘ কোথায় আছে। ভাল্লুক আছে কি না! একটা হাতির কত দাম পড়বে? অ্যানকেও নানা প্রশ্ন। মাথা নেড়ে আঙুল উঁচিয়ে প্রশ্ন করার সে কি ধরন। ওদের খাবার এসে গেছে। ভদ্রমহিলা মেয়ে দুটিকে ডেকে নিলেন। আমাদেরও খাবার এসে গেল। বেত দিয়ে বোনা সুন্দর বাস্কেটে গরম পাউরুটি। ওপর দিকে সোনালি বাদামি রঙ। বিশাল এক তাল মাখন। জেলি, বিস্কুট। সব সুন্দর পরিচ্ছন্ন করে সাজানো। আমার সবচেয়ে ভাল লাগল বেতের বাস্কেটটা। কেবলই ভাবছি কি করে ওটাকে নিয়ে যাওয়া যায়।

'অ্যান এই রুটির বাস্কেটটা কেনা যায়?'

'কিনতে হবে কেন, ওটা তুমি এমনিই নিয়ে যেতে পার। কিন্তু করবেটা কি?'

'বেশ কেমন সাজিয়ে রেখে দেবো।'

'ঠিক আছে যাওয়ার সময় নিয়ে যেযো।'

'এইরকম একজন মেকসিক্যান মেয়ে আমাদের দেশে নিয়ে গেলে বেশ হয়। হাসি হাসি মুখ। পরীদের মতো দেখতে।'

'স্প্যানিশ ব্লাড। রাগলে তোমাকে তুলোধোনা করে দেবে সেনর। তোমার খাওয়াটা একটু বাড়াও, তা না হলে রোগা হয়ে যাবে, আর তোমার মা বলবেন, মেয়েটি আমার ছেলেটাকে রোগা করে দিয়েছে। অযত্নে রুটিতে আর একটু বেশি করে মাখন মাখাও না। অমন কৃপণের মতো স্বভাব হচ্ছে কেন তোমার।' 'আমার মা নেই অ্যান। তিনি বহু বহু দিন আগেই আমার উৎপাতে চলে গেছেন। আর কৃপণ বলছ? ভারতে মাখন খাওয়ার শেষ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন এক অবতার, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। একালের ভারতে রুটির মাখন দর্শন করিয়েই খাওয়ার বিধি। সাহসীরা একটু

স্পর্শ করায় মাত্র।'

'কেন, দাম বেশি?'

'মাখন আর সোনা প্রায় এক দাম। সব সময় পাওয়াও যায় না। ভেজালের উৎপাত আছে। তার ওপর হৃদরোগের ভয় আছে।

আমার মা নেই শুনে অ্যানের বেশ খানিকটা ভাবান্তর হল। মা এমনই এক নারী, যা সবদেশের সন্তানের মনেই একটা ভাবাবেগ তৈরি করে। রুটির একটা বড় টুকরোয় আচ্ছা করে মাখন মাখিয়ে আমার হাতে দিয়ে অ্যান বললে, 'তোমার ওজন কমসে কম দশ কেজি বাড়িয়ে তোমাকে আমি দেশে ফেরাব, নো জোক। তোমাকে কেবল আমি বেকড পোট্যাটো, বিনস আর বাটার খাওয়াবো। আর খাওয়াবো রেজিনস আর নাটস।'

ছায়াঘেরা রেস্তোরাঁর বাইরে সোনালি রোদের নেশা জমছে। রোদ যে এইরকম ফলের রসের মতো মধুর হতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না। এখানে যাঁরা সমবেত হয়েছেন তাঁরা সকলেই জীবন-তপস্বী। বেঁচে থাকার আনন্দে বুঁদ হয়ে আছেন। যে যা করছেন, সবই করছেন পূর্ণপ্রাণে। যার ফলে গোটা এলাকায় ভিন্ন ধরনের একটা প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে।

আমরা বেরিয়ে এলুম। রাতের স্বপ্ন দিনে একেবারে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। আরব্য রজনীর একটা খন্ড কে যেন এখানে ফেলে রেখে চলে গেছে। পরিষ্কার পাথর বাঁধানো চত্বরে একের পর এক দোকান। কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকলেই স্বপ্নের এলাকা। মেকসিকোর একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে। হয়তো সব দেশেরই আছে। মেকসিকোয় অত্যন্ত স্পষ্ট। আমেবিকা লোকসংস্কৃতির ওপর স্টিম রোলার চালাতে পারেনি। সর্বত্রই তা যেন ফুটে বেরোচ্ছে। যে কোনও দোকানে ঢুকলেই সবার আগে চোখে পড়বে মেকসিকো। মেকসিক্যান জামার ছাঁট আলাদা। ট্রাউজারের কাট আলাদা। মেয়েদের পোশাকের ধরন আলাদা। অলঙ্কারের নকশা আলাদা। সমস্ত কিছুর মধ্যে মেকসিক্যান সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট।

ঝলমলে রোদের আলোতেই দোকান আলোকিত। শীতল ছায়াঘন শান্তির খেলাঘব। ক্রেতাদের চিৎকার চেঁচামেচি নেই। কোথাও এতটুকু বাড়তি শব্দ নেই। কোনও রেকর্ড বা ক্যাসেট প্লেয়ার অকারণে তপ্ত গান কানে ঢেলে দিচ্ছে না। বাজার, অথচ অসীম শান্তি। সমুদ্রের বাতাসের মতো সবাই পায়ে পায়ে ঘুরছে। দরজা ঠেলে ঢোকার সময় ক্লিং করে বেজে উঠছে মেকসিক্যান ঘন্টা। দোকানের ভেতর কে জীবন্ত মেয়ে, কে ম্যানিকুইন সহসা বোঝাব উপায় নেই।

সেলস গার্লস কেমন হওয়া উচিত, এইসব দেশেই শেখা গেল। তিনি তাঁব রূপ দেখাতেই ব্যস্ত নন। ব্যস্ত নন নিজেদের মধ্যে কথায়। আসলে মেকসিক্যান মধ্যবিত্ত মেয়েবা বাঙালি মেয়েদের মতোই মিষ্টি, সহযোগী স্বভাবের। একটু দুঃখী দুঃখী ভাব। কপালের ওপর উড়ু উড়ু চুল। মুখে একটা আন্তরিক হাসি। সাদা-মাটা পোশাক। গাঢ় রঙের স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ। চুলে বাঁধা রিবন। পায়ে মেকসিক্যান জুতো। এই জুতোর সঙ্গে খড়মেব খুব একটা তফাত নেই। চলার সময় খটখট শব্দ হয়। এই সুশ্রী সাধারণ মেয়েদের বড় আপনজন মনে হচ্ছিল। মেয়েদেব কাছ থেকে এত আন্তরিক ব্যবহার আমাদের দেশে পাওয়া কি সম্ভব? কে জানে।

এই সব দোকানে গেঞ্জির কাপড়ে তৈরি বহু ধরনের পোশাক পাওয়া যায। জামা, প্যান্ট, গেঞ্জি প্রভৃতির দাম অবিশ্বাস্য রকমের কম। গেঞ্জির বুকে বড় বড় হরফে লেখা, ইকসতাফা, কানকুন, আকাপুলকো। সবই জনপ্রিয় সমুদ্রনিবাসের না-।

এ-দোকান, সে-দোকান করতে করতে আমরা এক সুইডিস দম্পতিব দোকানে ঢুকলুম। এ দোকানে শুধুই হস্তশিল্প সাজানো। দোকানের নামটি ভারী সুন্দর, ফ্লোরেনস্। বিশাল কাঁচের দরজা থেকে শুরু করে, ভেতরের প্রতিটি জিনিস যেন ঝকঝক করছে। লম্বা একটি গাউন পরে দীর্ঘকায়া এক মহিলা বসে আছেন। বব করা চুল। চল্লিশের ওপর বয়স তো হবেই। দেখেই মনে হল, মা বলে ডাকি। মহিলার স্বামী প্রৌঢ় হলেও বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য। অতি অমায়িক। আমাদের বললেন, 'কাম অ্যান্ড সি'। দেখেই মনে হয়েছিল এঁরা মেকসিক্যান নন, ইউরোপীয়। পরে জানা গেল, সেই সুন্দর সুইজারল্যান্ড থেকে দু'জনে এখানে এসে দোকান খুলেছেন। ছবির মতো একটি দোকান। তেল রঙে আঁকা বড় বড় পেন্টিং বিক্রি হচ্ছে। মেকসিকোর নিসর্গ দৃশ্য। পাকা হাতের কাজ। তাকালে আর

চোখ ফেরানো যায় না। ছবি আমাকে ভীষণ টানে। অ্যানও বেশ চিত্ররসিক। আমরা এক একটা ছবির সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সুইশ ভদ্রমহিলা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। চোখা বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। আমি হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেললুম, 'মাদার, এ ছবি কার আঁকা?' ভদ্রমহিলা কেমন যেন হয়ে গেলেন। ভাবান্তর দেখে একটু ঘাবড়ে গেলুম। কিছু মনে করলেন না তো! মিনিট কয়েক স্তব্ধ থেকে মহিলা দু' হাত দিয়ে পরম আবেগে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে, রুদ্ধ গলায় বললেন— 'মাই সান।' দু চোখের কোণে জল টলটল করছে। মা-ডাকে চোখে যে-জল নামে, সে-জল হল অন্তরের মুক্তো।

আমি অবাক হয়ে সেই দীর্ঘকায় সুইস মহিলার দিকে তাকিয়ে রইলুম। তাঁর নরম মুঠোয় আমার হাত দুটি ধরা। চোখের কোণে জল। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম 'মা, আমি কি কোনও অন্যায় করে ফেলেছি?'

'নো মাই সান। তুমি কোনও অন্যায় করোনি। তুমি আমার বেদনার স্থানে হাত দিয়ে ফেলেছ। আমার একটি ছেলে ছিল। একটিমাত্র ছেলে। সেই ছেলে আমার আল্পস একসিপিডিশানে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। বহু বহুদিন পরে আবার আমাকে কেউ মা বলে ডাকল। তুমি আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলে।'

কাঁচঘেরা দোকানে আলোছায়ার মমতায় এক বিদেশিনীর হৃদয়ে পৃথিবীর সনাতন মাকে আবিষ্কার আমার কাছে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে বড় হয়ে রইল। অ্যান পেছন দিক থেকে ভদ্রমহিলার দীর্ঘ শরীর জড়িয়ে ধরল, যেমন আমাদের দেশে জীবনের অতি কোমল মুহূর্তে মাকে মেয়ে জড়িয়ে ধরে। ভদ্রমহিলা অ্যানের সুন্দর মাথাটা, তাঁর সিল্ক ঢাকা নরম বুকে চেপে ধরলেন। নরম উষ্ণতায় অ্যানের যে সুখ, সেই সুখ আমি আমার অনুভূতিতে ধরতে পারছি।

এসেছিলুম ক্রেতা হয়ে, কি নিছক দর্শক হয়ে, হয়ে গেলুম গভীর কোন সম্পর্কের আপনজন। দেশে দেশে মোর ঘর আছে, কথাটা কত সত্য! ভদ্রমহিলা আমাদের হাতে একটা কার্ড তুলে দিলেন কার্ডটা ভারী সুন্দর। এক টুকরো বাহারি প্লাইউড যেন। দোকানের নাম, ফ্লোরেন্স। মহিলার নাম, ফ্লোরেন্স স্যান্ডেল। আর্ত ইয়া আর্তেসানিয়া। অর্থাৎ আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস। ঠিকানা অ্যাপারটাডো পোস্টাল-নাইনটিন। জিহুয়াতানেজো, ফোর জিরো এইট জিরো। গুয়েররেরো। ইকসতাপা-সেন্ট্রো কোমার্রসিয়াল লা পুয়েরটা। টেল (৭৪৩) ৪২৪৬২। কার্ডটা স্মরণ করিয়ে দিল, আমরা পৃথিবীতেই আছি। স্বর্গে নেই। হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহের পৃথিবীতে হঠাৎ পড়েছে স্বর্গের ছায়া।

সেই সুইস মহিলা, আমার মা, পাশের টেবিল থেকে তুলে নিলেন, ঝকঝকে সোনালি রঙের একটা স্প্যানিশ মেডালিয়ান। আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'সান, দিস ইজ ফর ইউ।' বেশ একটু অবাক হয়ে গেলুম। এক পয়সারও জিনিস কেনা হল না। উপহার! একটি চাবির রিং অভিভূতের মতো গ্রহণ করলুম। মহিলা অ্যানের হাতেও অনুরূপ একটি চাবির রিং তুলে দিলেন। অ্যান ভারতীয় কায়দায় সেটিকে কপালে ঠেকাল। তারপর হাসিমুখে বললে, 'এইবার আমরা কিছু কিনি। এত সব লোভনীয় জিনিস চারপাশে!'

মহিলা বললেন, 'মেকসিকোর হস্তশিল্পের সেরা সেরা জিনিস আমার দোকানে। পছন্দ করো, আমি তোমাদের কেনা দামেই দোবো। ট্যুরিস্টদের যে দামে দি, সে দাম নয়।'

'আপনার যে লোকসান হয়ে যাবে।'

'লোকসান কেন হবে! লাভ হবে না। সারা বছর আমার দোকানে অনেকে আসে। লাভ আমি তাদের কাছে করব। তোমাদের সঙ্গে আমি ব্যবসা করতে পারব না।'

ভদ্রমহিলার স্বামী একটু গম্ভীর প্রকৃতির। তিনি দূরে ক্যালকুলেটিং মেশিনের সামনে বসে আপন মনে পাইপ খাচ্ছেন। ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধা হল। স্ত্রীর প্রতি এমন ভালবাসা ইউরোপীয়দের মধ্য সহসা চোখে পড়ে কি। ওঁরা তো পর্যায়ক্রমে ম্যারেজ, ডিভোর্স, ডিভোর্স, ম্যারেজেই অভ্যস্ত। সন্তানের মৃত্যু অবশ্যই একটা বড় রকমের আঘাত, তবু সুখী দাম্পত্য জীবন বলে, মুখে স্বর্গীয় একটা তৃপ্তি, একটা সুখের ভাব লেগে আছে। তাকালেই মনে হচ্ছে এক সাধককে যেন দেখছি। পরিধানে একটা ব্যাগি ট্রাউজার, সাধারণ একটা টি-শার্ট। আজকাল এ ঝোলর-ঝালর পোশাক বিদেশে খুব চালু হয়েছে।

আমরা দু'জনে প্রশস্ত সেই দোকানের ওপাশের কোণে চলে গেলুম। যাবার মতোই জায়গা। অসাধারণ সব কাঠের কাজ সাজানো রয়েছে। কাঠের টুকরো বা খণ্ডের ওপর শিল্পী খোদাই করেছেন নানা কাহিনীর সুপরিচিত চরিত্র। প্রথমেই যে মূর্তিটির ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করলুম, সেটি হল ডন কুইজোটের। গাধার ওপর বসে আছেন আমাদের সেই প্রিয় যোদ্ধা। গাধাটা বোঝার ভারে ঘাড় কাত করে আছে। পিঠের দু'পাশে দুটো ভারী বোঝা। গাধাটাকে এমনভাবে করা হয়েছে, যেন হাঁটছে। তার টুকুস্‌টুকুস চলনটি বোঝা যায়। ডন কুইজোটের মাথায় কোনা-মাড়া স্প্যানিশ টুপি। বগলে চেপে-ধরা দীর্ঘ একটা বর্শা। অদ্ভুত সুন্দর একটি কাঠ খোদাইয়ের নমুনা। হলুদ-বাদামি রঙের ভার্নিস লাগানো।

আমি তো দেখেই কেনার জন্যে লাফিয়ে উঠলুম। এ বস্তু তো আমি কোথাও পাবো না। স্মৃতি হিসেবে সারা জীবন কাছে রাখার মতো। গাধাটা যেন সত্যিই হাঁটছে। কে সেই শিল্পী যার এমন হাতের কাজ!

অ্যান বললে, 'ধীরে বৎস ধীরে! খুবই ভাল কাজ; তবে তুমি এটাকে কোনও ক্রমে দেশ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে না। কোনও খোঁচা জিনিস তোমার চলবে না। যেই ব্যাগে ভরবে, চাপ লেগে এই বর্শাটা ভেঙে যাবে। ভেঙে যাবে সুন্দর টুপিটা। তুমি বরং এই বুলফাইটারটা নাও। এটাও একটা সুন্দর কাজ।'

সত্যিই সুন্দর কাজ। স্প্যানিশ বুলফাইটার। মাথায় কাউবয় হ্যাট। সামনে লাল কাপড়টি দু'হাতে দুলিয়ে ধরেছে। রাগী ষাঁড়টি তেড়ে আসা। ঠিক মুহূর্ত। যোদ্ধার মুখে তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠুর এক অভিব্যক্তি। কাঠের সেই মূর্তিটি কিনে ফেললুম। ইচ্ছে ছিল মেকসিক্যান নর্তকীদের গ্রুপটাও কিনব। সাহসে কুললো না। সব সময় ভেবেচিন্তে খরচ করতে হচ্ছে। ফরেন এক্সচেঞ্জ ফুরিয়ে গেলে হয় ভিক্ষে, না হয় অ্যানের সাহায্য। শুকনো মুখে সরে এলুম। এবার যেখানে এসে দাঁড়ালুম, সেখানে শুধু ছবি। সুন্দর সুন্দর অয়েল পেন্টিং। কে সেই শিল্পী?

অ্যান বললে, 'দাঁড়াও জিজ্ঞেস করে আসি।' অ্যানকে আর যেতে হল না। এগিয়ে এলেন ফ্লোরেন্স্‌ স্যান্ডেল। বললেন, 'বড় ভাল শিল্পী। ভদ্রলোক মেকসিক্যান, নাম এডউইন মোজেস। তোমরা যদি চাও, পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। তেমন প্রচার নেই। প্রচার চানও না। আমি যতটা পারি সাহায্য করার চেষ্টা করি। তোমার কোন ছবিটা পছন্দ আমাকে বলো, আমি তোমাকে প্রেজেন্ট করব।'

'না মাদার। একটা ছবি আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে, আমি পুরো দাম দিয়ে কিনবো। কিনবো শিল্পী আর শিল্পকে ভালবেসে।'

অ্যান আমাকে সমর্থন করল 'ঠিক, ঠিক বলেছে।'

ফ্লোরেন্স্‌ বললে, 'তুমি ছবি বুঝি ভালবাস! তাই তোমার স্বভাব এত কোমল।'

এডউইন মোজেসের আঁকা ইকসতাফার গ্রামের একটা ছবি কিনলুম। তেলরঙে আঁকা বেশ বড় ছবি। এ-দেশ হলে কিনতে পারতুম না। দশ বারো হাজার টাকা দাম পড়ে যেত। দাম পড়ল তিরিশ হাজার। টাকা নয় পেসো।

'অ্যান তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে! আমাদের দেশে তোমার মতো মেয়েরা হাতে একটা কিছু পরে। বেশ দেখায়। তোমাকে একটা উপহার দেবো। খুব ইচ্ছে করছে।'

'বেহিসেবী কাজ করো না। আমি যখন ভারতে গিয়ে তোমার অতিথি হব তখন আমাকে তুমি একটা সিল্কের শাড়ি কিনে দিও।'

'তাহলে তুমি একটা কিছু কেনো।'

'দাঁড়াও, আমি একটা গাউন কিনি। ফ্লোরেন্স্‌কে গাউনে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না! মেয়েদের পোশাক মেয়েদের মতোই হওয়া উচিত। আমরা কি যে ছাই পরে ঘুরে বেড়াই!'

ফ্লোরেন্স্‌ থেকে আমরা যখন বেরিয়ে এলুম, তখন মন্দ বেলা হয়নি। ঝাঁঝালো মধুর মতো দিন। মেকসিকোর এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। সারা বছরই রোদ। গায়ে সানট্যান লোশান মেখে বিশ্বসুন্দরীরা সাদা বেলাভূমিতে ওলটপালট খান। চোখে সানগ্লাস। হাতে ড্রিংকসের বোতল।

অ্যান বললে, 'তুমি কিছু খেতে চাও?'

'তুমি কি কিছু খেতে চাও!'

'না।'

'তাহলে পরে হবে। পেট ভার।'

সমুদ্রের ধারে তখন জমজমাট ব্যাপার। মেমসায়েবদের চড়ুইভাতি। সমুদ্রের ঢেউয়ে থিকথিক করছে কালো কালো মাথা। কালো নয়, বাদামি, সোনালি মাথা। এমনভাবে সব শুয়ে আছে, তাকাতে লজ্জা করে। এরা নিজেরা লজ্জাটাকে কিভাবে জয় করল কে জানে! লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিনটেকে জয় করতে পারলে মানুষ সাধক হয়ে যায়।

অ্যান বললে, 'এইভাবে আমি যদি দেহে একটু রোদ লাগাই তোমার আপত্তি হবে?'

আমি একটু থমকে গেলুম। অ্যানকে আমি বাজারি অবস্থায় দেখতে চাই না। বললুম, 'তুমি একজন পণ্ডিত মানুষ। তোমার কি উচিত হবে! তুমি মদ খাও না, সিগারেট খাও না। আলাদা ধরনের একটি মেয়ে। আমাদের দেশের মেয়েরা এমন করে না অ্যান। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। ভালবাসি বলার সাহস নেই; কারণ তুমি ফুঃ করে উড়িয়ে দেবে। আমি ডন জুয়ান নই।'

'তুমি একটা বোকা। কিছুই জানো না। কিছুই বোঝো না। আমি তোমাকে ভালবাসি। দৈহিক নয়। ভালবাসায় দেহ নেই। আমি তোমার মনটাকে ভালবাসি। যে-মন শিশুর মতো সব কিছু জানতে চায়। তোমার মানিব্যাগটা কোথায়?'

কোন কথা থেকে কোন প্রশ্নে!

কেন আমার ব্যাগ, আমার কাঁধ-ব্যাগে।'

'ওই আনন্দেই থাকো। তোমাকে ভালবাসার আর একটা কারণ হল, তুমি অসহায়। ব্যাগটা বেমালুম দোকানে ফেলে চলে আসছিলে। ভাগ্যিস আমি নজর রেখেছিলুম, না রাখলে কি হত।'

'মাই গড। অ্যান, আমার আর কিছু বলার নেই। তুমি হলে সেন্ট অ্যান। আমি তোমাকে....।'

'ব্যাস! আর বোলো না। তোমার ব্যাগ, আমার ব্যাগে রইল। তোমার মতো বেহিসেবি, সরল ছেলে আমাদের মুলুকে বিরল। আমাদের দেশের ছেলেরা বিষয়ী। বড় পাকা।'

হঠাৎ আমার দৃষ্টি ঘুরে গেল অন্যদিকে। এরা আবার কারা। পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার। মুখে মুখোশ। চোখে গগ্‌লস। পায়ে মাছের পাখনার মতো দুটো কি। সারা শরীর রবারের মতো পোশাকে মোড়া।

'অ্যান ওই দেখ। কি বলো তো?'

'স্কুবা ডাইভার। ডুবুরি। ওরা এখন সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবে। তুমি যাবে?'

'গিয়ে কি হবে?'

'সমুদ্রের তলার জীবন দেখব। কত রকমের মাছ। সামুদ্রিক গাছপালা। ঝিনুক। শামুক। সাপ। সিন্ধুঘোটক, সি-আর্চিন। তিনের চার ভাগ জল। জলে যা আছে, যতরকম আছে, স্থলে তা নেই। রাজি থাক বলো। ব্যবস্থা করে আসি।'

'মাফ করো রানী।'

'সমুদ্রের তলার জীবন তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?'

'না। আমার পড়তে ইচ্ছে করে। ছবি দেখতে ইচ্ছে করে। অন্যের চোখেই আমার দেখা হোক।'

বাঁ দিকে, যে জায়গাটায় বিশেষ কেউ যাচ্ছে না, যে দিকে ভূমিকম্পে ফুটিফাটা বিশাল হোটেল বাড়িটা স্মৃতিচিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে, আমরা সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। সমুদ্র ওইদিকে আরও উত্তাল, আরও ভয়াবহ। ঢেউয়ের লম্ফঝম্ফ অনেক বেশি। এদিকে রোদে ফেলে রাখা নগ্ন শরীর নেই বলে, সমুদ্রই পুরো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ যতই প্রয়াস করুক না কেন, একেবারে উন্মোচিত, আকর্ষণীয় নারীদেহের তরঙ্গ সমুদ্রের চেয়ে প্রবল।

পরিত্যক্ত হোটেলবাড়ির সমুদ্রের দিকের সমস্ত আধুনিক আয়োজন যেমন ছিল ঠিক সেইরকমই আছে। নির্জন জনশূন্য তটভাগ হাজার মানুষের জলক্রীড়ার স্মৃতি নিয়ে পড়ে আছে। একদা হেথায় বিরামহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি উঠত। মানুষ ত্যাগ করলেও সমুদ্র স্থানটিকে ত্যাগ করে সরে যায়নি। অবিরত ঢেউয়ে ঢেউয়ে অস্থির করে তুলছে। হোটেলে একটা টেনিস লন ছিল। জোড়া জোড়া সুইমিং পুল শুকনো খটখটে হয়ে পড়ে আছে। কফি ও বার কাউন্টারের ছাদটা উল্টে পড়ে আছে

একপাশে। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অতীতকে দেখলুম। ছিল, এখন আর নেই। এই সত্যিটাই তো কবিতা।

অ্যান আবার চলতে শুরু করল। আমাদের ডানপাশে অনবরত ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। মাঝে মাঝে ছেঁড়া ফ্যানা গায়ে এসে জড়িয়ে যাচ্ছে। জলকণায় আমার চশমার কাঁচ থেকে থেকে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এখানে রোদের রঙ হলুদ নয় সাদা। অ্যানের ওপর-বাহু সমুদ্রের ভাসমান লবণে চটচট করছে। কোথায় যে চলেছি আমরা!

আরও অনেকটা হাঁটার পর আমরা একটা ধ্বংসাবশেষের কাছে চলে এলুম। কি ছিল কে জানে, প্রাচীন দুর্গ, বাতিঘর! সমুদ্র একটু একটু করে গ্রাস করে নিয়েছে। ঢেউ সোজা এসে আছড়ে পড়ছে ধ্বংসস্তূপে। খাঁজে খন্দে ফেনার বুড়বুড়ি উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন সোডার বোতল খুলছে অদৃশ্য কোনও হাত। আগ্নেয়শিলায় গাঁথা হয়েছিল একদা। কালো তার রঙ। জায়গায় জায়গায় লালের ছোপ।

একটা ধার দিয়ে অ্যান টকটক করে ওপরে উঠতে লাগল। এই আশঙ্কাই করেছিলুম। এরপর আমাকেও উঠিয়ে ছাড়বে। হলও তাই। বেশ কিছুটা উঠে আমার দিকে ফিরে তাকাল। একটা পা নিচের খাঁজে, হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'উঠে এসো, উঠে এসো, অসাধারণ দৃশ্য। জীবনে দেখনি তুমি।' আমার ডান হাত নরম মুঠোয় ধরে অ্যান আমাকে এক টান মেরে ওপরে তুলে নিল। দু'জনেই থমকে গেলুম। যেটাকে আমরা স্প্যানিশ আমলের প্রাচীন কোনও ধ্বংসাবশেষ ভেবেছিলুম, সেটা যে আসলে কি, তা নিয়ে দু'জনেরই সন্দেহ দেখা দিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কোথাও কোনও পরিচয়লিপি লাগিয়ে রাখেনি। বিশাল একটা গহ্বরের কিনারায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভয়ে ভয়ে। গহ্বরের ভেতরটা অন্ধকার। কেমন একটা গন্ধ বেরোচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ গবেষণার পর অ্যান বললে, 'এটা মনে হয় আগ্নেয়গিরি।'

'কি যে বল না তুমি! আগ্নেয়গিরি মানে বিশাল একটা ব্যাপার। চার হাজার, পাঁচ হাজার ফুট উঁচু ভয়াবহ একটা জিনিস। এটা মনে হয় একটা পাতকুয়া।'

'সমুদ্রে ধারে পাতকুয়া! এটা একটা শিশু আগ্নেয়গিরি।'

'যাই হোক, আমার ভীষণ ভয় করছে। চলো আমরা নেমে যাই।'

'আবার ভয়! আগ্নেয়গিরি হলেও মৃত। এসো আমরা এখানে কিছুক্ষণ বসি। এখান থেকে সমুদ্রটাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।'

পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। বসতেই হল। সমুদ্রের দিকে মুখ করে। সমুদ্র কেন ক্ষণিকের তরেও শান্ত হতে পারে না! কি বিশ্রী স্বভাব! কোনও সমুদ্র-বিশেষজ্ঞ থাকলে প্রশ্নটা করতুম। অ্যান বললে, 'চকোলেট খাবে?'

'কোথায় পেলে?'

'প্লেনে। আমারটা জমিয়ে রেখেছিলুম।'

চকোলেট খেতে খেতে অ্যান বললে, 'মেকসিকোকে এক সময় বলা হত, নিউ স্পেন। কত বড় জানো! ফ্রান্স্ আর স্পেনের চেয়ে চারগুণ বড়। ইউকের আটগুণ। সোভিয়েট রাশিয়ার একের বারো ভাগ। একা ত্রিভুজের মতো পড়ে আছে। ত্রিভুজের ভূমিটা হল আমেরিকার সঙ্গে উত্তরের সীমানা। দক্ষিণে একটু পশ্চিম ঘেঁসে য়ুকাটান পেনিনসুলায় ঢুকে আছে ত্রিভুজের মাথা। আর দক্ষিণে তেহুয়ানতেপেক থেকে শুরু হয়েছে মধ্য আমেরিকার যোজক, যুক্ত করেছে বিশাল দুটি মহাদেশ।'

আগ্নেয়গিরি কিনা জানি না, তবে খড়খড়ে গহ্বরের পাড়ে বসে, সুস্বাদু চকোলেট খেতে খেতে ভূগোল শিখতে বেশ ভালই লাগছে। এই সব যোগ বিয়োগ কোথায় কত দূরে হয়ে আছে তা জানি না। উত্তরে আছে গিলা আর কলোরাডো। নদীর সঙ্গম। সবচেয়ে বড় নদীটির নাম সানতিয়াগো। সুউচ্চ গিরিকন্দরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে আমার অচেনা সেই বিশাল নদী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই নদী মেসো আমেরিকার এক প্রাকৃতিক অবরোধ। নদীর একদিকে মেকসিকো আর মিচোয়াকানের কৃষিজীবী মানুষের বসবাস, অপর দিকে বন্য শিকারীদের অবস্থান।

বেশি উঁচুতে উঠিনি, অল্প একটু উঠেই মেকসিকোকে এত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কেন, একেই কি বলে স্থানমাহাত্ম্য! আমেরিকার মূল ভূখন্ডটাই যেন বেড়াতে বেড়াতে মেকসিকোয় এসে ঢুকেছে।

আমার যদি অর্থ ও শারীরিক ক্ষমতায় কুলোতো তাহলে একটা তেজী ঘোড়া কিনতুম, একটা বড় টুপি, আর একটা কাউবয় পোশাক; একটা নয় দুটো ঘোড়া। আমি কালো, সেই কারণে আমার জন্যে একটা সাদা ঘোড়া আর অ্যান ফর্সা, সেই কারণে তার জন্যে তেল চুকচুকে, কুচকুচে কালো রঙের একটা ঘোড়া। তারপর দু'জনে মিলে উত্তর থেকে শুরু করতুম। ইঞ্চি ইঞ্চি করে দেখে নিতুম ভূগোলের পরম বিস্ময় এই বিচিত্র ভূখণ্ডটিকে। তিনটি তিন ধরনের ভূ-প্রকৃতি উত্তর থেকে নেমে এসেছে দক্ষিণে। গালফ অফ মেকসিকোর সমতটভূমি, রকি মাউন্টেন, আর দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার সুউচ্চ মালভূমি। আমাদের যাত্রা শুরু হবে একটু ওপর দিক থেকেই। পারলে বেরিং সমুদ্রের তীর থেকেই আমরা ঘোড়া ছোটাবো, যে পথ ধরে এসেছিল এশিয়ার মঙ্গোলীয়রা। আমরা পাহাড় ধরেই আসবো। এত বিশাল পর্বতশ্রেণী আর আমরা কোথায় পাবো! একদিকে পাহাড়, একদিকে প্রশান্ত মহসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃত তটরেখাকে ভগবান একেবারে প্রাণ ঢেলে সাজিয়েছেন।

'মাউন্ট ম্যার্ককিনলে, বুঝলে অ্যান, প্রায় ছ' হাজার ফুট। সেইখান থেকে, আমি সাদা ঘোড়ায় তুমি কালো ঘোড়ায়। আমাদেব যাত্রা শুরু।'

'মাউন্ট ম্যাককিনলে সে তো বহু দূরে গো। আলাস্কায়। তুমি ও-নাম জানলে কি করে?'

'তুমি আমাকে কি ভাবো অ্যান? আমরা টেকসাস থেকে দুটো ঘোড়া কিনবো; তারপর রকি মাউন্টেন রেঞ্জ ধরে নেমে আসব। মাউন্ট লোগান, মাউন্ট রোবসন হয়ে সেলকার্ক মাউন্টেন। ভ্যাঙ্কুভারে সাতদিন বিশ্রাম। তারপব বিটার রুট মাউন্টের রেঞ্জ দিয়ে গড়িয়ে নেমে আসব সল্টলেকে। সল্টলেক সিটিতে বিশ্রাম। তাবপব আসব সেই জায়গাটায়, নাম শুনলেই গায়ে কাঁটা দেয়, ডেথ ভ্যালি।'

'তাব মানে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে এলে। বাঃ বেশ সহজে আসছ তো!'

'কল্পনাব এই তো মজা। কল্পনা-অশ্বের চেয়ে বেগবান আর কি আছে অ্যান! কোথায় লাগে তোমাব জেটপ্লেন। ডেথ ভ্যালিটা কি গো!'

'ওর একটু ওপাশে, তার মানে দক্ষিণমুখো দাঁড়ালে বাঁদিকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। মোজাভে ডেসার্টের উত্তরে ডেথ ভ্যালি। সমুদ্র থেকে ৮৪ মিটাব নিচু একটি লবণ উপত্যকা। শুধু নুন পড়ে আছে। কিছুই জন্মায় না। গেলেই তোমাব মৃত্যুব ভাব আসবে। প্রাণী নেই, গাছপালা নেই। লবণের শুভ্রতা মৃতের চাদবেব মতো ভূমিতে লুটিয়ে আছে। মৃত্যুর উদ্ভাসিত হাসি।'

অ্যানেব বর্ণনায় আমাব চোখেব সামনে সাগব যেন শুকিয়ে গেল। শুধু লবণের বিস্তার। অ্যান বললে, 'তা, তুমি ধান ভানতে শিবেব গীতের মতো অত ওপর থেকে কেন শুরু করলে?'

'কি কববো বলো! মনে মনে মেকসিকোব মাথার দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলুম সিয়েরা মাদ্রে পর্বতশৃঙ্গ। কিভাবে কোথা থেকে আসছে, দেখেছ। গোটা আমেবিকার পশ্চিমপ্রান্তে পাহাড়ের খেলা। সমুদ্রেব চেয়ে পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরেব ধ্যান কবে মনটাকে ঠেলে তুলতে চাই। সিয়েরা মাদ্রে যেন রকি পর্বতেরই সম্প্রসারণ।'

'ধবেছ ঠিক। মেকসিকোর মাথাব দিকটায় প্রকৃতির ভৌতিক খেলা। ডেথ ভ্যালি, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, একটু নিচে ইম্পিরিয়্যাল ভ্যালি। এই ইম্পিরিয়্যাল ভ্যালি মেকসিকোর সীমানা স্পর্শ করেছে। কোথায় সমুদ্র। কোথায় প্রাণ-জুড়ানো শীতল বাতাস। শুকনো, শুষ্ক প্রান্তর। মাইলের পর মাইল। রোদে পুড়ে যাচ্ছে। কলোরাডো নদী থেকে জল এনে সামান্য সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সেচেই ফলছে ফলপাকড়, খেজুর, টোম্যাটো, বিলিতি ঘাস। বিলিতিই বলি; কারণ চেহারাটা সাধারণ ঘাসের থেকে আলাদা। জন্মায় তুলো। আব চলে ডেয়ারিব ব্যবসা। তুমি ঘোড়া কিনে ভালই করেছ। উত্তর দিক থেকে মেকসিকোয় ঢোকা সহজ নয়। কি কাণ্ড যে হয়ে আছে। সিয়েরা মাদ্রে পর্বতমালা দু' ভাগে ভাগ হয়ে নেমে এসেছে সিয়েরা মাদ্রে ওরিয়েন্টাল্, সিয়েরা মাদ্রে অকসিডেন্টাল। সিয়েরা মাদ্রে ওরিয়েন্টাল রকি পর্বতমালারই অংশ। অবশ্যই একটা বাধা ; তবে অকসিডেন্টালের মতো নয়। মাঝে মাঝেই পাহাড় ফুঁড়ে নদী চলে গেছে। নদী মানেই ছোটখাটো উপত্যকা। পূর্বে এই পাহাড়শ্রেণী ঢালু হয়ে নেমে গেছে গাল্‌ফ কোস্টের দিকে। তোমার ঘোড়া নিয়ে নেমে যেতে পার ওই ঢাল

বেয়ে নিম্নভূমিতে। ধনুকের মতো ভূ-ভাগ ঘুরে গিয়ে স্পর্শ করেছে য়ুকাটন পেনিনসুলা।'

'কি দেখতে পাবো?'

'প্রথমে তুমি গরমে ভেপসে যাবে। তুমি চলেছ, গাল্‌ফ অফ মেক্সিকোর তটরেখা ধরে, তোমার ঘোড়ায় চেপে টুকুর টুকুর করে। জলা। ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। তোমার ঘোড়ার পা ফেলার খপাত খপাত আওয়াজ। অজস্র লেগুন দেখতে পাবে। ক্রমশই মনে হতে থাকবে তুমি আর পারছ না। তৃষ্ণার জল পাবে না। তিন দিনেই জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে দুম করে জলায় পড়ে যাবে। তারপর! তারপর তৈরি হবে বীরের স্মৃতিস্তম্ভ।'

'আমি ওদিকে যাবই না।'

'আগে ওইদিকে জনমনুষ্যই ছিল না। দিন দিন জনসংখ্যা বাড়ার ফলে, মানুষ গেছে। চাষবাস হচ্ছে। ফলছে কলা, তুলো, কফি, অন্যান্য গ্রীষ্মাঞ্চলীয় ফসল। আর যা হয়, পাওয়া গেছে তরল সোনা পেট্রল। গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল অয়েলফিল্ড। ওদিকে আছে দুটি বড় শহর, ট্যাম্পিকো আর ভেরাক্রুজ। তবে, বিপদে পড়বে তুমি যদি সিয়েরা মাদ্রে অকসিডেন্টাল ধরে আসতে চাও। এবড়ো খেবড়ো পর্বতমালা। চলেছে তো চলেছেই। সমুদ্রভাগের সঙ্গে যোগাযোগের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। পাহাড় ফুঁড়ে কোনও পথ বের করা সম্ভব হয়নি। মেকসিকোর সবচেয়ে অনগ্রসর, বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চল। উত্তর-পশ্চিমে সোনোরা মরুভূমি। সোনোরার মাথার ওপর প্যাসিফিকের ধারে আর একটি মরুভূমি মোজাভে। ভাবতে পারো, একদিকে বিশাল সমুদ্র। আর একদিকে মরুভূমি। কোনটা কতটা বেলাভূমি আর কোথায় শুরু মরুভূমি কে বলবে? তবে জেনে রাখো, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে, মরুভূমিতেও চাষ হচ্ছে। গমের চাষ। পশুপালন হচ্ছে। এমন কি মাছের চাষও। গোটা মেকসিকোটাই পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের বৃত্তের মাঝখানে জেগে আছে সুখ সমৃদ্ধির অঞ্চল, যাকে বলা হয় মেসা সেন্ট্রাল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার এমনকি আট হাজার ফিট উঁচু। গ্রীষ্মাঞ্চল থেকেও উচ্চতার জন্যে নাতিশীতোষ্ণ। হাল্কা বৃষ্টি। চাষাবাসের পক্ষে যথেষ্ট। গম আর ভুট্টার প্রাচুর্য। অনেকটা জায়গাই বাতিল। যেটুকু পাওয়া গেছে তাইতেই স্বর্গ। দেশের বেশির ভাগ মানুষই এই কেন্দ্রীয় মালভূমির বাসিন্দা। যেখানে আবহাওয়ায় সারাটা বছরই সুন্দর। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম। বুঝলে, মেকসিকোর আলাদা একটা চরিত্র আছে। একটা দেশে এত রকম সহজে পাওয়া যায় না। পাহাড়ঘেরা এই মালভূমিতেই রয়েছে মেকসিকোর সবচেয়ে বড় দুটি শহর--মেক্সিকো সিটি। মেকসিক্যানরা বলে সিয়ুদাদ দ্যা মেকসিকো। আর একটির নাম, গায়ুদালাজারা। আর পাহাড়ে বসেছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ওই বিদ্যুৎ সাহায্য করেছে নানা ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে। মালভূমির একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের শহরটির নাম মেকসিকো সিটি। চারপাশে তার উর্বর উপত্যকা। মেকসিকো শহরের দক্ষিণে পরপর এক সার আগ্নেয়গিরি। কয়েকটি এখনও পুরো মাত্রায় জীবিত। পাশাপাশি দুই যমজ শিখর, পোপোকাটাপিটেল মানে 'ধূমায়িত পর্বত', আর একটি নাম ভারী সুন্দর ইসতাসিহুয়াতল, মানে নিদ্রিত নারী। পোপোকাটাপিটেল প্রায় আঠার হাজার ফিট উঁচু। তোমার ভাগ্য ভাল হলে অগ্ন্যুৎপাত দেখেতেও পারো। মেকসিকো হল, পাগলা ভূ-খণ্ড। যে কোনও সময় যে কোনও কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। উত্তর দিক থেকে তোমার ঘোড়া আসছে তো?'

'শুধু আমার কেন, তোমার জন্যেও তো কিনেছি। তুমিও তো আসছ পাশাপাশি। ম্যাকেনাজ গোল্ড-এর গ্রেগরি পেক হলুম আমি। মনে করো! হাসবে না কিন্তু। আর তুমি হলে সেই ইন্ডিয়ান নারী। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দিয়ে আসছি দু'জনে সানতিয়াগো নদীর মতো।'

'কোলরাডো মালভূমি আর গ্রেট বেসিন এলাকার চেহারা জানো! আমাদের সানস্ট্রোক হয়ে যাবে। প্রায় মরুভূমি। কিছুই জন্মায় না। শুধু ঝোপ। মুড়ো খ্যাংরা, আর ক্যাকটাস। আর সামান্য বৃষ্টি যেখানে হয়, সেখানে ঘাস। কি দেখছ?'

'ঘাস। অ্যারিজোনার ঘাস। পাল পাল ভেড়া আর গরু।'

'ওই দেখ পেন্টেড ডেজার্ট দেখতে পাচ্ছ?'

'বলে দাও আগে, কেমন দেখতে, তারপর তো দেখব।'

'হলদে বালি নয়। তোমার চোখের সামনে পড়ে আছে নানা বর্ণের একটি ছবি। শামুক আর

ঝিনুকের নানা বর্ণের খোলা আর বালিপাথর। বৃষ্টিহীন এক বিচিত্র ভূখণ্ড।'

সমুদ্রের বাতাসে রোদ যেন উড়ে যাচ্ছে। তাই এতক্ষণ রোদে পড়ে থাকলেও গরম লাগছে না একটুও। আলো আর আলো। সুনীল সমুদ্র। সুফেন ঢেউ। আমরা যেখানে বসে আছি সেই অংশে সমুদ্রের তর্জন-গর্জন ভয়ঙ্কর। আঘাত হানছে তো হানছেই। এলোমেলো বাতাসে অ্যানের সোনালি চুল মা অন্নপূর্ণার চুলের মতো পিঠে, কপালে, বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখের পুরোটাই চুলে ঢাকা পড়ে গেছে। খাড়া নাকটি জেগে আছে।

হঠাৎ আমাদের নিচে স্লেট রঙের ইউনিফর্ম পরা সাংঘাতিক চেহারার একজন মানুষকে দেখা গেল। তিনি আমাদের উদ্দেশ্য করে কিছু বলছেন। ঢেউয়ের শব্দে কিছু শোনা যাচ্ছে না স্পষ্টভাবে। লোকটি আরও কাছে এসে, কিছুটা ওপরে উঠে বললেন, 'নেমে এসো, নেমে এসো। ওখানে বসে আছ কোন সাহসে। জানো না ওটা একটা স্নেকপিট!'

আমি লাফ মেরে উঠতে যাচ্ছিলুম, অ্যান আমার হাত চেপে ধরে বললে, 'অত ভয় পাবার কি আছে! আমরা এতক্ষণ বসে আছি, একটা সাপও কি চোখে পড়েছে!' অ্যান লোকটিকে বললে, 'ঠিক আছে, আমরা নেমে যাচ্ছি।'

লোকটির মুখ দেখে মনে হল, আমাদের জন্যে খুবই চিন্তিত। লোকটির কোমরে চওড়া বেল্ট। সেই বেল্ট থেকে ঝুলছে চামড়ার খাপে ভরা রিভলবার। লোকটি নিচে নামতে নামতে বললেন, 'তাড়াতাড়ি নেমে এসো। জানো না, তোমরা কি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ।'

অ্যান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। সূর্য তখন আকাশের এমন একটা স্থানে, তীরের মতো একফালি আলোর রেখা সেই রহস্যময় গহ্বরে ঢোকার সুযোগ পেয়েছে। অ্যান সেই আলোয় ভেতরটা দেখার জন্যে ঝুঁকতে গেল।

আমি হাত চেপে ধরলুম, 'করছ কি!' ভীতু মানুষের যা হয়। অ্যানকে ঝুঁকতে দেখে মনে হল হঠাৎ একটা সাপ যদি ফোঁস করে উঠে ছোবল মারে। স্নেকপিট মানে, অসংখ্য বিষধর সাপের বৈঠকখানা! গহ্বরের পাড়ে দুটো হাত রেখে অ্যান কিন্তু ঝুঁকে পড়ল। আমাকেও টেনে নিল পাশে। বেশ রাগরাগ ভাবে বললে, 'তুমি আমার সঙ্গে আছ, একটা কথা জেনে রাখো, তুমি মরার আগে আমি মরব। তোমাকে বিপদে ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয়।'

'আমি আমার বিপদের কথা ভাবছি না। তোমার বিপদের কথা ভেবেই ভয় পেয়েছি।'

'আমার আবার বিপদ কী?'

'আরে ওই স্নেকপিটে তুমি আমেরিকান বীরত্ব দেখাচ্ছ, র‍্যাটল স্নেক, স্যান্ড ভাইপার, এই সবের নাম কি তুমি শুনেছ!'

'শুনবো না কেন, তবে তুমি বড় ক্রেড্যুলাস। যে যা বলে, তাই বিশ্বাস করো। এটা স্নেক-পিট নয়, পিট। গহ্বর একটা। দু-একটা সাপ থাকলেও থাকতে পারে। ভেতর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, মনে হচ্ছে বিরাট এক মানুষের গলায় উঁকি মারছি। দেখতে পাচ্ছি টনসিল, আলজিভ। দেখবে এসো।' অ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি মারলুম। যা বলেছে তাই। সমুদ্রের বাতাসের ঝাপটায় অ্যানের সমস্ত চুলে আমার মুখ ঢেকে গেল। ফিচ করে একবার হাঁচলুম।

অ্যান বললে, 'কি, সর্দি ধরালে! এত করে বললুম, মেকসিকোতে দয়া করে অসুখ বাধিও না।'

'আরে এটা সর্দির হাঁচি নয় তোমার সোনালি চুলের হাঁচি।'

দু'জন হাত ধরাধরি করে সেই রহস্যময় গহ্বর মুখ থেকে নেমে এলুম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলুম, হে ঈশ্বর ওটা যেন সত্যিই একটা শিশু আগ্নেয়গিরি হয়। তাহলে এই দর্শন হবে আমার বাকি জীবনের গর্ব। আর তা যদি না হয়, তাহলে যেন একটা তৈলকূপ হয়। মেকসিকোয় প্রচুর পেট্রল আছে। পেট্রল উৎপাদনে বিশ্বে মেকসিকোর স্থান চতুর্থে। সৌদি আরবের পরেই মেকসিকো। সঞ্চয়ের পরিমাণ ৭২ বিলিয়ান ব্যারেল। গাল্‌ফকোস্টের নাবাল স্থানে পড়ে আছে একের পর এক তৈলকূপ। সৃষ্টির পশ্চাৎপটে সময়ের হিসাবে বেশ কিছুটা সরলে আমরা দুটি জিনিস দেখতে পাব। রহস্যের এক সভ্যতার উত্থান। অ্যাজটেক, ওলমেক, মায়া। এরা এলেন কোথা থেকে। কি ছিল তাঁদের জীবনচর্যা। কেন তাঁরা যুদ্ধবিমুখ ছিলেন। মায়াদের মতো কেন তাঁরা মুছে গেলেন। মিলিয়ে গেলেন ভোজবাজির মতো। যুগযুগ ধরে পুরাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিকরা ছুটে আসেন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপে।

জোড়া লাগাতে চান ইতিহাসের ছিন্নসূত্র। গড়ে তোলেন এক এক কাহিনী। হিসেবে মেলে না। খোপে টেঁকে না যুক্তি।

আর দেখতে পাওয়া যাবে খনিজ তৈলের সৃষ্টি। সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসে ডুবে যেত গালফ্‌কোস্ট। দিনের পর দিন তলায় জমত সামুদ্রিক উদ্ভিদ, শামুক, ঝিনুক, সামুদ্রিক জীবসমূহের দেহাবশেষ। তার ওপর জমত লবণমৃত্তিকা। স্তরের পর স্তর জমতে জমতে চাপে আর উত্তাপে শুরু হত রাসায়নিক বিক্রিয়া। ধীরে ধীরে সেই সব রূপান্তরিত হল মহার্ঘ ঐশ্বর্যে, যার নাম পেট্রল। সভ্যতার গতি-রথের প্রধান জ্বালানি। পেট্রলে আছে মেকসিকোর স্থান সৌদি আরবের পরেই।

মেকসিকোর আর এক ঐশ্বর্য হল খনিজ সম্পদ। রুপো, সোনা, তামা, সীসে, লোহা, গন্ধক, ক্যাডমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, পারা, টাংস্টেন। প্রায় চল্লিশ রকমের মূল্যবান খনিজ পদার্থ। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রচুর খনিজতেল আর নানা রকমের মূল্যবান ধাতু অবলম্বন করে দ্রুত বেড়ে উঠেছে মেকসিকোর আধুনিক শিল্প-অর্থনীতি। ১৯৭০ থেকে ৮০ এই দশ বছরের ইতিহাস একটানা অগ্রগতির ইতিহাস। প্রতি বছর শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার ছিল ৮.১ শতাংশ। ১৯৮০-র চৌকাঠ পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বগ্রাসী মন্দার কবলে চলে গেল টানা অগ্রগতির ধার। এখন একটু কষ্টেই চলেছে মানুষের দিন। সমুদ্রসৈকতে অর্ধোলঙ্গ ওই ট্যুরিস্টরাই এখন মেকসিকোর একটি বড় উপার্জনের পথ। চোখে সানগ্লাস, অনাবৃত শুভ্র শরীর পড়ে আছে নিশ্চল পাশাপাশি, পাশাপাশি। এক একটি শরীর এত চকচকে যে সূর্য প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ভগবান এদের সব শরীর দিয়েছিলেন বটে; সেই কারণেই মনে হয় ধর্মকর্ম হল না।

আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে এলুম। রোদ ভীষণ চড়ে গেছে। অ্যান বললে, 'সামান্য একটু বিশ্রাম করা দরকার। আমরা বহুক্ষণ জেগে আছি।'

'সে তো তুমিই বললে, আমরা এ-কদিন আর ঘুমবো না। এত কিছু দেখার আছে, যে একজীবনে দেখে শেষ করা যাবে না।'

'এখনও বলছি, ভবিষ্যতেও বলব। এই তো জানালার ধারে সরে এসো।'

বিশাল জানালা। অ্যান ঘরে এসেই পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। আকাশ সমুদ্রের ওপার দিয়ে দিগন্তে হারিয়ে গেছে। একমাত্র পাখিই জানে এ-আকাশের শেষ কোথায়।

৫২

অ্যান বললে, 'তাকিয়ে দেখ। আকাশ। আকাশের তলায় দেশের পর দেশ, গুয়াতেমালা, সানসালভাদর, মানাগুয়া, সানজোস, পানামা, পানামাযোজক পেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর আমেরিকার মতই আর এক মহাদেশ। আরও বিচিত্র। আরও রহস্যময়।'

অ্যান বলল, 'ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, পেরু, চিলি, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, কলম্বিয়া। গোটা পৃথিবীটাকে কোনও মানুষ যদি ঠিক ঠিক দেখতে চায়, এক জীবনে পারবে! এর পরেও তুমি ঘুমোতে চাও। অমি তোমাকে ঘুমোতে বলিনি। বলেছি একটু বিশ্রাম করতে। তোমার তো খাওয়া-দাওয়ার আবার নানা বায়নাক্কা। এই খাবো না, সেই খাবো না। মদ খাবো না। এনার্জিটা আসবে কোথা থেকে?'

'কেন, ভাত, মুগের ডাল, নটে শাক, সজনে ডাঁটা আর পোস্ত থেকে।'

'পোস্ত, পোস্ত, পোস্ত প্রায় শ'খানেক বার শুনলুম। তোমার বাড়িতে গেলে, সবার আগে আমি পোস্ত খাবো।'

'বড়ি পোস্ত।'

'কোথা থেকে আবার বড়ি আমদানি করলে।'

'একটা কথা বলবে অ্যান, তুমি বাঙালি হয়ে যাও। বাঙালি মেয়ে হলে তুমি বুঝতে পারবে, জীবন কত কোমল, কত স্নেহের, কত প্রেমের। তোমাদের দেশে তো ফ্যামিলিই নেই। বাবা, মা

ভাই, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর। বাঙালির রান্নাঘরে প্রোটিন হয় তো কিছু কম আছে। কিন্তু স্নেহের অভাব নেই। পিঠে খেয়েছ? নতুন গুড়ের পায়েস। কামিনীভোগের গন্ধ শুঁকেছ? গাওয়া ঘি দিয়ে বাসমতী চালের ভাত খেয়েছ? আমরা টেবিলে খাওয়া ধরেছি হালে। মায়ের হাতের আসনে বসে, কচি কলাপাতায়, অড়হর ডালের সঙ্গে গরম ভাত বড়ি ভাজা। আমরিক-দুহিতা, তোমাদের কেবল হটডগ আর হুচকির হেঁচকি। ফাস্ট কার, ফাস্ট লাইফ, ডেথ। বৈশাখের দুপুরে কালো কুঁজোর কর্পূর দেওয়া এক গেলাস জল খেয়ে দেখো।'

আমার লেকচারে অ্যান বেশ কাবু হয়ে বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়ল। একটা হাত কপালে পড়ে আছে আলতো। আঙুলে দুলছে ফ্লোরেন্স স্যান্ডেলের উপহার, চকচকে সেই চাবির রিং। কিছুক্ষণ ওইভাবে থাকার পর বললে, 'হিন্দু থেকে খ্রীস্টান হওয়া যায়, আমেরিকান থেকে কি করে বাঙালি হওয়া যায়!'

'শাড়ি পরো। মাথায় ঘোমটা দাও। কপালে সিঁদুর। হাতে পুজোর থালা। তার ওপর জ্বলছে একটি প্রদীপ। এইবার মনে মনে বলো আমি নারী আমি মা, আমি বিশ্বজননী। আমি শক্তি। আমি মা দুর্গা। বার বার বলতে বলতে তোমার ভেতর একটা পরিবর্তন আসবে। তোমার মানসিকতা পাল্টে যাবে। তুমি অনুভব করবে, আমি মানবী নই, আমি দেবী।'

'ঘোমটা আর সিঁদুর জিনিসটা কি?'

'দেখতে চাও?'

আমার ব্যাগে নীলরঙের পাতলা চাদর ছিল। চাদরটা বের করলুম। অ্যানকে বললুম, 'তোমাব লিপস্টিকটা দাও।'

অ্যান ব্যাগ খুলে স্টিকটা দিতে দিতে বললে, 'এটা দিয়ে কি করবে?'

'দেখ না কি করি।'

অ্যানের কপালেব মাঝখানে গোল করে একটা টিপ আঁকলুম। নীল চাদরের ঘোমটা টেনে দিলুম মাথায়। বললুম, 'যাও আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও।'

অ্যান উঠে গেল। আয়নার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'ফ্যান্টাসটিক। আমাকে বেশ নরম দেখাচ্ছে তো।'

'তাও তো পরিবর্তনের হয়েছে মাথায় দিকে। শাড়ি পড়লে কি হবে একবার ভাব। আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ে হলে কি করে জানো তো, সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়।'

'সিঁথি কাকে বলে?'

'চিরুনিটা নিয়ে কাছে এস।'

অ্যান এগিয়ে এল। চুল দু'ভাগ কবে দেখিয়ে দিলুম সিঁথি কাকে বলে। অ্যান বললে, 'একটু লিপস্টিকই না হয় লাগিয়ে দাও।'

'না, তাহলে তো তোমার সঙ্গে আমার বিয়েই হয়ে গেল। ধর্ম নিয়ে খেলা করা ঠিক নয়।'

'তুমি এতটাই বিশ্বাস করো?'

'অতটাই বিশ্বাস করি। বিদেশে এলেও বিশ্বাস ছাড়তে পাববো না।'

'আমাকে তুমি ঘৃণা করো?'

'যাঃ, তা কেন! কি কথায় কি সিদ্ধান্ত? তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'ভালোবাসো না?'

'বাসি।'

'তাহলে? তাহলে ধরো বিয়ে হল।'

'ভয়ে মরে যাবো। আমার বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই। বারো বাই তেরো ঘর। কার্পেট নেই, গীজার নেই, ওয়াশিং মেশিন নেই। দরিদ্র বাঙালি।'

অ্যানের মুখ গম্ভীর হল। মাথার চাদর খুলে ফেলল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হল অ্যান? রাগ করলে?'

'না কিছু হয়নি। বুঝতে পেরেছি, ইস্ট ইজ ইস্ট, ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট, দি টোয়েন শ্যাল নেভার মিট।'

'আছে, একটা মিটিং-প্লেস আছে। ইনটেলেক্ট, অ্যাণ্ড রিলিজান।'

'তুমি একটা জোচ্চর।'

অ্যানের কথায় অসম্ভব ঘাবড়ে গেলুম। আমি জোচ্চর!

'জোচ্চর কেন বলছ?'

'তুমি বলেছিলে আমাকে ধ্যান শেখাবে। প্রাণায়াম শেখাবে। যোগাসন শেখাবে, শীর্ষাসন শেখাবে। সেই ব্যাপারে তো একটা কথাও তোমার মুখে শুনছি না।'

'বেশ, আমাদেব এখন পেট খালি। এসো আসন করা যাক। তোমার পোশাক পাল্টাও।'

'কেমন পোশাক?'

'তোমার নেই। আমি দিচ্ছি।'

আমার একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি বের কবে দিলুম। পাজামাটা কোনওরকমে হল। পাঞ্জাবিটা হল না। শেষপর্যন্ত ওপর দিকটা ওয়েস্টার্নই রয়ে গেল। কি আর করা যাবে। কার্পেটেই শুরু হল। প্রথমে ভুজঙ্গাসন। তারপর শশঙ্গাসন।

ভ্রমণেরও একটা ক্লান্তি থাকে। আসনে একটা বিষয়ান্তর হল। দীর্ঘ বিমান-ভ্রমণেব পর শরীর সামান্য বেহাল হয়, যাকে বলে জেটল্যাগ। শরীর মোটামুটি ঝবঝরেই হতে লাগল। তাকে বিব্রত বা ছোট করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি বাহাদুরি দেখাতে আসিনি। শিক্ষার হাত-ফেব। অ্যান আমাকে ইতিহাস শেখাবে পুরাতত্ত্ব শেখাবে। আমি অ্যানকে শেখাব শ্বাস-প্রশ্বাসের কায়দা, শরীরকে দুমড়ে মুচড়ে হঠযোগের কায়দা। শবাসন যে সবচেয়ে কঠিন আসন, অ্যান তা স্বীকার করল। পা থেকে মাথা এমনকি মন পর্যন্ত শিথিল করা।

সব শেষে শীর্ষাসন সে করবেই। যোগের বইতে পড়েছে, শীর্ষাসনে যৌবন স্থায়ী হয়। মেধা বাড়ে, বাড়ে স্মৃতিশক্তি। জেনে নিলুম, দাঁত, চোখ, প্রেসার সব ঠিক আছে কিনা। আছে। প্রথমে আমি কবে দেখালুম। অ্যানকে নিয়ে এলুম দুটো দেয়ালের কোণে। প্রথম প্রথম একটা অবলম্বন চাই। নিজের চেষ্টায় উঠতে যে পারবে না, তা জানতুম। পা দুটো ধরে তুলে দিলুম। তিরিশ সেকেন্ড রেখে নামিয়ে দিলুম।

অ্যানের ফর্সা মুখ, গোলাপি গাল, ঝকঝক করছে। সারা জীবন যদি আসন ধরে রাখতে পারে অ্যান আরও সুন্দবী হবে।

অ্যান বললে, 'কি বুঝলে, আমার হবে?'

'হবে না মানে? তোমার হবে না তো কার হবে। তুমি কি বুঝলে?'

'রিয়েলি সামথিং। কিন্তু ধ্যান আব প্রাণায়াম?'

'ধ্যান হবে আজ রাতে। প্রণায়াম কাল ভোরে।'

'দাঁড়াও, তোমার পাজামাটা আমি কেচে দি।'

'এই তো, তোমার মধ্যে বাঙালি মেয়ের বোধ এসে গেছে। থাক, তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না। ওটা আসনের জন্যেই তোলা থাক।'

'বুঝলে, আমার শরীরের চাপে জায়গায় জায়গায় সেলাই খুলে গেল।'

'যাক গে।'

আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা আবার নিচে। ভারত থেকে মেকসিকোয় পতন। অ্যান একটা সেই প্রলয়ঙ্কর শব্দকারী, রথসদৃশ গাড়ি ভাড়া করল। আমরা গ্রামে যাবো। সেখানে গিয়ে কোনও গ্রাম্য ভোজনালয়ে মেকসিকোর সবচেয়ে নামী খাবার টরটিলা খাবো।

যে গাড়ি দেখে সবচেয়ে ভয় পেয়েছিলুম, শেষে সেই রথেরই আরোহী হতে হল। জড়োসড়ো হয়ে বসে আছি দেখে অ্যান বললে, 'ভয় নেই। এ-যন্ত্র স্কুটারের মতোই। আমি আস্তে চালাবো।'

দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে গাড়ি স্টার্ট নিল। থরথব কাঁপুনি। মেকসিক্যান ভূমিকম্পের মতো।

'অ্যান, কেন বলো তো এত শব্দ হয়।'

গাড়ি ছুটছে। অ্যানের চুল উড়ছে। কপালে লিপস্টিকের সেই টিপ দুর্দান্ত দেখাচ্ছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে অ্যান বললে, 'মেকসিক্যানদের সঙ্গে ভাল করে মেলামেশা করলে চরিত্রের দুটো দিক দেখতে পাবে, দুটো বৈপরীত্য। কখনও ভীষণ রাগী, কখনও ভীষণ বিনয়ী, কখনও অতি

সহযোগী, কখনও ভীষণ উদ্ধত, কঠোর, কখনও ভীষণ লাজুক, কখনও আবার নাছোড়বান্দা। এই স্বভাবকেই স্প্যানিশ ভাষায় বলে ম্যাচো। ইংরেজরা বলবে, মেল, ম্যাস্কুলাইন। পুরুষালি। এতেও সবটা প্রকাশ পেল না। মানুষের স্বভাব নয়, এইটাই হল কালচার। বিখ্যাত মেকসিক্যান লেখক অকটাভিয়োপাজ এই চরিত্রের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—'আগ্রাসী, স্পর্শকাতরতা, অবশ্যতা প্রভৃতি চারিত্রিক সুন্দর বৈশিষ্ট্য, যাকে বলা ম্যাচো, তা একটি মাত্র কথায় সুস্পষ্ট, পাওয়ার। শক্তি। ফোর্স। অ-শৃঙ্খলিত শক্তি। ডিসিপ্লিন সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা, লাগামছাড়া ইচ্ছাশক্তি, যে ইচ্ছে কোনও একটা নির্বাচিত পথ ধরে ছোটে না। ম্যাচো বা পাওয়ারের প্রকাশ ঘটে মানুষকে আহত করে, অপমান করে, ছোট করে, মানুষকে মেরে। আমাদের চারপাশের জগৎকে আমরা নিরাপদ মনে করি না। কেন করি না, তা আমাদের ইতিহাস, আমাদের তৈরী সমাজের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। আমাদের পরিবেশ রুক্ষ, বিরূপ, বাতাসে ভাসমান অজানা একটা ভয় লুক্কায়িত। প্রকাশ জানা নেই। সেই কারণেই আমরা আমাদের মধ্যে গুটিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের প্রতীক হল ক্যাকটাস। সমস্ত জল ভেতরে সঞ্চিত। পাতা নেই, শুধু কাঁটা। সেইটাই হল বাঁচার কৌশল।' মেকসিকোর মানচিত্রের দিকে তাকাও, দেখবে, এলোমেলো কিছু ভূ-খণ্ড যেমন তেমন ভাবে লেগে আছে। কোনওটার সঙ্গে কোনওটার মিল নেই। আর সৃষ্টির আদিকালে তাই ঘটেছে। সেই দেশের বাহন একটু বিকট শব্দ করতেই পারে। উলটেও যেতে পারে।

অ্যান, আমি ভয় পাব বলে খুব সাবধানেই গাড়ি চালাচ্ছে। অচেনা, অজানা পথ সামনে ছুটেছে শিশুর মতো। হোটেল আর সমুদ্র এলাকা থেকে সরে আসার ফলে প্রকৃত মেকসিকোকে যেন দেখতে পাচ্ছি। মাটির রঙ আমাদের দেশের মতো নয়। ঘাসের চেহারাও কেমন যেন অচেনা। গাছপালাও অপবিচিতি। সমতল তো বলাই চলে না। জমির রঙ কালচে কালচে। এই প্রথম ট্যুরিস্ট ছাড়া মেকসিকোর এই অঞ্চলের প্রকৃত বাসিন্দাদের দর্শন পেলুম। ধনীর আন্তর্জাতিক ঘরবাড়ি নয়। যে অঞ্চলেই বসবাস করুন পৃথিবীর সমস্ত ধনীর একই জাত। একই রকম ঘববাড়ি, প্রাচুর্য, জীবনযাত্রার ঢঙ। এঁরা হলেন সাধাবণ মেকসিক্যান। কারুব জীবিকা হয়তো হাতেব কাজ, কারুর জীবিকা চাষবাস, মাছ ধরা। দরজার সামনে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছেন মেয়েরা। সকলেই বেশ স্বাস্থ্যবান। মেকসিক্যান পরিবার নেহাৎ ছোট নয়। স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতা মাতা নিয়ে সংখ্যায় বিরাট। সকলকেই দেখতে বেশ ভাল। মধ্যবয়সী পুরুষ আব মহিলারা একটু মোটার দিকেই। এঁদেব খাদ্যে ফ্যাটেব ভাগ বেশি।

'অ্যান, টরটিলা জিনিসটা কি? কচ্ছপ?'

অ্যান হা হা করে হাসল। তার উড়ন্ত লম্বা চুলের মতো হাসিটাও বাতাসে উড়তে লাগল।

'খেলেই বুঝতে পারবে টরটিলা জিনিসটা কি।'

প্রশ্ন ছিল, করা গেল না। ফাঁকা মাঠের দমকা বাতাসে অ্যানের সমস্ত চুল আমার মুখে জড়িয়ে গেল। কয়েক গোছা আটকে গেল চশমায। একেই বলে চুলে-চশমায় গাঁটছড়া।

আমরা বিকট শব্দ করতে করতে, সকলকে সচকিত কবে, গ্রামীণ নিস্তব্ধতা খান খান করে, বিগত দিনের কনকুইসতাদোরের মত একটি মৎস্যজীবীদের গ্রামে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। অ্যান যে ওইরকম আচমকা গাড়ি থামাবে, তা বুঝিনি। কোনও কিছু ধরে বসিনি। পড়েই যেতুম ঠিকরে পাথুরে রাস্তার ওপর। অ্যান তৎপর বাঁ হাত দিয়ে আমার কোমবটা জড়িয়ে ধরে পতন থেকে রক্ষা করল।

অ্যানের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, আধুনিক ক্লিওপেট্রা রথ থেকে নামছে। পশ্চিমবাংলার গ্রাম তো নয়; তাই সবুজ অনেক কম। কালচে মাটির কালচে গ্রাম। জনসংখ্যা খুবই কম। মন-কেমন-করানো ধূসর উদার প্রান্তর আকাশ ধরতে ছুটেছে। তবু আমেরিকান গ্রাম তো! তার একটা আলাদা ছিরি। পথের ধারে ছাইগাদা, আঁস্তাকুড় নেই। ঘিয়ে-ভাজা লেড়িকুকুর নেই। অলস মানুষের জটলা নেই। ছবির মতো একটা দুটো বাড়ি কালো আকাশের নিচে খইয়ের মতো ফুটে আছে। পর্দা-ঘেরা জানালায় জানালায় আলোর ইশারা। কোথায় বাজছে স্প্যানিশ গিটার। মাঝে মাঝে ভারি গলায় কেউ দুর্বোধ্য ভাষার গান গেয়ে উঠছে। বড় মিষ্টি সুবেলা কণ্ঠ। এদের সকলেবই গলায় পেপারওয়েটের ওজন। আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে গ্রামটাকে বোঝার চেষ্টা করছি। বুকে একটু শান্তির স্পর্শগ্রহণ করছি। বিশাল একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। সঙ্গে কোনও বোটানিস্ট নেই, তবে মনে হয় এই গাছকেই বলে, রেডউড ট্রি।

বাতাসে গাছের ঝোলা ঝোলা পাতায় ঝুরু ঝুক আওয়াজ। দূর আকাশে ছবির মতো আটকে আছে পর্বতশ্রেণী। গ্রামটা যেন বিশাল একটা কড়াব মধ্য থেকে জেগে উঠেছে। চারপাশের ভূমি বেশ উঁচু। আমাদেব সামনের পথ নিচু হযে আবার ওপবে উঠে গেছে। আমার কণ্ঠে আসছিল, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর সেই গান, "ঘরে ঘবে আলো দেখে লাগে ভাল'।

গাছেব ডালে ঝুলছিল সাব সাব ছাতা। একেকটা ছাতা খুলছে আর হুস কবে উড়ে যাচ্ছে বাতেব আকাশে তারাব সন্ধানে। একসঙ্গে এত বাদুড আগে দেখিনি। প্যাবাট্রুপাবদের মতো খুসখাস খুলে পডছে, আর বৃত্তবচনা করে অন্ধকাবেব জীব অন্ধকাবে মিলিযে যাচ্ছে। মনে মনে হাসলুম, মনের কি বিমুগ্ধ অবস্থা। বিদেশে এসেছি বলে বাদুডও এমন দর্শনীয। হঠাৎ একটু ভয়েব ভাব এল, ওগুলো ভ্যাম্পাযাব নয তো। অ্যানকে জিজ্ঞেস কবলুম। অ্যান বললে, 'অত সৌভাগ্য তোমার এই মধ্য আমেবিকায হবে না। যেতে হবে আবও দক্ষিণে, আমাজনেব গভীব ভ‍্যপসা অরণ্যে। প্রকৃত ভযেব জাযগা তো ওইটাই। ওখানেই পাবে বিশাল পাইথন। পাবে পিবহানা। আস্ত একটা ঘোড়াকে একঘণ্টায কঙ্কাল কবে ছেড়ে দেবে।'

গাছতলায আমাদেব সেই প্রলযঙ্কবী চতুষচক্রযানটিকে ফেলে বেখে, ধীবে ধীবে ঢালু পথ ধবে নিচে নামতে লাগলুম। কোথা থেকে হু হু কবে শীতল বাতাস আসছে জানি না। শবীব একেবাবে ওুডিযে যাচ্ছে। কাকুব কাকুব মাথায সুন্দব বিমঅলা টুপি। এক বৃদ্ধ পাশ দিযে যেতে যেতে প্রশ্ন কবল 'ট্যুবিস্ত?' অ্যান বললে, 'সে।'

একাকী বযসেব ভাবে ন্যুব্জ সেই মানুষটি টুকটক কবে আমাদেব সামনে সামনে হাঁটতে লাগল। তাব পবনেব ঢোলা প্যান্ট। চেক হাওযাই শার্ট। যখন হাঁটছে ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে। তাব মানে পকেটে এক গাদা পেসো আছে। পেসোব মুদ্রা যেমন ভাবি তেমনি মোটা। ধাতুব শ্রাদ্ধ। মুদ্রা দেখলেই বোঝা যায, এদেশে ধাতুব ঐশ্বর্যেব শেষ নেই। দেশেব ঠিক কোন অঞ্চলটায আছে ওই সব খনি! একটা তৈলকূপ যদি দেখতে পেতুম। অযেল অ্যান্ড ন্যাচাব্যাল গ্যাস। কাছাকাছি আছে কোথাও।

অ্যান সেই বৃদ্ধ মানুষটিকে জিজ্ঞেস কবল, এখানে কোথাও ভাল একটা খাওযাব জাযগা আছে কিনা, যেখানে দিশি খাবাব পবিবেশিত হয। বৃদ্ধেব মুখটি ভাবি সুন্দব। চামডাব কুঞ্চনে দীর্ঘজীবনেব ইতিহাস। কপালে কে যেন হাল চালিযে গেছে। অসংখ্য গভীব, অগভীব বেখা। খাড়া নাক। নীল চোখ। বৃদ্ধেব কাঁধে ঝুলছে, অপূর্ব কাবকাজ কবা একটা ব্যাগ। বৃদ্ধ অ্যানেব মুখেব দিকে পবিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিযে বললেন, 'আমাকে অনুসবণ কবো।'

পথ আবাব উঁচু দিকে উঠছে দু'পাশে তক শূন্য বন্ধ্যা প্রান্তব। সেই গিটাব আব গানেব শব্দ ক্রমশই পিছনে চলে যাচ্ছে। আমাদেব গতি বাতাসেব বিপবীতে। দূবে দূবে টিপ টিপ আলো জ্বলে উঠেছে। একটা গাছেব তলায দুটো ঘোডা বাঁধা বযেছে। এই গাছটাও আগেব গাছেব মত বিশাল। মনে হয বাওবাব গাছ। যে-সব গাছেব নাম পডেছি, চোখে দেখিনি, সেই সব নাম লাগিযে বেশ পুলকিত হচ্ছি।

পথেব পাশেব একটি বাডি থেকে প্রায় সাদা পোশাক কবা একটি মেযে বেবিয়ে এল। তাব দু'হাতে তোযালে জডান একটি শিশু। প্রায আমাদেব পাশে পাশেই মেযেটি হাঁটছে। শিশুটি ঘুমে অচৈতন্য। বৃদ্ধ মেযেটিকে কি একটা প্রশ্ন কবলেন। মেযেটি উত্তবে দু তিনবাব মেডিকোস, মেডিকোস শব্দটি উচ্চাবণ কবল। সেই থেকেই অনুমান কবলুম, শিশুটিকে নিযে তরুণী মা চলেছে ডাক্তাবখানায়। এখানে গ্রামেও ডাক্তাব আছেন। হযতো ভাল হাসপাতালও আছে।

এমন সময দূবে এক-পাল কুকুব ডেকে উঠল। আমি আচমকা আমাব উল্লাস প্রকাশ কবে ফেললুম, 'এই কুকুব।'

অ্যান বললে, 'কুকুবেও তোমাব ভয।'

'ভয নয আনন্দ। এখানেও তা হলে কুকুব ছাডা আছে? এদেশে তো কুকুরের খুব আদব!'

'ঠিক 'ছাড়া কুকুব' নয। মনে হয ওখানে কোনও ফার্ম আছে। কুকুবগুলো সেই খামারেই পাহাবা দিচ্ছে।'

আমি মনে মনে আশ্বস্ত হলুম, যাক, মেক্সিকোব কুকুবও আমাদেব দেশেব কুকুরের মতই ডাকে।

এইবার একবার দর্শন পেলে চেহারাটা মিলিয়ে নিতুম। বিশ্বজুড়ে মানুষের হরেক ভাষা। অন্তরঙ্গ মেলামেশায় ভাষা এক বিরাট বাধা। বৃদ্ধটিকে কত কি জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে করছে! এই গ্রামের কথা। গ্রামবাসীর কথা। গিটার বাজিয়ে যাঁরা গান গাইছেন, তাঁদের কথা। বড় বড় গাছের কথা। ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির কথা, জাগুয়ারের কথা। বৃদ্ধের দীর্ঘ জীবনের কথা। তাঁর চলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে বৃদ্ধ নাবিক ছিলেন। নাবিকরাই এইভাবে দুলে দুলে চলে, একেই বলে, সেলারস গেট। বৃদ্ধের হাতে পিঠে, সারা গায়ে নিশ্চয়ই উল্কি আঁকা আছে। মেয়েটিকে প্রশ্ন করার ইচ্ছে করছে, শিশুটির কি হয়েছে? ভাষার জন্যে আমার সব প্রশ্নই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। কিন্তু কুকুরদের কি মজা! বিশ্বজুড়ে সব কুকুরের এক ভাষা—ঘেউ, এউ, এউ। আমি না এসে, এখানে যদি আমাদের পাড়ার লালু আসত, তার কোনও অসুবিধেই হত না, সংযোগে। গগন ফাটিয়ে ঘেউক্কার ছাড়ত। আলাপ-আলোচনাটা ঝগড়ার লাইনে গেলেও একটা লেনদেন, একটা বোঝাপড়া হত। আমাদের বিভিন্ন ভাষাই আমাদের এই ব্যবধানের কারণ।

'আমি একটা কুকুর দেখবো।'

অ্যান বললে, 'আবার একটা নতুন বায়না শুরু হল!'

কি করে অ্যানকে বোঝাই, কেন আমার কৌতূহল। বিদেশের কুকুর আর স্বদেশের নেড়ি কুকুরের অর্থনৈতিক বৈষম্যটা জানতে চাওয়া কি দোষের! মানুষ দেখছি, ঘরবাড়ি দেখছি, ভূ-প্রকৃতি দেখছি। হলদে ঠোঁটঅলা শক্তসমর্থ পাখিও দেখেছি গাছের ডালে। যার ঠোঁটের এক ঠোক্করে মাথার ঘিলু ছলকে যাবে। এদেশে ওই ভয়ঙ্কর পাখির নাম টোকান। চিমটের মত বাঁকা বিশাল ঠোঁট। রঙের বাহারও খুব।

আমরা বৃদ্ধকে অনুসরণ করতে করতে চলে এলুম সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। হু হু করছে আকাশ। হিলহিলে বাতাস। শিরশিরে বালি। সমুদ্রের ধারে বেশ জমাট একটি জনপদের জটলা। হাহা হাসির শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। দু'দিকে দু'সার দোকান, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বালি ঢাকা পথ। নরম নরম আলো জ্বলছে। খোলা একটি জায়গায় বসেছে নাচের আসর। গোল হয়ে বসে আছে দর্শকের দল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে নাচছে। ব্যাঞ্জোর মতো কি একটা বাজাচ্ছে আর-একটি ছেলে। তুমুল নাচ। মেয়েটি যখন লাট্টুর মতো ঘুরছে তখন তার ঘাগরা ছাতার মতো ফুলে উঠছে আর দর্শকরা সব উল্লাসে ফেটে পড়ছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেইখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, সমুদ্রের ধার বরাবর বাঁধা রয়েছে এক সাব বড় ছোট নৌকো। বৃদ্ধ সেই নাচের আসরে বসে পড়ার আগে দেখিয়ে দিলেন, কোন দিকে আছে খাবার দোকান।

আমরা সেই মত্ত আসর ছেড়ে, ফল, মাছ আর সব্জীর বাজারেব ভেতর দিয়ে চলে এলুম রেস্তোরাঁয়। জলজ উদ্ভিদ, মাছ আর ফলের গন্ধ মিশে একটা প্রাচীন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যেন হাজার বছর পেছনে চলে গেছি। মৃদু মোলায়েম আলো। পানামা হ্যাট পরা খাড়া নাক আর লালমুখো বলিষ্ঠ মানুষ। স্বাস্থ্যবান মহিলা। খোলামেলা ব্যবহার। নাচেব জিঙ্গল বেল। আকাশের তলায় দেশে দেশে কত কি যে ঘটে!

কাঠের মেঝেঅলা, স্বল্পালোকিত রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলুম। ব্যস্তসমস্ত মহিলারা খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনে ব্যস্ত। রেস্তোরাঁর একটা পাশে যেন সিনেমা হচ্ছে। পাতলা সাদা কাপড়ের পার্টিশান টানা। তার ওপর প্রতিফলিত মুখের প্রোফাইল। হাতের ছায়া। আঙুলে ধরা তাস। পর্দার ওপাশে তাস খেলা চলছে। কোনও কোনও ঠোঁটে গেলাস উঠছে। নেমে আসছে। আমরা এপাশ থেকে ছায়ানাটক দেখছি।

টেবিল চেয়ার টেনে বসতে বসতে অ্যান বললে, 'গ্যাম্বলিং চলেছে। খেলবে নাকি?'

আমিও বসতে বসতে বললুম, 'না বাবা। আমার সে সাহস নেই। ও হল টাফ মানুষের খেলা।' মধ্যবয়সী এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি খেতে চাই।

অ্যান চোখকান বুজিয়ে বলে দিলে, টরটিলা। মহিলা এক গাল হেসে চলে গেলেন। অ্যান আমার বিপরীত দিকে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে। আমি বললাম, 'কি হল? অমন চুপচাপ কেন?'

'হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। মা এখন কি করছে।'

'কি করছেন বলে মনে হয়?'

'মনে হয় রান্না করছেন।'

'তুমি এই টরটিলার সন্ধান পেলে কি করে?'

'সব কিছুরই একটা ইতিহাস আছে, বুঝলে? স্প্যানিয়ার্ডরা যখন এই নতুন জগতে এল তখন তারা শুধু নতুন দেশ নয়, নতুন খাবারও পেল। খাদ্যের এক নতুন জগৎ। ১৫১৯ সালে কর্টেস তাঁর চার শো স্প্যানিয়ার্ড সৈন্যবাহিনী নিয়ে মেকসিকোর অ্যাজটেক সভ্যতা ধ্বংস করে দিলেন। ধ্বংস মানে জয় করে নিলেন। সেই ইতিহাস তোমাকে আমি মায়া সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে বলব চাঁদনী রাতে। এখন বলি খাদ্যের কথা। কনক্যুইস্তাদোররা বেড়াতে বেড়াতে হাজির হলেন আ্যাজটেক রাজধানী টেনকটিটলানের বাজারে। বাজারে ঢুকে তো তাঁরা অবাক। আধুনিক সুপার মার্কেটও হার মেনে যায়। সুন্দর সুন্দর স্টল। অসংখ্য ক্রেতা। অতি সুষ্ঠু ব্যবস্থা। এক একটি স্টলে এক এক রকম জিনিস পরিপাটি করে সাজান। নির্দিষ্ট বিভাগে নির্দিষ্ট জিনিস। শৃঙ্খলার চূড়ান্ত। কোনও স্টলে সাজানো রয়েছে বিনস আর সেজ ও অন্যান্য তরিতরকারি।'

'সেজ জিনিসটা কি?'

'এক ধরনের উদ্ভিদ। ধরে নাও শাক। সাজানো রয়েছে হার্ব। ওষধি। কোনও স্টলে বিলিতি ইঁদুর, খরগোশ, হরিণ, বাচ্চা হাঁস, ছোট কুকুর। অ্যাজটেকেরা খাদ্যের জন্যে এক ধরনের ছোট জাতের কুকুর তৈরি করেছিলেন। নতুন একটা প্রজাতি। কোনও স্টলে মধু। হনিপেস্ট মানে আঠাল মধু। নানারকমের ফল ও নুন। বাজারের আর একদিকে তৈরি খাবারের স্টল। তৈরি খাবারের মধ্যে ছিল স্টু, মশলাদার মেজ পরিজ, ট্যামেল। এখুনি প্রশ্ন করবে ট্যামেল আবার কি! মেকসিকোর বিশেষত্ব। অনেকটা একালের রোল-এর মতো, মাংসকে কিমা করে তাতে লঙ্কা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এইবার ভুট্টার আটার লেচি করে তার মধ্যে পুর হিসেবে ভরে ভুট্টার খোসা দিয়ে মুড়ে ভাপানো হয়। এরই নাম ট্যামেল। খাস মেকসিক্যান ভাষায় নাহুয়াতল তামাল্লি। আর ছিল ট্রাইপ। এইবার প্রশ্ন কর, 'ট্রাইপ জিনিসটা কি?'

'করবই তো। আমি তো তোমার ছাত্র।'

'ট্রাইপ হল পশুর নাড়িভুঁড়ি, অন্ত্র। সভ্যজগতে, না ভুল হল, মায়াসভ্যতা হয়তো একালের চেয়েও উন্নত ছিল। একালের সভ্য দুনিয়াকে যাকে আমরা ট্রাইপ বলি, তা হল পশুর পাকস্থলি। অ্যাজটেকদের জগতে শিকার বলতে ছিল বুনো হরিণ। শুধুমাত্র হরিণের পাকস্থলী বেচে সারা বছর ব্যবসা চালানো সম্ভব ছিল। কিন্তু হাঁস, মুরগী ছিল, জালে বহু ধরনের পাখি পড়ত। ধনীরা খেতেন পাখির মাংস আর পাখির নাড়িভুঁড়ি, মেটে ট্রাইপ হিসেবে চলে যেত দরিদ্রের পাকশালায়। তাই দিয়ে তারা তৈরি করত ট্যামেল। প্রায় পাঁচ শো বছর আগে এই অ্যাজটেক বাজারের বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন কর্টেসের সহযোগী জনৈক সেনানায়ক, বার্নাল ডায়াজ।

'এই চেনা খাদ্যদ্রব্যের পাশাপাশি অ্যাজটেকদের খাদ্যতালিকায় বহু অদ্ভুত ধরনের অচেনা জিনিসও ছিল। রাজধানী টেনকটিটলান গড়ে উঠেছিল একটি লেকের ওপর। সেই হ্রদ থেকে আসত নানা খাদ্য, যেমন ব্যাঙাচি, জলের মাছি, শূককীট, সাদা পোকা। লেকের জলের ধারে ধারে বিচিত্র ধরনের ফেনা হত। সেই ফেনা তুলে এনে চাপ দিয়ে রেখে, চিজের মতো তুলতুলে, স্পঞ্জের মতো নরম একটি খাদ্যবস্তু পাওয়া যেত। ছিল ব্যাঙ। পরিষ্কার জলের চিংড়ি। আর ছিল এক ধরনের জলজ টিকটিকি। গোধিকা। ইংরেজিতে আমরা বলি নিউট, অ্যাজটেকেরা বলত অ্যাকসোল্‌টলস। যা একমাত্র মেকসিকোর জলেই জন্মায়।

৫৩

অপূর্ব সুগন্ধে প্রাণ ভরে যাচ্ছে। টরটিলা তৈরি হচ্ছে। তারই সুবাস। অ্যান তার সাইড ব্যাগ থেকে একটা বুরুশ বের করে সোনালি চুলে বার কতক চালিয়ে নিল। ফুসফুসে চুলকে কি অত

সহজে বাগে রাখা যায়। অন্ধকার প্রান্তরের ওপর দিয়ে উড়ে আসছে রহস্যময় মায়া সভ্যতার খেয়ালী বাতাস। নিমেষে চুল এলোমেলো। শেষে বিরক্ত হয়ে বুরুশ রেখে দিল। এখানে আসার পর থেকে একটা ভাব আমি কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না, সেটা হল এই দেশের আকাশে, বাতাসে, ভূমিতে, সমুদ্রে, পাহাড়ে, অরণ্যে বহুকালের একটা অভিশাপ যেন ফিকে কুয়াশার মতো ঝুলছে। মাঝে মাঝে একটা ভয়ের ভাবে গা কেমন করে উঠছে। যখনই ভাবছি, ত্রয়োদশ শতকে আমি যদি অ্যাজটেক রাজধানী টেনকটিটলানে জন্মে থাকতুম তাহলে সেই জন্মে আমার কি অবস্থাই না হয়েছিল। মনে হয় আমি একজন অ্যাজটেকই ছিলুম। নিজেকে কেমন যেন জাতিস্মর বলে মনে হচ্ছে। অ্যানকে এ-কথা বললে, মুখ বাঁকিয়ে আমাকে ঠাট্টা করবে। বাঙালির কল্পনাবিলাস এদেশের মানুষ কি চোখে নেবে কে জানে!

অ্যান মনে হয় থটরিডিং জানে। হঠাৎ বললে, 'মনে কর ১৩২৫ সালে তুমি আছ। তুমি আছ অ্যাজটেক রাজধানী টেনকটিটলানে। যেখানে টোলটেক সভ্যতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল। একটা জলা জায়গায় স্থাপিত হতে চলেছে সুরম্য এক নগরী। না, ১৩২৫ নয়, তুমি জন্মাও ১৫০০ সালে। তাহলে ১৫১৯ সালে তুমি হবে উনিশ বছরের যুবক। মনে করো তুমি অ্যাজটেক-রাজ মোকটেজুমার রাজসভার এক তরুণ মন্ত্রী। রাজধানীতে তখন ষাট হাজার পুরবাসী। গোটা রাজত্বের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। কি ভাবছ তুমি? তুমি কি ভাবছ যা হবার তা একালেই হচ্ছে। আজ্ঞে না। সভ্যতার উত্থান আর পতন ঢেউয়ের মতো এগিয়েছে। এক এক জায়গায় এক এক পর্ব দুশো কি তিনশো বছর ধরে উঠতে উঠতে শীর্ষস্থানে পৌঁছে নামতে নামতে বিলুপ্ত। এই হল সভ্যতার নিয়তি।

'১৩২৫ থেকে ১৫১৯ টোলটেক সভ্যতার উত্থান পর্ব। ১৫১৯ সালের এমনি এক রাতে তুমি রাজা মোকটেজুমার খানা-টেবিলে আহারে বসেছ। বসেছ তো?'

'হুঁ বসেছি।'

'পরিবেশনকারীরা তোমার সামনে বিশাল একটা প্লেটে করে রেখে গেল রোস্ট করা আস্ত এক গোধিকা। জলের টিকটিকি। অ্যাকসোলটলস। ধোঁয়া ছাড়ছে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটি কুমির শাবক যেন। তোমার নাকে এসে লাগছে গন্ধ। কেমন গন্ধ বলো তো। আমার কল্পনা গন্ধের ব্যাপারে কাজ করছে না।'

'অ্যান, আমার কিন্তু খুব ঘেন্না করছে। এরপর আমি আর কিছু খেতে পারবো না।'

'ঘেন্না! তোমার কোনও ধারণা নেই তাই। মেক্সিক্যান জল গোধিকার স্বাদ জানো?'

'তুমি জানো?'

'আমিও জানি না। তবে ইতিহাস জানে। অ্যাজটেকদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ছিল। আর একটা প্রিয় খাদ্য কি ছিল জান? ডানাঅলা পিঁপড়ে। মনে হয় স্যালাড হিসেবে খেত। আর ছিল অ্যাগেভ ওয়ার্ম। ঘৃতকুমারী গাছ পচালে যে পোকা হয়, সেই পোকা। আর একটা প্রিয় খাদ্য ছিল ইগুয়ানা। আমেরিকার গাছে বৃহৎ এক ধরনের গিরগিটি পাওয়া যায়। সেই গিরগিটি হল ইগুয়ানা। কলম্বাসের নাবিকরা ক্যারিবিয়ায় এই ইগুয়ানা খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল—সাদা তুলতুলে নরম, সেই রকম সুস্বাদু। ঘৃতকুমারীর পোকা কিভাবে পরিবেশন করা হত জান? তার ওপর ঢালা হত গুয়াকোমল। এক ধরনের গাছের আঠা, রজন। তার ওপর দেওয়া হত অ্যালিগেটার, ছোট এক জাতীয় কুমিরের চর্বি। তার মানে এমন এক খাদ্য যাতে আছে প্রোটিন, চর্বি ভিটামিন এ আর বি। সময় সময় টোম্যাটো আর ক্যাপসিকামও দেওয়া হত। কেমন লাগছে; তোমার মোকটেজুমার রাজভোগ! এরপর, তোমার সামনে এল এক প্লেট মাংস। টার্কির ঠ্যাং দেখে হাত বাড়ালে। ঠকে গেলে। ভেতরে সাজানো কুকুরের মাংস। অ্যাজটেকদের ওইটাই ছিল ধরন। অত টার্কি পাবে কোথায়। কচি-কুকুরের মাংসের ওপর টার্কির ড্রেসিং।'

'তুমি এইবার দয়া করে থামবে ভাই!'

'দাঁড়াও। স্প্যানিশরা এসে তোমাকে মোকটেজুমার প্রাসাদ থেকে আগে উদ্ধার করুক।'

'তোমার টরটিলা তৈরি হতে যে সময় লাগে তাতে একটা সভ্যতার পতনও হয়ে যেতে পারে। তুমি তো এই সময়ের মধ্যে প্রায় দুশো বছরের ইতিহাস টেনে এলে।'

'জেনে রাখ টরটিলা হল ফাউন্ডেশান অফ দি মেকসিক্যান ডায়েট। বাড়ি তৈরি করতে গেলে যেমন ভিত স্থাপন করতে হয়, সেই রকম মেকসিকোর খানাপিনার ভিত গড়ে উঠে টরটিলার ওপর। শুনেছি তোমরা বাঙালিরা তো খুব ভোজনবিলাসী।'

'ঠিকই শুনেছ।'

'তাহলে ফর্মুলাটা তোমাকে বলে দি, বাড়ি ফিরে তৈরি করার চেষ্টা করো। শুকনো ভুট্টার দানা প্রথমে জলে সেদ্ধ করবে। সেই জলে ফেলে দেবে হয় একটু কাঠকয়লা আর না হয় সামান্য খাবার চুন। এতে ভুট্টার খোসা তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাবে। হাত দিয়ে ঘসলেই খোসা বেরিয়ে আসবে। এরপর খোসাহীন সেই সেদ্ধ ভুট্টার দানা শিলে ফেলে বাটবে। প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে একটু করে জল দেবে। এরপর ওই মন্ডটাকে খুব ভাল করে ঠেসে মাখবে। মেখে লেচি কেটে গোল গোল করে বেলবে। বেলে একটা হট প্লেটে ভাল করে সেঁকবে।'

'হয়েচে হয়েচে। তুমি আমাকে নতুন কি শেখালে! এই যে আমি তোমার সামনে বসে আছি বিদগ্ধজনের মতো, দেশে গেলে আমার হাল কি হবে শোনো। রোববার সকালে এক গোছা র‍্যাশন কার্ড, গোটা কতক ঢাউস ব্যাগ আর গোটা দুই খালি টিন নিয়ে একটা দোকানের সামনে লাইন দোবো। ধরো আমি দাঁড়িয়েছি পনের জনের পেছনে। মাথার ওপর খাঁ খাঁ রোদ।'

'কিসের দোকান?'

'র‍্যাশান শপ।'

'তোমাদের ওখানে এখনও কি যুদ্ধ চলেছে!'

'আমরা সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবস্থাটাকেই বহাল রেখেছি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আর অসুবিধে হবে না। ও তোমরা বুঝবে না ভাই। ওই র‍্যাশান শপ থেকে আমি ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় চাল, গম, চিনি আর পাম অয়েল নোবো। আমাদের দেশের যারা বড়লোক তারা র‍্যাশানের চাল, গম ছোঁয় না। পচা, গুমো গন্ধ। এইবার গমটাকে আমি ফেলে দেবো গমকলে। কাঠিকুটি, মাটির ঢ্যালা, ইঁদুর, আরশোলার নাদি সব পিষে একাকার, প্রোটিনমিকস ওই আটা রোজ আমাদের পাকশালে তোমার টরটিলার কায়দায় গোল গোল রুটিতে পরিণত হয়। সেই রুটি আর কুমড়োকা ঘ্যাঁট।'

'হোযাট ইজ দ্যাট?'

'এ ভেরি ভেরি স্পেশ্যাল ইন্ডিয়ান ডেলিকেসি। পরপর সাতদিন খেলে বৈরাগ্য, শেষে সন্ন্যাসী। নাও, তোমার ফর্মুলা বাতাও।'

'ওই হট প্লেটকে মেকসিক্যানরা বলে কোমাল্লি।'

'আরে বলো না। আমরা বলি চাটু।'

'আগুনের ওপর সেই কোমাল্লি চাপিয়ে লেচিগুলোকে হাতের চাপড়ে বড় করে সেঁকে নেওয়া হত। এই হল টরটিলার ফাউন্ডেশান। এর ওপর করা হত যত কারিকুরি। নাও আমাদের জিনিস এসে গেছে।'

অপূর্ব সুবাস। আমার নাকের ধার ঘেঁসে টেবিলে গিয়ে নামল। যেন ফ্লাইং সসারের অবতরণ। শঙ্কর মাছের মতো আকৃতি। বাদামী রঙ। তার ওপর ছড়ানো ঝুরোঝুরো টোম্যাটো, চিজ, আর লাল লঙ্কা। ভুট্টাকে দু'বার পাক করা হয়েছে। একবার সেদ্ধ করা হয়েছে তারপর লেচি করে সেঁকা হয়েছে। ফলে তার একটা সুগন্ধ আছে তার সঙ্গে মিশেছে চিজ আর লঙ্কার গন্ধ। মাছ নয়, বিজাতীয় মাংস নয়, কি সুন্দর শুদ্ধ, সাত্ত্বিক একটা খাবার।

অ্যান বললে, 'বুঝলে, বিজ্ঞানই বলো, জ্ঞানই বলো, অপরাবিজ্ঞানই বলো, সবই সেই ওপরঅলার কাছ থেকে নেমে এসেছে। অবতীর্ণ জ্ঞান। সেই সময় তো মানুষ কেমিস্ট্রি, কেমিকেল রিঅ্যাকসান বলতে গেলে কিছুই জানত না; অথচ কি সুন্দর একটা রাসায়নিক খেলা হয়েছে টরটিলায়। চুনের জলে ভেজাবার ফলে ভুট্টার যে বি-ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে আছে, সেই নিয়াসিন আর চুনের জলের ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সুন্দর একটি বিক্রিয়া হয়েছে। এই বিক্রিয়ার ফলে নিয়াসিন সহজপাচ্য হয়েছে। শরীর খুব সহজেই বি-ভিটামিন নিতে পারবে। এমনি সিন্থেটিক ভিটামিন শরীর নিতে চায় না। নব্বই ভাগই বেরিয়ে যায়। এই ন্যাচারাল ভিটামিনের পুরোটাই শরীর টেনে নেয়

সহজে। দেখ প্রাচীন পৃথিবীর বীররা কেমন কায়দা করে প্রোটিন, ভিটামিন আর ক্যালোরির ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। আগে প্র্যাকটিক্যাল তারপর থিয়োরি আর ব্যাখ্যা।'

লঙ্কার পরিমাণ দেখে ভয় পাচ্ছিলুম। হয়তো ব্রহ্মতালু ছেঁদা হয়েই যাবে। ঝাল হয়েছে, তবে এমন নয় যে মাঠ-ময়দান ভেঙে ন্যাজ তুলে দৌড় লাগাতে হবে। আমেরিকার লঙ্কার সঙ্গে ভারতের লঙ্কা 'পাইপার নাইগ্রামের' অনেক পার্থক্য। দুটোর জাত আলাদা। আমেরিকার লঙ্কা সি-ভিটামিনে ভরপুর। এখানকার লাললঙ্কা বা ক্যাপসিকামের দুটো জাত—একটা হচ্ছে বড় মিষ্টি, যাকে বলে সুইট বেল, অন্যটা হল ছোট চিলি। বড় লঙ্কা, সুইট বেল কাঁচা আর সবুজ অবস্থায় সব্জীর মতো ব্যবহৃত হয়। আর একটা বিশেষ জাতের লঙ্কা আছে, পেকে লাল হলে শুকিয়ে গুঁড়ো করে ঝাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর নাম প্যাপরাইকা। সপ্তদশ শতকের গোড়ায় আমেরিকায় চল্লিশ জাতের লঙ্কা ছিল। মেকসিকোয় বর্তমানে বিরানব্বই জাতের লঙ্কা ফলে। অবাক কাণ্ড। এই জায়গার নামই দেওয়া উচিত ছিল শ্রীলঙ্কা। ভূগোলের ভুলে সেই নামটা গিয়ে পড়েছে আর এক দেশের ঘাড়ে।

টোম্যাটো এই দেশের আর একটি প্রিয় সব্জী। এই দেশ কেন টোম্যাটো সারা দুনিয়ার প্রিয়। টোম্যাটো প্রথমে এই দেশেই ফলেছিল, মেজের বা ভুট্টাক্ষেতের আগাছা হিসেবে। যেমন আমাদের দেশের তেলাকচু। আপনিই হয় অজস্র। স্প্যানিয়ার্ডরা যখন এল তখন চাষ শুরু হয়ে গেছে। জাতেরও উন্নতি হয়েছে। আমেরিকা থেকে ইউরোপে যে টোম্যাটো গেল তার রঙ হলদে। সেই কারণে টোম্যাটোর আদি নাম গোল্ডেন অ্যাপল। ভিটামিন-এ আর সি-তে ভরপুর।

মধ্যবয়সী এক মেকসিক্যান মহিলা আমাদের সামনে এসে বসলেন। বুকে অ্যাপ্রন আঁটা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। টান টান করে চুল বাঁধা। সবসময় যেন হেসেই আছেন। সামনে বসার উদ্দেশ্য হল, আমাদের আহারের তদারকি করা। মহিলার কথা অ্যানই ভাল বুঝছে। খুব সামান্যই ইংরেজি। বেশির ভাগ কথাই হচ্ছে স্প্যানিশে। মাঝে মাঝে দু'জনেই হই হই করে হেসে উঠছে। কি রসিকতা হচ্ছে কে জানে! মেকসিক্যানরা ভীষণ আমুদে। আমরা যেখানে বসেছি, সেইখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, জানালার বাইরে সমব্রেরো টুপি মাথায় একটি লোক ভীষণ মাতাল হয়ে গোল হয়ে ঘুরছে। বেশ লাগছিল দেখতে।

অ্যান আমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি এদেশের আবক একটু খাবে না কি?'

'কি জিনিস সেটা?'

'টেকুইলা।'

'এদেশে এক ধরনের গুল্মের চাষ হয় তার নাম হল অ্যাগেভ টেকুইলেরো। ইয়া মোটা মোটা শিকড় হয় তার। সেই শিকড় চোলাই করে তৈরি হয় টেকুইলা হল জাতীয় পানীয়। জলশূন্য মৃত্তিকায় পাদুপাদপের মতো এই রসাল গুল্ম খুব ভালই জন্মায়। চওড়া চওড়া পাতায় জল ধরে রাখার অসাধারণ ক্ষমতা। খাবে তো বলো।'

আমি আঙুল তুলে বাইরের মাতালটিকে দেখিয়ে বললুম, 'ওই অবস্থা হলে কে সামলাবে!'

আমাদের সামনে বসে থাকা হাসিখুশি মহিলাটি বললেন, 'ও আমার স্বামী। ও টেকুইলা নয় রাম খেয়েছে। ওই রকম ঘুরতে ঘুরতে এক সময় পড়ে যাবে, তখন আমি তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দোব।'

'সেই কাজটা তো এখুনি করলেই হয়।'

'এখন গেলে মারবে।'

আমাদের আর টেকুইলা পান করা হল না। বেরিয়ে এলুম স্বল্পালোকিত স্নেহনীড় রেস্তোরাঁ থেকে। অ্যান বললে, 'এখুনি ফিরবে না আর একটু ঘুরবে?'

আমি বললুম, 'জীবনে তো এই একবারই আসা, নতুন কাপড়ের মতো নতুন মাটিরও অদ্ভুত এক আকর্ষণ, সহজে ছাড়া যায় না। চলো, আনাচে কানাচে একটু ঘুরে যাই।'

প্রধান পথ থেকে অনেক সুঁড়ি পথ বেরিয়েছে। তার দু'পাশে ছাড়া ছাড়া একতলা বাড়ি। একটা কলোনি মতো। ছোট ছোট গৃহস্থালি। নিজের দেশ থেকে একটাই তফাৎ, শাড়ি পরা মহিলা নেই। তোলা উনুনের ভসভস ধোঁয়া নেই। কোথাও তেমন কলহ নেই। কোনও কোনও গৃহের পইঠাতে

দু-একজন তরুণী বসে আছে বিরসমুখে।

অ্যান বললে, 'মেকসিকোর একটাই সমস্যা, দারিদ্র্য। বেশির ভাগ সাধারণ মানুষই বড় গরিব।' আমরা হাঁটতে হাঁটতে ঢেউ খেলানো এক প্রান্তরের সামনে এসে হাজির হলুম। কিছুই জানা নেই, এক অজ্ঞাত, বিচিত্র প্রান্তর কোথায় গেছে! কার সঙ্গে দেখা করতে গেছে! কোনও নদী, অথবা কোনও আগ্নেয়গিরি!

অ্যান বললে, 'এসো এইখানে আমরা একটু বসে যাই। জানো তো কমালের মতো বসে থাকাটা পড়ে থাকে। বহুবছর পরেও এই ভূমি মনে রাখবে এখানে দু'জন বিদেশী এক রাতে বসে গিয়েছিল। মাটির কণায় স্মৃতি-ভারাতুর আলোচনা হবে।'

আমরা বসলুম। ঝামার মতো মাটি। গিটার আর ব্যাঞ্জো সহযোগে যারা গান গাইছিল তারা মনে হয় ক্লান্ত হয়ে নীরব হয়ে গেছে।

অ্যান বললে, 'এরা কি-রকম দরিদ্র জান, নৃতত্ত্ববিদ্ অ্যালফ্রেডো বারেরা ভাজকায়েজ, তিনি অবশ্য দেহ রেখেছেন কয়েক বছর আগে, তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বলি। তিনি একবার যুকাটান নগরী মেরিডা থেকে চলেছেন পাশের বাজা কামপেচেতে। সেখানে মাটি খুঁড়ে অনেক প্রাচীনকালের নিদর্শন পাওয়া গেছে। তিনি চলেছেন সেই আর্কেযোলজিক্যাল জোনে। যেতে যেতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অধ্যাপক ছোট্ট একটি খামার দেখে এগিয়ে গেলেন। গৃহের মহিলাকে সবিনয়ে বললেন, 'আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খাবার তৈরি করে দেবেন। যা খরচ লাগবে সবই আমি দোব।'

মহিলাটি করুণ মুখে বললে, সেনর, আমি দুঃখিত, বাড়িতে এক কণাও খাদ্য নেই।'

অধ্যাপক বললেন, 'সে কি! কিন্তু আপনার তো একটা গরু রয়েছে দেখছি। গরু যখন আছে তখন দুধ থাকা স্বাভাবিক। দুধ মানেই মাখন, এমনকি চিজও থাকতে পারে। আপনার উঠোনে মুরগী ঘুরছে। মুরগী মানেই ডিম। তাছাড়া বাগানে দেখছি বিনসের চাষ হয়েছে।'

মহিলাটি আরও করুণ গলায় বললে, 'সবই সত্য, তবে কি জানেন এসব হল খাদ্যের প্রতিশ্রুতি। প্রকৃত খাদ্য ঘরে নেই। পোকা আর অনাবৃষ্টিতে আমাদের চাষ নষ্ট হয়ে গেছে। অনাহারে আমাদের দিন কাটছে।'

'এই বাইকো, মানে রোগপোকা আর সেকুইয়া মানে খরা এই দুই শত্রুতে মিলে মেকসিকোর গ্রামে গ্রামে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সেই কারণে নৈরাশ্যবাদী প্রবীণরা একটি কথা প্রায়ই বলেন, সাল সি পুয়েদেস, পারো তো এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাও।'

সাল সি পুয়েদেস, মানে যঃ পলায়তি স জীবতি।

৫৪

রাত যত বাড়ছে বাতাস তত শীতল হচ্ছে। বেশ একটা গা ছমছমে ভাব হচ্ছে। হতেই পারে। পৃথিবীর এই প্রান্তে গত পাঁচশো বছর অজস্র খুনখারাপি হয়েছে। আমাদের সামনে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য প্রান্তর নেশায় যেন টলছে।

যখন এই রকম একটা ভয় ভয় ভাব চারপাশ থেকে ঘিরে আসছে, ঠিক সেই সময় অ্যান এমন এক প্রসঙ্গ শুরু করল। অ্যান বললে, 'জানো তো, অত বড় একটা সভ্যতার যারা প্রতিষ্ঠাতা সেই অ্যাজটেকরা, ক্যানিবলিজমে অভ্যস্ত ছিল। তারা ছিল নরখাদক। কনকুইসতাদর স্প্যানিশরা যা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। স্প্যানিয়ার্ডরাও অসম্ভব নিষ্ঠুর ছিল। তারা তাদের বন্দী এবং অপরাধীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে এক সময় হত্যা করত। কিন্তু তার পেছনে ছিল ধর্ম। খ্রীস্ট ধর্ম। তা ছাড়া হত্যার পর নিহত মানুষটিকে খেয়ে ফেলত না।

পঞ্চদশ শতকে অ্যাজটেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গই ছিল নরবলি।

একালের মানুষের কাছে এই অনুষ্ঠান অবশ্যই ঘৃণ্য। সেকালে ঈশ্বর অথবা আরাধ্য দেবতাগণকে

মানুষ শ্রেষ্ঠতম যে উপাচারটি দিতে পারত তা হল, মানুষের হৃৎপিন্ড। এই বিশ্বাস ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে। বিভিন্ন চেহারা নিয়েছে। কোথাও প্রতীকী হৃদয়াঞ্জলি, কোথাও প্রকৃতই হৃদয়টিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে দেবতাকে দান। শেষে ধর্ম থেকে এ বিশ্বাস সরে এল মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসে। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ধারণা তৈরি হল দুর্বল অধিকতর বলশালীর শক্তি শোষণ করে নিতে পারে। কিভাবে? না, তাকে কোনও রকমে ধরে এনে, খন্ড খন্ড করে কেটে খেয়ে ফেল।

কনকুইসতাদররা টেনকটিটনানে একটা 'স্কাল র‍্যাক' দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। একটা ঘরে তাকের পর তাক আর সেই তাকে পর পর সাজানো মড়ার মাথার খুলি। সূর্যদেবতার কাছে আনুষ্ঠানিক নরবলির পর নরখাদকদের ভোজসভার স্মৃতি সযত্নে রাখা। অ্যাজটেক ভগবানরা অনবরতই চাইতেন মানুষের জীবন্ত হৃদপিন্ড। অ্যাজটেক পুরোহিতরা পাথরের ধারালো ছুরি দিয়ে জীবন্ত মানুষের বুক থেকে খুবলে বের করে নিতেন হৃদয়টি। সেই ধকধকে হৃদয়টিকে থালায় সাজিয়ে নিবেদন করে দিতেন দেবতার চরণে। এরপর মুণ্ডটাকে কেটে সাজিয়ে রাখা হত তাকে। একটা উরু কেটে উপহার দেওয়া হত সুপ্রিম কাউনসিলকে। অন্যান্য অংশ পেতেন অভিজাতরা। এরপর দেহাবশেষটি তুলে দেওয়া হত তার হাতে, যে ধরে এনেছে। সে বাড়ি নিয়ে গিয়ে রান্না করে খেত। মানুষের মাংস আর ভুট্টা দিয়ে তৈরি হত স্টু। এই স্টুর নাম ছিল ত্‌লাকাতলাওল্লি। পুরো পরিবার মহানন্দে বসে যেত সেই স্টু আহারে। ভক্তিভরে ; কারণ দেবতার প্রসাদ।

স্প্যানিয়ার্ডদের বিতৃষ্ণার কারণ রক্তপাত নয়। রক্তে তাদের ভয় ছিল না। নিগ্রহ এবং হত্যায় তারা অ্যাজেটেকদের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। তাদের আপত্তি ছিল প্রথাটাকে ধর্মের অঙ্গ করে নেওয়ায়। স্প্যানিয়ার্ডরা কত বড় খুনী ছিল, তার একটা হিসেব পাওয়া গেছে। কনকুইস্তাদর কর্টেস আসার আগে সেন্ট্রাল মেকসিকোর জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ২৫০০০০০০। মারতে মারতে তিরিশ বছর পরে সংখ্যা দাঁড়াল ৬০,০০০০০। ১৬০৫ সালে পড়ে রইল মাত্র ১০,৭৫,০০০। যুদ্ধ, অর্থনৈতিক উত্থান-পতন, শোষণ, ইউরোপ থেকে আমদানি করা নতুন অসুখ আর নিগ্রহে তৈরি হয়ে আছে পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস। নিষ্ঠুর স্প্যানিয়ার্ডরাই ছিল এর নায়ক।

অ্যান উঠে পড়ল। আমাদের বাড়ি নেই, তবু মনে হল, অনেক রাত হয়েছে এইবার বাড়ি যাই। বাড়ি ফেরার সংস্কারটা আমাদের রক্তে চলে গেছে। হঠাৎ কোনও এক সময় মন ধড়ফড় করে ওঠে, এই রে বাড়ি যেতে হবে। রাত হল। অ্যান ঠিক ওই কথাই বললে, 'নাঃ রাত হল, চলো বাড়ি যাই।'

আমি সংশোধন করিয়ে দিলুম, 'অ্যান বাড়ি নয়। বলো হোটেল।'

আমরা ছোটখাটো একটা টিলার ওপর উঠে বসেছিলুম। ঢাল বেয়ে হু হু শব্দে নেমে এলুম সমতলে। আশ্চর্যের কথা, রাতের প্রভাব স্থানীয় জীবনেও পড়েছে। নাচ, গান থেমে গেছে। যাঁরা মদ্যপান করছিলেন, তাঁদের নেশা জমে উঠেছে। কেউ কেউ শুয়ে পড়েছেন। কেউ চেষ্টা করছেন কোনও কিছু ধরে উঠে দাঁড়াবার। পতিব্রতা এক স্ত্রী তার স্বামীটিকে সাবধানে গৃহমুখে নিয়ে চলেছে। মেয়েটি যেমন মিষ্টি তার স্বামীটি তেমনি কর্কশ। ভীম বপু। বেপরোয়া খেয়ে কাত। মেয়েটি কোনও বকাঝকা করছে না। ধমকধামক দিচ্ছে না। বরং পায়ে পায়ে সযত্নে প্রিয় বোঝাটিকে নিয়ে চলেছে তো চলেছেই। ব্যাপারটার দিকে অ্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। অ্যান বললে, 'এই মেকসিক্যান মেয়েদের চরিত্র। কখনও শান্ত। কখনও অশান্ত। এই তো দেখছ, এই ভাবে নিয়ে যাচ্ছে। কত যত্নে কত আদর করে। এমনও হতে পারে বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে মেজাজ অন্য রকম হয়ে গেল। তখন আর এ দৃশ্য দেখবে না।'

মেকসিকোয় রাতের দিকে একটা ভৌতিক বাতাস কোথা থেকে উড়ে আসে। সেই বাতাসই বইতে শুরু করেছে। পেছন থেকে ঝাপটা মেরে ফেলে দিতে চাইছে। ভয়, আনন্দ, ভৌতিক অনুভূতি, সব মিলিয়ে জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্তমালার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পায়ের নিচে খটখটে ভূমি। কালচে রঙের ভেতর থেকে একটা আলোর আভা বেরোচ্ছে যেন। দু'পাশে বিশাল দুটো

গাছ। যার নাম জানি না। বাওবাব হতে পারে, হতে পারে রেড উড। পেছনের টিলা শ্লেট রঙের আকাশের গায়ে কালো রেখার মতো দৃষ্টি আটকে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে অচেনা এক গ্রাম ধীরে ধীরে নিঝুম হয়ে আসছে। কোনও উৎসব ছিল। শামিয়ানাটা পড়ে আছে। বাতাস ফুলে ফুলে উঠছে। রঙিন কাগজ জুড়ে জুড়ে মেয়েরা শিকলি বানিয়েছিল। হু হু হাওয়ায় ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়ছে। চারপাশে হিল হিল করে। এই অঞ্চলের জমিতে মাঝে মাঝেই অলৌকিক খোদল। সৃষ্টির সময়েই পার্শ্বস্থ ভূ-ভাগের চাপে, ভূমিকম্পে, অগ্ন্যুৎপাতে তৈরি হয়েছে এই রহস্য। বাতাস সেই সব পকেটে ঢুকে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে খাঁচা-খোলা পাখির মতো উড়ে চলে যাচ্ছে, আর তখনই অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ হচ্ছে। বাতাসে অভ্রের রেণু উড়লে যে-রকম চকচক করে ওঠে, মাঝে মাঝে চোখের সামনে দিয়ে সেই রকম আলোর কণা ভেসে যাচ্ছে। অ্যানকে জিজ্ঞেস করলুম, রহস্যটা কি? অ্যান বললে, সব রহস্যের সমাধান চেও না। আমার জ্ঞানে কুলোবে না।

আমাদের সেই বিকট শব্দকারী গাড়ি, চারপাশের অন্ধকারকে ধমকাতে ধমকাতে ফিরে চলল। আসল খেলটা যে গাড়ি দেখাবে, আমি বা অ্যান কেউই বুঝিনি। মাইল তিনেক হু হু করে দৌড়োবার পর একটা হেঁচকি তুলে থেমে গেল। তেল ফুরিয়েছে। চারপাশে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো প্রান্তর। কোনও জনপদ নেই। ফিলিং স্টেশান তো দূরের কথা।

অ্যান বললে, 'শেষ পর্যন্ত আমাদের বরাতে এই ছিল।'

'বুঝলে অ্যান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন-ফর্শন কোনও কাজের নয়। অঙ্কই হল সব। আমরা অঙ্কে পাকা হলে, বোরোবার আগে তেল আর মাইলের হিসেবটা অন্তত করা যেত।'

'সে হিসেব আমি করেছিলুম। সন্দেহ হচ্ছে, আমরা যখন ছিলুম না তখন তেল কেউ টেনে নিয়েছে।'

'যাঃ তা কখনও হয়। ও-সব ছিঁচকে চুরি এদেশে হয় না।'

'কেন হবে না?'

'আরে বাবা এটা হল পেট্রলের দেশ। নিউকাসলে কেউ কয়লা বেচতে পারে?'

আমরা নেমে গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তার একপাশে করে দিলুম। লম্বা, কালো, রাস্তা সটান সামনে চলে গেছে। দেখলেই ভয় করে। এই পথের সেই শেষ মাথায় আমাদের হোটেল। দূরত্বে আরও তিন চার মাইল তো বটেই। হাঁটতে আমার আপত্তি নেই, তবে কে যেন ভয় দেখিয়েছিলেন, মেকসিক্যান ব্যান্ডিটরা বড় সাংঘাতিক। দয়া মায়ার বালাই নেই। ধরবে আর সব কেড়ে নেবে। তারপর মনে হল, কি কাড়বে! কি আছে আমাদের কাছে! কিছু ডলার আছে। তাও আছে ট্র্যাভলার্স চেকে। আমার জন্যে ভয় নেই। ভয় সুন্দরী অ্যানকে নিয়ে। অ্যামেরিকায় নারী লোলুপ অপরাধীর সংখ্যা তো কম নয়।

অ্যান বললে, 'চলো, হাঁটা ছাড়া গতি নেই।'

'সে তো বুঝলুম। গাড়িটার কি হবে! বেওয়ারিশ পড়ে থাকবে।'

'তা ছাড়া উপায় কি?'

'এইরকম একটা গাড়ির দাম কত হবে?'

'কোনও ধারণা নেই। তুমি চলো তো। অত আর ভাবতে পারি না। যা হয় হবে।'

আমরা সামনে পথ ধরে এগোতে যাই, এমন সময় দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। আমরা দু'জনেই হাত তুলে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলুম। গাড়িটা হু হু করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। বেশ ভয় করছে। যদি না থেমে চাপা দিয়ে চলে যায়। তা অবশ্য হল না। গাড়িটা থামল। বিশাল আমেরিকান গাড়ি। চালককে সিনেমার হিরোর মতো দেখতে। চোখে পোলারাইজড লেনসের দামী চশমা।

ভদ্রলোক আমেরিকান। গাড়ি থেকে না নেমে, জানালা দিয়ে মুখ বের করে পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, সমস্যাটা কি?

অ্যান বললে, 'আমাদের দু-এক লিটার তেল দেবেন দয়া করে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'অঃ সিওর।'

তিনি নামলেন। পেছনের বুট খুলে একটা টিন বের করলেন। ভর্তি পেট্রল। ভদ্রলোক নিজেই তেল ঢেলে দিলেন আমাদের রথে।

পেট্রল ঢেলে দিয়ে ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, 'হোটেল ডেলসলে যাবেন তো। যা দিয়েছি, তাইতেই হয়ে যাবে।'

অ্যান বললে, 'অনেক উপকার করলেন। আপনাকে কিন্তু দাম নিতে হবে।'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, 'আমিও একজন ভদ্রলোক। ড্যামসেল ইন ডিসট্রেসকে সাহায্য করার সুযোগ দিয়েছ, তাইতেই আমি খুশি। তোমার সঙ্গে ফায়ার আর্মস আছে?'

অ্যান একটু অবাক হয়ে বললে, 'না তো!'

ভদ্রলোক বললেন, 'তাহলে আর দেরি না করে, সোজা বেরিয়ে যাও টপ স্পিডে। কোথাও আর থেমো না। এই রাস্তাটা মাত্র দু'জনের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়।'

ভদ্রলোক গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, 'তোমরা আগে স্টার্ট নাও। তারপর আমি যাবো।'

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ইন্ডিয়ান?'

'হ্যাঁ, আমি কলকাতার।'

'ক্যালকাটা! আমি বেশ কিছুদিন তোমাদের শহরে ছিলুম। তোমাদের অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে আমি স্প্যানিশ শেখাতুম।'

ভদ্রলোকের মুখের দিকে আর একবার ভাল ভাবে তাকালুম। এ মুখ আমার চেনা। এই ভদ্রলোকই আমার স্প্যানিশ শিক্ষক ছিলেন। স্প্যানিশ ভাষার চেয়েও আকর্ষণীয় ছিল ভদ্রলোকের অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী। সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস হত। আমাদের একদিনও কামাই হত না। যেখানেই থাকি পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে যেতুম সেই মহিলাটিকে দেখতে পাব বলে। অ্যান্ডিয়ান বিউটি। দীর্ঘ শরীর। মা দুর্গার মতো টানা টানা চোখ। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রঙ। মাঝে মাঝে স্ত্রীও ক্লাস নিতেন। তখন মনে হত, স্প্যানিশের মতো সুন্দর ভাষা আর পৃথিবীতে হয় না। ফ্লোরেন্স স্যান্ডেলের মতো স্লেট রঙের গাউন পরে ডায়াসে দাঁড়িয়ে আছেন শিক্ষিকা। আর আমরা সামনে বসে আছি মন্ত্রমুগ্ধের মতো। শব্দরূপ ধাতুরূপ শিখছি।

ভদ্রলোককে বললুম, 'আমি আপনার ছাত্র ছিলুম। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।'

পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'নমস্কার। স্প্যানিশ শিখেছ?'

'আজ্ঞে না পুরোটা শেখা হয়নি। ইন্দো পাক ওয়ারের জন্যে, আপনি ক্লাস বন্ধ করে দিলেন।'

'ইয়েস, ইয়েস। তখন তোমাদের ওখানে ব্ল্যাক আউট শুরু হল। আমরাও বুঝতে পারলুম না, যুদ্ধ ক'দিন চলবে। তারপর আমিও আর বেশি দিন থাকিনি। দিল্লি হয়ে ফিরে এলুম দেশে। স্প্যানিশটা শেখো। ভাল ভাষা। পৃথিবীর অনেকে ওই ভাষায় কথা বলে। ভাল সাহিত্য পাবে। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আছে জোয়াকুইন বেস্টার্ড, কারলোস রুইজ মেজিয়া, ড্যানিয়েল লেভা, মেমপো জিয়ার্ডির্নেলি, মার্টিন গুজম্যান, অক্টাভিও পাজ। আমাদের লিটারেচার খুব রিচ। পরপর তোমাকে অনেক নাম বলে যেতে পারি। তোমাদের দেরি হয়ে যাবে। স্প্যানিশটা শেখ।'

অ্যানকে দেখিয়ে বললুম, 'এই যে আমার নতুন গুরু।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ও মাই ডারলিং।'

আমি আর চাপতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেললুম, 'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন।'

'ও তুমি আমার স্ত্রীকে মনে রেখেছ?'

'শুধু আমি কেন, কলকাতার আরও আড়াইশো তিনশো ছেলেমেয়ে মনে রেখেছে। আমরা তাঁকে বলতুম গডেস দুর্গা।'

হা হা করে হাসতে হাসতে ভদ্রলোক বললেন, 'সে ভালই আছে। মা হয়েছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। আর দেরি কোরো না, তোমরা এগিয়ে যাও।'

জানালা দিয়ে মুখ বের করে ঘাড় ঘুরিয়ে ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। অ্যান আর আমি, আমাদের সেই রথে উঠে স্টার্ট দিলুম। ভদ্রলোক হাত নাড়লেন। মাঝরাতের জাতীয় সড়ক ধরে আমাদের বিচিত্র যান হাওয়ার গতিতে উড়ে চলল।

আমাদের এই পৃথিবী নানা তথ্যে ভরপুর। উৎসাহী ঐতিহাসিক কত ভাবে, কত দিকে কাজ করতে

পারেন ভাবলে অবাক হতে হয়। সেই আন্দামানের ডুগঙ্গ আইল্যান্ডে গিয়ে দেখেছিলুম এক দক্ষিণ ভারতীয় ডাক্তার দম্পতি রিসার্চ করছেন, ওঙ্গিজ রমণীরা কেন সন্তানধাবণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের খাদ্যই কি এর জন্য দায়ী! সভ্যতা থেকে দূরে, জলবেষ্টিত এক ফালি ভূভাগে, এক দল নগ্ন মানব-মানবীর মাঝে, সুদর্শন এক পুরুষ ও রমণী দিনের পর দিন খুঁজে ফিরছেন কারণ। আমি যখন গিয়েছিলুম তখন সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা। বন্ধ্যা করে দেবার কারণ, 'রুট ডায়াস্কোরিয়া'। এক ধরনের গাছের শাঁসালো শিকড়, যা তারা খেতে অভ্যস্ত, সেই খাদ্যই তাদের উর্বরতা হরণ করেছে।

আমার অ্যানের নানা গবেষণার একটি হল, মেকসিকোয় টোলটেক, অ্যাজটেক, মায়া সভ্যতা, ওদিকে পেরুর ইনকা সভ্যতার বহসাময় পতনের কারণটা কি? যারা এতদূর উঠল, বিশাল বিশাল পিরামিড তৈরি করল, যাদের হাতে নগর-সভ্যতার উন্মেষ হল, যারা জ্যোতির্গণনার পথপ্রদর্শক, নির্ভুল ক্যালেন্ডার যারা তৈরি করেছিল, যারা শূন্যের ব্যবহার শিখেছিল, তারা হাজারখানেক স্প্যানিয়ার্ড জলদস্যুকে ঠেকাতে পারল না কেন? তারা সব জানত, যুদ্ধ জানত না। তারা কি দুর্বল, ভীরু ছিল। না শান্তিপ্রিয়, যুদ্ধবিমুখ ছিল! না এর মূলেও খাদ্যের ভূমিকা আছে!

আবার সেই ভুট্টা। মধ্য আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার উত্থানপতনে ভুট্টার অবদান। যাযাবর মানুষ শিকারের পেছনে যতত্র ছুটে বেড়াত। যতদিন না কৃষির কৌশল আয়ত্তে এল ততদিন একঠাঁয়ে বসে অন্য কিছু ভাবার অবসর হল না। জমি ধরে মানুষ যেদিন এক জায়গাতে জমতে শিখল, সেই জমায়েত থেকে এল জনপদ। গড়ে উঠল সভ্যতা।

মেকসিক্যান ইন্ডিয়ানদের হাতে এল ভুট্টার চাষ। অতি সহজ এক পদ্ধতি। ধান চাষের মতো কঠিন কিছু নয়। একফালি জমি, এক মুঠো শস্যকণা। একজন মানুষের পরিচর্যা। একটি পরিবারের আহারের ব্যবস্থা। ভুট্টাকে অনুসরণ করে এল টোম্যাটো, লঙ্কা, বিনস আর পেঁয়াজ। এই অঞ্চলের পেঁয়াজকে বলে, পার্ল অনিয়ান। কি একালে, কি সেকালে, সাধারণ মানুষের আহারে, মাছ, মাংস, ডিম দুধ ছিল না। আর ছিল ভুট্টাকে গেঁজিয়ে তৈরি এক ধরনের মদ, ষোড়শ শতকের আফ্রিকায় যার না ছিল পোম্বা। ভুট্টার টরটিলা তার ওপর লঙ্কা, টোম্যাটো, মুক্ত পেঁয়াজ আর পোম্বা। একদল মানুষকে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। দিনের পর দিন এই অসম আহারে এল অসুখ, 'দি ডিজিজ অব দি মিলিজ'। মিলিজ মানে মেজ মানে ভুট্টা। ভুট্টাই যাদের প্রধান আহার তারাই ভোগে এই অসুখে। আধুনিক কালে এই অসুখের ডাক্তারি নাম, পেলাগ্রা। ভিটামিনের অভাবে সর্বাঙ্গে ঘা। মুখের ভিতরে, জিভে ক্ষত আর পেটের গোলমাল। 'ম্যাসড' এনটেরাইটিস। জীবনীশক্তি জখম করে দেবার পক্ষে বেশ ভালই একটি অসুখ। প্রোটিনভোজী শত্রুরা, গানপাউডারের অধিকারী স্প্যানিয়ার্ডরা সহজেই শেষ করে দিতে পেরেছিল ইন্ডিয়ানদের। বিজয়ী স্প্যানিয়ার্ডরা যখন দেশে ফিরল তখন তাদের জাহাজে ছিল কিছু ইন্ডিয়ান ক্রীতদাস, ভুট্টার দানা আর মুঠো মুঠো সোনার গুঁড়ো। এই ভুট্টা বা কর্ন সেই ইওরোপীয় বিজেতাদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের কলোনিতে কলোনিতে। আফ্রিকাতেও ভুট্টা প্রধান খাদ্য। তারাও অপুষ্টিতে মরতে বসেছিল, কিন্তু সময়ে তার ওপর মাংস, টোম্যাটো, লেটুস, বিনস ইত্যাদি চাপিয়ে শুধু প্রাণে বাঁচেনি, আজ তারা প্রায় প্রত্যেকেই লম্বায় ফুট ছয়েকের কম নয়। স্বাস্থ্যেও কম নয়। স্বাস্থ্যেও প্রায় দৈত্যের মতো।

মেকসিকো এখনও ভুট্টার অভিশাপে ভুগছে। মেকসিকোর কৃষি সংক্রান্ত সরকারী নীতি অদ্ভুত ধরনের। 'এজিডো' শব্দটা হল স্প্যানিশ। অর্থাৎ একজন কৃষককে দেওয়া সরকারী জমি, যা সে নিজের দখলে চাষ করতে পাবে। শব্দটা স্প্যানিশ হলেও আবহমান কাল ধরে মেকসিকোয় এই 'এজিডো' প্রথাই চলে আসছে। জমির মালিক তুমি নও। সব জমি দেশের মানুষের। তার একটা অংশ দেওয়া হল তোমাকে। এইবার তুমি সেই জমির পেছনে তোমার পরিবারের শ্রম ও মূলধন নিয়োগ কর। মেকসিক্যান ইন্ডিয়ানদেরও সেই একই নীতি ছিল। তারা হয়তো এজিডো প্রথা না বলে অন্য কিছু বলত। কি বলত আমার জানা হয়নি। হাল আমলে এই নীতিতে আর কিছু আধুনিক শর্ত আরোপিত হয়েছে। যেমন কৃষক তার এজিডো একজন মাত্র উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যেতে পারবে। টুকরো টুকরো করে একাধিককে দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ ফ্র্যাগমেন্টেশান অফ ল্যান্ড বন্ধ করার

সরকারী চেষ্টা। দ্বিতীয় শর্ত হল, জমি বিক্রি করা যাবে না। তৃতীয় শর্ত হল চাষ না করে জমি ফেলে রাখলে সরকার সেই জমি সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করবেন। বাজেয়াপ্ত করে অন্যকে দিয়ে দেবেন।

নতুন নীতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যত কূপ ছিল, যত লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষি অনুষঙ্গ ছিল সব কিছুর মালিক হল ব্যক্তি বিশেষ নয়, দেশের সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়। জমির নতুন মালিক ও কৃষকরা প্রয়োজনে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে পারবে। সমস্ত কৃষক সমবেতভাবে সার, বীজ ও কীটনাশক কিনে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারবে। এর জন্যে স্থাপিত হল, ন্যাশনাল এজিডাল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক। নতুন জমিতে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি শেখাবার জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হল এঞ্জিনিয়ার আর অ্যাগ্রোনমিস্ট।

মেকসিকোয় বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর, ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্ট লাজারো কার্ডেনাস এই নতুন কৃষিনীতির প্রচলন করেন। নতুন নীতি, প্রাথমিক সাফল্য, পরবর্তী স্থিতাবস্থা, প্রাচুর্য, দারিদ্র্য, এ সব কথা বলার আগে মেকসিকোর গত পাঁচশো বছরের ইতিহাসের পাতায় একবার উঁকি মারা উচিত। ইতিহাস জেনে বর্তমানে ঘোরাফেরা করলে ভ্রমণের মাধুর্য আরও বেড়ে যায়। বর্তমানের পেছন থেকে অতীত উঁকি মারতে থাকে। দেশ মানে তটভাগে আছড়ে পড়া সমুদ্র নয়, একসার মাথা উঁচু গাছ নয়, কয়েক হাজার ঢ্যাঙা আধুনিক বাড়ি নয়। বিশাল হোটেল, ক্লাব, সুন্দরী রমণীর নৃত্য নয়, বহুতল বিপণিতে ঢুকে পাগলের মতো কেনাকাটা নয়। দেশ মানে যন্ত্রণা। যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত আনন্দ। দেশ যেন মা। কত যন্ত্রণায় জন্ম নেয় বর্তমান। পরিচারিকা, সেবিকা এসে মাতার ললাটের স্বেদ মুছিয়ে দিয়ে বর্তমান নামক শিশুটিকে তুলে ধরেন। হাসি ফোটে মায়ের মুখে। দেশ মানে ধূলিকণায় শুকিয়ে থাকা বিজেতা ও বিজিতের রক্ত। দেশ মানে নিগৃহীতের ক্রন্দন ও নিগ্রহকারীর নিষ্ঠুর উল্লাস মিশে উত্থিত এক সংগীত।

৫৫

ইতিহাস শুরু করা যাক ১৫২০ সাল থেকে। মেকসিকোর প্রাচীন সভ্যতা, জীবন, নগর, পিরামিড, ঐশ্বর্য, সংস্কার, সংস্কৃতি, গৌরব বলতে যা কিছু ছিল, নিষ্ঠুর স্প্যানিয়ার্ডরা চুরমার করে দিয়েছে। মায়াসভ্যতার সব অহংকার পরিণত হয়েছে ক্রীতদাসের আর্তনাদে। রাজা হয়েছে দাস। দেবতারা পরাভূত। পরাজিত সমস্ত আচার অনুষ্ঠান। কত মানুষের জীবন্ত হৃদয় উৎসর্গ করা হয়েছে অ্যাজটেক দেবতার চরণে। কিছুতেই কিছু করা গেল না। যীশুর ভক্তরা প্রমাণ করে দিল—পেগান গড কত দুর্বল! স্পেনে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল নতুন জগৎ, নিউ ওয়ার্লডের সংবাদ। সাহসী একদল মানুষ, অদ্ভুত এক ভূখণ্ডে অদ্ভুত এক দল মানুষকে পরাভূত করে সন্ধান পেয়েছে অতুলন ঐশ্বর্যের। একদিকে গালফ্‌কোস্ট, অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, য়ুকাটান পেনিনসুলা দক্ষিণে পানামাযোজক ধরে নেমে গেছে আরও গভীরতর রহস্যে ইনকাদের রাজ্যে। রহস্যালোকে সাজানো ছিল সব। সমগ্র স্পেনে রটে গেল বার্তা, হারনানডেজ কর্টেস খুঁজে পেয়েছে কুবেরের ঐশ্বর্য। হারনান পেরেজ দ্য ওলিভা, স্প্যানিশ হিউম্যানিস্ট দেশবাসীর উদ্দেশে লিখলেন, 'এতকাল আমরা ছিলাম পৃথিবীর শেষ প্রান্তে, এখন আমরা চলে এসেছি একেবারে মধ্যভাগে। আমাদের ভাগ্যের অভূতপূর্ব পরিবর্তন। খুব ভাল কথা। ভদ্রমহোদয়গণ স্পেনের এই বিশাল ভাগ্যোদয়ের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন। আপনাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন এক মহাপথ। সেই পথের পথিক হয়ে সৌভাগ্যের অংশীদার হোন। পরিবারে নিয়ে আসুন পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি।'

অলিভার এই আহ্বানই প্রমাণ করে, স্পেন তখন কি গর্বে, উল্লাসে ফেটে পড়ছে। উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ অরুণ সূর্যের মতো মধ্য আকাশে দীপ্যমান। রাজা পঞ্চম চার্লস বিজয়ী হারনান কর্টেসকে ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার জন্যে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন। তাঁকে নিযুক্ত করলেন নতুন

উপনিবেশের শাসক ও সেনানায়ক। মেকসিকোর নাম হল নিউ স্পেন। পরবর্তী কয়েক বছরে জাহাজ বোঝাই হয়ে স্প্যানিয়ার্ডরা দলে দলে চলে এলেন নতুন কলোনিতে। সকলেরই এক উদ্দেশ্য ভাগ্য ফেরাতে হবে। অ্যাজটেক রাজ মোকতেজুমার বিশাল নগরী ঐশ্বর্যে ভরপুর। তার অল্প নিদর্শন কর্টেস স্পেনে নিয়ে এসেছেন। সেইটুকু দেখেই সব মাথা ঘুরে গেছে।

ঔপনিবেশিকরা শুধুমাত্র টেনকটিটলানেই সীমাবদ্ধ রইলেন না, তিন দশকের মধ্যেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়লেন প্রায় কুড়ি লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের বিশাল অঞ্চলে। অর্থাৎ বর্তমান মেকসিকোর প্রায় গোটা এলাকাটাই এসে গেল স্পেনের দখলে। শুধু তাই নয় উত্তরে বর্তমানের টেকসাস, অ্যারিজোনা, নিউ মেকসিকো ও ক্যালিফোর্নিয়াতেও তাঁরা উপনিবেশ তৈরি করে ফেললেন। তার মানে প্রায় দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ইন্ডিয়ানদের তাঁরা ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসে গেলেন।

শুরু হল দুটি সংস্কৃতির মুখোমুখি সংঘর্ষ। স্প্যানিশ আর ইন্ডিয়ান। সব সংঘর্ষেরই শেষ পরিণতি হল মিলন। দুই সংস্কৃতির মিলনে জন্ম নিল মেকসিক্যান জাতি। যত সহজে বলা হয়, তত সহজে কিন্তু হল না। দশ মাসে ভূমিষ্ঠ হয় শিশু আর একটি জাতি ভূমিষ্ঠ হল প্রায় চারশো বছরের কালগর্ভ-যন্ত্রণায়। যন্ত্রণা, বঞ্চনা, রক্তপাতের পাত্র থেকে উঠে এল একটি নতুন দেশ, একটি নতুন জাতি, মেকসিকো। প্রথম তিনশো বছর উপনিবেশ চলল স্পেনের রাজার খেয়াল-খুশিতে। চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে গেল লাগাতার যুদ্ধ। স্পেনের আধিপত্য থেকে মেকসিকোর মুক্তি-সংগ্রাম। বিদেশী শক্তির খবরদারি থেকে মুক্তি। শেষে শুরু হয়ে অন্তর্বিপ্লব। ঔপনিবেশিক শাসনের যা পরিণতি। দেশের মানুষের মধ্যে পরস্পর বিরোধী শ্রেণী তৈরি হয়ে যায়। উচ্চবর্ণ, মধ্যবর্ণ, নিম্নবর্ণ। একই দেশের মানুষ হলেও সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের অভাব হয়ে যায়। অল্পসংখ্যক ধনী ও বিপুল সংখ্যক দরিদ্রের মধ্যে রচিত হয় দুস্তর ব্যবধান। কেউ হয় সকল সুখ ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী, আর কেউ হয় সর্ব অর্থে বঞ্চিত। তখন সব ভালবাসা উবে গিয়ে পরিবেশে আসে ঘৃণা। সে ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় শ্রেণী সংগ্রাম। প্রথমে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা হাতে এলেও সমাজের চেহারা পাল্টায় না। সমাজের চেহারা পাল্টাতে, প্রতিটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন বিপ্লবের। ভারত আর মেকসিকোর ইতিহাস প্রায় এক। ভারতের প্রথমটা হয়েছে, স্বাধীনতা দ্বিতীয়টা হয়নি। প্রয়োজন ছিল বিপ্লবের। মেকসিকোতে যা হয়েছিল ১৯১০ সালে। মানবেন্দ্র রায় দুই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে অদ্ভুত এক মিল খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই, দেশটির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে, আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগের চোখে ধুলো দিয়ে এক রাতে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যাত্রা করেছিলেন মেকসিকোয়। মেকসিকোতে তখন বিপ্লব চলেছে। রায় চেয়েছিলেন ভারতীয় বিপ্লবে জার্মানির সাহায্য যখন এল না, তখন মেকসিকোর বিপ্লবে নিজের কর্মশক্তি নিয়োগ করে ভারতীয় বিপ্লবের পরিবর্তে বিশ্ববিপ্লব সংঘটিত করা। সামাজিক ন্যায় বিচার ও মানবতার উদ্বোধন শুধু ভারতের সমস্যা নয়। সারা বিশ্বের সমস্যা। রাজশাসনই হোক আর ধনতান্ত্রিক শাসনই হোক, শাসনের একটাই চেহারা—বঞ্চনা। শ্রেণীবৈষম্য চুরমার না করতে পারলে, পারলামেন্টে জাতীয় পতাকা উড়তে পারে, কিন্তু শ্রেণীশোষণ অব্যাহতই থেকে যাবে। রায় বিশ্বাস করতেন মেকসিকোর য়ুকাতান প্রদেশে মায়াসভ্যতার স্থাপকরা ছিলেন ভারতীয়। সেই কারণেই মেকসিকোর সঙ্গে তিনি এক অবিচ্ছেদ্য রক্তের বন্ধন অনুভব করতেন। এই আকর্ষণেই তিনি মেকসিকোকে বেছে নিলেন তাঁর আগামী বিপ্লবের কর্মভূমি হিসেবে।

আমি আর অ্যান এখন য়ুকাতান প্রদেশেই রয়েছি। পথে হাঁটার সময় যেই মনে হচ্ছে এই পথে দূরে অতীতে মানবেন্দ্রনাথ হয়তো হেঁটে ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আমার ভ্রমণ হয়ে উঠছে ইতিহাসের পাতা ওল্টানো। আমি একটা বাড়তি পুলক অনুভব করছি, যা অ্যান করতে পারছে না।

আমি আবার ফিরি অতীতে। দেখি কেন রায় এত শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। মেকসিকোর শুরুতে বিপ্লবের বীজটি বুনে গিয়েছিলেন বিজেতা কর্টেস। কর্টেসের সঙ্গী কনকুইস্তাদররা। নির্মম হাতে তাঁরা ইন্ডিয়ানদের অতীত মুছতে শুরু করলেন। একটুও সময় নষ্ট না করে। জয় করার ছ'মাসের মধ্যে টেনকটিটলানের ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে উঠল মেকসিকো নগরী। নিউ স্পেনের রাজধানী। প্রাচীন মায়ামন্দির, হুইতজিলোপোকতলির কাছে গড়ে উঠল স্প্যানিয়ার্ডদের প্রধান গীর্জা। তার পাশেই উঠল

বিশাল প্রাসাদ, রাজ্যপাল কর্টেসের বাসস্থান। প্রাসাদেই রাজকীয় অহঙ্কারে বসবাস করে গেছেন পরবর্তী ভাইসরয়রা।

স্পেন থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী রাজকর্মচারীরা স্পেনের রাজকোষ থেকে কোনও অর্থ পেতেন না। তাঁদের বলা হয়েছিল চরে খাও। লুটপাট করে ভাগ্য ফেরাও। অধিকৃত অ্যাজটেক ঐশ্বর্যের বড় বংশটা চলে গেল স্পেনের রাজার ভোগে, বাকীটা রইল কর্মচারীদের লুটেপুটে খাবার জন্যে। অ্যাজটেক রাজ মোকটেজুমার প্রাসাদের সোনা ও বস্ত্রভান্ডার ভাগ-বখেরা হয়ে যাবার পর, কর্টেস স্পেনের রাজার খুঁতখুঁতে অনুমোদন নিয়ে তাঁর পারিষদদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন ৩৭০টি নগর। এই ৩৭০টি নগর কর্টেস ভেট পেয়েছিলেন বিজিতদের কাছ থেকে। এই উপঢৌকনকে স্প্যানিশ ভাষায় বলা হয়, এনকোমিয়েন্ডাস। ভারতবর্ষে মোগল অধিকারে যা হয়েছিল আর কি! জায়গিরদার। জায়গীর প্রথা। ওই ৩৭০টি মেকসিক্যান শহরের ইন্ডিয়ান প্রজারা বাৎসরিক খাজনা হিসেবে অধিকারকারী স্প্যানিশ জমিদারদের দিত খাদ্য নানারকম উপহার সামগ্রী আর দাস। কর্টেস নিজের অধিকারে রাখলেন এইরকম ২২টি এনকোমিয়েন্ডাস। যার ইন্ডিয়ান প্রজাসংখ্যা ছিল ২৩ হাজার। এইভাবে নিউ স্পেনে কর্টেস আর তাঁর সঙ্গীরা দেখতে দেখতে হয়ে উঠলেন বিশাল বড়লোক। সারা স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ধনী মানুষ। স্প্যানিশ জায়গিরদার আর শাসকরা চেয়েছিলেন দীর্ঘকাল এইভাবেই চলুক। অবস্থার পরিবর্তন যেন না হয়। বিনাশ্রমে বিশ্বের সেরা ধনকুবের। খাজনা আর বাজনা।

তা কিন্তু হল না। কয়েক বছরের মধ্যেই অবাঞ্ছিত সব বাধা আসতে লাগল। কাঙাল দেখেছে শাকের ক্ষেত। আর রক্ষা আছে? একটা সুন্দর দেশ, সুন্দর একটা শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে তাদের নজর ছিল না। তারা চেয়েছিল ঐশ্বর্য আর সম্মান। সবাই চেয়েছিল রাজা হতে। বিশাল ঐশ্বর্যভাণ্ডারের ওপর ঝাঁক ঝাঁক শ্বেত শকুন। টানাটানি, ছেঁড়াছেঁড়ি, খাবলাখাবলি। ডাকতদলে যা হয় আর কি! লুটের মাল নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি। স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের সঙ্গে নিউ স্পেনের একচ্ছত্র রাজা কর্টেসের বেধে গেল খটাখটি। পঞ্চম চার্লস নতুন স্পেনে তাঁর সিংহাসনের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী চান না। কর্টেস রাজার সুনজর থেকে সরে গেলেন। ১৫৩৫ সালে পঞ্চম চার্লস তাঁর এক আত্মীয় ডন অ্যান্টনিয়ো দ্য মেন্ডোজাকে কর্টেসের জায়গায় মেকসিকোর নতুন গভর্নার করে পাঠালেন। ক্ষুণ্ণ, আশাহত কর্টেস ফিরে এলেন স্পেনে। আশা ছিল বীর আবার ফিরে পাবেন তাঁর হৃত সম্মান। রাজানুগ্রহে আবার প্রতিষ্ঠিত হবেন উচ্চাসনে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর নানাভাবে চেষ্টা চালালেন। সফল হতে পারলেন না। ঠিক বারো বছর পরে ১৫৪৭ সালে স্বদেশেই তাঁর মৃত্যু হল। অকল্পনীয় ধনী; কিন্তু সম্পূর্ণ আশাহত দিগ্বিজয়ী বীর মনের দুঃখ মনে নিয়ে চিরবিদায় নিলেন।

অ্যান আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'এক মনে কি করছ বলো তো! তোমার কি পরীক্ষা?' তার মুখের দিকে ঘাড় ঘোরালুম। দু'পাশ দিয়ে চুল ঝুলে পড়েছে। ফুলের মতো মুখ। ছেলেবেলায় আমার মা এইরকম সুন্দরী ছিলেন।

'এখন তোমার ইতিহাস তুলে রাখ, চলো যাই। সমুদ্র ডাকছে।'

সত্যিই সমুদ্র ডাকছে, সফেন নেশার মতো। হোটেলের ঘর যতই সুরম্য হোক, ঢেউ আর বালি আর দামাল বাতাস পাঁচতারাকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। সমুদ্রের ধারে এত বড় বড় হোটেলের কোনও মানে হয় না। সামান্য ছাউনিই যথেষ্ট।

অ্যান বললে, 'আর আমাদের হাতে আছে মাত্র কালকের দিনটি। চলো, চলো, যতটা পারা যায় সব দেখে নি। আজ আমরা বালিতেই ঘুমবো। সারা রাত নাচবো।'

'এনার্জি কোথা থেকে আসবে?'

'সমুদ্রের বাতাস থেকে। সমুদ্রের নিশ্বাস থেকে।'

আজ খুব গান ধরেছেন ভরাট গলায় মেকসিক্যান শিল্পী সুইমিং পুলের ধারে রেস্তোরাঁয়। কফির গন্ধ বেরোচ্ছে। তাই কি এর নাম কাফে। আমরা স্প্যানিশ গানের পাশ দিয়ে, সুইমিং পুলের সাঁকো পেরিয়ে চলে এলুম সমুদ্রে। সমুদ্র তুলেছে মহা সঙ্গীত। তার কাছে কিছু আর লাগে না। আজ

আকাশে ফানুসের মতো একটা অলৌকিক চাঁদ উঠেছে। নিজের আকাশের চাঁদ আর অন্যের আকাশের চাঁদে যেন বিস্তর ফারাক। চাঁদেরও জাত আছে, ভারতীয় চাঁদ, মেকসিক্যান চাঁদ। চাঁদের এ সব কিছু মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমার। সামনের আকাশে সমুদ্রের ঢেউ ঘেঁসে ঈশ্বরের হাত থেকে খুলে পড়া আলোকিত বেলুনের মতো ভাসছে।

আমরা দুটো ফাইবার গ্লাসের ডোঙা টেনে এনে পাশাপাশি আধশোয়া হলুম। অকল্পনীয় আয়েস। একেই বলে 'ডলার লাকসারি'। মাথার তলায় হাত রেখে শুয়ে আছি আমরা। টুকরো টুকরো তুলোমেঘ ভেসে চলেছে। তারাদের সভা বসেছে আকাশের আসরে। সেই জায়গাটা আমরা এখনও দেখিনি। ছবি দেখেছি, যেখানে মায়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে মৌন নির্জনতায়। এই আকাশের চাঁদ ওই আকাশেও আছে। সমগ্র স্থানটিকে মায়াবী করে তুলেছে অবশ্যই। হয়তো সেই লুপ্ত সভ্যতার কোন অশরীরী চরিত্র এই মুহূর্তে মায়াপ্রান্তর ধরে সূক্ষ্মশরীরে ভেসে চলেছেন নির্বাচিত একটি ধ্বংস-স্তূপের দিকে।

ঢেউ ভাঙছে বেলাভূমিতে। একটানা কামান গর্জনের মতো শব্দ, যেন শুম্ভ নিশুম্ভে লড়াই চলেছে। হঠাৎ দেখলুম দূরে সমুদ্রবক্ষ দিয়ে ছোট একটা জাহাজ দ্রুতগতিতে চলেছে। অ্যান বললে, 'ওটা যাত্রী জাহাজ নয়, যুদ্ধজাহাজ, ডেস্ট্রয়ার।'

'এই সমুদ্রে ডেস্ট্রয়ার কি করছে অ্যান, কোথাও যুদ্ধ বেধেছে নাকি?'

'পৃথিবীর সর্বত্রই তো যুদ্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, ডেস্ট্রায়ারটা অবশ্য যুদ্ধে নেমেছে ড্রাগস আর নারকোটিসের বিরুদ্ধে।'

'এখানেও ড্রাগস?'

'আধুনিক সভ্যতার তো ওইটাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। মেকসিকো সিটিতে একবার চলো না। দেখতে পাবে টাটকা তাজা তরুণ-তরুণীদের কিরকম ভূতের মতো অবস্থা। ড্রাগস নিয়ে তোলপাড় কাণ্ড চলেছে আমেরিকায়। উত্তরে মেকসিকো আর আমেরিকার সীমান্ত এলাকার পরিমাণ তিন হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। এই দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা সামলানোই এক মহা সমস্যা। আমেরিকা থেকে চালান আসছে হেরোইন, মারিজুয়ানা। আমেরিকায় মারিজুয়ানা আসক্তের সংখ্যা দু'কোটিরও বেশি। আমেরিকায় মারিজুয়ানা চাষের পরিমাণ হু হু করে বাড়ছে। আমেরিকায় এখন সবচেয়ে লাভের চাষ। ইউনাইটেড নেশান্স ইন্টারন্যাশন্যাল নারকোটিক্স বোর্ডের '৮৫ সালের রিপোর্ট বলছে, পৃথিবীতে মোট গাঁজা উৎপাদনের বারো শতাংশ আসে আমেরিকা থেকে। সবটাই বেআইনি চাষ। আমেরিকার গাঁজার তেজ সবচেয়ে বেশি আর সিডলেস, বীজশূন্য। ওই দু'কোটি গঞ্জিকাসক্ত ছাড়াও, আমেরিকায় আরও কয়েক কোটি আছে যারা কোকেনের ভক্ত। ১৯৮৪ সালে হোয়াইট হাউস রিপোর্ট বলছে, কোকেনাসক্তের সংখ্যা হবে প্রায় বাইশ লক্ষ। এই সংখ্যা বছরে প্রায় ১১ শতাংশ হারে বাড়ছে। আফিং গাছ থেকে আরও সাংঘাতিক দুটি মাদক পাওয়া যায়, হেরোইন আর মরফিন। আমেরিকায় আরও পাঁচ লাখ এই হেরোইনে আসক্ত।'

'তুমি থামো বাবা, লাখ আর কোটি ছাড়া তোমার মুখে কথা নেই। ওই জন্যে আমেরিকাকে বলে বড় লোকের দেশ।' সমুদ্র আপন মনে মেঘ গর্জনের স্বরে তালি বাজিয়ে প্রকৃতির আসরে নাচানাচি করলে কি হবে, মানুষ নাচছে অন্য তালে। ডলার সেখানে তাল দিচ্ছে। অ্যানের কাছে যা শোনা গেল তাতে ব্যাপারটা যা দাঁড়াল তা হচ্ছে রিপাবলিক মাদক-চলাচলের রাস্তার মাঝখানে পড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে। কোকা গাছ, যা থেকে তৈরি হয় কোকেন, সেই গাছের ঢালাও চাষ হয় দক্ষিণ আমেরিকায়। উৎপাদিত কোকেন মেকসিকো মাড়িয়ে গিয়ে ঢোকে উত্তর আমেরিকায়। আর আমেরিকার মারিজুয়ানা, হেরোইন, মরফিন চোরাপথে মেকসিকোর মধ্য দিয়ে চলে যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। সাধারণ মানুষ জীবন, যৌবন, ভিটেমাটি চাটি করে নেশা করে, ব্যবসা করে অন্য লোক। এই ড্রাগরুটের দু'ধারে বসে আছে ধনকুবের মাফিয়া আর তাদের চেলাচামুণ্ডারা।

আদিকাল থেকে মেকসিকোয় অল্প-স্বল্প নেশা যা ছিল তা হল মেকসিক্যান ইন্ডিয়ান বা মায়াদের নিভৃত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত তাঁদের নিজস্ব উপাদান। সে আবার আরও সাংঘাতিক। নেশা তো নয়, জীবন মৃত্যু নিয়ে খেলা। আমরা যাকে ব্যাঙের ছাতা বলি, সেইরকম এক ধরনের ছাতা,

যা একমাত্র মায়ারাই চেনে, সেই ছাতার বিষে মানুষ বেঁহুশ হয়ে যায়। মৃত্যু হয় না। নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। নানা রকম অতিলৌকিক দর্শন হতে থাকে। আর ছিল পেয়োট, এক ধরনের ক্যাকটাস। মরুভূমি থেকে খুঁজে আনতে হয়। গোল গোল, শুঁড়ের মত দেখতে। যেন কন্টকিত ফণী। ওই ক্যাকটাসের গাঁটে গাঁটে জমে বিষ। সেই বিষ থেকে মায়ারা তৈরি করতেন আরক। এখনও তৈরি হয়, ব্যবহৃত হয় তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। মনসা গাছের এই বোতামের মতো বা মাকড়সার ডুমো পেটের মতো অংশকে নাহুতল ভাষায় বলে, মেসকাল। এই মেসকাল চোলাই করে তৈরি হয় আরক। এই আরককে তাঁরা বলেন 'মেকসক্যালি। আমেরিকানরা বলেন মেসক্যালিন। এই আরক এক সাংঘাতিক বস্তু। মানুষকে সম্মোহিত করে ফেলে, যেন ভূত ধরেছে। বিখ্যাত লেখক আলডাস হাকসলি মেসক্যালিন পান করে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন।

'অ্যান আমাকে এক চুমুক মেসক্যালিন খাওয়াবে?'

'তোমার সমস্ত বায়না কাগজে লিখে একটা লিস্ট করে আমাকে দাও। থেকে থেকে তোমার এমন এক একটা আবদার।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মেকসিকোর সরকার খোঁজই রাখতেন না, দেশের ক'জন হেরোইন আসক্ত। সংখ্যা ছিল অতি সামান্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খোঁজ পড়ল, কোথায় আফিং-এর চাষ হয়। খোঁজ মিলল। সিনালোয়া রাজ্যে আফিং-এর চাষ হয়। সরকারী উদ্যোগে সেই আফিং থেকে যন্ত্রণা নিরোধক ওষুধ তৈরি শুরু হল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তখন তুলকালাম যুদ্ধ চলেছে। শত শত আহত সৈনিককে ব্যথার হাত থেকে সাময়িক নিবৃত্তি দিতে হবে। মেকসিকো মিত্র দেশগুলিকে এই যন্ত্রণা-নিরোধক ওষুধ সাধ্যমতো সরবরাহ করে বিরাট এক মানবিক কর্তব্য সম্পাদন করল। যুদ্ধ শেষ হবার পর যা ছিল মানবিক তা হয়ে দাঁড়াল এক কঠিন মানবিক সমস্যা। এই প্রচন্ড লাভের ব্যবসা চলে গেল অপরাধীদের হাতে। স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিল। অর্থনৈতিক সমস্যা তো ছিলই তার সঙ্গে যুক্ত হল এই সমাজ সংস্কৃতি ঘটিত সাংঘাতিক সমস্যাটি ড্রাগ-অ্যাডিকসান।

এই ড্রাগসের পেছন পেছন তেড়ে এল বিদেশী এক বিকৃত সংস্কৃতি। হিপি কালচার। খাওয়া যদিও বা বন্ধ করা যায়, শোঁকাটা তো সহজে বন্ধ করা অসম্ভব। সিগারেটের প্যাকেটের রাঙতায় এক চিমটে ফেলে তলায় লাইটারের আগুন ধরে ধোঁয়াটা নাক দিয়ে টেনে নেওয়া। মানুষের দুর্ভাগ্যই বলি, আফিং একাই একশো। চোলাই করে কত কি যে বেরোয়। হরেকরকম ডেরিভেটিভস। যে জিনিসটা নাকে শুঁকলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, একই সঙ্গে তিনজনের আবির্ভাব, সেই বস্তুটি আবার শিল্পের উপাদান। শিল্পের কাঁচামাল, ওষুধ তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান, অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বন্ধ করার উপায় নেই। বাজার ছেয়ে আছে। ফলে ইচ্ছে করলেই সংগ্রহ করা যায়। মেকসিকোর নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশু আর কিশোরেরা এই মারাত্মক নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। মেকসিকো সরকার মহা সমস্যায় পড়েছেন। ড্রাগ ডিলাররা নিজেরাই মারিজুয়ানা আর পপির চাষে নেমে পড়েছে। এই চাষে প্রচুর পয়সা, এদিকে অন্য চাষে নিযুক্ত ক্ষুদ্র কৃষকরা মার খাচ্ছে। সরকারকে দু'তরফে লড়তে হচ্ছে, দেশের চাষকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, অন্য দিক থেকে কলম্বিয়ার কোকেন প্রবেশের পথ আগলানো। এই যুদ্ধের ফলে মেকসিকোর মাফিয়ারা একজোট হয়ে সরকারকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে। ঠিক যে ঘটনা ঘটছে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে। সাপের লেজে পা দেবার অভিজ্ঞতা। দলের চাঁই, যারা ধরা পড়ে বিচারের জন্যে আদালতে উঠেছে, তারা সকলেই সিনালোয়া অঞ্চলের। এইখানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সমরবাহিনীর প্রয়োজনে চাষ শুরু হয়েছিল। সেবা এখন মাথায় উঠেছে, শুরু হয়েছে সেবন। বিশ্বযুদ্ধ শেষ, ড্রাগ-যুদ্ধের শুরু। আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারী আর নিষ্ঠুর মাফিয়াচক্রের সঙ্গে মুহুর্মুহু সংঘর্ষ। মেকসিকো সরকারের বাজেটে ড্রাগ-চক্র নিধনে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা অন্যান্য খাতের চেয়ে অনেক বেশি। এই কাজে ব্যবহৃত বিমান ও হেলিকপ্টারের সংখ্যা সর্বাধিক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বড়। সংখ্যায় সাতাশি। চোদ্দটি বেল ২১২ হেলিকপ্টার, সাতচল্লিশটি বেল ২০৬ হেলিকপ্টার। একুশটি ছোট সেসনা বিমান। পাঁচটি বড় মাল-পরিবাহী বিমান।

এই আকাশবাহিনীর কাজ হল সারা দেশে তন্ন তন্ন করে খোঁজা, মারিজুয়ানা আর পপি চাষ

যে সব জমিতে হচ্ছে তা সন্ধান করা ও ধ্বংস করা। কাজটা খুব সহজ নয়। এই চাষ পরিষ্কার সমতল ভূমিতে হয় না। মেকসিকোর ভূ-প্রকৃতি বড়ো বিচিত্র। পাহাড়, অরণ্য, খানাখন্দ, ঢেউ খেলানো জমি, অজস্র গোপনীয়তায় ভরা বিশাল এক ভূভাগ। আকাশ থেকে সহজে দেখার উপায় নেই কোথায়, পাহাড়ের কোন ভাঁজে, ভূ-পৃষ্ঠের কোন গোপনীয়তায় ফুটে আছে আফিং-এর নীল ফুল। ফুলের রঙ নীল কিনা জানি না, তবে শুনেছি বিষের রঙ নীলই হয়। মহাদেব নীলকণ্ঠ। ভেরাক্রুজ, গুয়েররেরো, তিজুয়ানা, বাজা ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি অঞ্চল আর আদপেই নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক মাদক অপরাধীরা কোটি কোটি ডলার নিয়ে তাদের পাতাল সাম্রাজ্য সাজিয়ে বসে আছে। তাদের হাতেও মজুত রয়েছে আধুনিক সমরাস্ত্র। আজকাল স্টেটের চেয়েও ক্রিমিন্যালরা বেশি শক্তিশালী। স্টেটের ক্ষমতা থাকলেও প্রয়োগের সময় প্রচুর বিচার, বিবেচনার প্রশ্ন এসে পড়ে। ক্রিমিন্যালদের তো তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। মেকসিক্যান সরকারের টহলদার হেলিকপ্টারকে মাটিতে নামিয়ে আনার বৈজ্ঞানিক কৌশল তাদের হাতের মুঠোয়। প্লেন অথবা কপ্টার কোনওটাই তেমন নিচু দিয়ে উড়তে পারে না। প্রথমত প্রাকৃতিক বাধা। চাষের জমি এমন জায়গায় যেখানে পাহাড় বাধা, বাধা অরণ্য, বাধা মাটি থেকে ছোঁড়া অস্ত্র। মাদক ব্যবসায়ীরা বিশ্ব জুড়ে বিশাল এক পাপ সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলেছে। তাদের অক্টোপাস বাহুতে ধরা রয়েছে সারা বিশ্ব। তাদের হাতে প্রচুর অর্থ, লোকবল, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। তাদের নিজস্ব বিমানবন্দর, বিমান, হেলিকপ্টার। তারা সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় ছোবল মেরে লোভ আর দুর্নীতি ঢুকিয়েছে। মোটা অর্থ ঘুস দিয়ে প্রশাসনকে সময় সময় বিকল করে দিচ্ছে। শিশু আর কিশোরদের ব্যবহার করছে চোরা চালানের কাজে, ব্যবহারকারীদের হাতে গোপনে মাল পৌঁছে দেবার সংযোগ সেতু হল নিরপরাধ শিশুরা। মেকসিকোয় ১৯৮৫ সালে মে মাস থেকে ১৯৮৬ সালের মার্চ পর্যন্ত মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যা যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা হল সম্পত্তি, শেয়ার, অলঙ্কার, যানবাহন, অস্ত্র, ও অর্থ। ফেডারেল জুডিসিয়াল পুলিশ শুধুমাত্র অর্থই যা ধরেছেন বিশাল তার পরিমাণ, চুরানব্বই কোটি যাট লক্ষ পেসো। তার মানে মাসে দশ কোটি পেসো।

'অ্যান, এ তো তোমার গিয়ে টেরিফিক ব্যবসা গো। কি হবে, তেলকল, পাটকল করে! সব বন্ধ করে লাগাও আফিং-এর চাষ। জয় জয় শিবশঙ্কর। তুমি কি জানো পৃথিবীর বহু বড় বড় লোক, গাঁজা আফিং, চরস, চন্ডু, কোকেন মরফিনে আসক্ত ছিলেন। শার্লক হোমস কোকেন নিতেন তার মানে কোকেন নিতেন স্যার কোনান ডয়েল। লেখকদের মধ্যে আর যাঁরা কোকেন নিতেন রবার্ট লুই স্টিভেনসন, অ্যালিস্টার ক্রোলে, জেমস জয়েস। কোকেন নিতেন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড। নাজি ত্রাস, জার্মান বিমানবাহিনীর এয়ার মার্শাল হেরমান গোয়েরিং। অভিনেতা, অভিনেত্রীদের মধ্যে কোকেনাসক্ত ছিলেন ওয়ালেস রিড, ম্যাবেল নরম্যান্ড, বারবারা লামার। তিনজনেই তোমার দেশের বিশ থেকে তিরিশের দশক মাতিয়ে রেখেছিলেন।

'মারিজুয়ানা, হাসিস বা হ্যাসের ইতিহাস শুনবে? গাঁজা টানতেন, গ্রীক দার্শনিক পাইথাগোরাস, ফরাসী লেখক ভিক্টর হুগো, থিওফিল গতিয়ার, চার্লস বোদমেয়র, স্তেফান মালার্মে, অ্যাপোলিনেয়ার, বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক নিৎসে। তোমার দেশের বিখ্যাত অভিনেতা এরল ফ্লিন, রবার্ট মিচাম আর তোমাদের প্রেসিডেন্ট রবার্ট, না রবার্ট নয়, গ্রেট জন এফ কেনেডি। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও পর্যটক, ধর্মগুরু অ্যালিস্টার ক্রোলে আবার হেরোইন নিতেন। গোয়েরিং নিতেন মরফিন। আমেরিকার ফাদার অফ সার্জারি ডক্টর উইলিয়াম স্টুয়ার্ট হলস্টেড মরফিন আর কোকেন এক সঙ্গে নিতেন।

'বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিরা আফিং খেতেন যেমন সুইস ফিজিসিয়ান অ্যালকেমিস্ট, মেডিক্যাল ফার্মাকোলজির পিতা প্যারাসেলসাস, ইংরেজ কবি টমাস শাডওয়েল, জর্জ ক্র্যাব, কলরিজ, ডিকুইনসি। আফিং খেতেন এডগার অ্যালেন পো, চার্লস ডিকেনস, জাঁ ককতো।

'পোয়েট বা মেসক্যালিন পান করতেন, ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত আমেরিকান নিউরোলজিস্ট, ব্রেন সার্জেন, পয়ের মিচল লেখক ও সাইকোলজিস্ট হ্যাভলক এলিস, ডব্লু বি ইয়েটস, হেরম্যান হেস, অলডাস হাকস্লি, জ্যাক কেরুয়াক, অ্যালেন গিনসবার্গ।'

'যে গাছ থেকে কোকেন হয়, সেই কোকা গাছ থেকে এক ধরনের পানীয় তৈরি হত, মারিআনি।

স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসাবে এই আরক পান করতেন রানী ভিক্টোরিয়া, পোপ ত্রয়োদশ লিও, আবিষ্কারক টমাস এডিসন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইউলিয়াম ম্যাকিনলে, প্রখ্যাতা অভিনেত্রী সারা বার্ন হাউট।'

অ্যান শুয়েছিল হঠাৎ উঠে বসে আমাকে এক ধমক লাগাল, 'চুপ, একদম চুপ, একগাদা নাম বলে মাথা একেবারে খারাপ করে দিলে। মহাপুরুষ, প্রতিভাবান পুরুষদের অনেক ছাড়পত্র আছে। তোমার আমার মতো সাধারণ লোক ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে সমাজ-সংসারের সর্বনাশ করবে তা তো হয় না! কোকেন, হেরোইন—এই সব নেশার দাম জানো! তুমি তোমার ঘটিবাটি, বিষয়-সম্পত্তি বেচে রাজা করে দিচ্ছ একদল ক্রিমিন্যালকে। এই নেশা একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না। উইথড্রল সিমটম দেখেছ চোখে!'

'অবশ্যই।'

'তাহলে আর বকবক না করে ধুপুস করে শুয়ে পড।'

অ্যান আবার শুয়ে পড়ল। যে ডেস্ট্রয়ারটা এদিক থেকে ওদিকে গিয়েছিল সেইটাই আবার, ফিরে আসছে। একটি মাত্র আলোর নিশানা। একচক্ষু দানবের মতো।

অ্যান বললে, 'কাল আমাদের সাপের ভয় দেখিয়ে যে সেন্ট্রি নামিয়ে দিলে সে হল মেকসিকোর ড্রাগফোর্স এডেফার-এর সেন্ট্রি। তোমার ধারণা নেই পৃথিবীটা আজকাল কত অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। এই যে আমরা বসে আছি, এর মধ্যে আশেপাশে অপরাধ জগৎ কত সক্রিয় জান কি তা! তাদের চোখে ঘুম নেই। যাদের দেখছ তাদের সকলকেই ট্যুরিস্ট ভেবো না। এই সব ইন্টারন্যাশন্যাল সেন্টারে অনেক ড্রাগ ট্র্যাফিকারস থাকে। এর মধ্যেই লাখ লাখ পেসো হয়তো হাত বদল হয়ে গেল।'

রাস্তায় আলো নেই। ধারে কাছে দেখা নেই কোনও জনপ্রাণীর। পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সুন্দর স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ। সারা শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বুলেটে। প্রতিটি ক্ষত থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে রক্ত। শুকিয়ে জমে গেছে স্পঞ্জের মতো। বাতাসে মৃত মানুষটির সোনালি চুল মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। জামার প্রান্ত নড়াচড়া করছে। মানুষটি বহু আগেই মারা গেছে। আর্তনাদ করতে করতে ছুটে এল পুলিসের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স। গুয়াদালাজারা সিটি হসপিটালের এমার্জেন্সি বিভাগের ডাক্তাররা পরীক্ষা করে রায় দিলেন মৃত।

ড্রাগ ব্যবসায়ীদের সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে প্রাণ দিলেন মার্কিন নাগরিক, এর্নরিক ক্যামারেনা। মেকসিকোর ড্রাগ প্রতিরোধবাহিনীর তিনি ছিলেন উৎসাহী, সাহসী এক সদস্য। মৃত্যুর তিনমাস আগে এই বাহিনী তিনশো কিলোগ্রাম কোকেন ধরেছিলেন। সেই সঙ্গে ধরা পড়েছিল বেশ কিছু চোরাচালানকারী। ওই সময়েই মেকসিকোর সরকারী বাহিনী চিহুয়াহুয়া প্রদেশের এক গোডাউন থেকে হাজার টন মারিজুয়ানা উদ্ধার করে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর কয়েকদিন দেরি হলেই পুরোমালটাই বাইরে চালান হয়ে যেত। চোরাচালানকারীদের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে গেল রাজার ঐশ্বর্য। সেই রাগেই হত্যা করা হল ক্যামারেনাকে।

ক্যামারেনার মৃত্যুতে সারা দেশ আজ আলোড়িত। এর আগে তিজুয়ানাতে ফেডারেল জুডিসিয়াল পুলিসের এক সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁকে আধমরা করে জ্যান্ত পোড়ানো হয়েছিল। স্মাগলাররা ঠিক যেমনটি করেছিল এক পুলিস অফিসারকে কলকাতার গার্ডেনরিচে। পৃথিবীর সব দেশের অপরাধীদের এক পন্থা। ক্যামারেনাকে হত্যার ঠিক ন' মাসের মাথায় মাদক ব্যবসায়ীরা ভেরাক্রুজে একই সঙ্গে বাইশজনকে খুন করল, পেছন থেকে গুলি করে। এ যেন সাড়ম্বরে শেষ আঘাত। এই ঘটনার পরই মেকসিকালিতে প্রেসিডেন্ট রেগনের সঙ্গে মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দ লা মাদ্রিদের বৈঠক হয়ে গেল, আমরা এখানে আসার কয়েক মাস আগে। বৈঠকে ঠিক হল, এই অপরাধ ও অপরাধীদের উচ্ছেদের জন্যে দু'দেশের সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে। ধনী আমেরিকা দরিদ্র মেকসিকোকে ডলার সাহায্য করবেন। সেই অর্থে কেনা হবে আরও অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ি, বিমান ও হেলিকপ্টার। ইতিমধ্যে মেকসিকো সরকারের দুটি হেলিকপ্টার মাদক ব্যবসায়ীরা ফেলে দিয়েছে। একজন পাইলট নিহত হয়েছেন, চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে গেছেন আরও একজন।

শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছি, বাপরে, এত কাণ্ড! পায়ের দিকে সমুদ্র মুহুর্মুহু তোপ দাগছে। ডেস্ট্রয়ারটা ফিরছে টহল দিয়ে। ক্লান্ত অ্যান ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্ত আরামে। মোচার

খোলাব পাশে ঝুলে আছে তাব ঘুম-আলগা হাতখানি। এ আর এক নিদ্রিত সৌন্দর্য। এখন রাত আড়াইটে। কলকাতায দুপুব আড়াইটে। ঠিক চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধান। নিবপবাধ সমুদ্রতীরে আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম। ফাইবাব গ্লাসেব নৌকো-বিছানায।

সমুদ্রের তীবে হঠাৎ ঘুম ভাঙার অভিজ্ঞতা যে কি, বলে বোঝানো যাবে না, তবু চেষ্টা করি। পুজো শেষ হয়ে যাবাব পব শান্তিব জল ছিটান পূজাবী, ঘটেব মুখ থেকে আম্রপল্লবটি তুলে নিয়ে ঘটেব জলে ডুবিয়ে ডুবিযে, হঠাৎ মনে হল বিশাল কোনও ঘট থেকে বিশাল কোনও পূজারী অজস্রকণায আমাব গায়ে শান্তিবাবি বর্ষণ কবছেন। আমাব চোখ খুলে গেল। ধীবে ধীরে উঠে বসলুম। দেখি, সমুদ্র আমাদেব দিকে অনেকটা সবে এসেছে। ক্লান্তিহীন ঢেউ সশব্দে ভেঙে ভেঙে পড়ছে প্রায আমাদেব পাযেব কাছে। জলকণায আমরা ভিজে গেছি প্রায। অ্যান অকাতবে ঘুমোচ্ছে তাব সাবা গাযে, মুখে, চুলে, ভুরুতে ঝুলে আছে তুলতুলে সমুদ্রেব ফেনা। এ দৃশ্য আমি জীবনে ভুলবো না। কঠিন কল্পনাতেও ও দৃশ্য ভাবা যায না। অ্যানেব কপালে হাত ছোঁযাতেই সে চোখ মেলে তাকাল। আকাশে খুলছে দিনেব চোখ, এদিকে খুলেছে বিদেশিনীব সমুদ্রনীল চোখ।

আমি বললুম, 'অ্যান, চোখ মেলে দেখো, আমাদেব শোবাব ঘবে সমুদ্র ঢুকে পড়েছে।'

আমাব কথা শেষ হযেছে কি হযনি, পবেব ঢেউটা সশব্দে ভেঙে পড়ল আমাদেব ঘাড়ে। মনে হলে পোপোকাটাপিটেল পর্বতটাই বুঝি ভেঙে পড়ল। আমাদেব নৌকো ভবে গেল জলে। অ্যানেব ফ্রকটা ঝটকায উঠে গেল পাযেব দিক থেকে ওপবে। তাব নিদ্রাব জড়তা তখনও কাটেনি। প্রেমিকসমুদ্রেব প্রবল আলিঙ্গনে তাব বিস্ময়েব চিৎকাব, 'ও মাই গড'।

ঢেউ সবে যাবাব মুহূর্তে সে বেশবাস গুছিযে ডোঙ্গা থেকে নেমে পড়েই আমাকে বললে, 'মারো ছুট।'

পবেব ঢেউটা ছুটে এসে আমাদেব ধবাব আগেই আমবা সবে এসেছি নিবাপদ দূবত্বে। আকাশের অঙ্গ থেকে অন্ধকাবেব ওড়নাটি ধীবে ধীবে খুলে পড়ছে। সমুদ্রেব ঢেউযে দুলছে আলোর হাসি। আমবা দু'জনেই ভিজে সপসপে। পিঠেব ওপব চামবেব মতো দুলছে অ্যানেব বেশমী চুল। বাতাস এত শীতল যে শবীবে কাঁপুনি ধবে গেছে। এমন ঘটনা এ জীবনে আব ঘটবে না। সেই গান, 'প্রেম একবাবই এসেছিল নীববে'ব মতো, ঢেউ একবাবই ভেঙেছিল শবীবে, আচমকা। আমরা দুটি প্রাণী হতবাক দাঁড়িযে। এমন দামাল সমুদ্র দেখিনি। আমাদেব ঘুম ভাঙা চোখেব সামনে ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীব ভোবেব স্বপ্ন।

অ্যান শীতেব দেশেব মেযে, ব শীত কবছে না। আমাকে কাঁপতে দেখে বললে, 'চলো। শুকনো হযে আসি। তাবপব আমবা কফি খাবো। গবম মেকসিক্যান কফি।'

আমবা যখন ধোপদুবস্ত হযে পামফল্ড কফি কর্নারে এসে বসলুম, তখন বোদ উঠে গেছে। ঝলমলে বোদ। এদেশে মাছিব মতো প্রজাপতি ওড়ে। নানাবঙেব প্রজাপতি। ঈশ্ববেব এই পৃথিবীর কাণ্ডকাবখানা বোঝা ভাব। হৃষিকেশেব মাছি, মেকসিকোব প্রজাপতি। ওটা যোগীব দেশ, এটা ভোগীর দেশ।

কফিব কি সুন্দব স্বাদ! প্রাণ ভবিযে তৃষা হবিযে, যে মেয়েটি কফি পবিবেশন কবছে তাব মুখে ছড়িযে আছে রূপালি হাসি। অ্যান বললে, 'তুমি সলিড কিছু খেতে চাও?'

'না।'

'তোমার পেট ঠিক আছে তো? টবটিলা খেযে গোলমাল কবেনি তো।'

'না। পেট একেবাবে পিয়ানোব মতো হয়ে আছে। সুবে বলছে।'

'তাহলে আমবা ব্রেকফাস্ট কবব মার্কেট প্লেসেব সেই জায়গায। ভাবি সুন্দর দোকান।'

আমবা কফি শেষ কবে সুইমিং পুলের ধাবে দুটো ডেকচেযাবে এসে থপাস করে বসে পড়লুম। 'শরীবটা যেন তালশাঁসেব মতো হযে আছে' বললে অ্যান। সমুদ্রেব বাতাসে সাবারাত পড়ে থাকার ফল। শবীরের ওজন বেড়ে গেছে। সমুদ্রেব বাতাসে অক্সিজেনেব বড়দা 'ওজোন' থাকে। অতি স্বাস্থ্যপ্রদ একটি উপাদান। ক্ষযবোগীর ফুসফুস ভাল হয। হাঁপানি বোগীব শ্বাসকষ্ট দূর হয়। সেই 'ওজোন'-এ ওজন বেড়ে গেছে। আমরা যেখানে বসে আছি তাব দু'পাশে সুইমিং পুলের জল

টলটল করছে। এরা এত সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে সব আয়োজন। ক্লান্তিহীন নিরবচ্ছিন্ন এক সাধনা। অস্ত্রধারী লোভী মানুষ ইতিহাসের আদিতে অন্যের সভ্যতাকে যদি গ্রাস না করত, তাহলে সারা পৃথিবীতে সংস্কৃতির এমন জগাখিচুড়ি তৈরি হত না। এত সমস্যা তৈরি হত না পৃথিবী জুড়ে। ভাগ্যের ব্যাপারে ভারত আর মায়া মেকসিকোর মধ্যে প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যে কারণে প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে আমি বুঝি ভারতেই আছি। আমার বেদনার সঙ্গে এদের বেদনার একই ঝঙ্কার।

৫৬

স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস কর্টেসকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পর পরবর্তী আড়াইশো বছর ধরে তিন লক্ষেরও বেশি স্প্যানিয়ার্ড সাগর পাড়ি দিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে মেকসিকোয় চলে এল। যে দেশকে কাব্য করে বলা হয়, 'সোয়েট অফ দি সান, টিয়ারস অফ দি মুন।' যে দেশের ধূলিকণায় উড়ছে সোনা আর রুপোর গুঁড়ো। পঞ্চম চার্লসের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে কনকুইস্তাদর কর্টেস হাতের মুঠো খুলে ফুঁ মেরেছিলেন, রাজসভায় অভ্ররেণুর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল হলুদ স্বর্ণ রেণু। সভাসদদের চোখ কপালে উঠেছিল এল দোরাদো। স্প্যানিয়ার্ডদের আর আটকে রাখা যায়! তখনও মেকসিকোর জঠরে টলটলে তেলের সন্ধান মেলেনি। একালে যাকে বলা হয় লিকুইড গোল্ড।

প্রথম এলেন স্পেনের রাজার নিয়োজিত রাজকর্মচারীরা। ভাইসরয়, বিচারক, সেনাধ্যক্ষ, বিশপের দল। জীবনের বেশীর ভাগ সময় মেকসিকোয় কাটাবার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এলেও, কেউই নিজেদের মেকসিক্যান ভাবতেন না। ভাবতেন স্পেনের মানুষ। পেনিনসুলার। পর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি দেশ নিয়ে যে অঞ্চলটাকে ইউরোপের আইবেরিয়ান পেনিনসুলা বলা হয়, সেই অঞ্চলের অধিবাসী। মেকসিকোর মাটির সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলেও, তাঁরাই হয়ে উঠলেন ধনী শাসককুল। তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে পেলেন তালুক। সেই তালুকের আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা হলেন তাঁদের দাস। এতো স্বাভাবিক প্রাপ্তি। রাজার দান। এ ছাড়াও তাঁরা ইচ্ছে করলে নামমাত্র মূল্যে রাজার কাছ থেকে তালুক কিনতে পারতেন। ইতিহাসে আছে এক স্প্যানিশ মারকুইস মাত্র আড়াইশো পেসোতে নব্বই হাজার হেকটর জমি কিনেছিলেন। অর্থাৎ একটা ঘোড়ার অর্ধেক দামে।

এদের পেছন পেছন যাঁরা এলেন তাঁরা সাধারণ ভাগ্যান্বেষীর দল। নিজের দেশে যাঁরা ছিলেন সর্ব অর্থে বঞ্চিত। না ছিল সম্মান, না ছিল অর্থ, বিত্ত, প্রতিপত্তি। এঁরাও মেকসিকোর নিউ কলোনিতে জমি কেনার অধিকারী ছিলেন। অনেকে কিনেওছিলেন নামমাত্র মূল্যে। কিনে গড়ে তুলেছিলেন হাসিয়েন্ডা। মানে প্ল্যান্টেসান। চাষবাস। তুলো, ভুট্টা, আখ, গম, সিসলেব চাষ। উত্তরে যাঁরা উঁচু জায়গা কিনলেন, তাঁরা মাটি খুঁড়ে বের করতে লাগলেন তাল তাল রুপো।

এই দুই শ্রেণীর মানুষ দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে জন্ম দিলেন আরও নতুন দুটি শ্রেণীর। যে সব স্প্যানিয়ার্ড সস্ত্রীক এসেছিলেন তাঁদের সন্তানসন্ততি জন্মাল। মেকসিকো হল তাঁদের জন্মভূমি। এই শ্রেণীর নাম হল 'ক্রিয়োলোস'। এঁদের শরীরে একশো ভাগ স্প্যানিশ রক্ত। এঁরাও নিজেদের মেকসিক্যান ভাবতেন না। ভাবতেন পেনিনসুলার। জীবিকা হিসেবে এঁরা বেছে নিলেন ব্যবসা। কেউ গেলেন ছোটখাটো সরকারী পদে। বেশির ভাগ হলেন ধর্মযাজক, পুরোহিত, সাধু কিংবা শিক্ষক। সরকারের উচ্চপদ না পেলেও, করের হাত থেকে রেহাই পেতেন, আর পেতেন বিচারের হাত থেকে। এঁদের কোন বিচার হত না। এ ছাড়া আর কোনও বিশেষ ক্ষমতা স্প্যানিশ ক্রাউন তাঁদের দেননি। বড় পদে যাঁরা আসতেন তাঁরা সরাসরি দেশ থেকেই নিয়োগপত্র নিয়ে আসতেন।

এর পর যা হয়! স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর রমণীর প্রভাব। বহু স্প্যানিয়ার্ড পড়ে গেলেন ইন্ডিয়ান রমণীর প্রেমে। তাঁদের মিলন-জাত বংশধররা হল আর এক সঙ্কর শ্রেণী। তাঁদের বলা হল মেস্তিজোস। তুলোর ক্ষেতে কাজ করার জন্যে স্প্যানিয়ার্ডরা ১৬০০ শতকের প্রথম ভাগে দেড়লক্ষ দাস নিয়ে এসেছিলেন আফ্রিকা থেকে। সেই দাস রমণীদের

সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল স্প্যানিয়ার্ডদের দৈহিক সম্পর্ক। দেহ এমন জিনিস, প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক মানে না। ঘৃত আর অগ্নির সহাবস্থান। এঁদের সন্তানসন্ততিরাও মেস্তিজোস শ্রেণীভুক্ত হল। শ্রম ও নিষ্ঠার বলে মেস্তিজোসরা ধনী হলেও, স্পেনের রাজসিংহাসন তাঁদের উচ্চপদ দিলেন না। সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তাঁরা খাটো হয়েই রইলেন।

মেস্তিজোসদেরও তলাতে রইল ইন্ডিয়ানরা। রাজারা চলে গেল দাসেরও তলায়। ইতিহাসের আচ্ছা তামাশা। কিছু বলার নেই। জোর যার মুল্লুক তার। এদের প্রতিপালক হলেন চার্চ আর স্টেট। এদের অবস্থা হল ক্রীতদাসের চেয়েও হীন। এরা বাঁচার তাগিদে স্পানিশ ভাষা শিখল। নিজেদের ধর্ম ছেড়ে প্রভুদের গির্জায় সমবেত হতে লাগল উপাসনার জন্যে। চার্চ আর রাজ্য গরু ছাগলের মতো, এদের জুতে দিল হাসিয়েন্ডায় (চাষে), জুতে দিল খনিতে, বয়নশিল্পে। যাদের চাষের কাজে লাগানো হত তারা যেন পশু। স্প্যানিয়ার্ডদের সামান্যতম মায়ামমতা ছিল না এদের প্রতি। সামান্যতম শ্রদ্ধা। অথচ এঁরাই তৈরি করেছিলেন পিরামিড। উদ্ভাবন করেছিলেন ক্যালেন্ডার। শূন্যের ব্যবহার শিখেছিলেন গণিতে। এমন জনপদ গড়েছিলেন যা একালের টাউন প্ল্যানিংকে হার মানায়। রাজপথ, জনপথ মায়া শহরেই তৈরি হয়েছিল, যদিও তখন মোটরগাড়ি ছিল না। ছিল না রথ। শুধুমাত্র ধর্মীয় মিছিলের জন্যে আর সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজের জন্যে চওড়া, দীর্ঘ, সরলপথ তৈরি করেছিলেন মায়ারা। অসাধারণ ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখেও স্প্যানিয়ার্ডদের মনে হয়নি, এমন একটা জাতিকে ঘৃণা নয় শ্রদ্ধাই করা উচিত। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দাস ইন্ডিয়ানদের খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হত মাঠে। তারপর সারাদিন প্রচন্ড উত্তাপে নিরবচ্ছিন্ন গাধার মতো খাটানো হত তাদের। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মাঠ থেকে পশুরাও ফিরত, ফিরত দাস মানবেরা। যে সব দাসকে পাঠানো হত খনিতে, তাদের অবস্থা ছিল আরও কাহিল। হয় তো একটানা দু'সপ্তাহ হেঁটে তারা পৌঁছলো খনিতে। সেখানে গিয়ে নিজেদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিতে হবে। তুমি মরো বাঁচো, আমাদের দেখার দরকার নেই। তোমরা আমাদের ভূগর্ভ থেকে তুলে এনে দাও তাল তাল রুপো আর সোনা। আর বয়নশিল্পে নিযুক্ত দাসদের কারখানায় ঢুকিয়ে দরজায় তালা এঁটে দেওয়া হত। একটানা চব্বিশ ঘন্টা কাজের পর সাময়িক মুক্তি। ছুটি না বলাই ভাল কারণ মধ্যযুগের পৃথিবীতে মালিক শ্রমিক সম্পর্ক বলে কিছু ছিল না, ছিল দাস আর প্রভু। সে-যুগের ইতিহাস লিখতে গিয়ে লিউস মামফোর্ড সুন্দর একটি বিশ্লেষণী চিত্র তুলে ধরেছেন 'রাজাদের চরিত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তন লক্ষ্য করার মতো। প্রথমে তাঁরা সম্পর্কিত ছিলেন ফার্টিলিটি রাইটসের সঙ্গে। রাজাই পৃথিবীতে উর্বরতা আর অনুর্বরতার কারণ। রাজার কৃপায় ফসল, রাজার অশুভ-শক্তিতেই দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি। জনতার হাতের পুতুল রাজা হঠাৎ ঘোর পরাক্রমশালী হয়ে শক্তির দম্ভে ফেটে পড়লেন। সভ্যতার শুরুই হল এই চিত্র দিয়ে, রাজারা জীবনবোধ হারিয়ে ফেলে প্রাচীন পৃথিবীতে জেগে উঠলেন মূঢ়শক্তির প্রতীক হয়ে। মানুষের জীবনের প্রয়োজন, অপ্রয়োজনের দিকে তাঁদের আর নজর রইল না। শুধু যুদ্ধের সময়ে নয়, শান্তির সময়েও তাঁদের জীবনদর্শন হয়ে দাঁড়াল, বলং বলং বাহুবলং। নিজস্ব বাহুবল ও পারিষদবর্গের বাহুবল দিয়ে তাঁরা জনজীবনকে রাজদাসে পরিণত করলেন। সৈন্যসামন্ত পরিবৃত রাজার কথাই হয়ে দাঁড়াল রাজনীতি, হয়ে দাঁড়াল আইন। তাঁর হাতেই এল আজ্ঞা করার ক্ষমতা, সম্পত্তি অধিকারের ক্ষমতা, ধ্বংসের ক্ষমতা, মানুষকে মেরে ফেলার ক্ষমতা। এরই নাম হল সভরেন পাওয়ারস, রাজশক্তি। যুগযুগ ধরে প্রাকার ঘেরা রাজধানী থেকে রাজধানীতে ছড়িয়ে গেল বলাধিকারী রাজাদের এই অসুস্থ মানসিকতা। অস্ত্রশস্ত্র শোভিত সাংঘাতিক এক মানুষের চিত্র ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল।'

স্প্যানিশ অধিকারের দুই পুরুষেই মেকসিকোয় চার শ্রেণীর মানুষের রূপরেখা সুস্পষ্ট হয়ে রইল। প্রতিটি শ্রেণীর নিজস্ব স্বতন্ত্র চেহারা, লক্ষ্য, জীবনবোধ। স্বস্বার্থান্বেষী। পারস্পরিক ক্ষোভ বাড়তে বাড়তে এক সময় শ্রেণী সংগ্রামের পরিস্থিতি তৈরি হল। সরাসরি স্পেন থেকে আগত পেনিনসুলাররা ক্রিয়োলোসদের ঘৃণার চোখে দেখত কারণ তারা মেকসিকোতে জন্মেছে। ক্রিয়োলোসরা খাঁটি স্প্যানিশ হলেও পেনিনসুলারদের দম্ভ, ঠাটঠমক, নাক উঁচু ভাব একেবারে সহ্য করতে পারত না। তাদের নাম রেখেছিল, গাচুপাইনস। শব্দটা স্প্যানিশ। অর্থাৎ জিনের গ্রহস্থান। মেকসিকোর আদিবাসী

ইন্ডিয়ানরা ঘোড়ার পিঠে কিছু না চাপিয়েই চড়ে বসত। সেইটাই ছিল দরিদ্র, সাধারণ মানুষের সনাতন রীতি। আর রাজপ্রতিনিধি, ক্ষমতাশালী পেনিনসুলাররা ঘোড়ার পিঠে ঝকঝকে জিন চাপিয়ে হাতে চাবুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত দর্পহারীর মতো। দাস অধ্যুষিত দেশে তাদের এই বিশ্রী অহঙ্কার স্বজাতিরাই সহ্য করতে পারত না। বলত, গাচুপাইনস-এর দল।

মেস্তিজোস বা বর্ণসঙ্করররা একদিন আবিষ্কার করলে নতুন স্পেন অর্থাৎ মেকসিকোর সমাজ-ব্যবস্থায় কোথাও তাদের স্থান নেই। আর নতুন এই সমাজ একেবারে শেষ ধাপে পড়ে রইল বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী ইন্ডিয়ানরা। তারা অবাক্ হয়ে দেখলে কি ভাবে চলে গেল তাদের জমিজায়গা, তাদের ঐতিহ্য।

এই সুস্পষ্ট বিভেদ ও বঞ্চনা সত্ত্বেও চারটি শ্রেণী মোটামুটি শান্তিতেই পাশাপাশি অবস্থান করতে লাগল। আর দিন দিন বাড়তে লাগল নতুন কলোনির সমৃদ্ধি। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি দেখা গেল, পৃথিবীর মোট রুপোর অর্ধেক উৎপাদিত হচ্ছে মেকসিকোয়। স্পেনের রাজস্বের দুই তৃতীয়াংশ আসছে এই রুপো থেকে। তখন মেকসিকোর জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ষাট লক্ষ। জনসংখ্যার আটান্ন শতাংশ ইন্ডিয়ান, পঁচিশ শতাংশ মেস্তিজোস, সতেরো শতাংশ ক্রিয়োলোস, আর এক শতাংশের একের চার ভাগ হল পেনিনসুলার। মাত্র পনের হাজার পেনিনসুলার আর ক্রিয়োলোসদের হাতেই সমস্ত জমি ও সম্পদ। তৎকালীন এক বিশপ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন—'মেকসিকোয় চারটি শ্রেণী নেই, আসলে আছে দুটি শ্রেণী, এক যাদের কিছুই নেই, দুই যাদের সব আছে।'

এক জার্মান প্রকৃতিতত্ত্ববিদ, ফ্রেডরিক হাইনরিখ আলেকজান্ডার ব্যারন ভন হামবোল্ট পাঁচ বছর ধরে নিউওয়ার্লড ভ্রমণ করতে করতে মেকসিকোয় এসেছিলেন। তিনি দেখলেন, মেকসিকোয় মানুষের দুটি শ্রেণী, শ্বেতকায় আর অশ্বেতকায়। একজন শ্বেতকায় নগ্ন পদে, ঘোড়ার পিঠে চেপে গেলেও নিজেকে দেশের মহামান্য শ্রেণীর মানুষ বলেই ভাবে। অর্থ, প্রতিপত্তির চেয়েও বড় চামড়ার রঙ।

একদিন কিন্তু এই কড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দিল। ক্রিয়োলোসরা ক্রমশই মাতৃভূমি স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, জন্মাচ্ছিল বিদ্বেষও। তারা গাচুপাইনদের দম্ভ সহ্য করতে পারছিল না, এর ওপর হঠাৎ তাদের বিষয় সম্পত্তির ওপব চাপিয়ে দেওয়া হল নতুন করের বোঝা। দম্ভ যদিও বা সহ্য করা যাচ্ছিল, অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল তাদের কর চাপিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত। ক্রিয়োলোসদের আকাঙ্ক্ষা জাগল স্ব শাসিত হবার। তার মানে বর্ণসঙ্কর মেস্তিজোস বা বিশুদ্ধ ইন্ডিয়ানরা শান্ত থাকলেও অসন্তোষ দেখা দিল বঞ্চিত স্পেনীয়দের মধ্যে।

ঠিক এই সময়টিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত উত্তাল হয়ে উঠল নানা ঘটনায়। ফ্রান্সে ঘটে গেল সফল বিপ্লব। উত্তর আমেরিকার ব্রিটেন হারালো তাদের কলোনি। স্পেনের অবস্থাও টলটলায়মান। ১৮০৮ সালে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট স্পেন আক্রমণ করে, স্পেনের রাজাকে বন্দী করেই নিয়ে গেছেন। স্পেনের এই দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে মেকসিকোয় ক্রিয়োলোসরা একটি গোপন কর্মসূচি তৈরি করে ফেললেন। মেকসিকোর স্প্যানিশ শাসন খতম করে তাঁরা স্বাধীন হবেন।

একশোটিরও বেশি এই ধরনের অভ্যুত্থান ও ষড়যন্ত্র হলেও, উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে কোনওটিই তেমন সফল হল না।

বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যতদিন না মঞ্চে মিগুয়েল হিডালগো ওয়াই কোসতিললা আবির্ভূত হলেন, ততদিন প্রকৃত স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হল না। কলোনির মধ্য-পশ্চিম প্রান্তে ডেলোরেসের এক গীর্জার ধর্মযাজক ছিলেন এই মধ্যবয়সী মানুষটি। হিডালগো নিজে ছিলেন ক্রিয়োলো, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের তিনি ভীষণ ভালবাসতেন। ভীষণ সহানুভূতি ছিল তাঁদের প্রতি, নিজভূমে যাঁরা হয়ে আছেন পরবাসী। ইন্ডিয়ানদের তিনি শেখাতেন কি ভাবে আঙুরের চাষ করতে হয়। কি ভাবে চাষ করতে হয় রেশম। কি ভাবে চামড়া পাকা করতে হয়। পাশাপাশি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দিতেন নীতি উপদেশ। শেখাতেন ভাষা, ধর্ম। কি সুন্দর ছিলেন মানুষটি। অবসর সময় বসাতেন 'সাহিত্যসভা'। তাঁর একটি 'লিটারারি ক্লাব' ছিল। এই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার, নিম্নপদস্থ

কয়েকজন সরকারী কর্মচারী, একজন মুদি ও পোস্ট অফিসের একজন কেরানি। এঁরা সকলেই ছিলেন বিক্ষুব্ধ ক্রিয়োলো। সাহিত্যবাসরে যা পঠিত হত, তার অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক প্রবন্ধ। রম্যরচনার স্থান ছিল না। ১৮১০ সালের গ্রীষ্মে তাঁরা এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের গোপন পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক হয়েছিল ডিসেম্বরে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 'লোটাস অ্যান্ড ড্যাগার'-এর কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে এ দশের স্বদেশী গুপ্তসমিতির কথা। হিডালগোর দুর্ভাগ্য, দলীয় বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ডিসেম্বরের আগেই সেপ্টেম্বরের শুরুতে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। হিডালগোর দলের বেশ কিছু সদস্য ধরা পড়ে গেলেন।

সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮১০ সাল। গভীর রাত। হিডালগো বসে আছেন তাঁর গোপন আস্তানায়। চার্চের তৈরি মোমবাতির শিখা মিটিমিটি জ্বলছে, তাঁর স্বপ্নের মতো। মেকসিকো স্বাধীন হবে। ক্রিয়োলো আর বঞ্চিত ইন্ডিয়ানরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও সম্মান ফিরে পাবে। দাম্ভিক, উদ্ধত, স্প্যানিশ রাজন্যবর্গের দিন শেষ হবে। হঠাৎ তাঁর অনুচরেরা ছুটে এলেন। দুঃসংবাদ, রাজবাহিনী ছুটে আসছে এই গ্রামের দিকে তাঁর গ্রেফতারের পরোয়ানা নিয়ে। আপনি পালান। আত্মগোপন করুন। সেদিন ছিল শনিবার। হিডালগো তাঁর অনুচরদের কথা শুনলেন না। তাঁর আসনেই বসে রইলেন, নীরবে, নিভৃতে। ওদিকে মেকসিকোর রাতের প্রান্তর ধরে ছুটে আসছে অশ্বারোহী বাহিনী। ভোর হল। রবিবারের ভোর। ধর্মযাজক হিডালগো তাঁর গীর্জায় গিয়ে ঘন্টা বাজাতে শুরু করলেন। জনপদ জেগে উঠল। সাপ্তাহিক প্রার্থনার আহ্বান। যথারীতি সবাই ছুটে এলেন প্রার্থনা সমাবেশে। গীর্জার ঘর ভরে গেল। মঞ্চে দণ্ডায়মান তাঁদের প্রিয় 'ফাদার' তাঁদের প্রিয় শিক্ষক ও পরামর্শদাতা। তাঁরা কেউই জানেন না, সৈন্যবাহিনী তখন কোথায় কতটা দূরে। তাঁরা সমবেত হয়েছেন প্রার্থনায়।

ফাদার হিডালগো শুরু করলেন, 'মাই সান, আমার পুত্রগণ, আজ আমাদের কাছে এসেছে প্রভুর নতুন আদেশ। তিন শো বছর আগে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ঘৃণিত স্প্যানিয়ার্ডরা যে জায়গা জমি ছিনিয়ে নিয়েছিল তা উদ্ধার করে নেবার আদেশ এসেছে। আজই। এখনই, এখনই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে প্রভুর সেই আদেশ পালনে।' হিডালগো হুঙ্কার ছাড়লেন, 'দুঃশাসকদের মৃত্যু হোক। মৃত্যু হোক গাচুপাইনসদের।'

প্রার্থনায় সমবেত ইন্ডিয়ানরা ফাদারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'সরকার নিপাত যাক! নিপাত যাক গাচুপাইনসরা।' সেই চিৎকার শোনাল সমুদ্র গর্জনের মতো। প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসায় জ্বলে তিনশো বছরের অত্যাচারে তপ্ত মনের বারুদ। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতের কাছে যে যা হাতিয়ার পেল তাই নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল অভিযানের জন্যে। কারোর হাতে লাঠি। কারোর হাতে আখ কাটা বড় ছুরি, কারোর হাতে বেলচা। সরকারী সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করার জন্যে হিডালগোর ফৌজ প্রস্তুত।

হিডালগো ছিলেন কল্যাণকামী, একজন আদর্শবাদী। সামরিক শিক্ষা তাঁর ছিল না। ছিল না বাহিনী পরিচালনার দক্ষতা। নেতা হিসেবে বাহিনীর পুরোভাগে থাকলেও, নিয়ন্ত্রণ হারাতে বেশি সময় লাগল না। ক্ষেত, খামার আর খনি থেকে আরও শ্রমিক এসে যোগ দিল সেই বিদ্রোহী বাহিনীতে। হিডালগোর দল যত এগোয় ততই তার সংখ্যা বাড়ে। প্রতিহিংসাপরায়ণ বিশাল এক জনবাহিনী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নির্বিচারে হত্যা আর ধ্বংসের কাজে। শহরের পর শহর জ্বলে গেল। সরকারী সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাতে লাগল নিরীহ নাগরিক। একমাত্র গুয়ানাজুয়াতো শহরেই নিহত হল আড়াই হাজার নাগরিক।

শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বরের মধ্য ভাগে, অক্টোবরের শেষ দিকে দেখা গেল হিডালগোর বিশৃঙ্খলা বাহিনীতে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আশি হাজার। আশি হাজারের সেই দলটি প্রচণ্ড আক্রোশে ছুটে চলেছে মেকসিকো সিটির দিকে, তাদের শেষ আঘাত হানতে।

রাজধানী মেকসিকোর অদূরে হিডালগো তাঁর হিংস্র বাহিনী সহ থমকে দাঁড়ালেন। দীর্ঘপথের দু'পাশে ফেলে এসেছেন ধ্বংস আর নির্বিচারে হত্যার স্মৃতি। তিনি জানেন না, সামনে নগর অভ্যন্তরে কোন ইতিহাস তৈরি হবে। সহসা ঝাঁপিয়ে না পড়ে তিনি পথ পরিবর্তন করে সরে গেলেন উত্তর-পশ্চিমে। সেইখানে বসে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এরপর তাঁর কি করা উচিত।

ভাবতে যে কদিন তাঁর সময় লাগল তার মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল বিদ্রোহী বাহিনী। আর সেই অবসরে রাজসৈন্যেরা এসে হিডালগোকে বন্দী করে ফেলল। বিচারের যৎকিঞ্চিৎ প্রহসনের পর হিডালগোকে হত্যা করা হল। রাজসরকার দেশের মানুষের সামনে একটা জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরতে চান বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীর শেষ পরিণতি। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল হিডালগোর মুন্ড। মুন্ডটাকে বাঁশের ডগায় গেঁথে আনা হল গুয়ানাজুয়াতোতে, যেখানে হিডালগোর প্রথম বড় ধরনের একটা জয় হয়েছিল। সেইখানে ঝলসানো একটা দেয়ালের গায়ে অভ্যুত্থানের নায়ক হিডালগোর মুন্ডটা উঁচু করে রাখা হল প্রদর্শনী হিসেবে।

হিডালগোর পর বিপ্লবের বিদ্রোহের মশাল হাতে তুলে নিলেন তাঁরই দলের অন্য সহযোগী যোস মারিয়া মোরেলোস। হিডালগোর মতো মোরেলোসও ছিলেন ধর্মযাজক। গ্রামে ধর্মপ্রচার করতেন; কিন্তু তিনি হিডালগোর চেয়ে ছিলেন অনেক বেশি বাস্তববাদী। করিতকর্মা, কুশলী। কি রাজনীতিতে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে। প্রথমে তিনি ক্ষুদ্র একটি বাহিনী তৈরি করলেন নির্বাচিত কিছু সক্ষম বিদ্রোহীদের নিয়ে। প্রথমে তাদের শেখালেন গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল। সারা দেশে ছড়িয়ে দিলেন তাদের। ১৮১৩ সালে তাঁর গেরিলা বাহিনী খুব সুন্দর কায়দায় মেকসিকো সিটিকে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। দু'দিকের উপকূলভাগের সঙ্গে মেকসিকো নগরীর কোনও সংযোগ রইল না।

মোরেলোস ইতিমধ্যে সাংঘাতিক এক পরিকল্পনা ছকে ফেললেন। বর্ণবৈষম্যহীন এক রিপাবলিকের স্বপ্ন। মোরেলাসের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। হিডালগোর মতো তিনিও ছিলেন শতকরা একশো ভাগ খাঁটি স্প্যানিশ। অথচ কি অদ্ভুত, উদার নিঃস্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি ঠিক করলেন, স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত করে সমস্ত জমিজমা ফিরিয়ে দেবেন ইন্ডিয়ানদের। তারাই তো ছিল এদেশের মালিক। ইংরাজ অধিকারের সময় ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বেশ কিছু ইংরাজ হয়তো ছিলেন; কিন্তু কোনও ইংরাজ এইভাবে মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করেননি। গোপালবাহিনী নিয়ে রাজধানী দিল্লিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেননি। স্প্যানিশ রক্তে একটা অন্য ব্যাপার আছে। চিলপানসিঙ্গোতে মোরেলোঁস এক সভা আহ্বান করলেন। একালের পার্টি কংগ্রেসের মতো। পশ্চিমে পাহাড়ের ছায়ায় শান্ত এক ইন্ডিয়ান গ্রাম। সভায় স্থির হবে স্বাধীনতা ঘোষণার দিন, ঘোষিত হবে স্বাধীন মেকসিকোর সংবিধান।

ক্রিয়োলোরা এতদিন এত অশান্তি এত রক্তপাতেও বেশ উদাসীন ছিল; কিন্তু যেই শুনল মোরেলোস তাদের জায়গাজমি ধরে টান মারতে চাইছেন, তখন সকলেই মোরেলোসের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াল। সমস্ত সমর্থন নিল প্রত্যাহার করে। বিক্ষুব্ধ ক্রিয়োলোরা স্পেনের রাজশাসন থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন হতে চেয়েছিল, কোনও রকম যুগান্তকারী সংস্কারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। মোরেলোসের মতো অতটা উদারতা তাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুপাক হয়ে দাঁড়াল। স্বাধীনতা মানে ভূসম্পত্তি, ধনৈশ্বর্য খুইয়ে পথের ভিখিরি হয়ে যাওয়া নয়।

ক্রিয়োলোদের সমর্থন হারিয়ে মোরেলোস কিন্তু দমে গেলেন না। তিনি মেস্তিজোদের আহ্বান জানালেন। সম্রাট মোকতেজুমার পুণ্য নাম স্মরণ করিয়ে দিলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর আমলের গৌরব ও গর্বের কথা। তিনশো বছরের স্প্যানিশ দাসত্বে একটা সভ্যতা গৌরবের কোন শিখর থেকে কোথায় নেমে এসেছে। নেতা মোরেলোস মেস্তিজোদের বললেন, তোমরা এগিয়ে এস। অত্যাচারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনশো বছরের অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও।

চিলপানসিঙ্গো কংগ্রেসে সমবেত ডেলিগেটরা মোরেলোসের নেতৃত্বে যখন স্বাধীন মেকসিকোর সংবিধানের রূপরেখা তৈরিতে ব্যস্ত, তখন রাজবাহিনী অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এল মেকসিকো সিটি থেকে। প্রচন্ড বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল, আন্দোলনকারীদের ওপর। বিদ্রোহীদের দখল থেকে ছিনিয়ে নিতে লাগল একের পর এক গ্রাম। বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি পর্বতনগর চিলপানসিঙ্গোরও পতন হল। স্বাধীন মেকসিকোর সংবিধানের আঁতুড়েই মৃত্যু হল। হিডালগোর মতো মোরেলোস ধরা পড়লেন না। তিনি ঠিক সময়ে পালিয়ে গেলেন গ্রামাঞ্চলে। তাঁর পক্ষে বেশিদিন অবশ্য আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হল না। ঠিক দেড় বছর পরে, ১৮৫১ সালের শরতে ধরা পড়ে গেলেন। মেকসিকো সিটিতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গুলি করে মারা হল।

স্বাধীনতা পিছিয়ে গেল আরও ছ'বছর। নেতা মোরেলোসের মৃত্যুর পর তাঁর হাতে তৈরি গেরিলা বাহিনী কিন্তু চুপ করে বসে রইল না। তারা সুযোগ পেলেই রাজশক্তির ওপর হানতে লাগল সাংঘাতিক আঘাত। চালিয়ে যেতে লাগল রক্তাক্ত সংগ্রাম। নেতৃত্বহীন হলেও হৃতবল নয়। রাজবাহিনী মার খেতে-খেতে প্রায় কোণঠাসা।

এদিকে স্পেনে অনবরতই তৈরি হচ্ছে নতুন ইতিহাস। ১৮০৮ সালের মার্চ মাসে নেপোলিয়ান এক লক্ষ ফরাসী সৈন্য নিয়ে স্পেনে ঢুকে পড়েছিলেন বেশ কৌশল করে। প্রথমে তাঁর অছিলা ছিল, স্পেনের তটভাগ পাহারা দেওয়া যাতে ইংরেজরা না ঢুকে পড়ে। তারপর রক্ষক হল ভক্ষক। রাজা চতুর্থ চার্লস সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। পুত্র ফার্ডিনান্ড আরোহণ করলেন সিংহাসনে। এরপর নেপোলিয়ান চতুর্থ চার্লস, ফার্ডিনান্ড ও তাঁদের পরম প্রিয় গোডয়কে ফ্রান্সে ডেকে নিয়ে গিয়ে আর ফিরতে দিলেন না। সেখানেই বিশাল এক প্রাসাদে রেখে দিলেন। বেশ বড় অঙ্কের রাজন্যভাতার ব্যবস্থা হল। স্পেনের সিংহাসনে বসলেন নেপোলিয়ান ভ্রাতা যোসেফ। স্পেন যোসেফকে মেনে নিতে পারল না। শুরু হল অভ্যুত্থান। নেপোলিয়ান সরে গেলেন। স্পেনের সিংহাসনে সপ্তম ফার্ডিনান্ড। স্পেনের ওপর মহলের প্রচণ্ড চাপ। সংবিধান চাই। সংস্কার চাই। সময় এগোচ্ছে। পৃথিবী বেরিয়ে আসতে চাইছে রাজাদের খেয়াল খুশি থেকে। জাগছে গণতান্ত্রিক চেতনা।

স্পেনের আন্দোলন আর মেকসিকোর আন্দোলন বেশ মিলে গেল সময়ের সরলরেখায়। মেকসিকোর ক্রিয়োলোদের মানসিকতার পরিবর্তন হল। তারাও চাইল সংবিধান আর স্বাধীনতা। সপ্তম ফার্ডিনান্ড তখন বেশ বেকায়দায়। মেকসিকোয় সুযোগ এল অন্যভাবে। কলোনেল অগাস্টিন দ্য ইতুরবাইদের ওপর ভার পড়ল ওয়াকসাকার একটি বড় রকমের অভ্যুত্থানকে দমন করার। ইতুরবাইদ একজন অভিজ্ঞ কলোনেল। এক যুগ ধরে মেকসিকোর গেরিলাদের সঙ্গে লড়ছেন।

মেকসিকোর ভাইসরয়ের নির্দেশে আড়াই হাজার সৈন্য নিয়ে অভিজ্ঞ কলোনেল ইতুরবাইদ এলেন ওয়াকসাকায়। মুক্তি আন্দোলনের গেরিলারা বুঝতেই পারল না যে, দমন নয় এসেছে স্বাধীনতা। ইতুরবাইদ ছিলেন ক্রিয়োলো। পেনিনসুলারদের উন্নাসিকতায় বীতশ্রদ্ধ। মনে মনে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা আঁটছিলেন। তিনি দেখলেন এই হল সুবর্ণ সুযোগ। ওয়াকসাকায় এসে গেরিলা নেতা ভাইসেন্তে গুয়েররেরোর সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন। বললেন, 'আমি আমার বাহিনীকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি একটি শর্তে, স্বাধীন মেকসিকোর সংবিধান রচিত হবে আমার নির্দেশে। গণতন্ত্র নয় হবে সংবিধানসম্মত রাজতন্ত্র। সারা দেশের সরকার-সম্মত ধর্ম হবে রোমান ক্যাথলিক। ক্রিয়োলো এবং পেনিনসুলার উভয় শ্রেণীই নতুন রাষ্ট্রে সমান অধিকার ভোগ করবে আর গঠিত হবে নতুন সেনাবাহিনী, 'এজের সিতো দ্য লাস ত্রেস গারানতিয়াস, দি আর্মি অফ দি থ্রি গ্যারান্টিস!' সেই বাহিনী থাকবে আমার পরিচালনাধীন।

চুক্তি সম্পাদনের পর ইতুরবাইদ সদলে এগোলেন মেকসিকো সিটির দিকে। বিনা বাধায় প্রবেশ করলেন রাজধানীতে। ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২১ ঘোষিত হল স্বাধীনতা। স্বাধীন মেকসিকোর প্রধান হলেন অগাস্টিন দ্য ইতুরবাইদ, মানুষটি ছিলেন যেমন ধূর্ত, তেমনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। অ্যাজটেকদের অভিধান থেকে শব্দ ধার করে নতুন রাষ্ট্রের নাম রাখা হল দি সভরেন স্টেট অফ মেকসিকো।

অ্যান জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার ইতিহাস কি শেষ হল?'

বললুম, 'না, এই তো সবে শুরু মামণি।'

৫৭

অ্যান আড়মোড়া ভেঙে বললে, 'চলো, এইবার একটু আহারের সন্ধানে বেরনো যাক। বেলা তো বেশ হল।'

'কোথায় যাবে?'

'ওই সেই আমাদের আগের জায়গায়।'

আমরা উঠে পড়লুম। যে হোটেলে আছি, সেখানেও খাওয়ার অঢেল ব্যবস্থা কিন্তু ভয়ে খাই না। পাঁচতারা হোটেলের অনেক পাঁয়তাড়া। এমন বিল করে দেবে, মাথায় জবাকুসুম।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন, 'ভাই মেকসিকোর জলবায়ু কেমন? কেমন ক্ষিদে হয়? দিনকতক থাকার পর চেহারায় কেমন চেকনাই আসে?'

আমি বলব, 'ভাই জলের কথা বলতে পারব না। কারণ যখনই খেয়েছি, বোতল খুলে মিনারেল ওয়াটার খেয়েছি। প্রথম দিন হোটেলে ঢুকেই কল থেকে জল নিয়ে খেতে গিয়েছিলুম, অ্যান এমন হাঁ হাঁ করে উঠল, যেন আমি বিষ পান করছি। খবরদাব সাধাবণ জল খাবে না। মেকসিকোর রোগজীবাণুর স্ট্রেন আলাদা। আলাদা চরিত্রের। এখান থেকে কিছু ধবিযে গেলে, দেশে ফিরে গিয়ে আর সারাতে পারবে না। শুনে ভয়ে জল ফেলে দিয়েছিলুম। পর্যটকদেব জলই এক সমস্যা। মিনারেল ওয়াটারের কোনও স্বাদ নেই। বিদেশীরা যেভাবে চা কায়, সে চা আমাদের জিভে অখাদ্য। কাঁহাতক আর অনবরত কফি খাওয়া যায়। শরীর কষে যাবে। সুতরাং জলের কথা আমি বলতে পারবো না। তবে স্নানের সময় বুঝেছি, খুবই সফ্ট ওয়াটার। সাবানে ভীষণ ফেনা হয়। যতই ধোওয়া যাক গা হড় হড় করে। জলে লোহা নেই। আর কি করেই বা থাকবে৷ প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে ঢেলে দিয়েছেন সোনা আর রুপো। মেকসিকোর জলে তিন চারদিন স্নান কবলেই রঙ ফর্সা হয়। চুল চটচট করে না। ইকসতাফা সমুদ্রেব ধারে, বাতাস একেবাবে ছাঁকনি ছাঁকা। তাজা শ্যাম্পেনের মতো। রোদ ঝলমলে দিন। যেন সোনা গলছে। চাঁদ গলা রাত, যেন রুপোর তবক উড়ছে। তবে শুনেছি মেকসিকো সিটির বায়ু তেমন পরিষ্কার নয়। মাঝে মাঝেই হলুদ বঙেব ধোঁয়াশায় চরাচর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন নাকি দু'হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। শোনা কথা বিশ্বাস করি না। গিয়ে দেখবো।

হোটেলের বাইরে প্রখর রোদ। সমুদ্রের হু হু বাতাসে গরম তেমন জমতে পারছে না। অ্যানের চুল দোল খাচ্ছে। স্কার্ট ফুলে ফুলে উঠছে। রাজহংসী চলেছেন আগে আগে। কাল এখান থেকে চলে যাবো, তাই আমি হাঁ করে সব দেখতে দেখতে চলেছি। আজ আমাব কাছে একটা ল্যাম্পপোস্টও মহা আকর্ষণীয়। ইকসতাফার ল্যাম্প-পোস্ট। আমি মাঝে মাঝে থেমে পড়ে রাস্তার ধার থেকে ছোট ছোট পাথর, পড়ে থাকা গাছের পাতা, ফুল তুলে পকেটে রাখছি। অ্যান আমাব ছেলেমানুষি দেখে ভেবেছিলুম হয়তো হাসবে। উল্টে সে-ই পরম উৎসাহে আমার সংগ্রহে সাহায্য করতে লাগল। আমি অবাক হয়ে গেলুম। আমার সেন্টিমেন্ট সে বুঝে ফেলেছে। একটা রুপোলি আঁশ জড়ানো ছোট্ট পাথর আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললে, 'আজ থেকে বহু বছব পরে তুমি যখন এই পাথরটা হাতে তুলে দেখবে নিমেষে চলে আসবে পৃথিবীব এই প্রান্তে, এই দিনে, এই সময়ে। কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না। এই রাস্তায় তখন হাঁটবে নতুন প্রজন্মের মানুষ। মাটি কিন্তু ধরে রাখবে তোমার পদচিহ্ন। তুমি এই পাথরটা দিয়ে ছোট্ট একটা পেপাবওযেট তৈবি করে নিও। পেতলেব ওপর এইটাকে বসিয়ে দিলেই হবে।'

আমার দুটো পকেট বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। আর প্রয়োজন নেই। যথেষ্ট হয়েছে। পাতাগুলোকে অ্যালবামে পেস্ট করে রাখবো। ফুলেরও সেই একই দশা হবে। আমাব স্মৃতির ভান্ডার ভরে উঠবে। আমরা মাঠ পেরিয়ে মার্কেট প্লেসে এসে পড়লুম। এমন পরিষ্কার কবে বেখেছে যে আমাদের মন্দিরও হার মেনে যাবে। আমরা আপন মনে হাঁটছি হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনলুম, 'মাই সান, মাই সান।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। পেছন থেকে এগিয়ে এলেন লম্বা গাউন পরা ফ্লোরেন্স। সেই সুইস ভদ্রমহিলা।

'মাই সান, তোমাকে আমি কাল থেকে খুঁজছি।'

'কেন মাদার?'

'তুমি কাল ডলার ভাঙিয়ে পেসো করেছিলে আমার দোকানে। তখন আমি ওই দিনের দর জানতুম না। তাই তোমাকে আমি কম পেসো দিয়েছিলুম। পবে ব্যাঙ্কে ফোন করে জেনেছিলুম কালকের দর অনেক বেশি ছিল। তুমি আরও পেসো পাবে। এসো, আমার দোকানে এসো।'

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভদ্রমহিলার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলুম। হাঁটছি আর ভাবছি এঁরা কী ভীষণ সৎ। সাধে কি একটা জাত বড় হয়। কাঁচের দরজা দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, দেখতে পেলেই ধরবো। পাওনা আদায়ের জন্যে নয়, দেবার জন্যে। মহিলাকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে করছিল। মনে মনে বললুম, 'মাদার তোমার কাছে আজ শিখলুম, অনেস্টি কাকে বলে।' নিজের দেশের সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবেই একটা তুলনা চলে আসছে। আমাদের ধর্মতলার একটা দোকান থেকে ছাতা কিনেছিলুম। দাম মিটিয়ে মাল নিয়ে বেরিয়ে আসার পর মনে মনে হিসেব করে দেখলুম, আমাকে পয়সা কম ফেরত দিয়েছে। ফিরে গেলুম। বিক্রেতা বললেন, 'তা কি করে হয়!' আমি বললুম, 'ভুল মানুষমাত্রেরই হয়। এই দেখুন পুরো ফেরতটাই আমার হাতে। আরো পাঁচটা টাকা আমি পাবো।' বিক্রেতা বললেন, 'এখন তো আমি দিতে পারবো না। রাত আটটার পর ক্যাশ চেক হবে, তখন যদি এদিকে বেশি হয় দিয়ে দেবো।' আর একবার মিনিবাসের কন্ডাক্টর টিকিট দিয়ে বলেছিলেন, ব্যালেন্সটা পরে দিচ্ছি। সারাটা পথে তার আর গবজ হল না। ভিড়ে আত্মগোপন করে রইলেন। শেষে নামার সময় ধরলুম। বললেন, 'খুচরো ফেবত দিইনি বুঝি! তা গ্যারেজে চলুন, ব্যাগ গুনে দেখি। বেশি হলে দিয়ে দেবো!'

দোকানের দরজা খুলে ধরে মহিলা আমাদের ভেতর যেতে বললেন। সেই সুন্দর পরিবেশ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাইপ মুখে চিঠি টাইপ করছেন তাঁব স্বামী। আমাদেব বললেন সুপ্রভাত। ফ্লোরেন্স তাঁব ছোট্ট ক্যাশে বসে ড্রয়ার খুলে গুনে গুনে আমাকে তিনশো পঁচাত্তব পেসো দিলেন। নেহাৎ কম নয়।

আমরা কিছু কিনবো বলে এটা-সেটা দেখছি। ফ্লোবেন্স বললেন, 'অপ্রয়োজনে কিছু কেনার দরকার নেই। ভুলে যেয়ো না তোমবা ট্যুরিস্ট, আরও পাঁচ জাযগায় যাবে, পাঁচটা জিনিস কিনবে। এক জায়গায় সব খরচ করে ফেলো না।'

একটা জাযগায় একগাদা পেন্সিল সাজানো রয়েছে। ভারি সুন্দর। প্রতিটি পেন্সিলের পেছনে একটি করে জন্তু আটকানো। ভাল্লুক, জাগুয়াব, কুকুব, খরগোস। এত সুন্দর যে না কিনে পারা যায় না। দেশে আমার এক ক্ষুদ্র বন্ধু আছে, বাজু, তাকে দিলে কত খুশি হবে। বিভিন্ন জন্তুঅলা কযেকটা পেন্সিল কিনলুম। অ্যান কিনলো তাব চুলের জন্য সুন্দব একটা হেয়ার ক্লিপ। ফ্লোরেন্স হেয়ার ক্লিপের দাম নিলেন না। আমাকে উপহাব দিলেন এক প্যাকেট পিকচার পোস্টকার্ড। জিজ্ঞেস কবলেন,'তোমাদের খাওয়া হয়েছে?'

যেই শুনলেন হয়নি, বললেন 'তোমরা আজ আমাব গেস্ট। আমাব বাড়ি খুবই কাছে। হাঁটলে দশ মিনিট। চলো আমার সঙ্গে।'

মানুষ ভালোবাসা নিয়ে অনেক আদিখ্যেতা করে। বড় বড় বই লিখে ফেলেন। বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক 'এরিক ফ্রমের' বই, 'আর্ট অফ লাভিং' থেকে শিখতে হয ভালবাসার করণকৌশল। আসলে ভালবাসা জিনিসটা 'রেসিপ্রোক্যাল'। পেতে হলে দিতে হবে। স্বার্থটাকে বেশ কবে নিয়ে সামান্য একটু শ্রদ্ধা মেশাতে হবে। একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশ কাল পাত্রের ব্যবধান ঘুচে যাবে। দেশ জয়ের চেয়েও মানুষের মন জয় অনেক বড় জয়। উদ্ধত অহঙ্কারীর স্থান নেই ভালবাসার জগতে। কোথায় মেকসিকো, সেই মেকসিকোর সাগরপ্রান্তের সাগরিকা ইকসতাফা। সেই ক্ষুদ্র সমুদ্রনিবাসের মাতৃসমা এক মহিলার মনের কূলে আমাদের এই অবতরণের কাছে দিগ্বিজয়ী কনক্যুইস্তাদর হার্নান্ডেজ কর্টেসের সাফল্য যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে।

ফ্লোরেন্স হাঁটতে হাঁটতে অ্যানকে বললেন, 'তোমার ক্লিপটা এসো না চুলে লাগিয়ে দি। বাতাসে বড় বিরক্ত করছে তোমাকে।'

বেশ লাগল দেখতে, চোখের সামনে দুই বিদেশী মহিলার একান্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। অ্যান দাঁড়িয়ে আছে, অ্যানের পেছন দিকে দীর্ঘদেহী ফ্লোরেন্স। অ্যানের দুর্দান্ত অবাধ্য চুলে মেকসিক্যান ক্লিপ আটকে দিচ্ছেন। একটি ছবি যা সচরাচর আমাদের ভারতেই দেখা যায়। আসলে মেকসিকোর সঙ্গে অনেক জায়গায় ভারতের খুব মিল দেখা যায়। ইওরোপ অথবা উত্তর আমেরিকার মতো জীবন অতটা যান্ত্রিক হয়ে যায়নি। এই পরিবেশে থাকার ফলে ইউরোপীয় ফ্লোরেন্স মেকসিক্যান হয়ে গেছেন।

প্রায় বাঙালি। মা বলে ডাকলে যাঁর ভেতরে মাতৃত্ব জেগে ওঠে। আর অ্যান তো মেকসিক্যানই; অ্যান আমেরিকার যে অঞ্চলের মেয়ে সে অংশটি এক সময় মেকসিকোর দখলেই ছিল।

আমরা একটা উঁচু টিলায় উঠে, ঢালু বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে লাগলুম নিচে। দূরে নীল আকাশের গায়ে সমুদ্র ছটফট করছে। সমুদ্রের বিপরীতে তীক্ষ্ণ রেখায় আঁকা ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি কটেজ। ফ্লেরেন্স বললেন, 'ওই দেখ রোদ পোহাচ্ছে আমাদের বাড়ি'।

ফ্লোরেন্সের কথায় আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দেখার মতো দৃশ্য। একটা ইংরেজি সিনেমা দেখছিলুম, 'সামার অফ ফর্টি টু'। সেই ছবিতে এই রকম একটা কটেজ ছিল। উঁচু ভিতের ওপর চারপাশে, বারান্দা-ঘেরা ছিমছাম একটি কুটির। বলা নেই কওয়া নেই অ্যান হঠাৎ ঢালু বেয়ে ছুটতে শুরু করল। ফ্লোরেন্স হেসে বললেন, 'মেয়েটা এখনও শিশুই আছে।' আমারও ওইভাবে ছুটতে ইচ্ছে করল; কিন্তু পাছে ফ্লোরেন্স ভাবেন অ্যানের দেখাদেখি আমি ছুটছি সেই ভয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসে, পাশাপাশি হাঁটতে লাগলুম দু'জনে। অ্যান আমাদের অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

এসেছি ইকসতাফায় বেড়াতে। সেই বেড়াতে এসে এই কুটিরে আসা, এ যেন বেড়ানোর ভেতর আর এক বেড়ানো। ফ্লোরেন্সের কটেজটি ইউরোপীয় কায়দায় তৈরি। কাচমোড়া। চতুর্দিকে আলো আর আলো। ঝলমল করছে। কাঠের মেঝে। কার্পেট আছে। দেওয়ালে নানা ধরনের সুইস ঘড়ি। মেকসিক্যান কারুশিল্পীদের হাতের কাজ চারপাশে সুন্দর করে সাজানো। খাবার টেবিলটা ঝকঝক করছে। পাশ্চাত্যের পরিচ্ছন্নতার আলাদা একটা ব্যাকরণ আছে। ওঁরা বলেন, 'ক্লিনলিনেস ইজ নেকস্ট টু গডলিনেস।' বিচিত্র ডিজাইনের চেয়ার। ঘরের ভেতর ঘর, তাব ভেতর ঘর। এপাশ থেকে চলে গেছে ওপাশে। শেষ হয়েছে বারান্দায় গিয়ে। আমি হাঁ করে সব দেখতে লাগলাম। একপাশে সমুদ্র তালগোল পাকাচ্ছে। বেলাভূমি রোদে গড়াগড়ি যাচ্ছে নির্জন, নিঃসঙ্গ। ভেবেছিলুম গাঙচিল দেখতে পাবো। কোনও পাখিই চোখে পড়ছে না। এখানে এসে অবধি পাখির বড় অভাব দেখছি। পাখিরা সব গেল কোথায়?

আমার সামনেই দেখতে পাচ্ছি একটা কাঠের পার্টিশান। কোনও ইন্ডিয়ান শিল্পীর হাতের কাজ। মায়া মোটিফ খোদাই করা সূর্য। পুরোহিতেব মুখ, জাগুয়ার মানুষ। পার্টিশানের ওপাশে অ্যান, ফ্লোরেন্স ও আর একটি মেয়ে আহাবের আয়োজনে ব্যস্ত।

কানে আসছিল মিক্সারের সব আওয়াজ। পার্টিশানের ওপাশে ভীষণ কর্মচাঞ্চল্য। আর একটি মেয়ে, তাকে এক ঝলক দেখে মনে হল মেস্তিজো। ষোড়শী, সুন্দরী। থেকে থেকেই হাসির ঐকতান ভেসে আসছে ওপাশ থেকে। বসে থাকতে থাকতে মনে হল, আমি আমার বাড়িতেই বসে আছি। ওপাশে আমার বোনেরা হাসাহাসি করছে। আমার হঠাৎ ভীষণ ঘুম পেয়ে গেল। নেশায় চোখ যেন জড়িয়ে আসছে।

হঠাৎ তিনজন মহিলা পার্টিশানের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলেন মার্চ করে। এক একজনের হাতে এক একরকম খাদ্যসম্ভার। ধোঁয়া আর সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে মিছিল এগিয়ে আসছে আমার দিকে। মায়া মেক্সিকোর কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেন। খাওয়ার টেবিলে ভরে গেল। ভাত, ডাল, ছ্যাঁচড়ায় নয়। বিদেশী খাদ্যে। টেবিলের সামনে থেকে ফ্লোরেন্স ডাকলেন, 'কাম মাই সান।'

ঘুম-ঘুম চোখে উঠে দাঁড়ালুম। হাত ধুতে হবে। পার্টিশানের ওপাশে ওয়াশ বেসিন। ছোট্ট হলুদ রঙের সাবান। ফেনা আর গন্ধে পাগল করে দেবার মতো। নরম তুলতুলে তোয়ালে। টেবিলে ফিরে আসতেই ফ্লোরেন্স বললেন, 'আমরা কিন্তু ভেজিটেরিয়ান। রিচার্ড অ্যাটেনবরোর গান্ধী দেখার পর থেকেই আমবা মাছ, মাংস ছেড়ে দিয়েছি। গান্ধী আমাদের আদর্শ চরিত্র। শান্তি আর অহিংসা। এই দেশটা গড়ে উঠেছে হিংসার ওপর। মাটিতে অনেক রক্ত আছে। নাও প্রার্থনা করো।'

হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে করতে আমার কেবলই মনে পড়ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের কথা। দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমরা যখন ছাত্রদের সঙ্গে আহারে বসতুম সমবেত প্রার্থনা দিয়ে শুরু হত আহারপর্ব। এখানে আমরা বললুম, 'প্রভু যীশু, তুমি আজ আমাদের যা মাপিয়েছ তার জন্যে তোমার

কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমরা এই আহার অর্জন করেছি। প্রভু, তুমি আমাদের বর্জন কোরো না।'

স্যুপ। গরম স্যুপের পাত্র আমাদের ঠোঁটে।

ফ্লোরেন্স যেন ধারাভাষ্য দিচ্ছেন, 'তুমি এখন যে স্যুপ খাচ্ছ তা হল মধ্যযুগের ইওরোপীয় স্যুপ। এর একটা ইতিহাস আছে।'

মনে মনে ভাবলুম, আমি অবশেষে ইতিহাসের দেশে এসে পড়েছি। সবেতেই ইতিহাস। চলতে ফিরতে ইতিহাস। ফ্লোরেন্স বলতে লাগলেন, 'স্যুপে যে রুটির টুকরোগুলো ভাসছে, ওকে বলে সপ। টুকরোগুলো লাল মদে ভিজিয়ে রেখে, স্যুপে ছাড়া হয়েছে। স্যুপে ভাসমান এই সপের সংখ্যা দেখে সে-যুগের অতিথি বুঝে নিতেন গৃহস্বামী কৃপণ না উদার। কৃপণের পরিবেশিত স্যুপে ভাসত একটি কি দুটো টুকরো। এইবার গল্পটা শোনো, কোঁৎ দ্য গ্রাঁ প্রি সে-যুগের এক বিখ্যাত কৃপণ নিমন্ত্রণ করলেন সে-যুগের এক বিখ্যাত রসিককে। তাঁর নাম সিউয়ার দা ভ্যান্ডি। প্রথমেই তাঁর সামনে রাখা হল স্যুপের বিশাল পাত্র। ছোট্ট দুটি সপ তরল পদার্থে সাঁতার কাটছে। একটার পিছনে আর একটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিমন্ত্রিত ভ্যান্ডি চামচে দিয়ে একটাকে তোলার চেষ্টা করলেন। দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশাল পাত্রে স্যুপের সমুদ্রে চামচের নাগালের বাইরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। শত চেষ্টাতেও কায়দা করতে না পেরে তিনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাকলেন তাঁর ভ্যালেট দ্য চেম্বারকে। সে আসতেই বললেন, 'ওহে, আমার পা থেকে বুট জোড়া খোলো তো।' গৃহস্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করতে চাইছেন আপনি?'

ভ্যান্ডি বললেন, 'জুতো জোড়া খোলার অনুমতি দিন, আমি ওই স্যুপের বাটিতে ঝাঁপ মারতে চাই, তা না হলে ওই সপের টুকরোটা ধরা যাবে না।' এই ঘটনাটি ঘটেছিল সতের শতকের প্যারিসে। তা তুমি তোমার স্যুপ দেখে বলো, আমি কৃপণ না উদার।

'যথেষ্ট উদার, কিন্তু আমার পেট যে এক স্যুপেই টইটম্বুর।'

'সান, তা বললে তো হবে না। এখনও অনেক পদ বাকি।'

অপর মেয়েটির নাম ডেজি, সে আমার দিকে এগিয়ে দিল বেক্‌ড বিনস, টপড উইথ চিজ গ্রেটিংস। আমেরিকার খাদ্যতালিকায় ধরা আছে সে দেশের ইতিহাস। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ইতিহাসের পথ ধরে এসে একাকার হয়ে গেছে। খাদ্যের দর্পণেই সেই মিলিত-মিশ্রিত ঐক্যের প্রতিফলন। ইংরেজরা নিয়ে এল অ্যাপল পাই। ফরাসীরা নিয়ে এল চাউদার চিজ। ডাচরা নিয়ে এল কুকিজ। নিয়ে এল কোলসলা। কোল মানে বাঁধাকপি আর স্লা মানে সালাড, দুয়ে মিলে সন্ধি করে কোলসলা। নিয়ে এল ওয়াফলস। আমেরিকার মেনু থেকেই উঠে আসে, কত দেশের মানুষ আছে সে দেশে, তাদের ধর্ম, যুদ্ধ, ভৌগোলিক অবস্থান, এমন কি জীবিকা। মেনুটা আমি পড়ে যাই, বেশ মজার, অ্যামবুশড অ্যাসপারাগাস, শেকার লোত, বারগু, মেরিল্যান্ড চিকেন, স্নিকারডুডলস, স্পুন ব্রেড, কাউপোক বিনস, হাশ পাপিস, জাম্বালায়া, প্যানডাওডি, বোস্টন বেক্‌ড বিনস, ফিলাডেলফিয়া পিপারপট, মোরাভিয়ান সুগারকেক, সুইডিশ মিটবলস, হে মেকারস সুইচেল, হোয়েলারস টোডি, প্লেন কুকড পোসামস, র‍্যাকুনস সোল ফুড, চিটারলিংস।

নিরামিষ ভূরিভোজের পর, সমুদ্রের ঢেউ দেখতে দেখতে কফি পান। কফি পানান্তে আবার প্রান্তর। একটি লোক ঘোড়ায় চেপে চলেছে। মাথায় সমব্রেরো হ্যাট। লোকটি আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আপন মনে চলে গেল। তার টুপি পরা ছায়া প্রান্তরের ওপর দিয়ে পাশে পাশে চলেছে। ফ্লোরেন্স বললেন, 'ওয়াশার ম্যান। বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাপড়জামা সংগ্রহে বেরিয়েছে।'

আমরা আবার ফিরে এলাম মার্কেট প্লেসে। বাজার বেশ জমে উঠেছে। ক্রেতাদের মধ্যে অনেকেরই এখানে হয়তো আজই শেষ দিন। যেমন আমাদের। আবার কে কবে ফিরে আসে তার ঠিক নেই। আমরা একটা দোকানে গিয়ে ঢুকে নরম ক্যানভাসে তৈরি হ্যান্ড-ব্যাগ কিনলুম। ব্যাগের গায়ে নীল অক্ষরে বড় বড় করে লেখা, ইকসতাফা। কোথাকার ব্যাগ কোথায় চলে আসবে আমার সঙ্গে! প্রশান্ত মহাসাগরের কূল থেকে গঙ্গার তীরে।

ইকসতাফার আমাদের শেষ দিনের সূর্য সমুদ্রে নেমে গেল রাতের অবগাহনে। এপাশে ওপাশে

যা কিছু দেখার ছিল সবই প্রায় দেখা হয়ে গেছে। বাকি থেকে গেল এপাশের দিকে ছোট্ট একটি ধীবর গ্রাম। শুনেছি সেখানে সমুদ্র আরও সুন্দর আরও উত্তাল। সেখানে এই বিশাল বিশাল হোটেল নেই। আছে ছোট ছোট স্প্যানিশ আটচালা। সারা দিন তারা মাছ ধরে। সূর্য ডোবার পর আগুন জ্বেলে গান গায়, নাচে, মদ আর ঝলসানো মাংস, মাছ খায়। তারপর এক সময় বালির নরম বিছানায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। সারা রাত সমুদ্র তাদের গায়ে সিঞ্চন করে জলকণা। বাতাস দোলাতে থাকে চামর। তারারা একে একে উঠে চলে যেতে থাকে আকাশবাসর থেকে । সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই গ্রামের পথ ধরে হাঁটা হল না আমার। স্প্যানিশ মেয়েরা খুব প্রেমিক হয়। ছেলেরা হয়তো নিষ্ঠুর, মেয়েরা কিন্তু ভীষণ নরম। স্নেহপ্রবণ। সেবাপরায়ণ। সব কথাই তারা হাসিমুখে শোনে, সব কাজ তারা হাসিমুখে করে। মেয়েদেব এই মধুর স্বভাবেব জন্যে যে কোনও স্প্যানিশ পল্লী, স্প্যানিশ পরিবার বড় শান্তির জায়গা। একসময় আমাদের গ্রাম, আমাদের পরিবারও এইরকম ছিল। দরজার পইঠেতে গায়ে গা লাগিয়ে বসে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা গল্প করছে। কেউ কেউ গান গাইছে সুরেলা কণ্ঠে। ফুলের ডিজাইন ছাপা স্কার্ট আর ব্লাউজে স্প্যানিশ মেয়েদের সুন্দর দেখায়। যারা মেস্তিজো অর্থাৎ স্প্যানিশ ও ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত তাদের ঠিক ভারতীয়দের মতোই দেখতে। ইউরোপীয় মেয়েদের মতো সাংঘাতিক লম্বা নয়। গাত্রবর্ণ অতটা উগ্র নয়। চলনে বলনে রুক্ষ, কর্কশ পুরুষালি ভাব নেই বললেই চলে। শ্যামলা স্প্যানিশ মেয়েটিকে দেখলে মনে হবে, আমারই বোন এই মাত্র কলেজ থেকে ফিরে এলো। একটু বিশ্রাম করেই এক্ষুনি হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে বসবে। ভাষাব যেটুকু তফাৎ তা ভাব দিয়েই মিলিয়ে নেওয়া যায়। ক্রিয়োলো, মানে খাঁটি স্প্যানিশ মেয়েবা অবশ্য অন্যরকম। লম্বা, ফর্সা, মেজাজী, কখনও অহঙ্কারী। মেকসিকোব স্প্যানিশ ছেলেরা বেশ স্বাস্থ্যবান। প্রাণচঞ্চল। হো-হো করে হাসে, জোরে জোরে কথা বলে। তবে বন্ধু হিসেবে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। আত্মকেন্দ্রিক নয়। বিপদে ফেলে পালায় না। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

সন্ধে হয়ে রাত নামল। যে-কোনও জায়গা থেকেই বিদায়ের আগের দিন মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ, মনমরা হয়ে যায়। আমার শুধু নয় অ্যানের মুখও থমথম করছে। অ্যান আমি চলে যাবাব পরেও মেকসিকোতে অনেক দিন থাকবে তার গবেষণার কাজে। মায়ালিপির পাঠোদ্ধার। মায়া সভ্যতার পতনের কারণ অনুসন্ধান করবে। মানুষের অনুসন্ধানের তো শেষ নেই। অ্যানের ভাগ্য ভাল। সে কাজ করবে অধ্যাপক গুয়ালবেরতো জাপাতা আলোনজোর সঙ্গে। অধ্যাপক জাপাতার মতো অনুসন্ধানী মানুষ খুব অল্পই আছেন। তিনি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারে বসে প্রাচীন পণ্ডিতদের রেখে যাওয়া তথ্যের চর্বিতচর্বণ করেন না। তিনি নিজে, মেসো-আমেরিকার ছ'টি সুচিহ্নিত প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকায় দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাসের ছিন্ন সূত্র সংযোজনের আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। মেসো-আমেরিকা হল মেকসিকোর সেই অঞ্চল, যেখানে দূর অতীতে পল্লবিত হয়েছিল, ওলমেক, টোটোনাক, জাপোকে, মিক্সটেক, টিয়োটিহুয়াকান, টোলটেক আর অ্যাজটেক সভ্যতা। এই ছটি এলাকা নিয়ে মেসো-আমেরিকা। এই ছটি এলাকায়, অধ্যাপক জাপাতা পাগলের মতো অনুসন্ধান করে ফিরছেন অতীত। যে অতীত শুধু গ্লোরিয়াস নয়, গোল্ডেন।

অশিক্ষিত স্প্যানিশ হানাদাররা যে কি সর্বনাশ করে গেছে! এ কথা আমরা বলছি না, বলছেন তাঁদেরই স্বজাতি মেকসিকোর বর্তমান স্প্যানিশ পণ্ডিতরা। কনক্যুইস্তাদের একবারও মাথায় এল না, কি ধ্বংস করছি দেখি। সুপরিকল্পিত শহর, সুবিশাল স্থাপত্য, বাড়ি, মন্দির, ভজনালয়, বাজার, রাস্তা। সামনে যা পড়েছে, ভাঙতে ভাঙতে মারতে মারতে এগিয়ে গেছে। আজকের গবেষকদের জন্যে পড়ে আছে, নগরের ধ্বংসাবশেষ, পিরামিড, মূর্তি, পুতুল, প্রতীক, পিলারের গায়ে রিলিফের কাজ, চীনামাটির পাত্র, মূর্তি, শিলালিপি, সাঙ্কেতিক ভাষা। এলোমেলো এক ধাঁধা তৈরি করে রেখেছে বিজেতারা। যেসব ট্যুরিস্টরা ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে অধ্যাপক জাপাতাকে গাইড হিসাবে পাবেন, তাঁদের চোখের সামনে অতীত জীবন্ত হয়ে উঠবে।

একটু আগে অ্যান আমাকে অ্যাজটেকদের একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গল্প বলছিল। মেকসিকো আর পেরু এই দুটি জায়গায় সভ্যতা যখন তুঙ্গে তখন চাষবাসের সমস্ত কৌশল তাদের হাতের

মুঠোয়। ভুট্টার চাষ এই অঞ্চল থেকেই গিয়েছিল উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের এলাকায়। অ্যানের গল্প, অ্যাজটেকদের এই 'ফার্টিলিটি রাইটস' সংক্রান্ত। সন্ধের মুখে তার অসাধারণ বর্ণনার গল্পটা শুনেছি। এখনও আমার গা ছমছম করছে। বহু শতাব্দী পূর্বে অ্যাজটেক নগরীতে এসেছিলেন পথভোলা এক পথিক। তার নাম ছিল, ফ্রে বারনানডিনো দ্য সাহাগুন। তাঁব সামনেই ঘটেছিল এই ঘটনা। সাহাগুনের বিবৃতিটা ধরা আছে, স্যার জেমস জি ফ্রেজারের গ্রন্থ, 'দি গোল্ডেনবাউ'-তে।

সেপ্টেম্বর মাস। এই মাসেই অ্যাজটেকেরা বিশাল এক উৎসব পালন করে। উৎসবের আগে সাত দিন ধরে চলে কঠোর উপবাস। এই উপবাসের সাত দিন সাবা অ্যাজটেক নগরী ঢুঁড়ে তারা খুঁজে বের করে বারো কি তে'রো বছরের বয়সের সেরা সুন্দরী এক দাসী কন্যাকে। সেই মেয়েটিকে পূত-পবিত্র করে তারা সাজায়। সে তখন আর সাধারণ মানবী নয়, মেজগডেস বা ভুট্টাদেবী, চিকোমেকোগুয়াতল। দেবীর সমস্ত অলঙ্কার তাকে পরানো হয়। মাথায় ধর্মাধ্যক্ষের মুকুট। গলায় ভুট্টার দানা দিয়ে গাঁথা মালা। হাতে ভুট্টার দানার তাগা। মাথার মাঝখানে চুলের সঙ্গে খাড়া করে বেঁধে দেওয়া হয় সবুজ একটা পালক। এই পালকটা হল ভুট্টার শিসেব প্রতীক। আমি এই উৎসবের পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এই রকম করার কারণটা কি? তাতে তিনি বলেছিলেন, এই সময় ভুট্টা প্রায় পেকে এলেও, দানা নরম থাকে, সেই কারণেই দেবী হিসেবে তাঁরা নির্বাচন করেন এক কিশোরীকে। সাত দিনের উপবাস শেষ হলেই উৎসবের দিন। সারাটা দিন তারা ওই উৎসবের কিশোরী দেবীটিকে নিয়ে পথে পথে, বাড়িতে বাড়িতে ঘোরে। সঙ্গে চলে নাচ, গান আর বাজনা। মেয়েটির মাথায় গোঁজা সবুজ পালক দুলতে থাকে তালে তালে। সারা নগর মেতে ওঠে ভুট্টার উৎসবে। সাত দিনের নিরবচ্ছিন্ন উপবাসেব পর শহরের মানুষকে আনন্দে মাতিয়ে তোলার ব্যবস্থা।

নগর পরিক্রমাব পর দেবীকে নিয়ে তারা সমবেত হল মন্দির প্রাঙ্গণে। তখন আঁধার নেমে এসেছে। জ্বলে উঠল লণ্ঠনের পব লণ্ঠন। শত দীপ শোভায় উজ্জ্বল মন্দিব ও প্রাঙ্গণ। বাতিদানে পুড়তে লাগল বাতি। এই রাত হল জাগবণের রাত। ঘুমোলে চলবে না। সকলকেই জেগে থাকতে হবে। রাত এগোচ্ছে। মধ্যরাতে হঠাৎ বেজে উঠল দামামা, ভেরি, শিঙা, বাঁশি, ট্রাম্পেট প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। সমবেত বাদ্যভাণ্ডের গম্ভীব ধ্বনিব মধ্যে অন্ধকার থেকে উঠে এল সুসজ্জিত খোলা একটি পালকি বা বাহিকা। তাজা ভুট্টার শিস দিয়ে সাজানো। লাল লঙ্কার স্তবক গোঁজা। পালকির ভেতরে বিছানো বিভিন্ন শস্যের বীজ। পালকিটিকে তাবা মন্দিরের দুয়ারে স্থাপন করল। মন্দিরের অভ্যন্তরে শোভা পাচ্ছেন দেবী ভুট্টা, চিকোমেকোগুয়াতল। কাঠেব প্রতিমা। মন্দিরেব ভেতর এবং বাইরে ফুলে, ফলে আলোয সুসজ্জিত। সজ্জায় বহু' করা হয়েছে ভুট্টা, লঙ্কা, লাউ, কুমড়ো, গোলাপ, সমস্ত রকমের শস্যেব বীজ। সে এক দেখাব মতো দৃশ্য। ভক্তরা দেবীর নৈবেদ্য হিসেবে প্রত্যেকেই এই সব এনেছে। সবই ঢেলে দেওযা হয়েছে দেবীব ঘরের মেঝেতে। মোটা কার্পেটের মতো বিছিয়ে আছে ভুট্টার সাদা দানা, লাল লঙ্কা, শস্যের দানা। পা ডুবে যায়।

হঠাৎ বাদ্যবাজনা থেমে গেল। নেমে এল নীরবতা অখন্ড। সেই গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মিছিল করে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন পুরোহিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কারুর হাতে মশাল, কারু হাতে ধূম-উদগীরণকারী সুগন্ধী ভান্ড। সেই মিছিলের মধ্যভাগে রয়েছে দেবীরূপে সজ্জিতা সেই কিশোরী। মন্দির দুয়ারে উপনীত হয়ে পুরোহিতবর্গ কিশোরীটিকে সুসজ্জিত পালকিতে আরোহণ করালেন। দেবী কিশোরী বাহিকার দু'পাশের কাঠের দন্ড দু'হাতে ধারণ করে পালকির পাটাতনে বিছানো শস্যকণা, ভুট্টার দানা ও স্তূপাকার লাউ কুমড়োর উপর শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে দন্ডায়মান হল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল বাদ্যভান্ড। শুরু হয়ে গেল আরতি। কিশোরীর চারপাশে জ্বলতে লাগল মশাল, চামর, ধূপ ধুনো। আরতি চলছে। চলছে। হঠাৎ প্রধান পুরোহিত লাফিয়ে উঠলেন পালকিতে। হাতে তাঁর উদ্যত ক্ষুর। কিশোরীর চুলের ঝুঁটি, যার সঙ্গে বাঁধা ছিল সবুজ পালক, পুরোহিত সুদক্ষ হাতে গোড়া থেকে কেটে নিলেন সেই ঝুঁটি। পালকসমেত সেই কেশগুচ্ছ রাখা হল একটি আধারে। পুরোহিত নেমে এলেন। শোভাযাত্রা করে বাদ্যভান্ড সমেত এগিয়ে গেলেন মন্দিরে। দেবীর সামনে নতজানু হয়ে পরম ভক্তিভরে দেবীকে উৎসর্গ করলেন পালকবাঁধা সেই কেশগুচ্ছ। শস্যের প্রতীক। নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তাঁব আকুল ক্রন্দন। কান্না জড়ানো

গলায় তিনি বলতে লাগলেন, দেবী! তোমাকে ধন্যবাদ। আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি এই বছর আমাদের প্রচুর ফসল দিয়েছ। তুমি ফলে আর ফুলে ভরে দিয়েছ আমাদের ধরিত্রী। প্রধান পুরোহিতের ক্রন্দন ও দেবীবন্দনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করলেন সমবেত সকলে। সকলেই কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। প্রার্থনা শেষ হবার পর কিশোরী নেমে এল পালকি থেকে। তাকে নিয়ে যাওয়া হল তার রাত্রিবাসের স্থানে। প্রাঙ্গণে সবাই বসে রইলেন জেগে। পাহারায়। চারপাশে জ্বলতে লাগল মশাল। ধীরে ধীরে ভোর হয়ে এল। মন্দির পরিচারিকারা নিবু নিবু মশালগুলি একে একে তুলে নিয়ে জলে ডুবিয়ে দিলেন। রাত পাহারায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে এক পা-ও নড়েননি, কারণ উঠে চলে যাওয়াটা ভয়ঙ্কর রকমের এক অপরাধ। দিনের আলো ভালভাবে ফোটার পর প্রধান পুরোহিত সেই কিশোরীকে আবার নিয়ে এলেন। তার সেই দেবীর সাজ, মাথায় মুকুট। গলায় ভুট্টাদানার শঙ্খশুভ্র হার। দু'বাহুমূলে শস্যকণার তাগা। চন্দ্রচূড়। দেবী কিশোরী ফুল ও শস্য শোভিত বাহিকার পাটাতনে আরোহণ করে দু'হাতে দুই দিকের রেলিং ধরে দাঁড়াবার পর, প্রবীণ পুরোহিতরা পালকি কাঁধে তুলে নিয়ে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে চললেন প্রধান দেবতার বিশালকক্ষে। অ্যাজটেক দেবতা, অ্যাজটেক ঈশ্বর হুইটজিলোপোক্‌লি। প্রবীণদের কাঁধে চেপে দেবী কিশোরী চলেছে ঈশ্বর সকাশে। জ্বলছে মশাল। পুড়ছে সুগন্ধী দ্রব্য। ধূম, অগ্নি, বাদ্যবাজনা সহযোগে শোভাযাত্রা এগিয়ে গেল প্রধান কক্ষের দিকে। বিশাল সেই প্রাঙ্গণ অগণিত নরনারীর ভিড়ে উপচে পড়ছে। ধূপ আর সুগন্ধীরজনের গন্ধে বাতাস পবিত্র। বাদ্যযন্ত্র ও সংগীতে দেব-দেবীর প্রশস্তি। প্রধান মন্দির স্পর্শ করে পালকি আবার ফিরে এল দেবীমন্দিরে দারু মূর্তিব সামনে। মন্দিরের মেঝে ঢেকে গেছে শস্যে শস্যদানায়। সেই শ্যামল কার্পেটের ওপর দেবী কিশোরীকে দাঁড কবিয়ে দেওয়া হল। দারুদেবীর সামনে। কিশোরী দেবীর সাজে সেজে বিছানো শস্যের স্তূপে স্থির। এদিকে নগরীর প্রবীণেরা সার বেঁধে এগিয়ে আসছেন। প্রত্যেকের হাতে রক্তপূর্ণ পাত্র। শুকিয়ে জমাট। উপবাসের সাত দিনে প্রতিদিন কান বিঁধিয়ে প্রত্যেকে সংগ্রহ করে রেখেছেন এই রক্ত। একে একে নতজানু হয়ে তাঁবা কিশোবী দেবীর পায়ে পাত্র থেকে চেঁছে চেঁছে সেই শুকনো জমাট রক্ত অঞ্জলি দিলেন। হে দেবী তুমি আমাদের শস্য দিয়েছ, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি তোমাকে আমাব রক্ত উৎসর্গ করছি। সার বেঁধে এগিয়ে এলেন নারীরা। তাঁরা উবু হয়ে বসে একে একে দেবীব পাযে অঞ্জলি দিলেন পাত্রসঞ্চিত শুকনো রক্ত। বহুক্ষণ ধরে চলল এই অঞ্জলিপ্রদান উৎসব। কারণ, নগবীর কেউই বাদ গেল না। উচ্চবর্ণের মানুষ, নিম্নবর্ণের মানুষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, শিশু সকলকেই অর্ঘ্য দিতে হবে কিশোরী দেবীর পদতলে। অনুষ্ঠান শেষে হৃষ্টচিত্তে সবাই ফিরে গেলেন গৃহে। সেখানে অপেক্ষা করে আছে উপবাস ভঙ্গের ভোগ। নিষ্ঠাবান খ্রীশ্চানেরা যেমন ইস্টারের উপবাস শেষে মাংস ডিম সহযোগে ভোজসভায় মিলিত হন, সেইরকম অ্যাজটেকরাও দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ কবলেন মাংস, মদ ও অন্যান্য ভোজ্য সামগ্রী গ্রহণ কবে। আকণ্ঠ পান ভোজনের পব নিদ্রা। উপবাস ও রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি দূর করে তাজা হয়ে তাঁরা ফিরে এলেন মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসবের শেষটুকু দেখার জন্যে। শেষটা এইরকম। যখন নগরীর সবাই সমবেত হলেন অনুষ্ঠান অঙ্গনে তখন প্রধান পুরোহিত ধীরপদে এগিয়ে গেলেন সেই কিশোরীর দিকে, যাকে সাজানো হয়েছে দেবী। যাব পায়ে পুরোবাসীবা অর্ঘ্য দিয়েছেন রক্ত। প্রধান পুরোহিত তার সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলেন সুগন্ধী। একে একে এগিয়ে এলেন অন্যান্য পুরোহিতরা। তাঁরাও ছিটোতে লাগলেন সুগন্ধী, তারপর হঠাৎ সকলে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কিশোরী দেবীর ঘাড়ে। শস্য বিছানো মেঝের ওপর তাকে চিত করে ফেলে এক কোপে মুণ্ডটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল। ফিনকি দিয়ে যে রক্ত ধারা বেরোতে লাগল তা ধরা হল একটা বালতিতে। সেই ধৃত রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হল দারু দেবীর গায়ে, মন্দিরের দেয়ালে, মেঝের পর স্তূপীকৃত ভুট্টা, লঙ্কা, লাউ, শস্য ও সবজির ওপর। এরপর তাঁরা যা করলেন আরও নৃশংস। মুণ্ডহীন দেহের ছালটি সাবধানে ছাড়ানো হল। একজন পুরোহিত সেই রক্তাক্ত ছালটির মধ্যে অতি কষ্টে ঢুকে পড়লেন। কিশোরীর সমস্ত পোশাক ও অলঙ্কার তাঁকে পরানো হল। তিনি রইলেন, পুরোভাগে, পরিচালকের মতো, মিছিল বেরিয়ে পড়ল নগর পরিক্রমায়। বাদ্যযন্ত্র বাজছে, বাজছে দামামা। মিছিল এগিয়ে চলেছে নৃত্যের তালে তালে।

অ্যানের এই গল্প শোনার পর থেকেই মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে আছে। আমি মানুষের জন্মান্তরে বিশ্বাসী। কে জানে ছ'শো বছর আগে ওই পৃথিবীর আমি অধিবাসী ছিলুম কি না। আমারই চোখের সামনে ওইসব ঘটনা হয় তো ঘটে গেছে। তখন আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস হয় তো অন্যরকম ছিল। এই মুহূর্তে আমার ওই সুন্দরী কিশোরীটির জন্য ভীষণ মনোবেদনা হচ্ছে। দুটো দিন একদল পুরোহিত আর অগণিত মানুষ তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। বেড়াল যেমন খেলা করে ইঁদুর নিয়ে। বলির আগের দিন রাতে সে যখন দেবী সেজে দীপের আলোয় আলোকিত ঘরে, কাঁপা কাঁপা ছায়ায়, অসংখ্য মানুষের প্রহরায় একা বসে ছিল, তখন তার মনের অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছিল! দেবীর দু'গাল বেয়ে হয়তো মুক্তোর দানার মত জল গড়াচ্ছিল। তার পিতামাতার মনের অবস্থাই বা কি হয়েছিল। মৃত্যুর দিকে এই ভাবে এগিয়ে যেতে কেমন লাগে।

অ্যাজটেকদের সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল অদ্ভুত। তাদের দেবতাখ্যান ছিল তাদেরই মতো। পৃথিবীর আদিতে ছিল জল। সেই জলের ওপর একা একা হেঁটে বেড়াতেন দেবী 'তলালতেউতলি।' বিশাল, আশ্চর্য এক রমণী। তিনি ছিলেন কুমারী। তাঁর শরীরের প্রতিটি সন্ধিতে ছিল এক জোড়া করে চোখ আর চোয়াল। ওই জোড়া জোড়া চোখে সৃষ্টি আছে। চোয়ালে আছে পশুর মতো কামড়াবার ক্ষমতা। দেবী 'ত্লালতেউতলি'র ওপর গোপনে নজর রাখতেন দুই আদি দেবতা। একজনের নাম 'কুয়েতজালকোতল' মানে পালকধারী সর্প আর একজনের নাম 'তেজকাতলি পোকা', মানে ধূম উদ্‌গীরণকারী আরশি। এই দুই আদি দেবতা স্থির করলেন তাঁরা এই আশ্চর্য দেবীর মতো করে জগৎ সৃষ্টি করবেন। তখন তাঁরা বিশাল দুই সাপের আকৃতি ধারণ করে সেই বহু চক্ষু, বহু চোয়াল সমন্বিত দেবীকে দু'পাশ থেকে আক্রমণ করলেন। একজন ধরলেন তাঁর ডানবাহু বামপদ, আর একজন ধরলেন বামবাহু ডানপদ, তারপর তাঁকে ফেঁড়ে ফেললেন। তাঁর ছিন্নভিন্ন শরীর থেকে তৈরি করলেন স্বর্গ, মর্ত্য ও দেবতা। সৃষ্ট দেবতারা অতঃপর উত্তীর্ণ হয়ে সেই দেবীকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানালেন। আদেশ করলেন, দেবীদেহের অবশিষ্টাংশ থেকে জন্ম নিক সৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ফল। তখন তাঁরা দেবীর কেশ থেকে সৃষ্টি করলেন বৃক্ষসমূহ, ফুল ও তৃণ। তাঁর চোখ থেকে তৈরি হল প্রস্রবণ ও ঝরণা, গিরিকন্দর, মুখ থেকে নির্গত হল নদী ও বিশাল গুহাসমূহ। তাঁর নাসিকা হল উপত্যকা আর স্কন্ধদেশ হল পর্বত। এত সৃষ্টির পরেও দেবী কিন্তু তৃপ্ত হলেন না। সৃষ্টির সেই আদি রজনীতে তিনি সারাটা সময় শুধু কেঁদে গেলেন। দেবতারা প্রশ্ন করলেন এই দুঃখের কারণটা কি? দেবী বললেন, 'আমার ভোগে তোমরা জীবন্ত মানুষের তাজা হৃদয় উৎসর্গ করো। আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে তোমরা মনুষ্যরক্তে না ভেজানো পর্যন্ত বৃক্ষসমূহ ফল ধারণ করবে না।'

এই বিশ্বাস থেকেই এসেছিল অ্যাজটেকদের হৃদয় উৎসর্গের প্রথা। ফসলের দেবীকে রক্তে স্নান করানোর বাৎসরিক উৎসব। এই সব ভাবতে ভাবতে আমরা চলে এলুম সেই শান্ত নির্জন, স্বপ্নময় মার্কেট প্লেসে।

মধ্যরাতে ইকসতাফার এই মার্কেট প্লেস একেবারে নির্জন। খাবার দোকান ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দোকান বন্ধ। বন্ধ হলেও অন্ধকার নয়। কাঁচের ঘরে থরে থরে সাজানো পণ্যসম্ভার। নরম আলোয় উদ্ভাসিত। প্রাণহীন আয়োজনে দপদপ করছে প্রাণময়তা। ভেতরে ভেতরে কিসের যেন একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর মতো। রাতের এইসব দোকানের স্বপ্নময়তা আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করছে। চলে যাবার পর এই দোকানগুলোর কথা আমার ভীষণ মনে পড়বে। স্প্যানিশরা স্বভাবে নিষ্ঠুর ছিল। কত মেরেছে! কত ক্রীতদাসের রক্ত শোষণ করেছে। সভ্যতা লোপাট করে দিয়েছে। দিলেও ভেতরে একটা সৌন্দর্যবোধ আছে। মায়া তৈরি করার ক্ষমতা আছে। এরা সাদা আর নীল রঙের খুব ভক্ত।

আমরা দোকানের সারির ভেতর দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। জনপ্রাণী নেই কোথাও। না থাকলেও মনে হচ্ছে আছে। কোথাও যেন সব লুকিয়ে আছে। হঠাৎ বেরিয়ে আসবে হই হই করে। স্প্যানিয়ার্ড বললেই মনে হয় জলদস্যু। বুলফাইট। তলোয়ার। যত সব আকস্মিক, অদ্ভুত ঘটনার

জন্যে স্প্যানিয়ার্ডদের দায়ী করতে ইচ্ছে করে। আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ঘটনাই ঘটে গেল। আমি আর অ্যান দু'জনেই থমকে গেলুম। বর্ম, শিরস্ত্রাণ পরিহিত এক সৈনিক. ফাঁকা মাঠে, রাতের আকাশের তলায়, আপন মনে, একা একা দাঁড়িয়ে আছে। কি হল? লড়াই শেষ হবার পর বাড়ি ফিরে যেতে ভুলে গেছে নাকি? আর সেই লড়াইও তো থেমে গেছে বহু বছর আগে। আমরা থেমে পড়েছিলুম ভয়ে নয়, সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে কি অসাধারণ আমন্ত্রণ জানাবার কায়দা। একখন্ড পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণে ঝকঝকে বর্ম আর শিরস্ত্রাণ দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে চরিত্রটা নেই। তার পেছনে একটি মাঝারি আকারের রেস্তোরাঁ। স্প্যানিশ ভাষায় লেখা সাইনবোর্ডের মাথার ওপর একটি আলো জ্বলছে। মূর্তিটি পেছনের সেই আলোয় উদ্ভাসিত। জ্যোতির্ময়। রেস্তোরাঁর যিনি মালিক, তাঁর অসাধারণ রুচির প্রশংসা করতেই হয়। একটা সময়কে তিনি স্থির করে ফেলে রেখেছেন নিখুঁত একটি অঙ্গনে। দুশো বছরের অতীত ঘেঁসে আমরা সেই ভোজনালয়ে প্রবেশ করলুম। আলোয় আলোকময়। একটা সুবিধে, এ দেশের মানুষ রাতকে গ্রাহ্য করে না। ওরে! রাত হয়েছে বাড়ি আয়। ওরে! রাত হয়েছে আলো নিবিয়ে মশারি ফেলে শুয়ে পড। এই রকম কোনও তাগিদ আসে না। এ দেশে আবার মশাও নেই, মাছিও নেই।

এই রেস্তোরাঁটা বিলিতি ঢঙের। টেবিল-চেয়ার, টেবিল-চেয়ার, এই ছন্দে সাজানো। তিন চারজন সুদর্শন তরুণ পরিচালনায়। চার পাঁচজন সুঠাম চেহারার ভদ্রলোক দুটো টেবিল জোড়া লাগিয়ে খানাপিনা আর গালগল্পে মশগুল। কতক্ষণ চালাবেন কে জানে। অনর্গল স্প্যানিশ ভাষা, মাঝে মাঝে সাংঘাতিক হাসির দমকা ফোয়ারা। একেই বলে প্রাণ। চারপাশে ছড়িয়ে আছে প্রাণময়তা। প্রাণ সমুদ্র, প্রাণ মানুষে, প্রাণ ভূ-প্রকৃতিতে। যারা রাত জাগতে পারে, তারা জীবনকে অনেক বেশি জানতে পারে। পৃথিবীর যত রহস্য সবই তো উন্মোচিত হয় রাতে।

একটি তরুণ এগিয়ে এসে আমাদের সুন্দর একটি টেবিলে বসিয়ে দিয়ে গেল। প্রতিটি টেবিল ধবধবে সাদা টেবিল কভারে ঢাকা। মায়া ছাঁচে তৈরি ছাইদান। গাঢ় লেবু রঙের কাঁচে তৈরি। সাদা টেবিলক্লথের ওপর সুন্দর একটি শোভা।

তরুণটি ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি খাবেন?'

অ্যান বললে, 'আপনাদের রেস্তোরাঁ কতক্ষণ খোলা থাকবে?'

ছেলেটি হেসে বললে, 'সারারাত। সারাদিন। আমাদের এই এস্টাব্লিশমেন্ট বন্ধ হয় না কখনও।'

'তাহলে আমাদের ঠাণ্ডা কিছু দিন, আর প্রকৃত কিছু মেকসিক্যান খাবার।'

'তাহলে আপনারা বড় দুটো কোক খান আর তারপর মেকসিক্যান রাইস।'

ছেলেটি আমাদের সামনে দু বোতল ঠাণ্ডা কোকাকোলা রেখে গেল। আমরা সিপসিপ করে খেতে লাগলুম। ঘড়িতে তখন রাত একটা। এই ধরনের রোমাঞ্চ মানুষের জীবনে বারে বারে আসে না। গতানুগতিক জীবনে মানুষ এই সময় নিদ্রামগ্ন থাকে। লোক পাঁচটি হই হই করে খেয়েই চলেছে। আমাদের দিকে তাকাচ্ছেও না। আমরা কিন্তু তাকিয়ে আছি।

সেই তরুণটি একটা ট্রলি নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। সে ইতিমধ্যে একটা সাদা অ্যাপ্রন পরে নিয়েছে। দু'হাতে সাদা দুটো গ্লাভস। মুখে একটা সাদা মাস্ক। মনে হচ্ছে একজন সার্জেন এগিয়ে আসছে। ট্রলি নিয়ে সে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর শুরু হল তার জাদুর খেলা। সে তৈরি খাবার আনেনি, এনেছে রান্নার সরঞ্জাম আর কাঁচামাল। আমরা তার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলুম অবাক হয়ে। ট্রলির ওপরে ছোট্ট একটা গ্যাস ওভেন। তার ওপর একটা সসপ্যান। ছেলেটি প্রায় দু'ডজন সবুজ সবুজ চিংড়ি মাছ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ছাড়ানো একটি মার্বেল পাথরের স্ল্যাবের ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল। তার পাশে মাংসের টুকরো। লম্বা লম্বা লঙ্কা। নানা রকমের আনাজপাতি। দু-তিনটে বড় বড় শিশিতে কি সব রয়েছে। ছোট ছোট কৌটো। বার্নার জ্বলল। শুরু হয়ে গেল রান্না। ছেলেটির হাত ছবির মতো কাজ করছে। অসাধারণ দক্ষতা। যে কোনও মহিলার ঈর্ষা জাগাবার মতো রন্ধনশৈলী। দেরাদুন বাসমতীর মতো সরু সরু চাল। সেই চালের ভাত, সেই ভাতে মিশে গেল চিংড়ি, মাংসের টুকরো, সবজি. লাল লঙ্কা। প্রথমে কোন গন্ধ ছিল না, রান্নার একটা পর্যায়ে এসে ভুরভুরে গন্ধ আমাদের জিভে জল এনে দিল। লবস্টার আর রেড

পিপারের সঙ্গে মিশেছে মেকসিক্যান মশলা। সবার ওপরে কাজ করে চলেছে এক স্প্যানিয়ার্ডের গ্লাভস পরা দুটো হাত। সবার শেষে ছেলেটি অদ্ভুত একটা খেলা দেখাল। সব কিছুর ওপর ঢেলে দিল আধ বোতল মদ। পুরো খাদ্যবস্তুর ওপর দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। ছেলেটি সসপ্যানটা গ্যাসের উনুনের ওপর থেকে তুলে নিয়ে ধুনুচি নৃত্যের কায়দায় নেড়েচেড়ে একটি পাত্রে ঢেলে দিল। তারপর সুদৃশ্য দুটো বড় প্লেটে পরিবেশিত হল আমাদের সামনে। মেকসিক্যান রাইস। ফ্রায়েডরাইস চাইনিজ নয়, নয় পোলাও, অথবা বিরিয়ানি। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের এক প্রিপারেশন। গরম আগুন। কুলকুল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ভুরভুরে গন্ধ। ছেলেটি সব গোছগাছ করে তার ট্রলিটি নিয়ে চলে গেল।

প্রথমে আমার খেতে ভয় করছিল। চিংড়ির সঙ্গে মাংস, সব শেষে আগুনের নৃত্য। বাঙালির পেটে সহ্য হবে তো? অ্যান এক চামচ মুখে দিয়ে বললে, 'খেয়ে দেখ। বেশ বড়িয়া হয়েছে।' সাহস করে এক চামচ মুখে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ব্রহ্মতালু ছেঁদা হয়ে যাবে। অসম্ভব ঝাল। আমার অবস্থা দেখে অ্যান বলল, 'কোক খাও, কোক।' আর কোক, জিভে যেন অ্যাটোম বোমা পড়েছে। পাগল ভালো করার জন্যে ধরে দু-চার চামচ খাইয়ে দেওয়া যায়। অ্যান বেশ কিছুটা খেয়ে ফেলে কাঁদতে শুরু করল। দুঃখের কান্না নয়, ভেতরে লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে। একটা হনুমান যেন লেজে আগুন লাগিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এই রকম খাবার পরপর তিনদিন তিনরাত খেলে মানুষ বিপ্লবী হয়ে যাবে। সিংহাসন থেকে রাজাকে টেনে নামিয়ে এনে পিটাতে শুরু করবে। অলিম্পিক দৌড়বীরকে খাওয়ালে স্বর্ণপদক পেয়ে যাবেন। তাঁকে শুধু করতে হবে কি, জিভ বের করে ছুটতে হবে। সমানে টসটস করে লালা ঝরছে আর তিনি ছুটছেন, একশো মিটার, দুশো মিটার, আর মনে মনে বলছেন, 'মর গিয়া, মর গিয়া রে বাপ।'

অ্যানকে প্রশ্ন করলুম, 'এত সুস্বাদু, কিন্তু এমন প্রচণ্ড ঝাল দেবার কারণটা কী?

'একেই বলে জীবনবোধ। বাঁচার আনন্দে তুমি খাবে। তোমার শরীরে আগুন ছুটবে। তুমি ঘামবে। উদ্দাম নৃত্য করবে। গলা ছেড়ে গান গাইবে। সমুদ্রে ঝাঁপাবে। প্রেম করবে। এই খাদ্যের নাম হল এনার্জি প্যাক। চার্জড উইথ ইলেকট্রিসিটি। ম্যাগনেটিক। খাওয়ার পর মানুষের মানুষকে আকর্ষণ করতে ইচ্ছে করবে। আমার মনে হচ্ছে, তোমার গলা জড়িয়ে ধরে, বাইরের বাতাসে বসে কিছুক্ষণ হুসহাস করি। তোমার সে রকম কোনও ইচ্ছে করছে কি?'

'করছে। সেই সঙ্গে ড্রাম পিটিয়ে গাইতে ইচ্ছে করছে, দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।'

'আমার কি ইচ্ছে করছে জানো, ইফেল টাওয়ারের মাথায় উঠে নিচের দিকে জিভ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। সব ঝাল টসটস করে ঝরে যাক।'

আমি একের চার ভাগ খেয়ে চোখ ছানাবড়া করে বসে আছি। অ্যান খেয়েছে আধ ভাগ। দু'জনেই বেশ সমস্যায় পড়ে গেছি। রাত দেড়টার সময় পেটের ভেতর অগ্নিকাণ্ড ঘটানো কি ঠিক হবে! এইসব যখন ভাবছি, তখন সেই তরুণটি এগিয়ে এল। অ্যাপ্রন আর গ্লাভস খুলে ফেলেছে। হাসিমুখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'জিনিসটা কেমন হয়েছে?'

আমরা দু'জনে সমস্বরে বললাম, 'অসাধারণ, অসাধারণ।'

তরুণটি আমাদের থেকে কিছু দূরে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বেশ বিপদে পড়ে গেলুম। আর উপায় নেই, আমাদের এখন সবটাই খেতে হবে। অসাধারণ বলার পর তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। অ্যান আমার দিকে তাকাচ্ছে, আমি অ্যানের দিকে, আর একটু একটু মুখে পুরছি। এক সময় ঝাল সয়ে গেল; তখন প্রকৃত স্বাদটা ফুটে উঠল। তখন মনে হল রান্নাটা শিখে নি। দেশে ফিরে একটু কম ঝাল দিয়ে রেঁধে পরিবেশন করলে সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবে। তারপর মনে হল, কোথায় পাবো এমন লকলকে টাটকা চিংড়ি। কোথায় পাব দপ্ করে জ্বলে ওঠা বিলিতি মদ।

তরুণটির হাতে একটা ছোট্ট বাক্স। সুদৃশ্য। নাড়াচাড়া করছে আর আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আতিথেয়তার এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে না অন্য কোনও দেশে। বাক্সটা কী, তা জানার জন্য মনটা বড় উতলা হচ্ছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেললুম, 'ওটা কী ভাই?'

তরুণটি বললে, 'দেশলাই।'

ভারি বুঝদার ছেলে। দেশলাই শুনে আমার চোখে মনে হয় লোভ ঝলসে উঠেছিল; কারণ নানা ধরনের দেশলাই সংগ্রহ করা অনেকের হবি। সে দেশলাইটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আপনি নেবেন?'

মাছ যেভাবে লোভনীয় টোপ গেলে, আমি সেইভাবে খপ করে তার হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে নিলুম। জিনিসটা খুবই সামান্য, আমার কাছে অসামান্য। পাগল করে দেবার মতো রূপ। যে জিনিস জ্বলেপুড়ে যাবে, তার পেছনেও নির্মাতারা কত যত্ন ঢেলেছেন। আমাদের দেশের সব জিনিসই আধাখেঁচড়া। কোনও রকমে কাজ চলা গোছের একটা কিছু বাজারে ছেড়ে দিলেই হল। বাক্সটা পাতলা। হলুদ রঙের। এ পিঠে একটা গোল ছবি, ও পিঠে একটা আয়ত ছবি। গোল ছবিটার পেছনে নীল আকাশ। ছবিটা ভেনাসের তার মাথার ওপর অর্ধচন্দ্রাকারে লেখা, ১৮৮৫-১৯৮৫। বুঝতে পারা গেল না, এই একশো বছর ভেনাসের বয়স না দেশলাই প্রস্তুতকারক সংস্থা, লুসেস মার্কাসের বয়স। ঠিকানা ১নং প্রিয়া দ্য ইন্দাস্ত্রিয়া কোমার্সিয়ো। অপরের পিঠের আয়তাকারের ছবিটি হল একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য। শিল্পী জোর্জে সাজারেস কাম্পোস ১৯৩৭ সালে এঁকেছিলেন অনবদ্য একটি রঙিন ছবি। মেক্সিকোর ভূপ্রকৃতি। দেশলাইটির নাম 'ক্লাসিকোস' দ্য লুজো। ভেতরে ১০০টি সুদৃশ্য কাঠি। মোম মাখানো কাগজে তৈরি। সমান মাপের বারুদ লাগানো। সাদা কাঠির মাথায় টুকটুকে গোলাপী বারুদ। অমন শোভন কাঠি জ্বালাতেও মায়া হবে। আবার মাথার দিকের ফ্ল্যাপে লেখা কোম্পানিয়া সেরিলেরা, লা সেন্ট্রাল এস এ। কোনটা যে কোম্পানির নাম বোঝা কঠিন।

অ্যান বললে, 'ভাল লেগেছে পকেটে পুরে ফেলো, একটা দেশলাই নিয়ে অত গবেষণা ভাল লাগে না।'

দাম মিটিয়ে তরুণটির সঙ্গে করমর্দন করে আমরা বেরিয়ে এলুম। দেশলাইয়ের দাম কিছুতেই নিল না। অন্ধকারে নির্জন মার্কেট প্লেসে আমরা ভূতের মতো অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালুম অলিতে গলিতে। ফ্লোরেন্সের দোকানের সামনে দাঁড়ালুম। আলো জ্বলছে। নিখুঁত করে সাজানো লোভনীয় সব জিনিসপত্র। মিস্টার স্যাভার্সের টেবিলে টাইপরাইটার যেন ঘুমন্ত শিশু। ফ্লোরেন্সের ক্যাশকাউন্টারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্লোরেন্সের বদলে কাঠের একটি মূর্তি। বল্লমধারী এক স্প্যানিশ সৈনিক।

দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা বললুম, 'মা বিদায়, কাল সকালে আমরা চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না কোনদিন। মা, বিদায়।' বলার পর মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমরা তেমন বড়লোক নই, স্মাগলার নই, ড্রাগ ট্র্যাফিকার নই, রাষ্ট্রনায়ক নই, দূর কোন অজানা দেশে হালভাঙা নাবিকের মতো হঠাৎ এসে পড়ি ভাগ্যের বাতাসে। ওই একবার। জীবনে একটি বার স্মৃতি সঞ্চয় করে ফিরে যাই। এরপর জীবনের দিন যখন শেষ হয়ে আসে, তখন মৃত্যুর নির্জন শয্যায় শুয়ে দেখি, কবে কোন দূর অতীতে বসেছিলুম কোন সমুদ্রের ধারে। তখন আমার পাশে কারা ছিলেন। মনে পড়বে আকাশের গায়ে আটকে থাকা সেই আগ্নেয়গিরির কথা, দিনের বিভিন্ন সময়েই যার রঙ পাল্টাত। সেই বহুতল হোটেল, দোকান, রাজপথ, নদী, ঝরণা, প্রান্তর। এমনও হতে পারে, মৃত্যুর পরেই আমার আত্মা একবার করে ঘুরে যাবে এইসব প্রিয় জায়গা। কেউ দেখতে পাবে না। কারণ তখন আমার কোনও দেহ থাকবে না। একটি অনাথ শিশুকে একবার দেখেছিলুম। রাজপথের একটি পাশে প্রায়ান্ধকারে দেয়ালে পিঠ রেখে, দু'হাতে হাঁটু দুটি জড়িয়ে চুপ করে বসেছিল। দু চোখ ভরা বিস্ময়। সে কারোর নয়। পৃথিবী তার কথা ভাবে না অথচ সকলেই তার। তার মন, তার বিস্ময় সকলকে ঘিরে। গাড়ি ছুটছে, বড় বড় বাড়িতে জ্বলে উঠছে আলো। কত লোক, কত শব্দ, কত রঙ। সিনেমার হোর্ডিং। কেউ তাকে দেখছে না, সে দেখছে সকলকে। আমার আত্মাও ওই অনাথ শিশুটির মতো জায়গায় জায়গায় কিছু সময় বসে থেকে চিরবিদায় নেবে। সব মনেই একটা বেদনা থাকে, বিষণ্ণতা থাকে। একদিন না একদিন চলে যাবার বার্তাটা রক্ত বহন করে বলেই এমনটি হয়।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে কখন চলে এসেছি বাজারের বাইরে। সেখানে এক সার একতলা বাড়ি পাশাপাশি। এখানেও দেখি রাত নামেনি। জানালায় আলো। দুলছে পর্দা। দরজার ধাপে তিনটি মেয়ে

বসে আছে। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে। পেছন থেকে আলো এসে পড়েছে। তিনজন স্প্যানিশ কুমাবী। তিন সখী। অলস ভঙ্গিতে বসে আছে। পেছনে ঘবেব অংশ। আমাদেব দেশের মতোই খাট, বিছানাব চাদব, চেযাব, শিশুব দোলনা। মেয়ে তিনটিব পাযেব কাছে হাত-পা ছড়িয়ে মহা আবামে শুযে আছে সাদা ধবধবে একটি কুকুব।

হঠাৎ আমাব কী হল জানি না, সেই মেয়ে তিনটিব পাশ দিযে যেতে যেতে বিশুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস কবলুম, 'কি ঘুমোতে যাবে না।'

মেযে তিনটি কী বুঝলো জানি না, হাত তুলে চোখ বুজিযে কেমন যেন একটা ঘুমোতে যাবাব ভঙ্গি কবলো। স্প্যানিশ ভাষায কী একটা বলে হেসে উঠল খিলখিল কবে। ততক্ষণে আমবা এগিয়ে গেছি।

অ্যান বলল, 'কী জিজ্ঞেস কবলে তুমি?'

'আগে বলো ওবা কী বললে?'

'বললে একটু পবে। তুমি কী বলেছিলে, যে ওবা একটু পবে বলল।'

'তোমবা ঘুমোবে না?'

আমি আশ্চর্য হযে গেলুম, ভাব, ভাষা ছাড়াই মানুষকে স্পর্শ কবতে পাবে? প্রশ্ন যদি আন্তবিক হয তাহলে আত্মাব মতো, তা আব ভাষাব শব্দেব অধীন থাকে না। ভাষাহীন ভাষা আন্তর্জাতিক হযে দাঁড়ায।

৫৮

সাবা বাত ধবে আমাদেব গোছগাছ চলল। প্রতিদিন এটা ওটা নানা জিনিস কেনা হযেছে। আমবা দু'জনেই দুটো নবম ব্যাগ কিনেছি। গাযে বড বড কবে লেখা ইনসতাফা। একপাশে ছোট হবফ জিহুযাতানেজো। মেকসিকোব মাযা সভ্যতাব কাবিগববা কাচ তৈবি কবতে জানত। সিবামিকস এব কাজও তাবা শিখেছিল। কাঁচে বঙ আনা খুব সহজ বিদ্যা নয একসময ভাবতবর্ষে বেলজিযাম থেকে কাঁচেব জিনিস আসত। বেলজিযাম গ্লাস, ইতালিযান মার্বল ফ্রেঞ্চ পার্ফিউম বলতে ভাবতীযবা অজ্ঞান হযে যেতেন। অথচ ঢেব আগে মাযা মেকসিকোয বাঙালি কাচেব যে সব জিনিস তৈবি হযেছিল, দেখলে চক্ষু স্থিব। বিজ্ঞান তাঁবা ভালই বপ্ত কবছিলেন। মাযা সভ্যতাব নানা প্রতীকেব জটিল ছাঁচে ফেলে কাঁচ আব চীনামাটিব নানা জিনিস তৈবিব পবিপাটি অবাক বিস্মযে দেখাব মতো। সেই ট্র্যাডিশান আজও চলে আসছে। *মবা গাঢ নীল আব লাল বঙেব কানা উঁচু, চ্যাটালো কিছু ডিশ কিনেছি। দেখাব মতো। ধাবটা ঢেউ খেলানো। ডিজাইন হল সূর্য। একেবাবে ঝকঝক কবছে। নিখুঁত স্বচ্ছ। ভেতবে কোথাও একটা বাতাসেব বুদবুদ নেই।

মাযাদেব সেবামিকস নিযে আবাব নতুনভাবে গবেষণা হচ্ছে। গবেষণাব কাছে মানুষেব আস্তাকুড়েবও কত বড ভূমিকা। দিনেব পব দিন, বছবেব পব বছব একটা জাযগায আবর্জনা ফেলা হয। তাবপব একদিন হঠাৎ সভ্যতা কোল্যাপস কবল। আবর্জনাব স্তূপ চাপা পড়ে গেল ধ্বংসাবশেষেব তলায। তাব ওপব দিযে বযে গেল কালপ্রবাহ গর্জিযে উঠল মহাবণ্য। তাবপব যুদ্ধবিগ্রহ শেষে যখন নতুন সভ্যতা স্থিত হল, তখন বেবিযে এলেন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেব দল, চোখে অতীতেব পবকলা লাগিযে। শুরু হয খনন কার্য। তখন ওই সব আবর্জনা আব আবর্জনা নয। ইতিহাসেব ভাষা। ওপব থেকে নিচে, কালপ্রবাহেব স্তব। কার্বন ডেটিং-এব সাহায্যে সঠিক সময নির্ধাবণ এখন সম্ভব। খ্রীস্টেব জন্মেব হাজাব বছব আগে শুরু কবে ১৭৭১ পর্যন্ত প্রাপ্ত সেবামিক খণ্ডেব শ্রেণীবিন্যাস কবেছেন পণ্ডিতবা—ম্যামন সেবামিক, চিকানেল, তযাকোল, তেপিউ পাক, মেকসিকানা ফাইন অবেঞ্জ পোবসিলেন, প্লাম্বানতে মেটালাইজড বোজা বাস্তা। মেকসিক্যান শিল্পীবা চাক ব্যবহাব কবতেন না। সেইটাই এক আশ্চর্যেব ব্যাপাব। কুম্ভকাবেব চাক বা পটাবস হুইল আব গাড়িব চাকা, এই দুটি জিনিস হয়ে উঠেছিল সভ্যতাব আদি হাতিযাব। মাযা সভ্যতাব মানুষ এই দুটিকেই কেন পবিহাব

করেছিলেন? এই প্রশ্নের সমাধান আজও খোঁজা হচ্ছে। চাকের বদলে শিল্পীরা ব্যবহার করতেন 'কাবাল'। 'কাবাল' মানে কাঠের সিলিন্ডার। শিল্পীরা উঁচু আসনে বসে, সিলিন্ডারটাকে সমতল একটা পাটাতনে রেখে পা দিয়ে ঘোরাতেন। পায়ের নিয়ন্ত্রণেই বেরিয়ে আসত নানা আকৃতি। য়ুকাতান, তার মানে আমরা এখন যেখানে আছি সেখানকার শিল্পীরা ব্যবহার করতেন কাঠের চাকা। মাঝে একটা গর্ত। গর্তঅলা চাকাটাকে কাঠের গোঁজের ওপর অথবা পেরেকের ওপর বসিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁরা কাজ করতেন।

যে যেভাবেই কাজ করুন, মাটি খুঁজে যে সব নিদর্শন তোলা হয়েছে, তা দেখে একালের পণ্ডিতরা বিস্মিত। সেই সময়কার বিদ্যা, কারিগরিজ্ঞান, শিল্পজ্ঞান তাহলে কোন শিখরে উঠেছিল। শুধুমাত্র হাত, পা, আর কাঠের সিলিন্ডার দিয়ে কি কাণ্ডই না করে গেছেন সেকালের গুণী মানুষরা। আমরা ভাবি, আমরাই বুঝি শ্রেষ্ঠ! তা নয়, সভ্যতা সর্বকালেই একটা শিখরে উঠে গড়িয়ে নেমে আসে, আবার পাশ থেকে আর একটা ওঠে। যা একবার পড়ে যায়, তার আর ওঠার সম্ভাবনা থাকে না। এইটাই হল ট্র্যাজেডি। আমরাও যখন পড়বো, তো একেবারেই পড়বো, পুনরভ্যুত্থানের আশা থাকবে না। তা না হলে ব্যাবিলন আবার উঠত। উঠত অ্যাজটেক মায়া।

মায়া সেরামিক নিদর্শন জাদুঘরে আছে। যারা সভ্যতা চূর্ণ করেছিল, তারাই আবার সেই সভ্যতার স্মৃতি পরমাদরে সাজিয়ে রেখেছে। মায়া সভ্যতার কেন্দ্র অঞ্চল থেকে তুলে আনা হয়েছে, পলিক্রোম সেরামিকস। কারুকার্য আর মান দেখলে অবাক হতে হয়। 'ফ্লোরেসেন্ট' পর্যায়ের বিস্ময়কর সংগ্রহে আছে 'পিজারা' দ্য য়ুকাতান, ইংরেজি করলে দাঁড়ায়, দি স্লেট অফ য়ুকাতান। মহামান্য মানুষরা সে যুগেও স্নান করতেন বাথটাবে। সেরামিকসের ফ্লোরেসেন্ট বা ভাস্বর পর্যায় শুরু হয়েছিল খ্রীস্টপূর্বাব্দ ৯৮৭-তে, শেষ হয়ে যায় ১১৯৪ অব্দে। সবচেয়ে বিকাশের দীর্ঘ একটি যুগ। ছাই আর কফি রঙের সেই নিদর্শনগুলি অবাক হয়ে দেখার মতো। ছাই রঙের ওপর আরও হাল্কা ছাই রঙের অসাধারণ কারুকার্য। কারুকার্য একটু মোটা আস্তরণে করা। তার ওপব পালিশ। রঙ ও রেখার এমন উচ্চ রুচির সমন্বয়ে ধরা আছে সে যুগের মানসিকতা। রিফাইনড টেস্ট। দেখেই অনুমান করাযায়, বেশ বড় ধরনের একটা শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, শিল্পী, বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে। রন্ধনপাত্রের আকৃতি ছিল ফুলদানির মতো। প্রতিটি পাত্রের তিনটি করে লম্বা পায়া। মায়া সভ্যতা বললেই একটা রহস্যের আভাস ফুটে ওঠে, তার ওপর এই ধরনের আকার, আকৃতি, রঙ ও কারুকার্য। দেখলে মনটা এমন এক বিস্ময়লোকে চলে যায়, রোদ, অদ্ভুত সব ধর্মীয় আচার আচরণ, পিরামিড মূর্তি, পাথরের ঘরবাড়ি, গুহা, মশালের আলো। গড়ানে কপাল, উঁচু, সামনে অল্প বাঁকা নাক ও চেরা চোখের মুখঅলা নর-নারী। যেন কাঠখোদাই। বেশ একটা ভয়ের ভাব হয়। মনে হয় বাস্তবে আর নেই, তলিয়ে যাচ্ছি রহস্যের অন্ধকারে।

আমরা আমাদের কাঁচের পাত্র, মূর্তি প্রভৃতি ভঙ্গুর জিনিস কাগজের কুঁচি আর নানারকম টুকরো টাকরা দিয়ে সযত্নে প্যাক করে আমাদের ব্যাগে ভরতে লাগলুম। রাত কত হল, ক'টা হল জানার দরকার নেই। এ-দেশে রাতে ঘুমোবার রেওয়াজ নেই। ঘরের এপাশে, ওপাশে, টুকরো টাকরা যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সব গুছিয়ে তুলে ফেলা হল। যতই সব গুটনো হচ্ছে, ততই যেন মন খারাপ হচ্ছে। আসর ভেঙে গেল।

রাত তিনটের সময় সমুদ্রের কাছে বিদায় নিতে গেলুম। সমুদ্রের সেই এক চেহারা। সমানে লম্ফ-ঝম্ফ করে চলেছে। ঠিক ওই মুহূর্তে, সমুদ্র সৈকত একটু ফাঁকা। কেউ আর এখন জলে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছেন না। ডাঙার দিকে বালির ওপর এক জোড়া তরুণ-তরুণী, জড়াজড়ি করে একটু অন্যভাবে শুয়ে আছে। ভারতীয় চোখে অস্বস্তিকর। পাশে অ্যান। পা চালিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যেতে চাইছিলুম।

অ্যান বললে, 'কি হল। পাগলের মতো ছুটছো কেন? ওরা শুয়ে আছে তো তোমার কি? তোমার ওদিকে চোখ যাচ্ছে কেন?'

'যাচ্ছে, এই কারণে, চারপাশ দেখতে বেরিয়েছি তো। ট্রেন ধরার জন্যে ছুটছি না।'

'বেশ, তা দেখো, যে চোখে সমুদ্র দেখছ, ঢেউ, হোটেল, বেলাভূমি, স্লিপিং বোট, ফ্লাডলাইট

দেখছ, সেই চোখে দেখ। প্রকৃতির অংশ।'

আমরা ধীরে ধীরে পেরিয়ে এলুম জায়গাটা। চকচকে বেলাভূমি ধরে আমরা হাঁটতে-হাঁটতে সমস্ত হোটেল সীমানা পেরিয়ে চলে এলুম যেখানে অন্ধকার। যেখানে সমুদ্রের ঢেউ ছবির নেগেটিভের মতো সাদা। জলেরও হাসি আছে। বিশাল, বিস্তৃত ঠোঁটে অসংখ্য দন্তপঙক্তি, বেলাভূমিকে হেসে হেসে, বারে বারে এসে এসে, ফেনার ফুল, নিবেদন করে যাচ্ছে।

অ্যান আমেরিকান মেয়ে, তার কোনও ভয়-ডর নেই। আমাব ভীষণ ভয় করছিল।

জলের বুকে ফসফরাস দুলছে। মাঝে মাঝে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। একই সঙ্গে যেন, ঢাক, কাড়নাকাড়া, কাঁসর, ঘন্টা বাজিয়ে আরতি হচ্ছে রুদ্রের। নিজেকে এই বিশালের সামনে এত ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। পোকার মতো। আমি কখনোই নিজেকে জাহিব করতে চাই না। অ্যানেব গায়ে গা লাগিয়ে পায়ে পায়ে যেন মৃত্যুর দিকে, অবলুপ্তির দিকেই এগিয়ে চলেছি। যে কোনও মুহূর্তে সুইশ করে বিশাল একটা ঢেউ এসে খড়কুটোর মতো আমাদেব ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

অ্যানকে বললুম, 'চলো অ্যান, এবার আমবা আলোয ফিবে যাই। ভীষণ ভয় কবছে আমার। জলের কাছে নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়।'

'সাঁতার জানো না?'

'জানি ভাই। গঙ্গা, মানে গ্যাঞ্জেস-এর ধাবে বাড়ি আমার। বর্ষার গঙ্গায় আমি সাঁতার কেটেছি। এই সমুদ্রে সেই বিদ্যা কোনও কাজে লাগবে না। তিনবাব দুলিযে টেনে নেবে ভেতরে।

'আমি সাঁতার জানি। তেমন হলে আমার কোমর জড়িয়ে ধোবো।'

'তুমি এই অন্ধকারে কোথায় যেতে চাও!'

'কোনও লক্ষ্য নেই। এগিয়ে গিয়ে দেখি না কি পাওয়া যায়।'

আমাদের দু'জনের মুখের ওপর হঠাৎ একটা আলো ঝলসে উঠল। একজন সৈনিক আমাদের সামনে। আমরা যেন ভূত দেখার মতো থমকে দাঁড়ালুম।

সৈনিক প্রশ্ন করলেন, 'যাচ্ছ কোথায়?'

অ্যান বললে, 'কোথাও না। বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছি।'

'আর এগিও না। ফিরে যাও।'

'কেন?'

'সামনেই প্রেসিডেন্টের ভিলা। এপাশের তটভূমি প্রোটেকটেড প্লেস।'

শুনে আমার ভীষণ আনন্দ হল। যাক বাবা, আব এগনো যাচ্ছে না! 'বাঁচা গেল।'

অ্যান বললে, 'এদিকে বেঁচে গেলে কি হবে, সমুদ্র তো ওদিকেও আছে।'

আবার শুরু হল আমাদের হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে, সমুদ্রেব ঢেউয়ের শব্দ শুনতে শুনতে আমরা এসে দাঁড়ালুম দুর্গের মতো বিশাল সৌধের সামনে।

'এটা আবার কি রে বাবা?'

অ্যান বললে, 'এটা হল ইকসতাফার সবচেয়ে বড হোটেল। হোটেল দেল সল। একটা স্প্যানিশ দুর্গকে এরা হোটেল করে ফেলেছে। কত উঁচু দেখেছো! আমার মনে হয়, এর ছাদে উঠলে আমরা পানামা যোজক দেখতে পাবো। এই হোটেল হল ভি আই পি-দের জন্যে। তোমার আমার জন্যে নয়।'

সমুদ্রের দিক থেকে আমরা হাঁ করে হোটেলটা দেখতে লাগলুম। সমুদ্রের দিকের অংশটা, মানে ভিতটাই হবে চার পাঁচ তলা উঁচু! তার ওপর জাহাজের ডেকের মতো রেলিং ঘেরা খোলা একটা অংশ। এদিক থেকে ওপরে ওঠার কোনও সিঁড়ি নেই। পুরো একশো বিশ বাইশ তলা হোটেলটা সেই খোলা অংশটার ওপর ঝুঁকে আছে। রেলিং ধরে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে এক প্রৌঢ় বড় বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। প্রায় তাল গাছের মতো লম্বা।'

অ্যান সেই প্রৌঢ়কে দেখিয়ে বললে, 'চিনতে পারছো?'

চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু স্মৃতিতে তেমন স্পষ্ট হচ্ছে না, 'কে বলো তো?'

'জন কেনেথ গলব্রেদ।'

'গলব্রেদ এখানে কি করছেন?'

'নিশ্চয় কোনও কনফারেনস আছে। ওই দেখ পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন কার্ল সাগান।'

'সাগান! বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও লেখক!'

'তাঁর পাশে মার্কিস।'

'নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত ঔপন্যাসিক!'

আমি হাঁ। ভারতে বসে যাঁদের লেখা পড়ে আমি মুগ্ধ তাঁরা আজ আমার মাথার ওপর। অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি।

আমরা সমুদ্রের দিক থেকে হোটেলের ভেতর যাবার পথ খুঁজতে লাগলুম। নিশ্চয় আছে। অনুসন্ধানে সেই পথ বেরলো অবশেষে। পথ বেরলো না, বেরিয়ে এলেন একদল সমুদ্রবিলাসী মানব-মানবী। আমরা সেই পথে ভেতরে প্রবেশ করলুম।

প্রায় যেন একটা নগর। দু'তিন বাহিনী সৈন্য হোটেলের নীচেটায় খেলা করে বেড়াতে পারে। নিরেট স্লেট পাথরের দেয়াল ওপরে উঠে গেছে। বহু উঁচুতে ছাদ। সমুদ্রের দিকে ডেক মতো রেলিং ঘেরা জায়গাটায় বসার ব্যবস্থা। ওপাশে একটা রেস্তোরাঁ, কফিবার। হোটেল লবিটা এত বড় যে কাউন্টারটা যেন হারিয়ে গেছে। রিসেপসানিস্টদের মনে হচ্ছে পুতুল।

এই হোটেলে যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রাণোচ্ছল তরুণ তরুণীর সংখ্যা খুবই কম। হোটেলটা প্রবীণদের। ভারিক্কি চালের মানুষদের। ডেকের মতো জায়গাটায় সব সেজেগুজে, চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সবাই স্থির হয়ে বসে আছেন, সূর্য উঠছে।

হোটেলের তলাটা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলুম। সলিড স্টোন ওয়াল। কোথাও কোনও ছবি নেই। ডেকরেশান নেই। ইচ্ছে করে এইরকম করে রাখা হয়েছে যাতে আকার আকৃতি, কালো পাথরের শীতলতা, সব কিছু মিলিয়ে মানুষের মনে একটা ত্রাসের ভাব আনতে পারে। ঢোকামাত্রই যে মনে হয় হোটেল আমাকে গিলে খেয়ে ফেলেছে। নিচে রিসেপসান, লবি ও রেস্তোরাঁ ছাড়া আর কিছু নেই। আর আছে এদিকে ওদিকে যাবার চওড়া চওড়া অসংখ্য করিডর। কোনটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে বোঝার উপায় নেই। ইচ্ছা করে এমন এক ধাঁধা তৈরি করা হয়েছে, যাতে মানুষ ভয় পায়, অসহায় বোধ করে। ওপরে ওঠার কোনও সিঁড়ি চোখে পড়ল না। কেবল ভারি ভারি লিফট। উঠছে নামছে। মাথার ওপর আলোর অক্ষরে সংখ্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। দেয়ালে দেয়ালে টেলিফোন ঝুলছে। করিডরের এক একটা বাক ঘুরলে আচমকা এক এক ধরনের বিস্ময়। একই দেয়ালের এপিঠে, ওপিঠে দুরকম আয়োজন। এপিঠে নীল ইউনিফর্ম পরা মেকানিকদের জটলা। ওপিঠে ধবধবে সাদা পোশাকে একদল মহিলাকর্মী। হোটেলের প্ল্যান যিনি করেছিলেন, তিনি নিশ্চয় চীন-ঘোরা আর্কিটেক্ট, তা না হলে এমন চাইনিজ পাজল তৈরি করা অসম্ভব।

আমরা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বেরিয়ে এলুম হোটেল নেল সন নামক এক রাক্ষসীর গর্ভ থেকে। বেরিয়ে আসার পর বুঝতে পারলুম, হোটেলটা বসে আছে একটা টিলার ওপর, সেই কারণে সমুদ্রের ধারটা অত উঁচু। পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে ঢালু পথ। আমরা পাহাড়ের দেয়াল ভেদ করা সেই পথে নেমে এলুম রাজপথে। রাজপথ ধরে হাঁটতে শুরু করলুম বাঁদিকে। ওই দিকেই আমাদের হোটেল। বিভিন্ন মডেলের ফোর্ড গাড়ি হুসহাস ছুটছে। এই দিকে গাড়ির সংখ্যা বেশি।

হোটেলের দেনা পাওনা চুকিয়ে, সামান্য কিছু খেয়ে আমরা আমাদের সমুদ্রের নিবাস ইকসতাফাকে চির বিদায় জানিয়ে চললুম, এয়ারপোর্টের দিকে। ঠিক হয়েছে, এখান থেকে আমরা যাবো মেরিডা। 'হোয়াইট সিটি মেরিডা'।

মেরিডা। প্লেন থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে একেবারে মোহিত। সত্যিই হোয়াইট সিটি। প্লেন যত নিচে নামছে, শ্বেত শুভ্র একটি ছবি ক্রমশই ওপর দিকে উঠে আসছে। সাদা চুড়া, গম্বুজ ডোম। সব সাদা। পরিষ্কার রাজপথ, পরিচ্ছন্ন গৃহ, সবুজ বাগান। শত শত বছরের একটা ইতিহাসের মাথার ওপর চক্কর মারছে আমাদের পুষ্পক রথ।

বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক; তবে খুব একটা বড় নয়। সারা বছর টুরিস্টরাই আসে। বিমানবন্দর দিয়ে মাল চলাচল করে না। আরও একুশটি এয়ার ফিল্ড এই য়ুকাতান পেনিনসুলায় রয়েছে। মেরিডা য়ুকাতান প্রদেশেরই সুন্দর শহর। প্রাচীন শহর। য়ুকাতানে রয়েছে একটি গভীর জলের বন্দর। আর রয়েছে দশটি অগভীর বন্দর। অন্তর্দেশীয় মাল চলাচল ও যোগাযোগের জন্যে জলপথই ব্যবহৃত হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে পড়ে আছে গালফ্ অফ মেকসিকো। মেকসিকো উপসাগর। পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বে আর একটি প্রদেশ কুইনতানারু। দক্ষিণ-পশ্চিমে কামপেচে। য়ুকাতানের সবচেয়ে বড় শহর হল মেরিডা। মেকসিকো উপসাগর থেকে ক্যারিবিয়ান পর্যন্ত প্রশস্ত এই অঞ্চলটিকে বলা হয় ল্যান্ড অফ গডস। এখানে ভগবানের বসবাস। এই পবিত্র ভূমিতেই ছিল মায়াদের বড় বড় শহর। সেই সব শহরে পূজিত হতেন বৃষ্টির দেবতা। মন্দিরে মন্দিরে, বিশাল বিশাল উপাসনা কেন্দ্রে দেওয়া হত নরবলি। মায়াদের মানমন্দিরে চলত জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা। অতিজাগতিক রহস্যের সমাধানে কেটে যেত মায়া পুরোহিতদের রাত।

মায়ারা এই য়ুকাতনকে বলতেন, কানট্রি অফ দি টার্কি অ্যান্ড দি ডিয়ার'-বড় জাতের মুরগী আর হরিণের দেশ। ল্যান্ড অফ মিল্ক অ্যান্ড হানি। দুধ আর মধুর ধারা বইতো ভাল চাষবাস হত। প্রচুর শক্তিশালী জন্তু জানোয়ার ছিল, ছিল বহুবর্ণের পাখি। এখন কি আছে দেখা যাক। ইতিমধ্যে পাঁচ ছশো বছর গড়িয়ে চলে গেছে কালপ্রবাহে।

য়ুকাতান নামটির উৎপত্তি ভুল বোঝাবুঝি থেকে। প্রথম যে স্প্যানিশ কনকুইস্তাদর য়ুকাতানের তটভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি কৌতূহলী হয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করলেন, জায়গাটির নাম কি। মায়ারা স্প্যানিশ ভাষার কি বুঝবেন! তাঁরা তাঁদের ভাষায় বললেন, সি-উ-থান। তার অর্থ আমরা কেউ কারোর ভাষা বুঝছি না। বিদেশী ভাবলেন, ওইটাই বুঝি অঞ্চলটির নাম। সি উ-থান থেকে উকাতান। নতুন বিশ্বের ভৌগোলিক অভিধানে চিরতরে, ওই উত্তরটির অধিষ্ঠান হল নাম হিসেবে। সিউ থান, আমরা কেউ কারোকে বুঝি না য়ুকাতান।

পাঁচশো বছর পেছোবার আগে এয়ারপোর্টের ফর্ম্যালিটি সামলাই। ভিসা, পাসপোর্ট, ব্যাগের নাড়ি-ভুঁড়ি পরীক্ষা। ভারি শান্ত বিমানবন্দর। ঝকঝকে তকতকে। খুব অল্পেই আমরা ছাড়া পেয়ে গেলুম। বিমান বন্দরের বাইরে পরিষ্কার চওড়া রাজপথ। কোথায় কোনদিকে চলে গেছে এই মুহূর্তে বোঝা না গেলেও, অবিলম্বে পাওয়া যাবে। আমরা একটা ট্যাকসিতে চেপে বসেছি। কলকাতার ঝলঝলে, খলখলে গাড়ি নয়। নতুন আমেরিকান গাড়ি। স্টার্ট নেবার সময় পেছনের যে আসনে আমরা বসে আছি, তার তলায় খুস রে একটা শব্দ। সারাক্ষণ আর কোনও শব্দ নেই। ইঞ্জিন চলছে কি চলছে না বোঝার উপায় নেই। মসৃণ পথ, মসৃণ গাড়ি, ছাঁকা বাতাস, প্রতি মুহূর্তে পরমায়ু বেড়ে চলেছে। গাড়ির চালকের পোশাক শ্বেত শুভ্র। কাঁধের ওপর জামার আরও দুটি কলার। সেই কলারে সূক্ষ্ম সোনালি বর্ডার। শোভা এমন খুলেছে, চোখ ফেরানো যায় না।

চোখ ফেরাতেই হল। দু'পাশে পথের দৃশ্য অতুলনীয়। অনেক শহর দেখেছি এমন শহর একমাত্র স্বপ্নেই হয়তো দেখা যায়। অ্যান বললে, 'দু নয়ন ভরে দেখে নাও খোকা। স্পেনে না গিয়েও স্পেন। এ তোমার নরখাদক মেগাপোলিস নয়। এই একবারই এলে। জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসা হবে না। মায়া শহরের ওপর এই মেরিডা। পৃথিবীর একপাশে পড়ে আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও তেমন ভাল নয়।'

কান দুটো অ্যানের দিকে, চোখ দুটো পথের দিকে। সিমেন্ট বাঁধানো রাজপথ এত পরিষ্কার যে, যে-কোনও জায়গায় তাকিয়া মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়া যায়। প্রশস্ত ফুটপাত ততোধিক সুন্দর। প্রাসাদের পর প্রাসাদ। মাঝে মাঝে বাগান ঘেরা ভিলা। সাদা, সোনালি আর ফিকে নীল ছাড়া কোনও রঙ নেই। মায়া স্থাপত্যের দিকে নজর রেখে শহরটি সযত্নে তৈরি পাঁচশো বছর আগে। মায়া স্থপতিরা গ্রিলের ব্যবহার জানতেন না। নিউওয়ারলডে গ্রিল এনেছিলেন স্প্যানিশরা। মেরিডাতে গ্রিল দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ঢালাই গ্রিল কত ভাবে, কত ডিজাইনে করা যায়। ফেনসিং-এ একরকম, জানালায় একরকম, বারান্দায় আর একরকম। নিখুঁত সাদা রঙ।

মানুষের কল্পনা থাকলে সিটি প্ল্যানিং-এ কত রকম মজা করা যায়। পথ, মাঝে মাঝেই পথ

হারিয়ে এক একটা গোল চত্বরে ঢুকে পড়েছে। সে বেশ মজা। ট্রাফিক আইল্যান্ড নয়, গোটাটাই একটা আইল্যান্ড। চারপাশে গাছ। ধারে ধারে বসার জায়গা। মাঝখানে ফোয়ারা। হিস হিস করে মিহি চিনির মতো জল ছুঁড়ছে। গাড়ি বাঁদিকের বৃত্ত ধরে আবার সরল পথে গিয়ে উঠছে। এমনটি আমি আর কোথাও দেখিনি। সেই কথায় আছে টিকিটের দাম উঠে গেল। মেরিডা দেখে আমার জীবন সার্থক।

অ্যান বললে, 'এখনও তো কিছুই দেখনি। শুধু একটা রাজপথের দু' ধারের দৃশ্য।'

গাড়ি এসে দাঁড়াল হোটেল হলিডে-ইন-এর সামনে। হোটেলের সম্মুখভাগে একটি স্কোয়ার। হোটেলের সব ক'টা জানালা সেই দিকে তাকিয়ে আছে। হোটেলটা মাথায় বড় নয়। পাশে বড়। প্রতিটি ঘরের লাগোয়া একটি করে ছোট্ট ঝুল বারান্দা। হোটেলটা হাঁসের পালকের মতো সাদা। জানালায় জানালায় সাদা পর্দা। স্প্যানিশ রুচি যে এত ভালো, আমার জানা ছিল না।

হলিডে-ইন আগের হোটেলগুলোর মতো রাক্ষুসে নয়। ভারি সুন্দর মেয়েলি একটি শ্রী আছে কর্মীরাও সব মহিলা। নিচের তলায় রিসেপসান আর রেস্তোরাঁ ছাড়া সবই দোকান। সুন্দর সুন্দর দোকান। আকাশ মেঘলা আমরা আসার আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এদেশে মেঘের চেহারাও নরম। ছেঁড়া পালকের মতো সারা আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। যে দেশে এত লড়াই এত বিপ্লব, সভ্যতার উত্থান-পতন, সে দেশে এত নরম স্বপ্ন জমা হল কি করে!

রিসেপসানের মহিলাদের সাদা পোশাক। তার ওপর কে ছুঁড়ে মেরেছে এক মুঠো নীল ফুল। চেহারা দেখে মনে হল, পিওর স্প্যানিশ ব্লাড। স্প্যানিশ মেয়েরা খুব সুন্দর। আমরা ঘর পেলুম দোতলায়।

শহরটাকে না দেখা পর্যন্ত শান্তি নেই। ঘরে মালপত্র রাখতে রাখতে বলেছি 'চান করে নিলে কেমন হয়।' অ্যান চটে গেল, 'তোমার কেবল চান আর চান। আগের জন্মে কি সিন্ধুঘোটক ছিলে!'

আমি বললুম, 'থাক, থাক চান আর করব না।'

'চান করতে হবে না, দয়া করে দাড়িটা কামিয়ে এসো। মুখটা যেন কদমফুলের মতো দেখাচ্ছে।'

'ভাগ্যিস হনুমান বলোনি?'

'সে তোমার মা বলবেন।'

'আপাতত আমি অরফ্যান। মা, বাবা দুজ'নেই গত।'

অ্যান আমার পিঠে হাত রেখে বললে, 'আই অ্যাম সরি। তোমাদের দেশে তো পরিবার অটুট থাকে, আর জয়েন্ট ফ্যামিলি। আমাদের দেশে সবই সিঙ্গল ফ্যামিলি, তাও আবার তিন চার বার ভাঙাভাঙি হয়। ডিভোর্সের পর ডিভোর্স। মা থাকে তো বাবা যায়, বাবা থাকে তো মা যায়। আর ছেলেমেয়েরা ভেসে বেড়ায়।'

'অ্যান তুমি মনের দিক থেকে সেন্ট পার্সেন্ট ভারতীয়।'

'হতে পারে। ভারত সম্পর্কে আমার ভীষণ কৌতূহল। ভারতীয়রা ভালোবাসতে জানে, ভালোবাসা নিতে জানে। আমাদের সমাজে দেহটা এত প্রবল, পাগল করে মারে। তোমাদের ধর্মটাও খুব সুন্দর। তুমি ভোরবেলা এক মনে ওটা কি ঘোরাও?'

'রুদ্রাক্ষের মালা। জপ করি। আমি দীক্ষিত।'

'রুদ্রাক্ষ কি?'

'এক রকমের ফল। সেই শুকনো ফল গেঁথে তৈরি জপের মালা। হাতে নেওয়া মাত্রই তোমার চোখে ভেসে উঠবে তুষার শুভ্র হিমালয়। পর্বতগুহা। সাধু সন্ন্যাসী। মনে জাগবে, ত্যাগ, বৈরাগ্য। আসবে শান্তির ভাব। মালার অনেক পাওয়ার। নিমেষে তোমার সেলফ বদলে যাবে। তারপর জপ করতে করতে স্থায়ীভাবে তোমার সবকিছু পাল্টে যাবে। সুরক্ষিত চিত্ত সুখ প্রদান করে। আমাদের এই স্থূল শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর। ঐ সূক্ষ্ম শরীরের নাম মন। আর তোমার জপ ও ধ্যান ওই চঞ্চল মনকে স্থির করে। লক্ষ্য করে দেখ, মন আর মাছি প্রায় এক জিনিস। স্থির হয়ে কোথাও এক 'ভাবে বসতে পারে না। অনবরত ভ্যান ভ্যান করছে। মনের গভীরে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে এক বা একাধিক অসৎ চিন্তা, একটা আর একটার ঘাড়ে চেপে বসে আছে। সব ক'টাই

সমান শক্তিশালী। অথচ মনকে স্থির করতে না পারলে শান্তি নেই।'

'পিস অ্যান্ড ব্লিস।'

'ইয়েস পিস অ্যান্ড ব্লিস। মন স্থির করতে হলে চিন্তার ওপর সতর্ক নজর রাখতে হবে। তুমি বাণ দেখেছ? অ্যারো?'

'দেখেছি।'

'বৌদ্ধধর্মে ওই বাণের উপমা দিয়ে সুন্দর একটি পথনির্দেশ আছে। বাণ যে তৈরি করে সে সোজা করেই করে। বাঁকা করে করে না। সেই রকম বুদ্ধিমান ব্যক্তি, চঞ্চল চিত্তকে সরল করেন। নিজের বশে আনার চেষ্টা করেন। জপ আর ধ্যান সেই কাজ সহজ করে।'

'ধ্যান হল মেডিটেশন। জপ কাকে বলে?'

'জপ হল, অনবরত, নন স্টপ একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে চলা। হাজার বার, লক্ষ বার।'

'কি মন্ত্র?'

'দীক্ষিত হলে, দীক্ষার সময় গুরু কানে কানে মন্ত্রটি বলে দেন।'

'ধরো, আমি যদি জপ করতে চাই।'

'তুমি এক মনে ওঙ্কার জপ করে যাও। অউম, ওম।'

'আর ধ্যান?'

'ওই ওঙ্কারের ধ্যান করো। চোখ বুজিয়ে দুই ভুরুর মাঝখানে অক্ষরটিকে দেখ আর অবিরত জপ করে যাও।' অ্যান হাত পা ছড়িয়ে আরাম কেদারায় বসে রইল। সামনে খোলা জানালা। বাইরে ফিকে নীল আকাশ। সুন্দর একটি শহরের ছবি। অতীতের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা থাকেই। মায়া সভ্যতা সম্পর্কে একটা কৌতূহল একটা সমীহের ভাব শুধু আমার নয়, যাঁরা ইতিহাস চর্চা করেন, তাঁদের সকলেরই আছে। যখনই জানালার বাইরে তাকাচ্ছি, ঘর, বাড়ি, গৃহচূড়া দেখছি, চার্চ দেখছি, তখনই মনে হচ্ছে, এ কোনও সাধারণ শহর নয়। এর তলায় আছে মায়া-সভ্যতা। ছশো বছর আগে এই জানালায় দাঁড়ালে দেখতে পেতুম পথ ধরে চলেছে কোনও ধর্মীয় মিছিল। উজ্জ্বল পোশাকে চলেছেন মায়া পুরোহিত। মায়া মানবের মুখ ও শরীরে গঠনে এমন কিছু আছে যা দেখলে মনে একটা রহস্যের ভাব, ভয়ের ভাব হয়। কাপালিক দেখলে যেমন হয়, যেমন তিব্বতীয় কোনও লামাকে দেখলে। এক সঙ্গে অনেক ছবি ফুটে ওঠে—গভীর রাত, গুহা, সাঁ সাঁ বাতাস, হোমকুণ্ড, আগুন, আগুনের ফুলকি। বিচিত্র ভাষায় গম্ভীর গলায় মন্ত্রোচ্চারণ। বিচিত্র কোনও মূর্তি। নরবলি। মেকসিকো সিটি ছাড়া অন্য যে কোনও অঞ্চলে গেলেই মনে হয়, সমস্ত কিছু আচ্ছন্ন করে বিছানো রয়েছে, রহস্যের একটি অঞ্চল। হালকা কুয়াশার মতো বাতাসে কাঁপছে একটা 'স্পেল'। একটু আগে অ্যান বলছিল, কনক্যুইস্তাদররা যুকাতান প্রদেশের মেরিডায় এসে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অজ্ঞাত কোনও কারণে সাজানো শহর ছেড়ে সবাই পলাতক। কেউ কোথাও নেই। মার্কেটপ্লেস, কমিউনিটি-সেন্টার, সিটি-সেন্টার, পিরামিড, ভজনালয়, ভোজনালয়, প্রাসাদ, গৃহ, সব পড়ে আছে। খাঁ খাঁ করছে। চারপাশ থেকে এগিয়ে আসছে অরণ্য। বহু ইমারত চাপা পড়ে গেছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে। বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের মতো ঋজু, সরল পথের ফাটলে ফাটলে ঠেলে উঠেছে আগাছা। হঠাৎ বন্দুকের শব্দ হলে গাছ থেকে যেমন সব পাখি বাসা ছেড়ে উড়ে পালায়, সেইরকম হঠাৎ বড় রকমের এমন একটা কিছু ঘটেছিল। যার ফলে সব কিছু ফেলে রেখে অধিবাসীরা পালিয়েছিল, শহর ছেড়ে। সেই কারণটা কি! মায়া সভ্যতার পতনের সঠিক কারণটি এখনও জোর গলায় বলা যায় না, বলেই, সময়ের ওই পর্বটুকু শুধু ইতিহাস নয়, চাপা এক রহস্য। স্প্যানিয়ার্ডরা এসেই বুঝেছিল, পৃথিবীর এই দূর ভাঁজে দীর্ঘ সময় ধরে অসাধারণ একটা কিছু ঘটে গেছে। স্প্যানিয়ার্ডরা কত দূর বিস্মিত হয়েছিল, আমি কল্পনায় অনুমান করতে পারি।

ইকসতাফায় সেভিংসেট ফেলে এসেছি। বাঁচা গেছে, দাড়ি আর কামাতে হবে না। অ্যান বললে, 'তোমার লজ্জা করে না! এটা গোঁফ দাড়ির দেশ নয়। দেখছো না, প্রতিটি মানুষ ক্লিন শেভড্। চলো, সেভিংসেট কিনে আনি।' আমরা নেমে এলুম নিচে। রেস্তোরাঁতে দু'চারজন পান ভোজনে বসেছেন। আমরা কোনও দিকে না তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

হোটেলটি ঢ্যাঙা নয়; কিন্তু মোটা। পরিসরে বেশ বড়। মায়া আর্কিটেকচারের ধরনটা হল, আমাদের মহাভারতের মতো। মায়ারা কোর্ট ইয়র্ড বা অঙ্গন খুব পছন্দ করতেন। তার চারধার দিয়ে তুলে দিতেন ঘর। আমাদের হলিডে-ইন-এর নির্মাণ ছন্দটি প্রায় সেইরকম। সামনে পাথর বসানো ইয়ার্ড। পেছনে একটা বিশাল বাগান। নিচের সমস্ত দোকানের পেছন দিকে এই বাগানের সবুজ স্পর্শ।

আমরা একটা ওষুধের দোকানে ঢুকলুম। ছোট দোকান; কিন্তু ভারি পরিপাটি। এখানে ওষুধের দোকানে স্টেশনারি বিক্রি হয়। সেভিংসেট পাওয়া খুব কঠিন, কারণ, এদেশে ইলেকট্রিক রেজার। দোকানের মেয়েটি আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করছে স্প্যানিশ আর ভাঙা ইংরিজিতে, ইলেকট্রিক রেজারের মতো জিনিস হয় না, ইট ইজ জাস্ট লাইক এ মর্নিং ওয়াক। সকালে গালের ওপর দিয়ে একবার বেড়িয়ে চলে যাবে, আন্ড বিয়াড ইজ গন। জাস্ট লাইক ভোরের কুয়াশা।

৫৯

তিন হাজার, খ্রীস্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছব আগে শুরু হয়েছিল ইতিহাস। মায়া ভাষাভাষী একদল মানুষ গড়ে তুলেছিলেন বিশাল এক সভ্যতা। সুন্দর এক সংস্কৃতি। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁদেব নিজস্ব অবদান ছিল। কাল নিরূপণ বিদ্যায় তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের নিজস্ব লিপি ছিল। ওষুধ তৈরি করতে জানতেন তাঁরা। কিন্তু স্পেন থেকে কনক্যুইস্তাদররা যখন এলেন, তখন মায়া সভ্যতার পতন শুরু হয়ে গেছে। উকসমল পরিত্যক্ত। আমাদের ভ্রমণ তালিকায় উকসমল আছে। ইজামল সমেত অন্যান্য ধর্মস্থানও পড়ে আছে জনমানব শূন্য হয়ে। ইছকানসিহোর বাড়িঘর সব আগাছায় ঢেকে গেছে। এই ইছকানসিহোই হল মেরিডো।

সে এক সুন্দর ঘটনা। ১৫১১ সালে দারিয়েন থেকে পেডরো দ্য ভালদিভিয়াস তাঁর অভিযান শুরু করেছিলেন। গন্তব্য সান্টো ডোমিঙ্গো। দারিয়েনের বর্তমান নাম হল পানামা। সেই জাহাজ গন্তব্যে পৌঁছোবার আগেই ভরাডুবি হল। দু'জন নাবিক গোনজালো গুয়েরেরো আর জিরোনিমো দ্য আগুইলার ভাসতে ভাসতে ঢেউয়েব ধাক্কায় আছড়ে পড়লেন তীরে। যখন তাঁরা ভাবছেন, এ আমরা এলুম কোথায়, ঠিক তখনই স্থানীয় কিছু মানুষ তাঁদের বন্দী করে নিয়ে গেলেন তাঁদের প্রধানের কাছে। প্রধানেব নাম ছিল নাছানকান। তিনি ছিলেন ছেটুমালের প্রধান। অদ্ভুত অদ্ভুত নাম সব। কি করা যাবে। মাযাদের ভাষা যেমন, নামও সেইরকম। ভাষার ইতিহাস আমার জানা নেই। বলতে পারব না, কোন গোষ্ঠীভুক্ত এই ভাযা। ভাযা নিয়ে পাকামো না করে, ভেসে আসা সেই নাবিক দু'জনের গল্প বলি। গোনজালো গুয়েরেরো খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন ছেটুমাল-প্রধানের। প্রধানের মেয়ের সঙ্গে প্রেম হল। বিয়ে হযে গেল ঘটা করে। ক্রমে তাঁদের তিনটি সন্তান হল। এই তিন নবজাতকই হল মেকসিকোর প্রথম মায়া ও স্প্যানিশ মিলন জাত মেসতিজো। এই মেসতিজো গোষ্ঠীর উল্লেখ আগেই করেছি। অপর নাবিক জেরোনিমো দ্য আগুইলার নিজেকে এই ইন্ডিয়ান সমাজের সঙ্গে মানাতে পাবলেন না। কোনও রকমে আটটি বছর অতিবাহিত করে ১৫১৯ সালে নাম লেখালেন হারমান কর্টেসের বাহিনীতে। তিনি হয়ে গেলেন তাঁর দোভাষী। কারণ আট বছরে তিনি মায়া ভাষাটি বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করে নিতে পেরেছিলেন।

এই ইতিহাস জয়ের ইতিহাস নয়। মিলনের ইতিহাস। মিশে যাবার ইতিহাস। দুই স্প্যানিশ নাবিক ভাসতে ভাসতে এসে পড়লেন য়ুকাটান অঞ্চলে। জয়ের ইতিহাস এল পরে। ১৫২৬ সালে স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের দরবারে গিয়ে ফ্রানসিসকো দ্য মোন্তেজো বললেন, আমি য়ুকাটান জয় করে এসেছি। আসলে তিনি কিছুই করেননি, শুধু দেখে এসেছিলেন, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পড়ে আছে প্রাচীন এক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। আর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ভাঙা কাপের টুকরোর মতো, মায়াদের গোষ্ঠীপ্রধান ও হতাশ জীবনসংগ্রামে রত তাঁদের অনুসরণকারীরা। চাক থেকে সব মৌমাছি উড়ে যাবার পরেও যেমন কিছু তখনও আঁকড়ে থাকে মধুর শেষ বিন্দুটুকু শুষে নেবার জন্যে। ফ্রানসিসকো দ্য মোন্তেজো নয়, তাঁর পুত্র ১৫৪১ সালে এই টি-হো অধিকার করেছিলেন।

মায়ারা মেরিডাকে বলতেন, টি-হো। আমরা সেই ঐতিহাসিক টি-হোতে এসে পড়েছি। আমাদের ছোট্ট সাদা হোটেলের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সাদাটে নীল রঙের আকাশ উপুড় হয়ে তাকিয়ে আছে স্বপ্নে বোনা শহরটির দিকে। কৌতূহল এখনও যেন তার মেটেনি। নিচে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস জটলা পাকাচ্ছে। এই টি-হো বা মেরিডার ইতিহাস আমাকে কেন জানি না অসম্ভব সেন্টিমেন্টাল করে তুলেছে। সেই পাঁচশো, ছশো বছর আগের স্বল্পালোকিত সমুদ্র। গ্যালিয়ান ভেসে চলেছে। পাশ-মোড়া টুপি আর অদ্ভুত পোশাক পরা স্প্যানিশ ক্যাপ্টেন। চোখে দূরদর্শন যন্ত্র। ম্যাপ, কম্পাস, সেকস্টান্ট। সমুদ্রে তখন জলদস্যুর উৎপাত। হঠাৎ হঠাৎ আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন সভ্যতা, নতুন অসভ্যতা। সে একটা সময় গিয়েছিল। শিশু পৃথিবী তখন ক্রমে ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হচ্ছে। জানার পরিধি ক্রমশই বাড়ছে।

স্প্যানিয়ার্ডরা যখন মায়া নগরীতে এলো, তখন গ্রেট এম্পায়ার অদৃশ্য হয়ে গেছে। দেশ টুকরো টুকরো। প্রতিটি টুকরো তখন স্বশাসিত। এক এক প্রধানের অধিকারে। এই টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ফলে স্প্যানিশ আক্রমণকারীদের খুব সুবিধে হয়েছিল দেশটিকে দখলে আনতে। ইন্ডিয়ানরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল দেশটিকে দখলে রাখতে। পারেনি। চতুর্দিক থেকে দখলকারীরা ছুটে আসছে। ১৫১৩ সালের ২৬ জুন জুয়ান পোনসে দ্য লিওঁ য়ুকাটানের উত্তর তটভূমি দেখে গেলেন। চার বছর পরে ১৫১৭ সালের মার্চে ফ্রানসিসকো হারনানডেজ কোজুমেল দ্বীপ আর কেপ কাটোচে হয়ে কাম্পোচে পৌঁছোলেন। সেখানকার ইন্ডিয়ানরা বেশ শক্তিশালী তখন। হারনানডেজের বাহিনীকে আক্রমণ করে হটিয়ে দিলেন। তিনি প্রাণ নিয়ে ফিরে গেলেন কিউবাতে। কিউবা তখন স্প্যানিশদের দেখলে। ফিরে গিয়ে কিউবার গভর্নরকে বললেন, একটা দ্বীপ দেখে এলুম; তবে দখলে রাখতে পারলুম না। মার খেয়ে ফিরে এলুম। কিউবাতে বসেই য়ুকাটানের নাম রাখা হল সান্তা-মারিয়া দা লস রেমিদিওস। কিউবার গভর্নার তখন দিয়োগো ভেলাজকুয়েজ। পঞ্চম চার্লস স্পেন থেকে ফতোয়া পাঠালেন নতুন অঞ্চলটিকে দখলে আনার ব্যবস্থা করো। ভেলাজকুয়েজ হারনান কর্টেসকে দায়িত্ব দিলেন। অহঙ্কারী কর্টেসকে আবার দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না রাজা চার্লস। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পাঠালেন, 'স্টপ কর্টেস'। কর্টেস আঁচ করেছিলেন, এইরকম একটা কিছু হবে। ভেলাজকুয়েজ নির্দেশ ফিরিয়ে নেবার আগেই ১৫১৯ সালে, ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে গোপনে যাত্রা শুরু করে দিলেন। কর্টেস কোজুমেল পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে ইসলা মুজেরেসের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললেন। য়ুকাটানের দিকে ফিরেও তাকালেন না। য়ুকাটানের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। ১৫১৯ থেকে ১৫২৭, এই ন'বছর রক্ষা পেয়ে গেল কনকুইস্তাদরদের আক্রমণ থেকে। পড়ে রইল এক পাশে, নিজেদের ইতিহাস, নিজেদের সুখ দুঃখ নিয়ে পঞ্চম চার্লস আবার নড়েচড়ে বসলেন। ১৫২৬ সালের ৮ ডিসেম্বর ফ্রানসিসকো দ্য মোনতেজোর সঙ্গে এক নতুন আক্রমণ পরিকল্পনা ছকে ফেললেন। কোজুমেল আর য়ুকাটান দখলে আনতেই হবে। বিশ বছর সময় লেগে গেল। মোন্তেজোর পুত্র মোন্তেজো ১৫৩৭ সালে চ্যাম্পোটন দখল করলেন। তারপর বহু বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন আরও উত্তরে। ১৫৪০ সালে অধিকার করলেন কামপেচে, ১৫৪২ সালে মেরিডা', ৪৩ সালে ভাললাদোলিদ। স্বাধীনচেতা মায়া ইন্ডিয়ানরা সহজে বশ্যতা স্বীকার করতে চাননি। ২৭৫ বছরের স্প্যানিশ অধিকারের ইতিহাস হল রক্তের লেখা। থেকে থেকে যুদ্ধ। গেরিলা হানা। আচমকা আক্রমণ। স্প্যানিশ অধিকারীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। ফ্রানসিসকোর দলের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর লড়াই। আবার ফ্রানসিসকোর নিজের দলের মধ্যে হাতাহাতি। দীর্ঘ অশান্ত এক কালপ্রবাহ। এর সঙ্গে যুক্ত হল অনাবৃষ্টিজনিত এক করাল দুর্ভিক্ষ। সপ্তদশ শতকে সান জুয়ান দ্য দিয়োসের ধর্মযাজকরা এলেন মেরিডা হাসপাতালের দায়িত্ব নিতে। আর জেসুইট ফাদাররা নিলেন শিক্ষাবিস্তারের ভার। ১৭৫১ সালে স্থাপিত হল। সেমিনারিয়ো কনসিলিয়ার দ্য সদন ইলদেফোনসো। এই প্রতিষ্ঠানটিই পরে রাজবিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেল। ১৮২১ সালের মধ্যভাগে গভর্নর জুয়ান মারিয়া এচেভেরি এক সভা আহ্বান করলেন। মেকসিকোয় তখন পুরোদমে চলেছে স্বাধীনতা আন্দোলন। গাছুপাইনসদের শাসন থেকে, স্পেনের রাজছত্র থেকে মুক্তির আন্দোলন। সভার সিদ্ধান্ত হল য়ুকাটান স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবে, স্পেনের বশ্যতা থেকে বেরিয়ে এসে প্রবেশ করবে মেকসিকোর স্বাধীন

সাম্রাজ্যে। যুকাটেকানসরা প্রজাতন্ত্র মেনে নিলেন। ১৮২৪ সালের ২১ নভেম্বর তাঁরা মেনে নিলেন ফেডারেল কনস্টিটিউশান।

ইতিহাস আর নদী প্রায় একই স্বভাবের। কখন যে বাঁক নেবে কোন দিকে! ১৮২৪ থেকে ১৮৩৫ কখনও কনজারভেটিভ, কখনও লিবার‍্যাল, কখনও ফেডার‍্যালিস্ট, কখনও সেন্টর‍্যালিস্টরা সরকার গঠন করলেন। হঠাৎ ১৮৩৫ সালের অক্টোবরে, মেকসিকো সরকারের এক ফতোয়ায় যুকাটান স্বাধীন রাজ্য থেকে পরিণত হল অঙ্গরাজ্যে। সার্বভৌমত্ব চলে গেল। এই অবস্থায় চলল বছর চারেক। অসন্তোষ আর বিক্ষোভ দানা বাঁধতে লাগল। ১৮৩৯ সালের মে মাসে ফেটে পড়ল বিদ্রোহ। বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে উঠল তিজিমিনে। ১৮৪০ সালে যুকাটান আবার ফিরে এল ফেডারেল রেজিমে। মেকসিকোর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হল। ঘোষিত হল যুদ্ধ। ১৮৪১ সালে মিটমাটের একটা চেষ্টা হল। ১৮৪৪ সালের ১১ জানুয়ারিতে শেষ হল যুদ্ধ। চুক্তি বেশি দিন রইল না। ১৮৪৬ সালের পয়লা জানুয়ারি যুকাটান আবার বেরিয়ে এল মেকসিকো থেকে। ওই বছরই আগস্ট মাসে মেকসিকোয় যখন সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হল তখন যুকাটান মেনে নিল নতুন সরকারকে। যুকাটান মানলেও কামপেচের বিদ্রোহীরা মানতে পারল না। আবার শুরু হয়ে গেল লড়াই। এরপর মেকসিকোর সঙ্গে লড়াই লাগে আমেরিকার। সেই লড়াই শেষ হবার পর ১৮৪৮ সালের ১৭ই আগস্ট যুকাটানকে ফিরিয়ে আনা হল মেকসিকো সাম্রাজ্যে। এর আগেই ১৮৪৭ সালের ১৮ জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল মায়া ইণ্ডিয়ানদের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নাম দেওয়া হয়েছিল, 'কাস্টওয়ার'। বর্ণবিদ্রোহ নাম দেওয়া হয়েছিল, 'কাস্টওয়ার'। বর্ণবিদ্রোহ। চলেছিল একটানা ৫৫ বছর।

মেকসিকোর ইতিহাসে এত ঘটনা, এত জটিলতা, এত ফ্যাকড়া, মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা। পাঁচ ছশো বছর ধরে লড়াই আর লড়াই। মাটিতে কান পাতলে এখনও শোনা যাবে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অস্ত্রের ঝনঝনাৎকার। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লুম। হোটেলটি এত নির্জন আর শান্ত, ঘরে বসে থাকলে নিজেদের মনে হতে পারে রুগী। সাড়ম্বরে সন্ধ্যা নামছে। এমন একটি শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল, আকাশের রঙ। অস্ত সূর্য যেন সোনা স্প্রে করে দিয়েছে। আকাশের আভা নেমে এসেছে পথে। একটু আগেই এক বাহিনী মানুষ, সমস্ত রাজপথ, জনপথ, পাথর বাঁধানো ফুটপাত, জল আর বুরুশ ঘসে ঝকঝকে তকতকে করে গেছেন। আমি মনে মনে, একটা গরু কি ষাঁড় খুঁজতে লাগলুম, যে এখুনি ন্যাজ তুলে এক নাদা নামিয়ে দেবে। খুঁজতে লাগলুম ডজন খানেক নেড়ি কুকুর। খুঁজতে লাগলুম আমাদের দেশের সেই সব সিভিক সেনস্‌অলা মানুষ, যাঁরা এখুনি বীরের মতো দেহনির্যাসে যত্রতত্র পুকুর তৈরি করে দেবেন। শহরের সমস্ত বাড়ির বাইরের দেয়ালে এঁকে দেবেন পানের পিকের আলপনা। এমন একটা শহর যদি আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, একদিনেই একেবারে মনের মতো করে নোবো। আমাদের খনন শিল্পীরা হই হই করে নেমে পড়বেন। চতুর্দিক ভরে যাবে পরিখায়। বাম্প শিল্পীরা বিধ্বস্ত পথের ওপর সাজিয়ে দেবেন বাম্পের পর বাম্প। ফুটপাত চলে যাবে ফেরিওলার দখলে।

পথের জল শুকোয়নি। তার ওপর ঝরে পড়েছে আকাশের সোনা। আমরা চলেছি প্লাজা দেল জোকালো ধরে। বেশ নামী রাজপথ। ১৫৪২ সাল ৬ জানুয়ারি, এই শহরের পত্তন করেছিলেন, ডন ফ্রানসিসকো দ্য মোন্তেজো। আগেই বলেছি। ১৫৪২ সালে নির্মিত তাঁর প্রাচীন গৃহটি এই পথেই পড়ে। প্লাজা দেল জোকালোর দু'ধারে বড় বড় প্রাসাদোপম বাড়ি। স্প্যানিশ ধাঁচে নির্মিত। বাড়ি নয় তো ছবি; আর কি রক্ষণাবেক্ষণ। মনে হচ্ছে যেন এই কালই সব তৈরি হয়েছে। প্রতিটি বাড়ির সামনে বাগান। সন্ধ্যোর বেগুনি আলোয় হঠাৎ ভেসে উঠল এক ঝাঁক ফোঁটা ফোঁটা আলো। শহরের সমস্ত বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠেছে এক সঙ্গে। মেরিডা আর শহর নয়, যুকাটানের সুন্দরী রাজধানী। পথের পাশের আলোকস্তম্ভ যেন বিশাল বড় কারুকার্য করা এক একটি ক্রুশ। প্রসারিত দুই বাহুর প্রান্তে দুই আলোকদান। ঘষা কাঁচের ডোমে ঢাকা৷ যত দূর দৃষ্টি যায়, সারি সারি আলোকস্তম্ভ। হঠাৎ এক সময় সূর্য তাঁর বেগুনি আলোর আঁচলটুকুও টেনে নিলেন, অপর পৃথিবীকে ভোরের আলো দেবেন বলে। দুই গোলার্ধে সূর্যকে এইভাবেই আমরা ভাগ করে নিয়েছি। এখানে রাত যতটা, ভারতে ঠিক ভোর ততটা। কি মজা। এ প্রান্তে যখন আমরা দিনের কাজ শেষ করতে চলেছি,

ও প্রান্তে তখন শুরু হতে চলেছে। আমার হল সারা, তোমার হল শুরু।

মেরিডায় এসে নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। এমন একটা জায়গায় সহসা ছুট বলতে আসা যায় না, না এলে জানাও যায় না, এক রাজধানীর ওপর আর এক রাজধানীর কি অহঙ্কার! মায়া শহর টি-হোর ধ্বংসাবশেষের ওপর স্প্যানিশ রাজধানী মেরিডা। নামটিও কত সুন্দর। আদুরে রমণী এক। সর্বাঙ্গে আলোর অলংকার পরে সিঁথিতে টায়রা দুলিয়ে রাতের অভিসারে। স্প্যানিশরা প্রাণ ঢেলে, অনেক অহংকার নিয়ে গড়ে তুলেছেন এই রাজধানী। মোন্তেজো এই শহরটি স্থাপন করার সময় নিশ্চয়ই একটা শিহরণ অনুভব করেছিলেন। এই গৌরবের ইতিহাসকে চাপা দিচ্ছেন আর এক গৌরবের ইতিহাস দিয়ে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন এমন একটা সাজানো মঞ্চ যেখানে অনেক চরিত্র, অনেক ঘটনা নিয়ে, সহস্র সহস্র রজনী ধরে, বিপুল এক সেটসেটিং-এর মধ্যে অভিনীত হয়ে গেছে বর্ণাঢ্য এক নাটক। মোন্তেজোর অনুভূতি ক্রমেই আমার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। এই শহরের ধমনীতে অতীত দপদপ করছে। সেকালের ইওরোপীয় মাস্টার পেন্টারদের ক্যানভাসে দেখা গেছে, এক ছবির ওপরে আঁকা হয়েছে আর এক ছবি। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্মোচন করেছে এই রহস্য।

মেরিডার আর্কিটেকচারে মিশেছে মায়া আর স্পেন। হিন্দু সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাসের মতোই মায়া সংস্কৃতি। সূর্যের উপাসক। চন্দ্রের উপাসক। বেদোক্ত বিভিন্ন শক্তির উপাসক ছিলেন তাঁরা। মিশরে পিরামিড, এখানেও সেই একই পিরামিড। ভারতের সাধনমন্দির, এখানেও সাধনমন্দির। এদেশে মাটি খুঁড়লেই ইট পাটকেল নয় বেরিয়ে আসে অতীত সভ্যতার টুকরো। বেরিয়ে আসে দামী পাথরের স্তর, অনিক্স, অবসিডিয়ান, জেড। সোনা, রুপো, খনিজ তেল। হেলিকপ্টারে চেপে মেরিডার আকাশে উঠলে দেখা যাবে, চারপাশে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে আছে মায়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। রুক্ষ, তরুহীন প্রান্তর। মাঝখানে মায়াবী মরূদ্যানের মতো মেরিডা।

মেরিডা তার চারপাশে দুয়ার খুলে দিয়েছে। যে দরজা দিয়েই বেরনো যাক, পাওয়া যাবে য়ুকাটানের সযত্ন রক্ষিত পুরাতত্ত্ব ভূমি। এই দেশে জমিতে মাটির ভাগ কম। কোথাও কোথাও শুধুই স্তরের পর স্তর পাথর, গ্র্যাভেল স্টোন, পিউমিস, চুনাপাথর। জলধারণ ক্ষমতা নেই বললেই চলে। বৃষ্টিপাতেরও তেমন কোনও নিয়ম নেই। ফলে চাষবাস হয় না বললেই চলে। ব্যতিক্রম হল মেরিডা। সবুজ হয়ে আছে চারপাশ।

আমরা চলে এসেছি, প্যাসিয়ো মোন্তেজোতে। শিরা ওঠা দামী পাথর বাঁধানো ঝকঝকে ফুটপাত। এইরকম পথ পায়ে চলার পথ আর প্রাসাদশ্রেণী খুব কম শহরেই দেখা যায়। আকাশেই যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহলে মুখ তুলে বলি, তুমি আমাকে এই অনুপম শহর থেকে আর বের করে নিও না, তুমি বাকি জীবন এইখানেই ফেলে রাখো আমাকে।

অ্যান বললে, 'এসো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা যাক; তারপর আবার শুরু করা যাবে পরিক্রমা।' প্যাসিয়ো মোন্তেজোর দু'পাশেই ছাড়া ছাড়া বসার বেঞ্চ। ঢালাই লোহার তৈরি। কারুকার্যমন্ডিত। নিখুঁত সাদা রঙ। পাশাপাশি চারজন বসা যায়। রাস্তার দু'পাশেই বড় বড় গাছ। দৈত্যের মতো নয়। সুশ্রী ঝিরঝিরে। আকাশের গায়ে হালকা পাতার তুলি টানছে বাতাসের দোলায়। একটু শীত শীত ভাব। দিনের বেলাও তেমন গরম নয়। পথের তেমাথার বাঁদিকে আমরা বসে আছি। বসে আছি পার্সিয়ো মোন্তেজোর একপাশে। আমাদের ডানপাশ থেকে আর একটি পথ এসে মিশেছে। জানি না, কি নাম সেই পথের।

আমাদের পেছনে, আমাদের সামনে এক সার অতি সুন্দর বাড়ি। স্প্যানিশ কায়দায় তৈরি। সাদা গ্রিলের বেড়া দিয়ে ঘেরা। গ্রিল গেট। ধাপ ধাপ পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে, ঝকঝকে সাদা প্রবেশ দরজার দিকে। মাথার ওপর ঝুলে আছে দোতলার বারান্দা। লম্বা লম্বা সুদৃশ্য থাম। জানালার মাথায় মাথায় কারুকার্য করা শেড। কোনও বাড়িই সাধারণ এক আবাস্থল নয়, সুরম্য এক স্বপ্ন। প্রবেশপথ উদ্ভাসিত হয়ে আছে সাদা আলোয়।

জনসংখ্যা খুবই কম। হয়তো শহরের অন্যপ্রান্তে আছে। এই পাসিয়ো মোন্তেজোতে পথচারী নেই

বললেই চলে। কোনও বাড়িতেই কোনও শব্দ নেই। জানালায় জানালায় আলো জ্বলছে। পাতলা, সাদা পর্দা ভেদ করে সেই আলো চাঁদের আলো হয়ে বাইরে ছুটে আসছে। দেখতে না পেলেও দেখতে পাচ্ছি ভেতরের দৃশ্য। সুন্দরী স্প্যানিশ মহিলারা এ-ঘর, ও-ঘর করছে। পিয়ানো সুর তুলছে। হঠাৎ আমাদের সামনের রাজপথে স্বপ্নের জগৎ থেকে যেন বেরিয়ে এল স্বাস্থ্যবান সাদা ঘোড়ায় টানা সাদা একটি ফিটন। বড় বড় চাকা। চারপাশ, মাথা খোলা। আরোহী দুই সুন্দরী। হাঁসের পালকের মতো সাদা পোশাক। ঝিমঝিম শব্দ তুলে দ্রুতলয়ে চলে গেল সংগীতের মতো।

ঝিম ঝিম রাত। ঝিম ঝিম সেই স্বপ্নের পক্ষীরাজ। সাদা একটা গাড়ি টেনে নিয়ে চলে গেল উত্তর থেকে দক্ষিণে। হঠাৎ রাতের বাতাসে ছড়িয়ে গেল কনসার্টের সুর। আমাদের পেছনের প্রাসাদোপম কোনও বাড়ি হল সেই সুরের উৎস। স্বপ্নের শহরেই তো বাস করবে স্বপ্নের মানুষেরা। চিৎকার চেঁচামেচি নেই। যানজট নেই। মানুষ দোদুল্যমান বাস, মিনিবাস কন্ডাকটারের আদিম, অমানবিক চিৎকার নেই। ঘূর্ণায়মান বিক্ষোভ মিছিলের, 'চলছে চলবে' নেই। শহর যেন ধ্যানে বসেছে দীপালোক জ্বেলে। প্রার্থনা সংগীতের সুর আসছে বাতাসে।

অ্যান কতকালের আপনজনের মতো আমার কাঁধে হাত রেখে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললে, 'কি, নেশা ধরে গেছে তো?' আমার ধরেছে। জোরে কথা পর্যন্ত বলতে ইচ্ছে করছে না, পাছে রাতের আঁচলে নখের ঘসা লেগে যায়। এ যেন সিল্কের মতো রাত। বিশ্বাস করো জীবনে অনেক বড়, ছোট শহর দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, এই শহর ছেড়ে যাবার সময় চোখে জল এসে যাবে।'

'আমি বসে বসে কি ভাবছিলুম জানো, আমি আর ফিরবো না। এইখানেই যা হয় একটা কিছু জুটিয়ে নেবো, বেলবয় কি কাউবয়, টিকা কি হোটেলবয়। চেষ্টা করলে হবে না অ্যান?'

'হবে, তবে পারবে না। যে যে জীবনে অভ্যস্ত বুঝলে না। সেই জীবন, সেই ধরনের একটা মানসিকতা তৈরি করে দেয়। পৃথিবীতে যত শহর আছে, তার মধ্যে সোবিডা'র রাত হল সবচেয়ে কমনীয়, সব চেয়ে শান্ত।'

'ভারতবর্ষের যোগীরা এই শহরের সন্ধান পেলে ছুটে আসতেন। সারা রাত যোগাসনে বসে ধ্যান করে কাটিয়ে দিতেন। আমার অনুভূতি কি বলছে জানো, এই শহরে একসময় অনেক সাধনভজন হয়ে গেছে। এ তোমার হল গিয়ে সিদ্ধপীঠ।'

'সিদ্ধপীঠ কাকে বলে?'

'যেখানে যে কোনও একজন সাধক দিনের পর দিন সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন।'

'সিদ্ধিলাভ কাকে বলে?'

'সাধনার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরদর্শন। সেই ঈশ্বরদর্শন হলেই সিদ্ধিলাভ।'

'তোমরা ঈশ্বর ঈশ্বর বলো, আমরা বলি গড। সত্যিই কি কিছু আছে?'

'তিনি তর্কাতীত। যিনি আছেন মানুষের বিশ্বাসে। তিনি আছেন ভেতরে আমাদের অন্তরে। একাসনে বসে, দিনের পর দিনের একাগ্র চেষ্টায় ছড়ানো মনকে শামুকের মতো ভেতরে গুটিয়ে আনতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়।'

'পেলে কি হয়।'

'আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ। শান্তি, শান্তি, শান্তি। জ্যোতি, জ্যোতি, জ্যোতি। তুমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শুনেছো?'

'অফকোর্স। আমি ক্রিস্টোফার ইশারউডের বই পড়েছি।'

আনন্দে অ্যানকে জড়িয়ে ধরলুম। ছেলে কি মেয়ে আমার জানার দরকার নেই। অ্যান দক্ষিণেশ্বরের নাম শুনেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বক্তৃতা শুনেছে। খণ্ডনভব বন্ধন জগ প্রার্থনা সংগীতে অর্গ্যান আর পাখোয়াজ সহযোগে। ছুপা রুস্তম এখন আমাকে পরীক্ষা করছে, ঈশ্বরদর্শন হলে কি হয়। 'বুঝলে অ্যান, ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি বলে গেছেন , ঈশ্বরদর্শন হলে চৈতন্য লাভ হয়। চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী-কাঞ্চনের ওপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয়ের কথা শুনলে কষ্ট হয়।'

'আমরা ঈশ্বর থেকে বহু দূরে, তবু বলবো, এই যে আমাদের আলোচনা, আমাদের এই মুহূর্তের অনুভূতি, একটি কথাই প্রমাণ করে, তাঁর তরঙ্গ আমাদের স্পর্শ করেছে।'

'ঠাকুর কি বলতেন জানো, চুম্বক শুধু লোহাকে টানে না, লোহাও চুম্বককে টানে। আমরাও তাঁকে টেনেছি। একেই বলে, স্থান মাহাত্ম্য। তুমি তো মায়া গবেষক। তুমি জানো, এইখানে ছিল মায়া শহর টি-হো। ওঁদের শহর মানেই সাধনক্ষেত্র। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভূমিতে তন্ত্রমতে শক্তির আরাধনা হয়েছে। সাধনার সেই তরঙ্গ আজও এখানে জমাট হয়ে আছে। তুমি তো জানো, একখন্ড লোহার ওপর দিয়ে রেলগাড়ির লোহার চাকা চলে গেলে লোহা চুম্বক হয়ে যায়।'

'তুমি কি জানো, আমরা যে শহরে বসে আছি, এইখান থেকেই শুরু হয় মায়া ধ্বংসাবশেষ দেখার অভিযান। এই শহরই হল অতীতের চৌকাঠ। ভাবলেই আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। তোমার হচ্ছে না?'

'আমার হচ্ছে না মানে! আমার মনে হচ্ছে, আমি সেই অতীতের বাতাসেই শ্বাস নিচ্ছি। সেই দূর অতীতের ছায়াদৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসছে। আমি কখনও মায়া-ইন্ডিয়ান হয়ে যাচ্ছি, কখনও স্প্যানিশ কনক্যুইস্তাদার।'

কোথায় যে এত সুন্দর কনসার্ট হচ্ছে! আমাদের সামনে পেছনে দু'সার গাছ। দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাসে ফিস ফিস করছে। যেন অতীতের গল্প বলছে মা তার শিশুকে। দাসী মেয়েটিকে মায়া পুরোহিত নিয়ে চলেছেন বলি দেবার জন্যে। বছরের বর বছর বৃষ্টি নেই। চুনা পাথরের জমিতে জলধারণ ক্ষমতা নেই। অজন্মা। শহর ছেড়ে শহরবাসীরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। পৃথিবীর কোনও ঘটনাই হারায় না। বাস্তব জগৎ থেকে উঠে যায় ভাবের জগতে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেই সবই ফিরে আসে একে একে।

অ্যান হঠাৎ কনসার্টের সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে 'ওম, ওম' বলতে শুরু করল। আমার মনে হল, এইখানে এই পরিবেশে যদি খন্ডনভব সংগীতটি বেলুড়মঠের সুরে গাওয়া যেত, তাহলে অসাধারণ হত। এইবার পর পর দুটি ঘোড়ার গাড়ি চলে গেল। নির্জন পথে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, দূর থেকে মিলিয়ে গেল দূরে। আমাদের সামনের বাড়ির আলোকিত ব্যালকনিতে দুটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। পরনে যেন পরীর পোশাক। দুগ্ধধবল। কানের পেন্ডান্টে মনে হয় বহুমূল্য পাথর বসানো। মাঝে মাঝে ঝিলিক মেরে উঠছে।

অ্যান বললে, 'এই শহরের সবাই কেমন সুখী!'

'কোথা থেকে এরা এত সুখ পেল অ্যান, এত সৌন্দর্য!'

'স্পেনের ছেলেমেয়েরা সুন্দরই হয়। তারপর বিত্ত। তারপর কালচার। দেখছ না, কোথাও কোনও উচ্চকণ্ঠ নেই। দৌড়ঝাঁপ নেই। স্প্যানিশ মেয়েরা খুব ভদ্র হয়। খুব হোমলি। পতিপরায়ণা। ভালো মা হয়। গুছিয়ে সংসার করতে পারে। ভাল রাঁধতে পারে। নাচতে পারে, গাইতে পারে। লেখাপড়ায় ভাল। কথায় কথায় স্বামী পাল্টায় না। বড় সংসার পছন্দ করে। মেয়েরা ভাল হলে সংসার সুখের হয়, দেশ সুখের হয়। ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়। সুস্থ মনের অধিকারী হয়। স্পেন অনেক দিনের সভ্যতা। বীর বিজেতা। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। যুদ্ধবিগ্রহ করে বড় হয়েছে। সেই অহঙ্কার এখনও কাজ করছে। তবে মেকসিকো সিটিতে গেলে তুমি এই স্বপ্ন স্বপ্ন ভাবটা পাবে না। সেখানে অনেক সমস্যা, দারিদ্র্য, জীবিকাহীনতা, পাপচক্র, মাফিয়া চক্র, দেহব্যবসা, সবই পাবে। পেলেও তোমার খারাপ লাগবে না। ভূগোল আর ইতিহাস, দুয়ে মিলে একটা ভাবপরিমন্ডল তৈরি করে রেখেছে।'

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমরা উঠে পড়লুম। মসৃণ রাত ঘুমে আঁচল বিছোবার চেষ্টা করছিল। বলা যায় না, আমরা হয়তো পথের পাশেই অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তুম এক সময়।

অ্যান শরীরটাকে টানটান করে আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলে বললে, 'চলো তো কোথায় ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়, দেখি। আজ সারা রাত আমরা ভূতের মতো শহর প্রদক্ষিণ করবো। বড় রাস্তা ছেড়ে অলিতে গলিতে ঢুকে পড়বো। বসে থাকবো প্রাচীন কোনও পার্কে ঐতিহাসিক কোনও মূর্তির পাদদেশে।

আবার শুরু হল আমাদের হন্টন। এমন উৎসাহী, কল্পনাপ্রবণ ভ্রমণসঙ্গী পেলে বেড়ানোর আনন্দ

শতগুণ বেড়ে যায়। আমরা যে পথ ধরে চলেছি তার নাম এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা মোন্তেজোর নামে, প্যাসিও মোন্তেজো। দু'পাশেই প্রাসাদশ্রেণী। হঠাৎ একসময় আমাদের সামনে যেন ভেলকি খেলে গেল। নির্জনতা থেকে জনারণ্যে। আলো, রঙ, টুপি, পোশাক, সামান্য কলরব, ব্যস্ততা, শব্দ, গন্ধ।

অ্যান বললে, 'এ আমরা কোথায় এলুম?'

'মনে হয় মার্কেট প্লেস।'

সত্যিই তাই, জোকালো স্কোয়ার পেরিয়ে আমরা মেরিডার বাজারে চলে এসেছি। দিনের কেনাবেচা শেষ। হাট প্রায় ভেঙে এসেছে। এইখানেই আমরা প্রথম দেখলুম, খাঁটি মায়া ইন্ডিয়ান। কিছুই না, তবু মন যেন ভরে গেল। বাবা এরাই তাঁরা, যাঁরা মায়া সভ্যতার মতো একটা অসাধারণ ব্যাপার সাতসমুদ্রের পারে, পৃথিবীর এ প্রান্তে আপন মনে, নীরবে নিভৃতে গড়ে তুলেছিলেন। চাকার ব্যবহার এঁদের কাছে অসম্ভব ছিল না, তবু করেননি। হয় তো কোনও সংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এঁদের মৃৎশিল্পীরা চাক ব্যবহার না করেও হাতের জাদুতে অসাধারণ সব শিল্পকর্ম রচনা করে গেছেন। চাকার সাহায্য ছাড়াই দূরদূরান্ত থেকে পাথরের চাই এনে প্রাসাদ পিরামিড গড়েছেন।

আমি কেন, মায়া ইন্ডিয়ানদের যিনিই দেখবেন তিনিই থমকে দাঁড়াবেন। বহু বহু বছরের অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে যেন উঠে এসেছেন জীবন্ত হয়ে। মায়া ভাস্কর্যের ধ্বংসাবশেষে যে মুখ উৎকীর্ণ দেখেছি, অবিকল সেই মুখচ্ছবি। কপাল থেকে নাক গড়িয়ে এসেছে কোনও খাঁজ না রেখে। যার ফলে মুখের চেহারা দাঁড়িয়েছে খাঁড়ার মতো। দুটি মঙ্গোলিয়ান চোখ সেই মুখে আটকানো। মাথার মধ্যভাগ চ্যাপ্টা। এই থ্যাবড়া সমতল ভাবটা তাঁরা ইচ্ছে করে তৈরি করতেন শৈশব অবস্থা থেকেই। কৃত্রিম উপায়ে। কারণ কারণ, মাথায় করে মাল বহনের সুবিধা হবে। অ্যানথ্রপলজির সংজ্ঞায় একে বলে ব্র্যাকাইসেফালিক ক্রেনিয়াম। চোখের দৃষ্টিতে অল্প একটু তেরছা ভাব। সকলেই ট্যারা নয়। যাঁরা ট্যারা তারা সম্মানিত। ঈশ্বরপ্রতিম, কারণ স্বর্গের দেবতা ইতযামনার চোখও ট্যারা। মায়াদের গড় উচ্চতা এক মিটার পঞ্চান্ন সেন্টিমিটার। মেয়েদের চুল বেশ লম্বা এবং মোটা। একটি চওড়া বিনুনি করে পিঠে ঝোলানো। ছেলেদের মাথায় গোঁজা থাকে একটি করে গোল আয়না। মেয়েদের মাথায় আয়না থাকে না। আয়না হল প্রতীক। স্ত্রী পবিত্যক্ত স্বামীকে মহিলারা যদি অপমান করতে চান, তাহলে সেই অপমানের ভাষা হল —'ওর বউ নিজের চুলে আয়না গুঁজেছে।'

পুরুষরা সাধারণত কটিবস্ত্র পরিধান করেন। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। কাঁধে ফেলা থাকে কম্বলের মতোই একটা জিনিস। মায়াতে যাকে বলা হয় 'পশো'। খুব শীত করলে ওইটাই খুলে গায়ে দেন। রাতে কম্বলের মতো বিছিয়ে নিদ্রা। ঠিক ভারতীয় সন্ন্যাসীর মতোই পোশাকআশাক ও জীবনযাত্রার ধরন। কেউ যদি বলেন মায়ারা ছিলেন ভারতীয় সন্ন্যাসী, তাহলে প্রতিবাদ করবো না।

মেয়েদের পোশাকও খুব সহজ সরল, তবে অভাবনীয়। তলায় স্কার্ট, ওপরে শার্টের মতো একটি জিনিস। হাঁটা চলা কথা বলায় ধীর স্থির শান্ত। আমরা দু'জনে একপাশে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছি। যেন বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ চলে এসেছি হাজার বছর পেছনে। অতীত ইতিহাসের পাতায়। সময় যেখানে আটকে গেছে। বিংশ শতাব্দী প্রবাহিত হয়ে গেছে চারপাশ দিয়ে। সমুদ্রের জোয়ারের জল বেরিয়ে যাবার পরেও যেমন আটকে থাকে খাঁড়িতে। এই জায়গাটা হল সময়-সমুদ্রের খাঁড়ি। অতীতের জলাশয়।

অ্যান বললে, 'তাকিয়ে দেখ, এনসেন্ট, মিস্টিরিয়াস ফেসেস। এই হল ঠিক ঠিক ইন্ডিয়ান বাজার। তোমাকে এইটাই আমার দেখাবার ইচ্ছা ছিল। মায়া সভ্যতার কালে যা হত, যেভাবে হত, আজও তাই হচ্ছে।'

একপাশে বহু রঙের জামাকাপড়ের পাহাড়। বসে আছেন ইন্ডিয়ান বিক্রেতা। তাঁর সেই প্রাচীন পোশাকে। দু'কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুলে আছে ভাঁজ করা পশো। কালো কুচকুচে চুল। চুলে গোঁজা চ্যাপ্টা আয়না। সেই আয়না মাঝে মধ্যে ঝিলিক মেরে উঠছে। বহুবর্ণের পোশাক বিক্রেতার পাশেই টুপির পাহাড়। ঘাসের টুপি, খড়ের টুপি। টুপিরও কি বাহার। ওপাশে নানা রকম ফল ও ফুল, মশলা। মশলার কড়া গন্ধের সঙ্গে মিলেছে ফল ও ফুলের মিষ্টি গন্ধ। রাত এমন মোহময়ী হতে

পাবে, আমাব ধাবণা ছিল না। বিক্রেতা পুরুষ ও মহিলাবা মায়াপান ভাষায় কি বলছেন নিজেদেব মধ্যে জানি না।

আমবা দু'জনে মিশে গেলুম সেই বাজাবেব ভিড়ে। ফল, ফুল মশলা, আব বঙিন পোশাকেব জগতে। ইন্ডিয়ান পুরুষ আব মহিলাদেব অঙ্গ থেকে যেন ধূপ ধুনোব মিশ্রিত গন্ধ বেবোচ্ছে।

৬০

আমি দেখলুম, বাজাব আব বেসবকাবী বাস এই দুটোতে আমবা যত শব্দম করে তুলতে পেবেছি পৃথিবীব আব কেউ তেমন পাবেনি। এই ফল ফুল আব পোশাকেব বাজাবটা আমাদেব দেশেব হলে কি অবস্থা হত, চিৎকাব, চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলি জল কাদা, আবর্জনা। মায়া ইন্ডিয়ানবা কথা কম বলেন। বেশ গম্ভীব প্রকৃতিব। যাঁবা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁবা দাঁড়িয়েই আছেন। যাঁবা বসে আছেন তাঁবা বসে। কেউ হয়তো একটা পোশাক বাতাসে দোলাচ্ছেন। কেউ 'আসুন আসুন' ভঙ্গিতে তাঁব জিনিসপত্রেব উপব হাত নাড়ছেন। যেন বলতে চাইছেন, 'আইযে, বইঠিযে।'

আমাদেব শবীব ছুঁয়ে যাচ্ছে বাহাবী পোশাকেব প্রান্ত। মায়া নাবীদেব মুখে চাপা আলো পড়ে মনে হচ্ছে মানবী নয়, অতি প্রাচীন কোনও দেবী। মুখে চকচক কবছে ঘামতেল। কুচকুচে কালো চুল। সামনে সিঁথি। টান করে আঁচড়ানো। পেছনে ঝুলছে একটি মাত্র বিনুনি। বিনুনিব প্রান্তভাগে নানা বর্ণেব ফিতে বাধা। গাঢ় বঙেব স্কার্ট সাদা ব্লাউজ। পায়ে চামড়াব ফিতে বাঁধা চটি। আমাব মনে হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধবে কোনও দূব অতীতেব স্বপ্নে আছি।

আমবা একটু আলো আঁধাবি জায়গায় ছায়াব মতো দাঁড়িয়ে আছি। আব একটু পবেই এই বর্ণাঢ্য সমাবোহ গুটিয়ে আসবে। মায়া ভাবতীযবা ফিবে যাবেন তাদেব আস্তানায়। ফল আব ফুলেব গন্ধে অন্ধকাব যেন টুকবো টুকবো হয়ে মৌমাছিব মতো উড়ছে। ফলেব মধ্যে বয়েছে, লেবু, বড় বড় পেঁপে, বেবি, কলা পাকা অলিভ, বহু বকমেব লঙ্কা, থোলো থোলো আঙুব, জামরুল, পিচ , অ্যাপ্রিকট, চেবি। মাথাব ওপব থেকে আলো এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, ফ্লোবেন্সেব কোনো বিখ্যাত শিল্পীব আঁকা স্টিল লাইফ। বাটখাবা, দাঁড়িপাল্লাব কোনও ব্যাপাব নেই। আধুনিক ওজন যন্ত্র। ডোবাকাটা সুন্দব প্ল্যাস্টিকেব ব্যাগ। যত বাত বাড়তে লাগল ক্রেতাব সংখ্যা কমে এল। গম্ভীব দর্শন, ঋজু চেহাবাব মায়া ইন্ডিয়ানবা একে একে দোকানপাট গুছোতে লাগলেন। ঘোড়াব পায়েব শব্দ। সাদা সাদা ঘোড়াব গাড়ি সুন্দবী আবোহীদেব নিয়ে চলেছে। শহব এইবাব ঘুমিয়ে পড়বে আজ বাতেব মতো।

আমাদেব কেনাব কিছু নেই। ভাঙা হাটে মন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। সাবাদিনেব আসব গুটিয়ে এলে মনেব মধ্যে কেমন একটা 'যাই যাই সুব বেজে ওঠে। আমবা চলে আসছি হঠাৎ এক ইন্ডিয়ান বমণী এগিয়ে এসে আমাদেব দু'হাত ভবে দিলেন ফুলে। তাব ভাষা যতটুকু বোঝা গেল, তাব অর্থ দাঁড়াল দিনেব বেচাকেনাব পব এ অবশিষ্ট ফুল তো শুকিয়েই যাবে। তুমি বিদেশী, তোমাকে আমাব এই উপহাব। এক আঁজলা ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীব প্রাচীনতম শহবেব বাজপথে। এমনও হয়। এমন ঘটনাও ঘটে যুদ্ধবাজদেব এই বিশ্বে। যেখানে বিভেদেব পাঁচিল তুলে দেশনায়কবা ক্ষমতা আব গদিব চাষ কবেছেন।

ফুলওয়ালী ইন্ডিয়ান তরুণী আমাকে কি একটা জিজ্ঞেস কবলেন।

অ্যান দোভাষীব কাজ কবলে। তরুণী জিজ্ঞেস কবছেন আমি কোন দেশেব? আমিও কি ইন্ডিয়ান?

মেয়েটি ভাবতেব নাম শোনেনি। জানে না মানচিত্রেব কোথায় আছে ইন্ডিয়া নামক দেশটি, যে দেশেব অধিবাসীকেও ইন্ডিয়ান বলে। অ্যান নানা ভাবে বোঝাবাব চেষ্টা কবল। মেয়েটি বুঝলো কি বুঝলো না বোঝা গেল না। শেষে অ্যান জিজ্ঞেস কবল, 'তুমি এখন যাবে কোথায়?'

মেয়েটি বললে, 'বাড়ি যাবো। তাব আগে বাতেব খাওয়া সেবে নেবো এখানকাব কোনও বেস্তোবাঁয়।'

অ্যান জিজ্ঞেস করলে, 'এখানে কোনও ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ আছে? যেখানে প্রকৃত ইন্ডিয়ান খাবার পাওয়া যায়।'

মেয়েটি বললে, 'আমার সঙ্গে চলো না।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে কি যেন বললে এক বর্ণও বুঝতে পারলুম না। বোকার মতো হেসে সামাল দিতে লাগলুম। মেয়েটির হাসিও আরও স্পষ্ট হল।

অ্যান বললে, 'বুঝতে পারলে কিছু?'

'না। কিছুই বুঝিনি।'

'বললে, ইন্ডিয়া কোথায় জানি না, তবে আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাদেরই একজন।'

আমরা রাজপথ ছেড়ে গলিপথে ঢুকলুম। গলি সেও কত সুন্দর। পাথরের দেশ। সবই পাথর বাঁধানো। কার্নিভালের তাঁবুর মতো একটা দোকানে এসে আমাদের চলা শেষ হল। উনুনে গনগনে আগুন। ভারতের কথা মনে করিয়ে দিলে। আমাদের দেশের পাঞ্জাবি, কি হিন্দুস্থানি খানাঘরে এই দৃশ্যই চোখে পড়ে। সেখানে তন্দুরি রুটি হয়। কাবাব চিড়বিড় করে চ্যাটালো কড়ায়। এখানে কি হচ্ছে দেখি।

সাংঘাতিক একটা কিছু তৈরি হচ্ছে। এত খুশবু পৃথিবীর কোনও খাদ্য তৈরির সময় ছড়ায় কিনা আমার জানা নেই। পৃথিবীর ক'টা খাদ্যই বা খেয়েছি। অ্যান জিজ্ঞেস করলে, 'কি তৈরি হচ্ছে মম?'

'মম' সম্বোধনে বর্ষীয়ান ইন্ডিয়ান রমণী ভীষণ খুশি হলেন। মা নামের এত সম্মোহন। এক গাল হেসে বললেন, 'মোল পোবলানো'। বস্তুটা কি? তিনি ব্যাখ্যা করলেন। আছে, কাঁচা লঙ্কা, রসুন, কলা, পেঁয়াজ, লবঙ্গ, ধনে, জিরে, চিনি ছাড়া চকোলেট। এই সব মিলে তৈরি হচ্ছে সস। সেই সসে পড়বে ঝলসানো টার্কি। পদটির তখন নাম হবে, 'টার্কি-মোল পোবলানো'। এইটি হল মেকসিকোর 'ন্যাশন্যাল ডিশ'।

মহিলা বললেন, 'টেস্ট করে দেখ। যত খাবে ততই মনে হবে, আরও বাঁচি।'

অ্যান বললে, 'ঠিক আছে, আমরা বসছি।'

ইন্ডিয়ান যাঁরা বসেছিলেন, অপেক্ষায় অথবা আহারে, তাঁরা সবে সবে খাতির করে আমাদের বসতে দিলেন। আমি বসে ভয়ে ভয়ে অ্যানকে বললুম, 'ওই জিনিস খাবে অ্যান, কলার সঙ্গে রসুন, তার সঙ্গে পেঁয়াজ, পেঁয়াজের সঙ্গে চকোলেট, তার সঙ্গে মুরগী। এ তো গুরুচণ্ডালি ব্যাপার। পেটে ঢুকে যদি মেকসিক্যান বিপ্লব শুরু করে দেয়।'

অ্যান বললে, 'কাপুরুষের মতো কথা বলো না। বীরপুরুষ হও।'

'দ্যাখো অ্যান, খেয়ে মরলে কেউ বীরপুরুষ বলবে না। যুদ্ধ করে মরলে বলতেও পারে।'

'তুমি দয়া করে ভয় পেয়ো না। জানবে, আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

মনে মনে বললুম, 'হোতা হায় ওহি, মঞ্জুরে যো খোদা।'

রেস্তোরাঁ এত পরিষ্কার রাখা যায় কি করে। নানা প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে, তার মধ্যে এটি অন্যতম। ইন্ডিয়ান পুরুষদের পরিধানে জাতীয় পোশাক। লম্বা চুল। কপালে হেডব্যাগ। অনেকেই পান করেছেন। স্বদেশী আরক। সাধারণ মানুষের পানীয় ছিল এক সময়, 'পালকে'। বেশ ভীতিপ্রদ আরক। ম্যাগুয়ে ক্যাকটাসের বাল্‌ব খেঁতো করে রস বের করা হত। সেই রসকে জ্বাল দিয়ে জরিয়ে তৈরি করা হত 'পালকে'। শুনলেই ভয় করে। মনসাগাছের মদ। মনসা গাছ তো শুনেছি বিষাক্তই হয়। 'পালকে'র চেয়ে প্রিয় এখন 'তেকুইলা'।

'তেকুইলা' একটি ইন্ডিয়ান গ্রাম। সেই গ্রামে তৈরি হয় এই বিখ্যাত মদ। সেই বিখ্যাত মেসক্যালিন, যা পান করে অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন বিখ্যাত লেখক অলডাস হাকস্‌লি। আর তাঁর সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই জীবনের শেষ গ্রন্থ—'দি ডোরস অফ পারসেপসান', 'হেভন অ্যান্ড হেল'। এই সূত্রে হাকস্‌লির একটু স্মৃতিচারণা করে নি। বাঙালি মনীষার খুব কাছের মানুষ ছিলেন তিনি আর জীবনের শেষভাগটা তিনি মায়া সভ্যতার দুয়ারপ্রান্তেই কাটিয়ে গেছেন। ১৯২০ থেকে '৩০ তিনি ছিলেন ইতালিতে। ৩০ সালে চলে এলেন তুলোঁর কাছে সানারি বলে একটা জায়গায়।

এইখানেই বসে লিখলেন, 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড'। হাকসলি সারাটা জীবন দৃষ্টিক্ষীণতায় [illegible] করে গেছেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ইওরোপ ছেড়ে চলে এলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। [illegible] ক্যালিফোর্নিয়ায় চোখ ভাল থাকে। এইখানেই বসবাসের [illegible] পরিচয়। সাধারণ মানুষের যে দুর্জ্ঞেয় জগতের খবর নিয়ে মাথা ঘামাবার [illegible] করে না। এইখানেই শুরু হয় তাঁর জীবনের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেই অভি[illegible] ফসল দুটি রচনা 'ডোরস অফ প'রসেপসান'। আর 'হেভন অ্যান্ড হেল'। ১৯৫৫ সালে মারা গেলেন তাঁর স্ত্রী মারিয়া। বেহালা বাদিকা লরা আরচারার সঙ্গে আবার বিয়ে হল। তিনি ছিলেন আবার প্র্যাকটিসিং সাইকোথেরাপিস্ট। ১৯৬৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় হাকসলির মৃত্যু হয়।

নানা জাতের নানা ধরনের মনসা গাছই হল ক্যাকটাস। মধ্য আমেরিকা ও মেকসিকোর জলহীন, প্রায় মরুভূমি-সদৃশ অঞ্চলে শোষক কাঁটাযুক্ত এই কঠিন উদ্ভিদের ছড়াছড়ি। আমরা জন্মাই, খাই-দাই, বগল বাজাই এক সময় টেঁসে যাই। জানতে পারি না জানার চেষ্টাও করি না বিপুলা এই পৃথিবীর বিচিত্র রহস্য—ঈশ্বরের নিজের হাতের দীর্ঘ সাধনার চিড়িয়াখানা ও বোট্যানিক্যাল গার্ডেনটিকে। কি কান্ড যে করে বসে আছেন তিনি।

কোনও কোনও মানুষ তাঁরই ইচ্ছায়, ভাত, ডাল, জরু গরুর এই জীবন ছেড়ে রহস্যের কোণা ধরে টান মারতে ছোটেন। অজানা সমুদ্রে পোত ভাসান। পাহাড় চূড়ায় উঠে যান। গভীর অরণ্যে [illegible] সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে ক্ষণ জীবনের মায়া ছেড়ে প্রবেশ করেন। ফারোয়াদের ভৌতিক আবেশ উপেক্ষা করে নেমে যান পিরামিডের কন্দরে। তলিয়ে যান সমুদ্রের অতলে। স্বর্ণ করে আসেন [illegible] কোনও বজ্রজাহাজের ডুবো কঙ্কাল। আমরা আরাম কেদারায় বসে আমাদের [illegible] সেই কাহিনী পড়ি। বলি, অ্যাডভেঞ্চার পড়ছি।

১৮৮৬ [illegible] জার্মান ঔষধ বিজ্ঞানী লুডভিগ লেউইন প্রথম ক্যাকটাস সম্পর্কে তাঁর সুদীর্ঘ [illegible] পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন। পরবর্তীকালে এই প্রজাতির ল্যাটিন নামের সঙ্গে তাঁর [illegible] হল অ্যানহালোনিয়াম লেউইনি। বিজ্ঞানে এই গবেষণা সম্পূর্ণ নতুন। আদি মানবের [illegible] মেকসিকোর ইন্ডিয়ানদের কাছে দক্ষিণ পশ্চিম আমেরিকার আদিবাসীদের কাছে এই মনসা [illegible]। [illegible] বলি মা মনসা। মনসা আমাদের লোকস্মৃতিতে দেবী। মেকসিকোর [illegible] বলেছিলেন যে স্প্যানিশ কনকুইস্তাদররা তাদের একজন ঠিক একই কথা বলেছিলেন। [illegible] এবং জায়গায় বসে মায়া ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ভাগ করে গাছের শিকড় খাচ্ছিলেন। [illegible] ভাষায় 'পেয়োতল' [illegible] এক জাতের মনসা। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তাঁরা [illegible] এক ভিন্নতর জগতে নিজেদের হারিয়ে ফেললেন। [illegible] বললেন, [illegible] বন্ধু। না বন্ধু নয় [illegible] দেবতা। তাদের [illegible] প্রতিচ্ছায়া মা মনসা। [illegible]

[illegible] পেয়োতল' নির্যাসের [illegible] হ্যাভেলক এলিস, উইর মিচেল প্রমুখ বিশ্ব [illegible] লেখা করে গেছেন। তবে প্রত্যেকেই একটা জায়গা অবধি গিয়েই থেমে পড়েছেন [illegible] পশ্চিমী বুদ্ধিতে আর [illegible] হবার সাহস পাননি [illegible] তাহলেও হাঁ [illegible] ছেড়ে দিতে হয় [illegible] আমিকে। চলে যেতে হয় 'অনামি'র জ্যোতির্জগতে। যেখানে, সহস্রশীর্ষা [illegible] সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো [illegible]। [illegible] প্রত্যক্ষ করা [illegible] সেই [illegible] মহাপুরুষ, যাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বতোভাবে পরিবেষ্টন করে আছেন। সেই আলিঙ্গনে [illegible] পৃথিবী অথবা ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ মাত্র দশ আঙুল। [illegible] হল তাঁর জ্যোতির উল্লাস।

সেই তাবু রেস্তোরাঁয় সকলেই প্রায় 'টেকুইলা' পান করছেন। 'মেসকালিন'-এর তরল লঘু সংস্করণ। ঋষির মতো সেই সব মানব-মানবীরা ক্রমশই চেতন থেকে অতি চেতন জগতের দিকে এগিয়ে চলেছেন। চোখ, মুখ দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছে। স্থির দৃষ্টি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। দেহের সমস্ত চঞ্চলতা ক্রমেই শান্ত হয়ে আসছে। এখন মনে হচ্ছে আমরা কোনও খানাপিনার

জায়গায় আসিনি, এসে পড়েছি কোনও ধ্যান মন্দিরে। অবাক হয়ে গেলুম দেখে, কোণে কোণে ধূপ জ্বলছে। চন্দন আর কস্তুরির গন্ধ। সঙ্গে অন্য কোনো রজনও জ্বলছে। তিন রকমের গন্ধ মিশে তৈরি হয়েছে অপূর্ব এক সুগন্ধ। সেই সুগন্ধে মিলেছে 'মোল পোবলানোর' সুবাস। আমাদের বিপরীত দিকে বসেছে সেই ফুলওয়ালী ইন্ডিয়ান রমণী। তার উপহার দেওয়া এক রাশ সাদা ফুল অ্যানের কোলে জড়ো হয়ে আছে। সেই ফুলও যত রাত বাড়ছে ততই গন্ধে পাগল হয়ে উঠছে।

সকলেই অল্প অল্প কথা বলছে। মায়া ভাষা ভীষণ সুরেলা। অনেকটা সঙ্গীতের মতো। সাধারণ কথা; মনে হচ্ছে গান গাইছেন সকলে। কিছুই বুঝছি না; তবু সম্মোহিত। একাক্ষরী ভাষা। বিশাল বিশাল বাক্য তৈরির প্রয়োজন হচ্ছে না। এ ভাষার ব্যাকরণ মনে হয় খুবই সহজ হবে। একটা শব্দ বারে বারেই আসছে, 'পোল' 'পোল' মানে কি?

ফুলওয়ালী যাকে আমি রাত আর একটু গড়াতেই ফুলদি বলে সম্বোধন করেছিলুম, তিনি বললেন, 'পোল' মানে মাথা, হেড। ফুলদি মায়া তো জানেনই স্প্যানিশ শিখেছেন। ট্যুরিস্টদের সংস্পর্শে এসে ইংরেজির কাজ চলা জ্ঞানও হয়েছে। তিনি ভাল ছাত্র পেয়ে আমাকে শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মায়া ভাষায় যা বলে শিখিয়ে দিলেন। মাথা হল পোল, মুখ উইচ, চোখ সোত্‌স, বুক সেম, পেট নাহ্‌ক, পিঠ পুচ, হাত কা, হাঁটু পিশ, পা ওক, পেটের ভেতর কচ।

অ্যান আমার হাতে হাত রেখে ফিসফিস করে বললে, 'এক পাত্র তেকুইলা খাবে না কি! এ সুযোগ তো আর সহসা আসবে না।'

সব কথাই ফিসফিস করে বলতে হচ্ছে। এ হল সংগীতের দেশ। কম কথার দেশ। স্বপ্নাবেশের দেশ।

আমি বললুম, 'যদি কিছু হয়?'

'কিছুই হবে না। হলে, ভাগ্য ভাল হলে আধ্যাত্মিক একটা অনুভূতি হবে। সৎ চিৎ আনন্দ। সচ্চিদানন্দ হয়ে যাবো।'

সেই মুহূর্তে অ্যানকে এত ভাল লাগল। এ তো নিউক্লিয়ার এজ, জেট এজের মেয়ে নয়। বিশ্বাসে চালচলনে সম্পূর্ণ ভারতীয়। অ্যানকে কোনও দিন যদি আমার মাতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারতুম আমাদের সারদামঠে তাহলে বেশ হত।

আমি বললুম, 'বেশ, তাহলে বলো, দেখা যাক কি হয়!'

ফুলদি বললে, 'দাঁড়াও, আমি বলে দিচ্ছি।'

মহিলা সাপের মতো 'হিস' করে একটা শব্দ করলেন। একজন সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন আমাদের কাছে। তাঁর বুকের কাছে দুলছে গোল একটা আয়না। মাঝে মাঝে সেই রকম কোণে এলে বিদ্যুতের মতো আলোর চমক হচ্ছে। ফুলদি তিনটে আঙুল তুলে ইশারা করলেন।

তিন চার চুমুক 'তেকুইলা' খাবার পর পানীয়টি বেশ স্বাদে ভরে গেল। মদ সম্পর্কে আমার এবং অ্যানের দু'জনেরই অভিজ্ঞতা শূন্য। শুনেছি হুইস্কি, ব্র্যান্ডি, রাম ইত্যাদি মোটেই সুস্বাদু নয়। মানুষ নেশার কারণে খায়। তেকুইলা কিন্তু স্বাদে অসহনীয় নয়। আধ গেলাস পান করার পর পায়ের দিক থেকে শরীরটা ক্রমশ হালকা হতে শুরু করল। আগে একটা পা তুলে এ-পাশ থেকে ও-পাশে নিয়ে যেতে, বা তুলে একই জায়গায় নামাতে যতটা শক্তির প্রয়োজন হচ্ছিল, এখন আর তা হচ্ছে না। গোটা শরীর একেবারে পালকের মতো হালকা হয়ে গেছে। সব কিছু ভীষণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সমস্ত কিছুর ভেতর থেকে যেন তার নিজস্ব আলো বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, আমরা আর ঘটনার বাইরে নেই, ঘটনায় ডুবে গেছি, জলে ডুবে যাবার মতো। নিজেকে আর কোনও কিছু থেকে আলাদা মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে আমিই সব। আমিই অ্যান। আমিই ফুলমাসি বা ফুলদিদি। আমিই ওয়েটার। যাঁরা এখানে টেবিলে টেবিলে বসে আছেন, তাঁরাও আমি। গেলাস আমি, প্লেট আমি। আমিই পানীয়। আমিই খাদ্যবস্তু, সব আমি। ম্যাড়ম্যাড়ে ম্রিয়মান। আমি নই, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান আমি। আরও কয়েক ঢোক পান করার পর মনে হল, বস্তুজগৎ হল আলো। সেই আলো আর আলো, আর আলোক সমুদ্রে ছায়াসম্ ভাসে বিশ্ব। বস্তুপুঞ্জ। একসময় মনে হতে

লাগল, এক থেকে আর এক, আর এক থেকে আর এক হয়ে যাচ্ছে। একই বহু, বহুই এক হয়ে যাচ্ছে। আমার আর কিছুই করার নেই। বসে আছি নিশ্চেষ্ট এক সাক্ষী পুরুষের মতো। আনন্দময় এক মহাপুরুষের মতো। সৎ চিৎ আনন্দ শোনাই ছিল, অভিজ্ঞতাটা হল 'তেকুইলা' পানের পর।

অ্যান আমার কাঁধে হাত রেখেছে। আমি অ্যানের কাঁধে। এখন এই লেখার সময় আমি, তুমি ভেদ আসছে, তখন কিন্তু কে আমি কে তুমি এই ভেদ একেবারেই ঘুচে গিয়েছিল। 'ফিউসান' সব কিছুর সঙ্গে সব কিছু যুক্ত হয়ে যাওয়া। দেহের আমি র চার ভাগ ঘুচে গেলেও একের চার ভাগ অবশিষ্ট পড়েছিল তলানির মতো দেহভাণ্ডে। সেই এক চতুর্থাংশ আমার বোধে সাহায্য করেছিল। আমার সংস্কার অনুযায়ী দেব দেবী ও অবতার পুরুষদের আবির্ভাব হতে লাগল। 'টাইম ও স্পেস সিকোয়েনস্' উবে গেল। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের বোধ লোপাট। এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুর প্রকৃত দূরত্ব কত আর বলা যাবে না। হঠাৎ মনে হল বাইরের পথটা আমাদের টেবিলের উপর দিয়ে চলে গেছে। টেবিলের ওপরের গেলাসটা কতটা হাত বাড়ালে পাবো সেই আন্দাজটা আর নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে দেশ-কাল-পাত্রের বোধটাও চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সামনে পরিবেশিত হল সেই বিখ্যাত 'ন্যাশনাল ফুড' মোল পোবলানো। আর তো বলতে পারবো না, ওই খাদ্য প্রকৃত কেমন স্বাদু কেন না খাদ্যখাদক সম্পর্ক সম্পূর্ণ লুপ্ত। ব্রহ্মানুভূতিতে মানুষের আনন্দ আর একাত্মতা বোধ ছাড়া আর কিছু থাকে না। তবু যা মনে হল বলি, যেন স্বর্গের উদ্যানে বসে অভিজ্ঞতার উৎকৃষ্টতম খাদ্যটি গ্রহণ করছি। হঠাৎ মনে হল আমরা উল্টে গেছি। আমাদের মাথা মেঝের দিকে। আমরা শূন্য থেকে সেই অবস্থায় নিচের দিকে হাত বাড়িয়ে খাদ্য গ্রহণ করছি। ভোজনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম না মেনে অক্লেশে উদরে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, ঘরটা সবুজ জলপূর্ণ এক জলাধার, আর আমরা কেউ মানুষ নই, অসংখ্য লাল নীল মাছ। নিজেদের ইচ্ছে মতো অক্লেশে এদিকে ওদিকে খেলে বেড়াচ্ছি।

আর কিছুক্ষণ পরে দেহবোধ একেবারেই চলে গেল। মনে হল কোটি কোটি আলোকরেণু অভ্রের কুচির মতো ঘরের আকাশে প্রচণ্ড গতিতে ছোটাছুটি করছে এদিকে ওদিকে। নিউক্লিয়ার ফিজিকসের সত্য উপলব্ধি করার সৌভাগ্য হল তেকুইলার কল্যাণে। শরীর ভেঙ্গে গেছে। পরিণত হয়েছে অসংখ্য চার্জড পার্টিকলে। কণাগুলো মরছে আবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হচ্ছে নতুন কণা। বায়ুমণ্ডল থরথর করে কাঁপছে। এমন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি, যে শব্দ পূর্বে কখনও শুনিনি। মৃদু কিন্তু অশ্রুত।

স্বাভাবিক অবস্থায় যখন আবার ফিরে পেলুম নিজেদের তখন ভোরের আলো ফুটে গেছে। আমরা দু'জনে পরস্পরের ওপর হেলান দিয়ে বসে আছি। আমাদের সামনে টেবিল পরিষ্কার তকতকে। নীল দুটি ছোট্ট পোরসিলিনের পাত্রে ধবধবে সাদা গুঁড়ো মতো একটি পদার্থ। চিকচিক করছে ভোরের আলোয়। পাশে একটি করে তাজা লাল গোলাপ। আমাদের সোজা হতে দেখে ইন্ডিয়ান ওয়েটার এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এসে অদ্ভুত একটা কথা বললেন, 'গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়ে পাত্রের চিনিটা খেয়ে ফেলো। তোমাদের শরীরের পক্ষে ভালো হবে।'

তেকুইলার প্রভাব কেটে গেছে। এসে গেছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, মৃত্যুভয়। আমরা ব্রহ্মানুভূতি থেকে ফিরে এসেছি জগদানুভূতিতে। আমরা অবিশ্বাস নিয়ে সেই প্রাচীন, পাথরে কোঁদো মুখটির দিকে তাকালুম। সামনে সিঁথি। পাতা পেড়ে আঁচড়ানো লম্বা চুল। কপালে রঙিন হেড বান্ড। ডান পাশে গোলমতো পাতলা একটি আয়না গোঁজা। কোমরে জড়ানো এক ফালি কাপড়। মেটে হলুদ রঙের ওপর পাঁচ হাজার বছর আগের নকশা আঁকা লাল-কালোতে। চওড়া বুক। আজানুলম্বিত বাহু।

আমাদের তাকাতে দেখে মায়া মন্দির গাত্রের সজীব সেই পুরোহিত বললেন, 'আমার আদেশে অবাক হচ্ছ তো, কিন্তু ভুলে যেও না, তোমরা আছো মায়া ভূমিতে। এদেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তোমাদের দেশের অভিজ্ঞতার মিল পাবে না। যা বলি শোনো। এদেশে আমরা ফায়ার আর্থ আর এয়ার খাই। অবাক তো! পরে জানতে পারবে। অভিজ্ঞতা হবে। এখন যা বলছি খেয়ে নাও।'

আমরা দু'জনে ছাড়া দোকানে আর কেউ নেই।

প্রশ্ন করলুম, 'আর সকলে গেলেন কোথায়?'

'বাড়ি।'

'আমরা এখানে পড়ে আছি কেন?'

'প্রথম অভিজ্ঞতা বলে।'

পাত্রে শুধু চিনি ছিল না। কোনও একটা গাছের রজন বা গঁদ জাতীয় নির্যাস মেশানো ছিল তার সঙ্গে গোলাপ। বাসি মুখের স্বাদ আর গন্ধ দুটোই পাল্টে গেল। মনে হল আমাদের অন্ধকার জৈব মুখগহ্বরেই যেন ভোরের আলো ফুটছে। শরীরের সমস্ত জড়তা কেটে যাচ্ছে। ক্রমশই আমরা সুশীতল হয়ে উঠছি।

আমরা পথে নেমে এলুম। একটা রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল। হলফ করে বলতে পারি এমন রাত জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসবে না। অ্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল সে যেন গোলাপের মতো সদ্য ফুটে উঠেছে। নিজের মুখ তো আর আয়না ছাড়া দেখা যায় না। গোটা শহরটাকে এরই মধ্যে ধুয়ে মুছে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলা হয়েছে। এঁদের অসীম ক্ষমতা। আমরা প্লাজা দেল জোকালো ধরে বেড়াতে এগিয়ে চলেছি। এই প্রথম পাখির ডাক শুনতে পেলুম। দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ভারিক্কি ডাক শুনে মনে হচ্ছে আমাদের দেশের দোয়েল বুলবুল নয়। ম্যাকাও হতে পারে। কাকাতুয়া হতে পারে। একটা ঈগল পাক মারছে আকাশে অকারণে অবশ্যই নয়। ব্রেকফাস্টের সন্ধান করছে। ঈগল এই প্রথম দেখলুম। চিলের বড়দা! কি ম্যাজিস্টিক ওড়ার ভঙ্গি। এদেশের ইনসিগনিয়া সেই কারণেই মনে হয় ঈগল।

বিশাল এক প্রাসাদের সামনে এসে আমাদের চলা থেমে গেল। প্রাসাদই থামিয়ে দিল। যেন ফিসফিস করে বলছে দাঁড়াও পথিকবর। বিশাল প্রবেশ দ্বারের বাঁপাশে আর একটি ক্ষুদ্র দুয়ার। তার মাথার ওপর বিশাল কালো অক্ষরে লেখা ইংরেজি সি। আমি প্রায় পাঁচশ' বছরের প্রাচীন। পাঁচশ' বছর আগে এই সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন ওই শহরেরই স্থাপক ডন ফ্রানসিসকো দা মোন্তেজো।

উল্টো দিকের ফুটপাতে একটা পার্কের সামনে সেই প্রাচীন প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে আমরা থ' মেরে দাড়িয়ে আছি। কিভাবে তৈরি হয়েছিলো বিজেতার এই আবাসস্থল, কী কায়দায় সংরক্ষিত যে এখনও নতুনের মতোই হয়ে আছে। জরা পারেনি তার লোল হাতেব ছোঁয়া লাগাতে। মেকসিকোর পাথরে কেটে তৈরি। মাথা ভারতীয় দাসদের ঘাম ঝরিয়ে তৈরি। অ্যান বললে এই বাড়ির সামনেটাকে আর্কিটেকচারের ভাষায় বলে প্ল্যাটেরেক্স স্টাইল।

মূল প্রবেশ দরজার মাথার ওপর ছোট হালকা একটা ঝুলবারান্দা। বারান্দাব চারপাশ আর মাথাব ওপর দিয়ে একটা অসাধাবণ ও জটিল কারুকার্য উঠে গেছে ছাদেব কার্নিস পর্যন্ত। ছাদেব সামনেটা ত্রিভুজাকৃতির ওই কারুকার্যের মধ্যে বারান্দার দু'পাশে খাড়া দাঁড়িয়ে পাথরে কোঁদা এই বিশাল স্প্যানিশ সৈনিক। কোমর থেকে ঝুলছে চওড়া তরোয়াল। তাদের পায়ের কাছে দু'পাশে দুই ছোট মূর্তি। প্রসাদের এই অংশের কারুকার্য দেখার মতো। পাথরের ঢেউ খেলানো কার্নিশ। সরু লম্বা খাঁজকাটা থামের ওপর চৌকো খিলান। নিচেব দিকে অলংকবণের মধ্যে দু'পাশে দুই বৃত্ত। সেই বৃত্তের মধ্যে উৎকীর্ণ নিখুঁত দুটি মুখ। হয়তো কোনও দুই হিস্পানি। মহাপুরুষেরই হবে।

আমাদের মাথার ওপর ঝুঁকে আছে ঝাঁকড়া কয়েকটা গাছ। অচেনা অজানা জায়গায় চেনা গাছকেও অচেনা মনে হয়। মেরিডার পরিষ্কার ঝরঝরে বাতাসে গাছ দুলে দুলে উঠছে। সর্বত্র ভাসছে মৃদু একটা গন্ধ। ফুলেরই গন্ধ। অনেকটা দামি ওডিকলনের মতো। মেরিডা হল সুগন্ধ সুবাতাস আর সুন্দরী তরুণীদের দেশ।

এখানে ঘোড়ার গাড়িকে বলে কালাশ। এক্ষুণি একটা কালাশ চলে গেল ধীর গমনে আমাদের সামনে দিয়ে। লম্বা গাউন পরে আসনে বসে আছেন এক তরুণী। মাথায় লেসের কাজ করা রিম দেওয়া টুপি। পাথবের স্ল্যাব বাঁধানো পরিষ্কার রাজপথে ঘোড়ার পায়ের শব্দ যেন সঙ্গীত। কালাশের পাশে মোটর গাড়ির কোন আভিজাত্যই নেই। দু-একটা সাদা মোটর গাড়ি পরিমিত চওড়া রাজপথ ধরে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। মাথা উঁচু ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা বাড়ির শহর এটা নয়। বেশির ভাগ বাড়িই মাথা উঁচু নয়, পাশে বড়। ভার্টিক্যাল নয়, হরাইজেন্টাল। সবই প্রাসাদ। ফিউডাল লর্ডদের সিটি। প্রচুর অর্থ, প্রচুর শ্রম আর রাজকীয় মেজাজে তৈবি। এই শহরে আধুনিক কালের যে কোনও মানুষেরই নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হবে।

প্রাচীন শহব যত প্রাচীনই থাকাব চেষ্টা করুক, আধুনিক ব্যবসাব অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারেনি। মোন্তেজোব প্রাসাদেব দেওয়ালে উঁচিয়ে আছে কোকাকোলাব বিখ্যাত বিজ্ঞাপন। সেই পবিচিত অক্ষরের প্যাঁচ। সোনাবোদে শহবটিকে সজল স্নিগ্ধ জৈন সন্ন্যাসীব মতো দেখাচ্ছে। প্রাসাদটিব পবেই পথের চৌমোহনা। হঠাৎ ডান পাশেব পথ থেকে বেবিয়ে এল কমলালেবু বঙেব একটি স্টেশান ওয়াগন। কোকাকোলাব গাড়ি। চৌমাথাব ওপাশেব বাড়িব গায়ে আব একটি বিজ্ঞাপন 'লিবাভ'। আমেবিকান কোম্পানি ছেড়ে কথা কইবে।

মোন্তেজোর এই প্রাসাদ হল শহবেব এক নম্বব বাড়ি। হঠাৎ সাবা শহবেব ওপব আছড়ে পড়ল গম্ভীব ঘন্টাব শব্দ। জনজীবন থমকে গেল ক্ষণিকেব জন্য। শহবেব সর্ব বৃহৎ চার্চ মেবিডা ক্যাথিড্রালেব ঘন্টা। সবচেয়ে বড প্রার্থনাব স্থান। আমবা এগিয়ে গেলুম সেইদিকে। স্প্যানিশ আবকিটেকচাবেব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ক্যাথিড্রাল ও ফোর্টেব অদ্ভুত সমন্বয়। স্পেনেব সান 'ক্রস্টোবালেব মত এ। সেকালেব নিযমে ধর্ম ও বমকে এক করে ফেলা হত। তবোযালেব পেছন পেছন ছুটে আসত বাইবেল। ক্যাথলিক ধর্ম।

ভাবতে আমবা যে ধবনেব ছিমছাম চার্চ দেখি, এ চার্চ সেবকম নয়। এ হল গিজা-দুর্গ। দুর্গগির্জাও বলা চলে। আসলে ফোর্ট। ফোর্টেব দু'পাশে জুড়ে দেওয়া হয়েছে গির্জাব চূড়া। একেবাবে সলিড কনস্ট্রাকসান।

৬১

মেবিডা ক্যাথিড্রাল পাথবেব ইট গেঁথে তৈবি সাতটা তোপ মাবলেও দেয়াল ফুটো কবা যাবে না। চাবপাশ ভীষণ উঁচু পাঁচিলে ঘেবা। বাড়িটাব আলাদা একটা অথবিটি আছে। সামনে দাঁড়ালেই কেমন যেন একটা ভয ভয কবে। পাথবেব গায়েব শ্যাওলা ইচ্ছে কবেই বাখা হয়েছে। প্রাচীনত্ব বোঝাবাব জন্য। গির্জাটি পবিত্যক্ত নয। শহবেব এইটাই প্রধানতম গির্জা ও প্রার্থনা কেন্দ্র। সামনে অতি প্রশস্ত এক ফুটপাত। নিটোল নিবেট পাথবে বাধানো। গির্জাব সামনে দাঁড়িযে নিজেদেব যখন তুলনা কবছি তখন মনে হচ্ছে আমবা দুটো ইঁদুব। এত ক্ষুদ্র আমবা। প্রধান প্রবেশ পথ এত বিশাল যে আবোহী সমেত পাশাপাশি দশটা গাড়ি ঢুকে যেতে পাবে। পাশে অপেক্ষাকৃত আব একটি ক্ষুদ্র দবজা। দুটি দবজাই দুর্ভেদ্য। যেমন দুর্গেব দবজা হয়। আমবা ভয়ে ভয়ে ক্ষুদ্র দবজা দিয়ে ভেতবে তাকালুম। বিশাল বিশাল একটি প্রান্তব। ওই পাথুবে প্রাঙ্গণে সেকালে প্রার্থনাও হত আবাব সৈন্যবাহিনীও কুচকাওয়াজ কবত। ওপব থেকে নেমে এসেছে সূর্যেব আলো। ঝাঁক ঝাঁক পাযবাব মতো।

মেবিডাব ঘোড়াব পায়েব শব্দ যেন কবিতাব মত। 'কালাশ'টা ক্রমশ দূব থেকে দূবে চলে গেল। অ্যান বললে, 'আমাদেব আব ঘোড়াব গাড়ি চাপা হল না, কাল থেকে এত চেষ্টা কবলুম'।

'আজ হবে।'

'আব কখন হবে?'

'এখনই হবে।'

'তোমাব হোটেলে ফিবতে ইচ্ছে কবছে না?'

'আমাব তো ফ্রেশ লাগছে। তোমাব কি বকম লাগছে?'

'আমাবও ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে এইমাত্র ভোবেব ফুলেব মত ফুটেছি।'

সত্যিই অ্যানকে খুব সুন্দব দেখাচ্ছে। তাজা গোলাপেব মত। আমবা হাঁটতে হাঁটতে প্যাসিযো মোন্তেজো ধবে হাঁটতে লাগলুম। কোথায় একটা কালাশ পাওয়া যায়। অ্যানকে পাশে বসিয়ে দুলকি চালে সাবা শহবটা একবার ঘুবে আসব। এই শহবের ঈশ্বব বোধহয় শুনতে পেলেন আমাদের প্রার্থনা, বাস্তার বাঁ পাশে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোন যাত্রী নেই। স্বাস্থ্যবান সাদা ঘোড়াটি চামরের মত লেজটি দোলাচ্ছে। চালক স্প্যানিশ তরুণটি একটু দূবে একটি গাছেব তলায় দাঁড়িয়ে

আপন মনে সিগারেট টানছে। গাছের উঁচু ডালে এক ঝাঁক চন্দনা পাখি সভা করছে। জায়গাটা এত সুন্দর, মনে হচ্ছে সব ছেড়ে ছবি আঁকতে বসে যাই। অ্যান এগিয়ে গেল। যুবকটির সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় কি সব কথা হল তারপর ইশারায় আমাকে বললে, উঠে বস।

আমরা দু'জনে উঠে বসামাত্রই গাড়ি গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলল। সেই কোন ছেলেবেলায় কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি চেপেছিলুম। সে গাড়ি আর এ গাড়িতে অনেক তফাৎ, সেই পথ আর এই পথ এক নয়। এত সমতল রাস্তা আপাতত কলকাতায় নেই। বাতাস এত পরিষ্কার মনে হচ্ছে আমার দু'টো ফুসফুস অবাক হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোন শহরে এমন ফুলের গন্ধ আছে কিনা জানি না, আমার নাক নর্দমা আর আবর্জনার গন্ধেই অভ্যস্ত, এই রাস্তার দু'পাশে সারি সারি প্রাসাদোপম বাড়ি। প্রতিটি বাড়িরই পঁচিশ বছরের পুরনো ইতিহাস আছে। যে কোন বাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় ভাল শ্রোতা পেলে কত কথাই যেন বলার আছে। হঠাৎ গাড়িটি একটি বিশাল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফলকে লেখা রয়েছে, 'প্যালেসিয়ো ক্যান্টন'। গাড়ির চালক অ্যানকে কিছু বলল, অ্যান আমাকে বললে, 'এই বাড়িটা একসময় প্রাক্তন গভর্নারের বাসস্থান ছিল। তার মানে 'গভর্নার হাউস'। এখন এখানে লাইব্রেরি ও আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম হয়েছে। দুটোই এখন বন্ধ, খুলবে সেই সকাল দশটার পর। আমরা বাইরে থেকে বাড়িটার সৌন্দর্য দেখে এগিয়ে চললুম সামনের দিকে। এই দেশটিকে, ঠিক এই দেশটিকে নয় আর একটু এগিয়ে ইনকাদের দেশকে অর্থাৎ পেরুকে বলা হয়, 'সোয়েট অফ দি সান, টিয়ারস অফ দি মুন।' সূর্যের ঘাম হল সোনা চাঁদের কান্না হল রূপো। শ'দুয়েক স্প্যানিশ কনকুইস্তাদর অত বড় একটা ইনকা সভ্যতাকে শুধু ঘোড়া আর কয়েকটা কামানের জোরে তছনছ করে দিয়েছে। বন্দী করেছিল ঈশ্বরের সমান তাদের রাজাকে রাজা মুক্তিপণ হিসাবে দিয়েছিলেন ঘরভর্তি সোনা, তাতে অবশ্য তার প্রাণরক্ষা হয়নি। বিশ্বাসঘাতকরা বিচারের তামাসা করে ইনকার জনাকীর্ণ রাজাকে গলা টিপে হত্যা করেছিলেন, এত সোনা, এত রূপো পৃথিবীর আর কোথাও নেই। গাড়িতে যেতে যেতে পাঁচশ' বছর আগের এই রোমহর্ষক কাহিনীকে মনে আসছিল, কারণ সোনাঝরা রোদ কোন উত্তাপ নেই, শুধু বর্ণ। সারা শহরটাকে মায়াদের উপাস্য দেবতা সূর্য যেন সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন, ফোয়ারা দিয়ে জল উঠছে যেন রূপোর ধারা। কেবলই মনে হচ্ছিল এই শহরে যদি একটা ঝাড়ুদারের কাজও পাই, তা হলে সারা জীবন থেকে যাই।

হঠাৎ আমাদের সামনে এগিয়ে এল অসাধারণ এক স্মৃতিস্তম্ভ। আমরা সমস্বরে বললুম, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' ঘোড়ার চলা শান্ত হল। চালক বললেন 'এটা হল মনুমেন্ট, মায়া ডিজাইনে তৈরি। এর মধ্যে ধরা আছে মেক্সিকোর গত পঁচিশ বছরের ইতিহাস, নির্মাতা কর্লাম্বিয়ার বিখ্যাত এক ভাস্কর রোমুলো রোজা।' এই মনুমেন্টে এসেই প্যাসিয়ো মন্তেজো শেষ হল, আমাদের গাড়ি ঘুরে গেল ডানদিকে। মেরিডা শহরটি যেন এক মরূদ্যান। মেরিডার চারপাশে রুক্ষ প্রায় তরুহীন বিশাল এক অঞ্চল নিজের ঢেউ নিজের বুকে ধারণ করে স্তব্ধ হয়ে আছে। আকাশ থেকে দেখলে বেশ অবাক হতে হয়, প্রকৃতির এ কি খেলা। কেন এমন হল' ভূগোলে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ ধূ প্রান্তর, কোথাও উঁচু কোথাও নিচু প্রায় গহ্বরের মত। কোথাও এত উঁচু যেন পাহাড়। চারপাশে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। হাজার বছরের সাধনায় উৎকৃষ্টতম যে সভ্যতাটি মানুষ রচনা করেছিল লোভী একদল মানুষ এসে কোনও দ্বিধা না করে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। অটুট সেই সভ্যতাটিকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের আর হবে না। আমরা আসি ধ্বংসস্তূপ দেখতে। ইতিহাস আমাদের হাত ধরে বর্তমান থেকে নিয়ে যায় অতীতে সেটাই হল আমাদের রোমাঞ্চ।

অপূর্ব এক বাগানের সামনে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির চালক বললেন, 'আমি আপনাদের অনুরোধ করব আমাকে ছেড়ে দিয়ে আপনারা এই বাগানটিকে ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখুন। এই শহরে যে তিনটি শ্রেষ্ঠ উদ্যান আছে, এটি তার অন্যতম, এই পার্কটির নাম পার্ক-দেল সেন্টিনারিয়ো। আর দুটি পার্কের নাম পার্ক-দ্য-লাস আমেরিকান আর পার্ক-জুয়ারেজ।' চালক গাড়ি নিয়ে ফিরে গেলেন। আমরা সেই পার্কে প্রবেশ করলুম। উদ্যান রচনায় মেরিডার নগরপালের প্রশংসা না করে পারা গেল না। কলকাতায় অনেক পার্ক আছে, নামেই পার্ক। এই পার্কটি না দেখলে আমার ধারণাই হত না মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ে কত খেলাই না খেলতে পারে। পার্কটির মধ্যস্থলে

একটি বিশাল ফোয়ারা, ফোয়াবা মানে জল ছিটানো নয়। প্রতিভাবান শিল্পীরা সেই ফোয়ারাটিকে নানাভাবে অলঙ্কৃত করেছেন মায়া ডিজাইনে আর নীল জল তিন পাশেব পাথরের দেয়াল বেয়ে ধাপে ধাপে উঠছে আবার নেমে আসছে। আমবা ফোয়াবাটিব পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। কোথাও এতটুকু শ্যাওলা নেই, পাথবেব দেয়ালেব গায়ে খোদাই কবা হয়েছে নানা ডিজাইন। জলের হিসহিস শব্দ। মাথাব ওপব থেকে বোদ এসে পড়েছে, সেই বোদ খেয়াল খুশিমত তৈবি করছে বামধনু। ভিজে একটা ঠাণ্ডা ভাব আমাদের শবীবে ছড়িয়ে পড়েছে, আব তখন মনে হল স্নান কবতে পারলে ভাল হয়। চাবদিকে বেঁটে গাছ, ঢ্যাঙা গাছ, বাহাবি ঝোপ, চলাব পথ, ঘাসে ঢাকা ফাঁকা জমি যেন সবুজ গালচে। বিভিন্ন সুন্দব সুন্দব মূর্তি ও ভাস্কর্য। দেখলেই মনে হয পবিচর্যার সামান্যতম অবহেলা নেই। মূর্তিগুলি মায়া সভ্যতাব নিদর্শন থেকে ধাব কবা। দেখে আমাদেব এটাই মনে হচ্ছিল, একেই বলে বিবেকেব দংশন। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত একদল স্প্যানিশ জলদস্যু নির্বোধেব মতো যাদেব ধ্বংস করেছিল এখন তাদেবই শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলিকে পুনবায নির্মাণেব আপ্রাণ চেষ্টা। বর্তমান যেন এক অস্ফুট শিল্পবিলাপ– আমবা এ কি কবলাম।

পার্কটিতে ইতিমধ্যেই ভ্রমণার্থী ও ট্যুবিস্টদেব ভিড জমতে শুব করেছে। ক্যামেবা হাতে বিদেশী ট্যুবিস্টবা ছবিব পব ছবি তুলে চলেছেন। এক ফটোগ্রাফাব প্রকৃতি পেয়েছেন কিন্তু সামনে দাঁড করাব মানুষ পার্নান। অগত্যা আমাদেব অনুরোধ কবলেন, 'আপনাবা একটু সামনে দাঁড়ান, আপনাদেব সামনে বেখে আমি পেছনেব দৃশ্যটি ধবতে চাই। আশা কবি আপনাদেব আপত্তি হবে না।' আমাদেব পেছনে এমন একটি কুঞ্জ, যা দেখে মনে হল চাঁদেব আলোয এই কুঞ্জে আমাদেব শ্রীকৃষ্ণ আসেন বাঁশি বাজাতে। আমবা সামনে দাঁড়িযে গেলাম। ফটোগ্রাফাব ভদ্রলোক আমাদের দিকে ক্যামেবা তাক কবতে লাগলেন, হঠাৎ বললেন, একটু হাসুন।' একটু হাসিব প্রতি ক্যামেবাম্যানদেব কি দুর্বলতা। ছবি তোলাব অপব নাম হযতো 'প্লীজ লাফ'। ক্যামেবা গম্ভীব বিষণ্ণ উদাস অথবা দুঃখ দুখ মুখ পছন্দ করে না। ফটোগ্রাফাব কোন দেশেব মানুষ বুঝতে পাবলুম না তবে তাঁব খোলামেলা আচবণে মনে হল আমেবিকান। স্প্যানিশ ছেলে মেয়েবা খুব প্রেমিক হয। ইকসতাফাতেই তাব প্রমাণ পেয়েছি। এখানে আবও বেশি পেলুম। সবুজ শ্যামল গাছপালায ভবা এই উদ্যানে অনেক নিভৃতি আছে, সেখানে একটি ছেলে ও একটি মেয়েব একাধিক জুটি নজরে পড়ল। পৃথিবী ভুলে, জীবন ও জীবিকা ভুলে পাশাপাশি হাতে হাত বেখে ঘনিষ্ঠ হযে বসে আছে কেমন একটা সুখ সুখ বর্ণিল ভাব নিয়ে যা একমাত্র প্রেম মানুষকে দিতে পাবে। এমন একটা জাযগায হিংসাব কথা যুদ্ধেব কথা, জীবন যন্ত্রণাব কথা মনেই আসে না, স্বর্গোদ্যানেব কথা শুনেইছি, আমাব মনে হল সেই উদ্যান এব চেয়ে ভাল হতে পাবে না। আব একটি জিনিস চোখে পড়ল যা অবাক করে দেবাব মত। এক একটি ঝোপেব আড়ালে এক একজন মানুষ ধ্যানস্থ, চোখ বুজে ভাবতীয ভঙ্গিতে চুপচাপ বসে আছেন নিথব হযে। অ্যানকে প্রশ্ন কবলুম, 'ধ্যান এখানেও এসে গেছে?'

অ্যান বললে, 'ধ্যান আব জপ পৃথিবীব এপ্রান্তে ইদানীং খুব জনপ্রিয। ভাবতীয আধ্যাত্মিকতাব বিজয অভিযান শুরু হয়েছে আমাদেব এই বস্তুতান্ত্রিক দেশে। ভোগবাদ এদেশেব মানুষকে জর্জবিত করে তুলেছে ভাবতেব মানুষ দাবিদ্র্য থেকে মুক্তি চাইছে, আমবা চাইছি প্রাচুর্য থেকে মুক্তি। ভোগ আমাদেব চবিত্র নষ্ট করে দিচ্ছে, আমবা এখন ভোগ থেকে ত্যাগে আসতে চাইছি। আমাদেব এ-দেশে বামকৃষ্ণ ও হবেকৃষ্ণ মুভমেন্ট এখন প্রবল আকাব ধাবণ করেছে। ভাবতীয যোগ এখন প্রায় ঘবে ঘবে আমবা দেহটাকে এখনও তোমাদেব মত একেবাবে বাদ দিতে পাবিনি। আমাদেব আত্ম অনুসন্ধান ও দেহ সুখের অনুসন্ধান দুটোই পাশাপাশি চলেছে। তাবই উদাহবণ তোমাব চোখেব সামনে। এ কুঞ্জে প্রেম, ও-কুঞ্জে ধ্যান, তোমাদেব শ্রীকৃষ্ণেব কথা মনে কব।'

'শ্রীরামকৃষ্ণেব কথা তো শুনেছ, তিনিও বলতেন বাবেশে বাখিস মা।'

'তোমাদের এই মায়ের কনসেপশানটা ভাবি সুন্দব। আমার ভীষণ মা হতে ইচ্ছে করে। ছেলের মা নয় গুণেব মা।'

আমরা বিশাল একটা বার্চ গাছের তলায ঘাসেব ওপব বসলাম, বসাব সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানটা একটা অন্য চেহারা নিল। সমতল ঘাসেব মখমল, সামনে প্রসাবিত ফুলগাছের ঝোপ, পাতাবাহাব

গাছের ঝোপ, পায়ে চলা পথ সমস্ত কিছু উঠে এল চোখের সামনে। বাতাস আর সোনা-ঝরা রোদ দুয়ে মিলে অদ্ভুত এক শীতোষ্ণ অনুভূতি। বহু দূরে আকাশের গায়ে একটা চার্চের চূড়া স্পষ্ট একটি ক্রুশ। কাল সারারাত আমরা বসেই কাটিয়েছি। ঘুম ঘুম পাচ্ছে, অ্যান ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে গেল ঘুমের রাজত্বে। আমার মনোবল ভেঙে গেল। প্রথমে আধশোয়া তারপরে আর মনে নেই। তীব্র আলোয় যখন উঠে বসলুম, তখন সূর্য মধ্যগগনে। উদ্যানটি চলে গেছে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দলে। সকালের মানুষরা আর নেই আমরা দু'জন ছাড়া, অ্যান উঠে বসল, উদ্যানের বাইরের রাস্তায় খুব বাদ্য বাজনা চলেছে, আমরা বাইরে এলুম। সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে যুবক যুবতীরা নাচতে নাচতে চলেছে। এক একজনের মাথায় এক এক রকমের টুপি। মেয়েদের পরিধানে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা গাউন। প্রান্তভাগে লেসের ঝালর। কাঁধ ও বুকের কাছে ফ্রিল লাগানো। তারা যখন নাচছে ঘুরে ঘুরে, পোশাকের প্রান্তভাগ, মধ্যভাগ ফুলে ফুলে উঠছে। মনে হচ্ছে উটপাখি নাচছে, স্প্যানিশ সঙ্গীতের সুর ভারি মিষ্টি। সকলেরই পোশাকের রঙে সাদা তো আছেই, তার সঙ্গে আছে গাঢ় কমলালেবু ও নীল রঙ। মাঝে মাঝে মানানসই লাল। একটা জীবন্ত ছবি দেখছি। আনন্দের স্রোত বইছে। অ্যানকে জিজ্ঞেস করলুম, 'ব্যাপারটা কি?'

'ক্যানিভ্যাল চলেছে। এই শহরে রোজই এই ধরনের উৎসব হয়।'

'এ শহরে অভাব অভিযোগ দুঃখ-দুর্দশা নেই?'

'আছে, জীবন দুঃখ ছাড়া হয় না, দুঃখ ভারি জিনিস, জীবনপাত্রের তলায় পড়ে আছে। এ দেশের দর্শন হল পুরোটা বাঁচো, অন্তরালে গিয়ে নিভৃতে মরো, দুঃখ-দুর্দশাটাকে প্রদর্শনী করে তুলো না।'

ছেলে-মেয়ে যারা নাচছে, দেখে মনে হচ্ছে লাল টুকটুকে টম্যাটো আর পাকা বেদানা। এমন স্বাস্থ্য, এমন শরীর, এমন প্রাণ-প্রাচুর্য এরা কোথা থেকে পেল। আমরা একটা মোটর গাড়ি ধরে ফিরে চললুম হোটেলের দিকে। হোটেল থেকে আমরা প্রায় চব্বিশ ঘন্টা অনুপস্থিত। যেতে যেতে দেখলুম দুপুরের মেরিডা অন্য সুরে অন্য রঙে জেগে উঠেছে। অ্যান বললে, 'বেশ একটা ভাল ঘুম হয়ে গেল। সবুজ ঘুম। জীবনের আয়ু কম সে কম দশ বছর বেড়ে গেল। হোটেলে আমরা এখন স্নান করব, তারপর আবার বেরিয়ে পড়ব। এইবার তোমাকে একটা নতুন খাদ্য খাওয়াব, তার নাম হল পিবল চিকেন।'

হোটেলের রিসেপসানে একটি মেয়ে হাসি মুখে আমাদের চাবি এগিয়ে দিল, আর এগিয়ে দিল ছাপানো কার্ড। তাতে লেখা আছে সেদিনের খাদ্য তালিকা। আমাদের ঘরে ঢুকে অবাক। ঝকঝক তকতক করছে চারপাশ, সমস্ত পরদা আর বিছানার চাদর পাল্টে গেছে। টেবিলের ওপর ড্রয়ারের মাথায় স্প্যানিশ বেতের বাস্কেটে লাল আর সাদা গোলাপ, অ্যাপ্রিকটা, কলমালেবু, কলা ও পীচ ফল। সারা ঘরে অন্য কোন সুগন্ধ নয়, ফল আর ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

মেরিডার আশপাশের অঞ্চলে খুবই জলের অভাব। তার কারণ এই অঞ্চলের মাটির জলধারণ ক্ষমতা একেবারেই নেই বললেই চলে। মেকসিকোর ভূ-প্রকৃতি ভূগোলের এক বিস্ময়। বড় বড় কয়েকটি আগ্নেয়গিরির এক সময় বছরের পর বছর ধরে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে এখানকার জমি তৈরি করেছে। আগ্নেয়গিরি অভ্যন্তরভাগ থেকে বেরিয়ে এসেছে গলিত ধাতু, বেরিয়ে এসেছে গলা বালি। শীতল হবার পর সৃষ্টি হয়েছে বিচিত্র এক ভূ প্রকৃতি। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়েই চলে যায় তলায়, সেখানে কোন গহ্বর বা চার দেওয়াল আশ্রিত চৌবাচ্চার মত কোন জায়গা পেলে জল সেইখানে জমে থাকে। এই ভূগর্ভস্থ জল কোথাও উর্ধ্বচাপে ফোয়ারার মত বেরিয়ে আসে। একে বলে গিজার। কোথাও এই জলাধার পড়ে আছে খোলা আকাশের তলায়। এক সময় পানীয়-জলের এই ছিল উৎস। নিঃসন্দেহে খুবই পরিষ্কার জল, কারণ মাটির বিভিন্ন স্তরে ফিল্টার হতে হতে নেমে যাচ্ছে সঞ্চিত স্তরে, নামার সময় সঙ্গে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ। এই জলকে আমরা স্বাস্থ্যকর মিনারেল ওয়াটারও বলতে পারি। মেরিডায় কিন্তু তেমন জলের অভাব দেখলুম না। আমরা হোটেলের বাথরুমে বাথটাবে প্রায় শুশুকের মত উল্টে পাল্টে চান করলুম। মুখের জল নিয়ে মনে হল সোডা-ওয়াটার, মিষ্টি নয় কিন্তু তেজী। মেরিডার বাইরে যে অঞ্চল জুড়ে মায়াসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে সেই অঞ্চলটি সম্পূর্ণ রুক্ষ। বিশেষ গাছপালা নেই। মাটির ওপর জেগে

আছে শিলাখণ্ড ধূসর ধোঁয়াটে একটা ভাব। যেন একটা অভিশাপ এখনও ঝুলে আছে। ধূসর পথ তরুহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে দূরে। পথ কখনও উঠেছে কখনও নিচু হয়েছে। ছাই রঙের জমিতে কাঁটাগাছের ঝোপ। এই সব আমাকে দেখতে হয়েছিল পরের দিন।

আজই আমি পাঁচশ' বছরের প্রাচীন এক শহরে ছোটখাটো নিভৃত একটি হোটেলে মনের আনন্দে, স্নানের পর দিবানিদ্রা দেব কি না ভাবছি! দুই-একটা হাই ইতিমধ্যে উঠে গেছে, অ্যান বললে, 'তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে একটা ঘুম দেবার তালে আছ কিন্তু সে সুযোগ তোমাকে আমি দেব না। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যখন খুশি আমি চলে আসতে পারলেও ভারত থেকে তোমার আর দ্বিতীয়বার আসা সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। আমার কর্তব্য কম সময়ে যতটা পারা যায় দেখিয়ে দেওয়া। অতএব, বৎস, শয্যাত্যাগ কর, বস্ত্র পরিধান কর, নেমে চল রাস্তায়। আজ গোটা মেরিডাটা যেমন করেই হোক দেখে নিতে হবে। কাল সকালে আমাদের গন্তব্যস্থল 'উক্সমল'।'

আমাদের শাস্ত্রে বলে, নারী হলেন শক্তি। অ্যানই তার প্রমাণ। এমন প্রাণবন্ত মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না, এমন দূরদৃষ্টি, এমন বিচক্ষণতা সহসা চোখে পড়ে না। অ্যানের উৎসাহে আলস্য কেটে গেল। নেমে এলুম পথে।

সামনের রাস্তায় বেরোবার আগে আমরা নিচের দোকানগুলো একবার উঁকি মেরে নিলুম। এখানকার দোকান মানে স্বপ্নপুরী। মাঝে মাঝে নিজেকে ধমক লাগিয়েছি, ভ্রমণ মানেই খাওয়া আর কেনাকাটা নয়। তবু এই দোকানগুলির আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। মনে হয়েছে এগুলিও দ্রষ্টব্য। কারণ এরা আমার কল্পনাকে জাগাতে সাহায্য করেছে, আমার মনের ওপর অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া এনেছে। এ দেশের দোকানে পুরুষের স্থান নেই, সবাই মহিলা। আর এই মহিলারা 'মা' ডাক শোনার জন্য কাঙাল। এদের মা বলে ডাকলে এরা সন্তানের জন্যে জীবন দিতেও প্রস্তুত। সেই অভিজ্ঞতাই আমার হল। একটি দোকানে ঢুকে অ্যান বললে, 'বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে এসো তোমাকে কয়েকটি জিনিস কিনে দিই; লন্ডন, নিউইয়র্ক এই সব জায়গার জিনিস অনেকেই কিনতে পারেন কিন্তু মায়া শহরের জিনিস কেনা যায় না। অনেকদিন পরে তোমার দেশে গিয়ে এক-একটি জিনিস দেখবে আর তখন চোখের সামনে ভেসে উঠবে এই সুন্দর সাদা শহরটি, যার রাস্তা স্লেট পাথরে তৈরি, যার ফুটপাতে বসানো শ্বেত পাথর, যার আকাশের গায়ে দুর্গের মত গির্জার চূড়া, যে শহরের স্থাপত্যে মায়া ও হিসপানি ভাস্কর্যের মিলন, যে শহরের প্রতিটি বাড়ির মাথায় একাধিক গম্বুজ, যে শহরে প্রতিটি দেয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ অসাধারণ সব কারুকার্য। সেই শহরের স্মৃতি চিরজীবন তোমার সঙ্গে থাক এইটাই আমি চাই।'

দোকানের মহিলাটি মধ্যবয়সী, পাকা পেয়ারার মত চেহারা। যৌবনে যে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন তা বোঝা যায়। লাল পাড় সিল্কের শাড়ি আর কপালে একটি সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলে মনে হবে আমার মা। তাই আমি মাদার বলে সম্বোধন করে হাতটি কাউন্টারে রাখতেই তীব্র একটা জ্বালা অনুভব করলাম। আমি লক্ষ্য করি কবিনি যে ওখানে একটি অ্যাশট্রের ওপর জ্বলন্ত একটি সিগারেট ছিল। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতটা নিয়ে খুব লজ্জিতভাবে ফুঁ দিতে থাকলেন। অ্যানকে বললেন, 'তুমি একটু থাক আমি হোটেল থেকে একটু বরফ নিয়ে আসি।'

অ্যান বললে, 'আপনি থাকুন, আমি যাচ্ছি।'

মহিলা বললেন, 'তুমি গেলে দেরি হবে, আমি হোটেলের নাড়ি নক্ষত্র জানি।'

মহিলা দ্রুত বেরিয়ে গেলেন আর ঠিক সেই সময় ছোট্ট ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে এক ভদ্রলোক নেমে এলেন। নেমে এসে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, কাউন্টারের সেই জায়গায় এসে কিছু খুঁজতে লাগলেন।

অ্যান বললে, 'আপনি নিশ্চয় আপনার সিগারেটটা খুঁজছেন?'

ভদ্রভাবে বললেন, 'ঠিক ধরেছেন।'

অ্যান বললে, 'আপনি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন, জ্বলন্ত সিগারেট ওইভাবে কেউ রেখে যায়? আমার বন্ধুর হাত পুড়ে গেছে।'

এদেশ হলে ভদ্রলোক বলতেন বেশ করেছি। বিদেশে এখনও মানুষ সহবত জানে। ভদ্রলোক অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমি অসভ্যের মত কাজ করেছি। ওপরে গারমেন্ট সেকশান, ওখানে

সিগারেট চলবে না। তাই এখানে রেখে গিয়েছিলাম এখনই নেমে আসব বলে, আমার ভুলের জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' কথা শেষ করে ভদ্রলোক আমার হাতটা দেখলেন, আর এক প্রস্থ দুঃখ প্রকাশ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে কিনা। এমন সময় দোকানের ভদ্রমহিলা একটি সুদৃশ্য পাত্রে কয়েক টুকরো বরফ নিয়ে প্রবেশ করলেন, এক টুকরো বরফ আমার পোড়া জায়গাটায় চেপে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ। ভদ্রলোক চলে যাননি, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো বারে বারেই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'একটু ভাল বোধ করছেন তো?'

আমি বললুম, 'আপনি চিন্তিত হবেন না, আমার এমন কিছু লাগেনি।'

এই ঘটনাটি আমার অনেকদিন মনে থাকবে। তার কারণ আমার হাত না পুড়লে বিদেশী ঐ মহিলা ও পুরুষটির আন্তরিকতা ও স্নেহের গভীরতা আমার অজানা থেকে যেত। বিদেশে গিয়ে প্রকৃতি দেখব, ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখব খুবই ঠিক কথা, কিন্তু মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে না দেখলে একটা দেশের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। ভদ্রলোক এক সময় চলে গেলেন, মহিলাটি তাঁর ফ্লাস্ক থেকে দু' কাপ কফি ঢেলে আমাদের খাওয়ালেন। কফি শেষ করে আমরা জিনিসপত্র দেখতে শুরু করলুম। অ্যান আমাকে জেড পাথরের একজোড়া কুকুর ও একটি হাতি কিনে দিলে। হাতিটি দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গেলুম। আমি পণ্ডিত মানুষ নই, গবেষণা করার অধিকারও আমার নেই, তবু মনে হল হাতি তো এদেশের প্রাণী নয়, তাহলে শিল্পী এত নিখুঁত হাতি বানালেন কি করে। খোঁজ নিয়ে জানলুম এ সবই হল মায়া ইন্ডিয়ানদের তৈরি কারুশিল্প। তখনই রহস্যটা আমার কাছে আমার মত করে পরিষ্কার হল। মায়ারা এক মতে ছিলেন ভারতীয়, ভারত থেকে গিয়ে এই মেকসিকোয় উন্নত সভ্যতা স্থাপন করেছিলেন। সেই সভ্যতার রূপরেখা দেখে আততায়ী হিসপানিরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। উন্নত পশ্চিমী সভ্যতার গর্ব ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মায়ারা ভারতীয় ছিলেন বলেই হাতির কল্পনা তাদের স্মৃতিতে এখনও রয়ে গেছে, অ্যান আমাকে প্রায় জোর করেই একজোড়া চটি কিনে দিল।

জিজ্ঞেস করলুম, 'চটি কেউ কেনে?'

অ্যান বললে, 'পরে বুঝবে। এই চটির বিশেষত্ব হল পুরোটাই [illegible] তৈরি [illegible] কোটি। এইটা এই অঞ্চলের বিশেষ একটি আর্ট। এই [illegible] ঠিক থাকবে। কাদা যদি থাকলে সেরে যাবে। পা [illegible] হবে না, [illegible] উন্নত হবে। এই জুতো পায়ে হাঁটার সময় ঘোড়ার ক্ষুরের মত খটখট শব্দ হবে। সেই শব্দের ছন্দে তোমার নিজের এলোমেলো ভাবের একটা ছন্দ আসবে।'

আমি বললুম 'এই জুতো তো দেখছি মেডিকেটেড। বাত ভাল করে, পায়ের গোড়া শক্ত করে, চোখের জ্যোতি বাড়ায়, মনে কবিতার ছন্দ আসে।'

অ্যান বললে, 'একজোড়া নিয়ে রাখ, সারা জীবন চলে যাবে।'

মহিলা বললেন, কয়েকটি জামা কিনে নিয়ে যাও। খুবই কম দাম, আমি তোমাকে আরও কমদামে দেব। যেমন ভাল কাপড় তেমনি [illegible] তৈরি।'

মহিলা আমার হাতে একটি জামা দিয়ে বললেন, 'পরে দেখ।'

আমি জামাটা পরে এলুম।

অ্যান বললে, 'খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

এদেশের তৈরি জামা আমার না হবারই কথা, কারণ এরা যেমন স্বাস্থ্যে হাতি আমি তেমন চামচিকি। দুটো না তিনটে জামা আমাকে কিনতেই হল কারণ আমাদের দেশে ঐ জামার অনেক দাম, আর এত সুন্দর তৈরি হয় না। আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম। হোটেল বিসেপসানে জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে এলুম বাইরে। যে ভদ্রলোকের সিগারেটে আমার হাত পুড়েছিল তিনি এখনও দাঁড়িয়ে আমাদের দেখেই জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার হাত ঠিক হয়ে গেছে? ডাক্তারখানায় যাবার দরকার কি হবে?'

আমি বললুম, 'না, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার হাত মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের কোথাও লিফট দিতে পারি?'

অ্যান বললে 'আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের প্লাজা-দেল-জোকালোতে নামিয়ে দিন। প্লাজা-দেল-

জোকালো দিবা দ্বিপ্রহরে জমজমাট হয়ে উঠেছে। আকাশে চড়া রোদ কিন্তু চারপাশে এত গাছ আর তলায় তলায় এত ছায়া জায়গাটাকে মনে হচ্ছে কোন বড়লাটের গ্রীষ্মাবাস। এ শহরেও কোর্ট-কাছারি অফিস আছে, কর্মী আছে, কিন্তু বাইরে থেকে এত টুরিস্ট এসেছেন যে তাঁরাই জায়গাটাকে জমজমাট করে রেখেছেন। ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, তিনি যাবেন উক্সমল। উক্সমলে তাঁর একটি দোকান আছে টুরিস্ট শপ। আর ভদ্রলোকের একটি সমব্রেরো হ্যাট তৈরির বড় কারখানা আছে। ভদ্রলোক আমাদের সুদৃশ্য চাবির রিং উপহার দিয়ে গেছেন। আমরা সেই ইন্ডিয়ান বাজারের দিকে এগিয়ে গেলুম, যেখানে কালরাতে তেকুইলা খেয়ে আমাদের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমরা খুঁজে খুঁজে সেই ফুলদিদিকে বের করলুম। আজকে তাঁর ফুলের সম্ভার গন্ধে আর রঙে জমজমাট। হলুদ, গোলাপি, লাল, সাদা, বেগুনি যত রকমের রঙ হতে পারে সব রঙের ফুলের সমারোহ। ফুলদিদি আমাদের বললেন, 'কেমন আছ?'

আমরা দু'জনেই বললুম, 'আপনি কেমন আছেন?'

'আমি ভাল আছি।'

স্যান বললে, 'আপনি আমাদের একটা ইন্ডিয়ান গ্রামের সন্ধান দিতে পারেন?'

ফুলদিদি বললেন 'আমার গ্রামই তো আছে।'

'আমাদের সেই গ্রামে নিয়ে যাবেন?'

'আমার সব ফুল বিক্রি হয়ে গেলে তবেই তো আমি যেতে পারব। তবে আমার মেয়ের সঙ্গে আপনারা যেতে পারেন।'

'আপনার মেয়ে কোথায়?'

'সে কিছু খেতে গেছে।'

স্যান বললে, 'আমরাও তাহলে কিছু খেয়ে আসি। আপনি কিছু খেয়েছেন?'

ফুলদিদি বললেন, 'আমার মেয়ে এলে আমি খেতে যাব।'

স্যান বললে, 'আমরা তাহলে এদিক ওদিকে একটু ঘুরে বেড়াই, আপনার মেয়ে ফিরে এলে তিনজনে একসঙ্গে খেতে যাব।' মহিলা হেসে বললেন, 'তোমরা ভারী অদ্ভুত ছেলে-মেয়ে।'

আমরা আধঘন্টা মত সময় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালুম। দিনের বেলায় এই বাজারের চেহারা অন্যরকম। পৃথিবীর সমস্ত রঙ, সমস্ত গন্ধ, সমস্ত রূপ এই বাজারের ওপর কেউ অকৃপণ হাতে ঢেলে দিয়েছেন। টুপি, জামা, কাপড়, ব্যাগ, পঞ্চ, জপের মালা, অলঙ্কার, জুতো, বিভিন্ন মশলা, ফল ফুল, কারুসামগ্রী, পুতুল, বেতের কাজ, পাথরের জিনিস এমনকি প্রাচীন মুদ্রা পর্যন্ত এই বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

আমরা তিনজনে একটি ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলুম। এদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল আমি বোধহয় সিকিম কি ভুটানে আছি, চেহারায় অদ্ভুত মিল। আমরা টেবিলে বসলাম।

ফুলদিদি বললেন, 'কাল রাতে তোমরা আমাকে খাইয়েছ, আজ আমি তোমাদের খাওয়াব।'

স্যান বললে, 'তা হয় না! আমরা কালই চলে যাব, যাবার আগে আপনার মনে একটু জায়গা করে নিতে চাই। কি খাবেন বলুন।'

মহিলা বললেন, 'আজ তোমরা আর একটা উপাদেয় ইন্ডিয়ান খাবার খাওয়াও যার নাম পিব্‌ল চিকেন।'

আমাদের 'পিব্‌ল চিকেন' এসে গেল। মায়া জগতে সস একটি প্রিয় খাদ্য। সসের ওপরেই সমস্ত কিছু সাজানো হয়। পিব্‌ল চিকেনও সসের ওপর কায়দা করে কাটা মুরগির টুকরো, সুন্দর গন্ধ, ভীষণ সুস্বাদু, আর যে পাত্রে পরিবেশন করা হয়েছে সেই পাত্রটির দিকে তাকালে মনে হয় পৃথিবীতে এত সুন্দর শিল্পকর্মও আছে! আমরা খুব দ্রুত আহারপর্ব শেষ করে ফুলদিদির মেয়ের সঙ্গে তাদের গ্রাম দেখতে বেরিয়ে পরলুম। ঠিক হল আমরা হেঁটেই যাব। গরম নেই বললেই চলে। গালফ স্রোতের নাতিশীতোষ্ণ বাতাস, ঘাম হয় না এই জায়গায়, ফলে পরিশ্রমে কোন ক্লান্তি আসে না। ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই, কোন পলিউশান নেই। আমাদের পথ-প্রদর্শিকা নেচে নেচে এগিয়ে চলেছে, আমরা চলেছি পেছনে, তার সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই ভাষার সমস্যা, মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকিয়ে সে হাসছে আমরাও হাসছি। এ ছাড়া ভাব বিনিময়ের আর কোন পথ

নেই। এই হাঁটার ফলে ভূ-প্রকৃতিকে আরও ভালভাবে জানা গেল। অনেকে মনে করেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকেই মায়া সভ্যতার জন্ম। একশ' থেকে তিনশ' খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যে কোন সময় এল-সালভাদর-এর মধ্যভাগে অবস্থিত বিশাল আগ্নেয়গিরি স্লোপাঙ্গো বিস্ফোরিত হয়েছিল। সেই আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে আগ্নেয় ছাই পুরো এল-সালভাদর অঞ্চলটিকে গ্রাস করেছিল। সমস্ত গাছপালা এবং পশুপক্ষী সেই ছাই চাপা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল। যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা যেন একালের হিরোসিমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। প্রচণ্ড উত্তাপ, ভূ-কম্পন, বাতাসের অভাব, পানীয় জলের অভাব সমস্ত মিলিয়ে এমন এক দুর্যোগ, ইতিহাসে যার নজির প্রায় বিরল। ঐতিহাসিকদের অনুমান তিরিশ হাজারের মত জীবিত মানুষ এই অঞ্চল ছেড়ে আস্তানা গেড়েছিল মায়া নিম্নভূমিতে। এই তিরিশ হাজার মানুষই পৃথিবীর সর্বোত্তম সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল।

আমরা চলতে চলতে সেই ভূ খণ্ডই দেখছিলুম যার জনক হল আগ্নেয়গিরি, ধূসর ভূমি, চুনাপাথর, কোথাও বন্ধ্যা কোথাও আবার সামান্য সামান্য গাছপালা ঘাস। কখনও আমরা উঁচুতে উঠছি কখনও নেমে যাচ্ছি নিচে। তখন মনে হচ্ছে আমরা খাদে পড়ে আছি। আকাশ উঠে যাচ্ছে অনেকটা উঁচুতে, এই হাঁটাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। প্রতি পদক্ষেপে বিস্ময়, প্রতি পদক্ষেপে ঈশ্বরের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে তাঁর অসীম শক্তির কথা, সারা পৃথিবীটাকে কি বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে ভরে রেখেছেন। চলতে চলতে মনে হচ্ছিল এই মায়া নামটি কোথা থেকে এল। যাঁরা এই সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলেন তাঁরা কি বৈদান্তিক ছিলেন। মায়া নামটি কি তাঁরা বেদান্তের পাতা থেকে তুলে এনেছিলেন। জাঁ ফ্রেডারিখ ম্যাক্সিমিলিয়ান, যিনি নিজেকে বলতেন কোঁৎ-দ্য-ওয়ালডেক তাঁর একটি তত্ত্ব আছে। আঠারশ বত্রিশ সালে তিনি প্যালেঙ্ক দেখতে এসেছিলেন, এই অঞ্চলেই আছে মায়া সভ্যতার সর্বাধিক ধ্বংসাবশেষ। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে তিনি মন্তব্য করেছিলেন প্রাচীন কালের সর্বোত্তম বিশ্ব সভ্যতার নিদর্শন এই মায়া ধ্বংসস্তূপ, অর্ধ শতাব্দী পরে এক সুশিক্ষিত অবতার পুরুষ অগাস্টাস লা প্লোঁজিয়োঁ আবার ভিন্ন মত পোষণ করতেন। ভদ্রলোক মহর্ষির মত দেখতে ছিল। একমুখ দাড়ি, সম্মানিত, বল্গাহীন কল্পনার অধিকারী, উগ্র তার্কিক। তিনি বলে গেছেন স্বর্গোদ্যান বা গার্ডেন অফ ইডেন, যার উল্লেখ আমরা বাইবেলে পাই, তা হল এই মায়াভূমি। মায়া স্থাপত্যে আমরা যে আঁকাবাঁকা রেখা পাই তার থেকেই প্রমাণিত হয় মায়ারা বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মতে যুকাটান থেকেই পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার উদ্ভব। সাম্প্রতিক কালের মত হল মায়ারা এসেছিলেন বহির্বিশ্ব থেকে মহাকাশ যানে আরোহণ করে। আমি এই মতের সমর্থক কারণ আমি যতটুকু দেখেছি এখনও পর্যন্ত তাতে আমার মনে হয়েছে মানবাকৃতি থেকে শুরু করে পিরামিড, পাথরের মূর্তি, তৈজসপত্র, মোটিফ, গ্রিফস, ভাস্কর্য, ছবি, নক্সা, কাপড় জামা, বর্ণবিন্যাস সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা অতি জাগতিক স্পর্শ, বিশাল একটা ঘটনা, বিশাল এক কর্মতৎপরতা বিচিত্র আচার আচরণ একটা সময় সীমা পার করে হঠাৎ ভোজবাজির মত উবে চলে গেছে। এই মতবাদের যারা সমর্থক তাঁরা যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন তার মধ্যে প্রধান হল সেই অতীতে অন্য কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ডকে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে এমন অক্লেশে বহন করার, তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এমন একটি ধর্ম ও শিল্প গড়ে তোলার। আমরা একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখতে পেলুম দূরে আকাশের গায়ে ছবির মত আঁকা রয়েছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত 'ইন্ডিয়ান ভিলেজ'টি। অসমান ঢালু বেয়ে তরতর করে নেমে গেলুম সেই গ্রামের দিকে। নিজের গ্রামটি যত এগিয়ে আসছে আমাদের পথ প্রদর্শিকা মেয়েটির গতিও তত বাড়ছে। অবশেষে আমরা সেই গ্রামে গিয়ে হাজির হলুম। মায়ারা খুবই অতিথিবৎসল। গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন মানুষটি আমাদের অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলেন, প্রতিটি বাড়ির ভিত পাথরে তৈরি। এক ধরনের বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি দেয়াল। ছাদের আচ্ছাদন হল খড়, প্রতিটি বাড়ির ভেতরে দু'টি করে ঘর, একটি শোবার ঘর একটি রান্নাঘর। প্রতিটি গৃহের প্রবেশপথ আছে কিন্তু দরজা নাই। কারণ এখানে চোর নেই, চুরি নেই, অন্যের সম্পদের উপর কারও কোনও লোভ নেই। ফলে অর্গলের কথা এরা চিন্তাই করতে পারে না। বন্ধ দুয়ার শব্দটি এদের অভিধানে নেই। প্রবেশপথের মাথার ওপর একটি দড়ি ঝুলছে, সেই দড়িতে বাঁধা একগুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘণ্টা। একটু দুলিয়ে দিলেও সেই ঘণ্টা একসঙ্গে বেজে ওঠে নানা সুরে, এরই নাম মায়া কলিং বেল।

এই গ্রামে একটা মাঝারি উচ্চতার পিরামিড রয়েছে সেই পাঁচ হাজার বছর আগের ধ্বংসাবশেষ। প্রবীণ মানুষটি ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় বললেন, 'তোমরা ওর মাথায় উঠে চারপাশটা একবার দেখ, এমন দৃশ্য খুব কমই দেখা যায়।'

আমার তো সবেতেই ভয়। মনে হল যদি সাপে কামড়ায়, কি একটা জাগুয়ার বেরিয়ে আসে, বাংলাদেশের ছেলে সাপের ভয়টা আগে পাই।

অ্যান বললে, 'তোমার দ্বিধার কারণটা কি?'

'অনেকদিনের পুরনো ধ্বংসাবশেষ, ভেতরে কি আছে কে জানে?'

'তোমাকে তো ভেতরে যেতে হচ্ছে না দেখতে পাচ্ছনা সিঁড়িটা বাইরে?'

তখন আমার চোখ পড়ল সিঁড়িটার দিকে। মায়া জীবন, মায়া সভ্যতার পুরো রহস্যটা এখনও জানা হয়নি। এঁরা বিশাল বিশাল সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। শুধুমাত্র তার চূড়াটিকে ব্যবহার করার জন্য। কোন সময়ই সিঁড়ি ভেতরে রাখার প্রথা ছিল না। মনে হয় তার একমাত্র কারণ মায়ারা বর্তমানের স্বার্থপর সভ্য মানুষের মত নিজের কথা ভাবতে শেখেনি তারা যা কিছু করত জনজীবনের দিকে তাকিয়ে, কমিউনিটির দিকে তাকিয়ে। এই যে আমরা যে গ্রামে এসেছি, মায়া সভ্যতা অবলুপ্ত হলেও মায়া জীবনধারা এখানে পুরোপুরি বর্তমান। অনুসন্ধান করে জানলুম এদের প্রধান খাদ্য এখনও ভুট্টা, প্রধান জীবিকা চাষবাস। সকালবেলা মাঠে যাবার সময় কয়েকতাল ভুট্টার মণ্ড সঙ্গে করে নিয়ে যায় খাদ্য হিসেবে। এদের জীবন চলে, 'কমিউনিটি' প্রথায়। গ্রামের মধ্যভাগে রয়েছে স্নানাগার। মাঠ থেকে ফিরে এসে বিকেলে সকলে ঐ স্নানাগারে চলে যায়। সেখানে সবাই মিলে স্নান করে চলে যায় 'কমিউনিটি ডাইনিং হলে।' সেই ভোজনাগারে সবাই পাশাপাশি বসে দিনের প্রধান খাদ্যটি গ্রহণ করে।' 'কমিউনিটি কিচেন' থেকে বেরিয়ে আসে গরম গরম মেজ ওমলেট। বেশ বড় আকারের। একসঙ্গে পাশাপাশি কুড়ি পঁচিশটি ওমলেট থাক করে রাখা হয়। যে যত পার খাও। সঙ্গে থাকে লঙ্কা, যাকে এরা বলে আজি বা চিলি। এদের খাদ্য তালিকায় থাকে রাঙা আলু, ম্যানিওক, অ্যাভোক্যাডোপিয়ার। আর এখানে খুব কোকেব চাষ হয়। খাদ্য তালিকায় পানীয় হিসাবে থাকে চকোলেট। এখানে এক ধরনের চিউংগাম পাওয়া যায় গাছ থাকে। সে গাছের নাম চিক্‌ল ট্রি। সেই গাছের আঠা খুলে নিয়ে মুখে ফেলে চিবোলেই চিউংগাম। মায়া ছেলে-মেয়েবা অনবতরই সেই গাম চিবোচ্ছে।

সিঁড়ির বিপজ্জনক সঙ্কীর্ণ ধাপ বেয়ে আমরা সেই প্রস্তব পিরামিডের ছাদে গিয়ে দাঁড়ালুম। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে নেমে এসেছে।

৬২

বাবে বারে একটা প্রশ্নই আমার কাছে ঘুরে আসছে, এঁরা কে, এই মায়ারা। ভারতীয়দের চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য আছে। গাত্রবর্ণে। চুলের রঙে। চোখের রঙে। তাকাবাব ভঙ্গিতে। হাসিতে। দাঁতের গঠনে। সকলের নয়, অনেকের নাকের গঠন আমাদের সঙ্গে মেলে না। না আর্য, না অনার্য। 'হুক নোজ'। অর্থাৎ ঈগল চঞ্চুব মতো বাঁকা। যে মুখে এই ধরনের নাক দেখছি, সেই মুখের আকর্ষণ যেন অনেক বেশি। চোখে দার্শনিকের মতো সুদূর দৃষ্টি। মুখে বুদ্ধিদীপ্ত গাম্ভীর্য। দেখলেই মনে হয় 'ডিপেন্ডেবল ক্যারেক্টার'। ভালো লাগে। কাছে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় এমন মানুষের পাশে বসলে জীবনের গভীর কথা শুনতে পাবো। যে-কথা ভেসে আসে মহাসিন্ধুর ওপার হতে।

সেই ইন্ডিয়ান চিফের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও কারণ ছাড়াই আমার ভীষণ একটা শ্রদ্ধার ভাব আসছিল। মনে হচ্ছিল এমন এক ব্যক্তিত্বকেই বলা যায় 'ফাদার ফিগার'। আমার দিকে যতবার তাকাচ্ছেন, সেই দৃষ্টিতে ঝরছে স্নেহ। আমি প্রশ্ন করলুম, 'আমাদের মতো আপনাদের সমাজে কেন পাপ নেই। চুরি নেই। ডাকাতি নেই। নারীঘটিত অপরাধ নেই। স্বার্থ নেই। স্বার্থসংশ্লিষ্ট নোংরামি

নেই। কেন নেই। আপনারাও তো মানুষ।'

অ্যান আমার প্রশ্নটিকে স্প্যানিশে তর্জমা কবে দিলে। ইন্ডিযান চিফ বুঝতে পাবলেন। নীববে মাথা নিচু করে হাসলেন কিছুক্ষণ। তাঁব এই ভঙ্গিটি আমাকে স্মবণ কবিযে দিচ্ছিল, আমাব ধ্রুপদ-শিক্ষক প্রয়াত সন্তোষ বায মহাশযকে। অবিকল একই বকম দেখতে। একই বকম ভাবভঙ্গি। তিনিও এইরকম মুখে স্মিত হাসি নিযে মাথা নিচু কবে অনেকক্ষণ বসে থাকাব পব গান ধবতেন। তখন এই পৃথিবীতে খুলে যেত আব এক পৃথিবীব দবজা।

ইন্ডিযান চিফ অনেকক্ষণ ওইভাবে বসে থাকাব পব বললেন, 'আমবা মানুষ নই।'

আমি ভাবলুম অহঙ্কাব। পবেব কথায সে ধাবণা ভাঙলো। বললেন, 'স্প্যানিশ বিজেতাবা এক শতাব্দী ধবে নিজেদেব মধ্যে শুধু তর্ক বিতর্কই কবেছিল, আমবা মানুষ নই জন্তু। কাবণ আমাদেব জন্তু প্রমাণ কবতে না পাবলে শ্বেত দুনিযাব গান-পাউডাব সিভিলাই-জেসানেব অহঙ্কাব থাকে না।'

'এব কাবণ তাঁদেব হীনমন্যতা।'

'সে ব্যাখ্যা আপনাবা কববেন। আমবা পবাজিত। আমবা বিজিত। আমবা লস্ট এম্পাযাবেব ধ্বংসাবশেষ। আমাদেব নীবব থাকাই ভালো। তবে আমবা যে মন্ত্রেব পূজাবী, সে-মন্ত্র হ'ল, আমা সুযা, আমা ল্লুল্লা, আমা শেকল্লা। চুবি কোবো না, মিথ্যে বোলো না, আলস্য ত্যাগ কবো। আমবা এই নীতি আজও অনুসবণ কবছি। আমাদেব ঘব অর্গলমুক্ত। আমবা যা কবি, সকলে মিলে কবি। আমাদেব জীবনে কোনও গোপনীযতা নেই।'

'আপনাদেব দেখে মনে হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীব মহাকাশ সভ্যতা থেকে অনেকটা সবে আছেন। ঠিক যেন মিশতে পাবছেন না, মিলতে পাবছেন না। স্বেচ্ছা নির্বাসন বলা চলে।'

'কোনও সন্দেহ নেই। একে বলে সংস্কৃতিব পার্থক্য, বিশ্বাসেব পার্থক্য, ধর্মেব পার্থক্য। আমবা বড বেশি স্পিবিচ্যুযাল। আমাদেব দেবতা কোনও অলীক বিশ্বাস নয, প্রত্যক্ষ শক্তি। সূর্য, চন্দ্র আব ধবণী। সান কর্ন অ্যান্ড সিভিলাইজেসান। প্রকৃতিকে আমবা পূজা কবে এসেছি, বিংশ শতাব্দীব উচ্চ সভ্যতা সেই প্রকৃতিকে সুপবিকল্পিত ভাবে ধ্বংস কবে চলেছে। আমাদেব দেবতা হলেন সূর্য, বৃষ্টি, বাতাস, বাবি। আব আমাদেব দেবী হলেন শস্য। ভুট্টা। এই সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদেব এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। আমবা মনে কবি এই ভুট্টাই হল সজীব উৎস। খাদ্য ছাড়া প্রাণ বাঁচে না। কুইচে মাযাদেব স্মৃতিপুস্তক গোপোল ভু-তে আছে, ঈশ্বব কিভাবে প্রথম পিতা ও প্রথম মাতা সৃষ্টি কবলেন। হলুদ ও শ্বেত ভুট্টা দিযে তৈবি হল মাংস আব ভুট্টাব মণ্ড দিযে তৈবি হল তাদেব হাত আব পা। তোমাদেব স্থপতিবা যন্ত্রেব সাহায্যে শহব গডছে, বিশাল বাডি তৈবি কবছে। আমাদেব কোনও গৃহপালিত পশু ছিল না, আমাদেব গাডি ছিল না, কিন্তু আমাদেব পূর্বপুরুষবা যে শহব তৈবি কবেছিলেন, যে মন্দিব, প্রাসাদ, পিবামিড তৈবি কবেছিলেন, তাব ধাবে কাছে পৌঁছবাব ক্ষমতা বর্তমান সভ্যতাব আছে কিনা সন্দেহ। এমন একটা যুগে বসে আমবা এমন কিছু কবেছিলুম, যাব গব্ব বংশানুক্রমে আমাদেব মধ্যে একটা একাকিত্ব সৃষ্টি কবেছে। আজকেব যন্ত্র নির্ভব মানুষ যা নিযে গর্ব কবে, তা হল যন্ত্রেব দান। আমবা যাব গব্ব কবি, তা মানুষেব দান।'

বৃদ্ধ ক্লান্ত হযে পডলেন। আমবা সেই ক্ষুদ্র পিবামিডেব মাথা থেকে নেমে এলুম। অচেনা মাযা আকাশে আবাব সেই ঘোব লেগেছে। অনেক যুদ্ধ, অনেক হত্যা, লুণ্ঠন অত্যাচাব দেখলে বুদ্ধেব চোখ বোধ কবি এই বকমই ঝাপসা হযে আসত। কবে ঘটে গেছে সেই সব নাবকীয ঘটনা, মাথাব ওপব আকাশ কিন্তু বিষণ্ণ হযে গেছে চিবতবে। গাছপালা সম্পর্কে আমাব জ্ঞান খুব সামান্য। সেই জ্ঞান নিযে যে বৃক্ষকে এতদিন ভেবে এসেছি বেড উড, আসলে সেই গাছ হল সিবা ট্রি। সিবা বৃক্ষ। মাযা নাম। মাযা গ্রাম-প্রধানই আমাব ঘুম ভাঙালেন। এই বৃক্ষ তাঁদেব সেই অবলুপ্ত প্রাচীন সভ্যতাবই প্রতীক। যেখানে একসময় সবই ছিল, অথচ এমন কিছুই নেই অতীত সভ্যতার অতন্দ্র প্রহবীব মতো সেখানে দাঁডিযে আছে এই সিবা বৃক্ষ। এই নাম তাবা কোথায পেলেন! আমাদের শিব থেকেই কি শিবা? মাযাদেব কাছে এই গাছ অতি পবিত্র। এই গাছ তাঁদেব বিশ্বাসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। জীবন বৃক্ষ। সেন্টাব অফ দি কসমস। বিশাল লম্বা এই গাছেব গুঁডিব আকৃতি বেতালেব মতো। যেখান থেকে বেবিযে এসেছে একই মাপেব পত্রগুচ্ছ, পাখার মতো। আকাশেব প্রেক্ষাপটে

গাঢ় কালো এক একটি ছন্দের মতো। চিফ আমাকে চিনিয়ে দিলেন অন্যান্য গাছ। সেডার, মেহগিনি, স্যাপোডিলাস, ব্রেডন টি।

আমি আর অ্যান বিশাল একটি মেহগিনি গাছের তলায় গিয়ে বসলুম। আমাদের ফুলদির কিশোরী কন্যাটি মাথায় একটা ঝুড়ি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে এক ঝলক হেসে চলে গেল। সরল, নিষ্পাপ একটি মেয়ে। মেয়েটির বাবা আছে, বোন, আছে, ভাই আছে, ঠাকুরদা আছে, ঠাকুমা আছে। মায়া পরিবার আর আমাদের বাঙালি পরিবারে অসীম মিল। আমরা যৌথ পরিবার ভেঙে ফেলছি আর এরা যৌথ সমাজ গড়ে বসে আছেন। একটা গ্রাম নিয়ে একটা পরিবার। এত ভাল লাগছিল, এদের জীবন ও জীবন-ব্যবস্থা। এদের জীবনদর্শন। চারপাশ দেবালয়ের মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেডার গাছের সুন্দর একটা গন্ধ আছে। ভাসছে বাতাসে ধূপের মতো।

গ্রামের পরিকল্পনায় প্রাচীন মায়া-নীতিই অনুসৃত হয়েছে। গ্রামটি এইরকম, একটি বিশাল প্রাঙ্গণ বা উঠান। তার চারপাশে বাড়িগুলি ছবির মতো সাজানো। বিশাল মায়া শহরে এই উঠানটিই হয়ে যেত প্লাজা। উঠানটি চুনাপাথর আর সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। মনে হচ্ছে মার্বেল পাথরে তৈরি। ধারে ধারে বেদী। উৎসবের সময় সারা গ্রামের মানুষ নেমে আসেন এই চত্বরে। এই চতুষ্কোণ থেকে নিঁখুত জ্যামিতি মেনে পাথর বাঁধানো লম্বা লম্বা পথ সূর্যের কিরণের মতো বেরিয়ে গেছে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে। লম্বা লম্বা পাথরের ফলক জেগে আছে চারকোণে। একে বলে স্টেলা। এই প্রস্তরখণ্ডে লেখা হয় গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গ্রামজীবনের ইতিহাস। গ্রামের প্রতিটি মানুষের জন্যে কাজ ভাগ করা আছে। সেই কাজের পালা পড়ে। পাথরের নোটিশ বোর্ডে লেখা আছে সেই রুটিন। আজ কোন কোন পরিবারের কে কে যাবেন কমিউনিটি কিচেনে। কে কে সারাদিনে অন্তত বারদশেক প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করবেন। সারাদিনের কাজ এই ভাবে ভাগ করা আছে। কেউ কারোর একার নয়। সকলেই সকলের। পশ্চিম সমাজে যে ফ্যাশানেবল ব্যাধিটি আজ প্রবলাকার ধারণ করেছে, সেই এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতা এই সমাজে কখনই আসবে না। কেউ বলতে পারবে না আমি পরিবার পরিত্যক্ত, সমাজ পরিত্যক্ত, তাই আমি ড্রাগ অ্যাডিক্ট, তাই আমি ক্রিমিন্যাল, সমাজবিরোধী, আত্মহত্যা প্রবণ।

আমরা আজ যে ভূমিতে বসে আছি, ১৫১৯ সালে সেখানে যে অবিশ্বাস্য সত্য ঘটনাটি ঘটেছিল তার পেছনে যত না মানুষের হাত, তার চেয়ে বেশি ছিল ভাগ্যের হাত। আগেই বলেছি ১৫১৯ সালে স্পেনের রাজার জন্যে হারনান কর্টেস মেকসিকো জয় করেছিলেন। তাঁর সৈন্যদলে ছিলেন বার্নাল ডিয়াজ দেলক্যাস্টিলো এই সৈনিকটি শুধু যুদ্ধ করেন নি, লুঠ করেননি; ভবিষ্যৎকালের জন্যে অমূল্য একটি বৃত্তান্ত লিখে রেখে গেছেন। আমরা যে মেরিডায় বসে আছি, সেই মেরিডায় স্প্যানিশ বাহিনীর প্রবেশের ইতিহাস তাঁর বর্ণনায়।

পূর্ব সমুদ্র তট থেকে শুরু হল আমাদের যাত্রা। অনিশ্চিত সেই অভিযান। উদ্বেগ আর উত্তেজনা ভরা। আমরা সংখ্যায় খুবই অল্প। মায়া জনসংখ্যা আর যোদ্ধারা কতজন, আমাদের জানা নেই। আমরা চলেছি। দুর্গম ভূভাগ পেরিয়ে। বন্ধুর প্রান্তর। উঁচু নিচু। পাথুরে। শুষ্ক। জলহীন। আমরা চলেছি তো চলেইছি। দূর থেকে হঠাৎ আমরা দেখতে পেলুম একটি টলটলে সরোবর। বিশাল তার আয়তনে। আমরা আমাদের উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই নগরের বিশালতা আর সৌন্দর্য্য দেখে বিস্মিত। সরোবরের পাশে নগর। নগরের চারপাশে গ্রাম। সুন্দর পথঘাট। রাজধানীর বাইরে যে বিশাল শহরে আমরা সেই রাতের মতো অবস্থান করলুম তার নাম ইকস্তাপালা। ওই রাতেই আমরা শহরটিকে দেখে নিলুম। সে যেন এক স্বপ্ন। বিশাল বিশাল প্রাসাদ। নানারঙের পাথরে নির্মিত। সুগন্ধী কাঠের কারুকার্য। কাষ্ঠ আর প্রস্তরের অপূর্ব কবিতা যেন। বিশাল বিশাল প্রাঙ্গণ। চারপাশে ফুলের বাগান। বাগ-বাগিচা। সেই স্বপ্নের শহরে আমাদের রাত অতিবাহিত হল সুগন্ধী স্বপ্নের মতো। পরের দিন ওই নগরের অতিথিবৎসল নাগরিকরা বিশাল রাজপথ ধরে আমাদের নিয়ে চললেন রাজধানীর দিকে। প্রবেশ পথে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সমবেত হয়েছেন রাজপ্রধানেরা। কি অপূর্ব তাদের বেশভূষা। মাথায় সব মূল্যবান, বর্ণাঢ্য, মণিমুক্তা খচিত শিরোভূষণ।

সেই স্থানে আমরা অপেক্ষায় রইলুম। আসবেন রাজা স্বয়ং, আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে। রাজা

মোকতেজুমা, মায়াদের কাছে যিনি আদিত্যভগবান। অ্যাজটেক নৃপতি মোকতেজুমা। হঠাৎ ঘোষিত হল তাঁর আগমন বার্তা। মহামান্য রাজ অমাত্যরা বহন করে আনছেন তাঁর পালকি। অপূর্ব তার সজ্জা। চন্দ্রাতপ বহুমূল্য মণিমুক্তায় শোভিত। সবুজ পালকের অনিন্দ্যবাহার। সোনা আর রুপো দিয়ে বোনা ঝালর ঝুলছে চারপাশে। সেই ঝালরে দুলছে মুক্তা আর পান্নার শোভা সেই পালঙ্কে বসে আছেন নৃপতি স্বয়ং। বহুমূল্য পোশাক তাঁর পরিধানে। তাঁর পাদুকাযুগল মণিমুক্তা খচিত। পাদুকাতল স্বর্ণনির্মিত। এমন শোভা, এমন ঐশ্বর্য আমরা দেখিনি। মহামাত্যেরা নৃপতির অবতরণ ভূমি পরিষ্কার করে গালিচা বিছিয়ে দিলেন, কারণ রাজপদ ভূমি স্পর্শ করবে না।

৬৩

বার্নাল ডায়াজ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, 'ওই অসাধারণ দৃশ্য দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমাদের সমস্ত কথা ফুরিয়ে গেল। কি বলব আমরা জানি না। আমাদের সামনে যা ঘটছে তা সত্য নয় স্বপ্ন। বিরাট মেকসিকো নগরী আমাদের সামনে। আর আমরা সংখ্যায় চারশো হব কি না সন্দেহ।'

ডায়াজ আর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সামনে লাল কার্পেটের ওপর স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য মণ্ডিত সম্রাট মোকতেজুমা। পেছনে তাঁর সুসজ্জিত পালঙ্ক। তাঁকে ঘিরে আছেন অমাত্য ও মহামাত্যগণ। পেছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিশাল সৈন্যবাহিনী। এই সেই অ্যাজটেক সাম্রাজ্য। লক্ষ লক্ষ জনসংখ্যা। লক্ষ সৈন্য। মোকতেজুমা পরদেশী অতিথিদের স্বাগত জানাতে এসেছিলেন। তাঁর একবারও সন্দেহ হয়নি শতাধিক শ্বেতকায় মানুষগুলি এসেছে তাঁর এই বিশাল সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেবার মতলবে। মায়ারা যুদ্ধবাদী ছিল না। শান্তিপ্রিয় জাতি। অনেকটা ভারতীয়দের মতোই। ধর্মবিশ্বাসী। শিল্পী মনের অধিকারী।

স্প্যানিশ কনক্যুইস্তাদর বা বিজেতারা সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাদের একটা সুবিধা হয়েছিল, তাদের সঙ্গে ছিল তৎকালীন ইওরোপের আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, আর তাদের সহায় হয়েছিল মায়া প্রধানদের অন্তর্কলহ। আর সহায় হয়েছিল তাদের শুভগ্রহ। মায়া না বলে অ্যাজটেক বলাই ভালো। মায়াদের উত্তরপুরুষ।

মায়াদের ব্যাপারটা এই সুযোগে একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। ওলমেক, টোলটেক, মায়া, অ্যাজটেক ভীষণ জড়ামড়ি হয়ে বসে আছে। সবই সেই এক ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেসানের বিভিন্ন ধারা। সময়ের বিভিন্ন ধারায় প্রকাশিত ও অবলুপ্ত। ফুলের মতো সভ্যতা সংস্কৃতি ফোটে আবার শুকিয়ে যায়।

অ্যান সেই সিবা বৃক্ষের তলায় বসে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল। ইতিহাস শুরু হবার অনেক আগেই কত ইতিহাস যে হারিয়ে বসে আছে। ইতিহাসের মজা হল, সে যত পিছু হটে ততই তার অগ্রগতি। মানুষ এখন খোঁড়াখুঁড়ি, ভাঙাভাঙি করে ইতিহাসকে নিয়ে চলেছে পেছনে, আরও পেছনে। মেকসিকোর দূর দক্ষিণে, গুয়াতেমালার কিছু অংশ জুড়ে যে এলাকা, সেই এলাকায় মায়াসভ্যতার পত্তন হয়েছিল। মায়ামানবদের একেবারে নিজস্ব প্রচেষ্টা। বহির্জগতের সঙ্গে তাদের সামান্যতম যোগও ছিল না। শিশু যেমন বন্ধ ঘরে বসে পুতুল খেলা করে। সমুদ্রের জল খাঁড়ি দিয়ে ঢুকে প্রবাহ-পথ পেয়ে চলে গেল বহু দূরে। সমুদ্র গুটিয়ে গেল। প্রবেশ পথ হারিয়ে গেল মহাকাল সমুদ্রের পলির তলায়। চারিপাশ উঁচু হয়ে গেল। সেই বেষ্টিত, বিচ্ছন্ন জলটুকু ক্রমে পরিণত হল সভ্যতা-সরোবরে। প্রস্ফুটিত হল শত শতদল।

মায়া গোষ্ঠী একান্তে নিভৃতে গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। মেক্সিকোর সমসাময়িক সভ্যতার উপাংশ হলেও, মায়া শিল্প, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁদের স্টাইলটাই ছিল একেবারে অন্য রকমের। ওলমেকরা লিখতে জানত না তারা ব্যবহার করত সাংকেতিক চিহ্ন। মায়ারা সম্ভবত এই সাংকেতিক চিহ্ন থেকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তৈরি করলেন অক্ষর। যে

অক্ষব পাঠ কবা যায়। কথ্য ভাষাকে যে অক্ষবেব সাহায্যে লেখা যায়। খুবই জটিল, কিন্তু নিঃসন্দেহে সেই যুগেব এক বিস্ময়কব ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশ্ব সংস্কৃতিব ইতিহাসে অসাধাবণ এক ঘটনা, অগ্রগতি। কথ্য ভাষাকে বর্ণমালাব সাহায্যে লেখা। এই বর্ণমালাকে তাঁবা ধীবে ধীবে বিকশিত কবেছিলেন। তিনটি সংহিতায় মায়া বর্ণমালাব আটশো বাষট্টিটি অক্ষব সাজানো হয়েছিল। তিনটি সংহিতাব নাম, ড্রেসডেন, পেবিসিয়ানো, ত্রো কবতেসিয়ানো।

লেখ্য ভাষা ও তিনটি সংহিতা বা কোডেকস এব কথা বলতে গিয়ে কাগজেব কথাটাও বলে নি। তাবপব বলব মায়া বর্ণলিপি ও ভাষাব ধাবা অনুসবণ কবে উৎভূমিব অনুসন্ধান প্রসঙ্গে এমন সব বিস্ময়কব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, যাতে আমাদেব বোমাঞ্চ জাগে। যেমন যীশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ কবা হল, সেই মুহূর্তে তিনি একটি কথা বলেছিলেন, 'হেলি লামা যাবাক তানি।' এই ছিল যীশুব শেষ কথা। সেই মুহূর্তে কাবোব বোঝাব ক্ষমতা হয়নি পৃথিবীব অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাত্মা, অবতাব খ্রীস্ট কি বলতে চাইলেন। উত্তোলিত ক্রুশখণ্ডে প্রলম্বিত সেই মহামানব, বিশ্বকে যিনি পাপ থেকে পুণ্যেব পথে, অশান্তি থেকে শান্তিব পথে ফেবাতে চাইলেন, আব সেই চাওয়াব প্রতিদানে পেলেন চাবটি গজাল, তাঁব শেষ উক্তিটি কি। হিব্রুবা বললেন, প্রভুব শেষ উক্তিব অর্থ হল 'গড হোয়াই হ্যাস্ট দাউ ফবশেক্ন মি।' ঈশ্বব কেন তুমি আমাকে পবিত্যাগ কবলে।

সন্দেহ থেকে গিয়েছিল। যিনি ঈশ্ববেব দূত, তিনি কেন আবও গভীব আবও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বললেন না। এ তো যন্ত্রণাকাতব সাধাবণ মানুষেব উক্তি। ঈশ্ববীভূত পুরুষেব নয়। আজ এই উক্তিব অর্থ পবিষ্কাব হয়েছে, আব সে অর্থ অতি সুন্দব। এমন কথাই বেবোনো উচিত অমৃতপথযাত্রী এক অমৃতময় জীবেব কণ্ঠ থেকে মেকসিকোব যে প্রদেশে আমবা এখন বসে আছি অর্থাৎ যুকাটান, সেই যুকাটানেব এক গবেষক ডন ইগনাসিও মাগালোনি দুয়ার্তে মায়া সভ্যতা নিয়ে, মায়ালিপি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা কবছেন। সত্তবেব দশকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁব বিখ্যাত গ্রন্থ, 'এডুকাডোবস দেল মুণ্ডো' ইংবেজি কবলে দাঁড়ায়, এডুকেটাবস অফ দি ওয়ার্লড, বিশ্বেব আচার্য। তিনি প্রমাণ কবেছেন, মায়াবা আমেবিকায় বেবিং স্ট্রেট পেবিয়ে আসাব আগে বসবাস কবতেন দূব এবং মধ্যপ্রাচ্যে। যে অঞ্চলেব মধ্যে পড়ছে এখনকাব জাপান, চীন, ভাবত ইজিপ্ট, গ্রীস প্রভৃতি অঞ্চল। মায়াদেব ওপব এই সব অঞ্চলেব সভ্যতা ও সংস্কৃতিব বিশাল প্রভাব লক্ষিত হয়েছে। মায়া ভাষা সম্পর্কে মাগালোনিব মত হল, ভাষাতত্ত্ববিদবা দীর্ঘকাল ধবে বিশ্বেব সমস্ত ভাষাব যে আদি জননীটিকে খুঁজছিলেন, এই মায়া ভাষা হল সেই জননী। মায়া ভাষাব বহু শব্দরূপ ও অন্যান্য ভাষাব শব্দরূপেব সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। মাগালোনিব বিস্ময়কব আবিষ্কাবে পবে আসছি, তাব আগে বলে নিই যীশুব বিদায়বাণীব কি অপূর্ব অর্থ তিনি বেব কবেছেন। অ্যানই আমাকে পবিচয় কবিয়ে দিয়েছেন মাগালোনিব সঙ্গে।

যীশু বলেছিলেন, হেলি লামা যাবাক তানি। মায়া ভাষায় এব সব কটি শব্দই আছে। মায়াদেব ধর্মীয় আচাব আচবণেব এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। আলাদা আলাদা ভাবে। এই আলাদা শব্দগুলিকে একত্রে জুড়লে যে অর্থ পাওয়া যায় সেই অর্থেই অবতাব যীশুব শেষ উক্তিটি যথোচিত সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হেলি, মানে এখন, পাকাপাকিভাবে, ইতোমধ্যে। লামা মানে নিমজ্জিত কবা, নিজেকে বিসর্জন দেওয়া। যাবাক মানে ধোঁয়া, বাষ্প, অথবা উষাব প্রাক্কাল। তানি মানে সামনে, উপস্থিতিতে। মাগালোনিব ব্যাখ্যায় মায়া ভাষা অনুসাবে খ্রীস্টব বিদায়বাণীব অর্থ দাঁড়াল, নাও আই মিবস মাইসেলফ ইন দি প্রি ডন অফ ইওব প্রেসেনস। প্রভু তোমাব উপস্থিতির সমাসন্ন উষায় নিজেকে বিসর্জন দিলাম।

যে প্রশ্ন বহুক্ষণ ধবেই, বহু দিন ধবেই আমাকে পীড়া দিচ্ছিল, তা হল কাবা এই মায়া। সেই প্রশ্নেব ওপব আলোকপাত হল আজ। যুকাটান দৈনিকে অ্যানথ্রপলজিস্ট কার্লোস ভিলানুয়েভা একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, 'দি মায়াজ নিউ হিস্টোবিক্যাল ভিসান'। তিনি ওই বচনায় একটি পৌবাণিক উপাখ্যানেব উল্লেখ কবেছেন, যাব অংশবিশেষ হল নাইকি জাতিব সদস্যবা বিশাল, বিশাল এক জাহাজ তৈবি কবে ভাসিয়ে দিল সমুদ্রে। সেই জাহাজ ভাসতে ভাসতে নুকুহিবা দ্বীপেব পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল পূর্ব দিকে। শেষে তাঁবা গিয়ে পৌঁছলেন একটি দেশে। সেই দেশেব নাম টেপিটি।

বিশাল এক মহাদেশ। নানা ঐশ্বর্যে ভরপুর এক স্বর্গরাজ্য। এই নাইকি বসবাস করত পলিনেসিয়ার হিবাওরা দ্বীপে। টেফিটি হল আমেরিকা।' ওই প্রবন্ধে ভিলানুয়েভা উল্লেখ করেছেন খ্রীস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে মায়া শহরে যে সিরামিক সামগ্রী তৈরী হত, সেই শিল্পকর্মে জাপানের জোমোন সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। কারা এই জোমোন। জোমোনরা ছিলেন দুঃসাহসী নাবিক। ওই সময় তাঁদের বাণিজ্যপোত সমুদ্রে বিশাল এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াত। পলিনেসিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া সর্বত্র তাঁরা তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শ রেখে গেছেন। এই জোমোন নাবিকরা প্রশান্ত মহাসাগরের 'কুরো-শিভো' স্রোত কাজে লাগিয়ে চলে গিয়েছিল আমেরিকা। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় সভ্যতার প্রখর উন্মেষের দিনেও এই যোগসেতুটি ভেঙে পড়েনি।

মেসো-আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতায় এশিয়ার প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে মেনে নিতেই হয়, এশিয়াবাসীরাই এখানে গড়ে তুলেছিলেন বিশাল এক কর্মকান্ড, সম্পূর্ণ নিজেদের মতো করে, নিজেদের শক্তি ও কারিগরী বিদ্যা কাজে লাগিয়ে। তিনশো শতকে মায়ারা যেসব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তার যে খিলান, স্থাপত্যের ভাষায় তাকে বলে 'করবেলড় আর্চ'। দু'পাশে উঁচু দেয়াল, সেই দেয়াল থেকে খিলান ক্রমশই যেমন ওপর দিকে উঠেছে সেই রকম দেয়াল থেকেও কিছুটা বেরিয়ে এসেছে ঠেলে। মায়া সভ্যতায়, মায়া শহরে সাধারণ বাড়ি বলে কিছু ছিল না। সবই মন্দির, ভজনালয়, উপাসনাগৃহ। আর বিশাল বিশাল বাঁধানো উঠান, চত্বর বা প্লাজা। এই 'করবেলড় আর্চ' ভারত, পাকিস্তান; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র পাওয়া যায়। মায়া ধ্বংসাবশেষে, লিপি ও খোদাই চিত্র-সমন্বিত যে অজস্র প্রস্তরস্তম্ভ আজও জেগে আছে, অনুরূপ স্থাপত্য ও শিল্প নিদর্শন আমরা পাই ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়। গুয়াতেমালার টিকলেতে যে মায়ামন্দির পাওয়া গেছে, সেই মন্দিরের সঙ্গে কম্বোডিয়ার, আঙ্গকোরের পিরামিড, বাকসেয়ি চান গ্রঙ্গ-এর ভীষণ মিল।

মেকসিকোর চিয়াপাস প্রদেশে পালেঙ্ক বলে যে জায়গাটি আছে সেখানে একটি মায়ামন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে, 'টেম্পল অফ দি ক্রশ।' সেই মন্দির অভ্যন্তরে পুষ্পশোভিত ক্রুশের যে-সব কাজ আছে, তার সঙ্গে আমাদের অজন্তা গুহাচিত্রের অসাধারণ মিল। অনুরূপ ধর্মীয় প্রতীক জাভার মন্দিরগাত্রে ও আঙ্গকোরে আছে। মায়ামন্দিরের প্রবেশদ্বারে বহু রকমের পৌরাণিক প্রাণীর মুখ উৎকীর্ণ আছে। জাভার মন্দির দুয়ারেও সেই একই রকমের কাজ; মায়া ধ্বংসাবশেষের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে নানা আকার ও আকৃতির স্তম্ভ। এই স্তম্ভের ওপর ছাদ ছিল। স্তম্ভগুলির আকৃতি কোনওটা সম্পূর্ণ একটি মানুষ। দুটি হাত ওপরদিকে তোলা, যেন কোনও কিছু ধরে আছে। কোনওটা অর্ধমানব, পায়ের কাছে একটি জাগুয়ার। কোনওটা জাগুয়ার মানব। কোনওটা হেলান দিয়ে বসে থাকা একজন মানব। তার মাথার ওপর দিয়ে স্তম্ভটি উঠে গেছে বেঁকে। এমন শিল্পকর্ম দেখলে একটিই ভাব হয় মনে, সুবিপুল বিস্ময়। একটিই প্রশ্ন জাগে, একি কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতায় তৈরি। কোন কোণ, কি জ্যামিতি, ভার সংস্থাপনের কি গাণিতিক হিসাব। যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে বজ্রের মতো। স্থাপত্যের ভাষায় একে বলে অ্যাটলান্টেস। ঠিক অনুরূপ নিদর্শন ছড়ানো আছে ভারতের সাঁচিতে। খ্রীস্টের জন্মের একশো বছর আগে নির্মিত।

উকসমল, কোপান, চিচেনইৎজাতে, অনেক রিলিফের কাজ আছে। পৌরাণিক সরীসৃপ। সরীসৃপের দেহ থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষের মুখ। হিন্দু মকরের সঙ্গে যার অসাধারণ মিল। এই মকর মূর্তি আছে ভারতের অমরাবতীতে। তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় শতকে।

বোনামপাক আর পিয়েদ্রাস নেগ্রাসে যে গাত্রচিত্র আছে, তার সঙ্গে ভারত এবং অষ্টম ও নবম শতকের জাভা গাত্রচিত্রের অসাধারণ মিল। সাপ হল সৃষ্টির প্রতীক। এই ফ্যালিক কাল্ট ভারত এবং মায়া উভয় সভ্যতাতেই চর্চিত হয়েছে। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতে আছে 'মায়া' নামক এক জাতির মানুষকে বহিষ্কারের কথা। 'মায়া' নামে হিন্দুদের এক দেবীও আছেন।

নাগা ভাষার সঙ্গে মায়া ভাষার অসাধারণ মিল। আমরা এখন য়ুকাটান প্রদেশের যে গ্রামটিতে বসে আছি তাদের মায়া ভাষার নব্বই শতাংশ শব্দ নাগা ভাষায় পাওয়া যাবে। গবেষক মাগালোনির সিদ্ধান্ত, কয়েক হাজার বছর আগে, মায়া সভ্যতার ভাঙচুরের কালে, একদল মায়া মানব ভারতে এসেছিলেন। তাদের প্রথমে বলা হত 'নাগা'। পরে বলা হত 'দাহভস'। তাদের রাজধানী ছিল,

'নাগাপুব'। চাব শতকেব ঐতিহাসিক ভালমিকি লিখছেন, তিব্বত অঞ্চলে এসে একদল মানুষ বসবাস শুরু কবেন, তাঁদেব বলা হত 'নাগা-মাযা'। খাঁটি ইতিহাস, এব মধ্যে কোনও পুবাণগাথা নেই। এঁবাই পববর্তীকালে সভ্যতা নিযে যান ব্যাবিলনে আকাডিয়া, ইজিপ্ট এবং গ্রীসে।

মাগালোনি নাগা ও মাযা ভাষাব সাদৃশ্য বোঝাতে, সংখ্যাব উদাহবণ দিযেছেন। নাগা আব মাযাবা এক থেকে দশ একই ভাবে লেখেন ও উচ্চাবণ কবেন।

জাপানী ভাষাব সঙ্গেও মাযা ভাষাব বহু শব্দেব মিল আছে। জাপানী গবেষক ও ট্যুবিস্টবা এসে এই সাদৃশ্য খুঁজে পেযেছেন। কোথা দিযে কি যে হযে বসে আছে। উন্মুক্ত সমুদ্রে দুঃসাহসী নাবিক আব কালস্রোত, কবে কি যে ঘটিযে বসে আছে। এই যে আমাদেব চোখেব সামনে পিবামিডটি দাঁড়িযে বযেছে, এই পিবামিড তো প্রাচ্য এবং মধ্য প্রাচ্যেও আছে।

অ্যান বললে, 'চলো এইবাব আমবা বাড়ি যাই, সন্ধে হযে গেল।'

শৈশবে ঠিক এই কথাটাই আমাকে আমাব মা বলতেন। গঙ্গাব ধাবে বসে জাহাজ দেখছি। সূর্য ঢলে ঢলে গেল পশ্চিমে। মা বলতেন 'চল এবাব আমবা বাড়ি যাই।'

সেই ছবিব মতো ইন্ডিযান গ্রামটিকে পেছনে ফেলে আমবা দু'জনে পাযে পাযে এগিযে চললুম শহব জীবনেব দিকে। টিংলিং শব্দে অজস্র ঘন্টা বেজে চলেছে। লাল আকাশেব গাযে কালো হযে আছে সাব সাব সিবা গাছ। মাঠ পেবিযে ছুটে আসছে মেক্সিকান ঘোড়াব মতো পাগলা বাতাস।

দিগন্তপ্রসাবী ফাঁকা মাঠ। আগ্নেযগিবিব দিক থেকে ছুটে আসে সন্ধ্যাব জাদু বাতাস। অতীতেব মাযা শহবে এই সময থেকেই শুরু হত যত গোপন ধর্মীয অনুষ্ঠান। দিকে দিকে জ্বলে উঠত মশাল আব দীপশিখা। অন্ধকাব প্রান্তবে ঘোড়াব ক্ষুবেব শব্দ। নৃপতিব পবেই সবশক্তিমান ছিলেন পুবোহিত। সৈন্যবাহিনীব পাশাপাশি ছিল বিশাল দাসবাহিনী। মাযা সভ্যতাব বিকাশ ও লয সম্পর্কে গবেষণাব অন্ত নেই। প্রশ্নেব পব প্রশ্ন। স্প্যানিশবা এলেন। এসে অবাক। একি ব্যাপাব। অবণ্যেব গা ছমছমে পবিবেশে লুকিযে বযেছে বিশাল এক আযোজন। বহু বহু বছবেব, অসংখ্য মানুষেব শ্রমে গড়ে তোলা, প্রাকাব, পবিখা, পিবামিড, অঙ্গন প্রাঙ্গণ, বাগ, বাগিচা, ফোযাবা, পাথবে কোঁদা অসংখ্য অসাধাবণ সব মূর্তি। সেই সব মূর্তি দেখলে মনে একটা অলৌকিক ভাব আসে। ভয হয়। মানুষেব কোন কল্পনায এই সব মূর্তিব আদল এসেছিল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব পিলাব। অদ্ভুত সব প্রতীক আব লিপি। ক্যালেন্ডাব। সময নিরূপণ যন্ত্র। মানমন্দিব। কি কাণ্ডই না কবে বেখে চবিত্রবা সব উধাও হযে গেছেন। সোনা, সোনাব অলঙ্কাব, ফিউনাবেল মাস্ক, নিটোল সোনাব পাতে তৈবি। সব যেন ভোজবাজি। জানি মহাকাশ থেকে একদল নভোচব পৃথিবীব এই অলৌকিক প্রান্তবে নেমে, জীবনখেলাব শ্রেষ্ঠ খেলা খেলে, নভোযানে চড়ে আবাব মহাকাশে বিলীন হযে যেতে পাবে না। তবু ভাবতে ভাল লাগে। যেমন ভাবতে ভালো লাগে, অ্যাবোমিনেবল স্নো ম্যানেব কথা। গভীব বাতে নর্থকলেব গ্লেসিযাবেব ওপব দিযে অক্লেশে হেঁটে চলেছে টলতে টলতে। পর্বতাবোহীবা কখনও সেই বহস্যমানবেব বিশাল পদচিহ্ন ববফেব ওপব পড়ে থাকতে দেখে। যেমন লকনেস মনস্টাব। কেউ দেখেছে। থকথকে কালো জল থেকে দীর্ঘ গলাব ওপব ভযঙ্কব মাথাটি তুলে বাতাসে দোল খাচ্ছে। কেউ দেখেনি। দেখেনি বলেই কি আব কল্পনাকে মেবে ফেলা যায। যা নেই, যা হয না, সেইটাই হয বা আছে ভাবতে পাবা যায বলেই এই বিজ্ঞান আব যন্ত্রেব পৃথিবীতে গণিতেব জীবন ভিন্ন একটা মাত্রা পায। আমাদেব ন্যাযশাস্ত্র সেই কাবণেই বলেছেন, যা তুমি ভাবতে পাবো, তাই আছে। যা তুমি ভাবতে পাবো না তা নেই। কল্পনা হল বাস্তবেব ধূম। আগুন আমি দেখিনি, কিন্তু বহু দূব থেকে ধূম দেখে অনুমান কবতে পেবেছি, তলায কোথাও আগুন আছে। সে-সব অনেক কথা। আকাশ অসীম। তবু জগতাতীত জগতেব কল্পনায় বিভোব। পৃথিবী ছাড়া কিছু নেই, তবু আমরা ভাবি স্বর্গেব কথা। বেহস্তেব কথা।

অ্যান আমাব পাশে পাশে আপনমনে গুনগুন কবে গান গাইতে গাইতে চলেছে। আমবা একটা স্লেট পাথরেব ঢাকা মসৃণ ভূখণ্ডেব ওপব দিযে হেঁটে চলেছি। জাযগাটা বেশ উঁচু। চাবপাশ ছড়িযে আছে অনেকটা নিচে। আধো অন্ধকাবে দেখতে পাচ্ছি এক আবোহী, মাথায তাব সমব্রেবো হ্যাট, বলিষ্ঠ এক দুগ্ধ ধবল ঘোড়ায় চেপে নির্জন প্রান্তব ধবে আপনমনে চলেছে। বিশেষ কোনও তাড়া

নেই। এই একটা দেশ, যেখানে মানুষের ছোটাছুটি, হাঁকাহাঁকি, আর ব্যস্ততা নেই বললেই চলে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঢিমে একতালে জীবনের ছন্দ বাঁধা।

ওই ইন্ডিয়ান গ্রামে বসে অ্যান একটা মায়া-সঙ্গীত শিখেছে। সেইটাই গাইছে। ওদেরই সুরে।

এসপিদর দা লস আবরোলস আ উনো আ দস।

জমোস আ কাজার আ ওবিল্লাস দা লা আবরোলেদা।

এন ভাঞ্জা লিগেরা হাস্তা ত্রেস॥

মানে বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি নিজের মতো একটা অর্থ করে নিলুম, উনো মানে এক, দস মানে দুই। ত্রেস মানে তিন। তা হলে, তাড়া করো, তাড়া করো, তাড়া করো, ওই দেখো যায় কুঞ্জ, আর এক, কি দু কদম দূর॥ হে মহাজন, হে ঈশ্বর, ওই তো আমার শান্তিধাম। আর মাত্র তিন ঘড়ির পথ। অ্যান বললে, গলা মেলাও, আ উনো, আ দস। কে জানে ক'ঘন্টা পাবে এ জীবনটা। আমাদের সেই অপূর্ব দ্বৈত সঙ্গীত, এলো চুলের মতো বাতাসে, পাখির মতো উড়ে গেল। আকাশ সোনার মতো লাল। এ হল সোনার দেশ। সোনা হল সোয়েট অফ দি সান, রুপো হল টিয়ার্স অফ দি মুন। সূর্যের ঘাম, চন্দ্রের চোখের জল। ১৫২০ সালে, বিখ্যাত জার্মান শিল্পী আলব্রেখট ডুরার লিখছেন, 'আমি দেখে এলাম। নতুন সোনার দেশ থেকে বিজেতারা রাজার জন্যে উপহার নিয়ে এসেছে। বিশাল এক সূর্য, নিরেট সোনায় তৈরি। নিয়ে এসেছে একটি চন্দ্র, নিরেট রুপোর। দু' ঘর ভর্তি বর্ম শিরস্ত্রাণ, অদ্ভুত অদ্ভুত সব অস্ত্রশস্ত্র। এতকাল বেঁচে আছি, ওই সব অপূর্ব সামগ্রী দেখে যে আনন্দ পেলাম, তেমন আনন্দ আর পাইনি কখনও। কারণ সে এক অদ্ভুত শিল্পকর্ম। অত্যাশ্চর্য শিল্প নিদর্শন। কত বড় শিল্পী হলে, তবেই না এমন আশ্চর্য সুন্দর জিনিস তৈরি করা যায়।'

এ তো হল গিয়ে শিল্পীর দৃষ্টিতে আর এক দল শিল্পী। কিন্তু লুঠেরাদের চোখে শিল্প সভ্যতার কোনও মূল্য নেই। সেই সব লোভীর চোখে মূল্যবান হল গোল্ড, সিলভার, ডায়মন্ড, রুবি, স্যাফায়ার জেড। সে যে কি কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। লুঠেরার পর লুঠেরার অসভ্য অত্যাচারে পাঁচশো বছরের সাধনার কঙ্কালটুকু পড়ে রইল। কর্টেসের দলের সেই সৈনিক লেখক, বার্নাল ডায়াজের চোখেও জল এসে গিয়েছিল, অত্যাচার, ধ্বংস, আর লোভের সাংঘাতিক পরিণাম দেখে। তিনি লিখলেন, 'অল ইজ ওভারথ্রোন অ্যান্ড লস্ট, নাথিং ইজ লেফট স্ট্যান্ডিং।' সব ভেঙেচুরে শেষ করে দিলে, সবই গেল হারিয়ে। কিছুই আর অক্ষত রইল না।

কলম্বাস যখন প্রথম সানসালভাদরে পৌঁছলেন, তাঁর যাত্রাপথের প্রথম ল্যান্ডফল, সেখানে তাঁর লোভী নাবিকরা দেখলেন দ্বীপবাসী রমণীদের নাকে সোনার অলঙ্কার। সেই থেকেই হিস্পানিদের মনে ঢুকে গেল সোনার লোভ, এমন একটা উদগ্র আকর্ষণ যে, ইন্ডিয়ানরা মনে করতে লাগলেন, হিস্পানিরা বুঝি সোনাকেই দেবতা হিসেবে আরাধনা করছে। কর্টেস তাঁর স্প্যানিশ বাহিনী নিয়ে বসে আছেন কিউবায়। সে সময় ইন্ডিয়ানরা দেখলেন, এই সব অদ্ভুতদর্শন শ্বেতাঙ্গরা কেবল সোনা আর সোনা করে নিজেদের মধ্যেই খেয়োখেয়ি করছে সারাটা দিন। এখানে ১৫১৩ সালের একটা রেকর্ড দেখলুম। অজ্ঞাত কোনও শিল্পীর আঁকা রঙিন একটা ছবি। অবশ্যই কোনও হিস্পানি। হিস্পানিরা যেমন আক্রমণকারী, লোভী, লুটেরা ছিল, সেইরকম তাঁদের মধ্যে বোধবুদ্ধি সম্পন্ন, মানবিক চেতনাসম্পন্ন, পণ্ডিত মানুষও ছিলেন , যাঁরা স্বজাতির, কাণ্ডজ্ঞানশূন্যতা, নিষ্ঠুরতা ও লোভের সমালোচনা করে গেছেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। ইংরেজদের মধ্যেও আমাদের পরাধীনতার কালে এমন মানুষ দেখেছি। তা এই ছবিটি খুব মজার। একটা জঙ্গল। স্তূপাকার একগাদা অলঙ্কার। মণিমানিক্যখচিত। একদল স্প্যানিশ কনকুইস্তাদের কোথা থেকে লুঠপাট করে এনেছে মায়া-সম্পদ। সেই লুঠের মালের ভাকাতে ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে। হিস্পানি সৈনিকদের হাতে গাদা-বন্দুক। কোমরে তরোয়াল। নিজেদের মধ্যে খুব কাজিয়া হচ্ছে। ওইদিকে আরো মূল্যবান সম্পদ বয়ে আনা হচ্ছে ধরাধরি করে। একজন কোমর থেকে তরোয়াল বের করছে, অন্য আর একজন তুলছে বর্শা। অন্যরাও তৈরি হচ্ছে। এমন সময় একজন মায়া ইন্ডিয়ান এসে, তাদের শান্ত করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। এইবার লেখাটা হল এইরকম, 'কেন মারামারি করে মরছ, এই সামান্য সোনার জন্যে। ওই যে দেখছ, দূর-পাহাড়, ওই পাহাড় পেরিয়ে হেঁটে যাও। হাঁটতে হাঁটতে ছ'দিন পরে পাবে এক বিশাল

সমুদ্র। সেই সমুদ্রের তীরে আমরা বাস করি। সেখানে গেলে দেখবে, আমরা সোনার থালায় খাবার খাই। লোকটি সন্ধান দিয়ে গেল প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের স্বর্ণ-সাম্রাজ্যের। ইনকা এম্পায়ার। যেখানে ভাস্কো ন্যুনেজ দ বালবোয়া পৌঁছেছিলেন ১৫১৩ সালে। দুই কনকুইস্তাদর কর্টেস ও ফ্রান্সিসকো পিজারোর মধ্যে সেই সময় খুব লড়ালড়ি হচ্ছিল। দু'জনের দুই দল। কর্টেস আবার ভয়ঙ্কর স্বাধীনচেতা, রাজদ্রোহীও বলা চলে। স্পেনের রাজা তাঁকে তেমন সুনজরে দেখতেন না। পিজারো ছিলেন তাঁর ফেবারিট। পিজারোর আগে স্পেনের রাজার শেষ মুহূর্তের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কর্টেস মেক্সিকো দখল করে বসলেন। মায়া ও অ্যাজটেক সাম্রাজ্য লুঠ করে ধনকুবের হয়ে গেলেন। দশ বছর পরে সুযোগ পেলেন পিজারো। পিজারো শেষ করে দিলেন ইনকা সাম্রাজ্য। তাঁর সেক্রেটারী পেড্রো সাঞ্চো লুঠপাটে কর্টেসকে ধরে ফেললেন। ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপার সম্পদ এসে জমা হল পিজারোর শিবিরে। সাঞ্চো সেই সম্পদের একটা তালিকা রেখে গেছেন, সোনার তৈরি অসংখ্য বিরাটাকৃতির ফুলদানি, জার, গোল্ড প্লাক, এক একটির ওজন পাঁচ থেকে বারো পাউণ্ড। মন্দির আর বাড়ির দেয়াল থেকে খুলে আনা। সোনার পাদানি। সোনায় তৈরি ফোয়ারা। তার কারুকার্য, তার গঠনভঙ্গি, এত অপূর্ব দেখলে মনে হয় বিশ্বের এক আশ্চর্যতম শিল্পকর্ম। অর্থে যার মূল্য করা যায় না। এইবার সাঞ্চো লিখছেন, এইসব লুঠের সম্পদ যখন ওজন করা হল, তখন ওজন দাঁড়াল আড়াই মিলিয়ান আউন্স। কে বোঝে সেইসব শিল্পকর্মের সৌন্দর্য। সব গলিয়ে করা হল খাঁটি সোনা। সেই সোনার ওজন দাঁড়াল দশ লক্ষ থেকে চোদ্দ লক্ষ আউন্স। কি তারও বেশি। ডুরার যা দেখেছিলেন তা কিছুই নয়। যৎসামান্য দেখেই তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। কারণ রাজসংগ্রহের সবই এসেছিল গলিত সোনার 'বার' হয়ে। কিছু আসতে পেরেছিল অবিকৃত অবস্থায়।

আর একটি ছবি দেখলুম। সেও এক অসাধারণ চিত্র। স্বর্ণলোভী কিছু হিস্পানিকে মাটিতে চিৎ করে ফেলা হয়েছে। একজন চেপে ধরেছে হাত, একজন চেপে ধরেছে পা, অন্যজন ধরেছে মাথা; এইবার তাকে হাঁ করিয়ে মুখে ঢালা হচ্ছে গলিত সোনা, হাতায় করে।

এইসব ভাবতে ভাবতে পথ ফুরিয়ে এল। আমরা আবার এসে গেলুম আমাদের মায়া মেরিডায়। সবে তখন রাত নেমেছে গোলাপী ওড়না উড়িয়ে। মাথার ওপর অচেনা দেশের সন্ধ্যার আকাশ। পায়ের তলায় এমন এক ভূমি, যার প্রতি সেন্টিমিটারে ইতিহাসের স্পন্দন। বহু দূর অতীতে দুঃসাহসী নাবিকেরা যখন ছোট বড় নানা রকমের পালতোলা জাহাজে ভেসে পড়েছিলেন মহাসমুদ্রে, তখন তাঁদেরও একটা অনুভূতি হয়েছিল, আকাশ। জলের কোনও মাত্রা নেই। দিগন্ত-বিস্তারী সমুদ্র বৈচিত্র্যহীন, যতক্ষণ না স্থলের রেখা ফুটে ওঠে দিকচক্রবালে কিন্তু আকাশ। প্রতিটি নটিক্যাল মাইলে আকাশ বদলাচ্ছে, নতুন তারার দল ফুটে উঠছে, নতুন নতুন তারামণ্ডল, যা ইওরোপে বসে দেখা সম্ভব ছিল না। সমুদ্রে কোনও আপাত বিস্ময় না থাকলেও আকাশ ছিল।

আমরা আমাদের চলার পথে, স্থল এবং আকাশ, দুটো বিস্ময়ই অনুভব করছি সমমাত্রায়। যখনই মনে হচ্ছে, একটু থেমে এই ভূমি যদি খুঁড়তে শুরু করি, তাহলে হয়তো বেরোতে থাকবে জেড, অবসিডিয়ন মূল্যবান সব পাথর, আরও গভীর স্তরে হয়তো পেয়ে যাবো এমন এক প্রস্তর-কুঠার যার বয়স হবে চল্লিশ হাজার বছর। সেই আইস-এজের কালের কোনও এক আদি মানবের নিজস্ব হাতিয়ার।

এই সব কল্পনা যতই মনে আসছে চলার রহস্য ততই বেড়ে যাচ্ছে। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, মেকসিকো এক ভূগোলের বিস্ময়। সমভূমি থেকে পাহাড়। বিশাল, ঘন রেনফরেস্ট থেকে মরুভূমি, শ্যামল কৃষিক্ষেত্র থেকে কাঁটা ঝোপে ভর্তি ঢেউ খেলানো কাঁকুরে জমি। কোথাও বইছে নদী। প্রাকৃতিক সরোবর, কোথাও আবার জল নেই একফোঁটা। চুনাপাথর আর আগ্নেয়শিলার ফাঁক বেয়ে, উদার হাত গলে ঝরে গেছে নিচে। গোপন কন্দরে তৈরি করে রেখেছে প্রাকৃতিক জলাধার বা সোনোটস। পরিশ্রমী, শক্তিশালী মানুষ ছাড়া দুর্বলের জল পাবার উপায় নেই। শহর ছাড়া অধিকাংশ অঞ্চলের এই একই অবস্থা। 'টাফ গাই' হতে হবে আমেরিকার ভাষায়। আমরা ওই গ্রামটিতে এমন প্রাকৃতিক কূপ দেখে এলুম পাথরের দেয়াল তোলা। পাশে একটি বৃক্ষকাণ্ড পোঁতা; তার ওপর লাগানো আছে একটি ছোট্ট লোহার চাকা। এই কপিকলের সাহায্যে মা জল তুলছেন গভীর কূপ থেকে। মাকে সাহায্য করছে দুই মেয়ে। বিশাল বিশাল টাব ধরনের বালতি। জল-সমেত তার যা

গুঞ্জন, আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। এরা সব পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী। অলিভের মতো গাত্রবর্ণ। পালিশ করা ত্বক। ভ্রমরকৃষ্ণ চুল। জেড পাথরের মতো চোখ। বহু দূরে আকাশের কোলে যে-সব পাহাড় রাতের ওড়নার আড়ালে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, সেই সব পাহাড়ে, পাহাড়ের চারপাশে অজস্র গুহা আছে। অ্যামেচার আর্কেয়োলজিস্টরা দিগ্বিদিক থেকে ছুটে আসেন। ভেপসা গরম, প্রখর রোদ, গভীর জঙ্গল, দুর্গম পার্বত্যপথ কোনও কিছুই তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। ইতিহাসের এমনই আকর্ষণ। অতীত সেরা গোয়েন্দা-কাহিনীর চেয়েও রহস্যময়। পৃথিবীর এই প্রান্তে কত হাজার বছর আগে মানুষ এসেছিল!

৬৪

উত্তর আমেরিকার মাথার ওপর বেরিং স্ট্রেট। আলাস্কা। বরফযুগ। জলের ধারার মতো একদল আইস এজ হান্টার নিচের দিকে নামছে। অজস্র শিকার। বিশাল বিশাল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। যে কোনও একটাকে বধ করতে পারলে, একটি পরিবারের এক মাসের প্রোটিনসমৃদ্ধ আহার। চামড়া থেকে পোশাক। চর্বি থেকে প্রদীপ। অস্থি থেকে অস্ত্র। নামতে নামতে মধ্য আমেরিকায়। এই চলার পথটি আমেরিকার বাম ধার বরাবর প্রশান্ত মহাসাগর ঘেঁসেই হয়েছে। মধ্য আমেরিকা পেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মাথায় এসে সভ্যতা দানা বাঁধল। তিয়োতিহুয়াকান, তেনোকতিতলান, লা ভেন্তা, চিচেনইতজা, তিকল, কোপান, মন্ত আলবানে জ্বলে উঠল সভ্যতার পাদপ্রদীপ। বিশাল এক দূরত্ব আলাস্কা থেকে মেকসিকো। এই পথ অতিক্রমে পার হয়ে গেল হাজার হাজার বছর। আইস-এজ শেষ হল। পৃথিবী উষ্ণ হতে লাগল। অদৃশ্য হল রেন ফরেস্ট। মরুভূমি তৈরি হল। বরফ যুগের বিশাল প্রাণী, স্লথ, ম্যাস্টোডেন, জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে কিছু কঙ্কাল, আর গুহাচিত্র রেখে চিরতরে হারিয়ে গেল। এতকাল এই স্লথ, ম্যাস্টোডেন, ঘোড়া আর গুয়ানাকো মেরে শিকারীদের সহজ জীবন বেশ চলছিল। এই সব প্রাণী অদৃশ্য হয়ে যাবার পর যাযাবর শিকারীদের জীবনে দেখা দিল খাদ্যসমস্যা। এই খাদ্যের সন্ধানে নামতে নামতে পানামা যোজক পেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা। চ্যানচ্যান, মাচুপিচু, কুজকো পেরিয়ে মানুষ চলে গেল দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে শেষ প্রান্তে তিয়েরা দেল ফুয়েগোতে। তিন অঞ্চলে স্থাপিত হল তিন সভ্যতা, অ্যাজটেক, মায়া, ইনকা। এই কয়েক লাইনে যা বলা হল, যেন কত সহজ ঘটনা, আসলে তা নয়। একটু উঁচুতে উঠে ভূপ্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হবে, দুঃসাধ্য এক ব্যাপার। দুর্গম থেকে দুর্গমতর বিশাল ভূভাগ মানুষের জন্যে সাদর আমন্ত্রণের কোল পেতে রাখেনি। জল, জঙ্গল, জলা, বাদা, বাষ্পাচ্ছিদ পঙ্ককুণ্ড, বিচিত্র পর্বতশ্রেণী, দুরন্ত নদী, বিশাল সরীসৃপ, প্রতিকূল আবহাওয়া, সব মিলিয়ে একটা চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মানুষ গ্রহণ করেছিল যন্ত্র ছাড়াই। এই কারণেই মানুষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শিকারের কাল শেষ হল। বাঁচার তাগিদে এল চাষবাস। এই অতীতকে আবিষ্কারের জন্যে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, বোটানিস্ট, জিওলজিস্ট, প্যালিওনেটোজিস্ট, জুলজিস্ট, এমন কি অ্যাটমিক ফিজিসিস্ট। সবাই মিলে মোটামুটি একটি ইতিহাস খাড়া করেছেন।

এগারো থেকে ন' হাজার বছর আগে বরফযুগের প্রাণীরা অদৃশ্য হল। প্রায় তিরিশ রকমের বিশালকায় প্রাণী ছিল এই বরফযুগে। সব গিয়ে এখন টিকে আছে একমাত্র গুয়ানাকো। পুরুষ পরিচালিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চেহারা ঘুরে গেল। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে এসে গেল মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ। নারীকে ঘিরেই রচিত হল পরিবার, গ্রাম। ঘুরতে লাগল জীবন, এল ধর্ম। পুরুষরা করে শিকার, মেয়েরা সামলায় পরিবার। চাষবাস করে। ফল কুড়োয়। সংরক্ষণ করে। পুত্র-কন্যা সামলায়। ঘরকন্যার জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ল, হাঁড়িকুড়ি, নানা রকমের পাত্র, এসে গেল মৃৎশিল্প। খ্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার চারশো অব্দে মানুষের আঙুল আর মাটির খেলায় তৈরি হল মৃৎপাত্র, বিচিত্র সব আধার। এর পরেই জীবন-মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন চিকিৎসক। যাঁদের বলা হত শামান। উইচ ডক্টর। খ্রীষ্টপূর্ব নয়শো অব্দ থেকে শুরু হল এদের দাপটের কাল। দেখা দিলেন ঈশ্বর, বৃষ্টির দেবতা, ফসলের

দেবতা, উর্বরতার দেবতা। কৃষির মাধ্যমে খাদ্য যখন এসে গেল মানুষের হাতের মুঠোয়, এল সঞ্চয়, উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডার, জীবন সহজ হয়ে মানুষের হাতে এল উদ্বৃত্ত সময়, তখন মানুষ শুরু করল শিল্প চর্চা। মাটি আর পাথরের মূর্তি তৈরি হতে লাগল। পাথরের পর পাথর সাজিয়ে গড়া হল বিশাল পিরামিড।

ঐতিহাসিকরা সময়টাকে এইভাবে ভাগ করেছেন, আর্কেয়িক পিরিয়ড, খ্রীষ্টপূর্ব সাত থেকে দু'হাজার চারশো বছর। প্রিক্লাসিক, খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০০ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ। ক্লাসিক ৩০০ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। পোস্ট ক্লাসিক, ৯০০ থেকে ১৫০০ অব্দ। প্রিক্লাসিক পর্যায়ে ওলমেক। ক্লাসিক পর্যায়ে মায়া। পোস্টক্লাসিকে মেকসিক্যান মায়া। ষোড়শ শতকে স্প্যানিশদের আগমন, এক ফুৎকারে নির্বাপিত সভ্যতার উজ্জ্বল এক সভ্যতার উত্থান ও পতন।

এই অনুমানের পাশাপাশি আরও কিছু রোমাঞ্চকর মত অথবা ভাবনা আছে। মানি আর না মানি। কারোর ধারণা মায়ারা হলেন ইস্রায়েলের হারিয়ে যাওয়া একদল আদিবাসী। কেউ মনে করেন, আ্যটলান্টিস অথবা মু যখন সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেল তখন একদল মানুষ কোনও ক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে এল মেসো-আমেরিকায়। কারোর কল্পনা এরা এসেছিল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া স্কাইদিয়া, কার্থেজ অথবা ইজিপ্ট থেকে কিম্বা ফিনিসিয়া থেকে। কেউ আবার বললেন, আলেকজান্ডারের নৌবহর থেকে যে জাহাজটি হারিয়ে গিয়েছিল, সেই জাহাজেরই নাবিক এই মায়াদের পূর্বপুরুষ। এই সব বাজারে কল্পনার কোনও ভিত্তি না থাকলেও বেশ রোমাঞ্চ আছে। ভাবতে ভালো লাগে। এমন একটা দেশ, এমন যার ভূপ্রকৃতি সেখানে রহস্যময় কিছু না ঘটলে ভালো লাগে না।

যেমন ষোড়শ শতকের ভ্রমণবৃত্তান্তে এই নতুন জগতের কত বিচিত্র তথ্য আছে। হিস্পানিয়া এই সব অলৌকিক তথ্যের পরিবেশক। এই সব পর্যটকবা অদ্ভুত কথা লিখেছেন। যেমন একজন লিখেছেন, দেখে এলাম ধনুর্ধারী এক মানুষ, যার মাথাটা বুকের সঙ্গে লেপ্টানো। একজন লিখেছেন, ইন্ডিয়ানরা দৈত্যের মতো লম্বা। তাদের এক একটা পা নৌকার মতো বিশাল। এরা হল প্যাটাগোনিয়ান। প্যাটাগোন হল বিশাল পায়ের পাতা যুক্ত মানুষ!

হিস্পানি মিশনারিরা ইন্ডিয়ানদের মানুষ বলে মনে করতেন না। কারণ নব বিশ্বের এই আদিবাসীরা বিশ্বাস করতেন তাঁরা আদম ও ইভের বংশধর। আর মিশনারিরা মনে করতেন মানুষ হল নোয়ার বংশধর। বাইবেলোক্ত প্লাবনের পর নোয়ার জাহাজ থেকে নেমে এসেছিল অন্যান্য সংরক্ষিত প্রাণীর সঙ্গে এই মানুষ। লুঠেরারা তাদের হিস্যা বুঝে নেবার পর পেছন পেছন এগিয়ে এলেন মিশনারিরা ধর্মপ্রচারে। কলম্বাস বলেছিলেন, এঁদের কোনও ধর্ম নেই। পুতুল আর পাথরের উপাসক। মিশনারিরা এসে দেখলেন, ধর্ম আছে, তবে ভীষণ জটিল। ইওরোপীয় মানুষের চোখে ইন্ডিয়ানদের ধর্মীয়-আচরণ-পদ্ধতি রোমহর্ষক। ধর্ম প্রচারের আগে জানা দরকার কি আছে। জীবন, বিশ্বাস, ভাষা, আহার বিহার। সমীক্ষার প্রয়োজন। চিয়াপার ফ্রায়ার বার্নারদিনো দ্য সাহাগুন সেই কাজটি করলেন। তিনি শুধু উৎসাহী ধর্মযাজক ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃত একজন অনুসন্ধিৎসু মানুষ। তাঁর সেই সমীক্ষাটি যে কোনও অভিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদদের মতোই পাকা কাজ ছিল। এই মধ্য মেকসিকোর প্রাচীন তথ্য তিনি বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করে উপহার দিয়েছিলেন ইওরোপের কৌতূহলী মানুষকে। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে শুধু অ্যাজটেক ধর্মের কথাই ছিল না, তাদের জীবনের অন্যান্য তথ্যও ছিল। তাদের শিল্পের বিবরণও ছিল, যেমন সোনা কি ভাবে গলানো হয়, কি ভাবে পালক থেকে অ্যাজটেকরা কাপড় তৈরি করতেন। ওই অঞ্চলের গাছপালা এবং প্রাণীজীবন। চিত্রসহ তিনি তৈরি করেছিলেন তাঁর পাণ্ডুলিপি। একালের পণ্ডিতেরা এখনও সাহাগুনের সেই পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করেন অ্যাজটেক রীতিনীতির তথ্য সংগ্রহের জন্য। আর একজন মিশনারি দিয়েগো দালাণ্ডাও য়ুকাটানের মায়া ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে খুব ভাল কাজ করে রেখে গেছেন পরবর্তীকালের গবেষকদের জন্যে। ১৫৪৯ সালে স্পেনের রাজার নির্দেশে লাণ্ডা য়ুকাটানে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন ফ্রানসিসকান মতাদর্শী। য়ুকাটানে এসে প্রথমেই তিনি শিখে নিলেন মায়া ভাষা। কঠিন একটি কাজ। অতি গীতিময় ভাষা। কঠিন উচ্চারণ প্রণালী; কিন্তু প্রতিটি শব্দে একটা ছন্দ আছে। এই ভাষার স্থানীয় নাম, নাওয়াত্‌ল। মধ্য মেকসিকোর বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ এখনও এই ভাষায় কথা বলেন। অনেক অঞ্চলের নামের সঙ্গে এই ভাষা জড়িয়ে আছে, যেমন, কুল-ওয়া-কান মানে দুর্গম পর্বত। উই, ৎসি-লো-পোচ্‌-ত্‌লি মানে বাঁ দিকে তোমার

গানের পাখি। মিক্‌-ত্‌লান-তে কুত্‌ কি, মৃত্যুর দেবতা, যম, যিনি নরকপোলের মুখোশধারী। নিশ-তেক মানে মেঘলোকের মানুষ। ওহাকা উপত্যকার অতি সুসভ্য এক সভ্যতা। এই রকম সব শব্দ নিয়ে না-ওয়াত্‌ল ভাষা। গাছের ছাল থেকে কাগজ তৈরি করে এই ভাষায় লিখতেন বই। লাণ্ডা তাঁর ধর্মপ্রচারের অতি উৎসাহে, হাতের কাছে মায়াদের যত বই পেয়েছিলেন, সবই পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ ওই সব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল মায়া ধর্মের পরিচয়। লাণ্ডার ধারণা, ওই সব বই ছিল শয়তানের লেখা। স্পেনে ফিরে গিয়ে ১৫৬৬ সালে তিনি প্রকাশ করলেন, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, 'রিলেশান অফ দ্য থিংস অফ য়ুকাটান'। এই বইতে তিনি মায়া-জীবনের প্রতিদিনের খুঁটিনাটি লিখে রেখে গেছেন। মায়ারা সেই সময় স্প্যানিয়ার্ডদের বুটের তলায় নিষ্পেশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। স্বাধীনতা, সভ্যতা খুইয়ে রাজার জাত তখন পরিণত হয়েছে ভৃত্যের জাতে।

লাণ্ডার বর্ণনায় আছে মায়া-জীবনের একটি দিন, মায়া রমণীরা এক রাত আগে চুনমিশ্রিত জলে ভুট্টার দানা ভিজিয়ে রাখে। সকালে সেই ভুট্টা নরম প্রায় অর্ধ-সিদ্ধ হয়ে থাকে। সকালে মেয়েদের কাজই হল সেই ভুট্টার দানা শিলে ফেলে বাটা। সেই বাটা ভুট্টাকে তারা তাল তাল করে, এক একটি তাল তারা তুলে দেয় শ্রমিক, পর্যটক এবং নাবিকদের হাতে। তাদের সারা দিনের খাদ্য। সঙ্গে আর কিছুটা আধবাটা ভুট্টাও দিয়ে দেয়। প্রাতে এই পর্বটি সমাধার পর তারা প্রাতরাশ সারে। পাত্র হিসেবে ব্যবহার করে কুমড়োর শুকনো খোলা। বেশ শক্ত একটি প্রাকৃতিক আধার। এই পাত্রে তারা প্রত্যেকে একতাল ভুট্টাবাটা জলে গুলে পান করে। এদের অতি প্রিয় খাদ্য এই ভুট্টার সরবত। যেমন পুষ্টিকর, তেমনি ভারি। পেটে থাকে অনেকক্ষণ। খুব মিহি করে বাটা ভুট্টার মণ্ড থেকে তারা দুধ বের করে আগুনে জাল দিয়ে ঘন করে পরিজের মতো আর একটি খাদ্য প্রস্তুত করে সকালের আহারের জন্যে। এই পরিজ তারা গরম গরমই খেয়ে নেয়। অবশিষ্ট যা পড়ে থাকে তাইতে জল ঢেলে রাখে। সারা দিনে এই সরবত বারে বারে তারা গ্রহণ করে। তারা সারা দিনে শুধু জল একেবারে খায় না। এই সরবতই পান করে। মাঝে মাঝে তারা ভুট্টাকে শুকনো খোলায় নাড়াচাড়া করে, সেই মুচমুচে ভুট্টা গুঁড়ো করে তারা সুস্বাদু সরবত করে সেই সরবতে ছড়িয়ে দেয় লঙ্কার গুঁড়ো অথবা কোকো। প্রাত্যহিক জীবনের বর্ণনার পর লাণ্ডা চলে গেলেন পুরাতত্ত্বে। য়ুকাটানের চিচেন-ইত্‌ যা'র ধ্বংসাবশেষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্যে। এই চিচেন-ইত যা'র আর্কেয়োলজিক্যাল সাইট মেকসিকোর একটি সর্বাধিক ভ্রমণ-আকর্ষণ। লাণ্ডা মায়া সাঙ্কেতিক লিপির অর্থোদ্ধারের চেষ্টাও করে গেছেন। সে-যুগের একটি অতি উল্লেখযোগ্য সত্যনিষ্ঠ গবেষণা। পাণ্ডুলিপি পড়েছিল দীর্ঘকাল। রাজা আর কনক্যুইস্তাদাররা ব্যস্ত ছিলে লুঠের মাল নিয়ে। অবশেষে প্রায় তিন শতাব্দী পরে লোভ শান্ত হবার পর প্রকাশিত হল সেই গ্রন্থ, ১৮৬৪ সালে। 'রিলেশান অফ দ্য থিংস অফ য়ুকাটান', দিয়েগা দ্য লাণ্ডা, ১৫৬৬।

মেরিডার বিখ্যাত আর্কেয়োলজিক্যাল মিউজিয়ামের কিউরেটার সেই বইটি আমাদের দেখালেন। মেরিডার এই যাদুঘর, আমার মনে হয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বহু গবেষক ও পুরাতত্ত্বের সুপণ্ডিতগণ দীর্ঘ ইতিহাস জোড়া লাগিয়ে ওলমেক, মায়া আর অ্যাজটেক সভ্যতার পুনর্সংস্থান করেছেন। কিউরেটার বললেন জাতীয় অহঙ্কার আর ধর্মীয় উন্মাদনায় লাণ্ডা আমাদের পুরাতত্ত্বের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে গেছেন। শুধুমাত্র এই সচিত্র বিবরণীটির জন্যেই তাঁর সাতখুন মাপ।

মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ভদ্রলোক একেবারে রাজার মতো মানুষ। অনেকক্ষণ হা করে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে তাঁর মুখ, তাঁর চেহারার দিকে। হিস্পানিরা হলেন সুন্দর আর সুন্দরীর জাত। দু'একটা কথা বলেই মনে হল, ভদ্রলোক অতি সুপণ্ডিত। জাত শিক্ষক। কেউ কিছু শিখতে অথবা জানতে চাইলে তিনি অসম্ভব খুশি হন। মনে হল, অ্যানকে তাঁর ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তাকাচ্ছেন প্রেমিকের চোখে। এতে আমার হিংসার কিছু নেই। আমি তো দু'দিনের পথিক। আজ হিঁয়া কাল হুঁয়া।

বিশাল মিউজিয়াম। অসংখ্য গ্যালারি। হ্যালোজেন বাতিতে উদ্ভাসিত। আমরা একটা উঁচু জায়গায় বসে আছি। বারান্দাও বলা যেতে পারে। আমাদের ডানপাশে রেলিং। নিচে বিশাল এক কক্ষ। সেইখানে নিখুঁত একটি মায়ানগরী তৈরি করে রাখা হয়েছে, মডেলের সাহায্যে। মায়া শহরে, মায়াদের বিভিন্ন স্তরের জীবনের দিন ও রাত। সেই অতীত মানবদের কর্মতৎপরতা। ব্যক্তিজীবন ও জনজীবন। কখনও ব্যবহার করা হয়েছে মডেল। কখনও ব্যবহার করা হয়েছে মাটি খুঁড়ে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক

আবিষ্কার। অমন একটা প্রদর্শনী খুব কমই দেখা যায়। ইতিহাস পড়ার আর প্রয়োজন হয় না। চোখের সামনে পড়ে আছে পাঁচ ছ'হাজার বছর আগের অতীত-গৌরব। যাতে ধুলো পড়ে সব নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্যে পুরো ব্যাপারটা কাঁচের চাদরে ঢাকা। ইন্ডিকেটার লাইট রয়েছে। ডিরেক্টারের টেবিলে কনট্রোল প্যানেল। তিনি বসে বসে শুধুমাত্র বোতাম টিপে সব বুঝিয়ে দিতে পারেন। ভারতীয়দের ব্যাপারে তাঁর একটা আলাদা শ্রদ্ধার ভাব আমি লক্ষ্য করলুম। কেন তা জানি না। এমনও হতে পারে ভারতীয়ের ইংরেজি ইন্ডিয়ান বলে তাঁর এই শ্রদ্ধা। আবার মনে হল, হিন্দুধর্ম, বেদের ধর্মকে তিনি শ্রদ্ধা করেন; যে ধর্ম মানুষকে মন আর দেহ জয় করতে শিখিয়েছে। আমি যেমন মেকসিকো, মায়া সভ্যতা, পেরুর ইনকাদের ইতিহাসে মোহিত, তিনি তেমনি হিমালয়, রামায়ণ, মহাভারত, তপোবন, আমাদের অরণ্য, সমুদ্র আর তিব্বত সম্পর্কে ভীষণ শ্রদ্ধাশীল। যুদ্ধবিলাসী, বর্ণবিদ্বেষী পশ্চিমের অহঙ্কার তিনি তেমন পছন্দ করেন না। খুব স্বাভাবিক। মেরিডার মত শান্ত, স্থিত শহরে মাসখানেক বসবাস করলে মনে একটা সাত্ত্বিকভাব আসবেই আসবে। এমন রোমান্টিক শহর পৃথিবীতে আর আছে কি? শুনেছি অস্ট্রিয়া খুব কালচারড দেশ। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে ঢেলে দিয়েছেন সৌন্দর্য। মানুষও সেইরকম সুশিক্ষিত। রাতে সারা দেশ সেজে ওঠে আলোকমালায়। প্রতিটি চৌমাথায় আলোকিত ফোয়ারা। প্রতিটি বাড়ি থেকে উপচে পড়ছে ক্ল্যাসিক্যাল কনসার্ট। লোকসংখ্যা কম। সকলেই ধনী। মানুষে মানুষে দেখা হলে সম্বোধনের ভাষা 'হের ডক্টর'।

ডিরেক্টারের হাতের চাপে আলোকিত হয়ে উঠল একটি মানচিত্রের নকশা। প্রাচীন মায়া সাম্রাজ্যের প্ল্যান। ভদ্রলোক বোঝাতে লাগলেন মায়ারা কি সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন শহরে শহরে। বন্দর থেকে বাণিজ্যকেন্দ্রে। কি অদ্ভুত ছিল তাঁদের পূর্তকৌশল। সমস্ত পথই চলে গেছে সরলরেখায়। কোথাও কোনও বাঁক নেই, মোচড় নেই। মায়ারা ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন ডাকহরকরার মাধ্যমে। রাস্তা মানে খানাখন্দে ভরা কলকাতার রাজপথ নয়। প্রকৃত হাইওয়ে। সমান সমতল, মসৃণ। স্থপতি লুভেল লাকোস্কি এই আবিষ্কারের জন্যে খ্যাতকীর্তি। তিনি এই ম্যাপটির প্রণেতা। ক্যারিবিয়ার সমুদ্র শহর টুলুম থেকে একটি পথ বেরিয়ে চলে গেছে কোবা। কোবায় পথ দু'ভাগ হয়ে একটি শাখা গেছে একাল। একাল থেকে শেষ হয়েছে আকসুনায়। আর একটি শাখা গেছে চিচেন ইতজায়। সেখান থেকে ইজামাল হয়ে আকে। সেই সময় প্রাণকেন্দ্র। আকে থেকে পথ চলে এসেছে রাজধানী টিহোতে। অর্থাৎ মেরিডায়, এখন আমরা যেখানে বসে আছি। এই টি হো বা মেরিডা থেকে আর একটি রাজপথ মায়ারা চালিয়ে দিয়েছিলেন সুদূর দক্ষিণে মায়াপানে। আর একটি উত্তরে জিবিলচালটুনে। তৃতীয়টি উকসমলে। যেখানে আমরা কাল সকালেই যাবো ধ্বংসাবশেষ দেখতে। ওই উকসমল থেকে পথের দু'টি শাখা বেরিয়ে, একটি গেছে চ্যাম্পোটনে। আর একটি গেছে কাবা হয়ে, সায়িল, লাবনা, নোহকাকাব, টামপাক, বাকালার, টিপু, উযাকসাকাটুন, টিকল। শেষ হয়েছে উত্তলানটুনে। শেষ পথটি গেছে হোপেলচেনে। সেখান থেকে টায়াসাল। ওইদিকে যাবার সময় এই পথটি টিপু, উযাকসাকাতুন পথটিকে অতিক্রম করেছে। আলোকিত সেই প্রাচীন মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে আমরা অভিভূত। বিশাল সাম্রাজ্যকে কি ভাবে, কত মাথা খাটিয়ে তাঁরা জুড়েছিলেন পথের বাঁধনে। সবচেয়ে দীর্ঘ পথ ছিল ইয়াকসুনা-কোবা রাজপথ। হিস্পানিরা যখন এলেন পরিত্যক্ত সাম্রাজ্যের এইসব পথঘাট চলে গেছে আগ্রাসী জঙ্গলের তলায়। মানুষজন নেই। পড়ে আছে নগর, নগরী, রাজভবন, প্রাসাদ, গৃহ, মন্দির ব্যবসাকেন্দ্র, রাজার সম্পদ, সম্পত্তি, মূর্তি, স্থাপত্য, পিলার, ধর্মকেন্দ্র। একমাত্র জীবন্ত জিনিস, জঙ্গল। শতাব্দীর পর শতাব্দীর নির্জনতায় ধীরে ধীরে সেই বর্ষণস্মিত জঙ্গল সব গ্রাস করে বিস্তার করেছে তার সাম্রাজ্য। বিজেতারা কোথাও দেখছেন নগরীর সামান্য একটু জেগে আছে, সাঙ্কেতিক ভাষা লেখা একটা স্তম্ভ। জঙ্গল সরালেই বেরিয়ে পড়ছে সুগঠিত, প্রশস্ত রাজপথ, ডাকঘর। শুরু হল নতুন এক যুগ। ধ্বংস আর পুনর্গঠন। সব তছনছ করে তৈরি হল নতুন পথঘাট। খামার, গ্রাম, নগর। বসে গেল রেলপথ। এই পুনর্গঠনের কর্মীরা থেকে থেকেই অবাক হয়ে যেতেন। জঙ্গলের তলা থেকে যখন বেরিয়ে আসত রাজপথ, অতীত সভ্যতার নানা সম্পদ। পরবর্তী পাঁচশো বছর ধরে চলে আসছে এই অভিযান। ১৯৭৫ সালেও যা শেষ হয়নি, শেষ হয়নি যা আজও।

১৯৭৫-এর অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়েছে কোবা অঞ্চলের সুবিন্যস্ত প্রাচীন পথঘাট। সবচেয়ে বড় পথের জাল পাতা হয়েছিল, অতীতে এই অঞ্চলেই। কোবা হল পুবের একটি শহর। গাল্ফ

অফ মেকসিকোর বিপরীতে ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের তীরে। বিভিন্ন দিক থেকে বিয়াল্লিশটি পথ এসে মিলেছিল এই শহরে। এই শহর ছিল প্রাসাদ-নগরী। সমস্ত পথ এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে রাজভবনের সামনে। একালের রাজভবন এমন বিন্যাস ভাবতেও পারবে না। পৃথিবী এখন সঙ্কীর্ণ, জনসংখ্যার চাপে। রাজতন্ত্র হারিয়ে গেছে গণতন্ত্রে। এই বিয়াল্লিশটি পথের মধ্যে দীর্ঘতম ছিল, য়াকসুনা-ইকসিল রাজপথ। প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দীর্ঘ।

১৯৩৩ সালে ওয়াশিংটনের কার্ণেগি ইনস্টিট্যুট, কোবা-য়াকসুনা রাজপথ আবিষ্কারের অভিযান শুরু করেন। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল অধ্যাপক আলফোনসে ভিল্লা রোজাকে। তিনি পনেরজন কৃষকের একটি সশস্ত্র দল নিয়ে নেমে পড়লেন জঙ্গলে। হাতে কুঠার আর কাটারি। রোজা ছিলেন ডক্টর অফ অ্যানথ্রপোলজি।

পথটি ক্রমশই প্রকাশিত হতে লাগল। দুঃসাধ্য, দুরূহ, এক কাজ। গভীর রেন ফরেস্ট থেকে অক্ষত তুলে আনা অতীতের একটি রাজপথ। পথই পথ দেখায়। একটা পাশ জাগলে বাকিটা খুঁজে নিতে তেমন অসুবিধে হয় না। তখন লড়াই ইতিহাসের সঙ্গে নয় প্রকৃতির সঙ্গে দুঃসাহসী মানবের। প্রথমে বেরিয়ে এল পথের অংশ সাড়ে চার মিটার চওড়া। পথের উচ্চতা কোথাও ষাট সেমি, কোথাও আড়াই মিটার। পথ চলছে পথ ধরে! কোথাও কোথাও প্রায় সাত মিটার চওড়া। অভিযাত্রীরা এগোতো এগোতে অবাক হয়ে দেখলেন জঙ্গলে রয়েছে বিশাল এক তোরণ। রাজপথে সেই তোরণের সামনে এসে থেমেছে। খিলান ত্রিভুজাকৃতির। মাথাটা সমতল। ধাপের পর ধাপ এ-পাশ দিয়ে উঠে নেমে গেছে ও-পাশে। তোরণ পেরিয়ে পথ আবার চলে গেছে সুদূরে। এই তোরণ হল কাবা থেকে উকসমলের প্রবেশ-পথ। ঢোকার আগে পথ প্রায় সাত মিটারের মতো চওড়া। বেরিয়ে গেছে দশ মিটারের মতো চওড়া হয়ে। একশো কিলোমিটারের মতো এই দীর্ঘ পথ চলে এসেছে প্রায় সরলরেখায়। মাত্র পাঁচটি জায়গায় সামান্য একটু বেঁকেছে। এই পথেই ছিল বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক জলাধার বা সেনোটস। এই ভূগর্ভে সঞ্চিত বৃষ্টির জলই ছিল মায়াদের পানীয়। কয়েকটির নাম পাওয়া গেছে, যেমন, চাকনে। কোবা এখান থেকে মাত্র দু' কিলোমিটার দূরে। ছয় কিমি দূরে অকসকিন্টক। বারো কিমি দূরে কায়াদজোনট। জলাধার যেখানে সেইখানেই ছিল মায়াজনপদ, ক্ষেতখামার। ৬৩৩ থেকে ৭৩১ অব্দের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে নির্মিত হয়েছিল এই বিখ্যাত হাইওয়ে।

মেরিডার যোগাযোগ ও পরিবহণ দপ্তরের বাইরে অদ্ভুত একটি জিনিস প্রদর্শিত আছে। মনে হতে পারে, এ আবার কি! বিশাল একটা নোড়ার মতো পাথর! গোলাকার থাম। চার মিটার লম্বা। ষাট সেন্টিমিটার বেড়। এই বস্তুটা মাটি খুঁড়ে তুলে আনা হয়েছে। গবেষকরা বলছেন এটি হল মায়া পূর্ত বিভাগের রোড রোলার। 'একাল' বলে একটি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের সময় এই বিশাল পাথরটি পাওয়া যায়। মায়া রাজপথ তৈরির সময় এই রোলার ব্যবহার করা হত।

শুধু রাজপথ নয়, মায়া পূর্বপিতারা রাজপথ থেকে গলিপথও বের করেছিলেন। অ্যাভিনিউ স্ট্রিট, রোড, লেন, বাই লেন, সবই ছিল। পথ যেমন প্যালেসে গেছে, তেমনি সাধারণ মানুষের বাসগৃহেও গিয়েছে। এমন সুন্দর প্ল্যানিং যাঁরা করেছিলেন তাঁরা যে কত অসাধারণ ছিলেন সহজেই বোঝা যায়। আমরা বলি পথ, ইংরেজরা বলেন অ্যাভিনিউ, স্প্যানিশরা বলেন পাসিয়ো, মায়ারা বলতেন, 'সাসবে' বা 'সাকবে'। এর মধ্যে আছে দুটি মায়া শব্দ। 'সার্ক' মানে সাদা, 'বে' মানে হল পথ। সাদা পথ বলার কারণ, মায়া পথ ছিল সাদা ধবধবে। মেকসিকোয় এক ধরনের সাদা মাটি পাওয়া যায়। সিমেন্টের মতো। মায়ারা রাস্তা ঢালাই করতেন সেই সাদা মাটি বা 'সাসকাব' দিয়ে।

ডিরেক্টার ম্যাপ দিয়ে মডেল দিয়ে গোটা মায়া-সাম্রাজ্যের পথঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনভাবে বুঝিয়ে দিলেন, আমার মনে হতে লাগল, আমি পাঁচ হাজার বছর আগের সেই অবলুপ্ত নগরীতে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটু আগে আমরা একালের একটি মায়া গ্রাম দেখে এসেছি। সেনোট থেকে মা আর মেয়ে জল তুলছে। ভুট্টা বাটা হচ্ছে পাথরের উদুখলে। একটি মেয়ে উনুনের গনগনে আগুনে ভুট্টার চাপাটি সেঁকছে। ঝুড়ি বুনছে খোলা মাঠে বসে। খোলা প্রান্তর চারপাশ দিয়ে ছুটে ছুটে, নেচে নেচে চলে গেছে মন কেমন করা রহস্যময় পাহাড় শ্রেণীর দিকে। যে পাহাড় মোটেই আমাদের দেশের মতো দেখতে নয়। অদ্ভুত তাদের গঠনভঙ্গি। আমি জানি ওই পাহাড়ের

গুহায় এখনও সেই শামানরা বাস করেন। দৈবজ্ঞ। যাঁরা মানুষের শরীরে একটা খোঁচা মেরে পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনের আনন্দ ছিঁড়ে দিতে পারেন। দেহপিঞ্জর থেকে পাখিটাকে খুলে সাময়িকভাবে উড়িয়ে দিতে পারেন মুক্তির আকাশে। শামানদের অলৌকিক ক্ষমতার অভিজ্ঞতা অ্যানের আছে। শুধু অ্যান কেন, মেকসিকোর শামানদের নিয়ে একাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সদ্য ওই গ্রাম দেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিউজিয়ামের অভিজ্ঞতা মিলে, মনে হল, আমি যেন সেই শামানের খোঁচা খেয়ে পাঁচশ' বছর অতীতে হারিয়ে গেছি।

আমার একটা প্রশ্ন ছিল, এ শুধু আমার প্রশ্ন নয়, অনেকেরই প্রশ্ন, মায়ারা এত কিছু জানত, জানা সত্ত্বেও তাঁরা কেন চাকা তৈরী করলেন না। চাকার ধারণা অবশ্যই তাঁদের ছিল। মায়ারা ছিলেন সুগাণিতিক, জ্যামিতিক। বৃত্তাকারে তাঁরা সাম্রাজ্য শহর সাজিয়ে, কেন্দ্রবিন্দু থেকে সাইকেলের চাকার স্পোকের মতো পথ বের করেছিলেন, তাঁরা জানতেন না চাকার গঠন, এ হতেই পারে না। আবিষ্কৃত বিলিফের কাজে চাকার ব্যবহার আছে। খেলনা পাওয়া গেছে, চাকা লাগানো গাড়ির মতো একটা কিছু। চাকাই মানুষকে গতি এনে দিয়েছে। আমরা বলি, সভ্যতাই চাকা। আজ হঠাৎ যদি কোনও কারণে যানবাহনের চাকা গতি হারায় আমাদের সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যাবে।

ডিরেক্টারে বললেন, এর উত্তরে বেশ কয়েকটি অনুমান আছে। যাঁরা সব ব্যাপারেই আমাদের হ'বাক করে দেবার মতো কীর্তিকাণ্ড রেখে গেছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে চাকা অবশ্যই করতে পারতেন। কেন করেননি, তার প্রথম কারণ, মায়ারা ছিলেন সূর্যের উপাসক। সূর্য গোলাকার, চাকা গোলাকার। সেই চাকাকে জাগতিক ব্যাপারে মায়ারা ব্যবহার করতে চাননি। দ্বিতীয় মত হল, মায়া সাম্রাজ্যে সব ছিল, ছিল না ভারবাহী পশু। চাকা লাগানো গাড়ি কে টানবে? তৃতীয় মত, আরও সাংঘাতিক, মায়ারা সাম্রাজ্যের সমস্ত শ্রমিককে সারাদিন কাজে ব্যস্ত রাখার জন্যে ইচ্ছে করে চাকা ব্যবহার করেননি। কাজে ব্যস্ত না রাখলে যে কোনও মুহূর্তে বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল। দূরদর্শী মায়ারা জানতেন, বেকার আর বিদ্রোহ অঙ্গাঙ্গি জড়িত।

এমন কোথাও দেখিনি যে দু'জন আগন্তুকের জন্যে মিউজিয়ামের ডিরেক্টার কফি আনালেন। মেকসিকোর কাঁচ আর সিরামিকের কাজ অসাধারণ সুন্দর। অন্তত আমার তাই মনে হল। সবই 'আর্টপটারি'। বৃহৎশিল্পের জাতহীন চিকন জিনিস নয়। আমি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, চীন আর জাপানের জিনিস দেখেছি। মেকসিকো আর চেকোশ্লোভাকিয়ার কাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে কাপে কফি এল, দেখে তাক লেগে গেল। গাঢ় নীল রঙ, সর্বাঙ্গে মায়া মোটিফ। সূর্য। সূর্যের পল্লবিত কিরণছটা। একপাশে জাগুয়ার মানব।

কফি খেতে খেতে মিউজিয়ামের ডিরেক্টার বললেন, 'মায়ারা গাড়িতে চাকা ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু পরে তা বাতিল হয়ে যায়। কারণ তাঁরা দেখলেন কাঠের চাকা তেমন ঘাতসহ নয়। কারণ কাঠের চাকা দু-দশ গজ গড়াবার পরই ভেঙে যেতে লাগল। কেন জানেন! মায়ারা তখনও ধাতুর ব্যবহার শেখেননি। কাঠের চাকায় ধাতুর বেড় না লাগালে সেই চাকা ওজন টানতে পারে না। মায়াদের জগতে ছিল অঢেল সোনা আর রুপো। কি সোনা আর রুপো ছিল সেখানে! একালের মানুষ ভাবতেই পারে না, কিন্তু কাজের ধাতু—যেমন লোহা, তামা, দস্তা এসব ছিল না। খুব শক্ত কাঠ দিয়েও তৈরী করলেও ভারী ওজন পড়লেই আঁশের দিক থেকে ওজনের চাপে চাকা খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। মায়ারা যদি বুদ্ধি করে পর পর দু'টো চাকাও একসঙ্গে জোড়া লাগাতেন, একটার আঁশ একটার আঁশের সঙ্গে লম্বভাবে তাহলে আর একটা বিপদ ছিল। চাকা এবং তার কীলকের ঘর্ষণে কাঠ ক্ষয়ে যেত এমনকি ঘর্ষণের উত্তাপে আগুনও জ্বলে যেত। এইরকম কাঠের চাকার গাড়িতে বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড অথবা পাথরের বিশাল ভাস্কর্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাবার উপায় ছিল না। কারণ সেই সব পাথর ও মূর্তির ওজন ছিল টন টন। তাছাড়া পাথরের অস্ত্র দিয়ে কাঠের কাজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালাবার সময় যেসব জিনিস আবিষ্কার করেছি তার মধ্যে চাকা লাগানো খেলনাও ছিল। মায়ারা অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। যে কারণে তাঁরা দেখেছিলেন ভারী পাথর ও ভাস্কর্য। কাঠের গুঁড়ির ওপর দিয়ে গড়িয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ। এই যুক্তি সম্পর্কে কারও মতভেদ থাকলে আমি বলব বিশুদ্ধ কাঠের দুটো চাকা তৈরি করুন ভারী কোন কিছু বহন করার চেষ্টা করুন দেখবেন চাকা ভেঙে পড়ে গেছে। চাকা কখন এবং পৃথিবীর কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা এখনও একমত হতে পারেননি। অনেকের ধারণা খ্রীস্টপূর্ব তিন

হাজার অব্দে চাকা আবিষ্কৃত হয়েছিল ঈজিপ্টে। সেখানে বিভিন্ন সমাধিগাত্রে যেসব ছবি আঁকা আছে তার মধ্যে চাকা-লাগানো গাড়ির ছবিও আছে। এদিকে খোদাইচিত্রে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গোল চাকা। এত ভাল কাজ, চাকার গায়ে কাঠের আঁশ পর্যন্ত স্পষ্ট এবং চাকার মাঝখানে ধাতুর রিং লাগানো আর চাকার বাইরে ধাতুর বেড় লাগান। রিংটাকে দেখলে মনে হয় ঈজিপসিয়ানরা বুশ ও বেয়ারিং এর ব্যবহার জানতেন। এসবই তৈরি হত ব্রোঞ্জ থেকে। আমরা জানি খ্রীস্টপূর্ব ষাট হাজার অব্দে মানুষ সোনা, রুপো ও তামার ব্যবহার শেখে কিন্তু তামা ও টিন মিশিয়ে যে ধাতু তৈরি হয় তার ব্যবহার মানুষ খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দের আগে শেখেনি। তামা ও টিন মিশিয়েই তৈরি হয় ব্রোঞ্জ। এই ব্রোঞ্জ খুব শক্ত যৌগ ধাতু। ব্রোঞ্জের আবিষ্কার ও সুমেরীয়দের চাকার ব্যবহার প্রায় একই সময় হয়েছিল। পূর্ব ইরানে খ্রীস্টপূর্ব দু'হাজার অব্দে স্পোক লাগানো চাকা আবিষ্কৃত হয়েছিল আর ঈজিপসিয়ানরা এই কৌশলটা শিখেছিলেন খ্রীস্টপূর্ব পনেরশ' অব্দে। শক্ত ধাতুর বেড় লাগানো চাকা ও কীলক আবিষ্কৃত হলেও বহু টন ওজনের প্রস্তরখণ্ড বহন করানো সম্ভব হয়নি। তাঁরা সেই পুরানো পদ্ধতিতেই কাঠের গুঁড়ির সাহায্যে প্রস্তরখণ্ডও বহন করতেন। খ্রীস্টপূর্ব চারশ' অব্দে গ্রীকরা আবিষ্কার করলেন একাধিক স্পোক লাগানো চাকা আর রোমে চাকা এল খ্রীস্টের জন্মের একশ' বছর আগে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সাতটি স্পোক লাগানো চাকার নকশা প্রথম তৈরি করেছিলেন। চাকায় বাতাস ভর্তি টায়ার প্রথম লাগানো হল ১৯০৭ সালে। এই হল চাকার ইতিহাস।' ডিরেক্টার সাহেব কফির কাপটি নামিয়ে রেখে আমাদের দিকে তাকালেন হাসিমুখে। আমরা বললুম, 'পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জিনিসের সঙ্গেই সুদীর্ঘ ইতিহাস জড়িয়ে আছে।' ডিরেক্টার সাহেব বললেন, 'ইতিহাসময় জগৎ, বিশেষ করে পৃথিবীর এই প্রান্তে ইতিহাসের ঘনঘটা একটু বেশি, কারণ সুদূর অতীতে এই সব অঞ্চলে বহু ব্যাপার ঘটে গেছে। এই দেশের প্রতি সেন্টিমিটারে একশ' কিলোমিটার ইতিহাস। আপনারা বিদেশী, তেমন অনুভব করতে পারবেন না, এখানে দু'-দশ বছর থাকলে দেখবেন, ইতিহাস ছাড়া কোনও কথাই আপনি আর বলতে পারছেন না। আমাদের মধ্যে অনেকেরই স্ত্রী মায়া-মেক্সিক্যান। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যেন জীবন্ত ইতিহাস। পাঁচ হাজার বছরের অতীত যেন স্ত্রীরূপে পাশে পাশে ঘুরছেন। অমন মেয়ে আপনি পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। ধীর, স্থির, স্বভাবজ্ঞ , আধ্যাত্মিক, কর্মঠ। ভালবাসতে জানে, ভালবাসা নিতে জানে। সংসারটাকে একেবারে স্বর্গ তৈরি করে ফেলে। এদের কাছে আত্মসমর্পণের কি যে আনন্দ।'

'আপনার স্ত্রী কি মায়াপান?'

'না, স্প্যানিশ। স্প্যানিশ মেয়েরাও ভালো। খুবই ভালো। তবে রাজার জাত তো! একটু অহঙ্কারী।'

'আপনি ও তো রাজার জাত।'

'হলে কি হবে। মেয়েদের রক্তে ইতিহাসের অহঙ্কার একটু বেশি থাকে। আর সে ইতিহাস পুরাতত্ত্ব হলেও আর এক চেহারা হত। আমার স্ত্রীর রক্তে শুধুই বুলফাইটিং-এর ইতিহাস। কনক্যুইস্তাদরের মেয়ে তো। আমি একজন পুরাতত্ত্ববিদ, অন্তত আমার তাই মনে হয় নিজেকে। আমার স্ত্রী আমাকে মনে করেন, একটা স্প্যানিশকুল।'

ভদ্রলোক হা হা করে হাসলেন। গ্যালারিতে আমরা তিনজন জীবিত, বাকি সবাই মৃত। হাসির শব্দে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। সব কিছু চমকে উঠল। বাইরে মেরিডার নিস্তব্ধ রাত। আজ আবার চাঁদ উঠেছে। রাত যেন ছলছল করছে করুণাময়ী, বহসাময়ীর মতো। আমরা তিনজন উঠে দাঁড়ালুম চেয়ার ছেড়ে। বেশ বুঝতে পারছি, ঘোরাঘুরির ফলে শরীরে আর সেই শক্তি নেই। জেলি-ফিশের মতো থ্যাসথাস করছে। গোটা মিউজিয়ামটা যে কি ঝকঝকে, তকতকে। কালো পাথরের মেঝে যেন আয়না। আমাদের সামনে তৈরি রয়েছে মায়া ইতিহাস। গোটা সাম্রাজ্যটা প্রাচীন মানচিত্র অনুসারে গ্লোবে সাজানো হয়েছে। রাস্তাঘাট, মন্দির, প্রাসাদ। কারু সামগ্রী। মনোলিথ। তুষার যুগে পৃথিবীর এই প্রান্তে সত্যই যে বিশালকায় প্রাণী, ম্লথ বিচরণ করতো, তার প্রমাণ সুবৃহৎ একটি কঙ্কাল। রাত বাড়ছে, সমস্ত বস্তুসম্ভার ক্রমশই যেন মায়াবী হয়ে উঠছে।

মায়ারা যে এশিয়া, গ্রীস, ঈজিপ্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণস্বরূপ ডিরেক্টার সাহেব এক একটি শিল্পকর্ম দেখাতে আর ব্যাখা করতে লাগলেন। পাথরে খোদাই করা একটি মুখ। মায়া ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত। কোনও দেবতা। মাথায় মুকুট। দেখেই মনে হল বিষ্ণু। ডিরেক্টার বললেন,

'এই দেখুন, আপনাদের দেশের প্রভাব পড়েছে। একেবারে এশীয় মুখ। এশীয় কোনও দেবতা।'

আর একটি পাথরের টুকরোর কাছে নিয়ে দেখালেন, এক জোড়া হাতি।

ডিরেক্টার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তো এশিয়ার মানুষ। বলুন এ দুটো হাতির মাথা কি না?'

ভালো করে দেখে বললুম, 'অবশ্যই হাতি। হাতি আমাদের দেশের প্রাণী। এই তো শুঁড় চোখ এই তো দাঁতের ধারণা। এই তো কানের অংশ।'

'কোনও কোনও সুপণ্ডিত এই দুটিকে ম্যাকাও পাখির মাথা বলে প্রমাণ করতে চাইছেন। মানুষ কত অনুদার দেখুন, এশিয়ার প্রভাব থাকাটা যেন বড়োই অপমানের। এও এক ধরনের বর্ণবিদ্বেষ। পৃথিবীতে সবচেয়ে গোলমালে জীব হল মানুষ।

ডিরেক্টার সাহেব নিজের সংগ্রহ থেকে একটি সেরামিক পাত্র বের করলেন। বললেন, 'এই দেখুন কি মজার কাণ্ড! এই পাত্রটি পাওয়া গিয়েছিল ব্যাবিলোনে।'

পাত্রটি দেখে অবাক হলুম, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মজার কিছু খুঁজে পেলুম না।

ডিরেক্টার সাহেব তখন বোঝাতে লাগলেন, 'মজাটা কোথায় জানেন, এর এই অসাধাবণ ডিজাইনের মধ্যে মায়া ডিজাইন ঢুকে গেছে। এই পাত্রেব মাঝখানে রযেছে সূর্য। এই সূর্য হল মায়া-সূর্য। মায়ারা প্রায় সমস্ত অলংকরণেই সূর্য ব্যবহার করে গেছেন। সূর্যের এমন স্টাইলাইজড ছবি আর কোনও দেশে আঁকা হযনি। মিষ্টিক। দেখলেই মনে অদ্ভুত ভাব হয়। সূর্যের নকশায়, কিরণছটায় মায়া প্রভাব, অন্যদিকে ঈজিপ্টের ধারা। এর মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যাও আছে, সেই নকশায় আছে ক্রীট ও মেসিকোর প্রভাব।

ডিরেক্টার সাহেব একটি আসিরিয় ফুলদানি তুলে নিয়ে দেখালেন, র‍্যাটল স্নেকের ডিজাইন। ডিজাইনটা দেখাতে দেখাতে বললেন, 'মায়ারা এই সাপের ডিজাইন ভীষণ পছন্দ করতেন। আপনারা উকসমলে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে দেখবেন নানারি কোয়াডব্যাঙ্গল বলে একটা ব্লক আছে, সেই ব্লকেব পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণেব কার্নিসে এই সাপ উৎকীর্ণ আছে। অবিকল এই ভঙ্গিতে। এখন প্রশ্ন হল আসিবিয়দের ওপর মায়া প্রভাব পড়ল কি করে!'

ডিবেক্টার সায়েব আবার তাঁর চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, 'আসুন বসুন। এই দেশে দেশে মানুযে মানুযে কালচারাল লিংকের কথায় একটা তথ্য আপনাদের জানাতে ইচ্ছে করছে। গবেষক মাগালোনি তাঁর অনুসন্ধানে বের কবেছেন, এবং দাবি করেছেন, তিনি প্রমাণ করতে পারেন, যীশু দীর্ঘকাল হিমালয়ে ছিলেন। তিব্বতের লেতে হেমিস মনাস্টার, সেখানে নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। প্রমাণ আছে কাছেমিরায়। কাছেমিরা হল কাশ্মীব। যীশু হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। অদৃশ্য হয়ে তিনি ছিলেন কোথায়! সেই রহস্যের সমাধান আছে ওই গুম্ফায়। যীশু তাঁর মাতৃভূমি ছেড়ে প্রথমে গেলেন ঈজিপ্টে। সেখানে তিনি অধ্যয়ন করলেন প্রাচীন ধর্ম ওসিরিয়ানা-মায়া। ঈজিপ্ট থেকে চলে গেলেন তিনি ভারতে। ভারতের বিভিন্ন শহব ঘুরতে ঘুবতে গেলেন বেনারসে। বেনারস থেকে গেলেন লাহোরে। সেখানে তিনি গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা অধ্যয়ন করলেন। বুদ্ধ নিজে মায়াধর্ম অনুধাবন করেছিলেন। লাহোর থেকে যীশু আবার ফিরে এলেন হিমালয়ের বৌদ্ধবিহারে। সেখানে তিনি মায়া অধ্যয়ন করলেন। অধ্যয়ন করলেন আকাশবিজ্ঞান, মহাকাশতত্ত্ব। বারো বছর পরে তিনি হলেন সম্মানিত এক শিক্ষক। মাগালোনি লিখছেন, ক্রাইস্ট যে মায়া ভাষা শিখেছিলেন, এ কথা ভুললে চলবে না। ভারত ও তিব্বতের বহু মন্দির ও বিহারে, এমন সব তথ্য আছে যেখানে স্পষ্ট লেখা আছে, খ্রীস্টের উপস্থিতির কথা। যে সময় তিনি দেশ থেকে অন্তর্ধান করেছিলেন ঠিক সেই সময়। ওই সব পুঁথিতে খ্রীষ্টকে সব সময় যীশু বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। লাসার এক তিব্বতী বিহারে একটি রেকর্ড আছে। সেই রেকর্ডে পরিষ্কার লেখা আছে, এই দেশে যীশু হয়েছিলেন অদ্বিতীয় এক শিক্ষক। এমন শিক্ষক এদেশে আর কখনও আসেননি। লাসার এই বিহারে যীশুকে এখনও যে শ্রদ্ধা দেখানো হয় খ্রীস্টান দুনিয়ায় তা দেখানো হয় কি না সন্দেহ।

'এই ভাবে দেশে দেশে মিলন, সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়। কিছু ইতিহাসে আছে, কিছু নেই। জেমস চার্চওয়ার্ড ছিলেন এক সাংঘাতিক পর্যটক ও অতন্দ্র অনুসন্ধানকারী। তিনি লিখছেন পৃথিবীর সব ভাষাতেই মায়া শব্দ আছে। জাপানিতে ৪০ শতাংশ। ভারতীয় বহু ভাষায় কথ্যরূপ মায়া থেকে এসেছে। গ্রীক বর্ণমালা তো মায়া অক্ষরের অনুকরণ। জানেন এই অনুসন্ধানের নেশা এক ভীষণ

নেশা। মানবনদীর উৎসসন্ধান, অবতরণ, শাখাপ্রশাখা, ধারাপ্রবাহ।'

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এলুম মেরিডার রাজপথে। রাত, চাঁদ, আলো, বাতাস, পাতার শব্দ। একটি সাদা ঘোড়ার গাড়ি লেসের টুপি পরা দুই সুন্দরী। আজ শেষ দিন। আমরা দু'জনে হাঁটছি, হাত ধরাধরি করে। ভারত আর আমেরিকা। ভূমি, মায়া রাজধানী টি-হো, এখন শ্বেতনগরী মেরিডা।

মেরিডার হোটেলটি ভারি সুন্দর। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় স্বপ্নপুরি। মাঝারি মাপের সাদা একটি বাড়ি। চাপা আলোয় উদ্ভাসিত। হোটেলে এসে আমি আর অ্যান ধপাস করে শুয়ে পড়লুম। শরীর ক্লান্ত ভারাক্রান্ত। অ্যান কপালে হাত রেখে শুয়ে আছে আপন মনে। ঢিলে ঢালা ফুল তোলা পোশাক। এদেশের মেয়েরা সাজগোজ একদম পছন্দ করে না। না মেকআপ, না জবরদস্ত কোন জামাকাপড। সব ব্যাপারেই একটা বেপরোয়া ভাব। অনেক কিছু শেখার আছে। সবার আগে ব্যক্তিত্ব।

শুয়ে শুয়ে হঠাৎ মনে হল, বাইরে শহর। শহরের পরেই বিশাল আকাশ ছোঁয়া প্রান্তর। এখানে ওখানে ছোট ছোট ইন্ডিয়ান গ্রাম। আরো দূরে পাহাড়শ্রেণী। ঢেউ ভাঙা সমুদ্র। পাহাড়ে অনেক গুহা। সেই সব গুহা অতি পরিচ্ছন্ন। যেন এক একটি বাকসো। দু'জন কি তিনজন সেই গুহায় পাশাপাশি বসতে পারে কোনও রকমে। এই সব গুহায় সাধনা করেন শামানরা।

'অ্যান, তুমি আমাকে একজন ভালো শামানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে?'

'বলতে পারছি না। তাঁদের দর্শন পাওয়া সহজ নয়। কেন জানো তো, তাঁরা লোকালয়ে আসেন না। যন্ত্র সভ্যতা, অবিশ্বাসী সভ্যতা তাঁরা ত্যাগ করে চলে গেছেন। দর্শন পেতে হলে আমাদের যেতে হবে বহু দূরে। দুর্গম পাহাড়ে। খুঁজতে হবে কোথায় কোন গুহায় আছেন।'

'শামানরা কি বিশ্বাস করেন?

'বিশ্ব হল অসংখ্য শক্তি বলয়। একটার সঙ্গে আর একটা বাঁধা। বলয়গুলি যেন আলোর সুতো দিয়ে তৈরি। ধারণাটা ভারি সুন্দর। শক্তির বিশাল এক উৎস থেকে এই বলয়সমূহ ছিটকে এসেছে। শামানরা এই উৎসটিকে বলেন ঈগল। আর বলয়কে বলেন ঈগলের কিরণ। মানুষ হল অসংখ্য আলোর সুতো দিয়ে তৈরি এক একটি আধার। আমরা দেখি মানুষ। শামানরা দেখেন ডিম্বাকৃতি এক একটি আলোকপিণ্ড। বাহু দুটি যেন আলোর শুঁড়। এই পিণ্ডের ত্বকে অসম্ভব উজ্জ্বল একটি আলোকবিন্দু আছে। সেই বিন্দু ভেতরের কয়েকটি মাত্র শক্তিক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে। এই অবধি বেশ সহজ। বুঝতে অসুবিধে হয় না। এর পরের ধারণাটি বেশ কঠিন। উপলব্ধি কি ভাবে হয়? জগতাতীতের জ্ঞান আসে কি ভাবে? ত্বকের ওই অতি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু প্রসারিত হয়ে পিণ্ডের বাইরের সমগোষ্ঠীর শক্তিক্ষেত্রকে যখন উদ্ভাসিত করে তখনই আসে উপলব্ধি। এর পরের থিয়োরি আরও কঠিন। জ্যোতির্বলয়ের বাইরে শক্তির মিল বিন্দুকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরানো যায়। সরিয়ে আনা যায় ভেতরে। যখন যেখানে সরানো হবে, তার সংস্পর্শে এসে নতুন নতুন শক্তিক্ষেত্র আলোকিত হয়ে উঠবে। নতুন অনুভূতি হবে। নতুন দর্শন। আমরা আমাদের অভ্যস্ত জগতে থাকি। আমাদের চোখ যা দেখায়, তাই দেখি। আমাদের কান যা শোনায়, তাই শুনি। আমাদের মন যা ভাবায়, তাই ভাবি। বাইরে যেতে পারি না। শামানরা বলেন, শক্তির মিলন-বিন্দুকে নতুন নতুন জায়গায় সরাতে পারলেই নতুন জগতের উপলব্ধি। এই হল ওঁদের থিয়োরি কি ভাবে করা যায় তা আমার জানা নেই। শক্তির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। দেহ থেকে দেহের বাইরে নিয়ে গিয়ে পরাজগতের অনুভূতি লাভ করা। শামানরা প্রায়ই সেই জগতে চলে যেতে পারেন। ফিরে আসেন নতুন কর্মক্ষমতা আর শক্তি নিয়ে। এই জগতে যে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না, ওই জগৎ থেকে সেই সমস্যার সমাধান নিয়ে আসেন। এই জগতে যা কল্পনা করা যায় না, ওই জগতে তা বাস্তব। শামানরা পূর্ণ উপলব্ধি ও অনুভূতির স্তরে উঠতে চান। এই উপলব্ধির দুটি মেরু— জীবন ও মরণ। ব্যাপারটা এত মিস্টিক, তোমরা ভারতীয়রা বুঝতে পারলেও আমরা পারি না, কঠিন মনে হয়।'

'তুমি একজন শামানের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও না, অ্যান।'

'আচ্ছা আবদার তো, ছেলেমানুষের মতো। আমি পাবো তাঁদের। কাল তো আমরা উকসমলে যাবো, সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান করা যাবে।'

আমার শরীরটা হঠাৎ বেশ অসুস্থ মনে হতে লাগল। পেটে একটা অস্বস্তি। গা গরম। অনেকক্ষণ চেপে রেখে রেখে শেষে আমাকে বলতেই হল। অ্যান বললে, 'তোমার হচ্ছেটা কি?'

'পেট। পেটটাকে মনে হচ্ছে পোপোকাটাপিটেল। আগ্নেয়গিরি।'

'হতেই পারে। যা ক'দিন লঙ্কা খাওয়ার ধুম। দাঁড়াও, একজন ডাক্তারের অনুসন্ধান করি।' অ্যান বেরিয়ে গেল। বেশ উদ্বিগ্ন। আমার খুব খারাপ লাগছে। নিজের শরীরের জন্যে অন্যকে উদ্বাস্ত করা। ডাক্তার অবশ্য ডাকা গেল না। ভিজিট লাগবে আশি ডলার। আশি ডলার খরচ করার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। অ্যান আমার কপালে হাত রেখে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে একটা ভিজে তোয়ালে নিয়ে এল।

'তোমার চিকিৎসা এইবার আমি করি। মনে করো, আমি একজন শামান।' ঘরে আলোর ব্যবস্থাটা এমন, চোখে লাগে না। চারপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে চাঁদের আলোর মতো। সেই আলোয় অ্যানের মুখটা ঠিক মোমের মতো দেখাচ্ছে। চারপাশ থেকে ঝুলে এসেছে সোনালি চুল। আমার সেই কথাটা মনে পড়ছে, দেশে দেশে মোর ঘর আছে। আমার মায়ের [illegible] অ্যান।

পেটে ভিজে তোয়ালে চেপে ধরে অ্যান বললে, 'কোনও ভয় নেই। আমি তো আছি। এটাকে কি চিকিৎসা বলে জানো? প্রাকৃতিক চিকিৎসা। তোমার পেটটাকে ঠাণ্ডা করতে পারলেই অস্বস্তিটা কেটে যাবে। এরপর তোমাকে আমি চান করাবো।'

রাত দুটো নাগাদ আমার অস্বস্তিটা সত্যিই কেটে গেল। [illegible] অ্যান আমাকে এক গেলাস নুনবুর জল খাইয়েছে, এক চিমটে সোডিবাইকার্ব দিয়ে। ঘরের আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম যে যার জায়গায়। বাইরে বাতাসের শব্দ। চাঁদের আলোর ফিনিক ফুটছে। একটু লেখাপড়ার ছিল, উকসমলে যাবার আগে মায়া ইতিহাস আর একটু জেনে নিতে পারলে ভালো হত। শরীরের জন্যে হল না। কাল সকালে আর সময় পাওয়া যাবে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন মাথায় আসছে। যেমন মায়া সাম্রাজ্যের বিস্তার কতটা এলাকা জুড়ে ছিল? উত্তর পাওয়া গেছে ৩,২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। তার মানে চিয়াপাস রাজ্যের আধখানা, তাবাস্কোর অর্ধেকেরও বেশি, মেকসিকোর কাম্পেচে, য়ুকাটান ও কুইন্টানা রুর পুরোটা। মেকসিকোর বাইরে গুয়াতেমালার পুরোটা এলসালভাদোরের অল্প একটু অংশ, হণ্ডুরাসের কিছুটা, মধ্য আমেরিকার নতুন দেশ বেলিজের সমগ্র অংশ।

পরের প্রশ্ন, বিকাশ কাল? কোন সময় থেকে কোন সময়ের মধ্যে অভ্যুত্থান হয়েছিল মায়া সভ্যতার? বছর কয়েক আগে একদল বিজ্ঞানী মনে করেছিলেন খ্রীস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে মায়া এলাকায় মানুষ ছিল, বিশেষ করে হণ্ডুরাসে, গুয়াতেমালা ও তৎসন্নিহিত এলাকায়। খ্রীস্টের জন্মের আটশো বছর আগে তারা সুসভ্য হয়ে ওঠে। যাযাবরী, আদিম জীবনের অবসান। গ্রামের পত্তন। পরের অনুসন্ধানে এই সময়টা আর একটু পেছিয়ে গেল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, খ্রীস্টের জন্মের ১৫০০ বছর আগেই মায়ারা সুসভ্য গ্রামবাসী। সম্প্রতি, ১৯৭৬ সালে একদল ব্রিটিশ পুরাতত্ত্ববিদ যে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তার বিবরণ ও সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে। মধ্য আমেরিকার নিম্নাঞ্চলে অতি প্রাচীন মায়া ধ্বংসাবশেষ তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। এক খণ্ড পোড়া কাঠকে কার্বন রোটিন ডেটিং টেস্টে ফেলা হয়েছিল। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে আধপোড়া কাঠের খণ্ডটি খ্রীস্টের জন্মের ২৫০০ বছর আগের। তার মানে ১৫০০ বিসিতে নয়, অর্থাৎ [illegible] হাজার বছর আগে। ২৫০০তে মায়ারা সুসভ্য গ্রামবাসী। অতি সুসভ্য। সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে বহু। আবিষ্কৃত হয়েছে সমাধিস্তম্ভ। মাটির তৈরি ছোট ছোট ঘরবাড়ি। প্লাস্টার বা প্লাস্টারে কিম্বা বাড়ির তৈরির মশলায় তখনও চুনের ব্যবহার শুরু হয়নি, বা মানুষ তখনও ওই কৌশলটি শেখেনি। ১৯৭৮ সাল থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে আর একটি শক্তিশালী দল অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। উদগাতা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম। অর্থানুকূল্য, উত্তর আমেরিকার মায়ারা যে অঞ্চলে তাঁদের ধর্মীয় উৎসব পালন করতেন, সেই জায়গাটির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। দলের সদস্য-সংখ্যা কুড়ি। ইংরেজ আর আমেরিকান। দলে আছেন পুরাতত্ত্ববিদ শিল্পী, সার্ভেয়ার, প্রোজেক্ট ডেভলেপার আর মিউজিয়ামকর্মীরা। অনুসন্ধান চলছে এখনও। সময় ক্রমশই পেছচ্ছে। মেকসিকোর ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অফ অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড হিস্ট্রি, এই মেরিডা শহরের দক্ষিণে ১১০ কিলোমিটার দূরে অদ্ভুত এক আবিষ্কারে আবার নতুন ভাবনার পথ খুলে দিয়েছেন। যে গুহায় এই আবিষ্কার, সেই গুহাটির নাম লোলটুন। অকসকুটজক্যাব গ্রামের সাত কিলোমিটার দূরে। এই গুহার অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ। ছ'নম্বর প্রকোষ্ঠটির নাম হয়েছিল। এই কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ম্যাস্টোডন বলে বিশাল এক প্রাণীর শুঁড় ও কষের দাঁত। বাইসনের হাড়। আর ছোট জাতের ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর। পৃথিবীতে

এই ঘোড়া ছিল সেই সময়ে, যে সময়টাকে পুরাতত্ত্ববিদরা বলেন প্ল্যাইস্টোসিন পিরিয়ড। ম্যাস্টোডনের ছবি আমি মেকসিকোর জাদুঘরে দেখেছি। বড় মজার প্রাণী। হাতির বড়দা। বিশাল তার শরীর। একটাকে মারলে একশ' জন মিলে একমাস ধরে খেতে পারবে। মানুষ মেরে মেরে এই প্রাণীর অস্তিত্ব লোপ করে দিয়েছে। বহু বহুকাল আগে এর পাশাপাশি প্রাগৈতিহাসিক কালের অন্যান্য প্রাণীর হাড়ও পাওয়া গেছে। লোলটুন একটি মায়া শব্দ, যার অর্থ হল, পাথরের ফুল। এই আবিষ্কারের ফলে পুরাতত্ত্ববিদরা আবার নতুন করে ভাবতে বসেছেন। অন্যান্য জায়গা থেকে যেসব পাথর, কাঠ আর হাড় বেরিয়েছে, এই গুহাকক্ষের হাড়ও সেই একই কালের। তার মানে খ্রীস্টের জন্মের আট হাজার বছর, কি তার ও আগে মায়া জগতে মানুষ ও প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল। ঘড়ি আরও কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে গেল।

বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে মায়া সভ্যতার বিকাশ কাল নির্দেশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইংরেজ পুরাতত্ত্ববিদ, জে. এরিক. এস. থম্পসন-এর নিরূপণই সমধিক স্বীকৃত। মায়া সভ্যতার ক্ল্যাসিক্যাল পিরিয়ড থেকে পতন, কোন সময় থেকে কোন সময়ের মধ্যে হয়েছিল, তার একটা হিসেব তুলে ধরেছেন থম্পসন সাহেব, যা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। খ্রীষ্টের জন্মের ২৫০০ বছর আগে মায়ারা কৃষিপদ্ধতি রপ্ত করেছিলেন। এই তথ্যটি অন্যান্য নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোটামুটি একটি ইতিহাস তৈরি করেছেঃ প্রথম পর্ব মায়াপূর্ব যুগ, খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৮০০ থেকে ২৫০০। দ্বিতীয় পর্ব, প্রি-ক্ল্যাসিক, খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রীস্টাব্দ ২০০। তৃতীয় পর্বকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, আরলি ক্ল্যাসিক ২০০ থেকে ৬২৫ খ্রীস্টাব্দ। ফ্লোরেসেণ্ট ক্ল্যাসিক ৬২৫ থেকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দ। ডেকাডেণ্ট ক্ল্যাসিক ৮০০ থেকে ৯২৫ খ্রীস্টাব্দ। চতুর্থ পর্ব টোলটেক প্রভাব, ৯২৫ থেকে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ। পঞ্চম পর্ব, মেকসিক্যান অ্যাবসরপসান ১২০০ থেকে ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ।

কার্বন-১৪ রেডিয়ো অ্যাকটিভ পরীক্ষা আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদদের অনেকটা সুবিধে হয়েছে কাল নিরূপণে। ভূত্বকের স্তর খুলে খুলে তাঁরা এই প্রাচীন মানবদের ফেলে যাওয়া নানা জিনিস বের করে আনছেন। কার্বন-১৪ পরীক্ষা অবশ্য জৈবপদার্থ ছাড়া, অন্য কোনও কিছুর ওপর প্রয়োগ করা চলে না। খ্রীস্টের জন্মের ৫০০ বছর আগে মায়া সভ্যতা দানা বেঁধে গেছে। খড় আর তালপাতা দিয়ে কুটির তৈরি হয়েছে। চাষবাস শুরু হয়ে গেছে। শক্ত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র। সেরামিকস তৈরি হচ্ছে। ধর্মীয় উৎসব, অনুষ্ঠানাদি চলছে পুরোদমে। এর অল্পকাল পরেই চালু হয়ে গেছে লেখা। সংখ্যাতত্ত্ব শিখে ফেলেছেন তাঁরা। তৈরি করেছেন ক্যালেন্ডার। চুনাপাথরকে আগুনে পুড়িয়ে পেয়েছেন চুন। সেই চুন গুঁড়ো করে, সাদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আবিষ্কার করেছেন বাড়ি তৈরির মশলা। এই মর্টার হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আর্কিটেকচার। মায়া জগতে এসে গেল ক্ল্যাসিক্যাল পিরিয়ড। সর্বোজ্জ্বল একটি সময়। এই সময়েই হয়েছিল মায়া সভ্যতার সর্বোচ্চ বিকাশ। এই সময়েই তৈরি হয়েছিল সুন্দর সুন্দর বাড়ি। তৈরি হয়েছিল সুন্দরতম ভাস্কর্য, অপূর্ব সেরামিকস। জ্যোতির্বিদ্যায় হয়ে উঠেছিলেন অসম্ভব পারদর্শী। বিস্ময়কবভাবে নির্ভুল ক্যালেন্ডার তৈরি করে তাঁরা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন।

তারপর কি হল। সেইটাই হল গিয়ে লক্ষ ডলারের প্রশ্ন।

দেখা যাক, কাল সকালেই তো আমরা মেরিডা ছেড়ে উকসমল যাচ্ছি। আকাশের তলায় রুক্ষ প্রান্তরে মাইলের পর মাইল জুড়ে পড়ে আছে ধ্বংসাবশেষ।

৬৫

কিছুতেই যখন ঘুম আসছে না, তখন বিছানায় উঠে বসলুম। সত্যি কথা বলতে কি, এত বড় আর সুন্দর বিছানায় শোওয়ার মতো সংস্কার আমার তৈরি হয়নি। যে সংসারে আমার জন্ম ও চরিত্র গঠন, সেই সংসার ছিল বিলাসিতার ঘোরতর বিরোধী, সাত্ত্বিকতার পূজারী। পাখা থাকলেও অসহনীয় গরম না হলে চালানো হত না। খাট থাকলেও মেঝেতে ঢালাও বিছানা ফেলে গল্প করতে করতে ঘুম। পরিমিত আহার। সেই পরিবারের ছেলের এ কি দুর্দশা! এদেশে কেন, আমাদের দেশেও

বিলিতি বাতাস বইছে। বিখ্যাত এক ব্যক্তি আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেছিলেন, আমি খুব কষ্টে মানুষ হলেও, আমার ছেলেদের আমি খুব ভোগে রেখেছি, তা না হলে তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবে না। চরিত্র মিইয়ে যাবে ভাই। প্রথম থেকেই জীবনযাত্রার মানটা বাড়িয়ে না রাখলে তারা উদ্যোগী উদ্যমী হবে না। তা ছাড়া আমি যখন পারি, তখন কেন করব না।

তাকিয়ে দেখলুম, অ্যান ঘুমিয়ে পড়েছে। অ্যানের ঘুমন্ত মুখ নিষ্পাপ শিশুর মতো। অ্যানকে আর জাগাতে ইচ্ছে করল না। বেশ বুঝতে পারছি গভীর একটা ঘুম দিতে না পারলে, কাল সকালে খুব কাবু লাগবে। তবু ঘুম আসছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, আমি আছি টি হোতে, মায়াদের রাজধানী। কত কি হয়ে গেছে এইখানে। মহাকালের গর্ভে সব চাপা পড়ে গেছে। একালের মানুষের কাজ বেড়েছে। ইতিহাসের টুকরো জোড়া লাগাতে লাগাতে দিন যাচ্ছে মাস যাচ্ছে, ঘুরে আসছে বছর। মেরিডার মিউজিয়ামের ডিরেক্টার ভারি সুন্দর একটি কথা বললেন, কেন মানুষ এমন করে, এত ঝুঁকি নেয়, দি ইনসেশ্যাবল কিউরিয়সিটি টু নো হোয়াট মেড দিস ওয়ার্লড টিক।

আমার সেই কাহিনীটি মনে পড়ছে। ভাবছি, আমি হলে কি করতুম। ভয়েই বোধ হয় মারা যেতুম। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির কর্মী জিওগ্রাফার এডওয়ার্ডস পার্ককে ভার দেওয়া হল, মাচুপিকচুতে গিয়ে ইনকাদের হারানো নগরী সম্পর্কে একটি তথ্যভিত্তিক নিবন্ধ তৈরী করার। এডওয়ার্ডসকে সোসাইটির পত্রিকার ইলাসট্রেশান এডিটার বললেন, পার্ক খুব সাবধান, সাপের রাজত্ব। চোখ কান খোলা রেখে ঘোরাফেরা কোরো।'

পার্ক বললেন, 'আপনার কোনও অভিজ্ঞতা হয়েছিল কি?'

'অবশ্যই। আমি আর আমার গাইড পেড্রো, মিউলের পিঠে চেপে চলেছি সেই উঁচু পাহাড়ের দিকে, যার খাঁজে খাঁজে পড়ে আছে লুপ্ত শহর জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে। লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে চলেছি। পাশেই পেড্রো। হঠাৎ শুনি ঘাসের মধ্যে সরসর একটা শব্দ। পেড্রোকে জিজ্ঞেস করলুম, শুনতে পাচ্ছ? শব্দটা কিসের বলো তো?' পেড্রো বললে, 'সেনর। ও কিছু না, ওটা হল ফার-দ্য' লান্স।' বলে কি? ও কিছু না। ফার দ্য' লানস হল বিশাল সাপের এক পিটভাইপার। মারাত্মক বিষাক্ত। যার এক ছোবলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। আর কোন প্রশ্ন করার সাহস হল না। দু'জনে নীরবে চলেছি। ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে আছি। হঠাৎ কি মনে হল প্রশ্ন করলুম, 'পেড্রো, কি হবে, যদি আমাকে কামড়ায়।' পেড্রো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'সেনর ইউ কমপোজ ইওরসেলফ্।'

কাল আমি এক হারানো শহরে যাবো। জানি না, কি অবস্থায় পড়ে আছে সেই 'রুইনস'। সাপকে আমিও ভীষণ ভয় পাই। অ্যানের মতো আমি সাহসী নই। অ্যান ঘুমোতে গিয়ে ইকসতাফায় স্নেকপিটের ওপর বসেছিল। অ্যানের ধারণা, সাপ, বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক কেউই চায় না যে, অকারণে মানুষের ক্ষতি করবে। মেয়েটা ফুলপরীর মতো ঘুমোচ্ছে। ঘরে একটি মাত্র মৃদু আলো জ্বলছে। আলো ছায়ায় ভাসছে অকাতর একটি মুখ। আমি আবার শুয়ে পড়লুম। একটু ঘুম দরকার।

কখন সকাল হয়ে গেছে। অ্যান ঠেলা মেরে বললে, 'বাবা, তোমার ঘুম বটে। দয়া করে উঠে পড়ো। তোমার তো সাজতে গুজতে তিন ঘণ্টা লাগবে।'

সুন্দরীরা অসুন্দরের দুঃখ কি বুঝবে। আমাদের সবচেয়ে বড় খাটুনির কাজ দাড়ি কামানো। সোজা টান, উল্টো টান, গাল আর কিছুতেই মসৃণ হতে চায় না। জানালার বাইরে ফুটফুটে একটি সকাল। অ্যান টি ভি খুলেছে। এখানকার টিভিতে ছাব্বিশটা চ্যানেল। প্রতিটি চ্যানেলই কাজ করছে। প্রোগ্রামে ঠাসা। টিভিতে ছোটদের অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমেরিকা থেকে আসছে। ভারি সুন্দর অনুষ্ঠান। চোখ ফেরানো যায় না। ফুলের মতো একটি মেয়ে, নার্সারির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল বড় সাদা একটা ভাল্লুক এসেছে। ভাল্লুক তাকে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। শিশুটি তাকে নানারকম প্রশ্ন করছে, তুমি এই পারো, তুমি ওই পারো? মেয়েটা কি মিষ্টি। আদো আদো ভাষা। ম্যাজিসিয়ান ভাল্লুক কিছু পারছে, কিছু পারছে না। যখন পারছে না, তখন মেয়েটি একেবারে হেসে কুটোপাটি খাচ্ছে। শেষে ভাল্লুক ভীষণ রেগে গিয়ে ওপর দিকে দু'হাত তুলে কাগজের বৃষ্টি তৈরি করল। নানা রঙের কাগজ পড়তে লাগল। সারা ঘর ভরে গেল। আর মেয়েটির কি আনন্দ। সে একবার এদিক ছোটে, একবার ওদিক ছোটে। অবশেষে এলো তুলোর বৃষ্টি। শ্বেতভল্লুক ধীরে ধীরে সেই তুলোর স্তূপে ডুবে গেল। তার মুখটা শুধু জেগে রইল। ভাল্লুক ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েটি অবাক হয়ে বললে, 'এ কি শীত

এসে গেল! তাহলে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, আবার বসন্তে দেখা হবে।' অনুষ্ঠান শেষ।

অনুষ্ঠানের শেষ অংশটি মনে বেশ একটা রেখাপাত করে গেল। 'আবার দেখা হবে বসন্তে।' এই মেরিডার মতো সুন্দর শহরে আমার ক্ষণ-অবস্থান শীতের ভাল্লুকের মতো ঘুমিয়ে পড়ল আজ। বসন্ত আর আসবে না। তাকিয়ে দেখলুম, অ্যান আমার ব্যাগ গুছিয়ে দিচ্ছে। অভাবনীয় দৃশ্যই বলা চলে। ইংরেজি ছবিতে বিদেশিনীদের দেখানো হয়েছে কেমন যেন কোমলবৃত্তি শূন্য, পুরুষালি ভাব। ব্যাগে মাল ভরার দৃশ্যও দেখেছি। সব তালগোল পাকিয়ে একটা স্যুটকেসে ভরে চেপে ডালা বন্ধ করে দৌড়। অ্যান কিন্তু প্রতিটি জিনিস সুন্দর করে, পাট করে গুছিয়ে রাখছে। আমার নিজেরই লজ্জা করছে। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের ছেলে, স্বাবলম্বনই আমার ধর্ম।

'অ্যান, রাখো না ভাই, আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি।'

'তুমি দয়া করে সেরে নাও ভাই, গাড়ি এসে গেলে আর এক মিনিটও দাঁড়াবে না।'

আমরা সাড়ে আটটার সময় সব দেনাপাওনা মিটিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। ফুরফুরে সকাল। একটা নীল রঙের আমেরিকান গাড়ি সামনেই দাঁড়িয়ে যুবক চালক। অসাধারণ সুন্দর স্বাস্থ্য। আমরা পেছনের আসনে উঠে বসলুম। গাড়ি চলতে শুরু করল। যে হোটেলে আর কোনও দিন ফিরে আসবো না, সেই হোটেলটি ক্রমশই পেছনে সরে যেতে লাগল। শহরের মধ্যেই আছি। দু'চোখ ভরে দেখছি চারপাশ। চোখ দিয়ে গোগ্রাসে গেলা। আর তো দেখতে পাবো না। মেরিডার সেই দুর্গের মতো চার্চ। সেই ভিখারিটি বসে আছে চাদর বিছিয়ে। রোদ এসে পড়েছে সর্বাঙ্গে। লোকটি অন্ধ। মাঝে মাঝে মুখ তুলে চোখ দুটোকে তার আলোয় ধরার চেষ্টা করছে। যদি একটু ঢোকে কোনও রকমে।

শহর শেষ হয়ে গেল। আমরা বেরিয়ে এলুম বাইরে। সাপের মতো রাস্তা পড়ে আছে সামনে। কে যেন লিকলিকে লোহার পাত খুলে ফেলে রেখেছে আকাশের তলায়। গাছের ডালে কাকের বদলে বসে আছে তাগড়া তাগড়া রাগী ম্যাকাও পাখি। ধারালো ঠোঁটে ডাল ধরে টানাটানি করছে।

রাস্তাটা উঁচু। দু'পাশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে প্রান্তরে। অল্প অল্প ঝোপ ছাড়া গাছপালা নেই বললেই চলে। মাটির রং ধূসর। দেখলেই মনে হয়, এই জমির কোনও উর্বরতা নেই। মন অনেক সময় বলে দেয়। এখনও একটা অভিশাপ ঝুলে আছে এই অঞ্চলটির ওপর। যে অভিশাপে লোপাট হয়ে গিয়েছিল মায়া সভ্যতা। ঐতিহাসিকরা কি বলবেন জানি না, আমার মন বলছে, কোনও একটা পাপে, কোনও একটা অনাচারে রাজার রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি আজও যেন থমকে আছে। মাইলের পর মাইল পড়ে আছে আদিগন্ত জমি, কোনও চাষবাস নেই। জল নেই, নেই কোনও আঁকাবাঁকা নদী। ছায়া মেলে দেবার মতো কোনও বৃক্ষ নেই। অনেক অনেক দূরে আকাশের গায়ে লেগে আছে অদ্ভুত পাহাড়শ্রেণী। গুহায় বসে আছেন শামান। দেহ বিংশ শতাব্দীতে, জীবনচর্যা পাঁচ হাজার বছর পশ্চাতে। ঝাড়ফুঁক, মারণ, উচাটন, বশীকরণ যাঁর শাস্ত্র।

১৯২৫ সালে এক চাঁদের আলোর রাতে প্রত্নতাত্ত্বিক সিলভানুস গ্রিসোলড মোরলে পিরামিডের মাথায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লিখলেন অনবদ্য এক ছত্র : মন্দির, প্রাঙ্গণ, সারি সারি স্তম্ভ, পথ, আজ নিস্তব্ধ। কোথায় রাজা, রাজপুরোহিত, বলির প্রজা। শিল্পীরা কোথায়। কোথায় স্থপতি। সেই সাধারণ মানুষরা আজ কোথায়, যাদের অনন্ত শ্রমে গড়ে উঠেছিল নগরী, বহে গিয়েছিল প্রাচুর্য, প্রদর্শনী আর বিলাসিতার স্রোত। যে মৃত্তিকা থেকে অভ্যুদয়, সেই মৃত্তিকায় তাঁরা আজ লীন। প্রকৃতি সেই স্মৃতির ওপর মেলে দিয়েছেন ঘাস ঝোপঝাড়ের আচ্ছাদনী। কালের অর্ঘ্য হয়ে ফুটে আছে ফুল।

কিন্তু এই চাঁদিনী রাতে! ইজোন রাজ-প্রাসাদের সামনে যে উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছি, তার পদতলে পড়ে আছে শুভ্র আলোকিত, পরিত্যক্ত নীরব নগরী। জঙ্গল ভেদ করে মায়াবী আলোয় মাথা তুলেছে বিশাল মন্দির আর বিপুল পিরামিড। শ্বেত, শুভ্র। গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, সেই শ্বাসে ফিরে আসে অতীতের রোমাঞ্চকর যত কাহিনী। সেইসব হারিয়ে যাওয়া মানুষ, হারানো কীর্তি-গাথা। সেই সব অশরীরী শ্রোতা, যারা সাক্ষী ছিল সেদিনের ঘটনার, ফিরে আসে তারা একে একে।

আমরা যে পথ ধরে চলেছি, কাল রাতে মিউজিয়ামের ডিরেক্টার প্রাচীন পথচিত্রে আমাদের সেই পথ দেখিয়ে ছিলেন। মায়া-পথ। এই সেই বিখ্যাত কোবা হাইওয়ে। কোবা ছিল মায়াদের সুবৃহৎ

তীর্থস্থান। উকসমল থেকে এই পথেব একটা দিক চলে গেছে কাবাব দিকে। কাবাব প্রবেশ পথে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই সুবৃহৎ তোবণ।

আমাদেব পথেব ডানপাশটা একেবাবে ফাঁকা ধু-ধু কবছে। কোনও কিছু নেই। যতদূব দৃষ্টি যায় ধোঁযাটে ধূসব জমি। দু-এক খণ্ড পাথব। স্তম্ভেব মতো কোনও কিছু শতখণ্ড। বাঁদিকে কখনও কখনও দু-একটি আধুনিক এক-কোঠা সাদা বাড়ি আসছে আব দৌড়ে পালাচ্ছে পেছন দিকে। সাদা অ্যাপ্রনেব মতো পোশাক পবা মাযা-বমণীবা দাঁড়িযে আছেন। বাদামি তাঁদেব গাত্রবর্ণ, লম্বা কালো চুল, কালো চোখ। সেই দূব অতীতে চীনাবা যেমন একসময শিশু মেযেদেব পাযে লোহাব জুতো পবিযে পাযেব পাতা ছোট কবতেন, মাযাবা সেইবকম শিশু কন্যাব মাথাব ওপব দিকটা কানেব দু'পাশ থেকে প্রচণ্ড চাপ দিযে পবিযে বাখত লম্বাটে টুপি। মাথাটা ছুঁচলো হযে উপবদিকে ঠেলে বাড়ত। ঢালু হযে যেত কপালেব দু'পাশ। ঝখানেব পবিসব কমত, নাক লম্বা হযে ঠেলে উঠত। শ্রেষ্ঠ মাযা সুন্দবীদেব এই ছিল মুখেব আদল। তাঁদেব ছবি দেখে যে কাবণে মনে হয়, এ কেমন মুখেব আদল। কোনও ভিন্ন গ্রহেব মানুষ নাকি! ভয কবে। বাতেব অন্ধকাবে সালঙ্কাবা অমন কোনও বমণী, কাছে এগিযে এলে আমি তাঁকে মানুষ বলে ভাবতে পাবব না।

সর্ব অর্থে বহস্যময একটা সুবিপুল সভ্যতা কিভাবে হাবিযে গেল আমাদেব এই পৃথিবী থেকে। যেমন ধর্মই হোক, ধর্মকে আশ্রয কবেই গড়ে উঠেছিল এব সভ্যতা। একালেব মানুষ বলবেন, কুসংস্কাব। একালেব অনেক সংস্কাব তো দুঃসংস্কাব। সেকালেব মানুষ এমন মহাশক্তি থেকে, মহাবিশ্ব থেকে কসমস থেকে একঘবে হযে যাযনি। উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পড়েনি। আগুন, মাটি, সূর্য এই তিন নিযে জীবনেব খেলা। মাযা পুবোহিত পাহাড়েব খাঁজ বেযে বেযে উঠছেন। দুর্গম উচ্চতায় দুটি বিশাল পাথব পাশাপাশি। মাঝে পবিখাত। ৪৩৩ ফুট উচ্চতায আছে সেই নিরূপণ যন্ত্র, একালেব মানুষ যাব নাম বেখেছেন সান ড্যাগাব। সৌব ছুবি। কি অসাধাবণ প্রিসিশান। প্রস্তব গাত্রে খোদাই কবা আছে বিশাল বৃত্ত। বৃত্তেব ভেতব বৃত্ত। প্রভাতে সূর্যেব আলো দুটি পাথবেব দেযাল ভেদ কবে এই বৃত্তে এসে পড়ছে। বশ্মিব একটি বেখা যখন ছুবিব ফলাব মতো বৃত্তেব মধ্যভাগ বিদ্ধ কবে, তখন, বুঝতে হবে শীত শেষ হল গ্রীষ্মেব সূচনা। সূর্যকিবণ দিযে একটি বন্ধনীব মতো বৃত্তটিকে ঘিবে ধবা মানেই গ্রীষ্মেব বিদায, শীতেব আগমন। পাশেই আব একটি বৃত্ত। এই 'সান ড্যাগাব' বলে দিত চাষবাসেব সমযকাল। আমাব ঠিক অতটা সাহস নেই যে, সেই ইংবেজ মহিলাশিল্পীব মতো ৪৩৩ ফিট ক্যানিয়ন বেযে উঠে 'সান ড্যাগাব' দেখে আসব এ সেই সাহসী মহিলাবই আবিষ্কাব।

কতক্ষণ লাগল উকসমল পৌঁছোতে আমি বলতে পাবব না কাবণ আমি একটা নেশাব ঘোবে ছিলুম। আমাব চাবপাশ দিযে উল্টো দিকে ছুটে চলেছে বোমাঞ্চকব বিচিত্র এক ভূপ্রকৃতি। বাস্তা হঠাৎ ওপব দিকে উঠতে শুরু কবল। পাহাড় কাটা পথ ধবে উঠে আবাব নেমে এলুম নিচুতে। সামনেই কাচা পাথবেব দেযাল। পথ ঘুবে গেছে। গাড়ি সেই দেযালেব পাশে থামল। এই আমাদের হোটেল।

•

গাড়িব দবজা খুলে মাটিতে পা দিতে আমাব পা তুলে নিলুম। অসংখ্য লাল, হলদে, কালো, সবুজ, নীল ফুল ঘাসেব ওপব বিছানো। কে এমন কবে ফুল ছড়িযে গেছে! কালো ফুল তো জীবনে দেখিনি। মাযাদেব বাজত্বে কি সবই অদ্ভুত, অলৌকিক। আলেকজান্ডাব ডুমাব বইযে ব্ল্যাক টিউলিপেব কথা পড়েছি। দুর্লভ সেই গাছটিকে নিযে কি অশান্তি! খুনোখুনি! এ কি সেই ব্ল্যাক টিউলিপ।

আমাব ইতস্তত ভাব দেখে অ্যান বললে, কি হল বলো তো? পা আটকে গেছে?'

'না গো! অসংখ্য ফুল ছড়িযে আছে।'

অ্যান আমাব ঘাড়েব ওপব দিযে ঝুঁকে পড়ে দেখে শুনে বললে, 'ও মা' তাই তো! তুমি এই দিক দিযে নামো।' আমবা দু'জনেই ডানদিকেব দবজা খুলে পথেব পাশে বাস্তায নেমে দাঁড়ালুম। চালক ভদ্রলোক বললেন, 'এনি প্রবলেম?'

'এত ফুল কোথা থেকে এল? ফুল কি এখানে এইভাবেই ফুটে থাকে?'

চালক হা হা কবে হেসে বললেন, দোজ আব নট ফ্লাওযার্স। ওগুলো ফুল নয, প্রজাপতি।'

'প্রজাপতি!'

আমরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম সেই অসাধারণ দৃশ্য, কয়েক শ' নানা বর্ণের প্রজাপতি ডানা মেলে ঘাসের ওপরে পড়ে আছে। থির থির করে তাদের ডানা কাঁপছে। গাড়ির শব্দে, আমাদের উপস্থিতিতে নির্ভীক প্রজাপতিদের উড়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। যেন কোনও অদৃশ্য দেবির পদতলে তারা প্রকৃতির অঞ্জলি হয়ে পড়ে আছে। অ্যানকেও স্বীকার করতে হল, এমন অলৌকিক দৃশ্য সে কখনও দেখেনি।

আমরা ধীরে ধীরে সরে এলুম সেই জায়গা থেকে। গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল ঘেরা উকসমলের এই একটি মাত্র হোটেল. হোটেল হাসিয়েন্ডা। হোটেলটা দোতলা. একটা টিলার ওপর? চারপাশে বাগান। মনটা মায়াপ্রভাবে ডুবে আছে বলে কি না জানি, কেবলই মনে হত লাগল, হোটেলটা মায়াদেরই তৈরি। প্রবেশপথ. পাথরের সিঁড়ি, দেয়াল, বিশাল বিশাল গাছ, সবই যেন অতীতের আক্রমণ বর্তমানে বাঁচিয়ে উঠে এসেছে। সাত ধাপ সিঁড়ি ভেঙে আমরা উঠে এলুম লম্বা বারান্দায়। বারান্দা আমাদের ডানদিকে অনেকটা চলে গেছে। বাঁদিকে খানিকটা গিয়ে ডাইনে মোচড় মেরে দু-তিন ধাপ ওপরে উঠে গেছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেইখান থেকে বাঁ দিকটা তেমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। ডানদিকের বারান্দায় সার সার গার্ডেন চেয়ার, এমনকি আমাদের দেশের চৌকিও পাতা রয়েছে। বারান্দার সামনে গাছপালা। তিন-চার ধাপ নিচে পাথর বাঁধানো উঠান। উঠানে টলটল করছে নীল জল। সুইমিং পুল। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ রমণী ও কিশোর সেই জলে হিপোপটেমাসের মতো হাবুডুবু খাচ্ছেন। বারান্দায় গার্ডেন চেয়ারে বসে আছেন শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারীরা, অনেকটা বিভোর হয়ে। আমি একমাত্র অশ্বেতকায়। কৃষ্ণাঙ্গ বলতে ইচ্ছে করছে না।

হোটেলের দুই মহিলা কর্মী এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। আমার মতোই গাত্রবর্ণ। শাড়ি পরালেই ভারতীয়। মায়া ইন্ডিয়ান, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ, লম্বা লম্বা চুল, পিঠে ঝুলে আছে চাবুকের মতো। দুধের মতো সাদা পোশাকে মুখে অভিজাত একটা হাসি খেলছে। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের রিসেপসানের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। পৃথিবীর এই অর্ধের মহিলারা দেখছি ভারি ঘরোয়া। পশ্চিমী মহিলারা এক ধরনের যৌনভাব ছোঁড়ায় অভ্যস্ত। এরা তার ব্যতিক্রম। দেখলে মায়ের কথা মনে পড়ে, দিদির কথা মনে পড়ে, বোনের কথা মনে পড়ে। ঘরোয়া হোটেলের ঘরোয়া রিসেপসান। রিসেপসান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল বাঁদিকের বারান্দার শেষ প্রান্তে উঁচু মঞ্চের মতো ঘেরা একটা জায়গায়। পাথরের মেঝে। সেইখানে বিশাল এক টেবিল পাতা। টেবিলটাও পাথরের। নীলচে পাথর। তার ওপর সাদা রেখার আঁকিবুকি। সেই টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো রয়েছে কাটা ফল-পাকুড়। গেলাসে গেলাসে হলুদ রঙের সরবত। তার ওপর ভাসছে সাদা বরফের টুকরো। আমাদের পরম যত্নে বসানো হল সেই টেবিলে। ফলাহার দিয়ে শুরু হবে আমাদের উকসমলের দিন। টেবিলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। মেকসিকোর পেঁপের রঙ লাল টকটকে। সেই পেঁপে কাটা রয়েছে ফালাফালা। বড় বড় লেবু কাটা রয়েছে দু-আধখানা করে। রয়েছে আঙুর, পিচ, অ্যাপ্রিকট। কমলা লেবু। নানা রকমের কুকিস, চকোলেট বার।

সেই দুই মহিলা পরম সমাদরে বললেন, 'আপনারা খাওয়া শুরু করুন। এইটাই এখানকার অভ্যর্থনার রীতি। খাওয়া শেষ হলেই আমাদের গাড়ি আপনাদের নিয়ে যাবে আর্কেয়োলজিক্যাল সাইটে। যতটা পারেন খেয়ে নিন, কারণ ফিরে এসে লাঞ্চ খেতে দেরি হবে। আগে একটু টক লেবু খান। আজ খুব গরম, বাইরে প্রখর রোদ। টক লেবু রোদ লাগার হাত থেকে বাঁচাবে। গেলাসের সরবত এইখানের এক ধরনের সুস্বাদু পানীয়। নির্ভয়ে খেতে পারেন। সফট ড্রিংকস।'

এ লেবু নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের গোঁড়া লেবু। আমাদের দাঁতের এনামেলে তেমন বল নেই। একফালি চোষা মাত্রই দাঁত টকে গেল। এক চোষণে অতটা রস ছাড়বে কে জানতো। একেবারে গাছতাজা লেবু। একটাকে নিঙড়ালে এক বাটি রস অবশ্যই বেরোবে।

আমার অবস্থা দেখে অ্যান বললে, 'তোমার যেমন কাণ্ড। বললে, আর তুমি অমনি চুষলে। একটু নুন খেয়ে নাও। এরপর তো তুমি আর কিছুই চিবোতে পারবে না।'

সেই মহিলা দু'জনের একজন খিলখিল করে হেসে বললেন. 'নো প্রবলেম, আপনি এক চুমুক সরবত খেয়ে নিন, এভরিথিং উইল বি অল রাইট!'

সরবতটা সত্যিই সরবতের সরবত। অসাধারণ সুস্বাদু। অমন টেস্ট আমি আগে কখনো উপভোগ করিনি। প্রাণদায়িনী। মনে হচ্ছে, মানসম্মান ভুলে চার-পাঁচ গেলাস খেতে হবে। রক্তের মতো লাল পেঁপে, দেখলেই ভয় করে। ভয়ে ভয়েই একফালি মুখে দিলুম। এবারেও সেই একই অভিজ্ঞতা। কি সুন্দর। গোটা একটা প্লেট সাবাড় করতে হবে। গলা দিয়ে নিচে নামছে যেন এয়ার কন্ডিশাড চিপস। মিষ্টতায় কাশীর চিনিকেও হার মানায়। মোলায়েম, মখমল। পেঁপে পেঁপে গন্ধও নেই। একটা আতর আতর ভাব। কে জানে, সত্যিই আতর ছড়িয়েছে কিনা।

মহিলা দু'জন কিছুতেই উঠছেন না। গপাগপ খেতেও পারছি না। এখুনি ভাববেন লোকটা কি হ্যাংলা। তবু আমি খেলুম। যা ভাবেন, ভাবুন। জীবনে এই একবার হ্যাংলা হয়েছি। অ্যান অবশ্য সমানে আমাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে 'খাও খাও, যত পারো খাও। শরীর শীতল করো।'

গ্রীষ্মের সকালে এই ফলাহার স্বদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তখন থেকে কেবলই মনে হচ্ছে, আমি আমার দেশ, ভারতেই আবার ঘুরেফিরে চলে এসেছি। সেই একই আতিথেয়তা। মেয়েদের সেই স্নেহ। এ সেই খটমটে ইংল্যান্ড কি আমেরিকা নয়। ফলার শেষ করার পর নিয়ে যাওয়া হল আমাদের ঘরে। দক্ষিণের বারান্দার শেষ ঘর। বিশাল ঘর, তবে পাঁচাতারা হোটেলের কায়দায় সাজানো নয়। ছিমছাম, সাদাসিধে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নয়। মাথার ওপর চার চারটে পাখা। চারপাশে বড় বড় জানালা। জানালার বাইরে রোদ ঝলসানো বাগান। ঘরের সামনে বারান্দা। পেরোলেই বাগান, সুইমিংপুল। বিরক্তি উৎপাদনের জন্যে ঘরে বড়লোকি দেখাবার জন্যে টিভি রাখা হয়নি। রাখলে পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যেত। আমরা এখানে এসেছি হাজার বছর পেছিয়ে যেতে। ঘরের দেয়ালে মাদুরের ব্যবহার অবাক করে দিলে। মাদুর তো বাংলার জিনিস। কোনও কোনও পণ্ডিতের বিশ্বাস, সারা পৃথিবীর সংস্কৃতি এসে মিলেছিল মায়া সভ্যতায়, তাই হয়তো ঠিক। মেঝেতে কার্পেট নেই। মেঝেতে টালি কেটে কেটে বসানো দামী পাথর। কত রকমের পাথর যে পাওয়া যায় এই দেশে। জানালায় উগ্রতম রোদ। হতেই হবে। মায়ারা যে সূর্যের উপাসক ছিলেন। মেরিডা আর উকসমল ঘিরে যে অঞ্চল, সেই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। ক্রমশ মরুভূমিতে গিয়ে মিশছে। গাছপালা ছোট হয়ে এসেছে। ভলক্যানিক সয়েল। আসার পথে আমরা যে দেখলুম, গাছ ছোট হতে হতে ঝোপ, কাটা বন। জলের কষ্ট তো আছে। তবে হোটেলে প্রচুর জল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এ দেশের ধর্ম। রক্তে চলে গেছে। আমাদের দেশ হলে একটা না একটা খুঁত বের করতে পারতুম। এ একেবারে নিখুঁত। ঝকঝকে বাথরুম। পাথরে তৈরি বলেই হয়তো এত পরিষ্কার। সামান্যতম দুর্গন্ধ নেই। নানারকম আর্টিস্টিক ফিটিংস। স্নানের জায়গাটা জাফ্রি দিয়ে ঘেরা। একটা ঝকঝকে প্ল্যাটফর্ম। স্নানের পর প্ল্যাটফর্মে উঠে জামাকাপড় পালটানো যায়। দেয়ালে ঝকঝকে একটা ড্রয়ার। সোনালি রঙের নকশা করা। মায়া ডিজাইন। সানমাস্ক। সেই ড্রয়ারে বোঝাই প্রসাধনী। যার মধ্যে একটি হল চন্দন তেল। সাবানও রয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি। মেসো-আমেরিকার মায়াদের রাজত্বে বহু নরবলি হয়ে গেছে। মৃতাত্মারা কি সব প্রজাপতি উড়ছে হয়ে ফিরে ফিরে আসে।

থাক প্রজাপতির গবেষণা পরে হবে। আমরা ঢালু পথ বেয়ে গড়গড়িয়ে নেমে এলুম হোটেলের গেটে। গেট পেরিয়ে পথে। হাল্কা হলুদ রঙের একটা গাড়ি আমাদের অপেক্ষায়। আমাদের পথপ্রদর্শকের নাম ডেমিঙ্গো। অসহ্য রোদ। মনে হচ্ছে, সব বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। হোটেলটা রোদের তাপে যেন থিরথির করে কাঁপছে। এ দেশের সবই চড' প্রকৃতির। ভূমিকম্প যে কোনও মুহূর্তে হতে পারে। হঠাৎ একটা আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে যেতে পারে। হঠাৎ একটা সাইক্লোন হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সব ভেসে যেতে পারে। বৃষ্টি নেই তো নেই, নামলেই কেলেঙ্কারি। একেবারে ভারতের উল্টোপিঠ। হয় অতিবৃষ্টি, না হয় অনাবৃষ্টি। হয় ভীষণ ভালো ফসল, নয়তো সবই গেল।

হালকা হলুদ রঙের গাড়িটাকে একেবারে রাজার মতো দেখাচ্ছে। নতুন গাড়ি। এইমাত্র মোড়ক খোলা হয়েছে। এ দেশে গাড়ি চড়ে আরাম। যেমন রাস্তা নরম, সেই রকম গদি নরম, সেই রকম নরম তার চলার ছন্দ।

আমরা পথের দু'পাশে তীরচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। লেখা রয়েছে, 'আর্কেয়োলজিক্যাল সাইট। উকসমল।'

প্রথম যেদিন সাগর দেখেছিলুম, এই অনুভূতি সেই রকম। হঠাৎ চোখের সামনে খুলে গেল

ভিন্ন এক জগৎ। যেন সময়ের পথ উল্টে অতীতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেলুম। পথ আমাদের নামিয়ে দিয়েছে অনেকটা নিচে। ডেমিঙ্গো বললে, 'আমরা এসে গেছি সেনর।'

আমাদের সামনে আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে মায়া পিরামিড। যা এতকাল দেখেছি কেতাবের পাতায় আজ তা বাস্তব। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো, স্পর্শ করতে পারবো। প্রবেশপথে গাড়ি দাঁড়াল। একপাশে। আরও অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা হেলিকপ্টার চক্কর মারছে মাথার ওপর। যতদূর মনে হয় ড্রাগ স্কোয়াডের কপ্টার। অপরাধীর সংখ্যাও তো কম নয়। আর্কেয়োলজিক্যাল সাইট পাহারা দেবার প্রয়োজন আছে। লুণ্ঠনকারীরও অভাব নেই। অনেক কায়দা তাদের জানা আছে। বিশ্বজুড়ে অ্যান্টিকের চাহিদা। আমাদের দেশের মন্দিরে, কি গেরস্থ বাড়ি থেকে প্রাচীন বিগ্রহ চুরি হয়। যায় কোথায়! ধনকুবের আমেরিকানদের কাছে। আর্কেয়োলজিক্যাল সাইটে নামার আগে তিন চারটে আধুনিক বাড়ি। একতলা। একটাতে রেস্তোরাঁ। আর একটায় দোকান। একটাতে অফিস। ঢোকার মুখে একটা বড় গাছ। গাছের তলায় বেদি। ঠিক বেদি নয়, গাছটা গজিয়ে উঠেছে ধ্বংসস্তূপের ওপর। তার তলায় জনাচারেক টুরিস্ট বসে বিশ্রাম করছেন। দলে মহিলাও আছেন। সকলেরই চোখেই সানগ্লাস, গলায় ঝুলছে ক্যামেরা।

আমার তখন একপ্রকার আত্মহারা অবস্থাই বলা চলে। গাড়ি থেকে যে জায়গাটায় নেমেছি, সেই জায়গাটা বেশ উঁচু। টিলা বলা যায় কি না ভাবছি। পথ গড়িয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। দু'পাশে গাছপালা। মাটিতে থেকে থেকেই উঁকি মারছে পাথরের রেখা। জমি যেন কুঁচকে কুঁচকে এগিয়ে গেছে সামনে। নিচে চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ে আছে মায়া শহরের অবশেষ। বোবা ইতিহাস। গাড়ি আর সামনে যাবে না। ডানপাশের উঁচু জায়গায় গাছের ছায়ায় ব্যারাকের মতো একটা ছোট্ট বাড়ি। সাদা রঙ। চড়া রোদ ঠিকরে আসছে চোখে। সেখানে রয়েছে দুটো দোকান। একটাতে বিক্রি হচ্ছে কোল্ড ড্রিংস। দূর থেকে সেইটুকুই দেখতে পাচ্ছি। আরও হয় তো অন্য কিছু বিক্রি হচ্ছে। ঘোরাঘুরির পর মানুষের খিদে তো পাবেই। আর একটা দোকান হল কিউরিও শপ। দোকান-টোকান সব মাথায় উঠে গেছে এখন। অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য সামনে। যত দূর চোখ যায়, বিশাল এলাকা জুড়ে ধ্বংসস্তূপ আর ধ্বংসস্তূপ। গোলাকার বৃত্তের মতো কেন্দ্রভূমি থেকে চারপাশে ধাপে ধাপে উঠে গেছে ওপরে। সামনেই প্রায় অক্ষত একটি পিরামিড। আকারে বিশাল।

এই ধ্বংসাবশেষ প্রথম যাঁর আবিষ্কার তিনিও আমার মতো বলে উঠেছিলেন 'ইমপসিবল'। বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইমারতের পর ইমারত। ইমপোজিং ম্যাজিস্টিক। স্বর্গীয়। তার ওপর অসাধারণ সব রিলিফের কাজ। অভিভূত হবার আরও একটি কারণ, মায়া স্থপতিদের হাতে ধাতব যন্ত্র ছিল না, ভারবাহী পশু ছিল না, চাকা লাগানো গাড়ি ছিল না। তবু সম্ভব হয়েছিল এই মায়ানগরী গড়ে তোলা। ওঁরা কি জাদু জানতেন! হবেও বা' অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সাধন ভজনের গুণে।

মেরিডার আর্কেয়োলজিক্যাল মিউজিয়ামে মায়াদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি দেখে এসেছি। এই ট্র্যাকটার বুলডোজার ক্রেন আর পাইলিং মেশিনের যুগে ভাবতে অবাক লাগে, কি সামান্য দিয়ে কি অসামান্য কাণ্ড তাঁরা করে গেছেন। খুব কঠিন এক ধরনের পাথর যেমন, জেড, জেডাইট, বাসাল্ট, ডায়োরাইট, সার্পেন্টাইন, ফ্লিন্ট দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতি অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

আমার কথা নয়। বিশ্বের অগ্রগণ্য পণ্ডিতগণ বলেছেন, যাঁরা এই নগরসৌধ তৈরী করে গেছেন তাঁরা ছিলেন বিশাল ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, তা না হলে এ সব করা অসম্ভব। এ কর্ম অশিক্ষিত সাধারণ স্তরের মানুষদের নয়। একটা প্যারাবোলা, একটা হাইপারবোলা এঁকে, সেকসান ধরে ধরে, 'পয়েন্ট অফ সাপোর্ট' বের করা সোজা কাজ নয়। আর্কিটেকচারে জ্যামিতির অসম্ভব জ্ঞান না থাকলে বাড়ি ভেঙে পড়ে যাবে। মায়া ইঞ্জিনিয়াররা প্যারাবোলা, হাইপারবোলাও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা আরও জটিল জ্যামিতিতে কাজ করে গেছেন।

আমরা এখন যে ধরনের কাগজ ব্যবহার করি মায়ারা ঠিক সেই রকমের কাগজ তৈরি করতে পেরেছিলেন। বাড়ি তৈরির আগে আমরা এখন যেরকম প্ল্যান তৈরি করি মায়ারাও ঠিক সেই রকম প্ল্যান তৈরি করে রাজদরবারে পেশ করতেন অনুমোদনের জন্যে। উচ্চ-মহল গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন যা খুশি তাই করতে পারতেন। অনুমোদিত প্ল্যানেই কাজ শুরু হত।

এখন প্রশ্ন হল মায়ারা কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করেছিলেন? কোথায় তাঁরা শিক্ষা পেতেন। প্রথম প্রথম ক্লাস বসত গাছতলায়। পড়ে বড় আটচালায়। শেষে সুন্দর পাথরের প্রাসাদে। সমাজের ওপরতলার ছেলেরাই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিতে পারত। কি বিজ্ঞানে। কি শিল্পে। ছেলে নেওয়া হত বেছে বেছে। নির্বাচন পদ্ধতিও ছিল কঠিন। শিক্ষাক্রমে একগাদা বিষয় রাখা হত না। প্রয়োজনীয় তিনটি কি চারটি বিষয় রাখা হত। মায়া শিক্ষা পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল স্পেস্যালিস্ট তৈরি করা। বিভিন্ন এলাকায় ছড়ানো ছিল বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র। কোথাও কলা, কোথাও বিজ্ঞান। কোপান আর হোণ্ডুরাসে ছিল বিজ্ঞান বিষয়ের উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র, গবেষণা কেন্দ্র, যেখানে শিক্ষিত মানুষ আসতেন উচ্চতর বিষয়ের আলোচনায়। এই উকসমলেও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র। উকসমল আসলে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ। এই আবাসিক কেন্দ্রে ছাত্র হয়ে আসতেন অতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরা।

আমরা ঢালু পথ ধরে নেমে চললুম ধ্বংসাবশেষের দিকে। আমরা নামলুম বললে ভুল হবে, পথই আমাদের নামিয়ে আনল নিচু প্রান্তরে, এক সময় যেটা ছিল সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ড বা প্লাজা। মেরিডা থেকে উকসমলের দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার। খুব একটা কম দূর নয়। আমেরিকান গাড়ি মেকসিক্যান রাস্তা, তাই মনে হল চলে এলুম এক লহমায়। পিরামিডের সামনে আমি আর অ্যান হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম বেশ কিছুক্ষণ। তিন কোণা একটা বিশাল আকৃতি। শীর্ষে পাশাপাশি কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। গবাক্ষের মতো আকৃতি। কারুকার্যময়। মায়া ইমারত রিলিফের কাজ ছাড়া হয় না। এমন আর্টিস্টিক টেস্ট কেমন করে তাঁরা পেয়েছিলেন? অত দূর অতীতে সভ্যতা যখন সবে জাগছে তখনই এই মন, এই প্রাণ, এই রুচি। নিষ্ঠুর ধর্মীয় আচার আচরণ ছিল। ছিল নরবলি। দাসপ্রথা। হাজার হাজার মানুষ দূরদূরান্ত থেকে বয়ে নিয়ে আসত পাথর। জীবন বিপন্ন করে একের পর এক সাজিয়ে গেঁথে তুলত সৌধ। কুসংস্কার ছিল। আমাদের দেশের গাজনের সন্ন্যাসীর মতো দেবতার সন্তুষ্টির জন্যে ভিজ-ফোঁড়, বাণ ফোঁড়ের প্রথা ছিল। সবার উর্ধ্বে ছিল কবিতা, দূরদৃষ্টি, আধ্যাত্মিকতা, বিশাল হয়ে বাঁচার প্রবণতা। সঙ্কীর্ণতা ছিল না, স্বার্থপরতা ছিল না। বেশ একটা আটসাট ধরন ছিল সমাজজীবনের।

অ্যান বললে, 'উকসমলে এসেছ, মানে জানো শব্দটার?'

'কি করে জানব? আমি কি তোমার মতো পণ্ডিত?'

'শোনো, আকস, বা উকস মানে হল কুড়নো, তোলা। গাছ থেকে ফল বা ফুল তোলা। আর মাল মানে একটা সময়। যে সময় ভীষণ ভাল ফসল হয়েছিল এইখানে। ফসলের কালে ফসল তোল। নাম তার উকসমল। দার্শনিক ব্যাখ্যাও হতে পারে জীবনক্ষেত্র কর্ষণ করে ফসলে ভরে তোল সময় থাকতে। তারপর সব কুড়িয়ে তুলে রাখো তোমার গোলায় ভরে।'

আমি আর অ্যান একপাশে দাঁড়িয়ে উকসমলের অর্থ খুঁজছি যখন তখন আমাদের চারপাশ দিয়ে চলেছেন ট্যুরিস্টরা। সকলেই গম্ভীর ও সিরিয়াস। স্বাভাবিক। এসেছেন ইতিহাসে। অতীতে। হঠাৎ এক মধ্যবয়সী আমেরিকান ভদ্রমহিলা, চোখে তাঁর রঙ-চশমা, গলায় ক্যামেরা, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'একসকিউজ মিঃ, আর ইউ এ গাইড।'

বলছেন আমাকে। আমাকে গাইড ভাবার কারণ! বিনীত ভাবে বলতেই হল - 'আজ্ঞে না ম্যাডাম।'

'তাহলে তুমি কে?'

'আমি ইন্ডিয়ান।'

অ্যান বললে, 'তোমার চেহারা আর গায়ের রঙের সঙ্গে মায়া ইন্ডিয়ানদের ভীষণ সিমিলারিটি।'

আমেরিকান মহিলা ভারতের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'তোমাদেরও তো খুব প্রাচীন সভ্যতা! আমার ইচ্ছে আছে তোমাদের দেশে একবার যাবো। পয়সা জমিয়ে এ বছর এখানে এলুম। তিনবছর পরে যাবো ভাবছি। তোমার ঠিকানাটা আমাকে দাও।'

আমার একটা কার্ড ছিল, মহিলাকে দিলুম। যত্ন করে রেখে দিলেন বুকের কাছে ঝুলে থাকা হাতব্যাগে। বেশ হাসিখুশি, লাবণ্যময়ী মহিলা। প্রাণশক্তিতে চনমনে। পৃথিবীকে দেখার আকাঙ্খা। ইতিহাস জানার ইচ্ছা। অতীত সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল।

মহিলা বললেন, 'কাম কাম। চলো আমরা আগে পিরামিডের মাথায় উঠি। ওপর থেকে কত দূর, আরও কত দূর আমরা দেখতে পাবো। গোটা এলাকাটাই আমাদের নজরে এসে যাবে।'

পাথরের পরে পাথর রেখে আশ্চর্য কায়দায় গেঁথে তোলা এক ত্রিভুজ। গাঁথনিতে কোনও মশলা ব্যবহার করা হয়নি। খাঁজে খাঁজে ভাঁজে ভাঁজে মিলিয়ে জ্যামিতির অসাধারণ জ্ঞানে একটা সৌধ হাজার হাজার বছর দাঁড়িয়ে আছে অটুট।

বাইরের দেয়াল বেয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে শীর্ষে-গবাক্ষে। অসংখ্য সিঁড়ি। কোনওরকমে পা রাখা যায়। ভীষণ খাড়া। ধরার কোনও অবলম্বন নেই। আর্কেয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট পাশে একটা মোটা চেন ঝুলিয়ে রেখেছেন সিঁড়ি বরাবর। পাশাপাশি দু'জন ওঠা যায় না। প্রথমে উঠছেন সেই মহিলা। পরিচয় হয়েছে নাম জানা হয়নি। তারপরে অ্যান, শেষে আমি। যতই উঠছি শরীর ততই পেছনে মাটির দিকে ঝুঁকছে। ক্রমশই খাড়া হচ্ছে। নিদারুণ কোণ। ধাপ সরু। ভালভাবে পা-ধরে না। মাঝামাঝি এসে মনে হল, ঝুঁকি নিয়ে ভালো করিনি। বিপদ হলেই হল। টাল খেয়ে পড়ে গেলে আর বাঁচতে হবে না। মাথা ফুটিফাটা। ওপর দিকে তাকালুম। অসংখ্য সিঁড়ি একঘেঁয়ে ছন্দে উঠে গেছে আকাশে। অনেক ওপরে নীলের গায়ে কালো পিরামিডের কারুকার্যমণ্ডিত আলসে। জায়গায় জায়গায় ভেঙেছে। সে ভাঙন সামান্য। অ্যান মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'কি, ভয় করছে তোমার?'

অ্যান আমার চেয়ে বেশ কয়েক ধাপ ওপরে। সেই আমেরিকান মহিলা প্রায় চূড়ায় পৌঁছে গেছেন। অ্যান আমাকে ডাকছে হাত বাড়িয়ে। তার সুঠাম গৌরবর্ণ হাতের মণিবন্ধে সোনালি স্ট্র্যাপে বাঁধা সোনালি ঘড়ি চড়া রোদে জ্বলজ্বল করছে। এই আমি প্রথম অনুভব করলুম, আমার 'ভার্টিগো' আছে। আমি যতবার নিচের দিকে তাকাচ্ছি ততবারই আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। শরীর টলে উঠছে। হাত পায়ের জোর কমে যাচ্ছে। চোখে ধোঁয়া দেখছি। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছে বহু দূরে ছেড়ে আসা ভূতল আমাকে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে টানছে। যার এই ব্যাধি আছে সে যতক্ষণ না উঁচুতে উঠছে ততক্ষণ জানতে পারে না।

অ্যান ভয় পেয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। সেও আমার মতোই অসহায়। ধাপ এত সরু, চড়াই এত খাড়া, আর ধরার কোনও ব্যবস্থাই নেই, একমাত্র মাঝামাঝি ফেলে রাখা একটি লোহার শিকল ছাড়া। সেই শিকলও অনেকটা দূরে। আমাদের নাগালের বাইরে। আমরা এমন একটা জায়গা দিয়ে পাকামো করে ওঠা শুরু করেছি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে।

অ্যান বলছে, 'তুমি নিচের দিকে একেবারে তাকাবে না। ভুলেও না। তুমি আমার পায়ের দিকে তাকাও।' বুদ্ধিমতী অ্যান। সে জানে পুরুষের চোখে মেয়েদের পায়ের আলাদা একটা আকর্ষণ আছে, যা হয় তো জমির আকর্ষণকে কাটাতে পারবে। আমি এতক্ষণ অসভ্যতা হবে ভেবে অ্যান অথবা অপর মহিলার পায়ের দিকে তাকাইনি। এখন প্রাণ বাঁচাতে তাকাতেই হল। শত মনের জোরেও মাথা ঘোরা কমাতে পারছিলুম না। মনকে বার বার বোঝাচ্ছি, মন! মহিলারা কেমন অনায়াসে উঠে যাচ্ছে আর তুমি পুরুষ হয়ে পারবে না। এ তো মনের ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা মাথার।

অ্যানের পায়ের গোছ, হাঁটু, হাঁটুর ওপর হারিয়ে গেছে তার স্কার্টের জগতে। অ্যান ওপরে আমি নিচে। অ্যানের ওষুধে কাজ হল। আমার সামনে আর আকাশ-বাতাস-প্রকৃতি স্থাপত্য নেই। আকর্ষণীয় দুটি পা। টকটক করে উঠে এলুম পিরামিডের চূড়ায়। উঠেই ধপাস করে বসে পড়ে নিচের দিকে তাকালুম, আর সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে মাথা ঘুরে গেল। হাত-পা, গোটা শরীরের এলায়িত অবস্থা। অ্যান দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। তার ডান হাত আমার মাথায়। মনে হল আমার একমাত্র দিদি যে স্বর্গে চলে গেছে তিন দিনের অসুখে, সে ফিরে এসেছে কোনও এক অপ্রাকৃত শক্তিতে পাঁচ হাজার বছরের এই প্রাচীন স্থাপত্যে। অ্যান উদ্বেগ মাখানো মুখে বলল, 'তোমার কি খুব অসুস্থ লাগছে?'

'তা একটু লাগছে অ্যান। বেশ খারাপ লাগছে বোন।'

'তোমার ভার্টিগো আছে জানতে না?'

'অনেক আগে একটা রেলব্রিজের মাঝামাঝি গিয়ে নিচে নদীর দিকে তাকিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো হয়েছিল, তখন ঠিক বুঝিনি। আজ যেন বেশি হল।'

অ্যান আমার পাশে বসে পড়ল। ওপরের বারান্দার মতো জায়গাটা তেমন প্রশস্ত নয়। কোনও রকমে বসা যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি চারপাশে চারটে খুপরির মধ্যে কালো পোশাক পরা চারজন সেন্ট্রি। কাঁধে ঝুলছে স্টেনগান। স্টেনগানধারী লোহার মতো চেহারার পাহারাদারদের দেখে শরীর চাঙ্গা হয়ে গেল।

'অ্যান ওরা এখানে কি করছে গো?'

'বেলিকস পাহারা দিচ্ছে। চোবেব তো অভাব নেই। বিশ্বজোড়া জাল পেতে রেখেছে।'

আমবা উঠে দাঁড়ালুম। একটি আমেবিকান বাচ্চা ধাপে ধাপে নিচে নামছে। একেবারে দুধের শিশু, টডলাব। ছেলেটিব বাবা মা ওপবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শিশুটিব দুঃসাহস দেখছে আব হাসছে। আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলুম। কোনওবকমে একবাব পড়ে গেলে মাথা ছাতু হয়ে যাবে।

অ্যান বললে, 'ভয় পাচ্ছ? এদেশেব শিশুবা এইভাবেই বড় হয়। স্পার্টান কায়দা। শক্তিধরেরই পৃথিবীতে বাঁচাব অধিকাব। পৃথিবী দুর্বলেব নয়, শক্তিশালীব।'

আমি ভয়ে শিশুটিব দিকে তাকানো বন্ধ কবলম। চোখেব সামনে শিশুমৃত্যু দেখতে ভাল লাগে না। চাবপাশে চোখ ফেবালুম। ছড়ানো ইতিহাস। ভাঙাচোবা গৃহাবশেষ। অসাধাবণ সব স্থাপত্য। বিচিত্র সব গঠন। জ্যামিতিব টুকবো যেন। কত মাইল এলাকা জুড়ে যে পড়ে আছে সব। দিগন্তে গিয়ে যেন মিশিছে। কি বিচিত্র ল্যান্ডস্কেপ! একটা অভিশাপেব পাতলা চাদব এখনও যেন ঝুলে আছে সমগ্র পবিবেশেব ওপব। একটা বিষণ্ণতা। কিছু একটা ঘটেছিল, অশুভ কিছু, যাব ফলে নিবে গিয়েছিল সব আলো, নীবব হয়েছিল বীণা, শূন্য হয়েছিল জনপদ।

এই ব্যাপাবে নানা মুনিব নানা মত। মায়া সভ্যতাব পতন শুরু হয় ৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে। ৯২৫ খ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ অচল অবস্থা। হঠাৎ যেন সব ডুবে গেল। বাড়িপাট ছেড়ে সব উধাও। এব প্রায় পঞ্চাশ বছব আগে থেকেই সব নির্মাণ কাজ বন্ধ। বাড়ি তৈবি বন্ধ, পিবামিড তৈবি বন্ধ, কারুকার্যমণ্ডিত পিলাব আব উঠল না মানুষেব জয়গাথা গাইতে। বাফেযিল গিবার্ড একজন প্রখ্যাত পুবাতত্ত্ববিদ। তাঁব মত হল নাহুয়া গোষ্ঠীব পিপিল ইন্ডিয়ানবা মায়াদেব আক্রমণ কবেছিল।

আব এক মত হল পব পব কয়েক বছব খাবাব জন্যে ফসল হল না। জমিব উৎপাদিকা শক্তিও কমে এসেছিল। ফলে সভ্যতাব পতন হল। বিরুদ্ধবাদীবা এই মত মানেন না। খবাব জন্যে একটা প্রান্ত নিশ্চিহ্ন হতে পাবে সমগ্র এলাকা কেন পবিত্যক্ত হবে! মেক্সিকোব চিয়াপাস অঞ্চল, হণ্ডুবাসেব কোপান, গুয়াতেমালাব কুইবিগুয়াতে একাধিক নদী বয়ে গেছে উবা উপত্যকা জুড়ে। সেখানে চাষ না হবাব কোনও কাবণ নেই।

তাহলে? তাহলে কি ভূমিকম্প! এই অঞ্চল ভূমিকম্পেব জন্য বিখ্যাত। বিখ্যাত হলেও সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হল গুয়াতেমালাব কয়েকটি অঞ্চল। তেহুয়ানতেপেক যোজক অঞ্চল কিন্তু য়ুকাটানেব উত্তবাঞ্চলে ভূমিকম্প হয় না বললেই চলে। তাহলে ভূমিকম্প থিওবিও অচল হল।

একটি সিদ্ধান্ত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য, সেই সিদ্ধান্তটি হল, বিদ্রোহ। শ্রমিকশ্রেণী ক্ষিপ্ত হয়ে বড় লোক, ওপবতলাব লোক, শাসকশ্রেণীকে গদি থেকে তুলে ফেলে দিয়েছিল। পুবোহিত আব উচ্চবর্ণেব মানুষ উভয় মিলে একটি নিষ্পেষণযন্ত্র তৈবি কবেছিলেন। ধর্মীয় বিশ্বাস আব ভীতি ছিল এঁদেব হাতিয়াব। এই ভয়েব অস্ত্র দিয়ে তাঁবা দাবিয়ে বেখেছিলেন শত শত কুলিকামাবি, মজুবশ্রেণীব মানুষদেব। এব মধ্যে ছিল এক মহা চালাকি। সেই কলম্বাসেব গোলকাহিনীতে আছে পুবো একটা এলাকাব মানুষকে বশীভূত কবেছিলেন সূর্যগ্রহণকে কাজে লাগিয়ে। বেবা নেটিভদেব বললেন, আমি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছি, কাল সকালে আমি তোমাদেব সূর্যকে কালো কবে দেব। পবেব দিন ছিল সূর্যগ্রহণ। কলম্বাস জানতেন।

মায়া সাম্রাজ্যেব ওপব তলায় মানুষ মহাজ্ঞান আব পুবোহিতবা জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, জানতেন গণিত, তৈবি কবেছিলেন নির্ভুল ক্যালেন্ডাব। তাঁবা জানতেন কবে হবে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, গ্রহণ। তাঁবা হিসেব কবে বলতে পাবতেন, কখন আসছে কী। তাবা ছিলেন আবহাওয়াতত্ত্ববিদ। আগেভাগেই বলতে পাবতেন ঝড় আসছে কিনা, খবা হবে কিনা, অতিবর্ষণেব সম্ভাবনা আছে কিনা! প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে তাঁবা ভগবানেব বোষ বলে চালাতেন। দেবতা সন্তুষ্ট হবেন কিসে? বিশাল গগন-ছোঁয়া মন্দিব তৈবি কবতে হবে। গেঁথে তুলতে হবে অতিকায় স্তম্ভ। গড়তে হবে প্রাসাদ। পুবোহিতবা এই চালাকিব আশ্রয়ে জনমানসে একটা বিশ্বাস তৈবি কবে ফেলেছিলেন, আমবা হলুম ঈশ্ববেব প্রতিনিধি, দেবদূত। স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ অসীম করুণায়। আমবা যা বলি কবে যাও বিনা প্রশ্নে। নয়তো ঈশ্বর তোমাদেব সর্বনাশ কবে দেবেন।

বাজশক্তিব হাতে ছিল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। এই আসুবিক শক্তি দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে ক্রীতদাসে পরিণত কবা হয়েছিল। ভীতিব অস্ত্রে তৈবি হয়েছিল ত্রাস। 'ঈশ্ববেব কোপ' ছিল সেই চালাকিব

অস্ত্র। একদিন অতি ব্যবহারে এই অস্ত্রের ধার কমে এল। যাদের ভয় দেখানো হচ্ছিল তারা দেখলে, দুর্দিন তো দুর্দিন, সুদিন আর আসে না। দেবতাকে সন্তুষ্ট আর করাই যায় না। তার অর্থ প্রাকৃতিক শক্তির ওপর ভীতি প্রদর্শনকারী পুরোহিত ও রাজশক্তির কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। কাক মরে ঝড়ে, ক্ষমতা বাড়ে ফকিরের। এই দলিত মানুষ যারা মাইলের পর মাইল হেঁটে কাঁধে করে পাথর বয়ে আনতো, দুর্গম পরিস্থিতিতে জীবন তুচ্ছ করে গেঁথে তুলতো সৌধ প্রাসাদ, যারা ছিল নিষ্পেষিত, নিপীড়িত নিচের তলার মানুষ, সেই বিপুল সংখ্যক মানুষ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। খুলে ফেলে দিল শাসনযন্ত্র। পুরোহিতের দল, স্বর্ণপালঙ্কবাহিত রাজা ও তস্য অনুচরবর্গ প্রাণভয়ে সব ছেড়ে রাজ্যপাট ফেলে পালালেন।

শাসকরা ক্রমশই উচ্চাকাঙ্খী হয়ে উঠছিলেন। চাহিদা বাড়ছিল, বাড়ছিল ভোগের আকাঙ্খা আর সেই অনুপাতে বাড়ছিল প্রজাসাধারণের দাসত্ব। তাদের নিঙড়ে নিঙড়ে বের করা হচ্ছিল রস। আখমাড়াই কলে ছিবড়ে হচ্ছিল শ্রমজীবীরা। রাজসৈন্যরা কেড়ে নিয়েছিল জীবনের সব সুখ আর অবসর। পশুরও অধম এমন জীবনযাপনে বাধ্য করা হচ্ছিল তাদের।

মায়া পিরামিডের মাথায় বসে মায়া সভ্যতার পতনের কথা বিভোর হয়ে চিন্তা করছিলুম। চিন্তা করা হয়নি নিজের অধঃপতন কিভাবে হবে? নিচের দিকে তাকালেই যার মাথা বোঁ হয়ে যায় তাকে তো নামার সময় নিচের দিকেই তাকাতে হবে। এই খেয়ালটা এল, অ্যান যখন বললে, চলো এবার নামা যাক, রোদে তো চিংড়ি পোড়া হয়ে গেলুম আমরা।' বলেই সে নিচের দিকে তাকালো। তাকালো আমার দিকে। আমি তার পাশে এসে দাঁড়ালুম। পাথরের উঁচু গাঁথনি আমাদের হাটুর নিচে এসে থেমে গেছে। ওই বাধাটুকুর নিরাপত্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে ভূমির দিতে তাকিয়ে হাড় হিম হয়ে গেল। আমার নামা হবে না। হয় আমাকে কপিকলে করে নামাতে হবে, নয়তো মেকসিকো সরকারের কাছ থেকে পিরামিডের মাথাটা ইজারা নিয়ে সারাজীবন বসে থাকতে হবে তীর্থের কাকের মতো মৃত্যুর অপেক্ষায়।

নিচের দিকে তাকিয়ে দু'জনেই নির্বাক। অ্যান ইচ্ছে করলেই বলতে পারত, 'আমি চললুম। তুমি তোমার সুবিধামতো যে-ভাবেই হোক নেমে এসো।' সূর্য ঢলে যেত পশ্চিমে। চাঁদ উঠত মায়া সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় নগরীর আকাশে। ছড়িয়ে আছে মায়াবী ধ্বংসাবশেষ। কিছু গঠন অটুট, কিছু খুলে পড়ে গেছে ভূমিতে। সব পর্যটক ফিরে গেছে রাতের আশ্রয়ে। আমি এক ব্রহ্মদৈত্য বসে আছি টঙে। এখানে কি ফায়ারব্রিগেড আছে। বাগবাজারে একবার এক বাড়ির তিনতলার ছাদে একটা ষাঁড় উঠে পড়েছিল। ফায়ারব্রিগেড এসে কপিকলে করে নামিয়েছিল। আমেরিকান হলেও অ্যান বাঙালি। ওইসব না বলে বেশ আন্তরিকভাবেই বললে, 'তোমাকে কিভাবে নামানো যায় বল তো! এখান থেকে পড়লেই তো ছাতু হয়ে যাবে?'

'বাকি জীবনটা আমাকে এইখানেই হয় তো থেকে যেতে হবে অ্যান। আমি নামতে পারবো না।'

অবশ্যই পারবে। পারতেই হবে। আমি মেয়ে হয়ে যা পারি, তুমি ছেলে হয়ে পারবে না!'

'অসম্ভব! যেই পা বাড়াবো, সপাটে আছড়ে পড়ব নিচে। খাড়াইটা তুমি দেখেছ। ধাপ কত সরু!'

সেই বাচ্চাটা তুরতুর করে কখন একসময় নিচে নেমে গিয়ে হাঁ করে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় বোঝার চেষ্টা করছে, সে কত ছোট, পিরামিডটা কত উঁচু। তুলনা করে দেখছে। [illegible] ওপর থেকে শিশুটিকে দেখে আমার বাড়ছে আত্মবিশ্বাস। ওই বাচ্চাটি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি যদি পারে, আমি পারবো না কেন?

অ্যান বললে, 'আমরা ওই চেনটা ধরে ধরে নামবো। আমি আগে তারপর তুমি। আমি তোমার নিচেই থাকবো। তুমি যদি স্লিপ করো আমি ধরে ফেলবো। আমার মাথার ওপর দিয়ে তো আর পড়ে যেতে পারবে না। নাও স্টার্ট। হনুমানের মতো নামো। হাত আর পা দুটোই ব্যবহার করো।'

সে এক দৃশ্য। সরীসৃপের মতো নামা শুরু হল। পাহাড়ের মতো উঁচু পিরামিড। চারপাশে চারজন সেনট্রি। ডান হাতে ধরা আছে মোটা শিকল। জুতোজোড়া খুলে ফেলেছি অ্যানের সুপরামর্শে। ফিতে দিয়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়েছি একজোড়া বাইনাকুলারের মতো। নিচে সবাই জড়ো হয়ে গেছেন।

উৎসাহ দিচ্ছেন, 'কাম কাম ডারলিং। স্টেপ বাই স্টেপ।'

বিপদ হচ্ছে যখন কেউ নিচে থেকে ওপরে উঠছেন ওই একই চেন ধরে ধরে। তবে ভদ্রতা। আমাদের কাছাকাছি এসে তাঁরা পাশে সরে যাচ্ছেন। সবে যাবার সময় বলছেন, 'ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড মাই বয়।' বয়' শব্দটা বড় পীড়া দিচ্ছে। আমি কি বয়! আমি তো ম্যান।

শেষ ধাপে এসে একলাফে মাটিতে। তখন আমার কি বীরত্ব। যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা হাততালি দিয়ে উঠলেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে আমার বীরের মতো হাসি যেন ট্রাপিজের খেলা শেষ করলুম। কিছুক্ষণের জন্যে গুরুগম্ভীর পরিবেশ একটু লঘু হয়ে গেল। মজা হল। নিজেকে ক্লাউনের মতো লাগছে। ক্যামেরার শাটার টেপার শব্দ হল। ছবি হয়ে গেলুম। গলায় জুতোজোড়া। কার অ্যালবামে চলে গেলুম কে জানে। আমি আদাবের ভঙ্গিতে কপালের কাছে হাতের চেটো এনে নাড়তে লাগলুম। পিরামিডের নাটকের প্রথম পর্ব শেষ হল।

আমাদের গাইড বললেন, 'সেনর, ছায়ায় বসুন। আমি আপনাদের একটা শর্ট লেকচার দেবো, তাতে আপনাদের অনেক সুবিধে হবে। ভাল লাগবে।'

আমরা ছায়াঘেরা জায়গায়, ঘাসের ওপর বসলুম। অসংখ্য প্রজাপতি উড়ছে চারপাশে। এই নরম গরম আবহাওয়ায় প্রজাপতিরা জন্মাতে ভালবাসে। রোদের তেজ ভীষণ, গরম ছায়া কিন্তু বেশ শীতল। আমাদের পেছনে ধ্বংসাবশেষ, আমাদের সামনে প্রান্তর। টুকরো টুকরো নানা আকৃতির পাথর। ইমারত তৈরির কাজে হাজার হাজার বছর আগে স্থপতিরা এনেছিলেন। কাজ শেষ হবার আগেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। খেলা না ফুরাতে খেলাঘর ভেঙে যায়।

আমরা বসার ফলে, পিরামিড ও তার চারপাশের বাড়িঘর সব আরও বেশি উঁচু উঁচু দেখাচ্ছে। বহু দূরে আকাশ ধোঁয়াটে নীল। হাল্কা পাহাড়ের রেখা। ভারতের বহু ঐতিহাসিক স্থান আছে, ধ্বংসাবশেষ আছে। সেই স্থানের সঙ্গে এই অঞ্চলের পার্থক্য, এখানে সভ্যতা শুরু হয়েছিল একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে। শিকার, অরণ্য, আগুন আবিষ্কার, পাথর, পাথরের অস্ত্র, কৃষি, কৃষক, গ্রাম, শহর, ধর্ম, শিক্ষা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজা, পুরোহিত, দাস, অমাত্য, নরবলি, শিল্প, ভাস্কর্য। মানুষ প্রগতির পথে এগোচ্ছে।

আমাদের গাইড সায়েবের ইতিহাস সরলীকরণের অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি শুরু করলেন বিদ্রোহ থেকে। নিচের তলার মানুষেরা ওপরতলার অত্যাচারে জর্জরিত হলে শাসনযন্ত্র খুলে ফেলে দিল। বিতাড়িত হলেন মহামাত্য আর পুরোহিতের দল। বিদ্রোহী গোষ্ঠী নির্বাচন করলেন নেতা। নেতার বিপক্ষে দেখা দিল আর এক নেতা। তাঁর বিপক্ষে আর এক নেতা। শুরু হয়ে গেল নেতৃত্বের লড়াই। দলীয় কোন্দল। নিজেদের মধ্যে লড়াই। রক্তাক্ত সংগ্রাম। ধ্বংসযজ্ঞ। ভাঙচুর। ভেঙে পড়ল ধর্মমন্দির। আহত হল ধর্মকেন্দ্র। প্রাসাদনগরী। ছারখার হল সম্পদ। গুটিয়ে গেল সভ্যতায় ছড়ানো গালিচা। গড়তে লেগেছিল হাজার হাজার বছর। ভাঙতে লাগল মাত্র কয়েক বছর। ইতিহাসের পরেও ইতিহাস থাকে। ক্লাসিক যুগ খতম হল। আমরা এই মুহূর্তে যে জায়গায় বসে আছি, এই অঞ্চলটি য়ুকাটান পেনিনসুলার অন্তর্গত। এবং উত্তর ভাগ। এইখানে শুরু হল পোস্ট ক্লাসিক পিরিয়ড। ভাঙনের পর মায়া-সভ্যতা কিছুকাল থেমে রইল। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল এই উকসমলে। মায়ারা এই অঞ্চলে সমবেত হলেন। টুলা থেকে এলেন টোলটেকরা। টোলটেক কালচার চেপে বসল মায়াদের ঘাড়ে। তাঁদের ধর্ম এবং স্থাপত্যের ছায়া পড়ল মায়া সভ্যতার ওপর। দুটি সংস্কৃতির মিলন হল। টোলটেকরা মায়াধর্মে ঢুকিয়ে দিলেন নরবলির প্রথা। আর মায়ারা টোলটেকদের দিলেন ভাষা, হরফ, কিছু আচার-আচরণ।

টোলটেকরা এসেছিলেন বিজেতা হয়ে। দুর্বল মায়াদের তাঁরা সহজভাবেই কাবু করে ফেলেছিলেন। উকসমলের অল্প দূরে চিচেন ইৎজায় তাঁরা শিবির ফেললেন। পরে ওই অঞ্চলটি হয়ে দাঁড়াল টোলটেক সংস্কৃতির পীঠস্থান।

আমাদের ঐতিহাসিক গাইড এইবার এক মহাপুরুষের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। তার নাম হোলোনচান। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী পুরোহিত। ভাগ্যের সন্ধানে তিনি বেরিয়ে এলেন, পরিব্রাজক। ২৪২ খ্রীষ্টাব্দে য়ুকাটানের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল থেকে উত্তরাভিমুখে শুরু হয়েছিল তাঁর যাত্রা। তাঁর যাত্রাপথে তিনি একের পর এক নগর স্থাপন করতে করতে এগিয়ে চললেন। সেইসব শহরের ধ্বংসাবশেষ আজও পড়ে আছে। হোলোনচানের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা থেমে থাকলেন না। তাঁরা এগোতেই

থাকলেন। এই প্রব্রজ্যা চলেছিল ৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৪৬২-তে নতুন জমির সন্ধানের তাগিদে আবিষ্কার করলেন বন্দর জিয়নকান, বাখালাল, আজকের বাকালার। আর এইখানেই প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁদের রাজধানী। ৪৬২ থেকে ৫২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুরো এলাকায় বয়ে গেল চেন চিফদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। বাখালাল থেকে তাঁরা এলেন চিচেন ইতজায়। সেখানে এসে খুঁজে পেলেন খ্রীস্টপর্ব ২০০০ অব্দের প্রাচীন বসতি। পেলেন বিশাল দুটি প্রাকৃতিক জলাধার। স্থানটির যথেষ্ট আকর্ষণ থাকলেও 'চান'-নেতারা সুবিধে করতে পারলেন না। সেবারেব মতো ফিবে যেতে হল।

এলেন পুরোহিত লাকিন চান। যাঁর আব এক নাম ইতজামনা। এই অঞ্চলের এক প্রবাদপুরুষ। মহাপণ্ডিত, শক্তি আর পরাশক্তি দুইটি ছিল তাঁর অধিকারে। বিশালকায় খড়গ নাসার সামনের দিকটা ছিল হুকের মতো বাঁকা। তাঁর হাতেব স্পর্শে অসুস্থ নিমেষে সুস্থ হত। মৃত ফিরে পেত প্রাণ। হয় তো সত্য এই কিংবদন্তী। তা না হলে যুগ যুগ ধরে পাথরের রিলিফে কেবল তাঁর মুখই কেন দেখা যাবে। এই লাকিন চান ৫১৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর চিচেন ইৎজা দখল করে স্থাপন কবলেন নগরী। নামেব মধ্যে আছে তিনটি মায়া শব্দ– চি মানে মুখ, চে মানে কূপ, ইতজা হল যারা বসবাস করতে এল সেই উপজাতির নাম। লাকিন চান সাংকেতিক হরফ আবিষ্কার কবেছিলেন। তিনিই এই অঞ্চলকে সাজিয়েছিলেন স্থাপত্যে।

এই চান-শাখা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন আর এক প্রধান, আর মেকাট টুটুল কিউ। তিনি হলেন দক্ষিণমুখী। তিনিই এলেন এই উকসমলে। আমরা আজ যে ধ্বংসাবশেষে, যে প্রাচীন ইমারতের ছায়ায় বসে অতি জটিল এক ইতিহাস শুনছি তার সূত্রপাত হয়েছিল ষষ্ঠ শতকের শুরুতে।

আমবা কিছুক্ষণ বসে বইলুম স্তব্ধ হয়ে। আজ এই বিমান আর রকেটেব যুগে আমরা ভাবতেই পারি না সে যুগের মানুষেরা জলহীন মরুপ্রান্তব, শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি, নদী নালা পেবিয়ে কিভাবে চলে এলেন এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে। টুটুল কিউ ছিলেন যোদ্ধা, গণিতজ্ঞ, জ্ঞানী, গুণী ও দয়ালু। প্রধান হবার, দিগ্বিজয়ী হবার অভাবনীয় গুণ ছিল তাঁর। যুদ্ধ করা সহজ। জয় করা তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়। বাহুবল থাকলেই হয়। কঠিন হল গঠন কবা, সভ্যতা আর সংস্কৃতিব রূপরেখা তৈরি করা। উকসমলেব কিছু দূরেই ছিল মায়াপান। সেই অঞ্চলেব উপজাতির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে, দুটি সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কিউ গড়ে তুললেন মায়াসভ্যতার দ্বিতীয় পীঠস্থান। আজ আর কেউ কোথাও নেই। 'কোই হ্যায়' বললে প্রশ্নটাই ফিরে আসবে উত্তর হয়ে প্রতিধ্বনিতে। পড়ে আছে মানুষেব কীর্তিস্তম্ভ। সাংকেতিক হরফ। ম্যুবাল, বিলিফ। এই মুহূর্তে পিরামিডটাকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। আমরা আসি যাই, ছবি তুলি, তাব মন ভবে না। স্বজন হাবানোর বেদনায় গভীব রাতে তার রহস্যময় কন্দর থেকে ক্রন্দনেব সুব ভেসে আসে।

কার কি মনে হচ্ছে জানি না, আমাব এইসব দুঃখেব কথাই মনে জাগছিল। জায়গাটি এত বড় আর এমন ধাপে ধাপে ছড়ানো, বহু মানুষ ঘুরে বেড়ালেও ফাঁকা মনে হয়। দূরে কাছে, সর্বত্র ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ট্যুবিস্টবা ঘুরছেন। প্রখব রোদে টুপির ছায়া ঘেরা তাঁদেব মুখ লাল দেখাচ্ছে। পায়ে পায়ে তাঁরা এক নিদর্শন ছেড়ে আব এক নিদর্শনেব সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছেন। অবাক বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন। পাথরেব দেয়াল আব খোদাই করা স্তম্ভের গায়ে সসম্ভ্রমে হাত বোলাচ্ছেন। কখনও এগিয়ে গিয়ে কখনও পিছিয়ে গিয়ে পাগলের মতো টিপে চলেছেন ক্যামেরার শাটার। মানুষগুলিকে পিঁপড়ের মতো মনে হচ্ছে। মানুষ আকাব আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও তার সৃষ্টি সময় সময় বিশালতায় তাকে ছাপিয়ে যায়। উদ্ধত ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করতে থাকে স্রষ্টাকে।

৬৬

এই উকসমল ছিল মায়াদের বিদ্যাপীঠ। শিক্ষাক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয়। একেবারে অবিকল একালের বিশ্ববিদ্যালয়েব মতো। উচ্চশিক্ষার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এখানে ছাত্ররা ছুটে আসত। আমাদের গাইড বিশাল এক চত্বরে নিয়ে এসেছেন আমাদের। পাথর বসানো প্রাঙ্গণ। চারপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাথরে গাঁথা লম্বা লম্বা গৃহ। সব কিছুর মধ্যেই বিরাটত্বের একটা মহিমা জড়ানো

রয়েছে। সাধারণ এলাকার বাড়ির মতো নয়। রাজকীয় অবশ্যই। সব নির্জন। কেউ কোথাও নেই। মনে হচ্ছে এই একটু আগে সব ছিল, হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে ভোজবাজির মতো।

গাইড বললেন, 'এই হল বিখ্যাত নানারি কোয়াডর‍্যাঙ্গল। এইটাই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হস্টেল। আর এই মাঠে খেলা হত ফুটবল।'

'ফুটবল!' ভাবলুম গাইড ভদ্রলোক হয়তো রসিকতা করছেন।

আমার বিস্ময়ের উত্তরে তিনি বললেন, 'আশ্চর্য হবেন না। মায়ারা ফুটবল খেলতেন। নিয়মকানুন হয়তো অন্যরকম ছিল। ফুটবলের আকার একালের ফুটবলের চেয়ে একটু বড় ছিল। খেলায় তাঁরা হাত আর পা দুটোই ব্যবহার করতেন। হ্যান্ডবল ছিল না। চলুন ভিতরে যাই।'

ঝলমলে রোদে সাদা সাদা পাথরের লম্বাটে বাড়িগুলোকে কেমন যেন অলৌকিক মনে হচ্ছে। কান পাতলে ছাত্রদের কলকোলাহল যেন শুনতে পাওয়া যায়। ছুটির ঘন্টা। শিক্ষক তাঁর গম্ভীর চলনে প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। হাতে বই। বই তো ছিলই কারণ মায়ারা কাগজ তৈরি করতে শিখেছিলেন আর সেই কাগজের মান একালের চেয়ে কোন অংশে নিরেস ছিল না।

আমরা তিনজনে নানারি কোয়াডর‍্যাঙ্গলের প্রথম কোয়াডর‍্যাঙ্গলে ঢুকলুম। ছাত্রদের থাকার ঘরগুলি খুব একটা সুপ্রশস্ত ছিল না। এক একটি ঘরে বারো থেকে পনের জন ছাত্র সহজেই থাকতে পারত। এমনও হতে পারে এই ঘরেই নেওয়া হত ক্লাস। এক এক ঘরে পড়ানো হত এক এক বিষয়।

গাইড বললেন, 'এই ঘরেই ক্লাস বসত। এক এক ঘরে এক এক গ্রেড ও সাবজেক্ট।'

আমরা ঘর থেকে ঘরে এগিয়ে গেলুম। পাথরের মেঝে দেয়াল। দরজায় খিলান আর একটু উঁচু হলে ভাল হত। ঘরতে ঘুরতে আমরা শেষ ঘরদুটোয় চলে এলুম। গাইড বললেন,'একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, প্রথম দিকের ঘরের দেয়াল ধবধবে সাদা। তার মানে উজ্জ্বল করার জন্যে হোয়াইট ওয়াশ করা হত। আর এই শেষের ঘর দুটোর দেয়াল কিছুটা মলিন। এই ঘরে ক্লাস হত না। হয় স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করা হত, না হয় মেডিটেশান রুম। ছাত্র, শিক্ষক, পুরোহিতরা এখানে দিনান্তিক ধ্যানে বসতেন। মায়ারা ধ্যানধারণায় অতিমাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। নির্জনে এসে তাঁরা বসে থাকতেন চুপচাপ। এই ধ্যান দিয়েই তাঁরা বিশ্বকে জেনেছিলেন। জগৎ কারণের অনুসন্ধান করেছিলেন। বুঝতে পারতেন প্রকৃতির স্পন্দন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হত।'

আমরা তিনজনে শেষ মাথায় বেরিয়ে এসে পাথরের চাতালে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সত্য বলতে কি বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেছে। অতীত মানবেরা কি কায়দায় যে এই বিশাল সৃষ্টি সম্ভব করেছিলেন। আমাদের সামনে থেকে পর পর ধাপ নেমে গেছে বিশাল সিঁড়ি। তেমন চওড়া হয়তো নয় কিন্তু লম্বায় চলে গেছে এ দিক ও দিক। গিয়ে নেমেছে বাধানো প্রান্তরে। আমরা যে বিশাল আর্চের তলা দিয়ে এখানে এসেছি, সেই আর্চ দেখতে গেলুম গাইড ভদ্রলোকের নির্দেশে। শুধু দেখা নয়, মগ্ন হয়ে দেখার মতোই এক বিস্ময়। প্রথমত উচ্চতা হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে সহজেই চলে আসা যায়, এত উঁচু। কৌণিক আকৃতির এই প্রবেশ পথ নিখুঁত এক জ্যামিতি। পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞরা এই ধরনের স্থাপত্যের নাম দিয়েছেন, ফলস আর্চওয়ে বা কনসোল। অন্য নামও আছে মায়ান আর্চ, অ্যাঙ্গুলার রুফ, করবেল। পুরোটাই সাজাবার কায়দা। একটার ওপর আর একটা। দ্বিতীয়টা প্রথমটার সঙ্গে সমান হবে না, একটু বেরিয়ে থাকবে। দু'পাশ থেকে উঠতে উঠতে মাথার ওপর একটা কোণ তৈরি করবে। সবার ওপরে একটি মাত্র চৌকো পাথর বসিয়ে সেই কোণের ফাঁকটি ভরাট করা হবে। দূর থেকে উজ্জ্বল আকাশের বিপর্বাতে রেখে দেখলে অবাক হতে হয়। যেন স্কেল আর পেনসিলে আঁকা একটি ত্রিভুজ। মাথাটা ছোট্ট একটা সরল রেখা টেনে কেটে দেওয়া হয়েছে। মাথার ওপরের পাথরখন্ডটা যেন টুপি। মায়ান আর্চ আর গ্রীক আর্চে একটাই পার্থক্য, গ্রীকরা শেষ পাথরটা ব্যবহার করতেন চাবির মতো করে। কোণের দু'টো দিককে মিলিয়ে দিতেন এক বিন্দুতে।

আমি প্রশ্ন করলুম, 'কিভাবে গাঁথা হত এই আর্চ। তখন তো গাঁথনির মশলা ছিল না।'

গাইড ভদ্রলোক বললেন, 'এরও একটা গল্প আছে। মশলা আবিষ্কারের গল্প। এই গাঁথনিতে মশলা ব্যবহার করা হয়েছে। মায়া রাজ্যটাই পড়ে আছে পাথরের ওপর। বিভিন্ন জাতের চুনা পাথর। এর মধ্যে এক জাতের পাথর এত শক্ত যে কেটে সিলিন্ডারের মতো করে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে

শক্ত কোনও কিছু দিয়ে আঘাত করলে ধাতব শব্দ বেরোয়। মায়ারা এই পাথরকেও স্বরসাধনার কাজে লাগিয়েছিলেন। চিচেন ইতজায় গেলে দেখতে পাবেন। সেখানে একটা বেদি পাওয়া গেছে যাকে বলা হয় অ্যাজেরেটোরিও দ্য ভেনাস। এই বেদির তলায় লাগানো ছিল এই জাতীয় পাথরের বড় ছোট সিলিন্ডার। এক একটা এক এক সুরে বাজে জলতরঙ্গের মতো।

গাইডের কাছেই জানা গেল, চিচেন ইতজায় অ্যাজেরেটোরিও দ্য ভেনাস নামের বেদির তলায় যেসব সুরেলা পাথরগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো সমস্ত খুলে সযত্নে রাখা হয়েছে মিউজিয়ামে। কারণ অ্যান্টিক তস্করেরা ভেঙে ভেঙে নিয়ে যাচ্ছিল, তা এই যে চুনাপাথর, এর থেকে চুন পাওয়া গেল কেমন করে। আকস্মিকভাবে। মায়ারা ফাঁকা মাঠে আগুন জ্বেলে কিছু একটা করছিল। জল ঢেলে আগুন নেবাবার পর তলায় যেসব পাথর ছিল চৌচির হয়ে গেল। চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল মিহি গুঁড়ো পাউডার। মায়া পন্ডিতেরা গবেষণান্তে বুঝতে পারলেন বস্তুটির ধর্ম। বুঝলেন তাঁরা চুন পেয়ে গেছেন। এরপর তাঁরা সন্ধান করে পেলেন এক জাতীয় সাদা মাটি। সেই মাটির নাম রাখলেন, 'সাসকাব'। বিজ্ঞানীদের গবেষণা শুরু হল। এক ভাগ চুনের সঙ্গে মেশালেন তিন ভাগ সাদা মাটি, তার ওপর ঢালা হল জল। ভাল করে মেশাবার পর যখন শুকনো হল, দেখা গেল জমে পাথরের মতো হয়ে যাচ্ছে। পাওয়া গেল বাড়ি তৈরির মশলা। এইবার দেখুন আর্চটা তৈরি হয়েছে কিভাবে। এপাশ থেকে তোলা হল মাথা পর্যন্ত, ওপাশ থেকে এগিয়ে এল আবার একটা দিক, মাথার দিকে যেটুকু ফাঁক ছিল, তার ওপর বসিয়ে দেওয়া হল এক খন্ড পাথর। শুনলে আশ্চর্য হবেন, এখানে চুন এখনও ওই প্রাচীন কায়দায় তৈরি হয়। যদি সুযোগ পাওয়া যায় সে-দৃশ্য আপনাদের দেখাব। খোলা মাঠে রাতের অন্ধকারে জ্বলছে বিশাল হোমকুন্ড। পাথর পুড়ছে। ছত্রিশ ঘন্টা নাগাড়ে ওই আগুন জ্বলে। তারপর জল ঢালা হয়। চুন তৈরি এই অঞ্চলের একটি ভাল শিল্প।'

এখানে নানা বর্ণের, নানা টেকস্চারের পাথর পাওয়া যায়। সেই পাথর এমন কায়দায় গাঁথা হয়েছে যে আলোছায়ার খেলায় যেখানে খাঁজ নেই সেইখানে খাঁজ আছে মনে হচ্ছে। অগভীরেও গভীরতা এসেছে। আমরা কয়েক পা পিছিয়ে এসে সমগ্র তোরণটিকে দেখতে লাগলুম। নানা বর্ণের, নানা ত্বকের পাথর অপূর্ব এক সৌন্দর্যের খেলা খেলছে। দু'পাশে জাফ্রির কাজ, তারও কোনও তুলনা নেই। পাথর বসানোর কায়দায় নানা জ্যামিতিক নকশা তৈরি হয়েছে। মায়ামানবেরা গণিতটাকে সাংঘাতিক রপ্ত করেছিলেন।

'নানস কোয়াডর‍্যাঙ্গলের পূর্বদিকের বাড়িতে রয়েছে অসাধারণ একটি মুখোশ। চৌকো প্রবেশপথের মাথার ওপর পাথরের জোড়া কার্নিশ। কার্নিশের মাথার ওপর পাথরে গাঁথা মুখোশ। চৌকো একটা মুখ। বিশাল মুখ। খড়গ নাসা। নিমীলিত চোখ। স্ফুরিত অধর। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সাজানো দাঁত। অপূর্ব এক কারুকার্য। এই মুখের মালিক হলেন বৃষ্টির দেবতা। মায়ারা যাঁকে বলতেন 'চাক'। যে-পাথর ব্যবহার করা হয়েছে, তার রঙ হল হলুদ, নীল, লালচে, ছাই ছাই, সাদা।

উকসমলকে বলা হয়—'সিটি অফ দি প্লুমড সারপেন্ট'। অধিকাংশ বাড়ির দেয়ালেই উৎকীর্ণ রয়েছে এই রাজকীয় প্রতীক। 'নানস কোয়াডর‍্যাঙ্গল'-এর পশ্চিম প্রান্তের গৃহটির সামনে এসে আমরা হতবাক হয়ে রইলুম। বাইরের দেয়ালের কাজ সবচেয়ে সুন্দর। এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। বরফিকাটা দেয়াল। পাথরের রিলিফে তোলা হয়েছে পুচ্ছধারী সাপ। সাপের মুখ থেকে উঁকি মারছে এক পুরোহিতের মুখ। প্রতিটি বরফি বসানো রয়েছে কিরিকিটি কিরিকিটি কাটা ফ্রেমে। যাঁদের হাতে পাথরের অস্ত্র ছাড়া অন্য কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না তাঁরা কিভাবে এই অসম্ভব সম্ভব করলেন। জায়গায় জায়গায় খোদাই করা রয়েছে জাগুয়ারের মুখ। সেট করা হয়েছে স্থূলকায় মানুষের মূর্তি। এই দেয়ালটুকু শেষ করতে কত বছর যে লেগেছিল কে জানে। মায়ারা কোনও লিখিত ইতিহাস রেখে যাননি। অথচ তাঁদের হাতে কাগজ ছিল, ভাষা ছিল, অক্ষর ছিল।

'নানস কোয়াডর‍্যাঙ্গল'-এর উত্তর প্রান্তে আমরা একটি দ্বিতল গৃহের সামনে এসে দাঁড়ালুম। যেন মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ। গাইড বললেন, 'এটি হল টেম্পল অফ ভেনাস'। বাঁ-পাশের ছাদের অলিন্দ ধসে পড়েছে। পড়লেও, বাড়িটির অধিকাংশ অংশই নতুনের মতো রয়েছে। একেবারে মাথার ওপর দু'পাশে দু'টি মুখোশ। একতলায় সার সার চৌকো চারটি কলাম। তার ওপর দাঁড়িয়েছে কারুকার্যমন্ডিত

প্যারাপেট। তার ওপর দোতলার গাঁথনি। চৌকো চৌকো পাথর সাজিয়ে নিরেট দেয়াল। সমদূরত্বে চারটি চৌকো দরজা, বেশ বড় মাপের। দরজার পাল্লা নেই, ফ্রেম আছে। নিচের বারান্দায় ঘেরা অংশটি একেবারে আধুনিক কায়দায়। নিচু গাঁথনি। সামনের জমি থেকে টপকে ভেতরে যাওয়া যায়। চওড়া পাথরের কার্নিস। কার্নিসের তলায় পাথর গোল গোল করে কেটে সুদৃশ্য রেলিং। বাড়িটির বাঁ-দিক বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দোতলার ছাদের অংশ ভেঙে নেমে এসেছে। সবুজ রঙের পাথরের এখনও কি জেল্লা।

আমরা এখন যে এলাকায় রয়েছি, এই অঞ্চলটির ভৌগোলিক নাম হল—'পাক'। পর্বতময় বিশাল এক অঞ্চল। সেই অঞ্চলের মধ্যভাগে এই মায়া শহর, উকসমল। দক্ষিণাঞ্চলের পর্বতশ্রেণীকে বলে, 'সিয়েরাবাজা'। মায়া ভাষায় বলা হয় 'পাক'। আর এই অঞ্চলের স্থাপত্যের ধরনকে বলা হয় 'পাক স্টাইল'। একেবারে শতকরা একশো ভাগ খাঁটি মায়া ডিজাইন। উকসমল ছাড়া এই পেনিনসুলার অন্যান্য অঞ্চলের স্থাপত্যে আছে 'চেনস স্টাইল'। চেন বা চানের কথা আগেই বলেছি।

'পাক' অঞ্চলের সমস্ত মায়া শহর পবিত্র রাজপথ দিয়ে যুক্ত ছিল। মায়ারা এই পথকে বলতেন 'সাকবেয়োব'—'সেক্রেড রোডওয়েজ'। স্প্যানিয়ার্ডদের প্রথম দলে যারা এসেছিলেন এখানে তাঁরা এই পথ দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন—'এমন সুন্দর পথ শহর পরিকল্পনার চূড়ান্ত কীর্তি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—বিউটিফুল, ব্রড, অ্যান্ড ফ্ল্যাট।' আমরা সেই পবিত্র পথ দেখতে দেখতে এসেছি। এখনও দেখছি। পিরামিডের চূড়া থেকে দেখছি রানওয়ের মতো দীর্ঘ সমতল পথের রেখা ধ্বংসাবশেষ ছেড়ে চলে গেছে বহু দূরে আকাশ সামনে একটি তোরণ অতিক্রম করে। আমাদের গাইড বললেন –'ওই সাকবেয়োব গেছে মায়াদের পবিত্র ধর্মীয় শহর কাবার দিকে।' এখানেও কাবাহ সেখানে আছে মায়া রাজার বিশাল সমাধি।

জন্তু জানোয়ারে টানা চাকা লাগানো গাড়ি মায়ারা ব্যবহার করতেন না। তাঁরা ভার বহন করতেন পিঠে। রাজা বাহিত হতেন সুদৃশ্য পালকে সাজানো পালকিতে। এই পাক অঞ্চল জলশূন্য ও অনুর্বর। গাইড মহোদয় বলার আগেই ভূ প্রকৃতি দেখে আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল। তৃষিত প্রান্তরে পাথরের নৃত্য। অতি কষ্টে যা জন্মাতে পেরেছে—তা হল চাপড়া ঘাস গ্রাবস' আর 'বুশ'। অতিপ্রাকৃত এক অনুভূতি বিকিরণ করাই হল অঞ্চলটির অন্যতম মহিমা। যেই আসুন, যত দুর্বিনীতই হোন তিনি, একটা অনুভূতির স্পর্শে স্তব্ধ তাঁকে হতেই হবে।

'জল নেই, মায়ারা জল সমস্যার সমাধান করলেন কি করে?'

আমার এই কৌতূহলের উত্তরে গাইড ভদ্রলোক যা বললেন সে এক চমকে দেবার মতো ইঞ্জিনিয়ারিং। মায়ারা বপ্ন করেছিলেন। তাঁরা তৈরি করেছিলেন কৃত্রিম জলাধার। মায়ারা এই জলাধারকে বলতেন, চুলটুন। প্রথমে সার্ভে। বৃষ্টির জল কোথা দিয়ে কোথায় গড়িয়ে আসে। সেই গড়ানো অঞ্চলে মায়া ইঞ্জিনিয়াররা পর পর তৈরি করে গেলেন বিশাল বিশাল জলাধার। পাকা গাঁথনির চৌবাচ্চা। ভেতর দিকটা দুর্ভেদ্য মশলা দিয়ে প্লাস্টার করে দেওয়া হল। এই চুলটুনে জমা হত সারা বছরের বৃষ্টির জল। এই চুলটুনই ঘোষণা করে মায়াদের অপরিসীম কারিগরি ক্ষমতার কথা।'

আমরা যে পিরামিড থেকে একটু আগে নেমে এলাম সেই পিরামিডটিকে বলা হয়, 'উইজার্ডস পিরামিড' বা 'ডিভাইনস পিরামিড'। উকসমলের সমস্ত নাগরিকের এদের রোদজ্বলা আকাশের মাথা স্পর্শ করে অতীতের অহঙ্কার ঘোষণা করছে এই পিরামিডকে ঘিরে সুন্দর একটি কাহিনী আছে। গাইড ভদ্রলোক টেম্পল অফ ভেনাসের একপাশে দাঁড়িয়ে সেই কিংবদন্তীটি শোনালেন।

এক প্রবীণ জাদুকর একবার জাদুবলে একটি ডিম ফুটিয়ে এক মানবশিশুর জন্ম দিলেন। সেই শিশুটি কালে বড় হয়ে উঠল। অসীম গুণধর। ক্ষমতাশালী এক মানব। এক সময় তিনিই নির্বাচিত হলেন জাতির প্রধান। সেই ডিম্বজাত মহামানব তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় মাত্র এক রাতের মধ্যে এই বিশাল পিরামিডটি নির্মাণ করেন। লোকমুখে এই কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। যেখানে কিছুই ছিল না, রাত ভোর হতেই দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে এক পিরামিড। সেই কারণেই এই পিরামিডের নাম —জাদুকরের পিরামিড, বা দৈব পিরামিড। কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক, এই বিশ্বাস নিয়ে পিরামিডটির দিকে আবার তাকাতেই মনে হল পাথরের স্তূপটি যেন কিছু বলতে চাইছে। গাইড ভদ্রলোকের অনুমতি নিয়ে আবার আমরা ফিরে এলাম পিরামিডের কাছে।

গল্পটি হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবু শুনতে ভাল লাগল। মায়া শব্দটির মধ্যেই একটা জাদু আছে। তাছাড়া, চারপাশে যা-সব পড়ে আছে। মায়া বলেই মনে হয়। আমরা জাদু-পিরামিডের মাথায় উঠেছিলাম, তখন তলার দিকটা ভাল করে দেখা হয়নি। এখন আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা শুরু করলুম। জীবনের শেষ দেখা। বেশ ভালভাবেই জানি দ্বিতীয়বার আর আসা হবে না এখানে। প্রথমত খরচ। দ্বিতীয় কারণ হল, বড় কষ্ট। বহু পথ পেরিয়ে আসতে হয়। পিরামিডের ভিতে অদ্ভুত সব কারুকার্য। গাইড বললেন, 'একেই বলে টিওটিহুয়াকান আর্ট। এইখানেই ছিল সেই বিখ্যাত মূর্তিটি—কুইন অফ উকসমল। তুলে নিয়ে গিয়ে সযত্নে রাখা হয়েছে মেকসিকোর সিটির ন্যাশনাল অ্যানথ্রপলজিক্যাল মিউজিয়ামে। সর্পরমণী। মাথাটি সাপের মতো। কিন্তু সাপের চোয়াল ফাঁক হয়ে বেরিয়ে আসছে একটি মানুষের মাথা।'

কুইন অফ উকসমল অর্থাৎ সর্পরমণীর মূর্তিটিকে আন্তর্জাতিক তস্করদের হাত এড়াতে তার স্বস্থান থেকে খুলে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে জাদুঘরে। কাহিনী যাই প্রচলিত থাক না কেন পিরামিডটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল প্রায় তিনশো বছর। তার অর্থ সর্বতলের যে-অংশটি আমাদের দৃষ্টিহরণ করেছে সেই অংশটি প্রাচীনতম। চারপাশে ঝিমঝিম করছে রোদ। যেমন প্রখর আলো, তেমনি গাঢ় তার ছায়া।

প্রজাপতির ঝাঁক এখানেও উড়ছে। যেন উড়ন্ত রামধনু। একপাশে এই পিরামিড। পিরামিডের পেছনেই সেই কনভেন্ট 'নানস কোয়াডর‍্যাঙ্গল'। বাইরের দেয়ালে নানা বর্ণের পাথর এমন মুনসিয়ানায় সেই প্রাচীন স্থপতিরা বসিয়ে গেছেন যেন সুচারু একটি মোজাইক। কনকুইস্তাদররা এর নাম রেখেছিলেন—'কাসা দ্যা লা মোঞ্জাস'।

গাইড ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে এলেন প্রাসাদোপম আর একটি গৃহের সামনে। সবই পাথর। পাথর ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। বিস্ময়কর এক প্রাসাদ। 'কাল' কোনও কোনও অংশে হাত বোলাবার চেষ্টা করলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। প্রাসাদটি প্রায় অক্ষতই আছে। বড় ছোট নানা মাপের, নানা বর্ণের পাথরের স্ল্যাব একের পর এক সাজিয়ে প্রাসাদটি তৈরি করা হয়েছে। ত্রিতল। এইটাই ছিল সে-যুগের গভার্নার প্যালেস—লাটভবন। উকসমলের শাসনকার্য এইখান থেকেই পরিচালিত হত। রাজাপাল এইখানেই বসবাস করতেন। সামনে বিশাল এক প্রান্তর। শাসিতরা এই প্রান্তরেই সমবেত হতেন। এইখানেই বসত বিচারসভা। এঁরা রাজা বলতেন না, বলতেন 'চিফ'। প্রধান। প্রধান শব্দটি ব্যবহারের ফলে মানুষটি জনসাধারণের আরও কাছাকাছি চলে আসতেন। অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম প্রাসাদটির গঠন সৌন্দর্য। গাঁথনির কাজে মশলা ব্যবহার করা হয়নি। খাঁজে খাঁজে পাথর জোড়া দিয়ে প্রাসাদটি তৈরি। এখানেও সেই নানা রঙের পাথর। কোন রঙের পাশে কোন পাথর, কোন রঙ নিয়ে বসবে, যেন কোনও পাকা শিল্পী ঠিক করে দিয়েছেন। কাজটি সম্পূর্ণ হবার পর এমন একটি সামগ্রিক চেহারা নিয়েছে যা দেখলে একালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলবেন—এর চেয়ে ভাল কম্বিনেশন ভাবা যায় না। তিনতলার ছাদের কার্নিশ তৈরি হয়েছে কি অসাধারণ কায়দায়। আমার ভয় করছিল, কোনও রকমে একখন্ড পাথর যদি খুলে পড়ে তাহলে কি হবে!

গাইড মহোদয় বুদ্ধিমান। আমার মনের ভাব পড়ে ফেলে সাহস দিলেন, 'হাজার বছর এইভাবেই আছে। একটুকরো পাথরও খুলে পড়েনি। মানুষ শাবল মেরে ভেঙে না ফেললে এ বাড়ি সহসা ভাঙবে না।'

দেয়ালের একটি অংশ খুলে পড়ে আছে আমাদের পায়ের কাছে। পাথরের একটা চৌকো গাঁথনি। যেন বসার আসন। সেই ভগ্নাংশটিকেও ঝেড়েমুছে কর্তৃপক্ষ এমন করে রেখেছেন। হাল্কা শ্যাওলা লেগে আছে শিল্পীর সূক্ষ্ম তুলিতে লাগানো রঙের মতো। তলাতে অল্প অল্প ঘাস ফুটেছে। ছাদের আলসেটা ভারি মজার। সার সার পাথরের খাড়াই। তার ওপর চাপানো হয়েছে রেলিঙের মতো লম্বা পাথরের টুকরো। তার পাশে পর পর খাড়া করে রাখা হয়েছে পাথরের বড় বড় স্ল্যাব। সবই এক মাপে কাটা। পুরো গঠনটা মধ্যযুগের দুর্গচূড়ার মতো। চার কোণে চারটে চৌকো স্তম্ভ। প্রাসাদটির চেহারায় একটা কর্তৃত্বের ভাব এনেছে। একটা অথরিটি। সবচেয়ে অবাক করে দেবার মতো প্রতিটি কোণের অলঙ্করণ। শিল্পের সঙ্গে স্থাপত্য-কৌশলের অদ্ভুত মিলন। কারুকার্যময় তিনটি পাথরের শুঁড়। যেন আহ্বান জানাচ্ছে। ভাবছি, কি কায়দায় কেমন করে অমন ভারি একটা প্রোজেকসান অত উঁচুতে ধরে রাখা সম্ভব হল। কালের প্রহসন সহ্য করে আজও অটুট? গাইড ভদ্রলোক আমার

বিস্ময লক্ষ্য কবে বললেন, 'মাযা সভ্যতাটাই বিস্ময, আজও সব ঠিকঠাক জানা গেল না। এখনও বহু ধ্বংসাবশেষ পডে আছে গভীব জঙ্গলে। বহু প্রত্নবস্তু ছডিযে আছে ইতস্তত। ওই গল্পটা জানেন?'

'কোনটা?'

'জল। জলেব গল্প। মাযা কৃষকদেব সবচেযে বড সমস্যাই ছিল জল। সেই কাবণে বৃষ্টিব দেবতাই ছিলেন সবচেযে বড দেবতা। বেন গড চাক। তাঁব আবাবনা হত সবচেযে বড জলাধাবেব পাশে। সাধাবণত দুটি জলাধাব তৈবি হত। একটি সাধাবণেব প্রাত্যহিক ব্যবহাবেব জন্যে, অন্যটি ধর্মানুষ্ঠানে। আমবা এই জলাধাবেব নাম বেখেছি সোনোট। ইংবেজিতে যাকে বলা যেতে পাবে সিস্টার্ন। এই ধর্মীয জলাধাব আবিষ্কৃত হযেছে চিচেনে। তাব বেড হবে ৬০ মিটাবেব মতো। ২০ মিটাব গভীব। আবিষ্কাবেব মুহূর্তে ১৬ মিটাবেব মতো জল ছিল। তলায থকথকে মাটি জমেছিল প্রায তিন মিটাব। এই কূপে যে নববিসর্জন দেওযা হত তাব প্রমাণ পাওযা গেছে।

আমাদেব গাইড ভদ্রলোক অসাধাবণ সুন্দব গল্প বলতে পাবেন। সবাই যা পাবেন না। যেমন সুন্দব দেখতে। একমাথা কালো কুচকুচে, কোঁচকা কোঁচকা চুল। ১৩৯া ঝুলপি। চওডা গোঁফ। হাসি হাসি মুখ। তিনি আমাদেব জলেব গল্প বলতে লাগলেন। সেই অসাধাবণ দুপুবে যা জীবনে একবাবই আসবে। বাবে বাবে নয। অদৃশ্য এক 'সিন মাস্টাব' আমাদেব চোখেব সামনে দিযে বিশাল এক পট টেনে নিযে চলেছেন। এক দৃশ্য দ্বিতীযবাব আব ঘুবে আসবে না।

গাইড বললেন, 'চিচেন ইতজা থেকে যে বাস্তাটা ভাল্লাডোলিডেব দিকে চলে গেছে, সেই পথেব কযেক কিলোমিটাব দূবে একটি সাচুযাবি খুঁজে পাওযা গেছে সেখানে মাযাদেব সবচেযে বড জলপূজা হত। খুব ঘটা কবে। প্রথম পূজাব প্রচলন এইখানেই হযেছিল। এইখানেই তৈবি হযেছিল পূজাব পদ্ধতি। এই ধর্মপীঠেব নাম গ্রোটো অফ বালানকাঞ্চে। ১৯৫৯ সালেব আগে এই জাযগাটাব সন্ধান পাওযা যাযনি। মাযাবা এইখানে সাধনা কবতেন অতি গোপনে। লোকচক্ষুব আডালে। স্থান নির্বাচনও কবতেন সেইভাবে। ১৯৫৯ সালে আমাবই মতো এক গাইড একটি প্রাচীবেব গাযে হেলান দিযে হযতো একটু জিবোচ্ছিলেন। এমন সময দেযালেব একটি অংশ হঠাৎ খুলে পডে গেল। দুর্ঘটনা, কিন্তু সেই দুর্ঘটনা থেকেই বেবিযে এল হাজাব হাজাব বছব যা লুকিযে ছিল মানুষেব চোখেব আডালে। সেই গাইড ছেলেটি যেখানে গিযে পডল, সেটি একটি গহ্বব মুখ। ঝোপঝাড সবিযে দেখল লুকিযে আছে একটি সুডঙ্গ। খুবই সরু। সাহসী ছেলেটিব কৌতূহল হল, দেখতে হবে কোথায গেছে এই সুডঙ্গ। জীবনেব মাযা ছেডে ছেলেটি এগিযে চলল হামাগুডি দিযে। অনেকটা যাবাব পব সে গিযে পৌঁছল এক প্রকোষ্ঠে। চাবপাশ থেকে ঝুলছে স্ট্যালাগমাইট আব স্ট্যালাকটাইট। হাজাব বছব ধবে জল চুইযে নেমেছে ফাঁক ফোকব দিযে সেই জলধাবাব সঙ্গে নেমেছে চুন ধাতুব মিশ্রণ। নেমে এসে ঠান্ডায জমে গেছে সরু সরু সুতোব মতো। নানা আকৃতি নিযে জমে গেছে। সে যেন এক ভৌতিক দৃশ্য। পুবো আকৃতিটা যেন মাযাদেব পবিত্র বৃক্ষ সিবাব আকৃতি নিযেছে। সেই ভিজে প্রকোষ্ঠেব মেঝেতে ছডিযে পডে আছে অজস্র পূজাব উপকবণ। বৃষ্টিব দেবতাকে হাজাব বছবেব অঞ্জলি। এই লুক্কাযিত প্রাকৃতিক মন্দিবেব সন্ধান জানতেন একমাত্র মহামান্য পুবোহিতবাই।'

৮।

ইওবোপীযবা দেহবাদী, বৈর্যযিক বৈষযিক হওযাব ফলে লোভী। লোভী হওযাব ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিশ্বাসী। পশুশক্তিব উপাসক। তাদেব ধর্ম একটা আছে, তবে সে ধর্ম তাদেব আধ্যাত্মিক কবেনি। শান্ত কবেনি। ধর্মও তাদেব হাতে যুদ্ধেব চেহাবা পেযেছে। নিজেদেব ধর্ম, নিজেদেব বিশ্বাস ও ভাষা অন্যেব ওপব আবোপ কবতে গিযে তবোযাল ধবতে হযেছে। এ যেন সভ্যতাব অসভ্যতা। মাযা সভ্যতাব ধ্বংসাবশেষেব সামনে দাঁডিযে আমাব এই কথাই মনে হচ্ছিল। মাযাবা জ্ঞান-বিজ্ঞানেব চর্চা, ধর্ম, উপাসনা শিল্পকলা নিযে মেতে ছিলেন, তাব ফলেই হল পতন। ইউবোপীযবা কত নির্বোধ ছিল। এইবকম একটা বাজধানী, এমন সব শিল্পকর্ম নির্বোধ না হলে কেউ ছাবখাব করে দেয।

আমাদের দেশের মন্দির ভাস্কর্য ও গাত্র-অলংকরণ অবশ্যই তুলনাহীন; কিন্তু মায়াদের শিল্পকর্ম অনেক ভারি, অনেক জটিল, বিস্ময় উদ্রেককারী। কি ভাবে যে সব হয়েছিল সহসা ভেবে পাওয়া যায় না। রোদ ঝলমলে দুপুরে, প্রায় মরুপ্রান্তরে সভ্যতার মূক সাক্ষীরা বুকে অজস্র কথার ভাব নিয়ে স্তব্ধ সব ব্যক্তিত্বের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। দেহ আমাদের নুয়ে আসছে ক্লান্তিতে; কিন্তু ভেতরের মন হয়ে আছে টগবগে ঘোড়র মতো। সত্যই যদি ঘোড়া হতে পারতুম তাহলে এক ছুটে ঘুরে দেখে আসতুম এই বিস্তীর্ণ এলাকা। সাত দিকে সাতটি পথ চলে গেছে সূর্যের কিরণের মতো। এক একটি তোরণ ভেদ করে। শরীরে অত শক্তি নেই যে সব পথের শেষ দেখে আসব।

শুধু উকসমল নয়, য়ুকাটানের অন্যান্য শহরেও 'ফ্যালিক-কাল্টের' প্রবল চর্চা ছিল। তার নিদর্শন প্রচুর, প্রচুর পাওয়া যায়। মন্দিরে, ধর্মনিবাসে। পন্ডিতরা কি বলবেন আমি জানি না। আমার মনে হল শৈব তন্ত্রের সঙ্গে তাঁদের এই ধর্মের ভীষণ সাদৃশ্য ছিল। শিব-লিঙ্গের মতো পাথরের বড়, ছোট নানা আকৃতির ছাদে, ভিত্তিভূমিতে, বেদিতে ছড়ানো রয়েছে। এমন কি বৃষ্টির জল নিকাশেব জন্যে মায়াবা ছাদে ছাদে যে সব চ্যানেল লাগিয়েছিলেন, তাব আকৃতিও লিঙ্গের মতো। কিছুটা অশালীন মনে হলেও কিছু করার নেই। যার যা ধর্ম। পুরোহিতরা যে সব আচার আচরণ করতেন তা হত নিভৃতে। মধ্যরাতে। মন্দিরের গর্ভগৃহে। মায়াবা কিছু লিখে রেখে যাননি। রেখে গেছেন সাঙ্কেতিক চিত্র আব অক্ষরমালা। গুহাগাত্রে। স্তম্ভে। তার অর্থোদ্ধারে বিশ্ব পন্ডিতমন্ডলী আজও ব্যস্ত। পূজা পদ্ধতি কি ছিল বলা শক্ত। তবে কাপালিক প্রথায় বলি দেওয়া হত। কারণ দেয়ালচিত্রে দেখা যাচ্ছে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পুরোহিতের পদতলে নতজানু হয়ে আছে যুবক অথবা যুবতী। যৌনাচারও ছিল; কারণ মাযারা চাইতেন উর্বরতা, কি জীবজগতে, কি উদ্ভিদজগতে। বৃষ্টি চাই, শস্য চাই, মানুষ চাই এই ত্রিবিধ কামনায় রাত্রির মধ্যযামে তপ্পাচাব। লিঙ্গই হল উপাস্য দেবতা।

মায়া রাজভবনের পাশ থেকে সামনে আসতেই চোখে পড়ল প্রান্তরেব মাঝখানে বসানো বয়েছে বিশাল এক লিঙ্গ। এত বৃহৎ শিবলিঙ্গ আমাব দেশে দেখিনি। স্প্যানিযার্ড আক্রমণকাবীদেব চোখে এটিকে মনে হয়েছিল উদ্ধত এক অশ্লীলতা। লিঙ্গটির মধ্যভাগ থেকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে বাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে আর জোড়া লাগাবার চেষ্টা করা হয়নি। গাইড সায়েব বললেন, 'রেস্টোর কবা হয়নি ফর বিজনস অফ এ মবাল নেচাব।' নানস কোয়াড্রাঙ্গল, যাব অপব নাম কাসা দ্য লাস মোনজাস, তার সামনে দেয়ালে খোদাই কবা রয়েছে পব পব এক সার মানুষ। উলঙ্গ। তাদের লিঙ্গগুলিকে করা হয়েছে অস্বাভাবিক বৃহৎ। এই মূর্তিগুলি পুরুষত্বেব প্রতীক। প্রতীক প্রজননের। আমাদের দেশের মন্দিরগাত্রেও এই ধরনের মূর্তি আছে। তবে এই মূর্তিগুলি অতি ভয়ঙ্কব। দেখলেই ভয় করে। মুখ, চোখ, ঠোঁট, জিভ, শরীবের গঠন, সব মিলিয়ে এমন এক অবয়ব, মনে হল রাত নামলে নাবীজাতিব আব নিস্তাব নেই।

আমবা মাথা নিচু করে সবে এলুম। অ্যানকে পাশে রেখে দাড়াতে অস্বস্তি হচ্ছিল। লজ্জা। পুরুষজাতি সম্পর্কে তার কি ধারণাই না হচ্ছে! আমাদেব গাইড সায়েবও মনে হয় খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি আমাদেব সবিয়ে নিযে এলেন মাযা ক্রীড়াভূমিতে। বাজা আব রাজ পুবোহিতেবা যেখানে বল খেলতেন। যে খেলাব নাম ছিল, 'পোক তা টক'। ক্রীড়াভূমি দেখে মনে হল খেলাটা ছিল অনেকটা একালেব বাস্কেটবলেব মতো। এই খেলার গুহাচিত্র আমবা দেখলুম। কাগজে আঁকা ছবিও সংবক্ষিত আছে জাদুঘরে। প্রতিটি খেলোযাড় হাতে, কোমরে, হাঁটুতে আব মাথায় পরে আছে সুরক্ষা বর্ম্মনী। খেলাটি মনে হয় বিপজ্জনক ছিল, তা না হলে এমন বর্মপরিধানের ব্যবস্থা কেন? প্রাচীন মায়া পুঁথি 'পোপোল ভূ'-তে রহস্যময় এক খেলার উল্লেখ আছে। সেটা যে কি আজও তেমন বোঝা গেল না। সেই গ্রন্থের এক জাযগায় এই রকম একটা কথোপকথন আছে :

ইকসিবাল্বার প্রভু : এসো আমরা পেলোটা খেলি।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলটিকে ধরে সোজা ছুঁড়ে দিলেন গুলাইপুব রিং-এ।

এই উকসমলেই আর্কেয়োলজিস্টবা অনুসন্ধান করে করে পেলোটাগেম রিং খুঁজে পেয়েছেন। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছিল। আর্কেয়োলজিস্টরা একটু একটু করে অতীত নকশা মিলিয়ে খেলাব জায়গাটিকে পুনর্গঠন করেছেন। চল্লিশ মিটার লম্বা, দুটি উঁচু সমান্তরাল দেযালের মাঝখানে একফালি জাযগাই হল পেলোটার কোর্ট।

বহু অনুসন্ধান এখনও বাকি। উকসমলের টুকরো টুকরো ইতিহাস গেঁথে সম্পূর্ণ সুন্দর একটি মালা আজও গেঁথে তোলা সম্ভব হয়নি। কারণ পুরাতত্ত্ববিদগণ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার সংরক্ষণ ও পুনর্গঠনে যতটা মনোযোগী হয়েছেন ইতিহাস উদ্ধারে ঠিক ততটা হননি। তার কারণ প্রায় অটুট এই মায়া শহরটি খুঁজে পাওয়ার প্রাথমিক বিস্ময় এখনও তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এ যেন বনের মাঝে জলসা হচ্ছিল অতীত শতাব্দীর; হঠাৎ বর্তমান কাল এসে পড়ায় চরিত্ররা সব ছেড়ে ছুড়ে ভয়ে পলাতক। উকসমলের অতীত সম্পর্কে অনুসন্ধান যা হয়েছে, যতটুকু হয়েছে তাতে অতীত তেমন আসেনি। বর্তমানে যা পাওয়া গেল তারই বিবরণ, তালিকা। পন্ডিতদের হাতে তৈরি ক্যাটালগ। আর্কেয়োলজিক্যাল পোস্ট মর্টেম। অথচ মায়া সাম্রাজ্যে যেখানে যা কিছু আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে উকসমল অক্ষত এক বিস্ময়। এই শহরের সৌধ-ভাস্কর্য অতুলনীয়। অসাধারণ স্থাপত্য-শৈলী। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ভেঙেছে চুরেছে, চুরি হয়েছে, সময় চেষ্টা করেছে সংহারের। পারেনি। অলৌকিক প্রভাবে আজও সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের অক্ষয় কীর্তি। সারা আমেরিকায় এর জুড়ি নেই। এ-কথা আমার নয়। বিশ্বের পন্ডিত সমাজের। তাঁরা বলছেন —'দেয়ার ওয়াজ নো রাইভাল আমং দি সিভিলাইজড এরিয়াস অফ আমেরিকা টু দি ফাইন ফিনিশ অ্যান্ড দি ডেলিকেটনেস অফ দি স্মুথ লাইনস অফ উকসমলস আর্কিটেকচার।' কনকুইস্তাদররা দখল নেবার পর, সোনাদানা যা ছিল সব পাচার করে দিলে। মণিমাণিক্য সব লুটপাট হয়ে গেল। অশিক্ষিত সেনাদল সব ভেঙেচুরে তামসিক উল্লাসে নৃত্য জুড়লেন। সব গেলেও পড়ে রইল ভাস্কর্য শিল্পকলা, মূর্তি, স্তম্ভ, পিরামিড। কিছু প্রাচীন পুঁথি। এই প্রাচীন বিবরণীতে উকসমলের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেইভাবে ইতিহাস নেই। ভাসা ভাসা বর্ণনা।

উকসমলে এই মুহূর্তে আমরা যা দেখছি, তা ছাড়া আরও অনেক কিছু লুকিয়ে আছে মাটির তলায়। কবে আসবেন পুরাতত্ত্ববিদদের দল, তাঁদের খননসামগ্রী নিয়ে। আমাদের গাইড সায়েব ডানদিকে দেখালেন, এক সার মাটির ঢিবি। আকারে বিশাল। যেন পাহাড় মাটি ফুঁড়ে উঠতে গিয়ে থেমে গেছে। প্রথম থেকেই ভাবছিলুম, ওগুলো কি হতে পারে। গাইড সাহেব বললেন, 'অসমাপ্ত কাজ। একসক্যাভেশান এখনও ওই পর্যন্ত এগোয়নি। ওই স্তূপ যখন অভিজ্ঞ মানুষের শাবল আর গাঁইতির ছোঁয়া পাবে তখন হয়তো আরও অসাধারণ সব নিদর্শন বেরিয়ে আসবে। আমরা অপেক্ষায় আছি।'

উকসমলে ঢোকার মুখে প্রথমেই নজরে পড়বে এই স্তূপ আর বিশাল পিরামিড। এই পিরামিডটি যে কত নাম 'টেম্পল অফ দি ম্যাজিসিয়ান', 'টেম্পলো ডেল আডিভিনো।' উকসমলকে বলা হয় মায়াদের 'সেরিমোনিয়াল সেন্টার।' এইখানেই উৎসবাদি হত। পূজাপার্বণে সমবেত হত মায়ারা। বিদ্যার্জনের জন্য আসত ছাত্ররা। এইখানেই সমবেত হতেন সন্ন্যাসী আর শামানরা। এই সব যতই ভাবছি ততই যেন স্থানটির মায়া বাড়ছে। যেখানে অনেক কাণ্ড ঘটে যায় সেই স্থানের মাটি হয় পবিত্র। উকসমল হল শক্তিপীঠ, শৈব শক্ত পীঠ।

উকসমলের জমি খুবই উর্বর। অভাব ছিল জলের। জল ছাড়া সেচ হয় না। মায়ারা প্রায় আধুনিক কায়দায় সেচ সমস্যার সমাধান করেছিলেন। উকসমলে এই রকম শত শত জলাধার পাওয়া গেছে। বড়, ছোট। বৃষ্টিই ছিল কৃষির একমাত্র ভরসা। সেই বৃষ্টিকে মায়ারা শতকরা একশো ভাগ কাজে লাগিয়েছিলেন। উকসমলের চারপাশের জঙ্গলে আরও কয়েক হাজার জলাধার বা 'চুলটুন' আছে। উকসমলের মায়ারা ছিলেন কৃষি নির্ভর। প্রতিটি গৃহের দেয়ালগাত্রে সেই কারণে উৎকীর্ণ আছে বৃষ্টির দেবতার মুখ।

উকসমল এবং তার লাগোয়া অঞ্চল কাবাতে মায়াদের আবাসন নির্মাণের বিশিষ্ট একটি ধরন ছিল। একটি বর্গাকার খোলা এলাকা মাঝখানে রেখে চারপাশে তাঁরা একাধিক বাড়ি নির্মাণ করতেন, মধ্য যুগের মনাস্টারির কায়দায়। ইওরোপে চার্চ কমপ্লেকস যে ভাবে তৈরি হত। পরস্পর মিলেমিশে থাকার সুন্দর একটি উপায়। পরিবারে পরিবারে মুখোমুখি বসবাস। একালের হাউসিং কমপ্লেকস।

উকসমল আজ সারা বিশ্বের আকর্ষণ। উকসমলের দর্শনীয় নিদর্শনগুলির মধ্যে প্রধান হল, (১) দি টেম্পল অফ ম্যাজিসিয়ান, (২) নানারি, (৩) গভারনারস প্যালেস, (৪) গ্রেট পিরামিড, (৫) হাউস অফ দি টরটইস। এ ছাড়া আরও একটা স্কোয়ার আছে পশ্চিম প্রান্তে। একটা কেন, সমগ্র এলাকাটা বিভিন্ন স্কোয়্যারে বিভক্ত। বেশ বোঝা যায় সুঅভিজ্ঞ কোনও টাউনপ্ল্যানার এই কমপ্লেকসটি

তৈরি করেছিলেন। একাল হলে তিনি দেশবিদেশ সফর করতেন বিশ্ব উপদেষ্টা হিসাবে, লা কোববুশিয়ারের মতো। পশ্চিম প্রান্তের এই স্কোয়ারটিকে বলা হত, সিমেটারি গ্রুপ। এই স্কোয়ারে ঢোকার প্রবেশপথ উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে। প্রবেশপথের ডানপাশে একসার স্তম্ভ। আপন মনে দাঁড়িয়ে আছে ঝলমলে রোদে। পায়ের তলায় লম্বা ছায়ার রেখা টেনে। সিমেটারির পূর্ব, দক্ষিণ আর উত্তরের অংশ ভেঙে পড়েছে। খাড়া আছে পশ্চিমাংশ। পশ্চিমাংশে বিশাল একটা বেদি ছিল, মায়া আমলের। সেই বেদির ওপর ছিল একটা ইমারত। সেই ইমারতটাকে পূর্ত বিভাগ সযত্নে পুনর্গঠন করেছেন। এই স্কোয়ারের ভেতরে আরও চারটি ক্ষুদ্র বেদি আছে বর্গাকার। এই বেদি চারটির প্রত্যেকটির ওপর রয়েছে রিলিফের কাজ 'স্কাল অ্যান্ড ক্রসবোনস'। বিপদের সংকেত। প্রতিটি বেদির একই উচ্চতা, আশি সেন্টিমিটারের মতো। এই স্কাল আর ক্রসবোন দেখে পরবর্তী কালের সিদ্ধান্ত রাজা, রাজপুরুষ, রাজ-অমাত্য, রাজপুরোহিতদের দেহাবসানের পর এই 'ক্রিমেটোরিয়ামে' আনা হত। মৃতদেহ স্থাপন করা হত বেদিতে। অনুষ্ঠানাদির পর শবদেহ দাহ করা হত, যেমন করেন হিন্দুরা। তারপর অস্থি আর দেহভস্ম সুদৃশ্য একটা মৃৎপাত্রে রেখে সমাহিত করা হত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সেই সব ভস্মাধার খুঁজে পেয়েছেন এই ভূমিখণ্ড থেকে। সেই ভস্মাধারে ছিল ছাই আর দগ্ধ অস্থি।

আজ যা পড়ে আছে তা হল স্মৃতির মতো সবুজ ঘাসে ঢাকা বর্গভূমি। স্কাল আর ক্রসবোন উৎকীর্ণ চারটি বেদি আর তিন পাশ ভেঙে পড়া গম্ভীর এক সমাধিগৃহ। দূরে সাত আটটি বৃহৎ স্তম্ভ। তার পেছনে অভ্রংলেহী বিশাল পিরামিড। এই হল মায়া শ্মশান। মৃত্যুর পর এই ছিল তাঁদের পরিচ্ছন্ন প্রয়াণ স্থান। আমরা তিনজনে ধীরে ধীরে তৃণাচ্ছাদিত ভূমির একপাশে একটু ছায়া দেখে বসে পড়লুম। অ্যান আমার কাঁধে হাত রেখে বললে—মৃত্যু কত মহান। কত রোমান্টিক! এই যে চির-চলে যাওয়া, এইটাই, পৃথিবীর পরম সত্য। বাঁচার তবু একটা পরিমিতি আছে। উপস্থিতি কালসীমায় বাঁধা। মৃত্যু অপরিমেয়। মানুষের উপস্থিতির চেয়ে তার অনুপস্থিতি আরও বেশি সত্য, অনন্ত।

মায়াদের এই বল খেলা নিয়ে আমার একটা বিশাল কৌতূহল তৈরি হল মনের আনাচে কানাচে। কি করব মনের যা স্বধর্ম। আমাদের গাইডসায়েব প্রকৃতই পণ্ডিত মানুষ। এই বয়সেই প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। আর তা নাহলে গাইড হলেন কি করে। দেশ বিদেশের মানুষ আসছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সুপণ্ডিত। অজস্র তাঁদের প্রশ্ন। গাইডসায়েব আমাদের কৌতূহল নিরসন করলেন।

মেসো আমেরিকান কালচারের বহু শাখাই বল খেলত। যেমন, টেয়োটিহুয়াকান, জাপোটেক, টোটোনাক। বল খেলা হত নিঃসন্দেহে, তবে কিভাবে, তেমন স্পষ্টভাবে কিছু লেখা নেই। সব বর্ণনাই অসম্পূর্ণ। টেয়োটিহুয়াকান, মানে 'দি সিটি অফ গডস', ঈশ্বরের শহর। অথবা ঈশ্বর যেখানে সৃষ্ট তৈরি করেছিলেন। এই শহরের প্রথম সারির মানুষ, যেমন, মহামাত্য, এঁরা খোলা মাঠে ঈশ্বরের তুষ্টি সাধনের জন্যে, ঈশ্বরকে আনন্দ দেবার জন্যে বল খেলতেন।

দীর্ঘ সময় ধরে একটি সংস্কৃতি দানা বেঁধেছে। এসেছে এক এক রাজার রাজত্বকাল। বল খেলার মাঠের আকার আকৃতি পাল্টেছে। পাল্টালেও সৌসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, কারণ খেলার মাঠগুলি সে যুগের আয়োজনের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে আজও পড়ে আছে। এক রকম হলেও সামান্য সামান্য পার্থক্য দেখে পরবর্তীকালের অনুমান, এক এক সংস্কৃতিতে খেলার নিয়ম ছিল এক এক রকম। স্থান আর কাল অনুসারে নিয়ম বদলে গেছে। মায়াদের বল খেলা নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার অন্ত নেই। ওয়াতেমালার কুইচে জাতীয় পবিত্র গ্রন্থটির নাম- 'পোপোল ভু'। আগেই উল্লেখ করেছি। সেই গ্রন্থে বহুবার এই বল খেলার কথা লেখা হয়েছে, কিন্তু বিস্তারিত কোনও বিবরণ নেই। 'এসো বল খেলি'। খেলা শুরু হল। এর বেশি কিছু নেই।

মায়া সভ্যতা যখন পড়ে আসছে তখন যে বল খেলা হত, তেমন কোনও উল্লেখ পরবর্তীকালের কোনও বিবরণীতে নেই। বিশপ লান্ডা মায়া সভ্যতা ও মায়াজীবনের বিবরণী যত পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে গেছেন এমনটি আর কেউ লেখেননি। তাঁর গ্রন্থেও বল গেম-এর উল্লেখ নেই। চিলাম বালাম আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সেখানেও বল খেলার'উল্লেখ নেই। কিন্তু বল খেলা হত সে বিষয়ে মায়া বিশেষজ্ঞরা সুনিশ্চিত। ফ্রাঞ্জ ব্লাম বলছেন, চিচেন ইৎজায় বল খেলাকে বলা হত—'পোক-ইয়া' অথবা 'পোকটা-পোক'। ফ্রাঞ্জ ব্লামের বইটির নাম 'লা ভিদা দ্য লস মায়াস'। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত। মেক্সিকোয় বইটি আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্প্যানিশ ভাষায় লেখা। উৎসাহী পাঠক

কোনওভাবে সংগ্রহ করে পড়ে নিতে পারেন। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন। ব্লাম যাকে 'পোকটা-পোক' বলছেন, আসলে তা হবে 'পিপুকটাল-পিপুকটাল'।

অনেকেরই মনে হতে পারে বল খেলা নিয়ে এত মাতামাতির কারণটা কি! কারণ একটাই, মেসো আমেরিকা আর লাটিন আমেরিকা ইদানীংকালে ফুটবলের পুরোভাগে। ছেলে বুড়ো সকলেই ফুটবল পাগল কেন! অবশ্যই এর একটা কারণ আছে। অতীতের রক্তই তো বইছে বর্তমানের শরীরে। গোলা মেরে সভ্যতা উড়িয়ে দেওয়া যায়, রক্তের ধারা স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না। স্প্যানিশ ব্লাড, মায়া ব্লাড হাজার বছর ধরে মিলেমিশে তৈরি করেছে মেস্তিজো প্রজন্ম। নারীর দুর্নিবার আকর্ষণে সন্ন্যাসীর গেরুয়াই গোলাপী হয়ে যায়, তা বীর যোদ্ধার দল। এখানে এসে এই বিশাল খেলার মাঠের একধারে বসে বুঝতে পারলুম বল কি ভাবে রক্তে ঢুকেছে।

ডক্টর সোলিস আলকালা একটা অভিধান প্রণয়ন করেছেন -স্প্যানিস-মায়া ডিকশেনারি। সেই অভিধান অনুসারে পিপুকটাল-পিপুকটাল মায়া শব্দটির অর্থ, হাটু মুড়ে বারে বারে আধবসা হওয়া। তাঁর অভিধানে এই বল খেলার ওপরও ছোট একটা নোট আছে। ব্লাম লিখছেন, মায়া ফুটবলের সঙ্গে আমেরিকান ফুটবল বা বেসবলের সাদৃশ্য আছে। বেসবল খেলা শুরু হবার মুহূর্তে খেলোয়াড়রা আধবসা হয়ে থাকেন। রেফারির বাঁশি বাজা মাত্র খেলা শুরু হয়ে যায় রণোন্মাদনায়।

এই উকসমল, যেখানে আমরা এখন বসে আছি আর চিচেন ইৎজায় কনক্যুইস্তাদররা যখন এল তখন তো কোথাও আর কিছু নেই। ভূতুড়ে শহর পড়ে আছে। কেউ কোথাও নেই। বিশাল বিশাল প্রসাদের মাথায় মাথায় চোখ পাকিয়ে বসে আছে বাঁকা-ঠোঁট ঈগল। জাগুয়ারের দল শিকারের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘুরছে। ভ্যান্ডালেরা যা পেরেছে ভালো ভালো আর্ট-অবজেক্ট সব খুলে নিয়ে গেছে। কনক্যুইস্তাদররা আসার তিনশো বছর আগেই মায়াদের গৃহ-বিবাদে খেলাধুলো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উকসমলের এই ছোট মাঠ আর চিচেন ইৎজার বড় মাঠটি চলে গেছে জঙ্গলের তলায়। সাফ সুতরো করার পর দেখা গেল– সে আর কিছুই নয়, ক্রীড়াভূমি।

ব্লাম তাঁর বিবরণীতে লিখছেন—স্প্যানিশ মিশনারী ড়বান, সাহাগুন, মোলিনা এবং দ্যা ওভিয়েডোর রেখে যাওয়া ইতিহাস ঘেঁটে আমার এই সিদ্ধান্ত, টেনোকটিটলান আর টেকসকোকোতে বল খেলা হত। স্প্যানিশ আক্রমণের অব্যবহিত আগেও তারা খেলতেন। তারপর তো সবই ধ্বংস হয়ে গেল। সেই সময় মায়ারা এই বল গেমকে বলত 'তলাচতলি'। স্প্যানিয়ার্ডরা এই খেলার সাক্ষী হয়েছিল। অনেকেই অংশ নিয়েছিল। খেলার দুটো কারণ নির্দেশ করেছেন তাঁরা—এক ধর্মীয় কারণ আর একটি কারণ জুয়া। তৃতীয় আর একটা কারণ একালের গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন রাজারাজড়াদের সাংঘাতিক এক প্রমোদ। পরাজিতকে খেলার ছলে হত্যা। যে খেলার জয়পরাজয়ের একটাই পুরস্কার, জীবন অথবা মৃত্যু।

কিছু ছবি রেখে গেছেন মায়া শিল্পীরা। খেলার মাঠের ছবি। মাঠের দুই বিপরীত প্রান্তে বিশাল উঁচু দুটি পাঁচিল। গোল পোস্টের বদলে দেয়াল। দু'পাশের দুই দেয়ালে লাগানো রয়েছে দুটি রিং। রিং-দুটি পাথরের তৈরি। খেলার মাঠটি ঠিক ইংরেজি টি অক্ষরের মতো। মাঠের ঠিক মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে আছেন দুই খেলোয়াড় মুখোমুখি। যেমন একালের খেলার মাঠে। একজন খেলোয়াড় হাত বাড়িয়ে আছেন আর এক খেলোয়াড়ের দিকে। তাঁর হাতে ধরা রয়েছে একটি বল। বলটির আকার একালের সফ্‌ট বলের মতো।

আর একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একদল খেলোয়াড়। তাদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে একটা করে ছোট ব্যাট। একালের বেসবল ব্যাটের মতো। সেই ব্যাটে করে তারা একজন আর একজনের দিকে বল ঠেলে দিচ্ছে। মাত্র কয়েক বছর আগে চিচেন ইৎজায় খুঁজে পাওয়া গেছে মায়া সাম্রাজ্যের বৃহত্তম ফুটবল গ্রাউন্ড। লম্বায় ১৭০ মিটার। ৪০ মিটার চওড়া। মাঠটা প্রায় বারো মিটার উঁচু। অনেকটা মঞ্চের মতো। মাঠটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। দু'ধাপে এই বেদির মতো মাঠটি তৈরি করা হয়েছিল। তলার বেদির উচ্চতা ১.৭২ মিটার। তবে অতি সম্প্রতি টোলটেকদের রাজধানী টুলাতে আর একটা বিশাল মাঠ পাওয়া গেছে, যার দৈর্ঘ্য ২১৪ মিটার।

চিচেন ইৎজার মাঠটি উত্তর থেকে ক্রমশ চওড়া হতে হতে দক্ষিণ প্রান্তে সর্বাধিক চওড়া হয়ে ইংরেজি টি অক্ষরের মতো হয়েছে। এই টি আকৃতির মাঠটি স্থাপিত হয়েছে ১.৭২ মিটার উঁচু একটা বেদির ওপর। মাঠটির দুই প্রান্তে প্রবেশ প্রস্থানের জন্য দুটি ফাঁক। দক্ষিণের চওড়া অংশে গ্যালারি

ছিল। কারুকার্যময়। গ্যালারিতে ছাদ ছিল। ছাদটি ঢালু। ছাদের পেছন দিকটা দেয়ালে রক্ষিত। সামনের দিকে সুগঠিত সুদৃশ্য এক সার স্তম্ভ। থামে সব রিলিফের কাজ। ভালো ভালো পোশাক পরিহিত সমাজের মহামান্য ব্যক্তিরা। এই গ্যালারিতে বসে রাজা-মহারাজারা খেলা দেখতেন। উত্তর প্রান্ত দক্ষিণ প্রান্তের চেয়েও উঁচু আর একটু ছোট, কিন্তু আরও সুদৃশ্য গ্যালারি। বিশেষভাবে নির্মিত। মহারাজা তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে এই বিশিষ্ট আসনেই বসতেন। দক্ষিণ প্রান্তের গ্যালারিটিকে বলা হয় থিয়েটার। উত্তর প্রান্তেরটিকে বলা হত— সেক্রেড ট্রিবিউন।

দু' দেয়ালে পাথরেব যে রিং দুটি লাগানো রয়েছে তার কারুকার্যে মায়াদের সেই প্রিয় প্রতীক প্লুমড্ সাবপেন্ট। পূর্ব আর পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে তিনটি করে বুথ। এই বুথে বসতেন রেফারিরা। দু' দলে ক্যাপটেনসহ্ সাতজন করে খেলোয়াড় থাকতেন। খেলোয়াড়দের ইউনিফর্ম ছিল খাটো স্কার্ট। পিঠেব দিকে পালকের ক্রেস্ট। বাঁ হাঁটুতে একটা প্রোটেক্টাব। কোমরে নিরাপদ কোমরবন্ধনী। বাহু এবং পুরবাহুতেও সুবক্ষাবন্ধনী। খেলোয়াড়দেব দু'কানেও থাকত লিঙ্গাকৃতি দুটি অলঙ্কার যাকে আমরা আগেই জেনে এসেছি, 'ফ্যালিক সিম্বল' বলে। পায়ে থাকত স্ট্র্যাপ বাঁধা এক ধরনের চটি জুতো। প্রতিটি খেলোয়াড়ের হাতে থাকত এক ধরনের চাকতি। ডান হাতে। দেখতে ঠিক সাপের মাথার মতো। আর তাদেব কোমরবন্ধনী থেকে ঝুলতো একটা ব্যাট বা খেঁটে লাঠি। মাথায় পালক লাগানো টুপি। ইউনিফর্ম এক হলেও, প্রতিটি খেলোয়াড়কে চিনে নেবার জন্যে পোশাকে লাগানো থাকত পৃথকীকবণ প্রতীক। একালে যেমন ব্যবহাব করা হয় সংখ্যা।

এইবার খেলাটা ছিল, দেয়ালে লাগানো ভার্টিকাল পাথরের রিং, যা দু'পাশের দুই দেয়ালে লাগানো আছে তা ভেতব দিয়ে একটি রবারের বলকে গলিয়ে দেওয়া। এই রবার কোথা থেকে আসত। পণ্ডিতরা প্রথমে ভেবেছিলেন, রবার আসত ভেরাক্রুজ থেকে। সম্প্রতি তাঁরা মত পাল্টেছেন; কারণ চিচেন ইৎজার কাছেই রয়েছে রবারের জঙ্গল। কোনহুনলিক নামের একটি জায়গায় ভিক্টর সেগোভিয়া (এক পুরাতত্ত্ববিদ) ধ্বংসস্তূপ পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে দেখলেন, যে মাঠে বল খেলা হত সেই মাঠেরই চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে রবার গাছ।

সেকালের চিত্রকর, খেলার যে চিত্র এঁকে রেখে গেছেন, তা দেখলে একালের মানুষের শরীর সিরসিরিয়ে উঠবে। খেলোয়াড়দেব দাঁড়াবার একটা প্রথা ছিল। নিয়ম। সাতজনের ছ'জন দাঁড়িয়েছে, একের পিছনে আর এক। সর্বাগ্রে ক্যাপটেন। বিপরীত দলেও তাই। দুই দলে দুই ক্যাপটেন মুখোমুখি। একদলেব ক্যাপটেনের হাতে একটা বড় ধারালো পাথরের ছুরি। ডান হাতে ছুরি, বাঁ হাতে একটা কাটামুণ্ড। টপটপ করে রক্ত ঝরছে। সেই ক্যাপটেনের পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছে প্রতিযোগী দলের ক্যাপটেন। মুণ্ডুটি তারই। কারণ সে পরাজিত। সেই কবন্ধ দলনেতার কাটা গলা দিয়ে ফিনকি ধারায রক্ত উঠছে। সাতটি ধারা। সাতটি ধারাব ছটি হবে সর্প আর সপ্তম ধারাটি হবে একটি দ্রাক্ষালতা। লতায ঝুলছে ফুল ও ফল।

এই ছবিটি নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার শেষ নেই। কোনও মহলের মত চিত্রটি প্রতীকী। ক্যাপটেনের রক্তধারা হল সার। সেই সারের উর্বরতায় ধরিত্রী ফলবতী হবে। চিত্রে দুই দলনায়কের মাঝখানে অঙ্কিত রয়েছে একটা মড়া' . মাথার খুলি। খুলিকে ঘিরে খোঁচা খোঁচা চিরুনির আকারের একটি বৃত্ত। শব্দের প্রতীক। তবে অধিকাংশের ধারণা, ঘটনাচিত্রে প্রতীকী বলে কিছু ছিল না। পরাজিত দলনাযক এইভাবেই তাঁব মুণ্ডু হারাতেন। সম্প্রতি আর একটি ব্যাখ্যা এসেছে। কর্তিত মুণ্ডু যাঁর তিনি জয়ী দলটির অধিনায়ক। ঈশ্বরকে তাঁর জয়ের সম্মান হিসাবে অর্ঘ্য দিচ্ছেন নিজের ছিন্ন মুণ্ডু। এ ব্যাখ্যা মানা অসম্ভব। ঈশ্বরের ভালবাসা যত প্রবলই হোক, মানুষের বাঁচার ইচ্ছা আরও প্রবল। খেলার যদি এই রীতি হয়, কোন দলের অধিনায়ক জিততে চাইবেন!

৬৮

দিন শেষ হয়ে আসার আগেই আমাদের সব দেখে নিতে হবে। এখানে দিন অবশ্য বেশ বড়। দিনের আলো থাকে বহুক্ষণ। ম্যাজিসিয়ানস পিরামিড আমাদের দেখা হয়ে গেল। চারটি 'সাব স্ট্রাকচার'

নিয়ে গঠিত এই বিশাল পিরামিড। পশ্চিমে রয়েছে প্রথম সাব স্ট্রাকচারের বাইরেটা। নিচু একটা বেদি থেকে একটু করে গেঁথে তোলা হয়েছে। পুবের সাব স্ট্রাকচারেব আবিষ্কারের পেছনে বেশ একটা রোমাঞ্চ আছে। মেকসিকোব ন্যাশনাল ইনস্টিটুট অফ অ্যানথ্রপলজি অ্যান্ড হিস্ট্রি ৬৮ সালে আর্কেয়োলজিস্ট ডক্টর সেজার সায়েঞ্জকে পাঠিয়েছিলেন উকসমলে। সায়েঞ্জ-এর কি মনে হল তিনি পুবদিকে একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেললেন। বেবিয়ে এল পুবেব একেবারে অক্ষত উপাংশটি। যাক, স্থাপত্যের জটিলতাব মধ্যে না যাওয়াই ভাল। বড নীবস বিষয়। তবে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, মায়ারা স্থাপত্য-শিল্পের তুঙ্গে উঠেছিলেন, আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাডাই। অতীত যেন বর্তমানের দিকে তাকিয়ে আছে ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে। পশ্চিমের প্রবেশ-দ্বারটি হল বিশাল এক দৈত্যেব মুখ। এই মুখ দিয়েই ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। খাড়া উঁচু সিঁড়িব দু'পাশে খোদাই করা রয়েছে বৃষ্টির দেবতার মুখ। মোট বাবোটি মুখ নজরে পডল। একটা গা ছমছম করানো পবিবেশ। বলা চলে 'আনক্যানি'।

দেখা হল নানাবি কোয়াডর‍্যাঙ্গল। সাবা পৃথিবী একমত, গোটা ল্যাটিন আমেরিকায় এমন সুন্দর একটি বাড়ি আব দ্বিতীয় নেই। গোটা গঠনটাই যেন পাথবেব ফিলিগ্রি। নানাবি নামটি রেখেছিলেন ফ্রানসিসকান প্রিস্ট, দিযোগো লোপেজ কোগোল্লুদো। এখানে এসেই তার মনে হয়েছিল স্পেনের ধর্মীয় কনভেন্টেব সঙ্গে এই বাড়িব বেশ মিল আছে। পুরো ব্যাপাবটাব পবিকল্পনা যে কাব মাথা থেকে বেরিয়েছিল। একটা স্কোয়্যাব তাব চারপাশে বাড়ি। বাড়ি মানে এক একটা ব্লক। এক এক ব্লক এক এক উচ্চতায। দক্ষিণেব ব্লক শুরু হয়েছে জমিব লেভেল থেকে। দক্ষিণেব ব্লকের কার্নিস যেখানে সেই উচ্চতা থেকে শুরু হয়েছে উত্তরেব ব্লক। পশ্চিমেব ব্লক আবম্ভ হয়েছে দক্ষিণের ব্লকের ছাদেব লেভেল থেকে। ফলে এমন একটা বৈচিত্র্য এসেছে জমকালো একটা ব্যাপাব। এক একটা ব্লক এক এক উচ্চতা থেকে উঠেছে। অজস্র ঘব। প্রতিটা ঘবেব ভেতরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকাব মতো কারুকার্য। ডেকরেশনে মায়া শিল্পীরা যে সব মোটিফ ব্যবহার করতেন, সেই সব মোটিফে অদ্ভুত একটা বার্তা থাকত, মনকে অবশ করে দেবাব পক্ষে যথেষ্ট। সম্মোহনী প্রভাব। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকাব পব মনে হয অন্য কোনও জগতে চলে গেছি। সে জগৎ মৃত্যুর না মৃত্যু-পূর্বেব বলা শক্ত। তবে সম্পূর্ণ অচেনা। মায়ারা যে কোনও কারণেই হোক জোড সংখ্যা পছন্দ করতেন না। সেই কারণে, পূর্ব দিকেব ব্লকে পাঁচটি দরজা। দক্ষিণ ব্লকে দরজাব সংখ্যা নয। পশ্চিম ব্লকে সাত। উত্তব ব্লকে এগাব। নানারি কোয়াডর‍্যাঙ্গল নিয়ে গবেষণার এখনও শেষ হয়নি। কোনও ব্লকেব দরজা স্কোয়্যারেব দিকে খুলছে, কোনও দরজা বিপরীত দিকে। কোনও দরজারই অবশ্য কপাট নেই।

তৃতীয় বিস্ময় হল লাট ভবন। গোটা আমেরিকায় এমন একটি ভবন পাওয়া যাবে না। বিশালতায়, আকারে আকৃতিতে, অলংকরণে। গভর্নার্স প্যালেস নামটিও, প্রিস্ট দিয়েগো লোপেজের দেওয়া। বাড়িটাকে দেখেই তিনি বলেছিলেন, এ হল লাট ভবন। বাইরেব চারপাশেব দেয়াল অলংকরণে ২০ হাজাব পাথব ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রশ্ন করেছিলুম, সংখ্যাটা কিভাবে পাওয়া গেল। খুব সহজে না হলেও পাওয়া গেছে একটা একটা করে গুনে। লাট ভবনের পেছন দিকটা এখনও সারানো হয়নি। ভেঙে পড়ে আছে। অন্যান্য অংশেব সংরক্ষণের সময় পাথব গোনার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই হিসেবেই পেছনের অংশে কত পাথব লাগবে জানা যাবে। ২০ হাজার বৃহৎ পাথরের টুকরো কাঁধে করে বয়ে আনতে হয়েছিল মায়া মজুরদেব। তারপর ভারা বেঁধে মায়া রাজমিস্ত্রিরা সেই পাথরখন্ড একের পর এক সাজিয়ে এই ভবনটি তৈরি করেছিলেন। কি অসাধারণ শক্তি আর লেগে থাকার ক্ষমতা থাকলে মানুষ পারে এই কাজ। বাড়িটি ৯৭.৫ মিটার লম্বা। ১২ মিটার চওড়া। ৯ মিটার উঁচু। সামনের দিকে এগারোটি দরজা। এই এগারোটি দরজা দিয়ে যোলটি ঘরে প্রবেশ করা যায়। দু'পাশে একটি একটি দুটি দরজা। প্রতিটি দরজা দিয়ে দুটি ঘরে ঢোকা যায়। তার মানে এই লাট-ভবনে মোট ঘরের সংখ্যা কুড়ি। বাড়িটার সম্মুখ আর পশ্চাৎভাগ যুক্ত করে একটা করিডর ছিল। করিডরটা চলে গেছে কালের গর্ভে। পড়ে আছে দুই প্রান্তে দুটি আর্চ।

এই ভবনটির অসাধারণ কারুকার্য থেকে চোখ ফেরানো যায় না। চারপাশে বৃষ্টির দেবতার মুখ খোদাই করা। মুখেব পাশে পাশে রেখা খেলে গেছে একটা ছন্দ মেনে। গ্রীক শিল্পীরা এমন লাইন ব্যবহার করতেন। সর্বোচ্চ কার্নিসটির ধারে ঢেউ খেলে চলে গেছে একটা চেন, এ-পাশ থেকে ও-পাশ। আসলে এটা চেন নয। জোড়া সাপ। যার মাথা আর লেজ পড়েছিল কার্নিসের দু'মাথায়।

ভেঙে পড়ে গেছে। সামনের দেয়ালের খাঁজে খাঁজে কিছু অসম্পূর্ণ মূর্তি রয়েছে, মায়ারা শেষ করে যাবার সময় পাননি। মনে হয় সে যুগের নামী সব মানুষদের প্রতিকৃতি গড়ার চেষ্টা হয়েছিল।

গ্রেট পিরামিড আমরা দেখলুম। এই পিরামিড সম্পর্কে বিশেষ কোনও তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানের অনুসন্ধান যতটুকু তথ্য দিতে পেরেছে, তা হল, এর নিচের দিকটা অতি প্রাচীন। অর্থাৎ পুরনো গঠনের ওপর নতুনটাকে স্থাপন করা হয়েছে। মেকসিকোর ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অফ অ্যানথ্রপলজি অ্যান্ড হিস্টি সেজার সায়েঞ্জের নির্দেশে ৭২ থেকে ৭৩ সালের মধ্যে এই বিশাল পিরামিডের সংস্কার সাধন করেন। পিরামিডটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সেই অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় আনা হয়েছে। পিরামিডটি নটি স্তরে গড়ে উঠেছে। একটার ওপর আর একটা। বাইরের চারপাশ গ্রীক রেখায় অলংকৃত। অজস্র টিয়াপাখি বিভিন্ন ভঙ্গিতে উৎকীর্ণ। কোনও পাখি সোজা তাকিয়ে আছে। কোনও কোনও পাখির দৃষ্টি পুবে, কোনটির পশ্চিমে। কোনও পাখি ভূমির দিকে নামতে চাইছে। কোনও পাখি উড়ে যেতে চাইছে আকাশে।

পরে আকর্ষণ হল, হাউস অফ দি টরটইস। বাড়িটির এই নামকরণের কারণ, এর সর্বোচ্চ কারনিসে সার সার কচ্ছপ গাঁথা রয়েছে। বাড়িটি আয়তক্ষেত্রকার। পূর্ব-পশ্চিমে ৩০ মিটার লম্বা। উত্তর-দক্ষিণে ১১ মিটার। উচ্চতা আনুমানিক ৭ মিটার। পূর্ব-পশ্চিম দিকে তিনটি করে দরজা আছে। প্রতিটি দরজা দিয়ে দুটি ঘরে ঢোকা যায়। উত্তর দিকে দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর তিনটি ঘর। এই ঘর তিনটির সংস্কার সাধন করা হয়েছে। বাকি দুটি ঘরের ছাদ খুলে পড়ে আছে, কিছুই করা হয়নি। কোনও কোনও ঘরের পাশের দেয়াল বরাবর ছোট ছোট বেদি গাঁথা রয়েছে। উচ্চতা হবে ৩০ সেন্টিমিটারের মতো। বেদিগুলি কি কারণে গাঁথা হয়েছিল জানা যায়নি।

আমরা পায়ে পায়ে ক্রমশই চলে এসেছি আরও উচ্চতর ভূমিতে। এত উঁচু যে পাহাড়ই বলা চলে। আমাদের পায়ের তলায় সব কিছু চলে গেছে। বহু দূরে সেই গ্রেট পিরামিড। পিরামিডের মাথা আর আমাদের পা প্রায় সমভূমিতে চলে এসেছে। এসব হয় পাহাড় না-হয় এর তলায় লুকিয়ে আছে মায়ানগরীর অন্য অংশ। আমাদের গাইড বললেন, যা বেরিয়েছে তারও ঢের বেশি লুকিয়ে আছে মাটির তলায়। আমরা যাকে পাহাড় ভাবছি, তা পাহাড় নয়, মায়া নগরীর প্রাসাদ-প্রাকার, পিরামিড। লুকিয়ে আছে রাজপথ, জনপদ। আছে মানমন্দির। পেলোটা বা বল খেলার কোর্ট। আছে খেলার কোর্ট। আছে বিশাল বিশাল থামঅলা নাটমঞ্চ। যার প্রবেশ-পথের দু'পাশে বসানো আছে বিশাল দুই পাথরকোঁদা মূর্তি। অর্ধশায়িত মানব। ঘাড় ঘুরিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে সামনে তাকিয়ে আছে। মাথায় জেডব্যাণ্ড রয়েছে। পাথরের চেয়ার।

সূর্য ঢলেছে পশ্চিমে। দিন এবার শেষ হয়ে আসছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেইখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অনেকটা নিচে একটা চাতাল। অজস্র স্তম্ভ সেই চাতালে। যেন গুরুত্বপূর্ণ কোনও সভা চলেছে। রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি। যারা নেই, তাদের জন্যে মন খারাপ হচ্ছে। অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা ঘিরে আসছে। হু হু বাতাস বইছে। এখানে ওখানে সবত্র ছড়িয়ে রয়েছে পাথরের চাংড়া। মায়ারা শক্ত ভিতের ওপর সুদক্ষ হাতে গড়ে তুলেছিলেন এ শহর। উকসমল, চিচেন ইৎজা আর মায়াপান নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত শক্তিশালী সাম্রাজ্য, 'মায়াপান লিগ।' বহু রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। কে বাস করতেন ওই বিশাল প্রাসাদে! জীবনধারা কেমন ছিল! ওই যে মন্দির, যে মন্দিরের ভেতরের ছাদে আঁকা রয়েছে অসংখ্য লাল হাত, সেই মন্দিরের রহস্যটা কি! ওখানে কার পূজা হত! কি পদ্ধতিতে! লাল হাতের অর্থ কী, রক্তক্ষরণ! নরবলি। পুরোহিতরা পূজায় বসার আগে স্টিমবাথ নিতেন। 'স্কোয়ার অফ থাউজেণ্ড কলামস'-এর কাছেই রয়েছে এমন স্টিমবাথ। তপ্ত পাথরে জল ছিটিয়ে করা হত বাষ্প। পুরোহিতরা বসে থাকতেন পাথরে মাথা নিচু করে। সবই ছিল। বিপুল, বিশাল। হঠাৎ একদিন সবই মিলিয়ে গেল স্বপ্নের মতো। ধ্বংসাবশেষের মাথায় মাথায় আজ নিশ্চল হয়ে বসে আছে রহস্যময় ইগুয়ানরা। যেন পাথরের ভাস্কর্য।

অ্যানের সোনালি চুলে রোদ পড়েছে। মনে হচ্ছে সোনার কেশর উড়ছে। অ্যান বললে, 'বুঝতে পেরেছি, তোমার খুব মন খারাপ হচ্ছে। কি করা যাবে বলো! সব কিছু একদিন শেষ হয়ে যায় এই ভাবে। চলো, এইবার আমরা চলে এসেছি অনেক দূর।'

আমরা ঢাল বেয়ে নেমে চলেছি সমতলের দিকে। পায়ে পায়ে পাথর গড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সামনে পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে কোনও স্তম্ভ, মূর্তি অথবা ব্যাদিত মুখ সাপ, 'প্লুমড সারপেন্ট।' আমরা

কথা না বললে, কি সাংঘাতিক নিস্তব্ধতা। প্রায় একঘণ্টা লাগল, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলুম সেখানে ফিরে আসতে। ফিরে এসেই বুঝলুম, আমরা কতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে। আমরা তখন সেই ছোট্ট সরাইখানায় গিয়ে ডবল কোকের বোতল খুলে বসলুম। ট্যুরিস্টদের এবার ফেরার সময় হল। সকলেই ক্লান্ত। অতীতের আকর্ষণে সকলেই বর্তমান ভুলে গিয়েছিলেন। এইবার সব একে একে ফিরে আসছেন ক্লান্ত দেহে। একটু আধটু কথাও বলছেন নিজেদের মধ্যে। অ্যান আর আমি দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে মুখোমুখি বসে আছি।

হঠাৎ অ্যান বললে, 'আর মাত্র আজকের রাতটা, তারপর তুমি কোথায় আর আমি কোথায়!'

'একবার, একবারই দেখা হয়, তারপর স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া। তারপর হয় তো বিস্মৃতি।'

খালি বোতল রেখে আমরা বেরিয়ে এলুম। পাশেই কিউরিও শপ। কাউন্টারে এক মায়া মহিলা। সাদার ওপর ফুলছাপ কাপড়ে তৈরি স্কার্ট আর ব্লাউজ পরে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। দোকানে ভালো ভালো বই আছে, পিকচার পোস্টকার্ড আছে। এক ধরনের শার্ট রয়েছে। যার নাম 'গুয়াবেরা শার্ট'। এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। পৃথিবীর আর কোথাও তৈরি হয় না এমন জামা। নানা রঙ। সুন্দর সিন্‌থেটিক কাপড়। সুন্দর টেলারিং। চওড়া কলার। এসবের মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। নতুনত্ব রয়েছে হাতের কাজে। বুকের দু'পাশ দিয়ে ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছে দু'ফালি মৌচাক। কাপড় কুঁচকে কুঁচকে তৈরি করা হয়েছে এই অপূর্ব ডিজাইন। কোনও কোনও জামায় এই হনিকম্বের পাশ দিয়ে উঠেছে নকশা। মায়া আলপনা। যে আলপনায় রয়েছে সূর্যশতদল। দাম তেমন বেশি নয়।

আমি সেই মহিলার নাম রাখলুম, মীরা। নিজের নামের চেয়ে এই নামটি তাঁর খুব পছন্দ হল। ভারত নামে যে একটা দেশ আছে, তা তিনি জানেন না। ইন্ডিয়ান বললে তিনি নিজের স্বজাতি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। যতবার মীরা বলে ডাকি হেসে মুখ তুলে তাকান। দোকানে জেড আর অবিসিডিয়ান পাথরের তৈরি নানা মূর্তি রয়েছে। জাগুয়ার। প্লুমড সারপেন্ট। মায়া শিল্পীদের হাতের কারুকার্য করা গাঢ় নীল রঙের একটা কলম আমাকে উপহার দিয়ে বললেন, 'দেশে ফিরে চিঠি লিখো আমাকে।' দোকান থেকে বেরোবার সময় ভদ্রমহিলাও আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। হাসিমুখে বিদায় জানালেন আমাদের।

আমাদের সেই নির্জন, নিরালা হোটেলটি এক সময় মায়াদেরই কোনও প্রাসাদ ছিল। একটু অদল বদল করে হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানেও মনে হয় একটা স্টিমবাথ ছিল। যত রাত বাড়তে লাগল হোটেলটি হয়ে উঠতে লাগল ততই রহস্যময়। চাঁদের আলোর রাত। হোটেলের পাথুরে ছাদে উঠে ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম বহুক্ষণ। আলোয় ভরা আকাশের গায়ে অন্ধকার পিরামিড। গভর্নর হাউস। প্রান্তর জুড়ে আসর সাজিয়ে বসে আছে মায়াময় মায়ানগরী।

এই হোটেলের খানাপিনায় মায়া সংস্কৃতিকেই ধরে রাখা হয়েছে। মায়ারা অবশ্যই ভোজনবিলাসী ছিলেন। বহুতর পদ প্রস্তুতেও তাঁদের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। চাটনি, আচার, জ্যাম জেলি তৈরিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বহু রকমের গাছগাছড়ার সন্ধান রাখতেন তাঁরা। সেই সব দিয়ে স্বাদ বাড়াতেন খাদ্যবস্তুর। স্প্যানিয়ার্ডরাও ছিলেন রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী। এই দুইয়ের মিলন ঘটল খাবার টেবিলে।

যে-ই প্রশ্ন করি, এটা কি, অমনি সুন্দরী একটা নাম বলেন। নামে কিছুই বোঝা যায় না। স্যুপের নামটা খুবই সহজ, লাইম স্যুপ। সুবাস ছেড়েছে খুব। মশলার ব্যবহার এঁরা সুন্দর শিখেছেন। প্রাচীন ঐতিহ্য। খাওয়ার আগেই জিভে জল এসে যায়। সুন্দর সসারে ঝোল ঝোল সোনালি রঙের পদটির নাম হোয়াইট ফিলিং। তার পাশে, সরপুরিয়ার মতো পদটির নাম পাপড়জুলস। তার পাশে পকচ্যু। এর পাশে চেনা একটি পদ, স্টিক উইথ পোট্যাটোস। তার পাশে ভেনিসন স্টিক। মায়ারা ভীষণ কোকোর ভক্ত ছিলেন। সেই ধারা আজও বহাল আছে। মায়ারা কোকো তৈরি করতেন ফরাসী কায়দায়। পাতলা নয়। দুধ দিয়ে ঘন করে, মোটা করে। সেই রকম কোকোও পরিবেশিত হয়েছে আমাদের টেবিলে।

আহারে বসে আহারের গল্প হওয়াই স্বাভাবিক। এক আমেরিকান সুপণ্ডিত বললেন, 'মায়ারা এক জাতের কুকুর তৈরি করেছিলেন, যাদের শরীরে কোনও লোম থাকত না। লোমহীন অ্যাজটেক ডগ্ মেরিডার চিড়িয়াখানায় আছে। মায়ারা এই কুকুরের মাংস ভীষণ পছন্দ করতেন।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার খাওয়া মাথায় উঠে গেল। ভদ্রলোক খাচ্ছেন আর বলে চলেছেন, মায়ারা কোন কোন প্রাণীর মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতেন। হরিণ, বুনো শূকর, বানর, পিপীলিকাভুক

খরগোস, আরমাডিলো, ইগুয়ানা, টেপেসুকুইন্টেলস। সে আবার কি! মাটির তলায় বসবাসকারী এক ধরনের প্রাণী। আমি জীবনে দেখিনি। মায়ারা আর কী প্রোটিন খেতেন। ছুঁচো, শেয়াল, রাত-চরা-বানর। ওপোসাম। নানা জাতের সাপ। জাগুয়ার, পুমা, টাপির। পায়রা, ঘুঘু, টার্কি।

ভদ্রলোকের ব্যাখ্যার চোটে আমাদের উঠে পড়তে হল। অন্য কোনও কারণে নয়, লোমহীন কুকুরের ছবি বারে বারে ভেসে আসে কল্পনায়। অ্যাজটেকদের সেই কুকুর আবার ঘেউ ঘেউ করত না। আমরা যেমন ছাগ বলি দিই, মায়ারা বলি দিতেন এই কুকুর। আমরা ঘরে না ঢুকে সোজা উঠে গেলুম ছাদে। ছাদে যেন পাতা হয়েছে চাঁদের আলোর মায়া সিংহাসন। অ্যান আমাকে মায়াদের ফলাহারের গল্প শোনাতে লাগল—যেমন গাম গাছের ফল। আপেলের মতো দেখতে। যেমন মিষ্টি তেমনি রসাল। সুন্দর তার গন্ধ। হালকা বাদামী রঙ। সাবামুগো আর একটি ফল। অসংখ্য কালো কালো বীজ, তাকে ঘিরে ফলের শাঁস। খুবই সুস্বাদু। অনেকটা আমাদের দেশের আতার মতো। এখনও এই ফল পাওয়া যায় এবং ভীষণ চাহিদা। বাতাসী ক্যাকটাসে এক ধরনের ফল হয়, যার নাম পিটায়া। কমলালেবুর চেয়ে সামান্য আকারে বড়। শাঁস খুব নরম। সুস্বাদু। তার ওপর কালোর ছিটে। কালো বিন্দুগুলি হল বীজ। ফলগুলি লাল টুকটুকে। অসম্ভব সুস্বাদু। তেমনি সুগন্ধ। স্প্যানিয়ার্ডরা ভীষণ ভালবাসত। এখনও এই ফলের ভীষণ চাহিদা। আর একটি ফল ছিল 'জাপোট নিগ্রো' বা 'ব্ল্যাক জাপোট'। পাকা ফলের ভেতরটা কালো কুচকুচে। ছোট জাতের পেয়ারা ছিল। পরে স্প্যানিয়ার্ডরা বড় জাতের পেয়ারা এনেছিল। আর পেঁপে তো আছেই।

ফল থেকে আমাদের আলোচনা চলে গেল রঙে। মায়ারা কোথা থেকে এত রঙ পেয়েছিলেন। কাপড় রাঙাবার জন্যে। ছবি আঁকার। মৃৎপাত্রে ব্যবহারের জন্যে। মায়ারা নীলের চাষ করতেন। নীলগাছ থেকে আসত নীল রঙ। কুলের মত এক ধরনের ফল, যার পরিচয় ছিল 'আকিয়োট' নামে, সেই ফলের ছোট ছোট বীজ থেকে তৈরি হত লাল রঙ। এই ফল এখনও আছে। মায়ারা এই ফলকে বলতেন কুকসুর। এখন ব্যবহার হয় মাংসের ঝোলে লাল রঙ আনার জন্যে। এই ফলের একটা সুন্দর গন্ধও আছে। অনেকটা আমাদের জায়ফলের মতো। এক ধরনের গাছ আছে এখানে যার ফল কেটে টুকরো টুকরো করে গরম জলে ফোটালে স্বচ্ছ নীল রঙ বের হয়। এই গাছের ইংরেজি নাম 'স্টিক অব কালারস'। কালোজামের ডাল আর ছাল জলে ফোটালে ঘনত্ব অনুসারে হলদে, সবুজ, আর বাদামী রঙ বেরোয়। কাঠকয়লা থেকে আসত কালো রঙ। ওয়াইলড রোর প্ল্যান্টের শিকড় থেকে বেরোত নির্ভেজাল হলুদ রঙ। গিরিমাটি থেকে সিঁদুরে লাল। চুন থেকে সাদা। এই রঙ মিলিয়ে মিশিয়ে মায়ারা তৈরি করতেন অন্য মিশ্রিত বর্ণালি।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর চাঁদও ঢলে গেল পশ্চিমে। নিরালম্ব হয়ে উঠল ঘোর ঘন কালো। ধ্বংসাবশেষে নেমে এল শেষ রাতের ছলছলে ওড়না। ধীরে ধীরে আমরা নিচে নেমে এলুম। অ্যান খাটে পা তুলে হেলান দিয়ে বসল। টেবিল ল্যাম্পের চাপা আলোয় ওর মুখের ডান পাশ উদ্ভাসিত। অ্যানকে দেখাচ্ছে ডাচ পেণ্টারের আঁকা ছবির মত। মানুষ ফেরার আগে সব কিছু থেকে যেমন মন তুলে নেয়, আমিও সেইভাবে তুলতে শুরু করেছি। অ্যানের দিকে আমি আর সেভাবে তাকাচ্ছি না। কাল ভোরে মেরিডা। বিমানে মেকসিকো। সেখানে কয়েকটা দিন। সেখান থেকে ভারতমুখী দীর্ঘ যাত্রা।

অ্যান বললে, 'আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন? কী হয়েছে?'

কিছু একটা বলতে চেয়েছিলুম। গলা দিয়ে স্বর বেরলো না। মানুষের এত আবেগপ্রবণ হওয়া কি উচিত! কে দাম দেয় এ যুগে আবেগের। অ্যান আমার কাঁধে হাত রেখে বললে, 'রাগ হয়েছে।' আমি তার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালুম। সেই তাকানোটাই স্মৃতি হয়ে রইল। ধ্বংসাবশেষের পটভূমিতে স্নেহময়ীর দুটি চোখ।